# আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
# রচনাবলী

## ১৩



If you want to download
a lot of ebook,
click the below link
Get More
Free
eBook
VISIT
WEBSITE
www.banglabooks.in
Click here

# আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

ত্রয়োদশ খণ্ড

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

—দু'শো টাকা—

সম্পাদনা
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
সর্বাণী মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন — অমিয় ভট্টাচার্য
ন্যাশনাল হাফটোন



ASHUTOSH MUKHOPADHYAY RACHANAVALI VOL XIII

An anthology of collection of complete works Vol XIII by Ashutosh Mukherjee. Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd. 10 Shyama Charan Dey Street, Calcutta 700 073

Price Rs. 200/-

ISBN : 81-7293-579-X

শব্দগ্রন্থন : লেজার ইম্প্রেশন

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও এস পি অফসেট ৩০/২ বি হরমোহন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৮৫ হইতে সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

## সূচীপত্র



# ভূমিকা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৯২০–১৯৩৯) তাঁর কালের একজন জনপ্রিয় লেখক। পাঠকের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা তিনি প্রভূত পরিমাণেই পেয়েছিলেন। আর তা অহেতুক ছিল না। আপন শক্তি ও সামর্থ্যে তিনি তা অর্জন করেছিলেন।

বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব নিতান্ত আকস্মিক নয়। এর জন্য একটু একটু করে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। লেখক-কন্যা শ্রীমতী সর্বাণী মুখোপাধ্যায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আগ্রহী পাঠক তা দেখে নেবেন। এই নেপথ্য-ইতিহাস যুগপৎ আকর্ষণীয় ও শিক্ষণীয়।

কর্মসূত্রে বিভিন্ন সময়ে আশুতোষ-জনক অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সপরিবারে বসবাস করেছিলেন। জীবনের সেই অভিজ্ঞতা আশুতোষ তাঁর সাহিত্যে কাজে লাগিয়েছিলেন। তাঁর ভাণ্ডারে অজস্র উপাদান-উপকরণ সংগৃহীত হচ্ছিল। অভিজ্ঞতার এই পুঁজির পরিমাণ সামান্য ছিল না। আশুতোষ সেদিক থেকে প্রাচুর্যের অধিকারী ছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের পূর্বসূরী দু'জন লেখকের রচনা তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। একজন শরৎচন্দ্র (১৮৭৬–১৯৩৮), অন্যজন তারাশঙ্কর (১৮৯৮–১৯৩৯)। উভয়ের সাহিত্য যে মানবিক মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেই মানবিক মূল্যবোধে আশুতোষ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের শাশ্বত ন্যায়-নীতি ও সততার পাঠ নিয়েছিলেন। স্থূল কামনা-বাসনার কাছে আত্মসমর্পণ না করে তাকে জয় করাতেই যে জীবনের সার্থকতা, আশুতোষ তার শিক্ষা পেয়েছিলেন। পরিচিত মানুষজনের মনের অন্দরমহলে অবাধে বিচরণের কৌশলটি আয়ত্ত করেছিলেন। শিখেছিলেন কথন-নৈপুণ্য। কীভাবে পাঠকের অন্তরঙ্গ হতে হয়, পাঠকের বিশ্বাস অর্জন করতে হয়, তার ব্যাকরণ নিষ্ঠাবান শিক্ষার্থীর মতো আত্মস্থ করেছিলেন।

তাঁর সাহিত্যের পাঠযোগ্যতা নিয়ে সংশয় নেই। পাঠক মনোরঞ্জনের ক্ষমতা তাঁর ছিল। কিন্তু সস্তা চটুল উপকরণ-সহায়তায় তিনি পাঠকের মন ভোলাতে চান নি। বরং প্রাত্যহিক তুচ্ছতা-ক্ষুদ্রতার জগৎ থেকে পাঠকের উত্তরণ ঘটিয়েছেন তিনি। বারবার, নানাভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, বাহ্য সুখ-সম্পদ ও খ্যাতির মধ্যে জীবনের সত্যিকার সার্থকতা নেই। জীবনে যথার্থ শান্তি, তৃপ্তি ও আনন্দ আসে সংযম ও সাধনা থেকে। আশুতোষ তাঁর সাহিত্যে সেই সংযম ও সাধনার শিক্ষা দিয়েছেন।

উপনিষদ আর গীতা থেকে তিনি জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করেছিলেন। শান্তি, তৃপ্তি, আনন্দের সন্ধান পেয়েছিলেন উপনিষদে। গ্লানি ও অবসাদ মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিলেন গীতার আশ্রয়ে। গীতা তাঁকে মৃত্যু-ভয় জয় করতেও শিখিয়েছিল।

সংযম ও সাধনার শিক্ষা নিয়েছিলেন ভারতবর্ষের সনাতন জীবনধারা থেকে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, সংযম আনে শান্তি। সাধনা দেয় প্রসন্নতা, নির্লিপ্তি, নিরাসক্তি।

আশুতোষের কাছে এসব নিছক তত্ত্বকথা ছিল না। তাঁর প্রাত্যহিক জীবনাচরণে এবং লেখায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরমের সন্ধানী ছিলেন তিনি। পরমকে পেতে হলে চাই বিশ্বাস, নিষ্ঠা আর আত্মসমর্পণ। তিনি সেই ধারণা বহন করে চলতেন। জীবনের তুচ্ছতা-ক্ষুদ্রতা থেকে তাই সহজেই মুক্ত হতে পেরেছিলেন। তাঁর কাছে যা সহজ ছিল সংসারের অধিকাংশের কাছেই তা সহজ নয়। আর সেখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য।

উপনিষদের 'চরৈবেতি'র মন্ত্রে দীক্ষা তাঁর। এগিয়ে চলাই তাঁর লক্ষ্য। অন্ধকারের জগৎ থেকে আলোর জগতের দিকে এগিয়ে চলা। হতাশাকে জয় করে আশার অভিমুখে এগিয়ে চলা।

ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য নিয়ে জীবন। লেখক আশুতোষ সামগ্রিকভাবেই জীবনকে দেখেছেন, দেখিয়েছেন। কিন্তু অন্যায় শেষপর্যন্ত পরাভূত হয়েছে। ন্যায়ের মহিমা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। পাপী অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হয়েছে। পুণ্যের মর্যাদা বজায় থেকেছে। দস্তয়েভস্কির কথা মনে পড়ে যায় বৈকি। দস্তয়েভস্কির মতোই মূল্যবোধের বিনষ্টি থেকে আশুতোষ তাঁর পাত্র-পাত্রীকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। সুস্থ জীবনবোধে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। সেখানেই তাঁর সাফল্য। তাঁর সিদ্ধি।

বড়ো মাপের উপন্যাস তিনি বেশ কয়েকটি লিখেছেন। 'সোনার হরিণ নেই' তার অন্যতম। দু'খণ্ডের উপন্যাস। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। লেখকের বয়স তখন উনষাট বছর।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারির শুরুতে এ উপন্যাসের সূচনা। নায়ক বাপী তরফদার। ভালো নাম বিপুলনারায়ণ তরফদার। বয়স বাইশ বছর। বি. এসসি পাশ। স্মার্ট, সপ্রতিভ। দীপ্তিমান। কলকাতায় এসেছে জীবিকার সন্ধানে। সংসারে একান্ত আপন বলতে কেউ নেই। হঠাৎ আবিষ্কার করে মিষ্টি অর্থাৎ মালবিকা নন্দীকে। একসময় তার বাবা সন্দীপ নন্দী ছিলেন উত্তরবঙ্গের বানারজুলি রিজার্ভ ফরেস্টের রেঞ্জ অফিসার। বাপীর বাবা ছিলেন ঐ ফরেস্টের কেরানি। মিষ্টি তার জীবনের প্রথম প্রেমিকা। মিষ্টিকে কেন্দ্র করে তার কৈশোরের দিনগুলি উত্তাল হয়ে ওঠে। ভালোবাসার স্বাদ পায়। শরীরী চেতনার জাগরণ ঘটে। বানারজুলি ফরেস্টের গভীরে-গহনে মিষ্টির সান্নিধ্যে তার কৈশোরক প্রেমের উন্মীলন অবশ্য অভিভাবকদের অনুশাসনে বাধা পায়। দু'জনের মেলামেশাও বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে সন্দীপ নন্দী অন্যত্র বদলি হন। বাপীর জীবন থেকে মিষ্টি সাময়িকভাবে হারিয়ে যায়।

বেশ কয়েক বছরের ব্যবধানে সেই মিষ্টির সঙ্গে আবার দেখা হয়। বাপী রোমাঞ্চিত। যৌবনের কামনায় উদ্বেগ। কিন্তু মিষ্টির দিক থেকে কোনও আগ্রহ নেই। তার বয়স এখন আঠারো। সুন্দরী তরুণী। সচ্ছল সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা। লেডি ব্রাবোর্ন কলেজের হিস্ট্রি অনার্সের ছাত্রী। প্রতিবেশী এক তরুণের সঙ্গে তার পূর্বরাগের পালা চলছে। বেকার বাপীকে সে প্রশ্রয় দেবে কেন? তার প্রেমিকের নির্দেশে পাড়ার ছেলেরা বাপীকে অপমান করে।

গভীর মনোবেদনায় বাপী কলকাতা ছাড়ে। দীর্ঘদিন পর শৈশব-বাল্য-কৈশোরের লীলাক্ষেত্র বানারজুলি ফরেস্টে উপস্থিত হয়। এই ক' বছরে বানারজুলির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু বনমায়া এখনও আছে। বনমায়া ফরেস্টের পোষা হাতি। বনমায়া বাপীকে

চিনতে পারে। সেলাম জানায়। বাপী বিস্মিত হয়। ভালোলাগার এক অদ্ভুত অনুভূতিতে তার মন ভরে ওঠে। পুরনো বন্ধু আবু রব্বানীর সঙ্গে দেখা হয়। সে এখন ফরেস্ট গার্ড। রীতিমতো সংসারী। অত্যন্ত করিতকর্মা। বাপীকে সে নিয়ে যায় গায়ত্রী রাইয়ের কাছে। তাঁর নানা রকমের ব্যবসা। বিধবা প্রৌঢ়া। বুদ্ধিমতী। স্বামীর মৃত্যুর পর নিজেই ব্যবসার হাল ধরেছেন। বাপীর সপ্রতিভতা ও বুদ্ধিমত্তায় তার প্রতি আকৃষ্ট হন গায়ত্রী। বাপীকে নিজের প্রতিষ্ঠানে চাকরি দেন। অল্প দিনের মধ্যেই বাপী গায়ত্রীর প্রিয় হয়ে ওঠে। তার বিশ্বস্ততা, কর্মনিষ্ঠা এবং দক্ষতায় গায়ত্রী খুশি হন। বাপীর পদমর্যাদা ও বেতন বৃদ্ধি পায়।

গায়ত্রী তাঁর একমাত্র সন্তান কন্যা উর্মিলাকে নিয়ে কিঞ্চিৎ বিব্রত। তরুণী উর্মিলা এক পাঞ্জাবী তরুণের সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত। মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও সে ঐ পাঞ্জাবী তরুণকে বিয়ে করতে চায়। বাপী উর্মিলাকে উৎসাহ দেয়, গায়ত্রীকে আশ্বাস। পারিবারিক সংকটে সে পরিত্রাতার ভূমিকা নেয়। বাপী ক্রমেই পরিবারটির অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে।

কিন্তু মিষ্টিকে ভুলতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেজেটে দেখে মালবিকা নন্দী হিস্ট্রি অনার্সে সেকেণ্ড ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে। বাপী টেলিগ্রামে মালবিকাকে অভিনন্দন জানায়। সেইসঙ্গে বনমায়ার মৃত্যু-সংবাদটাও জানিয়ে দেয়। আশ্চর্য, দু'দিনের মধ্যেই উত্তর আসে। টেলিগ্রামের উত্তর মালবিকা দেয়নি, দিয়েছে মিষ্টি। বাপীর মনের মধ্যে আলোড়ন শুরু হয়।

কাহিনী নতুন বাঁক নেয়। এখানের প্রথম খণ্ডের পরিসমাপ্তি। পাঠক কৌতূহলী হয়ে ওঠে। বেশ বোঝা যায়, মিষ্টি ও বাপীর সম্পর্কের টানাপোড়েন শেষ হয় নি। তার চূড়ান্ত পরিণতি জানার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

উপন্যাসটি কাহিনীপ্রধান নয়, চরিত্রপ্রধান। প্রধান চরিত্র বাপী। বাপী-চরিত্রের ক্রমবিকাশসূত্রেই অন্যান্য চরিত্রের আবির্ভাব। বাপী অসাধারণ নয়, আবার একেবারে সাধারণও নয়। বংশকৌলীন্য, বিত্তবৈভব, পাণ্ডিত্যগৌরব, ঈর্ষাযোগ্য পদমর্যাদা কিছুই তার নেই। এমন একটি চরিত্রকে নায়ক করে লেখক সংস্কারের বেড়া ভাঙেন, দুঃসাহসের পরিচয় দেন। অন্যদিকে বাপীর মধ্যে যে ঋজুতা, সারল্য, সত্যনিষ্ঠা, সহিষ্ণুতা, সংকল্পের কঠোরতা ও সংগ্রামশীলতা আছে তাও সহজলভ্য নয়। নায়ক-নির্বাচনে লেখক এগুলিরই আশ্রয় নেন। তাঁর রুচি ও পছন্দ যে ভিন্নধরনের সেকথা স্বীকার করতেই হয়।

নায়ক-চরিত্রের ক্রমোন্মোচন ও ক্রমবিকাশে বিভিন্ন নারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বালিকা মিষ্টির হাত ধরেই গোপন নিষিদ্ধ জগতে বাপীর প্রথম পদার্পণ। দুর্বার কামনা-বাসনার সঙ্গে বাপীর প্রথম পরিচয়। ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষার জাগরণ। মেয়েদের শরীর সম্পর্কে কৌতূহলের বিস্তার। বয়সে বড়ো অবকাশ যাপনের সঙ্গী আবু রব্বানীর তাতে ইন্ধন দান। অপরিণত দেহমনের অধিকারিণী মিষ্টির দেহমনের জাগরণ তখনও শুরু হয়নি। ফলে বাপীর দাবদগ্ধ দেহের আমন্ত্রণে সে সাড়া দেয় না। প্রেমের ব্যাপারেও সে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা। প্রেম তাই অবিকশিত থেকে যায়। অভিভাবকদের অনুশাসনে বাপীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়। বাপী কিন্তু শরীরের ভাষা বুঝতে শেখে, তার দেহস্থিত জান্তব সত্তাটির সম্পর্কে সচেতন হয়। সতর্কও। আবুর মাধ্যমে বেদেনী দুলারি ও রেশমার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। বাপীর মনের বয়স বাড়ে।

কলকাতায় স্বল্পকালের মধ্যেই সে বিভিন্ন নারীর সঙ্গে পরিচিত হয়। ব্রুকলিন

কোম্পানির বড়োবাবু মন্মথ সোমের অবিবাহিত কন্যা উষার অর্থপূর্ণ চাহনি তার পৌরুষকে উদ্দীপ্ত করে। গৌরী বৌদির কামনাব্যাকুল আহ্বানে সাড়া না দিয়ে সে স্থানত্যাগ করে। তার বিবেকতাড়না তাকে রক্ষা করে। বেকার অবস্থায় তার আশ্রয়দাতা বৃদ্ধ রতন বণিকের দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী ভার্যা সন্তানহীনা কমলা কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে তাকে শয্যাসঙ্গী হতে বাধ্য করে। তার নীতিবোধ পরাভূত হয়। জীবনে এই প্রথম নারীদেহ সম্ভোগের অভিজ্ঞতা তাকে বিষণ্ন করে। গ্লানিমুক্তির জন্য সে কলকাতা থেকে বানারজুলিতে পলায়ন করে। গায়ত্রী রাইয়ের মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বে সে আকৃষ্ট হয়। গায়ত্রী রাইকে শ্রদ্ধা করে। গায়ত্রী-কন্যা উর্মিলা তার নিঃসঙ্গ জীবনকে প্রীতি-মাধুর্যে অভিষিক্ত করে। বাপীর চলার পথে এরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু চিহ্ন রেখে যায়। কিন্তু বাপীর সমস্ত হৃদয় জুড়ে থাকে মিষ্টি। যাকে আকৈশোর সে ভালোবেসে এসেছে। মিষ্টিকে সে জয় করতে চায়। মিষ্টির জন্য একাধিকবার সে লাঞ্ছিত হয়েছে। গোপনে বহন করে চলেছে চিত্তজ্বালা। বাপী সুযোগের অপেক্ষা করে। প্রতীক্ষায় অক্লান্ত সে।

'সোনার হরিণ নেই' দ্বিতীয় 'আরণ্যক' নয়। যদিও অরণ্য-জীবন এ উপন্যাসের অনেকখানি অংশ অধিকার করেছে। অরণ্য এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়, বড়ো জোর তাকে পার্শ্ব চরিত্রের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। বাপীর দেহ-মনের বিকাশে বানারজুলি অরণ্যের অবদান অবশ্য অনস্বীকার্য। অরণ্য সম্পৃক্ত মানব-মানবী ও ইতর প্রাণীদের প্রেম বাপীকে নানাভাবে নাড়া দিয়েছে। তার প্রেম-সংস্কার এই প্রতিবেশেই লালিত পালিত হয়েছে। বানারজুলির অরণ্যভূমি তার বাল্য-কৈশোরের ক্রীড়াভূমি, তার যৌবনের উপবন। বানারজুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে ভাবাই যায় না।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সুস্থ জীবনবোধের সন্ধানী। তাঁর এই অনুসন্ধান-তৎপরতা আলোচ্য উপন্যাসেও লভ্য। বাপীর হতাশাগ্রস্ত জীবনকে তিনি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে দেন নি। তাকে সফলতায় ভরিয়ে তুলেছেন। শুধু তাই নয়, বাপীও সাধ্যমতো গায়ত্রী ও তার কন্যা উর্মিলা, আবু, দুলারি, রেশমা প্রমুখের জীবনে যথার্থ হিতৈষীর ভূমিকা নিয়েছে।

উপন্যাসের শেষ পর্বে পাহাড়-জঙ্গলের মাঝখানে ক্ষণিকের জন্য জটাজূটধারী কোনও এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটে। তিনি বাপীর উদ্দেশে বলেন—'আগে বাঢ়্। মিল যায়গা।' বাপীর কাছে তা দৈববাণীর মতো মনে হয়। বাপী বিস্মিত, উদ্দীপ্তও। সে এগিয়ে চলে। জীবনের সার্থকতা খোঁজে। বাইশ বছরের এক তরুণের জীবন-কাহিনী নতুন তাৎপর্য পায়। পাঠকের কৌতূহল বাড়ে। বাড়ে প্রত্যাশা।

'তিনপুরুষ' (মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯) তিন পুরুষের কাহিনী। সিদ্ধেশ্বর, সোমেশ্বর ও ধ্রুব তিন প্রজন্মের প্রতিনিধি। সিদ্ধেশ্বর চাটুজ্জেকে দশখানা গাঁয়ের লোক তেজ-সিদ্ধ পুরুষ ভাবতো। পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। নানাস্থানে তর্কসভা ও বিচারসভায় তাঁর ডাক পড়তো। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। পুরনো ঐতিহ্যের অনুসারী। নির্লোভ এবং মর্যাদা-সচেতন। বর্ধমানের মহারাজার শ্রদ্ধা-প্রীতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু সে সুযোগ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন নি। সাদামাটা অনাড়ম্বর জীবন ছিল তাঁর। পরের গোলামি পছন্দ করতেন না। বাহারীতে বসতবাড়ি বানিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল ঠাকুরদালান ও অতিথিঅভ্যাগতদের থাকার ঘর। পুকুর আর ফুল-ফলের বাগানও ছিল।

বিঘা পনের চাষের জমি ছিল তাঁর। জীবন নির্বাহের পক্ষে তাই যথেষ্ট মনে করতেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাহিদা ছিল না। তিনি স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেছিলেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে পুত্র সোমেশ্বরকে স্থিরচিত্ত হতে বলেছিলেন।

সোমেশ্বর সিদ্ধেশ্বরের উপযুক্ত পুত্র। কালবদলের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির দিকে ঝুঁকেছিলেন তিনি। বি. এ-তে সংস্কৃতে অনার্স ছিল। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন। এবং ঈশান-স্কলার। এম. এ-তেও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। বিষয় : সংস্কৃত। সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ তিনি পিতার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন।

অধ্যাপকের বৃত্তি বেছে নিয়েছিলেন। অধ্যাপনার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। আয়ুর্বেদ এবং হোমিওপ্যাথি মতে আশপাশের গরীব মানুষজনের চিকিৎসাও করতেন। চিকিৎসক হিসেবে সুনাম ছিল তাঁর। বিপদগ্রস্ত মানুষজনকে গোপনে অর্থ-সাহায্য করতেন। পাণ্ডিত্যে, ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রশক্তিতে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। সরল মর্যাদাসম্পন্ন জীবনই তাঁর কাঙ্ক্ষিত ছিল। সে আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকেনি। মানসিক ঔদার্যে ছিলেন অসাধারণ। সমাজের চোখে যারা ঘৃণ্য, অপরাধী, তাদের অবজ্ঞা করেন নি। আত্মশুদ্ধির সুযোগ দিয়েছেন। মূল জীবনস্রোতে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। সমস্ত সংস্কারকে অগ্রাহ্য করে একমাত্র পুত্রের সঙ্গে বিধবার বিয়ে দিয়েছেন। জীবনের মতো মৃত্যুতেও তিনি মহৎ। শান্ত প্রসন্ন চিত্তে মৃত্যুকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে অসংখ্য মানুষ কেঁদেছে। 'কাতারে কাতারে হাজারে হাজারে লোক আসছে। খনির কুলি এলাকার মেয়েপুরুষরা। অস্পৃশ্য এলাকার ছোট ঘরের মেয়েপুরুষরা। জমির চাষীরা। আদিবাসী মেয়েপুরুষরা। আসছে, ফুঁপিয়ে কাঁদছে, বুক চাপড়ে কাঁদছে, মাটিতে গড়াগড়ি করে কাঁদছে। ...চেনা অচেনা কত ভদ্রলোক আসছে। দেখছে। কাঁদছে। ...ছোট বড় নেই, উঁচু-নীচু নেই, শিক্ষিত অশিক্ষিত নেই, পাপী অপাপী নেই। সকলেই এক মৃত্যু-তীর্থ দেখতে আসছে, কেঁদে কেঁদে চলে যাচ্ছে; এই শোকের খবর কোনো কাগজে ছাপা হবে না, এই শোক নিয়ে কোনো সভা হবে না—এ শুধুই অগুনতি মানুষের বুকের তলার শোক।' অসংখ্য মানুষের শ্রদ্ধা-প্রীতি আর চোখের জলে অভিষিক্ত হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন সোমেশ্বর। সন্দেহ নেই এ মৃত্যু সমারোহের, গৌরবের।

ধ্রুব তৃতীয় প্রজন্মের প্রতিনিধি। অর্থনীতির কৃতী ছাত্র। আই. এ. এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রশাসনের উচ্চপদে বৃত। বংশের মেধাশক্তির ধারাবাহিকতা তার মধ্যেও বহমান। নানা ব্যাপারে সোমেশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তার অবশ্য পার্থক্য দেখা যায়। প্রয়োজনে তর্কও করে। সোমেশ্বরের অনেক কিছুই সে পছন্দ করে না। প্রকাশ্যে সমালোচনা করে। যেমন, সোমেশ্বরের চিকিৎসায় তার আস্থা নেই। অপচয়-বিরোধী সোমেশ্বর তার মতে কৃপণ। সোমেশ্বরের ক্ষুরধার বুদ্ধির কাছে সে কিন্তু বারবার পরাজিত হয়। চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে তাঁর মৃত্যুর পর। পিতার মহত্ত্ব সে বুঝতে পারে।

উপন্যাসটি আকারে ছোট। তিন পুরুষের কাহিনী হলেও দ্বিতীয় পুরুষেরই প্রাধান্য। সোমেশ্বরই এ উপন্যাসের নায়ক। তুলনায় সিদ্ধেশ্বর টাইপ বা একপেশে চরিত্র। কিন্তু সোমেশ্বরের চরিত্রটি বর্ণদীপ্ত। ধ্রুবও পিতার পাশে ম্লান, নিষ্প্রভ।

আলোচ্য উপন্যাসে তিন প্রজন্মের তিন প্রতিনিধিকে আশ্রয় করে কাল-পরিবর্তনের রূপটি ধরতে চেয়েছেন লেখক। সিদ্ধেশ্বর উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের, সোমেশ্বর বিশ

শতকের প্রথমার্ধের এবং ধ্রুব বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রতিনিধি। কাল-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধ কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে লেখক তাও দেখিয়েছেন। সমাজের অন্তরঙ্গে এবং বহিরঙ্গে পরিবর্তনের যে সমস্ত চিহ্ন পরিস্ফুট লেখক তারও উল্লেখ করেছেন। স্মরণযোগ্য, অনেকখানি সময়ের পরিসরে তিন প্রজন্মের কাহিনী লেখক 'নগর পারে রূপনগর' ১৯৬৩ উপন্যাসেও শুনিয়েছেন। বেশ বোঝা যায়, এ ধরনের কাহিনী নির্বাচনে লেখকের একটা আসক্তি ছিল। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের (১৯০৮–১৯৬৩) 'কলকাতার কাছেই' (১৯৫৭), 'উপকণ্ঠে' (১৯৬১), 'পৌষ ফাগুনের পালা' (১৯৬৩) এবং আশাপূর্ণা দেবীর (১৯০৯–১৯৬৩) 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' (১৯৬৪), 'সুবর্ণলতা' (১৯৬৩), 'বকুলকথা' (১৯৬৩) ট্রিলজীর কথা মনে পড়ে। আশুতোষ তিন প্রজন্মকে নিয়ে ট্রিলজী রচনা করেন নি। হয়তো সময়াভাবেই তা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তার একটি সম্ভাবনা ছিল।

'একাল ওকাল' ১৯৬৩ সালের শারদীয় 'নবকল্লোল' পত্রিকায় 'এ-কাল ও-কাল' : 'মাঝখানে রতনে কালী' নামে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় (' ১৯৬৩) গ্রন্থনাম ঈষৎ পরিবর্তিত। লেখকের অভিপ্রায়কে মর্যাদা দিয়ে তাঁর মৃত্যুর পর লেখক-কন্যা এরূপ পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।

আলোচ্য উপন্যাসের মর্মবাণীটি 'নিবেদন' অংশে লেখক-কন্যার জবানীতে ব্যক্ত হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন : 'নিখাদ বিশ্বাসের জোর, নিটোল সমর্পণের শান্তি আর নিরন্তর জীবনের অস্তিবাদী আশা এ বইয়ের প্রথম ও শেষ কথা। কালীমূর্তি ও পঞ্চমুখী একটি শাঁখ এই উপন্যাসে প্রতীক হিসাবে এসেছে, বিশ্বাস সমর্পণ আর আশার প্রতীক। যে বিশ্বাস সমর্পণ আর আশা নিয়ে এ বই, সে সত্য সুন্দর আর আত্মশক্তির প্রতি বিশ্বাস ; সে সমর্পণ শিব মঙ্গল আর উত্তরণের পায়ে আত্মসমর্পণ ; সে আশা শাশ্বত অস্তিবাদের নিশ্চিত আশ্বাস। যে বিশ্বাস এ যুগে প্রায় লুপ্ত, যে সমর্পণ এ দুনিয়ায় আজ অচল, যে আশা একালে নিছক দুরাশা,—সেই নিখাদ বিশ্বাস, নিটোল সমর্পণ আর নিরবচ্ছিন্ন আশার শক্তি লেখক এই ঘুন ধরা সমাজের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন।'

'একাল ওকাল' উপন্যাসের লেখক ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন। 'আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডে লেখক-কন্যা তাঁর পিতৃদেবের জীবনের একটি রাত্রের এমন কিছু অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন (দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ১৩-১৪) যা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। লেখক হিসেবে তখনও আশুতোষ প্রতিষ্ঠিত হননি, অথচ প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। মনের মধ্যে হতাশা পুঞ্জীভূত। গভীর রাত্রে ঠাকুরঘরে ঢুকে 'মেঝেতে মাথা ঠুকে' 'ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে' কাঁদতে লাগলেন। ঠাকুরঘরে রয়েছে বংশের বহুকালের পুরনো নারায়ণ শিলা, আশুতোষ জননী তরুবালার দক্ষিণাকালীর ছবি। হঠাৎ মাথায় কার যেন হাতের স্পর্শ। প্রাণ জুড়িয়ে গেল। দৈববাণীর মতো আশুতোষ শুনলেন, 'আশু, ওঠ। আমি বলছি তোর কোনদিন দৈন্য হবে না। তুই যা যা চাস, আজ এই ঠাকুরঘরে আমার এই ঠাকুরের সামনে চেয়ে নে। আমি বলছি, তোর হবে, তুই যা যা চাস, স-ব হবে তোর....।'

জলে ভেজা মুখ তুলে আশুতোষ দেখলেন, তাঁর গর্ভধারিণী মা। তাঁর দুটি চোখে হাসি।

ঠিক সেই মুহূর্তে মনের মধ্যে এক প্রচণ্ড জোর পেলেন আশুতোষ। মায়ের প্রতিটি কথা অকপটে বিশ্বাস করলেন। মনে হলো, মায়ের মুখ দিয়ে স্বয়ং দক্ষিণাকালীই ঐ কথাগুলি বললেন।

আশুতোষ চাইলেন। নাম-যশ-অর্থ-খ্যাতি-সাফল্য।

পরবর্তীকালে এ সবই আশুতোষ পেয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, বিশ্বাস আর আত্মসমর্পণে সব কিছু পাওয়া যায়। 'একাল ওকাল' উপন্যাসে বিশ্বাস আর আত্মসমর্পণের একটি কাহিনী রচনা করেছেন আশুতোষ। বস্তুবাদীদের চোখে যে কাহিনী অলৌকিক, অবাস্তব। আশুতোষের লেখনী-নৈপুণ্যে অবশ্য সে কাহিনী রুদ্ধনিশ্বাসে পড়তে হয়। কোনও সংশয়, কোনও সন্দেহ মাথা চাড়া দেয় না।

গাজনপুরের জমিদার বিক্রমদেব আচার্য চৌধুরীকে দিয়ে এ কাহিনীর সূত্রপাত। 'জীবদ্দশাতেই প্রবাদপুরুষ হয়ে উঠেছিলেন। দয়া-নিষ্ঠুরতা বিলাস-ব্যসন ধর্ম-কর্ম সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য পুরুষ ছিলেন।'

পিতার সঙ্গে মতান্তরের কারণে মাত্র পনের বছর বয়সে একদা গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করেছিলেন। সঙ্গে নিয়েছিলেন 'বংশের প্রতিষ্ঠিত দেড়শ বছরের পুরনো শ্যামাকালী-বিগ্রহ'টিকে। 'অর্ধ অঙ্গ ঘন নীল, অর্ধ অঙ্গ কষ্টিকালো। দেড় হাত প্রমাণ ছোট্ট মূর্তি, অপরূপ তাঁর শ্রী।' 'লোকে বলত সিদ্ধপুরুষ ছিলেন তিনি। দেবীর আদেশেই তাঁকে তুলে এনেছিলেন। তারপর থেকে তাঁরই নির্দেশমতো চলেছেন। নবাবকে তুষ্ট করে ঐ দেবীর আশীর্বাদেই গাজনপুরের জমিদারি পেয়েছিলেন। তারপর আস্তে আস্তে গাজনপুরের সচল কিংবদন্তী হয়ে উঠেছেন।'

প্রাসাদ-চত্বরেই দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরের সামনে বিশাল দীঘি খনন করেছিলেন। দীঘি খননের সময় 'মাটির সঙ্গে উঠে এসেছিল একটা অদ্ভুত সুন্দর শঙ্খ। আকারে এক বিঘতের বেশী হবে না, পাঁচটা মুখ, ধবধবে সাদা। এত সাদা যে আলোর মধ্যেও চোখ ধাঁধিয়ে ওঠে। সেই শঙ্খ মাথায় ঠেকিয়ে বিক্রমদেব বিগ্রহের সামনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।'

প্রতি সন্ধ্যায় সেই শঙ্খ নিয়ে নিজেই আরতি করতেন বিক্রমদেব। তাঁর শঙ্খ-আরতি দেখার জন্য গাজনপুরের মানুষজন মন্দিরের সামনে ভিড় করতো। 'দু-হাতের দশ আঙুলের বিচিত্র মুদ্রায় শঙ্খ তুলে শুরু হতো আরতি। ...আরতি করতে করতে হঠাৎ একসময় দেবীর দিকে দু-হাত প্রসারিত করে স্থির হতেন বিক্রমদেব। শয়ে শয়ে লোকের চোখের সামনে সেই শঙ্খ নাকি তাঁর তালু ছেড়ে সবেগে শূন্যে উঠে পাক খেয়ে উত্তরমুখী হয়ে আবার তাঁর হাতে ফিরে আসত। শঙ্খের পাঁচমুখ বেয়ে শান্তির জল পঞ্চধারে গড়িয়ে পড়ত।'

একসময় পুত্র অনলদেবকে নিয়ে সমস্যা দেখা দিলো। অনলদেব দুর্বিনীত, রাগী, দাম্ভিক, অত্যাচারী এবং ব্যভিচারী। বিক্রমদেব পুত্রের বিয়ে দিলেন। পাত্রী সুচারু ব্যক্তিত্বময়ী। অনলদেবের সঙ্গে অচিরেই সংঘাত বাধলো। অনলদেব আরও দুর্বিনীত স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠলো। পরবর্তী কাহিনী ঘটনাবহুল। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় শঙ্খ-আরতির সময় বিক্রমদেব মারা গেলেন। তারপর থেকেই শঙ্খ অনড় হয়ে গেল। অনলদেবের পুত্র নির্মাল্যদেবের অকালমৃত্যু হলো। অবশ্য অনলদেবের কন্যা শুভলক্ষ্মীর বংশ

থাকলো। সুচারু বিষ খেল। মৃত্যু হলো তার। অনলদেব পাগল হয়ে গেল। মন্দির থেকে দেবীমূর্তি উধাও হলো। প্রাসাদে আগুন লাগলো। সে আগুনে দগ্ধ হলো অনলদেব।

একসময় নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে মঙ্গলশঙ্খ এলো শুভলক্ষ্মীর পুত্র ত্রিদিবনারায়ণের হাতে। ত্রিদিবনারায়ণও সে শঙ্খকে সচল করতে পারে নি। শুধু বিশ্বাস করেছে পৌত্রী উত্তরা কিংবা তার বংশধরদের হাতে হয়তো সে শঙ্খ আবার সচল হবে।

মৃত্যুর ঘনঘটায় এ উপন্যাস পরিপূর্ণ। ক্রমান্বয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে থাকে। অলৌকিকতা প্রশ্রয় পায়। বিশ্বাস আর আত্মসমর্পণকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য লেখক কঠিন পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। অন্যায়ের শাস্তি কী ভয়াবহ তা দেখান।

এ উপন্যাসের স্মরণযোগ্য চরিত্র সুচারু। এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী-চরিত্র বাংলা কথাসাহিত্যে দুর্লভ। সুচারু আমাদের মনের মধ্যে দাগ রেখে যায়। এমন একটি চরিত্রের স্রষ্টা হিসেবে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অবশ্যই পাঠকসমাজে নন্দিত হবেন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের যে কোনও উপন্যাস পড়েই মনে হয়, তিনি একজন নিপুণ কথক। কথকতার গুণে বহুকাল তিনি পাঠকসমাজের প্রিয় হয়ে থাকবেন। মানবিক মূল্যবোধের জন্য তিনি শ্রদ্ধাযোগ্য। মানুষের মঙ্গল চান তিনি। সমাজের সুস্থতাই তাঁর কাম্য। তিনি আশাবাদী। অন্যায়ের প্রতিবাদী, কিন্তু অন্যায়কারীকে আত্ম-সংশোধনের সুযোগ দেন। মানুষের বিবেক এবং শুভবুদ্ধি উদ্বোধনের নিরন্তর প্রয়াসী তিনি। তাঁর প্রতিষ্ঠা, তাঁর মর্যাদা তাই সহজে ক্ষুণ্ণ হবার নয়।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মানস মজুমদার

# সোনার হরিণ নেই

(প্রথম ভাগ)

—তোমাকে

# এক

বেশ মজার স্বপ্ন দেখছিল বাপী তরফদার। শহরটা যেন পাঁচ মাসের দেখা কলকাতা শহর নয়। জঙ্গলটাও বানারজুলির চেনা জঙ্গল নয়। কলকাতার মতোই আর একটা শহর। বানারজুলির মতোই আর একটা জঙ্গল। সেই শহর আর জঙ্গল পাশাপাশি নয়। একটার মধ্যে আর একটা। জঙ্গলের মধ্যে শহর, আবার শহরের মধ্যেই জঙ্গল। হাতি বাঘ ভালুক হায়না চিতা হরিণ মানুষ মেয়েমানুষ সব যে-যার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছেও না। কারো প্রতি কারো ভ্রূক্ষেপ নেই।

ঘোরের মধ্যেই ঘুমটা ভেঙেছে। বাপী তরফদার হঠাৎ ঠাওর করে উঠতে পারছিল না কোথায় শুয়ে সে। উদ্ভট স্বপ্নের রেশ মগজে লেগে আছে। সামান্য নড়াচড়ার ফলে দড়ির খাটিয়া ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে উঠতে সজাগ হল। সবে সকাল। মাথাটা ভার-ভার।

দেড় মাস হল খুপরি ঘরের এই দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে রাত কাটছে। তার আগে যেখানে ছিল সেটা ভদ্রলোকের আশ্রয়। সেখানে সুখ ছিল। ভোগ ছিল। মণিদার বউ গৌরী বউদির চোখের তারায় আগুন ছিল। সে-আগুনে ব্যভিচারে প্রশ্রয় ছিল। রমণীর অকরুণ ইশারায় মণিদার পুরুষকার বাপী তরফদারের পিঠে চাবুক হয়ে নেমে আসে নি। ভালো মানুষ মণিদা সাদামাটা দু'চার কথায় তাকে বিদায় দিয়েছিল।

তারপর থেকে এই দেড় মাস এখানে।

ভদ্রলোকের সেই সুখের ঘরের আশ্রয় থেকে ঢের ভালো। তবু সকালে ঘুম ভাঙলে মাথাটা রোজই ওই রকম ভার-ভার লাগে। সেটা দড়ির খাটিয়ার দোষ নয়। নিজের দোষ। মাথার দোষ। অমন পাগলের স্বপ্ন ক'টা লোক দেখে? স্বপ্ন দেখুক বা না দেখুক, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যে খাপছাড়া ভাবনাগুলো আর ইচ্ছেগুলো মাথার মধ্যে ঠিকি দিয়ে জমতে থাকে, সেগুলো তরল হবার মতো গাঢ় ঘুমের প্রলেপই বা কতটুকু পড়ে? নইলে এই রকম দড়ির খাটিয়ায় চেপেই তাদের মতো লোকেরা নিমতলা-কেওড়াতলায় চলে যায়। আবার ওতেই শুয়ে ঘুমোয়ও দিব্যি।

টালি-ছাওয়া পঁচিশ ঘর বাসিন্দার মধ্যে ক'টা ঘরেই বা খাট-চৌকি আছে। ভালো ঘুম না হওয়াটা নিজের স্বভাবের দোষ বাপী তরফদারের। তার বুকের তলায় অসহিষ্ণু বাষ্প ছড়ানোর একটা মেসিন বসানো আছে। মুখ দেখলে কিছু বোঝা যায় না, সেটা তার নিজের কৃতিত্ব। কিন্তু ওই মেসিনটার ওপর তার কোনো হাত নেই। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ওটা কাজ করে চলেছে। বাষ্পগুলো ঠেলে ঠেলে মাথায় নিয়ে গিয়ে ঠাসছে। ওই নিয়ে ঘুম, ওই নিয়ে জাগা।

গোল চাপ-বাঁধা এই পঁচিশটা টালিঘরের শতেক বাসিন্দাদের একজন ভাবতে চেষ্টা করে নিজেকে। কিন্তু এখানকার বাসিন্দাদের প্রায় কেউই তা ভাবে না। এমন কি, যার আশ্রয়ে ওই আধখানা ঘরে সে আছে, সেই রতন বণিকও ভাবে না। তার বউটার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। কিন্তু বাকি সকলে তাকে ভদ্রলোক ভাবে। ভদ্রলোকের ছেলে ভাবে। ভদ্রলোকের মস্ত পাশ-টাশ করা ছেলে ভাবে। তাদের চোখে এখানে সে রতন বণিকের সমাদরের অতিথি। নেহাৎ বিপাকে পড়ে দিন কতকের জন্য এসে ঠাই নিয়েছে। দিন

ফিরলেই চলে যাবে। নইলে বিপুলবাবুও ওদের মতো ওই আধখানা টালি-ঘরে পাকা বসবাসের ভাঙা কপাল নিয়ে এসেছে নাকি! রতন বণিক কপাল চেনে। বিপুলবাবুর কপাল এরই মধ্যে সকলকে সে ঢাক পিটিয়ে চিনিয়ে দিয়েছে।

...বিপুল তারই নাম। শুধু বিপুল নয় বিপুলনারায়ণ তরফদার। গরিব বাবা-মা কোন্ বিপুল আশার খুঁটি ধরে এরকম একটা নাম রেখেছিল জানে না। গোটা নামটা মনে হলে নিজেরই হাসি পায়। তবে এই পোশাকি নাম ভালো পোশাকের মতো তোলাই থাকে বেশির ভাগ সময়। বাবা মা আত্মীয় পরিজন বন্ধু-বান্ধব সকলের কাছেই সে বাপী। বাপী তরফদার। জ্ঞান বয়সের আগে থেকে ওই নাম শুনে তার কান পেকেছে। কিন্তু খিদিরপুর ব্রুকলিন গোডাউনের বাবুদের পিয়ারের পিওন 'আট-কেলাস' পড়া রতন বণিকের সঙ্গে কার্য-কারণ সুবাদে এখানে তার ওই পোশাকি নামটাই চালু।

অন্য সব দিনের সঙ্গে এই দিনটার সকাল দুপুর বা বিকেলের রঙে তফাৎ ছিল না একটুও। টালি এলাকার সক্কলের আগে রোজ যেমন ঘুম ভাঙে আজও তাই ভেঙেছিল। তফাৎ শুধু উদ্ভুট স্বপ্নটা। তার রেশ ছিঁড়তে রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে একবার চোখ তাকিয়ে খুপরি জানলার ফাঁক দিয়ে ভোরের আলোর আভাস দেখেছিল। নড়বড়ে জানলা দুটো বন্ধ করলেও খানিকটা ফাঁক থেকেই যায়। সেই ফাঁক দিয়ে আলো ঢোকে। মাথার ওপরের টালির ছাদের ফাঁক দিয়েও আলোর রেখা হামলা করে। আলোর এরকম বেয়াড়া স্বভাব বরদাস্ত করতে ইচ্ছে করে না বাপী তরফদারের। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো শতেক ফুটোর কম্বলটা মাথার ওপর টেনে দিয়ে অন্য দিনের মতোই সে আবার অন্ধকারে সেঁধিয়ে গেছল।

উনিশ-শ' আটচল্লিশের ফেব্রুয়ারির একেবারে গোড়ার দিক এটা। চার কি পাঁচ তারিখ হবে। সকালের শীতের কামড়ের হাত থেকে বাঁচার তাগিদেও আপাদ-মস্তক কম্বলে ঢাকা দিতে হয়। কিন্তু শেষ রাতে হোক বা প্রথম সকালে হোক, চোখ একবার দু' ফাঁক হলে ঘুমের দফা শেষ। কম্বল মুড়ি দিয়ে শুলেও সবার আগে কলতলার কলরব কানে কটকট করে লাগবে। এই শীতের সকালেও জল নিয়ে কাড়াকাড়ি। কম্বলের তলায় ঢুকে বাপী তরফদারের ইচ্ছে করে ওদের সক্কলের মাথায় ঘড়া ঘড়া জল ঢেলে দিয়ে আসতে।

সকালের আলো গরম হতে না হতে একটু আগে পরে গাঁ-গাঁ করে রেডিও বেজে উঠবে দু' ঘর থেকে। পঁচিশ ঘর বাসিন্দার মধ্যে মাত্র দু' ঘরেই এই সম্পদ আছে। তারা সক্কলকে জানান দিয়ে বাজায়। প্রথমেই শোকের প্রসঙ্গ শুরু হবে। সমস্ত দেশ জুড়ে শোকের কাল, শোক-পক্ষ চলেছে এখন। আজ ফেব্রুয়ারির চার তারিখ কি পাঁচ তারিখ বাপী তরফদার ঠিক করে উঠতে পারছিল না। যাই হোক, পাঁচ-ছ'দিন আগে নীল আকাশ থেকে আচমকা একটা বাজ পড়ার মতো সেই শোক-সংবাদ সমস্ত পৃথিবীর বুকের ওপর ফেটে পড়েছিল। গান্ধীজী দিল্লীর প্রার্থনা সভায় গুলিবিদ্ধ হয়ে 'হা-রাম' বলে চিরকালের মতো মাটিতে লুটিয়েছেন।

খবরটা শুনে পৃথিবীর শত-সহস্র-কোটি মানুষের মতো বাপী তরফদারও প্রথমে সচকিত আর পরে স্তব্ধ হয়েছিল। কলকাতায় এসেছে মাত্র পাঁচ মাস আগে। অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হওয়ার এক মাসের মধ্যে। দূরে বসে দাসত্বের শেকল ভাঙার ঝনঝনানি কানে যত মিষ্টি লেগেছিল, এই পাঁচ মাস যাবৎ আবেগশূন্য বাস্তবভূমির ওপর বিচরণের

ফলে তার রেশ প্রায় মিলিয়েই গেছে। তার চোখে মহাত্মার হত্যা সেই আবেগ-শূন্যতার শেষ নজির। এই নজির দেখে সেদিন সে স্তব্ধ বোবা হয়ে বসেছিল। সকলেরই তাই হবার কথা। কিন্তু তারপর থেকে দেখছে শোকের আনুষ্ঠানিক দিকটাও কম ব্যাপার নয়। যত বড় শোক, ততো বড় অনুষ্ঠান। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রেডিওয় শোকের গান আর শোকের বক্তৃতা, পথে ঘাটে শোকের মিছিল আর শোকের মিটিং। বাপী তরফদারের এক-একসময় মনে হয়েছে দেশটা সত্যি শোকে ডুবে গেল নাকি শোকের উচ্ছ্বাসে। বাইশ বছর বয়সের মধ্যে সে নিজে তো কখনো সরবে শোক করেনি।

...যে মহারানীর ঘুম ভাঙলে বাপী তরফদারের শরীর খানিক চাঙা হতে পারে আর মাথার ভার একটু কমতে পারে, তাঁর সকাল হতে কম করে এখনো ঘণ্টা দুই দেরি। রতন বণিকের বউ কমলা বণিক। আজ দেড় মাস হয়ে গেল ওরাই তার আশ্রয়দাতা এবং আশ্রয়দাত্রী। রতন বণিকের কড়া হাতের ধাক্কা না খেলে রেডিও বাজুক বা কলতলা সরগরম হোক বেলা আটটার আগে সেই দেমাকীর ঘুম ভাঙতে চায় না। ঠেলা মেরে ঘুম ভাঙানোর পরে রতনকে আবার মিষ্টি সোহাগের সুরে দু'চার কথা বলতে হয়। তা না হলে সাত-সকালে বউয়ের বচনের তোড়ে অনেক সময় তাকে ছিটকে এই খুপরি ঘরে চলে আসতে হয়। সপ্তাহে একদিন করে নাইট ডিউটি পড়ে রতন বণিকের। ফেরে পরদিন সকাল দশটায়। সেদিন বেলা আটটা সাড়ে-আটটার আগে কেউ আর বাপী তরফদারের এই খুপরি ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢোকে না।

গত রাতে রতনের নাইট ডিউটি ছিল না অবশ্য। তাই সোয়া সাতটা থেকে সাড়ে-সাতটার মধ্যে চায়ের আশা আছে। খুপরি ঘরের দরজা আছে কিন্তু হুড়কো নেই। অন্য দিনের মতোই কমলা দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেছিল। কম্বলের তলা থেকে বাপী তরফদার সেটা টের পেয়েছে। কারণ, ভেজানো দরজা দুটো শব্দ করেই খোলা হয় আর এই কমলার চলনও লঘু নয়। ঘরে ঢুকে রোজ সে আপাদমস্তক কম্বলে মোড়া একই দৃশ্য দেখে, আর বাপী তরফদারও একই সম্ভাষণ শোনে।

—কই গো, বড়বাবুর ঘুম ভেঙেছে—নাকি ফিরে যাব?

এক ডাকে সাড়া না দিলে সত্যি ফিরে যাবে। দ্বিতীয়বার আর ডাকবে না। সাড়া না পেয়ে এরকম ফিরে গেছে দুই-একদিন। কমলার নিজের ঘুমের ওপর মমতা আছে বলেই বেশি হাঁকডাক করে কারো পাকা ঘুম ভাঙাতে চায় না। ডাক শোনা মাত্র বাপীকে কম্বল ফেলে তড়াক করে দড়ির খাটিয়ার শয্যায় উঠে বসতে হয়।

সকালের এই একটা সময় রতন বণিকের বউটাকে ভালোই লাগে। ঘুমের দাগ লাগা ফোলা-ফোলা মুখ। কালো চোখের তারায় ঘুম-ছোঁয়া ঢুলু ঢুলু ভাব একটু। তার এক হাতে শাড়ির আঁচলে জড়ানো গরম চায়ের গেলাস, অন্য হাতে সস্তা দামের খানচারেক বিস্কুট, নয়তো হাতে-গড়া দু'খানা রুটি আর গুড়। বিস্কুট বা রুটি পছন্দ নয়, ওই চায়ের গেলাসটাই লোভনীয়। কিন্তু কমলার শাসনে পড়ে বিস্কুট বা রুটি-গুড়ও নিতে হয়। না নিলে কমলা ধমকে উঠবে, খালি পেটে চা গিললে কারো 'নিভার' আস্ত থাকে!

'আট-কেলাস' পড়া রতন বণিকের 'ছ-কেলাস' পড়া বউয়ের ভুলটা বাপী তরফদার একদিন শোধরাতে চেষ্টা করেছিল।—কথাটা নিভার নয়, লিভার।

পলকা ঝাঁঝের মুখঝামটা দিয়ে উঠেছিল কমলা বণিক।—থাক, নিজের বিদ্যে নিজের মাথায় ঠেসে রাখো, আমাকে আর বিদ্যে দান করতে হবে না।

এরপর আর ভুল সংশোধনের চেষ্টা করেনি। কিন্তু রোজ সকালে ওই শামলা মুখের ধমক একটু খেতেই হয়। কারণ, কম্বল ফেলে ধড়মড় করে উঠে বসেই চায়ের গেলাসের জন্য হাত বাড়ায় সে। ফল কি হবে জেনেও। শাড়ির আঁচল তেমনি গেলাসে ধরে রেখেই কমলা চোখ পাকাবে।—মুখ ধোয়া হয়েছে?

এটুকু ভালো লাগে বলেই বাপী তরফদার মিথ্যে বলে না। বিব্রত মুখে মাথা নেড়ে জানান দেয়, ধোয়া হয়নি।

ঘেন্নাও করে না বাসি মুখে কিছু গিলতে—যাও মুখ হাত ধুয়ে এসো!

এই নিয়মিত অধ্যায় চটপট সারা হলে তবে চায়ের গেলাস আর বিস্কুট বা রুটি তার হাতে আসে।

আজও এর খুব ব্যতিক্রম হল না। তবে একটু হল চায়ের গেলাস আর বিস্কুট হাতে নিয়ে বসার পর। গজেন্দ্রগমনে কমলা বণিক দরজার কাছাকাছি এগিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল। এটুকু অপ্রত্যাশিত। চা দিয়ে চলে যাবার সময় বিপুল তরফদারের দু' চোখ নিজের অগোচরে দরজা পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করেই। আজ হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ানোর ফলে চাউনিটা তার মুখের ওপর হোঁচট খেল। আর এটুকুও কমলার চোখে ধরা পড়ল। হাসির ঝিলিক ঢাকা দেবার জন্যেই সে ছোট করে হাই তুলল একটা।—বুড়ো বলছিল বিপুলবাবু দুই-একদিনের মধ্যেই চলে যাবে।...ঠিক? আ হা, ষাট ষাট, জিভে গরম চায়ের ছেঁকা লাগল বুঝি?

চায়ের গেলাস কোলের কাছে নামিয়ে বাপী তরফদার গম্ভীর মুখে জবাব দিল, দেড় মাস হয়ে গেল আর কত অসুবিধে করব তোমাদের...

কমলাও গম্ভীর মুখেই সায় দিল, আমাদেরই বা সকালে এক গেলাস চা আর দু'খানা বিস্কুট দিয়ে কতকাল কেষ্ট ঠাকুরকে ধরে রাখার ক্ষ্যামোতা বলো।...তা এবার কোন্ মহলে ঘর ঠিক হল?

—কোথাও না। দেশেই চলে যাব ভাবছি। এখানে আর কিছু হবে-টবে না—

কমলার কালো চোখের তারায় চাপা হাসির ঢেউ খেলে গেল একটু। বলল, কোথায় যে তোমার হবে ভগবানই জানে। বুড়ো অবিশ্যি বলে, হবে যখন দেখে নিস, বিপুলবাবুর ভাগ্যিখানা কালবোশেখীর ঝড়ের মতোই সবদিক তোলপাড় করে নেমে আসবে একদিন--তা দেখো, যেখানে গেলে হবে সেখানেই যাবে, তার আর কথা কি।

হেলেদুলে চলে গেল।

...আর এই সকালেই ইদানীংকালের সেই অস্বাচ্ছন্দ্য বোধটা তার মধ্যে ছড়িয়ে রেখে গেল। বাপী তরফদারের ওই কমলার ওপরেই রাগ হতে থাকল। ভদ্রলোকের সংস্রব এড়িয়ে রাতের এই মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু তার নিশ্চিন্ত আশ্রয় হয়ে উঠতে পারত। রতনের সঙ্গে কথা বলে সামান্য কিছু ভাড়াও ঠিক করে নেওয়া যেত। কিন্তু এখান থেকে যাওয়ার কথা ইদানীং রতনকে বলতে হচ্ছে নিজের ভিতরের অস্বস্তি দিনে দিনে বাড়ছে বলে। যাবার কথা রতনকে কাল রাতেও বলেছে।

অস্বস্তি শুরু হয়েছিল এখানে আসার দিনকতকের মধ্যেই। বয়স্ক রতন বণিকের

ওই তরতাজা বউটা ঠারেঠোরে তাকাতে জানে। চোখের কোণে আর ঠোঁটের ফাঁকে হাসির ঝিলিক ফোটাতে জানে। প্রথম ক'টা দিনই শুধু ধারেকাছে ঘেঁষেনি, আড়াল থেকে লক্ষ্য করেছে। সমস্ত দিন ঘোরাঘুরি করে বাপী তরফদার তখন বিকেলের দিকে ঘরে ফিরত। ঘন্টা দুই-তিন দড়ির খাটিয়ায় চিৎপাত শুয়ে থেকে আবার বেরুতো। বাইরে রাতের খাওয়া সেরে ঘরে ফিরত।

একদিন সন্ধ্যার ঠিক পরে ব্যস্তসমস্ত মুখে ঘরে ঢুকে রতন বণিক বলেছিল, আজ নাকি সমস্ত দিন খাওয়াই হয়নি আপনার?

বাপী তরফদার সচকিত।—কে বলল?

—বউ বলছিল, আজ সমস্ত দিন উপোস গেছে কেষ্ট ঠাকুরের—

বলে ফেলেই লজ্জা পেয়ে জিভ কামড়েছে সে। তারপর সে বলেছে, কিছু মনে করবেন না বাবু, বউটার লঘু-গুরু জ্ঞান নেই—ওই রকমই কথা। বলে, কেষ্ট ঠাকুরপানা মুখখানা—। আজ ঘরে ফিরতেই বলল, কেষ্ট ঠাকুর সমস্ত দিন উপোস দিয়েছে। এরই মধ্যে ভাত তরকারি রেঁধে ফেলেছে, সকালের একটু মাছও আছে—আপনাকে এক্ষুনি ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঠেলে পাঠালো আমাকে। চলুন—

বাপী তরফদার বাধা দিয়েছিল, না না, তোমাদের ব্যস্ত হতে হবে না, আমি একটু বাদেই বাইরে থেকে খেয়ে আসছি—

মাথা নেড়ে রতন বণিক বলেছিল, আজ আর সেটি হচ্ছে না বিপুলবাবু, রাঁধা ভাত-তরকারি সব তাহলে ড্রেনে ঢেলে দেবে, আমাকেও খেতে দেবে না। চলুন শিগগীর—

অগত্যা উঠে আসতে হয়েছে। সকালের চা-রুটির পর সেদিন সত্যিই চার পয়সার মুড়ি আর চার পয়সার চিনেবাদাম ছাড়া আর কিছু পেটে পড়েনি। সেটা যে নিছক অভাবের দরুন তা নয়। তিন মাসের চাকরির কিছু পুঁজি হাতে আছে এখনো। অবশ্য হিসেবের বাইরে একটিও বাড়তি পয়সা খরচ করে না সে। কিন্তু একেবারে না খাওয়াটা পয়সা বাঁচানোর তাগিদে নয়। মেজাজ না থাকলে এক-আধ বেলা ওরকম উপোস দিতে অভ্যস্ত।

খেতে খেতে একটু সহজ হবার জন্যেই রতন বণিকের বউয়ের দিকে একবার মুখ তুলে তাকিয়েছিল। আর তার পরেই কি-রকম ধাক্কা খেয়েছিল একটু। এ-ক'দিনে দুই-একবার আভাসে দেখলেও মুখখানা চোখে পড়েনি। আধবয়সী রতন বণিকের ঘরে এরকম বউ থাকা সম্ভব সে ভাবেনি। গায়ের রং তারই মতো কালো ঘেঁষা, কিন্তু অল্প বয়েস, সুঠাম স্বাস্থ্য। কালো চোখে সরমের বালাই নেই। উল্টে সে নিজেই রমণীটির চোখে একটি দর্শনীয় বস্তু।

চোখাচোখি হতে বাপী তরফদার হেসেই বলেছিল, সমস্ত দিন সত্যিই আজ ভালো করে খাওয়ার ফুরসত হয়নি, কিন্তু তুমি বুঝলে কি করে?

তক্ষুনি জবাব এলো, মাটির কেষ্ট হলে বোঝা যেতনি। ওই বুড়োর চোখ থাকলে সে-ও বুঝত।

বউয়ের কথা শুনে রতন বণিক হেসে উঠেছিল, তোর মতো চোখ আর কার আছে বল্। পরে বলেছিল, তোর স্বভাব জানি, বিপুলবাবুর সামনে কক্ষনো ঠাট্টা-ঠিসারা করে বসিস্‌নি যেন—আমাদের কত ভাগ্যির জোরে উনি এখানে এয়েছেন—একদিন ওঁর দিন

কেমন করে দেখে নিস—

নিরীহ বিস্ময়ে কমলা বলেছিল, দিন ফিরলে আমি দেখে নেব কি করে গো।

তুষ্ট মুখে হার মেনে রতন বলেছিল, সবেতে কেবল ফষ্টি-নষ্টি কথা তোর—দিন ফিরলেই বিপুলবাবু কি আমাদের ভুলে যাবেন।

সেই দিন থেকে ভিতরে ভিতরে কেমন অস্বস্তি বোধ করেছিল বিপুল তরফদার। দীর্ঘকাল জঙ্গলে বাসের ফলে বুনো জন্তু-জানোয়ার ছেড়ে মানুষেরও প্রবৃত্তির দিকটা অনেকখানি চেনা তার। সেই সঙ্গে নিজের খোলস-ঢাকা চরিত্রও ভালোই জানা। মনের তলায় সেই রাতেই একটা বিপদের আভাস উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে।

পরদিন থেকেই সকালে চা-বিস্কুট বা চা-রুটি-গুড় নিয়ে রতন বণিকের বদলে কমলা নিজেই দরজা ঠেলে অনায়াসে ঘরে ঢুকেছে। আর তখন অতিথির অস্বস্তিটুকুও তার কাছে উপভোগ্য কৌতুকের মতো। তারপরে আবারও এক-আধদিন দুপুরের খাওয়া বাদ পড়লে এই বউটার চোখে ধরা পড়বেই। আর তখন জুলুম করে ধরে নিয়ে গিয়ে খেতে বসাবে তাকে। ঠিসারার সুরে রতনকে বলবে, অসময়ে তোমার ভাগ্যিমন্ত অতিথির একটু সেবা-যত্ন করে রাখলে আখেরে কাজ দেবে—কি বলো?

রতন বণিকেরও তুষ্ট মুখ—এখন ঠাট্টা করছিস কর, পরে দেখে নিস।

বাপী তরফদার এরপর বিকেলে ঘরে ফেরাই ছেড়ে দিল। একেবারে রাতের খাওয়া সেরে ঘরে ঢুকত।

কমলা সেই সময় থেকে তাকে বড়বাবু বলে ডাকতে শুরু করেছে। শুনে কান করকর করেছে বাপী তরফদারের। কিন্তু এ নিয়ে তাকে কিছু বলেনি। বলতে গেলেই কমলা দুটো রসের কথা বলে বসবে। সেটা নিজেকে প্রশ্রয় দেওয়ার সামিল হবে বাপী তরফদারের। সব থেকে বেশি ভয় নিজেকে। বনে-জঙ্গলে বাসের কালে বিষাক্ত সাপের আচমকা ছোবলে এক-একটা বড় বড় জীবকে ধরাশায়ী হতে দেখেছে। সেই ছেলেবেলা থেকে ওই রকম একটা হিংস্র প্রবৃত্তি তার মধ্যেও লুকনো আছে। এই কারণেই নিজেকে সব থেকে বেশি ভয়।

...দেড় মাস আগে প্রবৃত্তির এই দিকটা আচমকা অনাবৃত হয়ে গেছল। গৌরী বউদি দেখেছিল। চিনেছিল। গৌরী বউদি কম করে ছ' বছরের বড় তার থেকে। কিন্তু জানোয়ার বয়েস দেখে না। গৌরী বউদিও চোখের সামনে সেদিন তাজা জ্যান্ত পুরুষ দেখেছিল একটা। তার চোখের আগুনে পতঙ্গ পোড়ে না। পতঙ্গ করুণার পাত্র। মণিদা করুণার পাত্র। গৌরী বউদির চোখের আগুনে ব্যভিচারের প্রশ্রয়।

...কিন্তু জানোয়ারটা ততক্ষণে খোলসে সেঁধিয়েছিল আবার। গৌরী বউদি তাকে ক্ষমা করেনি। তাকে আশ্রয়-ছাড়া করেছে।

...এই কমলার মতোই গায়ের মাজা রং গৌরী বউদির। সুপটু প্রসাধনে আর একটু উজ্জ্বল হয়তো। মাথায়ও কমলার থেকে কিছু লম্বা। কিন্তু গৌরী বউদির মতো নয় কমলা। তার মতো তীক্ষ্ণ নয়। নির্লিপ্ত নয়। অকরুণ নয়। মায়া-মমতা আছে। বুড়ো স্বামীর যত্ন-আত্তি করে। মেজাজ ভালো থাকলে সহজ কৌতুকে আর উচ্ছ্বাসে টইটম্বুর। সে ঠারেঠোরে তাকাতে জানলেও তাকে দেখে গৌরী বউদির মুখ মনে পড়ত না বাপী তরফদারের।

কিন্তু ইদানীং মনে পড়ে। পড়ছে। হঠাৎ-হঠাৎ মনে হয়, সে-রকম পরিস্থিতি-বিপর্যয়ে এই কমলাও গৌরী বউদির মতো হয়ে উঠতে পারে। মণিদার মতো রতন বণিকও হয়তো তখন নিরীহ মুখে ওকে এখান থেকে চলে যেতে বলবে। সেই ভয়েই মাঝে মাঝে এই আশ্রয় ছেড়ে পালানোর কথা ভাবছে সে। যাবার কথা রতন বণিককে বলেছেও।

কমলা নিজের স্বামীকেই বলে বুড়ো। রতনের সামনেই বলে। কিন্তু রতন তাতে রাগ করে না। এই বউয়ের পাশে একগাল কাঁচা-পাকা দাড়ির জন্য একটু বেখাপ্পাই দেখায় তাকে। দ্বিতীয় পক্ষের এই বউকে খুশি করার জন্যও রতন বণিক কেন দাড়ির মায়া ছাড়তে পারে না বাপী তরফদার সেটা ভালোই অনুমান করতে পারে।

ব্রুকলিনের বাবু এমন কি বড়বাবুদের কাছেও কোনো কারণে রতনের একটু বিশেষ সমাদর আছে। এই দাড়ির বোঝা সাফ করে ফেললে সেই বিশেষ কদরে ঘাটতি পড়ার আশংকা। কিন্তু দাড়ির কারণে এই স্বামী-সম্ভাষণ কি অন্য কোনো চাপা ক্ষোভের ফলে, সেটা একমাত্র কমলাই জানে। রতনের বয়েস এখন উনচল্লিশ আর কমলা খুব বেশি হলে কুড়ি ছাড়িয়েছে। কমলা বাপীর থেকে দেড়-দু' বছরের ছোট হতে পারে।

সন্ধ্যার পর মাত্রা রেখে একটু-আধটু নেশা করার অভ্যাস আছে রতন বণিকের। এই খুপরিটা তার নেশার ঘর। বোতল থেকে সাদা জলের মতো খানিকটা দিশি মাল খায় আর সেই সঙ্গে নুন মেশানো কিছু আদার কুচি। আগে হয়তো ওই পর্বের পর এই দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে খোয়াব দেখত। এখন মেঝেতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে অল্প অল্প দোলে। কেউ সামনে থাকলে মন খুলে গল্প করে তার সঙ্গে। সামনে গোড়ার দিকে বাপী তরফদারই থাকত। রতনের সংকোচ সে-ই কাটিয়ে দিয়েছে। বলেছে, আমি তোমার আশ্রিত, কিন্তু তোমার কোনরকম অসুবিধে হচ্ছে দেখলে আমি সরে পড়ব।

রতনের অসুবিধের ব্যাপারটা প্রথম সন্ধ্যাতেই টের পেয়ে গেছল। অন্য কারো ঘরে গিয়ে নেশা সেরে এসে রতন এই খুপরিতে এসে বসেছিল। মেঝেতে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে তাকে একটু একটু দুলতে দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। তারপর ওর জিভ আলগা হতে সমস্যা বুঝেছে। বউটার বিবেচনার অভাবের কথাই বলছিল রতন। মাতাল তো আর হয় না, সমস্ত দিন খাটা-খাটনির পর সামান্য মৌজের লোভে যা একটু খায়। শরীর মন ভালো থাকে, রাতে ভালো ঘুম হয়। এই খুপরি ঘরে অতিথি আছেন জেনেও বোতল সুদ্ধু বউ তাকে নিজের ঘর থেকে বার করে ছাড়ল। বোতল হাতে দেখলে রতনকে সাদরে ডেকে নেবার মতো ঘর এখানে আরো দু'-পাঁচটা আছে। কিন্তু যে ডেকে নেবে তাকে ভাগ তো দিতেই হয়। সেদিনই খামোখা একটা ছোট বোতল একেবারে ফাঁক হয়ে গেল। রোজ রোজ লোককে এ-রকম ভাগ দিতে হলে সে যে ফতুর হয়ে যাবে বউয়ের এই সামান্য বিবেচনাও নেই।

বাপী তরফদার তারপর ওই কথা বলে তাকে নিশ্চিন্ত করেছিল। ঢুলু ঢুলু দু' চোখ টান করে রতন বলেছিল, বিপুলবাবুর মতো এমন দরাজ মনের মানুষ সমস্ত ব্রুকলিনেও আর দুটি নেই, অথচ বরাত এমন যে তারই চাকরিটা সকলের আগে খোয়া গেল। কিন্তু সে নিশ্চিন্ত, বিপুলবাবু ঢের ঢের বড় হবেন বলেই এই ধাক্কাটা খেতে হল।

ওর বড় হওয়ার ভবিতব্যের কথা শুনে কমলা তাকে ঠাট্টা করে বড়বাবু বলা শুরু করেছে।

অতিথির কাছ থেকে রতন বণিক ঘর ভাড়া নেবেই না যখন, অন্যভাবে বাপী তরফদারকে তার দরাজ মনের পরিচয় দিতে হয়েছে। বার দুই নিজে ছোট বোতল কিনে ওর হাতে গুঁজে দিয়েছে। রতন বণিক খুশিতে আটখানা। এ-সময় একটু-আধটু চেখে দেখলে বাবুরও মন ভালো হত এ-কথা অনেকবার বলেছে। কিন্তু জঙ্গলের মানুষদের এ জিনিস হামেশাই খেতে দেখেছে বাপী। অনেক বেলেল্লাপনাও দেখেছে। ফলে এই লোভ সে বাতিল করেছে। রতনের কথায়ও বিন্দুমাত্র আগ্রহ হয়নি। উল্টে বউয়ের ওকে ঘরে বসে এ জিনিস খেতে না দেওয়ার তেজটুকু ভালো লেগেছে।

এ-সময় ওই দ্বিতীয় পক্ষটির গল্প রতন বণিকের মুখেই শুনেছিল সে।...কমলা রতনের নিজের শালী। প্রথম পক্ষ দুর্গার থেকে ঢের ছোট অবশ্য। শ্বশুর-শাশুড়ীর বুড়ো বয়সের মেয়ে।...দুর্গার সর্বাঙ্গ মায়ের দয়ায় ছেয়ে গেছল। সেটা জানাজানি হতে সরকারী গাড়ি এসে তাকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে রেখে এসেছিল। আর ঘরের মুখ দেখতে পায়নি, সেখানেই সব শেষ। পাঁচ বছর আগের কথা। দুর্গাকে হারিয়ে রতন চোখে-মুখে অন্ধকার দেখেছিল। কমলার তখন বছর পনের কি ষোল বয়েস। মফঃস্বলে বিধবা মায়ের কাছে থাকে। শাশুড়ী তাকে চিঠি লিখত, একটা তো গেছেই, যেটা আছে তার ভয়ে বুকের ভিতরটা সর্বদা হিম হয়ে থাকে। মেয়েটা দিনকে দিন দজ্জাল হয়ে উঠছে।

রতনের তখন শোকের সময়। অতশত কান দেয়নি। বছর ঘুরতে শাশুড়ীর জোর তাগিদ এলো, জামাইয়ের শীগগির একবার আসা দরকার—এখানকার ঘর বাড়ি বেচে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার ইচ্ছে তার। ততদিনে রতন বণিকের শোক হালকা হয়েছে। কিন্তু বোতলের অভ্যাসটাও তখন থেকেই।

ছুটি নিয়ে শাশুড়ীর কাছে গিয়ে তার সমস্যা স্পষ্ট করে বুঝল। সমস্যা ছোট মেয়ে। কমলার তখন বছর সতেরো বয়েস। বাড়ন্ত গড়ন। তাকে দেখে চোখে পলক পড়ে না রতনের। অনেক ছোট শালী, কাছে ডেকে আগের মতোই গায়ে পিঠে হাত বোলাবার লোভ ছাড়তে পারেনি। কিন্তু সতের বছরের ওই কমলা পাকা ঝানু মেয়ে তখন। তার হাত একটু বেসামাল হতেই ফোঁস করে উঠেছে। আর তাই দেখে ভিতরে ভিতরে রতন বণিকও পাগল হয়েছে। কিন্তু কাউকে বুঝতে দেয়নি।

গম্ভীর মুখে সামনে বসে শাশুড়ীর নালিশ শুনেছে সে। সমস্যা আর দুর্ভাবনার কথা শুনেছে। এই মেয়েকে আর সামলাতে পারছে না শাশুড়ী। তার ফষ্টি-নষ্টি বেড়েই চলেছে। আগে আশপাশের সমান পর্যায়ের ছেলে-ছোকরাগুলো উৎপাত করত। ওই পাজী মেয়েও তাদের আসকারা দিত। যার সঙ্গে খুশি বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতো। কোথাও যাত্রা হচ্ছে শুনলে মায়ের শাপমন্যিতে ভ্রূক্ষেপ না করে চলে যেত। এখন ভদ্দরঘরের ছেলেদের উৎপাত শুরু হয়েছে। দিনেদুপুরে জানলা দিয়ে ঢেলার মতো চিঠির মোড়ক ঘরে এসে পড়ে। শাশুড়ী লেখাপড়া জানে না, আর কমলাও চোখ-কান বুজে মায়ের কাছে মিথ্যে কথা বলে। কিন্তু ফাঁক পেলেই চুপিচুপি বেরিয়ে যায়। একা শহরে গিয়ে সিনেমা দেখে আসে। ওই সব পাজী ছেলেগুলোই নিশ্চয় পয়সা যোগায়। চৌদ্দ-পনের বছর বয়েস পর্যন্ত বাখারিপেটা করে মেয়েকে মাটিতে শুইয়ে ফেলা গেছে, কিন্তু এখন মেয়েটা মায়ের সমস্ত শাসনের বাইরে।

...হ্যাঁ, বুদ্ধির চালে সেই একবার শাশুড়ী আর তার মেয়ে দুজনকেই ঘায়েল করতে পেরেছিল রতন বণিক। ভেবে-চিন্তে শাশুড়ীকে বলেছে, কমলাকে এখান থেকে সরানো দরকার। কলকাতা দেখাবার নাম করে শাশুড়ী আর শালী দুজনকেই তার ওখানে নিয়ে যাবে সে। আর তারপর কমলার মতো মেয়ের ভালো বিয়ে হতে কতক্ষণ? কমলার যে ভালো বিয়ে হবে নিঃসংশয়ে সেই ভবিষ্যৎবাণীও করেছে। জামাইয়ের এই ঘোষণার ওপর শাশুড়ীর ভারী আস্থা। তার ওপর শুনেছে খরচাপত্রের জন্যেও ভাবনা নেই—যা করার জামাই-ই করবে। কলকাতার এই চাকুরে জামাই শাশুড়ীর মস্ত গর্ব।

কমলাও সানন্দে এসেছে। কলকাতা দেখার লোভ, তার ওপর দিনে একটা করে সিনেমা দেখার লোভ। এত লোভের টোপ না গিলে থাকতে পারবে এমন মেয়ে কমলা নয়। সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে বিয়ের আগের দিন মতলবটা শাশুড়ীকে জানিয়েছে রতন বণিক। প্রথম শোনার পর শাশুড়ী ঘণ্টা-কতক গুম হয়ে ছিল অবশ্য। কিন্তু আবার দেশে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে মেয়ের হাল কি হতে পারে সেই ভবিষ্যৎবাণী শোনার পর শাশুড়ী আর আপত্তি করেনি। উল্টে ভেবেছে এ বরং ভালোই হল, মেয়েটা তোয়াজে থাকবে।

কমলা জেনেছে একেবারে বিয়ের দিন সকালে। কিন্তু সেদিন আর রতন বণিক এই টালি এলাকা থেকে তার পালাবার মতো কোনো ফাঁক রাখেনি। শেষে মুখ বুজেই বিয়েটা করতে হয়েছে তাকে। তবে ওই দজ্জাল বউকে বাগে আনতে বেশ সময় লেগেছিল রতন বণিকের। কখন কোন্ ফাঁক দিয়ে পালায় সেই ভয়ে আস্ত একটা মাস আপিসে ছুটি নিতে হয়েছিল। আর রোজ একটা করে সিনেমা দেখাতে হয়েছিল।

কথায় কথায় একদিন বউয়ের আর একটা খেদের কথা জেনেছিল রতন বণিক। এখানে কারো ঘরে কোনো শুভ কাজ হলে বউ নাকি অপমান বোধ করে। কুড়ি পার হতেও ছেলেপুলে হল না বলে এখানকার এয়োরা কোনো শুভ কাজে প্রথমে তার মুখ দেখতে চায় না। রতন বণিক অবশ্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছে কমলা ছেলের মা হবে, ব্যস্ত হবার কি আছে, সবে তো কুড়ি গড়ালো বয়েস। কিন্তু বউ তক্ষুনি গলা উঁচিয়ে তর্ক করবে, তাহলে দিদির কেন তিরিশ বছরেও ছেলেপুলে হল না! এ-সব কথা শুনলে রতন বিরক্ত হয়।—দিদির বরাতে ছিল না তাই হয়নি—তা নিয়ে তোর এত বড় ভাবনা কেন, তোর হলেই তো হল!

কপালের ব্যাপারে এত লোকের এত বিশ্বাস রতন বণিকের ওপর, এতটুকু বিশ্বাস নেই শুধু ঘরের বউয়ের। আর বিশ্বাস না থাকলে কারো কোনোদিন কিছু হয়!

...আপিসের সহকর্মীদের কাছে তো বটেই, বাবুদের আর বড় দরের বাবুদের কাছেও পিওন রতন বণিকের ওই কপাল গোনার গুণেই বাড়তি খাতির। মাস দুই আগে পর্যন্ত বাপী তরফদার নিজেও ওই ব্রুকলিনেরই সাধারণ কেরানীবাবুদের একজন ছিল। রতন বণিক সেই বিভাগেরই পিওন। কিন্তু পিওনের কাজ খুব একটা করতে হয় না তাকে। কারণ, দশটা-পাঁচটা অফিসের মধ্যে নিজের বা অন্য বিভাগের কোনো না কোনো বাবু ডিউটির অর্ধেক সময় তাকে ডেকে নিয়ে পাশে টুল পেতে বসিয়ে ভবিষ্যতের জট ছাড়াতে চায়।

নিজস্ব পদ্ধতিতে ভবিষ্যৎ গণনার সুনাম দিনে দিনে বাড়ছিল রতনের। হাত দেখা বা ঠিকুজি দেখার সঙ্গে এই গণনার কোনো সম্পর্ক নেই। তার কোন্ এক গুরুর আশীর্বাদে

এক ভিন্ন পদ্ধতিতে সে ভবিষ্যৎ-বক্তা আর ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা হয়ে বসেছে। একমাথা চুল, একমুখ কাঁচাপাকা দাড়ি, আর চওড়া কপালে তেমনি মোটা করে মেটে সিঁদুর ঘষা। অনেকেরই বিশ্বাস লোকটার তন্ত্রমন্ত্র জানা আছে কিছু। ছোট বড় বাবুদের কাছ থেকে দু'দশ টাকা রোজগার হয় রতন বণিকের।

সে তার খদ্দেরের মাথার শেপ দেখে, ভুরু কান নাক চোখ দেখে, ঠোঁটের বক্রাভাস দেখে—আর সব থেকে বেশি মুখ আর কপালের রং। শুধু তার চোখেই যে কোনো লোকের সুসময়ে অথবা দুঃসময়ে কপাল আর মুখের রং-বদল ধরা পড়ে। খুব নিবিষ্ট মনে এইসব দেখে নিয়ে চোখ বুজে সে ভবিষ্যৎ বলা শুরু করে। যা বলে তার কিছু সত্য হতে পারে, বেশির ভাগই হয়তো সত্য হয় না। বাপী তরফদারের তাই ধারণা। একশটা ঢিল ছুঁড়লে দু'দশটা লেগে যায়ই। কিন্তু মানুষের মন এমনি দুর্বল, যেটা লাগল সেটারই দাগ থেকে গেল। অনেককে বলতে শুনেছে, ব্যাটা ভাঁওতাবাজ, কিস্‌সু জানে না। কিন্তু বিপাকে পড়লে অথবা কোনো আশার সম্ভাবনা দেখলে তাদেরও ওকে খাতির করে কাছে ডেকে বসাতে দেখেছে।

শাশুড়ীর কাছে চিঠি লিখতে হলে বা টাকা পাঠাতে হলে নতুন বাবু অর্থাৎ বাপী তরফদার তার সেই চিঠি অথবা মানিঅর্ডার ফর্ম লিখে দিত। আর রোজ ওকে দিয়ে চা আনানোর সময় ওকেও চা খাওয়ার পয়সা দিত। সেই কারণে হোক বা সমস্ত বিভাগের মধ্যে এমন কি আপিসের মধ্যেও একমাত্র বিপুল তরফদারই ভাগ্য যাচাইয়ের ব্যাপারে কখনো শরণাপন্ন হয়নি বলে হোক—রতন বণিকের তার ওপর একটু বেশি টান ছিল। তার আগ্রহ না থাকলেও নিঃসংশয়ে সে তার সম্পর্কে এমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যা শুনে সহকর্মীদের চোখ ট্যারা আর বাপী তরফদারের মেজাজ গরম। তার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সে গোটা ব্রুকলিন ডিপোর মালিক হয়ে বসলেও অবাক হবার কিছু নেই।

...ভবিতব্যের কথা শুনে অপরের হাসি দেখে সাধারণ কেরানীবাবু বিপুলনারায়ণ তরফদারের মেজাজ গরম হবার আরো কারণ আছে। খুব ছেলেবেলা থেকে সে আকাশ-ছোঁয়া রকমের বড় হওয়ার স্বপ্নই দেখে এসেছে। সেই স্বপ্ন এত প্রত্যক্ষ যে এর প্রতিকূল কোনো বাস্তব সম্ভাবনার সঙ্গে এতটুকু আপোস নেই। মনের তলায় এক বিশাল সাম্রাজ্যই গড়ে বসে আছে। বড় হওয়ার এই তাড়নাটা বাসা বেঁধে আছে অনেক দিনের এক অসহ্য তাচ্ছিল্যের আঘাত থেকে। আর, নিজের সেদিনের ছোট শরীরটার তাজা রক্তের নোনতা স্বাদ থেকে।

...মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে দুঃসহ অপমানের বিকৃত প্রতিশোধের প্ররোচনায় কোনরকম জ্ঞানবুদ্ধি বিবেচনার অবকাশ ছিল না। তারপর শাসনের চাবুকে অপরিণত বয়সের সেই দেহ ঝাঁঝরা হয়েছে। দুই কশ-ঝরা নিজের সেই তাজা রক্তের স্বাদ বাপী তরফদার এ জীবনে ভুলবে না।

সেই থেকেই বড় হওয়ার একটা অফুরন্ত তাগিদ ধমনীর রক্তে টগবগ করে ফুটত সর্বদা। এখনো ফোটে। কত বড় হলে মন ভরে সে-সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই। কোনো গণ্ডী বা কোনো সীমানার মধ্যে কুলোয় না সেটা।

বাপী তরফদারের সমূহ সমস্যা রতন বণিকের বউ কমলাকে নিয়ে। তার হাবভাব

রকম-সকম দ্রুত বদলাচ্ছে। ওকে দেখলেই মনের তলায় অঘটনের ছায়া পড়ে। বাপী তরফদার সরোষে ওটা ছিঁড়েখুঁড়ে মন থেকে সরায়।

মাত্র দিন পাঁচ-ছয় আগের কথা। বিকেলের আগেই রেডিও মারফৎ খবরটা আগুনের গোলার মতো ছড়িয়ে পড়তে স্তব্ধ বাপী তরফদার আর বাইরে টহল না দিয়ে এই খুপরি ঘরে এসে বসেছিল। ও-পাশ থেকে কমলা দেখতে পেয়ে ছুটে এসেছে। একপিঠ খোলা চুল, ঢিলে-ঢালা বেশ-বাস, উত্তেজনায় দু'চোখ কপালে।—তুমিও খবর শুনেছ তাহলে? তোমাদের ভদ্দরলোকদের হল কি গো বড়বাবু, দেশসুদ্ধু মানুষ জানে উনি মানুষ নন্—দেব্তা—তাঁকেই গুলি করে মেরে দিলে?

এর কি জবাব দেবে বাপী তরফদার। তার নিজের মাথার মধ্যেই সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল।

আগ্রহে আর উত্তেজনায় কমলা খাটিয়ার সামনেই মেঝের ওপর বসে পড়েছিল। তার শোনার ইচ্ছে, জানার ইচ্ছে, বোঝার ইচ্ছে। এ-রকমও কেন হয়, দেবতার আবার শত্রু থাকে কি করে?

বাপী তরফদার টুকটাক দুই-এক কথায় জবাব দিচ্ছিল। জানতে বুঝতে এসে কমলা নিজেই বেশি কথা বলছিল। গেল বছর বেলেঘাটায় গিয়ে কমলা নিজের চোখে গান্ধীজীকে দেখে এসেছিল। এখানকার আরো অনেকে গেছিল। নিজের কানে তাঁর কথা শুনেছে, নিজের চোখে তাঁর হাসি দেখেছে—জন্ম সার্থক। আর আজ কিনা এই!

বলতে বলতে কমলা থমকে মুখের দিকে তাকিয়েছে। নিজের অগোচরে বাপী তরফদারের দু'চোখ তার মুখে বুকে ওঠা-নামা করেছে হয়তো দুই একবার! কিন্তু আসলে সে নিজের প্রতি বা কারো প্রতি সচেতন ছিল না একটুও।

গা-ঝাড়া দিয়ে কমলা বসা থেকে সোজা উঠে দাঁড়িয়েছিল আর সঙ্গে সঙ্গে খসা আঁচলটা সজোরে বুকের ওপর দিয়ে পিঠের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল। তার পর ছদ্ম ঝাঁঝে বলে উঠেছিল, খুব যে পরের বউকে সামনে বসিয়ে চোখের সাধ মেটানো হচ্ছে—অ্যাঁ?

বলতে বলতে ঘর ছেড়ে চলে গেছল সে। বাপী তরফদার কাঠ।

পরের চার-পাঁচ দিনের মধ্যে কমলার হাবভাব আরো অন্যরকম দেখছে। বাইরে গম্ভীর, কিন্তু চোখে চোখ পড়লে অঘটনের অস্বস্তিকর ছায়াটা আরো ঘন হয়ে উঠেছে। বাপী তরফদার বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ স্নান সেরে বেরিয়ে পড়ে। বাইরে দু'বেলার খাওয়া সেরে একেবারে রাতে ফেরে। গতকাল বেরুনোর আগে কমলা এই খুপরিতে এসে হাজির। কালো মুখ পলকা-গম্ভীর, চোখের কোণে কৌতুক চিকচিক।

—আজকাল তোমার কোন্ পার্কে ডিউটি চলছে গো?

—তার মানে? না বুঝেও বিরক্ত।

—মানে আবার কি, রোজ সাড়ে এগারোটা বারোটায় বেরিয়ে রাত নটা পর্যন্ত হন্যে হয়ে তুমি চাকরি খুঁজে বেড়াও সেটা ওই হাঁদা বুড়ো বিশ্বাস করলেও আমি করি না। চাপা হাসি উছলে উঠতে চাইল কিন্তু উঠতে দিল না।—মরুকগে, এদিকে একটা ভালো ছবি হচ্ছে, এখানকার অনেকে দেখেছে ; দুকুরের শোয়ের দু'খানা টিকিট কাটতে পারবে? আমি পয়সা দিচ্ছি—

কমলার চোখ এড়িয়ে মাথা নেড়ে বাপী তরফদার বিড়বিড় করে জবাব দিল, আমার সময় হবে না।

এ জবাবের জন্য প্রস্তুতই ছিল কমলা।—ঠিক আছে, টিকিট আমিই কেটে রাখব না হয়...তোমার দেখার সময় হবে?

এবারে ওর চোখের দিকে তাকালো বাপী তরফদার। কমলা ফিক করে হেসে ফেলল।—তোমার অত ভয় কিসের, কেউ টের পাবে না। ছবি দেখার পর বেরিয়ে এসে আমি তোমাকে চিনতেও পারব না—সোজা ঘরে চলে আসব—

কমলার দু'চোখের কৌতুক সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। জবাব না দিয়ে বাপী তরফদার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে।

তারপর কাল রাতেই রতন বণিককে এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা বলেছে। আর তাই শুনেই কমলার সকালের এই ঠেস।

কিন্তু সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত আজকের দিনটায় আর কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। অভ্যাসমতো বাপী ঘণ্টাকয়েক আপিসপাড়ায় ঘোরাঘুরি করেছে ; সেখানে লালদীঘির মাছ দেখে ঘণ্টা দুই কেটেছে। বিকেলে ময়দানের মাঝখান দিয়ে অন্য দিনের মতোই দক্ষিণে হাঁটা দিয়েছে। ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসের পয়সা কটাও বাঁচে আবার লম্বা হাঁটাও হয়। এই হাঁটারও কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। পা যখন আর চলতে চায় না, ধারেকাছের কোনো একটা পার্ক-টার্ক-এ বেঞ্চিতে নয়তো ঘাসের ওপরে বসে পড়ে। ততক্ষণে শীতের ছোট বেলার শেষ আলোটুকু অন্ধকারের জঠরে চলে যায়।

আজ ক্লান্ত লাগছিল না। বেলা তিনটে নাগাদ ছেলেবেলার বন্ধু নিশীথ সেন-এর আপিসে গেছল। সে ভর-পেট জলখাবার খাইয়ে দিয়েছে। লোকালয়ের ফুটপাথ ধরে চলতে চলতে নিজের বাসের এলাকা ছাড়িয়ে আরো দক্ষিণে চলেছে। হাজরা পার্কের সামনে দাঁড়িয়ে গেল একটু। লাইট জ্বালিয়ে প্যাণ্ডেল খাটিয়ে এখানেও গান্ধীজীর শোকসভা চলেছে।

এর পাশেই আর এক দৃশ্য দেখে হাসি পেয়ে গেল বাপী তরফদারের। রেলিং-ঘেঁষা ফুটপাথে গজ দশেক দূরে দূরে কুপী জ্বালিয়ে দু'জন শীর্ণকায় গণৎকার বসে। সামনে ফুটপাথের ওপরেই খড়ির ছক-কাটা। তাদের সামনে একজন করে খদ্দের হাত বাড়িয়ে বসে আছে। এখানেও ভাগ্য গণনা চলছে। এক-আধজন আবার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে। বসে পড়বে কি পড়বে না—দোনামনা ভাব।

বাপী তরফদার এগিয়ে চলল। মানুষ কত দূরের ভবিষ্যৎ দেখতে পেলে নিশ্চিন্ত হতে পারে? আসলে এ একটা রোগ। রোগের মতো কিছু। এই রোগে বাপী নিজেও জর্জর। কিন্তু কোনো লোককে সে হাত দেখায় না। ঠিকুজি দেখায় না। সে জানে, দেখালে একটা রূঢ় বাস্তব তাকে হাঁ করে গিলতে আসবে। কল্পনায় যে সাম্রাজ্যের সে অধীশ্বর, সেটা কোনদিন সত্যের ধারেকাছে ঘেঁষবে এমন ভবিষ্যদ্বাণী কোনো গণৎকার করবে না। বিশ্বাস করুক আর না-ই করুক, রতন বণিকের ভবিষ্যৎ-বচন বরং শুনতে ঢের ভালো লাগে তার।

কিন্তু ঠিক এই এক ব্যাপার থেকেই যে এই দিনটা অন্য সবগুলো গতানুগতিক দিন থেকে এত তফাৎ হয়ে যাবে, তখন পর্যন্ত এ-রকম সম্ভাবনা তার কল্পনার মধ্যেও নেই।

...বড় রাস্তা ছেড়ে ভিতরের একটা মাঝারি রাস্তা ধরে আরো আধ মাইলটাক দক্ষিণে হেঁটে এসেছিল। সামনের মোড়ের মাথায় একটা তিনতলা বাড়ির রাস্তা-ঘেঁষা একতলার ঘরটার দিকে চোখ গেল। বাপী আবারও হেসে উঠল। ওই ঘরেই একজন জ্যোতিষী বসে সে জানে। এই রাস্তায় আরো এসেছে-গেছে। এই একজন বড়লোকের জ্যোতিষী। বড়লোকের ভাগ্য দেখে, ভাগ্য ফেরায়। ঘরের সামনে দুটো তিনটে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরে অভিজাত মেয়ে-পুরুষেরা অপেক্ষা করে। ভিতরের খদ্দের বেরিয়ে এলে তবে আর একজনের পালা।

আজও দূর থেকে সেই একই দৃশ্য দেখল। দু'খানা গাড়ি দরজায় দাঁড়িয়ে। বাইরে দু'জন ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা। বাপী তরফদার হাসছে মৃদু মৃদু, এগিয়ে আসছে। সামনের দরজা দিয়ে ফরাস-ঢাকা চৌকিতে বসা জ্যোতিষীকে দেখা গেল। তার সামনে দুটি অভিজাত মহিলা বসে। পিছন থেকে তাদের পিঠ দেখা যাচ্ছে, মুখ দেখা যাচ্ছে না। জ্যোতিষীর মুখে হুঁকো-গড়গড়ার নল। নলের তামাক টানছে আর নিবিষ্ট মনে দেখছে কিছু।

দরজা ছাড়িয়ে এসে পাশের জানলা দিয়ে ভিতরে তাকাতেই বাপী তরফদার স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডটা লাফালাফি করে বুকের খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। এ কাকে দেখছে বাপী তরফদার? কাদের দেখছে? সত্যি দেখছে না স্বপ্ন কিছু।

সত্যি না হলে গত আটটা বছরের এতগুলো দিন থেকে এই দিনটা—এই রাতটা মুহূর্তের মধ্যে এত তফাৎ হয়ে গেল কি করে? সত্যিই এখানে এত বড় একটা চমক তার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে!

জানালার গরাদ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত দুই চক্ষু মেলে দেখছে। ওই দু'জনই এত বেশি চেনা তার যে দেখামাত্র সর্বাঙ্গের স্নায়ুগুলো একসঙ্গে টানটান হয়ে গেল। বয়স্কা মহিলার জমকালো বেশবাস, গলায় কানে হাতে ঝকমক একরাশ গয়না।...মনোরমা নন্দী। জ্যোতিষীর সামনে কচি পদ্মের মতো দু'হাত মেলে বসে আছে তার মেয়ে মিষ্টি...মালবিকা। ছেড়ে আসা এক জায়গায় সে যেমন বিপুল নয়—বাপী, সেখানে এই মেয়েও তেমনি মালবিকা নয়—মিষ্টি। মিষ্টি মিষ্টি। বাপী, অপলক চেয়ে আছে। দশ আর আটে আঠেরো হবে এখন বয়স। দশ বছরের সেই গরবিনী মেয়েটা আঠেরোয় এই হয়েছে!

বাপী তরফদার তাদেরই দেখছে আর তার মা-কে দেখছে এ কি বিশ্বাস করবে?

ভিতরে জোরালো আলো। বাইরেটা সে তুলনায় অন্ধকার। ভিতর থেকে তাকে, কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

কতক্ষণ কেটেছে জানে না। উঠতে দেখল তাদের। মনোরমা নন্দী হাসছেন। মিষ্টি নন্দীও হাসছে। মনোরমা নন্দী সুন্দর হাতে ব্যাগ খুলে দুটো দশ টাকার নোট জ্যোতিষীর সামনে রাখলেন। ভিতরের কথাবার্তা আসছে না।

নিজের ওপর আর এতটুকু দখল নেই বাপী তরফদারের। তারা বেরিয়ে আসতে সে দু'হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

মনোরমা বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকালেন। পা-জামা পরা খয়ের রঙের গরম আলোয়ান

জড়ানো একটা ছেলে হাঁ করে তাঁর মেয়েকে দেখছে। দেখছে না, দুই চোখ দিয়ে গিলছে।

—স্টুপিড! খুব অস্পষ্ট ঝাঁঝে কথাটা বলে মেয়ের হাত ধরে তিনি গাড়িতে উঠলেন। মেয়েটারও বিরক্তি-মাখা লালচে মুখ।

সাদাটে রঙের গাড়িটা চোখের সামনে দিয়ে আরো দক্ষিণে চলল।

পিছন থেকে গাড়িটার নম্বর চোখে পড়ল বাপী তরফদারের। তখনো স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে সে। গাড়ির রক্তবর্ণ সাইডলাইট দুটোও মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ জিভে করে নিজের শুকনো ঠোঁট বার দুই ঘষে নিল বাপী তরফদার। আট বছর আগের সেই অকরুণ আঘাতের চিহ্ন আট দিনেই মিলিয়েছে। কিন্তু নিজের দেহের সেই তাজা রক্তের নোনতা স্বাদ আজও জিভে লেগে আছে।

## দুই

...'অন্ন দেইখা দিবা ঘি, পাত্র দেইখা দিবা ঝি'।

শুধু কথা নয়, এক বুড়োর ফ্যাসফেসে গলার টানা স্বরসুদ্ধু হুবহু মনে পড়ে গেল বাপী তরফদারের।

ছেলেবেলা থেকে এ-পর্যন্ত একটিমাত্র গুণের ওপর মস্ত নির্ভর তার। প্রখর স্মরণ-শক্তি। এই গুণটুকুও না থাকলে হাতের মুঠোয় বি-এস-সি'র ডিগ্রি ধরা দূরে থাক, স্কুলের গণ্ডী পার হতে পারত কিনা সন্দেহ। যা একবার দেখে নেয় তার ছাপ মগজ থেকে আর সরে না। যা একবার শোনে কানে লেগেই থাকে। কিন্তু এই গুণটাকে সে যদি কোনো উপায়ে বিস্মরণের রসাতলে ঠেলে দিতে পারত, দিতই। একটুও দ্বিধা করত না।...অনেক দাহ অনেক যন্ত্রণার শেষ হত তাহলে।

এক ধাক্কায় নটা বছর হুড়হুড় করে পিছনে সরে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে হাফপ্যান্ট আর মোটা ছিট কাপড়ের ফতুয়া পরা তেরো বছরের এক ছেলে, নাম যার বাপী—সে সেই বনাঞ্চলের সব থেকে শৌখিন রংচঙা কাঠের বাংলোর বাইরের সাজানো ঘরের দরজার পাশে আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে। ভিতরের গদিআঁটা ঝকঝকে বেতের সোফায় বসে মুগা রঙের চোগাচাপকান পরা একজন সাদা দাড়িঅলা মুসলমান ফকির। সাদা দাড়ি নেড়ে নেড়ে অন্ন দেখে ঘি আর পাত্র দেখে ঝি দেবার কথা সে-ই বলছিল।

তার হাঁটুর এক হাতের মধ্যে চামড়া-ঢাকা চেকনাই মোড়ার ওপর মেমসাহেব বসে। অদূরের আর একটা সেটিতে সাহেব—যাঁকে সামনে দেখলে ভয়ে আর সম্ভ্রমে বাপীর বাবা আর বন-এলাকার সমস্ত মানুষের মাথা বুকের দিকে নুয়ে পড়ে। সাদা দাড়ি আর মাথায় সাদা ফেজ টুপী দেখেই অপরিচিত মানুষটাকে মনে মনে ফকির আখ্যা দেয়নি বাপী। সে যখন এসে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়েছে, ওই সাদা দাড়ি তখন সবে মেমসাহেবের হাত ছেড়ে তার ন' বছরের মেয়ে মিষ্টিকে কাছে টেনে নিয়েছে। সোফার হাতলের পাশে এক হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। মিষ্টির পরনে জেল্লা ঠিকরনো বেগনে রঙের ফ্রক। ওই ফ্রকটাতে এত সুন্দর লাগছে মিষ্টিকে যে এক হাতে ওকে ওইভাবে জড়িয়ে ধরে থাকার জন্য বুড়োর ওপর রাগই হচ্ছিল বাপীর। আরো একটু গলা বাড়িয়েছে সে। ওদের পিছনে একটু দূরে আর একটা সোফায় আবার ভারিক্কি

মুখে দীপুদা বসে। ওকে দেখতে পেলেই উঠে এসে মাথায় খট খট করে গাঁট্টা বসাবে। তবু সাবধানে মিষ্টিকে দেখার লোভ সামলে উঠতে পারছিল না বাপী।

...মিষ্টির ডান হাতটা বুড়োর সোফার হাতলে চিং করে পাতা। বাঁ হাতটা সামনে মেলে ধরা। ফুটফুটে হাতের ছোট চেটো দুটোতে যেন হালকা গোলাপী রং বোলানো। সেই দুটো হাতের ওপর বুড়ো তার এক হাতের পুরু কাঁচের চাকতিটা ফেলে একমনে দেখা শুরু করতেই বাপী বুঝে নিল লোকটা গণৎকার। ওই কাঁচের জিনিসটা সে চেনে। ম্যাগনিফাইং গ্লাস না কি বলে ওটাকে। গণৎকার যদি মুসলমান হয় তাকে ফকির ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে বাপী জানে না।

হাতের রেখার ওপর চোখ রেখে বুড়ো জিজ্ঞাসা করল, বেটীর নাম কি?

লজ্জা-লজ্জা মুখ করে মিষ্টি বলল, মালবিকা নন্দী। জবাব দিয়ে সকৌতুকে ও একবার বুড়োর মুখের দিকে তাকাচ্ছে আর একবার নিজের হাতের দিকে।

এরপর ভবিষ্যৎ বলা শুরু হল। খাসা মেয়ে। যত বড় হবে আরো খাসা হবে। উদগ্রীব মুখে তার মা আরো সামনে ঝুঁকল। আর বাবা সিগারেট ধরালো।

—খুব বুদ্ধিমতী মাইয়া। অনেক লেখা-পড়া অইব। বি.এ. এম.এ., পাস করবো। না, কোন রকম বড় অসুখবিসুখ দেখা যায় না, মায়ের কোনো ভাবনা নাই, বেটীর শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাইবো।

মেমসাহেবের প্রশ্ন, আর বিয়ে? বিয়ে কেমন হবে দেখুন—

বাইরে থেকে বাপীরও মনে হল মিষ্টির সম্পর্কে এইটেই শুধু জানার মতো কথা, আর সব বাজে।

ওর দুটো হাতের ওপরেই কাচ ফেলে-ফেলে দেখছে বুড়ো। বেশ করে দেখে নিয়ে শেষে শ্লোকের মতো করেই কথা কটা বলল। 'অন্ন দেইখা দিবা ঘি, পাত্র দেইখা দিবা ঝি'—

বাইরে থেকে স্পষ্টই শুনল বাপী কিন্তু অর্থ বুঝল না। মেয়ের বিয়ের মধ্যে অন্ন ঘি ঝি আবার কি ব্যাপার! মাথাটা আবার একটু বাড়িয়ে দিতে হল। মিষ্টিও বড় বড় চোখ করে বুড়োর দিকে চেয়ে আছে।

মিষ্টির মা উদ্বিগ্ন একটু।—তার মানে গণ্ডগোল দেখছেন নাকি? প্রশ্নটা করেই কিছু খেয়াল হল। মেয়েকে বলল, এই মিষ্টি তোর হয়েছে, তুই যা এখন।

মিষ্টি মাথা ঝাঁকালো, দাদা থাকলে আমি থাকব না কেন!

ফলে দাদার প্রতিও মায়ের নির্দেশ, দীপু, তুইও বাইরে যা তো একটু—

শোনামাত্র এদিক থেকে বাপীর ছুট লাগানোর কথা। কিন্তু প্রস্তুত হবার আগেই ছেলের প্রতিবাদ কানে এলো, বা রে, আমারটা তো দেখাই হয়নি এখনো, আমি তাহলে বাড়ি থেকেই চলে যাচ্ছি—

বাপী জানে, মেমসাহেব ছেলের কাছে নরম মেয়ের কাছে গরম। ওমনি ছেলেকে অনুমতি দিল, আচ্ছা তুই থাক। সুর পাল্টে মেয়েকে বলল, মিষ্টি! কতদিন বলেছি না দাদা তোমার থেকে ঢের বড়—যাও, ও-ঘরে গিয়ে বই নিয়ে বোসো—

বাপী এদের সমস্ত খবর রাখে। বাইরের শাসন সাহেবের আর ভিতরের শাসন মেমসাহেবের। বিরস মুখে মিষ্টি দরজার দিকে পা বাড়ালো। এবারে বিপদ হতে পারে

বাপী জানে, তবু দরজার আড়াল থেকে সে নড়ল না।

বাইরে পা দিয়ে ওকে দেখেই মিষ্টি থমকালো এক দফা। পরের মুহূর্তে ঘরের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, মা—বাপী পাজিটা এখানে দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে শুনছে সব!

এক লাফে জাহাজ মার্কা কাঠের বাংলো থেকে বাপী মাটিতে এসে পড়ল। খানিকটা নিরাপদ ব্যবধানে ছুটে এসে ঘুরে দাঁড়াল। না, ওর চিৎকার শুনে সাহেব বা মেমসাহেব কেউ বেরিয়ে আসেনি। এসেছে দীপুদা। চোখোচোখি হতে সে হাত তুলে মার দেখালো, তারপর আবার ভিতরে চলে গেল।

বয়সে দীপুদা তিন বছরের বড় হলেও আর সেবারে সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলেও ওই ননীর শরীরে জোর কত বাপীর তাতে সন্দেহ আছে। কিন্তু সাহেবের ছেলের জোর যাচাইয়ের প্রশ্ন ওঠে না। তাই হাতের নাগালে পড়লে বাপীকে গুঁতো খেতে হয়। সাহেবের ছেলে না হলে ও উল্টে লড়ে দেখতে পারত। ছুটে দীপুদা তার নাগাল পায় না কখনো, সে-চেষ্টা করলে জিভ বার-করা কুকুরের হাল হয়।

দীপুদা ঘরে ঢুকে যাওয়ার পরেও ফ্রক পরা মিষ্টি সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে আর ওকেই দেখছে। এ-রকম একটা সুযোগ বাপী ছাড়তে পারে না। যতটা সম্ভব দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল। তারপর হাত দুটোও দুপাশে টান করে দিল। শেষে মুখটা বিকৃত-কুৎসিত করে আর ছ'আঙুল জিভ বার করে ভেঙচি কেটে দাঁড়িয়ে রইল।

ফল যেমন আশা করেছিল তেমনি। রাগের মাথায় ও-দিকের কাঠের বারান্দা থেকে মিষ্টিও চোখের পলকে ঠিক ওই রকম পা ফাঁক করে হাত দু'দিকে ছড়িয়ে আর জিভ বার করে ভেঙচি কেটে পাল্টা জবাব দিল। তারপরেই তারস্বরে আবার চিৎকার, ও মা! দেখে যাও বাপী পাজিটা আমাকে কি বিচ্ছিরি করে ভেঙাচ্ছে।

আর দাঁড়ানো নিরাপদ নয়। মেয়ের ডাকে ওই মেমসাহেব বাইরে এসে আঙুল তুলে ডাকলেই বাপীকে কাচপোকার মতো কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। দাঁড়িয়ে কানমলা বা চড় খেয়ে আসতে হবে। চড় অবশ্য এখন পর্যন্ত খেতে হয়নি, কিন্তু কানে দুই-একবার হাত পড়েছে। আর চড়িয়ে গাল লাল করে দেবার শাসানি শুনতে হয়েছে। এ-সব নির্যাতন ওই সোহাগী মেয়ের নালিশের ফল। নইলে দরকার পড়লে মেমসাহেব ওকে ডেকে ফাইফরমাস তো বেশ করে। আর, একটু সুনজরের আশায় বাপীও তার কোনো কাজ করতে পেলে বর্তে যায়।

সোহাগী মেয়ের চিৎকার শেষ হবার আগেই বাপী রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে সেঁধিয়েছে। তারপর জঙ্গলের ভিতর দিয়েই হাসতে হাসতে ঘরমুখো হয়েছে।

মাথায় ফকিরের কথাগুলো ঘুরপাক খেতে লাগল। যা বলল তার অর্থ কি হতে পারে? ঘরে গিয়ে পিসীকে জিজ্ঞেস করতে হবে। পিসীর কথাবার্তার মধ্যেও বাঙালের টান আছে, বিশেষ করে বাবার সঙ্গে যখন কথা বলে। আর ওই ফকিরের মতো অনেক রকমের ছড়া-পাঁচালি কাটে পিসী।

বাপীর যা-কিছু আদর-আব্দার সব পিসীর কাছে। ঘরে মা নেই। মা-কে সে-রকম মনেও পড়ে না। চিন্তা করলে মায়ের একটা কাঠামো শুধু মনে আসে। আরো সাত বছর আগে অর্থাৎ বাপীর ছ'বছর বয়সের সময় এখানকার হাসপাতাল থেকে মা-কে শহরের

বড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে মা আর এই বানারজুলিতে ফিরে আসেনি। পিসী তার আগে থেকে এখানে ছিল। একদিন বিকেলের দিকে তাকে মেঝেতে আছড়ে পড়ে কাঁদতে দেখেছিল। আর বাবাকে মুখ কালি করে ঘরের কোণে বসে থাকতে দেখেছিল। তারপর জেনেছে মা বড় হাসপাতাল থেকেই সগ্‌গে চলে গেছে। এই তেরো বছরের জীবনে তারপর মায়ের জন্য হাহুতাশ করার সময় খুব একটা মেলেনি।

ঘরে ঢুকে পিসীকে বলল, সাহেব বাংলোয় মস্ত এক ফকির এসেছে কোথা থেকে, সকলের হাত দেখছে—

হাত দেখা ফকিরের কথা শুনে পিসীর জিভে জল গড়ালো।—বলিস কি রে! কে ফকির? কোথাকার ফকির? তুই নিজের হাতটা একবার দেখিয়ে এলি না কেন?

বিরক্তিভরে শেষের প্রশ্নটারই জবাব দিল, কি যে বলো ঠিক নেই, সাহেব মেমসাহেব তাদের ঘরে বসে হাত দেখাচ্ছে সেখানে নিজের হাত বাড়াতে গেলে আস্ত থাকত—দুমড়ে ভেঙ্গে দিত না।

এ-রকম কথা শুনলে পিসীর রাগ হয়ে যায়। কেন, ভেঙে দেবে কেন শুনি? ওদের ভবিষ্যৎ আছে তোর নেই—তুই কি বানের জলে ভেসে এসেছিস নাকি!

পিসী আবার বাবার ঠিক উল্টো। বাবা সাহেব মেমসাহেবের নাম শুনলে কাঁপে। পিসী জ্বলে। পিসীর রাগের কারণও বাপী নিজেই। তার কাছে ও দুখের ছেলে। সাহেবের ছেলে ভাইপোর গায়ে যখন-তখন হাত তোলে, আর মা-ও ভালো ব্যবহার করে না, ধমক-ধামক করে, কানে হাত দেয় পর্যন্ত—এ পিসী বরদাস্ত করতে পারে না। দাঁত কড়মড় করে, বাপীকেই ঠেঙাতে আসে, তুই নোলা বার করে যাস কেন ও-দিকে বেহায়ার মতো—এত হেনস্তার পর লজ্জা করে না ও-মুখো হতে?

বাপীর লজ্জা করে না। দীপুদা তার বাবা-মা, এমন কি ওই মিষ্টিটার ওপরে পর্যন্ত কি-রকম একটা আক্রোশ তারও বুকের তলায় জমাট বেঁধে আছে। তবু যায়। না গিয়ে পারে না। বিকেলে বা ছুটির দিনে একটা অদৃশ্য কিছু তাকে ওই বাংলোর দিকে টেনে নিয়ে যায়। ওই বাংলোটা তার চোখে রূপকথার নিষেধের এলাকার মতো। নিষেধ বলেই ওদিকে হানা দেবার লোভ।

পিসীর সামনে গ্যাঁট হয়ে বসল বাপী।—বাজে কথা ছাড়ো—অন্ন দেইখা দিবা ঘি পাত্র দেইখা দিবা ঝি—মানেটা কি চটপট বলে দাও দেখি?

হঠাৎ এই বচন শুনে পিসী হাঁ প্রথম।—কে বলেছে?

—ওই ফকির।

—কাকে বলেছে?

—মিষ্টির হাত দেখে তার মা-কে বলেছে।

পিসী মিষ্টিকে চেনে। মেমসাহেবকে লুকিয়ে ও বাপীর সঙ্গেই দু'দিন এখানে এসেছে। পিসী ওকে আদর করে নারকেলের নাড়ু আর মুড়ির মোয়া খাইয়েছে।

হাসিমুখে পিসী ভাইপোকে ছড়ার অর্থ বুঝিয়ে দিল। শুনে বাপী চিন্তিত হওয়া দূরে থাক উল্টে খুশি হল। ঢাক-ঢোল-শানাই বাজিয়ে মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলেই হল? হোক গণ্ডগোল—গণ্ডগোলটা যত বেশি হয় বাপী ততো খুশি হবে। ওই হাবা মেয়ে কিস্‌সু বোঝেনি। বুঝবে কি করে, তাকে তো ঘর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পিসীর কথা

অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হলে নিজের মা ওকে ঘর থেকে সরাবে কেন। মিষ্টিটাকে এবার হাতের নাগালে পেলে হয়—

ডাকলে মিষ্টি যে ওর ধারেকাছে আসতে চায় না সেই দোষটা বাপীর নিজেরই। মেয়েটাকে দেখলেই মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি চাপে। অবস্থার ফারাকটা ওরা যদি এত বড় করে না দেখত তাহলে বোধহয় এতটা হত না। মেয়েট .ক দেখার সঙ্গে সঙ্গে একটা অজ্ঞাত লোভ মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দেয়। ঝাঁকড়া আধা-কোঁকড়ানো চুলের সামনে ফর্সা টুলটুলে মুখখানা দেখে মনে হয় ছোট্ট মিশকালো একটা ঝোপের মধ্যে সুন্দর একখানা বড়ো ফুল বসানো।

একা পেলেই ডেকে বসত, এই মিষ্টি, শোন্—

মিষ্টি কাছে আসত।—কেন?

—তোকে আমি খেয়ে ফেলব। তারপর আরাম করে এক গেলাস জল খাব।

এরপর আর রাগ না করে থাকতে পারে কোন মেয়ে। কাছে আসুক না আসুক, দেখা পেলেই বাপীর ওই কথা।—মিষ্টি, তোকে আমি খেয়ে নেব—দূরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কাছে এলে খেয়ে নেব বলে?

মিষ্টি এই নিয়ে তার দাদার কাছে আর মায়ের কাছে নালিশ করেছে। দীপুদা এই অপরাধে ওর মাথায় কম গাঁট্টা মারেনি। আর এই অপরাধেই মেমসাহেবের হাতে কানমলা খেয়েছে। তার ফলে দেখা হলে দূর থেকে আরো বেশি করে এই কথা বলে ছুটে পালিয়েছে। এরপর বাবার কাছে সাহেব বা মেমসাহেব কে তড়পেছে বাপী আজও জানে না। বাবা একদিন আপিস থেকে ঘরে ফিরেই ওকে ধরে বেদম ঠেঙানি। কি দোষে মার খাচ্ছে, পিসীর বা ওর তাও বুঝতে সময় লেগেছে। এই মারের ফলেই পিসীর সঙ্গে বাবার ঝগড়া বেধে গেছে। দোষটা তখন বোঝা গেছে। বাবা বলেছে, সাহেবের মেয়েটাকে দেখলেই মিষ্টি খাবে, মিষ্টি খাবে বলে চেঁচায়—আজ ওকে আমি শেষ মিষ্টি খাওয়াচ্ছি।

বাবার ওপরে রাগ করেই পিসী গুমগুম করে ওর পিঠে আরো কটা কিল বসিয়ে দিয়েছে।—সাহেবের গরিব কেরানীর ছেলে হয়ে তোর এত লোভ—পা চাটিতে পারিস না?

এরকম বিপাকে পড়ার ফলেই মিষ্টিকে দেখলে বাপী এখন আর গলার আওয়াজে জানান দিয়ে একথা বলে না। কিন্তু মনে মনে ঠিক বলে। আগের থেকে আরো বেশি বলে। আর সেটা ওই মেয়ে ঠিক বুঝতে পারে। কিন্তু কানে না শুনলে নালিশ করতে পারে না বলেই বাপীর ওপর আরো বেশি রাগ তার।

দাদাকে বলেওছে ক'দিন, ও মনে মনে ঠিক আমাকে খাবার কথা বলছে, ঠোঁট নড়ছে দেখছ না—ধরে দাও না দু'ঘা!

কিন্তু দীপুদা যখন দেখে তখন আর বাপীর ঠোঁট নড়ে না। বোনের রাগের কথায় সে অতটা অবুঝ হতে পারে না। তবু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করে নেয়, মনে মনে বলছিস?

যতটা সম্ভব মুখখানা নিরীহ করে তুলে বাপী মাথা নাড়ে। বলছে না।

দুপুরটা কোনরকমে কাটিয়ে বাংলা পথ ধরে আবার সোজা বাংলোর সামনে এসে দাঁড়াল। বিকেলে মিষ্টি বাংলো ছেড়ে বেরুবেই জানা কথা। নিজেদের বাগানে ছোটাছুটি

করে আবার সামনের পাকা রাস্তা ধরে বেড়ায়ও। ফাঁক পেলে মেয়েটার জঙ্গলে ঢুকে পড়ারও লোভ খুব। কিন্তু একলা ঢুকতে সাহস পায় না। বাপীর তোয়াজ তোষামোদে মেজাজ ভালো থাকলে মা-কে লুকিয়ে তার সঙ্গেই মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ে। ইদানীং বাপীরও তোষামোদের মেজাজ নয় বলে সেটা বন্ধ আছে। এমন কি মিষ্টি ওকে দেখলে বাগান ছেড়ে বাইরেই আসতে চায় না।

চুলবুলে মেয়ে ঘরে কতক্ষণ আর থাকবে। একটু বাদেই কাঠের বাংলোর বারান্দায় দেখা গেল ওকে। তারপর থমকেও দাঁড়াল। অর্থাৎ ওরও চোখ এই দিকে।

একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিল বাপী। কেউ নেই। গেট-এর সামনে এসে হাত তুলে ইশারায় কাছে ডাকল।

মিষ্টি দাঁড়িয়ে রইল। অপলক চোখ। রাগ-রাগ মুখ। বাপী বুঝে নিল সকালে যেভাবে ওকে ভেংচি কাটা হয়েছে, সহজে আসতে চাইবে না। খুব মোলায়েম গলায় ডাকল, মালবিকা, একটা কথা শুনে যা, খুব মজার কথা—

মালবিকা বলে ডাকার মানে ওকে বোঝাতে চায় মনে মনেও সে এখন মিষ্টিকে খেয়ে ফেলার কথা ভাবছে না। কিন্তু মেয়েও ত্যাঁদড় কম নয়।—ফের তুই-তুকারি করে কথা। মা-কে ডাকব?

বাপীর ইচ্ছে হল দুই চড়ে ফোলা-ফোলা লালচে গালে দশ আঙুলের দাগ বসিয়ে দেয়। তার বদলে দু হাত জোড় করে ফেলে বলল, ঠিক আছে আর তুই-তুকারি করব না, কিন্তু একবার এলে খুব মজার কথা বলতাম, সকালের সেই গণৎকারের কথা—পিসীমার কাছে চুপিচুপি জিগগেস করে জেনে নিয়েছি!

বাংলো ছেড়ে বাইরে আসার লোভ একটু একটু হচ্ছে বোঝা যায়। তবু মাথা নাড়ল, মা তোমাদের সঙ্গে মিশতে বারণ করে দিয়েছে।

এ-কথা মিষ্টি আগেও বলেছে। শুনলেই রাগে ভিতরে ভিতরে গজরাতে থাকে বাপী। কিন্তু এত শুনেছে বলেই কানে তোলার মতো নয়। সাদা-মাটা মুখ করে বলল, ঠিক আছে, শুনতে হবে না তাহলে...জঙ্গলের মধ্যে মস্ত একটা মৌচাকও দেখাব ভাবছিলাম। আবু বলছিল, শীগগিরই মওকা বুঝে এক রাত্তিরে ওটা পেড়ে ফেলবে—অনেক মধু হবে। তুই তোর মায়ের আঁচলের তলায় বসে থাকগে যা।

গেট ছেড়ে রাস্তার এ-ধারে চলে এলো বাপী।

লোভ সামলানো কঠিন হয়ে পড়ছে মিষ্টির। এই পাজীটার সঙ্গে জঙ্গলে বেড়াতে ওর ভালই লাগে। বাবার সঙ্গে বা বাবার লোকের সঙ্গে ও আর দাদা জঙ্গলে ঘুরেছে। হাতীর পিঠে চেপেও ঘুরেছে। কিন্তু সে আর এক রকমের ঘোরা। বাপীর সঙ্গে ঘুরতে অন্য রকমের মজা। বাপী হাত ধরে টানাটানি করলেও মিষ্টি ঘন জঙ্গলে ঢোকে না অবশ্য। এমনিতেই গা ছমছম করে। দাদাও ভীতু, একলা বেশি দূর যায় না। কিন্তু বাপীর ভয়ডরের লেশমাত্র নেই। যেখানে বাঘ, ভালুক, চিতা থাকে, আবুর সঙ্গে ও নাকি সে-সব জায়গাও চষে বেড়িয়েছে। আর ঢিল নিয়ে বুনো মোরগ খরগোস বেঁজী সজারু তাড়া করতে মিষ্টি নিজের চোখেই দেখেছে। ছমছমানি ভাব কেটে গিয়ে তখন সত্যিকারের মজা।

রাস্তার ওদিকে চলে গেল দেখে মিষ্টির আর বাংলোয় দাঁড়িয়ে থাকা হল না। পায়ে পায়ে নেমে গেট-এর কাছে এসে চোখ বেঁকিয়ে দেখে নিল সত্যি চলে যাচ্ছে কিনা।

তারপর অনেকটা নিজের মনেই কথা ছুঁড়ে দিল, হুঁ, মৌচাক দেখতে যাই আর বোলতা এসে কামড়ে দিক।

বোলতার বদলে বাপীর নিজেরই ওই ফোলা গালে কামড় বসাতে ইচ্ছে করছিল। বলল, বোলতা আর মৌমাছির তফাৎ জানিস না—তোকে দেখতে হবে না। ঢিল না ছুঁড়লে মৌমাছি চাক ছেড়ে নড়ে?

—আবু চাক ভাঙবে কি করে, তখন কামড়াবে না?

—রাতে ধোঁয়া দিয়ে ভাঙবে। জঙ্গল-সাহেবের মেয়ের কত সাহস আবুকে বলে আসিগে যাই।

ওই একজনকে জঙ্গলের দেবতা বা অপদেবতা ভাবে মিষ্টি। আবু রব্বানীকে এ তল্লাটের মানুষ ছেড়ে জঙ্গলের সমস্ত জীব-জন্তুগুলোও চেনে বোধহয়। জঙ্গলের খবর ওর থেকে বেশি কেউ রাখে কিনা সন্দেহ। এই জন্যে মিষ্টির বাবাও ওকে পছন্দ করে। আবুর বাবা এ জঙ্গলের হেড-বীটম্যান। ওর ছেলে আবুকে বাবা শীগগিরই বীটম্যান করে দেবে শুনেছে মিষ্টি। ওই আবু একসময় দাদার দু ক্লাস ওপরে পড়ত নাকি। বছর-বছর ফেল করার ফলে পাঁচ বছরের ছোট বাপী ওকে ধরেছিল। আর সেই বছরেই আবু ঘেন্নায় ইস্কুল ছেড়েছে। বয়সে দাদার থেকে মাত্র দু'বছরের বড়। বেশি হলে উনিশ। এরই মধ্যে শুধু পাথর ছুঁড়ে আর লাঠিপেটা করে কত রকমের জীব মেরেছে ঠিক নেই। এই সেদিনও পেল্লায় এক বিষধর সাপ মেরে মিষ্টির বাবাকে দেখাতে এনে খুব বকুনি খেয়েছিল। সাপ ইঁদুর খায়। ইঁদুর বনের ক্ষতি করে। তাই বেশি সাপ মারলে বনের ক্ষতি। বাবা বকুক আর যা-ই করুক, ওর বুকের পাটা আছে অস্বীকার করতে পারে নি। কেউ পারে না। জঙ্গলের ব্যাপারে তার আলাদা মর্যাদা।

বাপীকে নিয়ে আবুর সঙ্গেও মিষ্টি চুপি চুপি জঙ্গলে কম বেড়ায়নি। ছুটির দিনের দুপুরে বাবা-মা ঘুমোয়, দাদা শহরে যায়। ফাঁক বুঝে বাপীও এসে মিষ্টিকে ডেকে নিয়ে যায়। বাবা-মা ওকে না দেখতে পেলেও ভাবে কাছাকাছি আছে কোথাও। আবু সঙ্গে থাকলে আর হাতে সময় থাকলে মিষ্টি ওদের সঙ্গে একটু ঘন জঙ্গলে ঢুকতেও ডরায় না। এই আবুর কাছে মিষ্টির ভীরু অপবাদ কাম্য নয়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও গেট খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতে হল। মেয়ে ভাঙবে তবু মচকাবে না। ঠোঁট উল্টে জবাব দিল, আবুকে বললে বয়েই গেল। বাবাকে বলে দেব আবু জঙ্গলের ক্ষতি করছে, ওকে যেন বীটম্যান না করে।

বাপীর ধৈর্য কমছে, তাই রাগ বাড়ছে।—কি? আবুর নামে নালিশ করবি তুই?

—ফের তুই?...তুমিই বা আমার নামে ওকে বলতে যাবে কেন? বোলতার চাক কত দূর?

একবার শুধরে দেবার পরেও ফের আবার বোলতাই বলল। বাপীর মনে ওকে নিয়ে জঙ্গলে ঢোকার তাড়না।—খুব কাছে।...আচ্ছা, আবুকে কিছু বলব না।

মিষ্টি অত সহজে ভোলবার পাত্রী নয়।—মজার কথা কি বলবে বলছিলে?

টোপটা আরো একটু রহস্যজনক করে তোলার সুযোগ পেল বাপী। মুখে হাসি টেনে বলল, সকালে গণৎকারের সঙ্গে তোর বিয়ের কথা বলার সময় তোর মা তোকে ঘর থেকে সরিয়ে দিল কেন সে তো বুঝতেও পারিসনি বোকা মেয়ে! আয়, বলছি—

এবারে আর 'তুই' বলার জন্য ফোঁস-ফোঁস করে সময় নষ্ট করতে চাইল না মিষ্টি। আসলে মা বলেছিল বলেই, নইলে তুই-তুমির তফাৎ খুব একটা কানে লাগে না। ঘুরে দাঁড়িয়ে বাংলোর দিকটা দেখে নিল একবার। কেউ নেই। রাস্তা পেরিয়ে কাছে এলো। ...বিয়ের কথা মানেই মজার কথা আর ভালো কথা, কিন্তু মা হুট্ করে ওকে ঘর থেকে চলে যেতে বলেছিল কেন সত্যিই মাথায় ঢোকে নি।

—বলো।

—আগে এদিকে আয়। কাছে পাওয়া মাত্র ওর একখানা হাতের ওপর দখল নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল। তারপরেও হাত ছেড়ে দিল না। মিষ্টির সুন্দর ছোট হাত নিজের হাতে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করতে বা চাপাচাপি করতে ভালো লাগে।

—সকালের ওই গণৎকার কোত্থেকে এলো রে?

—বাবা শিলিগুড়ি থেকে আনিয়েছে। অনেক জানে।

—কি নাম?

—পীর বক্স্।

—তার মানে এক বাক্স পীর!

না বুঝে মিষ্টি বোকার মতো তাকালো তার দিকে।

বাপী বলল, বি-ও-এক্স বক্স মানে বাক্স না?

—তোমার মুণ্ডু, তুমি এই-সব বজ্জাতি করার জন্য আমাকে ডেকে এনেছ! হাত ছাড়াবার চেষ্টা।

—না রে না—তোর বিয়ের কথায় বুড়ো সেই ছড়াখানা কি বলেছিল মনে আছে?

একটা কি বলেছিল মিষ্টির মনে পড়ছে। চেষ্টা সত্ত্বেও কথাগুলো মনে পড়ল না। মাথা নাড়ল, মনে নেই।

'অন্ন দেইখা দিবা ঘি, পাত্র দেইখা দিবা ঝি'! বাপী হেসে উঠল।

মনে পড়ল। বুড়ো গণৎকার এই কথাগুলোই বলেছিল বটে। বড় বড় চোখ করে মিষ্টি ওর দিকে মাথা বেঁকিয়ে তাকালো।—তার মানে কি?

—'অ' আর 'নয়-নয়' অন্ন মানে ভাত তো?

মিষ্টি মাথা নাড়ল। তাই।

—পচা গন্ধ-অলা চালের ভাতে ভালো ঘি ঢাললেও খেতে স্বাদ ভালো হয়?

এবারে একটু ভেবে-চিন্তে মাথা নাড়ল মিষ্টি। হয় না বটে।

—আর পাত্র মানে হল ছেলে, যে-ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে। আর ঝি মানে হল মেয়ে—যে-মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে।

মিষ্টি ফোঁস করে উঠল, ঝি মানে কখখনো মেয়ে নয়।

বাপী তেমনি জোর দিয়ে বলল, হ্যাঁ মেয়ে। পিসীর কাছে শুনে আমি ডিকশনারী দেখে নিয়েছি, বিশ্বাস না হয় তুইও দেখে নিস। ঝি মানে ঝিও হয় আবার মেয়েও হয়।

এ-কথা শুনে মিষ্টি দমে গেল একটু। বলল, ঝি মানে মেয়ে হলেই বা মা আমাকে ঘর থেকে যেতে বলবে কেন?

—তোর বিয়ে নিয়ে হ্যাঙ্গামা আছে বলে। বাপী গম্ভীর!—পচা চালের মতো একটা বাজে ছেলের হাতে পড়বি তুই।

—কখ্খনো না। পীর সাহেব তো বলেছে, আমার অনেক লেখা-পড়া হবে, চেহারা আরো ঢের সুন্দর হবে, অসুখ করবে না, শরীর ভালো থাকবে—তাহলে খারাপ ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে কেন?

অনেক-জানার মতো মুখ করে বাপী হাসতে লাগল। বলল, ওই জন্যেই তো এই শোলকটা রে! তোর পীরসাহেব বলেছে, যত ভালো মেয়েই হোক, সে-রকম ভালো ছেলের সঙ্গে যদি বিয়ে দিতে না পারো তাহলে পচা চালে ভালো ঘি ঢালার মতো হবে সেটা। বুঝলি?

বুঝেও গোঁ-ভরে মিষ্টি বলল, বাবা ঠিক দেখেশুনে ভালো ছেলের সঙ্গেই বিয়ে দেবে আমার—

বাপীর মুখের হাসি আরও প্রশস্ত হল।—তুই আচ্ছা বোকা, তোর বাবাও কি গণৎকার নাকি যে আগে থেকেই ছেলের সব জেনে ফেলবে! ভয় না থাকলে পীরসাহেবের মতো এত বড় গণৎকার এ-কথা বলবে কেন, আর তোর মা-ই বা তোকে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে সরিয়ে দিতে চাইবে কেন! পরিতুষ্ট বাপী ওর হাতে বড়সড় চাপ দিল একটা। অকাট্য যুক্তির মুখে পড়ে মিষ্টি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বেশ রাগ হচ্ছে। একে হাসছে তায় হাতের ওপর হামলা।

—বোলতার চাক কই?

বাপী থতমত খেল একটু। চারদিকে তাকালো একবার।—কোন্ গাছটায় দেখেছিলাম ঠিক মনে পড়ছে না...একটু খুঁজলেই পেয়ে যাব।

এক ঝটকায় মিষ্টি নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল।—মিথ্যেবাদী, মিথ্যেবাদী! সঙ্গে সঙ্গে যে-দিক থেকে এসেছে সেইদিকে ছুট্।

মৌচাক জঙ্গলের কোথাও না কোথাও আছেই। একটা ছেড়ে অনেক আছে। কিন্তু একটাও দেখে রাখা হয় নি বলে বাপী মনে মনে পস্তালো একটু। ছুটে গিয়ে আবার ওকে চেপেচুপে ধরার লোভ। কিন্তু ধরতে পারলেও আজ আর ফেরানো যাবে না।...ওর ফুটফুটে নরম-গরম হাতটা এতক্ষণ নিজের হাতের মধ্যে ছিল, বেশ লাগছিল।

হৃষ্ট মুখেই বাপী এবার আর একজনের সন্ধানে চলল। বয়সে ছ বছরের তফাৎ হলেও এখানে প্রাণের দোসর একজনই।

আবু রব্বানী।

ওই রব্বানীর সে একনিষ্ঠ ভক্ত বললেও বেশী বলা হবে না। তার একান্ত কাছে থাকার ফলে বাপীর ইদানীং কত দিকে জ্ঞান বাড়ছে তা নিজেই অনুভব করতে পারে। বাপীর বিবেচনায় আবুর মতো মরদ তামাম বানারজুলিতে আর দুটি নেই। আবুরও ওর ওপর অকৃত্রিম স্নেহ। তার কারণ আছে। বীটম্যান হবার আশায় বানারজুলির এত বড় রিজার্ভ ফরেস্টের স্থানীয় সর্বেসর্বা রেঞ্জ অফিসারের মেমসাহেবটিকে আবু নানানভাবে তোয়াজ তোষামোদ করে চলেছে বটে। ঝুড়ি ভরতি ফিকে পীত-রঙা শাল ফুল অথবা টকটকে লাল পলাশ দিয়ে আসে, আম জাম জামরুল পেয়ারা খেজুর নিয়ে যায়, বুনো মুরগী বা খরগোশ মারতে পারলে মেমসাহেবকে ভেট দিতে ছোটে। কিন্তু চাকরিটা একবার হয়ে গেলে ওর সমূহ মনিব কেরানীবাবু অর্থাৎ বাপীর বাবা হরিবাবু। তাই বাপীর সঙ্গে খাতির রাখাটা তার দরকারও বটে। কিন্তু আবুর অকৃত্রিম স্নেহটাই বড় করে দেখে বাপী।

—আরে থো থো—আল্লার খবর মোল্লায় রাখে!

বাপীর মুখে গণৎকার পীর বক্স-এর সমাচার শুনে বাঙাল টান দিয়ে ওই মন্তব্য করেছিল আবু রব্বানী। বিশেষ করে মিষ্টির বি-এ. এম-এ. পাশ করে মস্ত বিদুষী হওয়ার সম্ভাবনাটা এক ফুঁয়ে বাতিল করে দিয়েছিল সে। বলেছে, বি-এ. এম-এ. দূরে থাক, ওই মেয়েকে ম্যাট্রিকও পাশ করতে হচ্ছে না বলে দিলাম।

আবু নিজে অনেক বছরের চেষ্টায় ক্লাস সিক্স থেকে সেভেনে প্রমোশন না পেয়ে পড়া ছেড়েছে একথা একবারও মনে হয় না বাপীর। সত্যিকারের বিস্ময় নিয়ে শুধিয়েছে, কেন বলো তো—মেয়েটা তো ওদের ক্লাসে ফার্স্ট হয়।

—ফার্স্ট হোক আর লাস্ট হোক, এই পীর যা বলে শুনে রাখ্।

শুনে রাখার মতোই কথা বটে। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু বেশি পড়াশুনা কেন হবে না বলো না?

আবুর মুখে সবজান্তা হাসি। তোর কোনো বুদ্ধি যদি থাকত! এই বয়সেই চেহারাখানা দেখছিস না মেয়েটার, ষোল-সতের বছরের ডবকা বয়সে এই মেয়ের চেহারাখানা কি রকম হতে পারে চোখ বুজে ভেবে দেখ দিকি? ভেবেছিস? ভালো করে ভাব—

বাপী সঠিক ভেবে উঠতে পারল না। তবে একটা সম্ভাব্য আদল চোখে ভাসল বটে। কিন্তু কি বলতে চায় বোঝেনি তখনো। মাথা নাড়ল। ভেবেছে!

আবু এবার ব্যাখ্যা শোনালো। সেই বয়সে কোনো কোনো বড়লোকের ছেলের চোখ পড়বেই ওর ওপর। বিয়ে করে ঘরে এনে পুরবে, তারপর লুটেপুটে শেষ করবে। বি-এ. এম-এ. পাস করার ফুরসৎ মিলবে কোত্থেকে?

হাঁ করে বাপী আবুর মুখখানাই দেখছিল। মগজে এত বুদ্ধিও ধরে ও!

রাস্তার পাশে জ্যোতিষীর জানালা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ওই মা মেয়েকে অপলক চোখেই দেখে নিয়েছিল বাপী তরফদার। তারপর শুধু মেয়েকেই চেয়ে চেয়ে দেখেছে। ওই মা পাশে না থাকলে হঠাৎ দেখে চিনতে পারত কিনা সন্দেহ। জ্যোতিষীর সামনে মিষ্টি টান হয়ে বসে ছিল। ডান পা-টা পিছনে মোড়া। জ্যোতিষীর দিকেই চেয়ে ছিল সে।

জানালা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে স্থানকাল ভুলে বাপী তরফদার ওকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখেছে। মাথা...কপাল...নাক কান চোখ মুখ...গলা...কাঁধ বুক।

এক পা পিছনে মুড়ে বসার ভঙ্গী...বুক থেকে কোমরের নীচে পর্যন্ত ঈষৎ স্থির যৌবনরেখা...একটু নড়লে-চড়লে সেই রেখাগুলোও নড়া-চড়া করেছে।

নিজের অগোচরে মনে মনে একটা হিসেব সেরে নিয়েছে বাপী তরফদার। আবু রব্বানীর সেই ভবিষ্যদ্বাণী এখন পর্যন্ত ঠিক হয়নি। ঠিক ন' বছর আগের কথা...মিষ্টির বয়েস এখন আঠারো। কিন্তু এখন পর্যন্ত কপালে বা সিঁথিতে সিঁদুরের আঁচড় নেই।

গাল দুটো আগের মতো ফোলা-ফোলা নয়। মেদ-ঝরা টানা মুখ। আগের তুলনায় আরো আয়ত চোখ। গায়ের রঙও আগের থেকে ঢের বদলেছে, অনেক কম ফর্সা মনে হয়। কিন্তু এই রঙের মধ্যে আদুরে ভাব থেকে তাজা ভাব বেশি।

নির্নিমেষে দেখছিল বাপী তরফদার। তার এই দেখাটা বাইরের প্রতীক্ষারত অন্য মেয়ে-পুরুষদের চোখে বিসদৃশ লাগছিল সে হুঁশ নেই। মা-মেয়ে যখন উঠেছে, বাপী তরফদার আত্মস্থ নয় তখনো। অনাবৃত অপলক দু চোখ মিষ্টির সর্বাঙ্গে ওঠা-নামা করেছে।

তারা বেরিয়ে আসতে বাপী তাদের দু'হাতের মধ্যে এসে মা কে ছেড়ে মেয়েকেই দেখেছে। দেখেনি, দুই চোখের বাঁধনে তাকে আটকে রাখতে চেয়েছে। চিনতে পারার কথা নয়, দুজনের কেউই চিনতে পারেনি। অস্ফুট ঝাঁজে 'স্টুপিড' বলে মেয়ের হাত ধরে মা গাড়িতে উঠেছে। মেয়েরও বিরক্তিমাখা লালচে মুখ। মৃদু শব্দ তুলে সাদাটে গাড়িটা চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। পিছনের লাল আলোয় গাড়ির নম্বরের ওপর চোখ আটকেছে বাপী তরফদারের।

সেই দিকে চেয়ে ন' বছর নয়, নিজের অগোচরে আটটা বছর পিছনে পাড়ি দিয়েছে বাপী তরফদার।...ওর বয়েস যখন চৌদ্দ।...মিষ্টির দশ।

হঠাৎ জিভে করে নিজের শুকনো দুই ঠোঁট ঘষে নিল বাপী তরফদার। আট বছর আগের সেই আঘাতের চিহ্ন নেই—কিন্তু জিভে নিজের দেহের সেই তাজা রক্তের নোনতা স্বাদ!...এক মেয়েকে কেন্দ্র করে আট বছর আগে অপরিণত বয়সের ছেলের সেই প্রবৃত্তির আগুন বাইশ বছরের এই দেহের শিরায় শিরায় হঠাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আবার।

আবছা অন্ধকার শূন্য পথের দিকে চেয়ে দু চোখ ধক্‌ধক্ করছে প্রবৃত্তির ক্রুর আদিম অভিলাষে।

## তিন

শীতের রাত বাড়ছে। পথে লোক চলাচল নেই বললেই চলে। বাপী ঠায় দাঁড়িয়ে। গায়ে শার্টের ওপর শুধু একটা আলোয়ান। কাঁপুনি ধরার কথা। কিন্তু ভিতর থেকে একটা উষ্ণ তাপের ওঠা-নামা চলেছে তখনো। একেবারে বুকের পাতাল থেকে। বাইরের ঠাণ্ডা চামড়ায় বিঁধলেও টের পাচ্ছে না। বাইরের জানালা দিয়ে দু চোখের এক-একটা উষ্ণ ঝাপটায় জ্যোতিষীর সামনে বসা শেষ লোকটাকে তুলে দিতে চাইছে।

জ্যোতিষীর অপেক্ষায় বাইরে তখন একমাত্র বাপী তরফদার ছাড়া আর কেউ দাঁড়িয়ে নেই। হাতের কবজিতে পুরনো আমলের ঘড়ি বাঁধা আছে একটা। সেটা চলছে। রাত দশটা বেজে দশ।

ভবিতব্য জানার আশ মিটিয়ে শেষ লোকটা উঠল। বাপী তরফদারের স্নায়ুগুলো টান-টান আবার। লোকটা বেরিয়ে আসতে সে ঢোকার জন্য প্রস্তুত। দেখতে না পেলেও নিজের চোখ-মুখের খরখরে ভাবটা অনুমান করতে পারছে। ভিতরে ঢোকার আগে সেটা মোলায়েম করে নেবার তাগিদ।

ঘর ফাঁকা হবার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষী ভদ্রলোক নিজের ভাগ্য যাচাইয়ে মনোনিবেশ করেছে। সামনের এক-হাত প্রমাণ কাঠের বাক্সটা খুলে ভিতর থেকে এক মুঠো নোট বার করে ওটার ওপর রাখতে যাচ্ছিল। মুখ তুলে তাকাল এবং সঙ্গে সঙ্গে নোটগুলো আবার কাঠের বাকসের ভিতরে চালান করল। একই সঙ্গে পাশের গোল পকেট ঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল?

বাপী তরফদার মাথা নাড়ল। ছিল না। আর কিছু বলার আগে ভদ্রলোকও মাথা নাড়ল।—অনেক রাত হয়ে গেছে, আজ আর হবে না।

প্ল্যানমাফিক বাপী তরফদার সবিনয়ে বলল, আমি শুধু একজনের ঠিকানা জেনে নেবার জন্য অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করছি...মিসেস মনোরমা নন্দী, আজ তাঁর এখানে আসার কথা ছিল...আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল, জানা থাকলে ঠিকানাটা দয়া করে যদি বলেন...

ভদ্রলোকের গোল দু'চোখ তার মুখের ওপর আটকে থাকল খানিক। তারপর আপাদ-মস্তক ওঠা-নামা করল।—তাঁদের এখানে আসার কথা ছিল আপনি জানলেন কি করে?

সন্দেহ এড়ানোর জন্যেই শুধু মনোরমা নন্দীর নামটা করেছিল। মালবিকা বা মিষ্টির নাম করে নি। তবু ভদ্রলোকের চাউনি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে সেটা অনুভব করা গেল। আমতা-আমতা করে জবাব দিল, বিকেলে ফোনে কথা হয়েছিল...তখন বলেছিলেন—

—ফোন নম্বর জানা আছে, বাড়ির ঠিকানা জানা নেই?

বাপী তরফদার মাথা নাড়ল। জানা নেই।

মুখের ওপর সন্দিগ্ধ চাউনিটা কঠিন হয়ে উঠতে লাগল।—কি মতলব?

—আজ্ঞে...?

—আমি দু ঘণ্টা আগেও তোমাকে ওই জানলার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। ভদ্রমহিলার ঠিকানা চাই কেন? কি মতলব?

ভিতরের উত্তেজনার ফলে এ-রকম বিপাকে পড়ার কোন সম্ভাবনা অন্তত মাথায় আসে নি। এখন ছুটে পালাতে চাইলেও চেঁচামেচি করে লোক ডাকবে কিনা কে জানে। এই তিনতলা বাড়ীর একতলায় বসে জ্যোতিষী করে। ডাকলে ভিতর থেকে কতজন ছুটে আসবে ঠিক নেই। কোণঠাসা হয়ে জবাবদিহি করল, ভদ্রমহিলাকে হঠাৎ এখানে দেখে তাঁর স্বামীর কাছে একটা চাকরির তদ্বিরের জন্য ঠিকানা খোঁজ করছিলাম...অনেক-কাল আগে উত্তরবঙ্গে থাকতে ওঁরা আমাকে চিনতেন...

আরো রূঢ় স্বরে জ্যোতিষী জিজ্ঞাসা করল, ওঁর স্বামীর নাম কি?

—সন্দীপ নন্দী...উত্তরবঙ্গে বানারজুলি রিজার্ভ ফরেস্টের রেঞ্জ অফিসার ছিলেন এক সময়...বড় দুঃসময় চলছে তাই একটু চেষ্টা করার ইচ্ছা ছিল—-

এবারে বিশ্বাসযোগ্য হল বোধহয়। শীতের রাতের এই বেশবাস বিশ্বাসের অনুকূল। ভদ্রলোকের ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস দেখা গেল। ভাঁওতাবাজী ধরে ফেলার মতই পাকা জ্যোতিষী। বলল, কোন মহিলার ঠিকানা জানার জন্য এভাবে আর কখনো কোথাও ঢুকে পড়ো না—ওঁর স্বামী কলকাতায় থাকেন না। যাও।

বেরিয়ে এল। এর পরেও উত্তেজনার উপশম হল না একটুও। মনে মনে জ্যোতিষীর মুণ্ডপাত করতে করতে ঘরের দিকে পা বাড়াল। ওই মেয়েকে আবারও দেখার তাড়না ভিতরে একটা যন্ত্রণার মত ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকল। সেই যন্ত্রণার তাপ বুকের পাঁজর থেকে মাথার দিকে উঠছে। জ্যোতিষীর জানলা দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখেছে মিষ্টিকে, আর বাইরে বেরুনোর পর সামনে দাঁড়িয়েও দেখেছে। এই দেখার বিশ্লেষণে ফাঁক ছিল না বড়। আগের সঙ্গে মেলে না। মাথায় লম্বা হয়েছে বেশ। স্বাস্থ্যও লোভনীয় রকমের নিটোল ছাঁদ নিয়েছে। ফোলা গাল ভেঙে অন্য ধাঁচের পরিণত আকার নিয়েছে। গায়ের রঙে তাজা তামাটে প্রলেপ পড়েছে। সব মিলিয়ে মিষ্টিকে তীক্ষ্ণ মনে হয় এখন। রূপ

নয়, এর থেকে ঢের রূপসী কলকাতায় এ ক'মাসে সে অনেক দেখেছে। সন্ধ্যার দিকে যে-কোন অভিজাত বার-রেস্তরাঁর সামনে দাঁড়ালে দু-চারটি অন্তত রূপসী মেয়ে চোখে পড়েই। বড় গোছের যে-কোন সোস্যাল ফাংশান ভাঙলেও চোখে পড়ে। ভিতরের সুপ্ত বাসনা অনেক সময়েই তাকে ওসব জায়গায় টেনে নিয়ে যায়। পকেটে পয়সার টান। হিসেবী মন বাজে খরচের ঝোঁকে বিক্ষিপ্ত হয় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক-একদিন শুধু বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে। দেখে। এই গোপন অশালীন দেখার খবর একমাত্র সে নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না। সে-তুলনায় এই রূপ এমন কিছু নয়। কিন্তু এই রূপের মধ্যে এমন কিছু আছে যা পুরুষের বিশ্লেষণের বস্তু, আবিষ্কারের বস্তু। এই বিশ্লেষণ অথবা আবিষ্কার দীর্ঘকালের জমাট-বাঁধা লোভ আর যন্ত্রণার ফল কিনা জানে না। জানতে চায়ও না। অপ্রত্যাশিতভাবে যার দেখা পেল আজ, তার সমস্ত খুঁটিনাটি দু চোখের তারায় আগলে নিয়ে পথ চলেছে।

মগজে সাদাটে গাড়ির নম্বরটা ঘুরপাক খাচ্ছে।

রাত প্রায় এগারোটা। টালি-এলাকায় শীতের নিঝুম রাত। রাস্তার ধারে লাইটপোস্টের ঝিমুনো আলোয় ভিতরে ঢোকার সরু গলি-পথ দেখা যাচ্ছে। বাপী তরফদার নিঃশব্দে ভিতরে সেঁধিয়ে গেল। অন্ধকার সত্ত্বেও আন্দাজে ঠিক নিজের খুপরির দরজা ঠেলে অন্দরে ঢুকে যেতে পারবে। কিন্তু ভেতরটাও খুব অন্ধকার নয়। ওপর থেকে খানিকটা জ্যোৎস্না এক ধারের টালি বেয়ে উঠোনে লুটোপুটি খাচ্ছে।

কোন দিকে না তাকিয়েই বাপী তরফদার তার খুপরি ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। তার পরেই বিষম চমক। পাশের ঘরের দরজা দুটো খোলা। দরজার ওধারে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে রতন বণিকের ঘুমকাতুরে বউ কমলা। মুখ-চোখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তাহলেও সাদা চাদর জড়ানো ওই মূর্তি ভুল হবার নয়।

চোখের পলকে বাপী তরফদার নিজের খুপরির দরজা ঠেলে ভিতরে চলে এলো। ক্যাঁচ করে শব্দ হল একটু। আবার বন্ধ করার সময়েও সেই শব্দ। জোরে না হলেও ওই শব্দ রাতের এই নিঝুম স্তব্ধতা ভেঙে দেওয়ার মতো বিরক্তিকর। দরজা বন্ধ করে ঘরের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে রইল বাপী। এতক্ষণে শীতটা ছেঁকে ধরেছে তাকে। একটা ঠাণ্ডা অনুভূতি পা বেয়ে বুকের হাড়ের দিকে এগোচ্ছে। মিনিট খানেক বাদে পাশের ঘরের দরজা বন্ধ করার আর হুড়কো লাগানোর মৃদু শব্দ কানে এলো।

এবারে ঠাণ্ডার ভাবটা কমতির দিকে। অবসন্ন শরীরটা দেয়াল-ঘেঁষা দড়ির খাটিয়ার কাছে টেনে নিয়ে এলো। বসল। গায়ের আলোয়ান খুলে পায়ের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর জামাসুদ্ধই কম্বলের নিচে ঢুকে গেল।

বিকেল থেকে এই রাত পর্যন্ত আজ অনেক মাইল হাঁটা হয়েছে। স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড ধকল গেছে। রাতে কিছু খেয়ে নেবার কথা মনেও পড়ে নি। কম্বলের তলায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল দু চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে।

বাপী তরফদার জানে এই সন্ধ্যেটা আর এই রাতটা অনেকগুলো বছরের অনেকগুলো সন্ধ্যা থেকে আর রাত থেকে এত তফাৎ হয়ে গেছে যে খানিকক্ষণের মধ্যেই অবসন্ন স্নায়ুগুলো আবার টান-টান হয়ে উঠবে। কিন্তু মনে-প্রাণে এখন সে ঘুমের

অতলে ডুবে যেতে চায়। মড়ার মতো নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়তে চায়।

দরজার পরিচিত শব্দটা কানে এলো যখন, অন্য দিনের মতোই বাপী তরফদারের আপাদমস্তক কম্বলের নিচে। কিন্তু আজ সে রাত থাকতে উঠে মুখহাত ধুয়ে আবার শয্যায় আশ্রয় নিয়েছে।

—বড়বাবু ঘুমিয়ে না জেগে?

কম্বলের তলা থেকে গলার স্বরটা ভারী-ভারী ঠেকল কানে। কম্বল বুকের নিচে নামিয়ে বাপী সোজা কমলার মুখের দিকে তাকালো। ঘুম-ভাঙা ফোলা-ফোলা মুখ আঁচলের ঘোমটায় কান মাথা গলা বেড়িয়ে আধখানা ঢাকা। ভিতরেও আজ পাতলা ব্লাউস নয়, একটা গরম জামা পরেছে। তার ওপর দিয়ে আঁট করে শাড়ি জড়ানোর ফলে শরীরটাও ফোলা-ফোলা লাগছে।

বাপী আস্তে আস্তে উঠে বসল। নির্লিপ্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, ঠাণ্ডা লাগালে কি করে?

অনেকটা সেই রকমই নির্লিপ্ত ঢংয়ে কমলা ফিরে জিজ্ঞাসা করল, ঠাণ্ডা লেগেছে তুমি বুঝলে কি করে?

—গলার আওয়াজ শুনে, তাছাড়া ঢাকাঢুকি দিয়ে এসেছ—

তার চোখের ওপর কমলার দু চোখ আকারে বড় হতে থাকল। তারপর রাগত সুরে বলল, দেখো, সাতসকালে গোপাল ঠাকুরের রঙ্গও ভাল লাগে না বলে দিলাম...ঢাকাঢুকি না দিয়ে কবে তোমার সামনে এসেছি?

সকালের ঠাণ্ডা সত্ত্বেও ঝাঁ করে দু কান গরম হয়ে উঠল বাপী তরফদারের। তাড়াতাড়ি ওকে বিদায় করার জন্যেই চায়ের গেলাসের দিকে হাত বাড়ালো।

—মুখ ধোয়া হয়েছে?

—হয়েছে।

সত্যি-মিথ্যে যাচাইয়ের চোখে একবার দেখে নিল।—কখন হল?

—কারো ওঠার আগেই হয়েছে, দাও।

গেলাস আর নুন-মাখানো গরম রুটি দুটো সামনে এগিয়ে দিয়ে ঠেসের সুরে কমলা বলে উঠল, দরজায় আওয়াজ শুনেও তাহলে কম্বলের তলায় ঢুকে ছিলে কেন?

বাপী তরফদার জবাব দিল না বা তার দিকে তাকালো না। রাতের নির্জলা উপোসের পর গরম চা আর নুন-ছড়ানো গরম রুটি অমৃতের মতো লাগছে। সকালে চায়ের সঙ্গে রুটি হলে সে চিনি-গুড়ের থেকে নুন পছন্দ করে।

কমলা ত্রস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল। কারণ না বুঝলেও বাপী তরফদার স্বস্তিবোধ করল একটু। কিন্তু দু মিনিটের মধ্যেই দ্বিগুণ বিরক্ত। শাড়ির আঁচলে নিজের চায়ের গরম গেলাস ধরে আবার এ-ঘরে হাজির। চোখের কোণে কৌতুকের ছোঁয়ায় শ্যামবর্ণ মুখ সরস দেখাচ্ছে।

দু চুমুক তল করে বলল, বুড়োটা ঘুমোচ্ছে এখনো, ঠাণ্ডার চোটে উঠে পড়ে আজ এক ঘণ্টা আগে চা বানিয়েছি। তুমি চায়ের পিত্যেশে বসে আছ জানলে আরো আগেই করে দিতে পারতাম। বলতে বলতে একটা হাত পিছন দিকে নিয়ে দরজার একটা পাট বন্ধ করে দিল। তারপর সেদিকের দেয়ালে আড়াল নিয়ে ফিক করে হাসল একটু—তোমার

ঘরে এসে গল্প করতে করতে চা খেতে দেখলে কার চোখে আবার কাঁটা বেঁধে ঠিক কি।

কাল রাতে নিজের ঘরের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকাটা ভুলতে পারেনি। আজ এই দিনমানেও ওকে দেখে অস্বস্তি। চাপা বিরক্তির সুরে বাপী বলল, আমার ঘরে এসে চা খাওয়ার দরকারটা কি।

চায়ের গেলাস মুখে তুলেছিল। সেটা ঠোঁটে ঠেকিয়ে রেখেই হাসি আড়াল করল। —গোপাল ঠাকুরের মনে এক মুখে এক—হুঃ। বড় বড় তিন চার ঢোক চা গিলে নিল। তারপর টেনে টেনে বলল, বড়বাবুর কি সাঁঝের টাইমে কোনো ডিউটি-টিউটি জুটেছে নাকি?

—না। নিজের গেলাস খাটিয়ার সামনে মেঝেতে নামিয়ে রাখল।

—তবে কাল রাতে ফিরতে এত দেরি হল?

এবার সত্যি সত্যি ধমকে উঠল বাপী তরফদার।—দেরি হল তো হল—কেন দেরি হল সে জবাবদিহি তোমার কাছে করতে হবে?

গেলাসের চা শেষ করে মুখখানা আর একবার ভালো করে দেখে নেওয়া দরকার বোধ করল কমলা। ঝাঁজালো ব্যঙ্গ ঝরল তার গলাতেও।—সাধে বড়বাবু বলি! নুন রুটি দিয়ে দিন শুরু তবু মেজাজ কতো! রাত-দুকুর পর্যন্ত হাট-করা খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ঠাণ্ডা লাগালাম, সকালে তাই নিয়ে উঠে চা করে খাওয়ালাম—লজ্জাও করে না মুখ নেড়ে কথা বলতে!

বলতে বলতে এক-পাট খোলা দরজা ভুলে যেভাবে কাছে এগিয়ে এলো, মুহূর্তে দিশেহারা অবস্থা বাপী তরফদারের। কিন্তু না, টুপ করে উপুড় হয়ে তার খাওয়া গেলাসটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে দু চোখে এক-ঝলক মেকি আগুন ছড়িয়ে প্রস্থান করল।

বাপী তরফদার পঙ্গুর মতো বসে রইল। তারপর আত্মস্থ হল।...হ্যাঁ, মুখ নেড়ে কথা বলতে লজ্জা করে। আগেও করেছে, এখনো করে। তাই কথা বেশি বলে না, বলতে চায় না। কিন্তু এখন অন্যায় থেকে বেশি করে ভয়। ভয় কমলাকে। তার থেকে ঢের বেশি নিজেকে।

...বানারজুলিতে সোমত্ত বয়সের দু-ঘর সাপুড়ে মেয়ে ছিল। ননদ-ভাজ সম্পর্ক। একজনের মরদ দিন-রাত নেশা করে পড়ে থাকত। আর একজনের মরদের দুটো চোখই বসন্তের গুটিতে খেয়ে দিয়েছে। সেই ননদ-ভাজ একসঙ্গে দু'তিনটে ঝাঁপিতে সাপ পুরে নিয়ে গ্রামে শহরে সাপের খেলা দেখিয়ে বেড়াতো। গাল ফুলিয়ে পেটমোটা সাপুড়ের বাঁশি বাজিয়ে যেত ঘাগরা-পরা মেয়ে দুটো। কিছু পয়সা মেলার মতো ভিড় দেখলেই সাপের ঝাঁপি খুলে বসত তারা। হরেক রকমের সাপ বের করত। বাঁশি বাজাতো আর সাপের খেলা দেখাতো। কিন্তু অবাক চোখে বাপী ওই মেয়ে দুটোকেই বেশি দেখতো। হাঁটু গেড়ে বা হাঁটু মুড়ে বসে বসে ফণা-তোলা সাপের মতোই সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে কোমর-বুক-মাথা দোলাতো তারা। ওই করে সাপকে উত্তেজিত করতে চাইত। শুধু তাই নয়, সাপের ছোবল খাবার জন্য অঙ্গ যেন চিড়-চিড় করত তাদের। ফণা-তোলা সাপের সামনে ভুঁয়ের ওপর হাত পেতে দিত। ছোবল পড়ার আগেই চোখের পলকে হাত সরিয়ে নিত, মাটির উপর ছোবল পড়ত। এই করে যতবার ওরা সাপকে

ঠকাতে পারতো ততো ওদেরও উত্তেজনা বাড়ত। কিন্তু ক্রুদ্ধ সাপের ছোবল একবার না একবার হাতের উল্টো পিঠে বা আঙুলের মাথায় পড়তই। সঙ্গে সঙ্গে দরদর করে রক্ত বেরুতো। ওরা তখন থলে থেকে কি পাতা বার করে দাঁতে চিবিয়ে সে-পাতা ক্ষতর ওপর লাগিয়ে দিত। ছোবল খাবার পরে উত্তেজনার শেষ।

..কমলাও অনেকটা সেই সাপুড়ে মেয়ে দুটোর মতোই। সাপকে দখলে রেখে উত্তেজনা বাড়িয়ে ছোবল খাওয়ার লোভ। কিন্তু সাপুড়ে মেয়েদের সাপের মতো নিজেকে নির্বিষ ভাবে না বাপী তরফদার। তাই কমলার থেকেও নিজেকে বেশি ভয়।

কিন্তু গত সন্ধ্যা থেকে তার ভিতরে ভিতরে সাপের মতোই এক বিষ-বাষ্প কুণ্ডলী পাকাচ্ছে, গজরাচ্ছে, ফুঁসে উঠে ছোবল বসাতে চাইছে। এই অকরুণ অব্যর্থ সন্ধানী লক্ষ্য আর এক মেয়ে। নাম মিষ্টি। মালবিকা...।

বানারজুলির সবজান্তা আবু রব্বানী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, ষোল-সতের বছর বয়সে মিষ্টির চেহারাখানা যা হবে, কোনো না কোনো বড়লোকের ছেলের চোখ পড়বেই ওর ওপর—বিয়ে করে ওকে ঘরে এনে পুরবে, তারপর লুটেপুটে শেষ করবে—বি.এ., এম. এ., পাস করার ফুরসৎ মিলবে কোত্থেকে?

হিসেবে ভুল হবার নয় বাপী তরফদারের। নিজের বয়েস চৌদ্দ আর আটে বাইশ। মাস দেড়-দুই বেশি হতে পারে। ওই মেয়ের দশ আর আটে আঠের। সেই চৌদ্দ আর সেই দশ থেকে আটটি বছর সামনে পা ফেলেছে তারা। কিন্তু বাপীর একটা সত্তা চৌদ্দর সেই অবুঝ দুরন্ত রক্তাক্ত গণ্ডীর মধ্যে আটকে আছে এখনো। আর এই মেয়ের সবটাই সেই দশের গণ্ডী টপকে ভরভরতি আঠেরোয় পা ফেলে জাঁকিয়ে বসেছে। অতীতের ছিটে-ফোঁটাও তার গায়ে লেগে নেই। আবু রব্বানীর ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক হয়নি। ভরাট সময়ের যে রূপ রব্বানীর কল্পনায় ছিল সেটা এ-চেহারার সঙ্গে আদৌ মিলবে না এ বাপী হলপ করে বলতে পারে। তার থেকে ঢের ভালো কি ঢের খারাপ জানে না। মোট কথা মেলেনি, মিলবে না। কোনো বড়লোকের ছেলের চোখ পড়েছে কিনা জানে না, কিন্তু কেউ ঘরে এনে পুরতে পারেনি এখন পর্যন্ত। সাদা সিঁথিই তার প্রমাণ। বাপী তরফদার আরো হিসেব করেছে। এম্. এ. পড়ার বয়স এখনো হয়নি, কিন্তু এযাবৎ ফেলটেল যদি না করে থাকে তো এতদিনে বি.এ., পড়া শুরু করা উচিত।

একটা অসহিষ্ণু তাড়নায় বেলা এগারোটার মধ্যে স্নান-টান সেরে বেরিয়ে পড়ল। শুধু মোটর গাড়ির নম্বরটা সম্বল। শহর কলকাতার শত সহস্র গাড়ির মধ্যে সেই নম্বরের সাদাটে গাড়িটাকে খুঁজে বার করার চিন্তাও হাস্যকর পাগলামি। কিন্তু আট বছর পরের এই হঠাৎ-দেখাটা হঠাৎই শেষ একেবারে, এরকম চিন্তা বাপী বরদাস্ত করতেও রাজী নয়।

এক জায়গায় বেশ করে খেয়ে নিল। অনেক দিন বাদে নিজেকে সুস্থ আর তাজা রাখার তাগিদ। খেয়েদেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে একটা বড় কিছুর মুখোমুখি দাঁড়ানোর প্রস্তুতি। আজ আর পা দুটো কোনো আপিসপাড়ার দিকে এগোতে রাজি নয়। গত সন্ধ্যার পথ ধরে হাঁটা শুরু করল। জ্যোতিষীর একতলা ঘরের বাইরের দরজা বন্ধ। খোলা থাকলেও সেখানে ওই বাঞ্ছিত মুখ আজও চোখে পড়বে এমন আশা বাতুলে করে।

জ্যোতিষীর ঘর ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল বাপী তরফদার। অপ্রত্যাশিত হদিস মিলবে

এরকম আশা করছে না বটে, কিন্তু রাস্তার দুদিকের একটা বাড়িও তার শ্যেন দৃষ্টি থেকে অব্যাহতি পাচ্ছে না। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তাটা ফুরিয়ে গেল একসময়। বেঁকে গিয়ে ট্রাম লাইনের বড় রাস্তায় এসে মিশেছে। সামনে ব্রীজ। একটা রাস্তা গেছে তার তলা দিয়ে। আর একটা রাস্তা ট্রাম লাইন পেরিয়ে লেক-এর দিকে।

গলা দিয়ে অস্ফুট একটা গালাগাল বেরিয়ে এলো। বড় রাস্তার বাস স্টপের কাছে চুপচাপ খানিক দাঁড়িয়ে রইল বাপী তরফদার। মাঝখানের ট্রাম লাইন ধরে ট্রাম আসছে যাচ্ছে। এক-একটা করে মানুষ বোঝাই বাস এসে দাঁড়াচ্ছে আবার চলে যাচ্ছে। মোটর ছুটেছে অবিরাম। সাদাটে রঙের গাড়ি দেখলে দু চোখ সেটার গায়ে আটকাচ্ছে। সব-কিছুই দেখছে বটে, কিন্তু আসলে সে ভেবে চলেছে।

হঠাৎই মাথায় এলো কিছু। চেষ্টার নাম পুরুষকার। দেখা যাক। সামনে যে বাস পেল তাতেই উঠে পড়ল। সব বাসই ডালহৌসি যায় এ-সময়। গাড়ির নম্বর থেকে বাড়ির হদিশ মেলা সম্ভব কিনা বন্ধু নিশীথ সেন সেটা বলতে পারে। নিশীথের বাবা মধ্য কলকাতার মাঝারি নাম-ডাকের কবিরাজ। নিজের আয়ুর্বেদ ফার্মেসি আছে। তাঁর ঝরঝরে গাড়ি আছে একটা। সেই গাড়িরও নম্বর আছে।

কলকাতায় বাপীর মোটামুটি দরদী বন্ধু বলতে ওই একজনই—নিশীথ সেন। ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে স্কুলে পড়েছে, একসঙ্গে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। বানারহাটে নিশীথ তার দাদুর কাছে থেকে স্কুলে পড়াশুনা করত। জলপাইগুড়ি থেকে আই-এসসি পরীক্ষার পর ছাড়াছাড়ি। নিশীথ আই-এসসি'র পর কলকাতায় বি-এ পাস করেছে। ছেলেকে মেডিক্যাল কলেজে পড়ানোর ইচ্ছে ছিল বাপের। কিন্তু আই-এসসি'র ফল দুই দাঁড়ির নিচের দিকে ঠেকতে সেটা সম্ভব হয় নি। বি-এ পাস করার সঙ্গে সঙ্গে ও একটা যুদ্ধের আপিসের চাকরিতে ঢুকে পড়েছিল। এখনো সে চাকরিতে টিকে আছে, কিন্তু মাথার ওপর ছাঁটাইয়ের খড়্গ ঝুলছে। দুদিন আগে হোক পরে হোক ওটা নেমে আসবেই। তা বলে বাপীর মতো বেকার হবে না সে। বি-এ পড়ার সময় থেকে বাপের কাছে কবিরাজি চিকিৎসার তালিম নিচ্ছে। বাবার সঙ্গে বসে নানারকম কবিরাজি ওষুধ তৈরির কাজে হাত পাকাচ্ছে। রোজ সন্ধ্যার পরে আয়ুর্বেদ ফার্মেসিতে বাবার পাশের কাঠের চেয়ার দখল করে গম্ভীর মুখে ছোট কবিরাজ হয়ে বসতে দেখা যায় তাকে। ছুটির দিনে সকাল-বিকেল দু বেলাই বসে সেখানে। বাপের অনুপস্থিতিতে সে এখন দিব্যি ঠেকা দিতে শিখেছে। চাকরিটা নেহাৎ আছে বলেই ছাড়তে পারছে না। চাকরি গেলে আয়ুর্বেদের দুই-একটা দিশী টাইটেল জুড়ে পাকাপোক্ত কবিরাজ হয়ে বসবে।

নিশীথ সেন আপিসেই আসেনি আজ। আবার একটা গালাগাল বেরিয়ে এলো বাপীর ভিতর থেকে। এটা ছেলেবেলার অভ্যাস। অনেক রকমের কুৎসিত গালাগালও নিঃশব্দে ঠেলে বেরিয়ে আসে।

আবার কলেজ স্ট্রীটের বাস ধরল। কপালে আজ কিছু পয়সা গচ্চা লেখা আছে।

কলেজ স্ট্রীট ছাড়িয়ে আরো একটু উত্তরে এগোলে নিশীথের বাড়ি। বাড়ির কাছেই ওদের আয়ুর্বেদ ফার্মেসি। আগে সেখানে হানা দিল। দরজা বন্ধ, কিন্তু বাইরে তালা ঝুলছে না। অর্থাৎ ভিতরে কেউ আছে। বাপ আর ছেলে ভিন্ন আর কেউ এ দপ্তর খোলে না। এই বেলা দেড়টায় বাপের এখানে দরজা বন্ধ করে বসে থাকার সম্ভাবনা কম।

বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা দিল। সাড়া না পেয়ে দরজার গায়ে জোরে দু'চারটে চড়চাপড় বসালো। ভিতর থেকে দরজা খোলা হল।

কাঁচা ঘুম-ভাঙা মুখখানা বিরস দেখালো নিশীথের। হাই তুলে বলল, তুই মরতে এখানে এসে জুটলি—

—আপিস কামাই করে এখানে ঘুমুচ্ছিস?

—বাড়িতে থাকলেই বাবা কোনো পাঁচন বা সালসা বানাবার কাজে বসিয়ে দিত, এখানেও তুই দিলি ঘুমের বারোটা বাজিয়ে। বোস, খাবি কিছু?

এই বেঁটেখাটো ছেলেটার বুকের তলায় একটু নরম জায়গা আছে। এমনিতে বাস্তববুদ্ধি প্রখর। কিন্তু বেকার বন্ধুর প্রতি সদয়। চাকরির প্রথম ক'টা দিন ওর বাড়িতেই ছিল বাপী তরফদার। কিন্তু বন্ধুর প্রীতি বেশি, কি অনুকম্পা—জানে না।

বিরক্ত মুখ করে জবাব দিল, তুই ভাবিস আমি খালি খেতেই আসি তোর কাছে। এখন অন্য দরকারে এসেছি মন দিয়ে শোন, তোদের তো একটা গাড়ি আছে?

হঠাৎ গাড়ির খোঁজ কেন ভেবে না পেয়ে নিশীথ সেন শুরু থেকেই সতর্ক।—আছে একটা, কিন্তু তার ওপর বাবা ছাড়া আর কারো দখল নেই।

—আরে বাবা আমি তোদের গাড়ি চাইছি না; কোনো গাড়ির নম্বর যদি তোকে দিই তুই তার মালিকের ঠিকানা বার করে দিতে পারিস?

নিশীথ সেন অপ্রস্তুত একটু।—সে আবার কি—!

—আমার খুব দরকার। কাল হঠাৎ ভদ্রলোকের গাড়িটা দেখলাম, চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল, নম্বরটা মনে আছে, বাড়ির ঠিকানা বার করতে পারলে একটা চাকরি-বাকরি হতে পারে—

নিশীথ সেন জ্যোতিষী নয়, তাছাড়া পরিস্থিতিও সন্দিগ্ধ হবার মতো নয়। একটু ভেবে জিজ্ঞাসা করল, ভদ্রলোকের কোন্ আপিস বা কি চাকরি জানিস না?

জেরা পছন্দ নয়।—সে জানলে আর তোর কাছে আসব কেন, বড় চাকরিই করে নিশ্চয়, এককালে খুব চেনাজানা ছিল, ধরতে পারলে একটা সুরাহা হতে পারে।

—ভদ্রলোকের নাম কি? ফোন-গাইড দেখেছিস?

ভদ্রলোক বাপী তরফদারের চিন্তার মধ্যেও নেই বলেই তল্লাসীর এই প্রাথমিক রাস্তাটা মনে পড়ে নি।—সন্দীপ নন্দী...ফোন-গাইড আছে এখানে?

জবাব না দিয়ে নিশীথ সেন ঢাউস টেলিফোন গাইডটা টেনে নিল। সাগ্রহে খোঁজাখুঁজি চলল খানিকক্ষণ। দুজন সন্দীপ নন্দীর নাম পাওয়া গেল, কিন্তু বাড়ির ঠিকানা দক্ষিণ কলকাতার নয়। তাছাড়া তাদের একজন ডাক্তার আর একজন অ্যাডভোকেট। নন্দী এস-এর মধ্যে একগাদা নম্বর। ফোন-গাইড বন্ধ করে নিশীথ জিজ্ঞাসা করল, গাড়ির নম্বর ঠিক মনে আছে?

বাপী তরফদার গড়গড় করে নম্বর বলে দিতে সে একটু ভেবে মন্তব্য করল, মোটর ভেহিকিলস্-এ গেলে বাড়ির ঠিকানা বার করা যায়, অনেক দূর—

—সেটা কি? সেটা কোথায়?

—তোদের ও-দিকেই। সেখানে কলকাতার সমস্ত গাড়ির ঠিকানাপত্তর থাকে। কাল একবার খোঁজ করে দেখ না—

—কাল নয়, আজই। বাপী তরফদার সাগ্রহে উঠে দাঁড়াল।—আমার দ্বারা হবে না, চল আমি তোকে বাস ভাড়া দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, আবার পৌঁছেও দেব—

তাগিদ বোঝাবার জন্যেই এরকম করে বলা।

মোটর ভেহিকিলস্-এর অপরিচিত চত্বরে পা ফেলতেই জনা-তিনেক হা-ঘরে মূর্তি ছেঁকে ধরল। কি চাই? নতুন লাইসেন্স না রি 'য়াল? লার্নার্স লাইসেন্স? ট্র্যান্সফার?

এখানে একলা এলে বাপী তরফদার কোনো কিছুর হদিস পেত কিনা সন্দেহ। কিন্তু নিশীথ সেন-এর জানা আছে। দালালদের মধ্য থেকে সব থেকে দুঃস্থ-মার্কা লোকটাকে বেছে নিল সে। তারপর বক্তব্য জানালো। গাড়ির নম্বর থেকে বাড়ির ঠিকানা বার করে দিতে হবে।

এরকম ফরমাস পেতে অভ্যস্ত নয় এরা। দুরূহ দায়িত্ব নেবার মতো মুখ করে দালাল পাঁচ টাকা দর হাঁকল। বাপী তরফদার তক্ষুনি পাঁচ টাকাই বার করতে রাজি। কিন্তু নিশীথ সেন আট আনা থেকে শুরু করে এক টাকায় রফা করে ফেলল।

দশ মিনিটের মধ্যে কাজ হাসিল। কিন্তু ঠিকানা হাতে নিয়ে নিশীথ সেন হাঁ...না সন্দীপ না নন্দী। সেই নম্বরের গাড়ির মালিকের নাম অনিমেষ ঘোষ!

বিব্রত মুখে বাপী তরফদার তার হাত থেকে কাগজটা নিল। কিন্তু বাড়ির ঠিকানা দেখে আশান্বিত একটু। সেই জ্যোতিষীর ডেরার রাস্তায় বাড়ির নম্বর। একটা টাকা দিয়ে দালাল বিদায় করে বন্ধুকে বলল, কোনো আত্মীয়ের গাড়ি হবে হয়তো ওটা—

নিশীথ সেন প্রস্তাব করল, এতটাই যখন করা গেল ওটুকু আর বাকি থাকে কেন- –চল্, ওই ঠিকানাতেই খোঁজ করে দেখি তোর চেনা লোকের হদিস মেলে কিনা।

—না-না, আজ আর ভালো লাগছে না। বাপী তরফদার ব্যস্ত হয়ে উঠল।—মেজাজ খিঁচড়ে গেছে, নাম মিলছে না, চলতি গাড়িতে কাকে দেখতে কাকে দেখলাম কে জানে। ইয়ে, আমি এ-দিকে একটু কাজ সেরে যেতাম...তোকে পৌঁছে দিতে হবে?

তাকে অব্যাহতি দিয়ে নিশীথ সেন নিজের বাস ধরল। তারপর...। তারপর অপচয় করার মতো হাতে আর এক মুহূর্তও সময় নেই বাপী তরফদারের।

...সেই রাস্তা।

মিথ্যেই অনেকটা আগে থেকে রাস্তার ডান দিকের বাড়িগুলোর দিকে চোখ রেখে দ্রুত হেঁটে চলেছে বাপী তরফদার। রাস্তার বাঁয়ের বাড়িগুলোর জোড় নম্বর। তার বে-জোড় নম্বর চাই। নিজের ওপরেই বিরক্ত। বোকার মতো বেশি হাঁটছে। ওই নম্বরের বাড়ি রাস্তার শেষ মাথায় হবে। বাসে চেপে এসে শেষ দিক থেকে খুঁজতে খুঁজতে এলে সময়ের সাশ্রয় হত। শীতের বেলা পড়ে আসছে, তার হাঁটার গতি বাড়ছে।

কম করে দেড় মাইল লম্বা এই রাস্তা। জ্যোতিষীর বাড়ি সিকি মাইলের মধ্যে। লোকটা বিকেলেই দপ্তর খুলে বসেছে, আর আশ্চর্য, খদ্দেরও জুটেছে! জানলা দিয়ে একটা অসহিষ্ণু দৃষ্টি ছুঁড়ে বাপী তরফদার হনহন করে এগিয়ে চলল।

বাড়ির নম্বর যতো বাড়ছে, উত্তেজনাও বাড়ছে ততো। একটা বাড়ির সামনে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে গেল শেষে।...নম্বর মিলেছে। সামনে কোলাপসিবল্ গেট লাগানো শূন্য গ্যারাজ। তার কোণের দিকে দেয়ালের গায়ে বাড়ির নম্বর-প্লেট। ছোটর ওপর ছিমছাম বাড়ি।

বুকের ভিতরটা ধপ-ধপ করছে বাপী তরফদারের।...ওই গাড়িটা হয়তো এই বাড়িরই, কিন্তু মিষ্টি মালবিকা নন্দী নামে কোনো মেয়ে কি সত্যিই এখানে থাকে? পনের বিশ গজ এগিয়ে গিয়ে রাস্তা টপকে উল্টো দিকের ফুটপাথ-এ এসে দাঁড়াল। দোতলার বারান্দাটা ফাঁকা। তার ও-ধারে পর পর তিনটে ঘরে লোক চলাচলের আভাস পাচ্ছে। কিন্তু স্পষ্ট কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

নির্নিমেষে ওই দোতলার দিকেই চেয়ে আছে বাপী তরফদার। হঠাৎ তন্ময়তায় ছেদ পড়ল কেন জানে না। উল্টো দিকের বাড়িটার একতলায় বাঁধানো দাওয়ায় তারই বয়সী জনা-তিনেক ছেলে বসে সিগারেট টানছে। তারা ওকে দেখেই হাসাহাসি করছে বোধহয়। আবার ঘন ঘন সামনের বাড়িটার দোতলার দিকে তাকাচ্ছে।...এদিকের একটা বাড়ির দোতলায় রেলিং-এর সামনে সোনালি ফ্রেমের চশমা-পরা ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের একজন সুশ্রী লোক দাঁড়িয়ে। তারও দৃষ্টি ওই বাড়িটার দোতলার বারান্দার দিকে। বাপী তরফদারের হঠাৎ কেমন মনে হল সিগারেট-মুখে ওই ছেলেগুলো বা দোতলার ওই লোকটাও তারই মতো কারো দেখা পাওয়ার অপেক্ষায় আছে। বাপী তরফদারের আশা বাড়ছে।

হঠাৎ নিঃশ্বাস রুদ্ধ হবার দাখিল তার। ঘর থেকে ওই দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে একজন। খোলা চুল ফোলা-ফোলা মুখ। মনোরমা নন্দী! মিষ্টির মা।

সন্তর্পণে বড় নিঃশ্বাস ফেলল বাপী তরফদার। একটা প্রকাণ্ড অনিশ্চয়তার অবসান। অনিমেষ ঘোষ যে-ই হোক, মিষ্টি এ বাড়িতেই থাকে।

ভুরু কুঁচকে মহিলা রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নিচের দাওয়ার ছেলে তিনটিকে দেখলেন একবার। সামনের বাড়ির দোতলার সোনালি ফ্রেমের চশমা-পরা লোকটাকেও দেখলেন। তারপর বাপীর দিকে চোখ গেল তাঁর। রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে তিনি বারান্দা ছেড়ে ঘরে ঢুকলেন আবার।

বাপী তরফদারের মনে হল শেষের বিরক্তিটুকু এক বাড়তি উপদ্রব দেখার দরুন। অর্থাৎ তাকে দেখেই।

এর তিন-চার মিনিটের মধ্যে দাওয়ার ছেলে কটা সচকিত। তিনজনেরই ঘাড় রাস্তার উল্টো দিকে ফিরেছে।...হ্যাঁ, ও-দিক থেকে সাদাটে গাড়ি আসছে একটা। সঙ্গে সঙ্গে তারও ধমনীর রক্তে দাপাদাপি।

গাড়িটা এই সাতাশি বাড়ির গায়ে এসে দাঁড়িয়ে গেল। বিকেলের আলোয় টান ধরেছে। তবু সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সেই সাদাটে গাড়ি। এঞ্জিনের সামনে সেই নম্বরের প্লেট।

গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে হর্নও বেজেছে। মনোরমা নন্দী আবার দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। ভিতর থেকে একটা অল্পবয়সী চাকর ছুটে এসে গ্যারাজের তালাবন্ধ কোলাপসিবল্ গেট খুলতে গেল।

বাপী তরফদারের একাগ্র দু চোখ গাড়িটার গায়ে আটকে আছে। পিছনের দরজা খুলে প্রথমে মিষ্টি নামল। বুকের সঙ্গে একপাঁজা বই ধরা। পরনে হালকা সবুজ শাড়ি, সবুজ ব্লাউস। নেমে দাঁড়াল একটু। পিছনে আর একজন প্যান্ট-কোট পরা বৃদ্ধ লোক নামছেন। তাঁর জন্য কয়েক পলকের প্রতীক্ষার ছলে দাঁড়িয়ে তিন দিকে তিন ঝলক

দৃষ্টি নিক্ষেপ করল মিষ্টি নন্দী ঃ প্রথমে দাওয়ার ছেলে তিনটের দিকে—তাদের কারো মুখে সিগারেট নেই এখন। তারপর সামনের বাড়ির দোতলার সোনালি ফ্রেমের চশমা-আঁটা সুশ্রী গম্ভীর মূর্তির দিকে।

তারপর বাপী তরফদারের দিকে। তাকে দেখাটা নতুন পতঙ্গ দেখার মতো।

পলকা ঝটকায় ঘুরে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গে.ল।

## চার

আবু রব্বানী বলেছিল, যদি মরদ হোস তো একদিন শোধ নিবি। একটা চোখ ছোট করে অন্য চোখ সটান তাকিয়ে শুধিয়েছিল, কি রকম শোধ বুঝলি?

চৌদ্দ বছরের বাপী মাথা নেড়েছিল, বুঝেছে। আবুর কল্যাণে এর ঢের আগে থেকেই না-বোঝার মতো কত কি জল-ভাত তার কাছে। তাছাড়া না বুঝলে নিজের কপাল নাক মুখ তো অক্ষতই থাকত। শোধ নেওয়ার কোনো কথাই উঠত না। তবু আবু রব্বানীর কথাগুলো নতুন করে মনে পড়েছে বাপীর।

পরের দুদিনও একটা অবুঝ অস্থিরতা সকালে-বিকেলে গলায় শেকল পরিয়ে এ পর্যন্ত টেনে এনেছে তাকে। এই সাতাশি নম্বর বাড়িটার দরজা পর্যন্ত। শুধু অস্থিরতা নয়, এক ধরনের অব্যক্ত উপোসী যন্ত্রণাও। শুকনো দুই ঠোঁট বার বার জিভে ঘষেছে। নিজের একদিনের সেই থ্যাতলানো মুখের রক্তের নোনতা স্বাদ লেগেই আছে। সেই ফয়সালা বাকি। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখতে অসুবিধে হয়নি। কল্পনার জগতের সোনার সিংহাসনেও চেপে বসা গেছে। তারপর এক মেয়ের সঙ্গে চরম কিছু ফয়সালার মুখোমুখি এসে থেমে গেছে। সেটার ছক কোনো সময় মনের মতো হয়নি।

সেটা আজও বাকি। সেই মেয়ের দেখা মেলার সঙ্গে সঙ্গে নিভৃতের একটা অস্বাভাবিক বিশ্বাস মগজে দাগ কেটে বসেছে। ফয়সালা হবে বলেই এত বড় দুনিয়ায় এত বছর বাদে আবার দেখা তার সঙ্গে।

ভিতরে ভিতরে এমন একটা নাড়াচাড়া না পড়ে গেলে বাপী তরফদার হয়তো আর একটু মাথা খাটিয়ে বাস্তবের মাটিতে পা ফেলে চলত। গত পরশু আর কাল শুক্রবার আর শনিবার গেছে। এ দুদিনের হাজিরায় কোনরকম ব্যাঘাত ঘটেনি। সকাল সাড়ে নটার আগে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দেয়ালের নেম-প্লেটের নামটা মুখস্থ হয়ে গেছে। অনিমেষ ঘোষ, অ্যাডভোকেট। মালবিকার মায়ের বাবা হবে হয়তো। মুখ দেখে আর বয়েস আন্দাজ করে সেইরকমই মনে হয়েছে।

...পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়নি। প্রথমে বই বুকে করে বেণী দুলিয়ে ওই মেয়েকে সুতৎপর গাম্ভীর্যে গাড়িতে উঠে বসতে দেখেছে। তিন দিনে তিন রকমের শাড়ি পরতে দেখল। যেদিন যেটা পরেছে সেটাই যেন সব থেকে ভালো মানিয়েছে। গাড়িতে ওঠার ফাঁকে বাপীর দিকে চোখ গেছে। উল্টো দিকের রকে আর দোতলার বারান্দায়ও। দোতলার বারান্দায় সোনালি ফ্রেমের চশমা। রকে দুটো তিনটে বা চারটে ছেলে। বাপীকেও এদের মতোই নতুন একজন ধরে নেওয়া হয়েছে, সন্দেহ নেই। চিনতে না

পারাটা বাপীর ক্ষতর ওপর নুন ছড়ানোর মতো লেগেছে।

এক আধ মিনিটের মধ্যে বয়স্ক ভদ্রলোক গাড়িতে এসে ওঠেন। দোতলার বারান্দায় তখন মালবিকার মা মনোরমা নন্দীর অপ্রসন্ন মুখখানাও দেখা যায়। গাড়িটা সকলের নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে গেলে তিনি ভিতরে পা বাড়ান। বিকেলেও একই ব্যাপার। পাঁচটা পনের থেকে কুড়ি মিনিটের মধ্যে সাদা গাড়ি সাতাশি নম্বরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। ওই মেয়ে আগে নেমে ভিতরে চলে যায়। পিছনে বয়স্ক ভদ্রলোক। তাঁর কোনদিকে বা কারো দিকে চোখ নেই। আত্মতৃপ্ত সুখী মানুষ মনে হয়। রকে সেই দুটো তিনটে বা চারটে ছেলে। সামনের দোতলার বারান্দায় সেই সোনালি ফ্রেমের চশমা। আর সাতাশি নম্বরের দোতলার বারান্দায় মনোরমা নন্দীর অপ্রসন্ন মুখ।

...গত বিকেলেও বাড়িতে ঢুকে পড়ার ঝোঁক অনেক চেষ্টায় সামলেছে বাপী তরফদার। আজ রবিবার। কলেজ বন্ধ। সকাল সাড়ে আটটা না বাজতে ভিতরের দুর্জয় তাড়না তাকে এখানে ঠেলে নিয়ে এসেছে। এমনিতে দেখা পাওয়ার আশা কম। আজ বাপী ভিতরে ঢুকেই পড়বে। তারপর যা হয় হবে। এরকম ঝোঁকের ফলেই অন্য কোনো বাস্তব সম্ভাবনা তার হিসেবের মধ্যে ছিল না।

খাবার লোভে বা সঙ্গিনীর লোভে কোনো বেপাড়ার কুকুর সীমানা লঙ্ঘন করে ঢুকে পড়লে পাড়ার সগোত্র-দল সেটা যেমন বরদাস্ত করে না, ঘেউ ঘেউ রব তুলে চারদিক থেকে ছেঁকে ধরে আচড়ে কামড়ে ওটাকে পাড়া-ছাড়া করতে চায়—হঠাৎ সেই গোছের দাঁড়াল অবস্থাখানা। রোববারের রকের মজলিশে জন পাঁচেক বসে। পর পর কদিন সকাল-বিকেলে দুবেলা একটা উটকো লোককে ওই সাতাশি নম্বর বাড়ির সামনে টহল দিতে দেখেছে তারা। সামনের দোতলা বাড়ির সোনালি ফ্রেমের চশমা পরা সুশ্রী লোকটাও দেখেছে। সকলেরই একসঙ্গে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

আগেও এদের হাব-ভাব সদয় মনে হয়নি বাপী তরফদারের। তা বলে এরকম অতর্কিত হামলার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সাতাশি নম্বরের সামনে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে রকের ছেলেগুলো উঠে এসে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। ওদের এক মুরুব্বির হাত সোজা তার কাঁধের ওপর উঠে এলো।

—কি মতলব ব্রাদার?

বাপী তরফদার জবাব হাতড়ে পেল না। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

পাশ থেকে একজন সোল্লাসে ফোড়ন কাটল, অসুবিধে দেখে ব্রাদার বোবা হয়ে গেছে, দু'ঘা না বসালে কথা বেরুবে না।

এসব মজার ব্যাপারের চট করে গন্ধ পায় লোকে। অবশ্য একটু চেঁচামেচিও শুরু হয়ে গেছে। এদিক ওদিক থেকে বাচ্চা-কাচ্চারা স-কলরবে দৌড়ে আসছে। রাস্তার দুদিকেরই দোতলার বারান্দায় লোক দেখা যাচ্ছে। ভেবাচাকা খাওয়া মুখ তুলে বাপী তরফদার তাদেরও দেখল একবার। এদিকে মালবিকা...মিষ্টি...রেলিংএ ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে। পাশে তার মা। ওদিকে সেই সোনালি ফ্রেমের চশমা। পাশে আরো দুই-একজন। পরিস্থিতি জমে উঠতে যারা তাকে ছেঁকে ধরেছে তাদেরও উল্লাস বেড়েছে। এদিক ওদিক থেকে ধাক্কা মেরে কথা বার করতে চেষ্টা করছে। মুরুব্বিটি কাঁধে একটা বড় ঝাঁকুনি দিয়ে তর্জন করে উঠল, জিভ টেনে ছিঁড়ব বলে দিলাম। কি মতলবে রোজ দুবেলা এখানে

এসে ছোঁক-ছোঁক করা হচ্ছে?

নিরুপায় বাপী তরফদার এবারে সাতাশি নম্বরের বাড়িটাই দেখিয়ে দিল। ওখানে ঢোকার জন্যে।

ছেলেগুলো থমকে গেল একটু। সকলেই বাড়িটার দিকে তাকালো। দলের মুরুব্বি এবারে যথাসম্ভব গলা মিষ্টি করে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, মাসিমা কদিন ধরে এই লোকটা আপনাদের বাড়িতে ঢোকার জন্যে ঘুরঘুর করছে বলছে—একে চেনেন নাকি?

সরোষে মাথা নেড়ে মনোরমা নন্দী ভিতরে চলে গেলেন। মেয়ে দাঁড়িয়েই থাকল।

কাঁধ ছেড়ে মুরুব্বি এবার মুঠো করে বুকের জামা টেনে ধরল তার।—শালা মেরে একেবারে তক্তা বানিয়ে দেব—পাড়ায় ঢুকে এত সাহস তোমার?

সঙ্গে সঙ্গে এদিক-ওদিক থেকে জামা ধরে টানাটানি চলল। জামাটা ফ্যাঁস-ফ্যাঁস করে ছিঁড়তে থাকল। কাঁধে কোমরে দুই-একটা গুঁতোও পড়ল। একজন চুলের মুঠি চেপে ধরেছে।

সামনের বাড়ির দোতলা থেকে সোনালি ফ্রেমের সুশ্রী তরুণ গম্ভীর নির্দেশের সুরে বলল, ঘাড় ধরে পাড়ার বার করে দিয়ে এসো, আর যেন না ঢোকে!

এই নির্দেশ মতোই কাজ করল ছেলেগুলো। মারধরের দিকে না গিয়ে রাস্তা পার করে দেবার জন্যেই সামনের মোড় পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে চলল তাকে। যে লোভে নিজেরা সকাল-বিকেল রকে বসে থাকে সেই লোভেই আর একজন একটু বেশি এগিয়ে এসেছে বলে কত আর হেনস্থা করা চলে। আশা তো কারোরই নেই, চোখে দেখাই সার। মোড়ের এধারে ছেড়ে দিয়ে শুধু শাসালো, আর এদিকে রস করতে এসো না ব্রাদার, ওই অসিতদা না বললে আজ তোমার মিষ্টি মুখখানা একেবারে থেঁতো হয়ে যেত।

তার ওপর দিয়ে বিস্ময়ের পলকা রঙ চড়ালো আর একজন।—কি ব্যাপার বল্ তো মাইরি, ওই অসিতদার সব থেকে বেশি কলজেয় জ্বালা ধরার কথা, আর সে-ই আগেভাগে ক্ষমা করে ফেলল।

মুরুব্বি গম্ভীর মন্তব্য করল, রোমান্টিক গ্রেটনেস। থাম্ এখন—

বাপীকে বলল, যাও বাছা, ঘরের ছেলে ঘরে চলে যাও—

ওরা ফিরে চলল। বাপী তরফদার সেদিকে চেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। সামনের বাড়ির দোতলার সোনালি ফ্রেমের চশমা-পরা পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ফর্সা লোকটাই অসিতদা হবে। একটা মেয়ের জন্য তারও কলজে পুড়ছে আগেই বুঝেছিল। এখন আরো ভালো বোঝা গেল।

হনহন করে হেঁটে চলল বাপী তরফদার। কারো দিকে তাকাচ্ছে না। মনে হচ্ছে সকলেই আস্ত ট্রাউজারের ওপর লণ্ডভণ্ড ছেঁড়া জামাটা দেখছে। আক্রোশের একটা জ্বলন্ত পিণ্ড গলার কাছে দলা পাকিয়ে আছে। সেখান থেকে একটা অসহ্য তাপ চোখেমুখে ছড়িয়ে পড়ছে।

এত বড় হামলাটা যারা করল, রাগ এই মুহূর্তে তাদের ওপর নয়। গুষ্টির পিণ্ডি ওই অসিতদা না কে, তার ওপরেও নয়। আক্রোশ নিজের ওপর। আরো বেশি দোতলার রেলিং-এ ঝুঁকে দাঁড়ানো ওই মেয়ের ওপর। যার নাম মালবিকা। মিষ্টি। তাকে ঘিরে সেই মেয়ে একপাল পথের কুকুরের খেয়োখেয়ির মজা দেখছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।...আবু

রব্বানী বলেছিল, মরদ হোস তো শোধ নিবি। সেই চরম শোধের নিষ্ঠুর অভিলাষ শিরায় শিরায় জ্বলছে এখন।

উঠোনে পা দিতেই রতন বণিকের বউ কমলার সঙ্গে চোখাচোখি। এটাই সব থেকে অবাঞ্ছিত বাপী তরফদারের। উঠোনের একধারের বাঁধানো কলতলায় শুধু কমলা ছাড়া আর কেউ নেই। বেলা দশটার ওধারে এখন কারোরই থাকার কথা নয়। ছুটির দিনে পুরুষেরা ভালো-মন্দ বাজার করে আনে, তারপর ঘরে বসে বা বাইরে কোথাও আড্ডায় মশগুল হয়। মেয়েরা রান্নায় ব্যস্ত থাকে। টিউবওয়েলের হাতল চালিয়ে কমলাকে ওখান থেকে জল নিতে কমই দেখা যায়। তার ঘরের জল এমন কি স্নানের জলও রতনই তুলে দেয়। তাদের রান্নাঘরের পিছনে ছোট ঘেরানো স্নানের জায়গা আছে। আব্রু যাদের তাদের অনেক ঘরেই এরকম ব্যবস্থা।

আজ হয়তো কোনো কারণে জল ফুরিয়েছে। রবিবারে বেলা দুটো আড়াইটের আগে রতনের টিকির দেখা মেলে না। বাজার ফেলে দিয়েই সে বেরিয়ে পড়ে। ছুটির দিন মানেই তার কিছু বাড়তি রোজগারের দিন। বেশ খানিকটা আদর-কদর মেলার দিন। অনেক ক্লায়েন্ট জোটে। কোনো কোনো রবিবারে আবার আপিসের বাবুদের বাড়িতেও ভবিষ্যৎ-বচন শোনাতে যেতে হয়।

অন্যদিন হলে টিউবওয়েলের হাতল চালিয়ে কমলার ঘড়ায় জল ভরার দৃশ্যটা দেখতে মন্দ লাগত না বাপীর। আজ ভিতরটা ডবল চিড়বিড় করে উঠল। শুধু ওর হেনস্থা দেখার জন্যেই যেন বউটা এ সময় ওখানে দাঁড়িয়ে।

কমলার এদিকে অর্থাৎ সামনের দিকে মুখ। উঠোনে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে চোখাচোখি। টিউবওয়েলের হাতল হাতেই থেকে গেল। নামছে উঠছে না। কমলার দু'চোখ কপালে।

ওই দৃষ্টি থেকে সরোষে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে বাপী তরফদার ঘরে ঢুকেই ঠাস করে দরজা দুটো বন্ধ করে দিল। নড়বড়ে দরজায় ছিটকিনি নেই, ছেড়ে দিতেই চার-ছ' আঙুল ফাঁক আবার।

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে ক্যাচ করে একটা মৃদু শব্দ কানে আসতেই বাপীর ঝাঁজালো দৃষ্টি দরজার দিকে। এক পাট খুলে কমলা ঘরে ঢুকল। শাড়ির আঁচলে ভিজে হাত মুছতে মুছতে দু পা এগিয়ে এলো। বাপী তার খাটিয়ায় বসে। ছেঁড়া-খোঁড়া জামাটাও গা থেকে খোলার ফুরসৎ পেল না। দু চোখের উগ্র ঝাপটায় ওকে আবার ঘর থেকে বার করে দিতে চায়।

চোখের বিস্ময় মুখে নেমে এলো কমলার।—ব্যাপার কি গো বড়বাবু মারামারি-টারামারি করে এলে নাকি কোথাও থেকে?

এই অবস্থা দেখে ঢুকেছে যখন এমনিতে ঘর ছেড়ে চলে যাবার মেয়ে নয় কমলা। বাপী কি করবে এখন? জবাবে উঠে ওকে ধাক্কা মেরে বার করে দেবে?

কমলা খুঁটিয়ে দেখছে ওকে। উসকোখুসকো চুল, ক্রুদ্ধ বিবর্ণ মুখ, ছেঁড়া-খোঁড়া ঝলঝলে জামা। চকিতে কাছে এগিয়ে এলো সে। বাপীর হাঁটুর লাগালাগি প্রায়। তারপর ঝুঁকে ছেঁড়া জামার ভিতর দিয়ে গা দেখতে চেষ্টা করল। আঘাতের দাগ চোখে পড়ে কিনা সভয়ে তাই দেখছে।

বাপীর গলার কাছে একটা গরম নিঃশ্বাসের ছেঁকা লাগল। পরের মুহূর্তে মাথায় ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে গেল। দুটো চোখের শলাকা কমলার ঝুঁকে পড়া মুখ থেকে নেমে বুকের ওপর বিদ্ধ হল।...বহুদিনের উপোসী ক্রুদ্ধ জানোয়ারটাকে এই মুহূর্তে খোলস ছিঁড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেবে? স্থান ভুলে কাল ভুলে রসাতলে ডুবে যেতে দেবে? আজকের অত বড় অপমানের জ্বালা জুড়োবে তাহলে?

আবার সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কমলা বিষম থতমত খেল এক প্রস্থ। দু'পা পিছনে সরে গেল। এরকম চাউনির একটাই অব্যর্থ অর্থ হতে পারে বুঝি। কৈফিয়তের সুরে বলল, কোথাও লাগল-টাগল কিনা দেখছিলাম...

ফাঁড়া কাটলো। নিজের কি সামনে যে দাঁড়িয়ে তার, বাপী জানে না। মাত্র কটা মুহূর্তের মধ্যে নিজের সঙ্গে অনেক যুঝে অশান্ত ক্রুদ্ধ জানোয়ারটাকে আবার খোলসের ভিতরে ঠেলে দিতে পেরেছে। কিন্তু তার ধকল চোখেমুখে এখনো এত স্পষ্ট যে কমলাও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে মনে হল। বাপী তার মুখের ওপর রূঢ় ঝাপটা মেরে বসল একটা।
—কেন দেখছিলে? কেন তোমরা এভাবে জ্বালাতন করো আমাকে?

—আমরা! কমলার বিস্ময়-ঝরা দু'চোখ তার মুখের ওপর নড়েচড়ে স্থির হল।...অন্য কোনো মেয়ের জ্বালাতনে আজ এই হাল নাকি তোমার?

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেই চলেছে। তুমি যাবে এখন এখান থেকে?

কমলা মোলায়েম করে বলল, কি হয়েছে শুনি আগে—উঠোনে পা দিতেই ওই মূর্তি দেখে আমি আঁতকে উঠেছিলাম—

খাটিয়া ছেড়ে বাপী প্রায় তেড়েই এলো, তুমি এক্ষুণি যাবে কি যাবে না আমি জানতে চাই?

কমলা চেয়ে আছে। রাগ ছাড়া আরো কিছু দেখার আছে যেন। এক পাট খোলা দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল। গম্ভীর। শামলা মুখ একটু মচকে বলল, আমার বাড়ি আমার ঘর, তুমি তাড়াবার কে?

—ও। ঠিক আছে, আমিই যাচ্ছি।

অসহিষ্ণু হাতের টানে ছেঁড়া জামাটা ছিঁড়েই গা থেকে খুলে খাটিয়ার ওপর আছড়ে ফেলল। দড়ি থেকে আর একটা আস্ত জামা টেনে নিয়ে সরোষে দরজার দিকে এগিয়েই থমকে দাঁড়াল। এক পাট খোলা দরজা আগলে কমলা তেমনি দাঁড়িয়ে।

দুজনে সোজা তাকালো দুজনের দিকে। বাপীর লাল চোখ। কমলা প্রায় তেমনি গম্ভীর।

—কি হল, যাও?

বাপী ফুঁসে উঠল, সরো বলছি!

পিছনে ঘাড় ফিরিয়ে একবার বাইরেটা দেখে নিল কমলা। কেউ নেই। থাকলেও এই দিনমানে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করতে দেখলে খুব কিছু মনে করবে না কেউ। বুড়োর গণনা আর বোলচালের ফলে বড়বাবুকে এখনো মস্ত বাবুই ভাবে সকলে।

আবার সোজা তাকিয়ে পলকা ঝাঁজে কমলা বলল, এক বস্ত্রে চলে যাচ্ছ—তোমার ওই রাজ-শয্যা, বাড়তি জামাটামা আর ওই ভাঙ্গা টিনের সুটকেস কার জন্য রেখে যাচ্ছ?

বয়েস মাত্র বাইশ, কিন্তু নিজের ভিতরের বয়েস কতো এগিয়ে আছে বাপীই শুধু

জানে। রমণীর এই তেজ আর এই উক্তির বিপরীত রসের আঁচটুকু ভালোই অনুভব করতে পারে। সভয়ে এদিকটাই এড়িয়ে চলেছে এতকাল। কিন্তু আজ হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। এই মেয়ে ভিতর দেখেছে তার। সেই জোরেই এভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এমন কথা বলছে।...এক মেয়ের চোখের ওপর অপমানের সেই চাবুকের জ্বালা আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে আছে। এখন সামনে এক হাতের মধ্যে যেভাবে আর একজন দাঁড়িয়ে, তাকে দেখে জ্বালা জুড়োবার সেই ক্রূর লোভ নিজের দুটো চোখের তারায় আবারও চিকিয়ে উঠছে।

এবারে কমলার গলার স্বর মোলায়েম-এ।—ঠাণ্ডা হয়ে বোসোগে যাও। তার পর ইচ্ছে হয় বলবে, ইচ্ছে না হয় বলবে না। আমি কি তোমাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছি!

ভিতরের অসহিষ্ণু তাড়না মাড়িয়ে বাপী খাটিয়ায় এসে বসল।

কমলা অনড় তার পরেও। দেখছে।—এক গেলাস চা করে এনে দেব?

—না!

—বাবা রে বাবা, বাইরে কোথায় কি কাণ্ড করে এসে এখন ঘরের ভালো মানুষদের কাছে যত দাপট আর হম্বি-তম্বি...রান্নাটা সেরে ফেলিগে যাই, তুমিও চানটান করে মাথা ঠাণ্ডা করো।

যেতে যেতে চোখের কোণ দিয়ে খাটিয়ায় বসা মুখখানা আর একবার দেখে নিল।

বাপী সটান শুয়ে পড়ল। স্নায়ুর ওপর দিয়ে আবার এক প্রস্থ ঝড় বয়ে গেছে। অসাড়ের মতো পড়ে থাকল খানিক। নিজের বুকের তলার ঢিপঢিপ শব্দ কানে আসছে। হঠাৎ নিজের ওপরেই আবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগল সে। এই পৃথিবীর মুখ একেবারে না দেখলে কি হত? না জন্মালে কি হত? মানুষের খোলসে ঢাকা ভিতরের এই হিংস্র অবুঝ জানোয়ারটাকে আর কতকাল ধরে পুষবে? মাত্র কটা মুহূর্তের জন্য হলেও খোলস ছিঁড়ে নিঃশব্দ হুংকারে ওটা বেরিয়েই এসেছিল। থাবা উঁচিয়েছিল। কমলা দেখেছে। চিনেছে। অথচ সত্যিই তার দোষ নেই। যে মূর্তিতে ঘরে ফিরতে দেখেছে, আঁতকে ওঠারই কথা। ছুটে আসারই কথা।

চোখের সামনে আর একখানা মুখ ভেসে উঠল। সে-ও রমণীর মুখ। অকরুণ মুখ। কিন্তু সেদিন সেই সময়ে খুব অকরুণ ছিল না। মণিদার বউ গৌরী। বাপীর থেকে ছ' বছরের বড় গৌরী বউদি। রসভঙ্গের এক মূর্তিমান কৌতুকের মতো বাপী তরফদার অসময়ে বাড়ি ফিরেছিল সেদিন। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে দেরি তখনো। সেই প্রকাশ্য নির্জনে পাশের লাগোয়া ফ্ল্যাট থেকে কোনো পুরুষের বেপরোয়া অভিলাষের আবেদন এবং এ ফ্ল্যাট থেকে সেটা নাকচের নিঃশব্দ প্রহসন চলছিল। বাপী তরফদার স্বচক্ষে দেখেছে। দোতলার বারান্দা থেকে ওকে দেখে পাশের ফ্ল্যাটের দিকে একটা লঘু ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করেছিল গৌরী বউদি। রস-ভঙ্গের ব্যাপারখানা উপভোগ্য ব্যতিক্রমের মতো।

...সেদিনও মাথায় আগুন জ্বলছিল বাপী তরফদারের। অপমান আর হতাশার যন্ত্রণা ভিতরটা কুরে খাচ্ছিল। সেই মূর্তি দেখে কমলার মতো আঁতকে উঠে গৌরী বউদি বসার ঘরের দরজা খুলে ছুটে না আসুক, কাছেই এসে দাঁড়িয়েছিল।

—কি ব্যাপার? এ সময়ে যে?

জবাব না পেয়ে আর একটু এগিয়ে এসে গৌরী বউদি আরো ভালো করে দেখে

নিয়েছিল।—এই মূর্তি কেন? কে তাড়া করল?

...সেদিনও বাপী তরফদার স্থানকাল ভুলেছিল। পুরুষের রোষে বাসনা ঝলসে উঠেছিল। মনে হয়েছিল অপমান আর হতাশার আক্রোশ উজাড় করে জাহান্নমে ডুবিয়ে দেবার মতো এক রমণীয় আধার নাগালের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

...আর, চোখের সামনে হঠাৎ একটা দুর্বিনীত তাজা পুরুষ দেখেছিল গৌরী বউদি।

কি মনে হতে বাপী তরফদার খাটিয়ায় উঠে বসল। তারপর জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে পরল। তাকে চান করে মাথা ঠাণ্ডা করতে বলে কমলা রান্না সারতে গেছে। রান্না শেষ হলেই আবার আসবে। ওকে ঠেলে স্নানে পাঠাবে। তারপর জোর করে ঘরে ধরে নিয়ে গিয়ে খেতে বসাবে। নয়তো এ-ঘরে ওর খাবারটা নিয়ে আসবে। পরে কি হবে বলা যায় না, কমলা গৌরী বউদির মতো নয় এখনো। তার মতো অকরুণ নয়। মায়া দয়া আছে। আছে বলেই ওই উদভ্রান্ত মূর্তি দেখে ছুটে এসেছিল। আর অত ছলা-কলা জানে না বলেই অমন কাছে এসে ছেঁড়া জামার ভিতর দিয়ে ব্যাকুল চোখে গায়ে আঘাতের চিহ্ন খুঁজেছিল। আজ অন্তত কমলা ওকে বাইরে খেতে যেতে দেবে না। বাপী তরফদারের এটা নির্ভুল অনুমান।

আবার একটা অসহিষ্ণুতা ঘরের বাইরে ঠেলে নিয়ে এলো ওকে। তারপর উঠোনে নামিয়ে দিল।

—ও কি! না খেয়ে এ-সময় আবার চললে কোথায়? বড়বাবু শোনো—শোনো বলছি? উঠোনের চারদিকে ঘর, কত আর গলা উঁচিয়ে ডাকতে পারে কমলা?

বাপী তরফদার ফিরেও তাকালো না। হনহন করে বেরিয়ে গেল।

নিরুদ্দিষ্টের মতো হেঁটে চলল অনেকক্ষণ। অনেক পথ। এই করে নিজেকে ক্ষয় করার তাগিদ। কিন্তু ক্ষয় সত্যিই করা যায় না। ক্লান্তি সার। সামনে পার্ক। বকুল গাছের ছায়ায় একটা খালি বেঞ্চিতে গা ছেড়ে বসল। শীতকাল হলেও এই অবেলায় দ্বিতীয় লোক নেই পার্কে।

ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছু টের পাচ্ছে না। বুকের দিক থেকে একটা চিনচিনে যন্ত্রণা শুধু পেটের দিকে নামছে। সেটা সাতাশি নম্বর বাড়ির সামনের সেই অপমানের যন্ত্রণা হতে পারে। নিজের ভিতরের গ্লানির দরুনও হতে পারে। গ্লানি স্বাভাবিক। ওপরঅলার অভিশাপের মতোই প্রবৃত্তির অবুঝপনা হঠাৎ-হঠাৎ দখল দিয়ে বসে তার ওপর। নইলে বরাবর একটাই লক্ষ্য তার। একজনই লক্ষ্য। আট বছর ধরে ভিতরে বাইরে একজনকেই সে আঁতিপাঁতি করে খুঁজেছে। আট বছর বাদে তার দেখা মিলেছে।

সব ভুলে বাপী তরফদার দুটো মেয়েকে দেখছে এখন চোখের সামনে। একজনের বয়েস দশ। নাম মিষ্টি। ফুটফুটে রং। ফোলা-ফোলা গাল। মাথায় ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল। বাপী নামে একটা দুরন্ত ছেলে মিষ্টি খেয়ে জল খেতে চায় শুনে সে রাগে ফুঁসছে, জিভ ভেঙাচ্ছে।

...আর একজনের বয়েস আঠের। নাম মালবিকা। গাল দুটো ফোলা নয় একটুও। মেদ-ঝরা সুঠাম দেহ, টানা মুখ। আয়ত চোখ। অনেক কম ফর্সা কিন্তু ঢের বেশি তাজা। ...বাপী তরফদারের একটা বয়েস চৌদ্দয় আটকে আছে, আর একটা বয়েস বাইশ ছাড়িয়ে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে কেউ কল্পনা করতে পারে না। ওই মেয়েও না। ওই মেয়ে চেনেও

না তাকে। চেনার আগ্রহও নেই। বাড়ির দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হৃষ্টচিত্তে একটা অপমানের প্রহসন দেখেছে শুধু। নিগ্রহ দেখেছে।

বাপী তরফদার সোজা হয়ে বসল। স্নায়ুগুলো সব টান হয়ে উঠল। নিঃশ্বাসে এক ঝলক তপ্ত বাষ্প ঠেলে বেরুলো। চৌদ্দ বছরের একটা ছেলের ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত মুখ দেখছে। সেটা যদি শেষ কথা না হয়ে থাকে, আজকের এই অপমান আর নিগ্রহও শেষ কথা নয়। বাপী তরফদার তা হতে দেবে না।

বছরগুলো পিছনে সরে যাচ্ছে। আট বছর...ন' বছর...দশ বছর। চোখের সামনে শান্ত গম্ভীর রহস্যে ছাওয়া বানারজুলি এগিয়ে আসছে।

## পাঁচ

দুপুরেও আকাশ সেদিন মেঘলা ছিল। পিছনের দিকে তাকালে বুক পর্যন্ত কালচে মেঘে ঢাকা পাহাড়ের সারির মাথাগুলো শুধু দেখা যাচ্ছিল।

বাপী বৃষ্টি ভালবাসে না। কিন্তু মেঘলা আকাশ ভারী পছন্দ। আর ওই মেঘে পেট-ঠাসা হিমালয়ও। ঝমঝম বৃষ্টি এসব জায়গায় লেগেই আছে। তখন ঘরে থাকলে বেরুনো দায়। পিসী চোখে আগলায়। কাঠের ঘরে বসে তখন জানলা দিয়ে বৃষ্টি দেখলেও পিসী থেকে থেকে এসে শাসিয়ে যায়, জল মাথায় করে কেউ এখন বাইরে বেরুলে আর রক্ষা নেই—বাবাকে বলে ঠ্যাং ভাঙার ব্যবস্থা না করে ছাড়বে না।

বাপী পিসীর তম্বির পরোয়া করে না। বারো বছর বয়সে এটুকু অন্তত বুঝেছে পিসী আর যা-ই করুক, বাবার কাছে ওর নামে নালিশ করবে না। আসলে জলে বেরুতে বাপীর নিজেরই ভালো লাগে না। জংলা রাস্তাগুলো সব পিছল আর প্যাচপ্যাচে হয়ে যায়। গাছে পাখি কলকল করে না। বাঁদরগুলো সব মৌনী হয়ে বসে থাকে। খরগোশ আর বনমোরগগুলোর টিকির দেখা মেলে না। যদি বা দুই একটা চোখে পড়ে, পিছল রাস্তায় তাড়া করা যায় না।

তার থেকে মেঘলা আকাশ ভালো। বানারজুলির পেল্লায় জঙ্গলখানার তখন আর এক চেহারা। শাল শিশু অর্জুন জারুল দেবদারু ইউক্যালিপটাস—এইসব বড় বড় গাছগুলো তখন বেজায় গম্ভীর। আব তাই দেখে ছোট গাছগুলোও যেন ঘাবড়ে গিয়ে চুপ মেরে থাকে। আকাশে সূয্যি ঠাকুর যতই জ্বলুক, এমনিতেই জঙ্গলের মধ্যে ছায়া-ছায়া ভাব। উনি মেঘে ঢাকা পড়লেই সেই ছায়া-ভাবটা ঘন থমথমে হয়ে ওঠে। আর তখনই জঙ্গলটাকে বাপীর সব থেকে ভালো লাগে। ওটা তখন অদৃশ্য একটা হাত বাড়িয়ে ওকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসতে চায়। এমন কি পাঁচ মাইল দূরের স্কুলের ক্লাসে বসেও বাইরে মেঘলা আকাশ দেখলে ভিতরটা পাখা মেলে বানারজুলির ওই জঙ্গলে এসে সেঁধোয়, তারপর ইচ্ছাসুখে হুটোপুটি করতে থাকে। এক-একদিন তো এমন হয়, স্থান-কাল মনে থাকে না। মাস্টারমশাই উঠে এসে কান টেনে ধরে। অন্য ছেলেরা হাসাহাসি করে।

আর, তখন ঘরে থাকলে তো কথাই নেই। ছুটির দিনের দুপুর হলে সোনায় সোহাগা। পিসীর চোখে ধুলো দিয়ে ছোট্ট মজবুত লাঠিখানা হাতে করে ছুটে বেরুবেই। ওই ছোট্ট

জুতসই লাঠিটা ওকে দিয়েছিল আবু রব্বানী। তেল খাইয়ে-খাইয়ে ওই লাঠি বাপী এখন প্রাণের জিনিস করে তুলেছে। জঙ্গলে ঢোকার আগে আরো কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করে নিতে হয়। শার্টের দু পকেট আর প্যান্টের দু পকেট বাছাই নুড়ি-পাথরে বোঝাই করে নেয়। ফুরোলে ওই অস্ত্র জঙ্গলেও মেলে। জল পড়লে ওপরের মাটি কাদা হয় বটে, কিন্তু আসলে তো পাথুরে জঙ্গল।

পাথর হাতে নিলেই বাপীর আবুকে মনে পড়ে। টিপ বটে হাতের। টিপের কমপিটিশন বা প্রাইজ থাকলে আবুকে দুনিয়ার কেউ হারাতে পারত না বোধহয়। ওর মতো টিপ করার জন্য বাপীরও চেষ্টা বা নিষ্ঠায় ফাঁক নেই। ফারাক ঠিক করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গাছের মোটা-সরু ডাল লক্ষ্য করে প্রায়ই টিপের মহড়া দিতে হয়। এই করে করে তারও হাতের টিপ মন্দ নয় এখন। কিন্তু আবু রব্বানীর ধারে কাছে নয় তা বলে।

বাপী কোনো সময়ই বৃষ্টি পছন্দ করে না এমন নয়। লোকে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলে তারপর দুটো কাঁটাই ফেলে দেয়। বাপীরও তেমনি স্কুলে রওনা হবার আগেভাগে বৃষ্টি এলে স্কুল কামাই করার তাড়না। তারপর বৃষ্টি আর স্কুল দুইই চুলোয় যাক। যেমন আজকের এই দিনটায় এই রকমই হবে আশা করেছিল। পড়ার বই সামনে রেখে সকাল থেকে নটা পর্যন্ত জানলা দিয়ে ঘন ঘন আকাশ দেখেছে। সকাল ছটা থেকে আটটা পর্যন্ত ওই আকাশ মেঘে কালি। কালো কালো মেঘের চাঙড়ে হিমালয়ের পেট-বুক ঢাকা। গলা উঁচিয়ে না পড়লে বাবা আর পিসী ভাবে পড়ায় ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে। মেঘের সাজ দেখে আনন্দে বাপীর গলা আপনি চড়ছিল। ওই মেঘ হুড়মুড় করে আজ গোটা বানারজুলির ওপর ভেঙে পড়বেই।

কিন্তু বেলা সাড়ে নটার আগে ভাঙুক এটা চায় না। চান-খাওয়া সেরে ঘড়ি ধরে রোজ পৌনে দশটায় একগাদা বই-খাতার ঝোলা কাঁধে ফেলে স্কুলে রওনা দিতে হয়। স্কুল বসে বেলা এগারোটায়। পাঁচ মাইল দূরে সেই বানারহাটে স্কুল। অত পথ হাঁটার ধকল কিছু নয়, রাস্তায় একে একে আরো অনেক ছেলে জোটে। হৈ-হৈ করে চলে যাওয়া যায়। কিন্তু আসলে স্কুলটুল ভালো লাগে না। ক্লাসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকার চিন্তাতে গায়ে জ্বর আসে। সকালে ঘুম ভাঙলেই স্কুলে না যাওয়ার নানা ফন্দি মাথায় জট পাকাতে থাকে। সকালের জলখাবার খেতে খেতে পিসীকে প্রায়ই শুনিয়ে রাখে, এই এই কারণে আজ স্কুলে যাবে কি যাবে না ঠিক নেই। কিন্তু হাসতে মানা বাবাটি সামনে এসে দাঁড়ালেই সব ফন্দিফিকির মাথা থেকে উধাও হয়ে যায়।

কিন্তু আজকের আকাশ আর পাহাড় দেখে স্কুল ফাঁকির চিন্তা থেকে মাথাটাকে বিশ্রাম দেওয়া গেছে। আজকের দিনের ব্যবস্থা যা হবার ওখান থেকেই হচ্ছে। অল্প বৃষ্টিতে বাবা যদি ছাতা নিয়ে স্কুলে যেতে বলে, পিসী সে হুকুমও বরবাদ করে দেয়। বৃষ্টিকে বড় ভয় পিসীর। এখানকার ভাষায় 'মালোরি' জ্বর ঘরে ঘরে লেগে আছে। তার ওপর ব্ল্যাকওয়াটার ফিভার না কি এক ঘোড়ার ডিমের ব্যামোয় জঙ্গলের আর আশপাশের চা-বাগানের কতগুলি লোক ধপাধপ মরল। পিসীর ধারণা জলে ভেজার থেকেই যত রাজ্যের ব্যামোর উৎপাত।

কিন্তু ঘড়িতে যখন নটা, বারো বছরের বাপীর মেজাজের তখন বারোটা। ওই আকাশ তার সঙ্গে একটা বড় রকমের বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। মেঘ এখনো গোটা আকাশ জুড়ে

আছে বটে, কিন্তু এখন আর তেমন ঘন গভীর নয়। পাহাড়ের বড় গাছগুলোও একটু একটু দেখা যাচ্ছে। মেঘ-বিশারদ না হলেও অনেক লক্ষ্য করার ফলে বাপী মোটামুটি ওদের হালচাল জানে। হলপ করে বলতে পারে ঘন্টাকতকের মধ্যে এই মেঘ আর বর্ষাবে না।

মেজাজটাই খিঁচড়ে গেল। হাতের বই চটাস করে টেবিলে ফেলে উঠে দাঁড়ানোর ঝাঁজে বসার বেতের চেয়ারটা পিছনে ওলটালো। ওটার ওপর আর একটা লাথি ঝেড়ে গটগট করে সোজা হেঁসেলে পিসীর কাছে।—আমি আজ স্কুলে যাচ্ছি না—কক্ষনো যাচ্ছি না।

এরকম শুনে পিসীর দু কান অভ্যস্ত। মুখ না ফিরিয়ে বললেন, আজ আবার কি হল, আজ তো আরো কষ্ট কম হবে, ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় চলে যাবি—

রাগের চোটে ভেংচে উঠল বাপী।—ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় চলে যাবি—ঠাণ্ডার জন্যে পাঁচ মাইল রাস্তা কমে দু মাইল হয়ে যাবে? হাঁটতে হাঁটতে পায়ের সুতো ছিঁড়ে যায়, ফেরার সময় জিভ বেরিয়ে পড়ে—তবু একটা সাইকেল কিনে দেবে না—আর ছ' মাস ধরে ভোলানো হচ্ছে সাইকেল হবে! আজ আমি যাব না, যাবই না! বাবাকে বলে দাও আমার পা দুটো আজ সকাল থেকে টনটন করছে।

এতটুকু ছেলের পাঁচ-পাঁচ দশ মাইল হেঁটে যাওয়া আসা পিসীর চোখেও অত্যাচারের সামিল। চা-বাগানের অনেক বাবুর বাড়িতেই সাইকেল আছে। তাদের ছেলেরা বেশির ভাগ সাইকেলে স্কুলে যাতায়াত করে। আবার অনেক সমবয়সী তাদের ক্যারিয়ারে বসে যায়। বাপী ছোট বলে তাদের কাছে খুব একটা পাত্তা পায় না। তাছাড়া ওর নিজেরও দয়া চাইতে ইচ্ছে করে না। সাইকেল চড়া শেখার আন্তরিক অভিলাষ একমাত্র আবুর কাছে ব্যক্ত করেছিল। আবু বলেছিল, শিখে কি হবে, তোর বাবা কিনে দেবে?

বাপী বলেছে, পিসীর পিছনে লেগে থাকব, তার তাগিদে বাবা একদিন না একদিন কিনে দেবেই।

এরপর আবু চা-বাগানের কোন এক পিওনের কাছ থেকে একটা ঝর্ঝরে সাইকেল যোগাড় করে এনেছিল। চালাতে শেখা এক দিনেই হয়ে গেছল। তারপর কিছু দিন ওই নেশায় পেয়ে বসেছিল তাকে। ছুটির দিনে ঘণ্টা কতকের জন্য একটা সাইকেল তার চাই-ই। পিসীর কাছ থেকে চার আনা আট আনা আদায় করে আবুর হাতে দিত। আবু কখনো পিওন কখনো আরদালিকে ঘুষ দিয়ে সাইকেল যোগাড় করত। কারো কাছে ভালো সাইকেল দেখলে লোভে দু চোখ চকচক করে ওঠে বাপীর। চুরি করে পার পেলে আপত্তি হত না বোধ হয়। বড় সাধ, ওরও একদিন ঝকঝকে একটা সাইকেল হবে।

কিন্তু এক বছরে আশা অনেক ফিকে হয়ে এসেছে। পিসীর কথা বাবা কানে তোলে না। পিসীর দরদ আছে। দুধের ছেলের অত পথ হাঁটাটা তার বুকে লাগে। নিজের উদ্যোগে ভাইপোর সাইকেল চড়াটা শেখা হয়ে গেছে যখন, সাইকেল একটা ওকে কিনে দেওয়াই উচিত। এই উচিত কথাটা বাবাকে অনেকবার শুনিয়েছে পিসী। গোড়ায় গোড়ায় বাবা কোনো জবাবই দেয়নি। আড়াল থেকে বাপী কখনো তাকে ভুরু কোঁচকাতে দেখেছে, কখনো না শোনার মতো করে পাশ কাটাতে দেখেছে। কিন্তু পিসীব তাগিদে কামাই নেই। কারণ পিসীর ওপর বাপীর না-ছোড় জুলুম। শেষে বাবা একদিন মহা বিরক্ত। তেতে

উঠে পিসীকে বলল, প্রথম যেদিন বলেছ সেদিনই তোমার কথা আমার কানে গেছে। আমার কি মাটির তলায় টাকা পোঁতা আছে যে ভাবছ ইচ্ছে করে দিচ্ছি না? শুনে রেখেছি সুযোগ-সুবিধে যদি হয় কখনো—দেব। রোজ তোমার এই এক বায়না নিয়ে আসার দরকার নেই।

বাস, সেই থেকে পিসীরও আর তাগিদ দেওয়ার সাহস নেই।

ডালের কড়া নামিয়ে সুধারাণী ভাইপোর মুখখানা দেখলেন একবার।—সকাল থেকেই বুঝি স্কুলে না যাবার ফন্দি আঁটছিস—তোর বাবা সাইকেল কিনে না দিলে আমি কি করব—আমার টাকা আছে?

বাপীর চোখে পিসীর টাকা না থাকাটাও অপরাধ।—টাকা নেই তো স্কুলে পাঠানোর এত গরজ কেন? আমার কষ্ট হয় না? আজ আমি স্কুলে যাব না—যাবই না।

পিছনে বাবার চটির আওয়াজ কানে আসতে সচকিত। তাঁরও চানে যাবার সময় এটা। খেয়েদেয়ে দশটার মধ্যে হরিনারায়ণবাবু দপ্তরে গিয়ে বসেন। অধস্তনদের কাছে তিনি কেরানীবাবু। অন্যদের কাছে শুধু হরিবাবু। সকালের কাজ সেরে দিদিকে কাঠের আলমারির চাবি দিতে এসেছেন। ওই আলমারিতে দরকারী কাগজপত্র থাকে।

ছেলের কথা কানে যায়নি, চড়া গলা শুনেছেন। মুখ দেখেই কিছু একটা ঝকাঝকির আঁচ পেলেন।—কি হয়েছে?

বাপী পালাবার পথ খুঁজছে। কিন্তু বাবা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সুধারাণী সামাল দিতে চেষ্টা করলেন, ওর আজ পা কনকন করছে, অত পথ হেঁটে স্কুলে যেতে চাইছে না—

বাপীর মনে হল চোখ দুটো দিয়েই বাবা ওর কান টেনে ধরল। কথাগুলো ঠাস ঠাস করে দু-গালে দুটো চড় পড়ার মতো।—দশ মিনিটের মধ্যে চান সেরে খেতে বোস—

বাপী পাশ কাটালো। বাবার ওপরেই সব থেকে বীতশ্রদ্ধ। আড়াল থেকে পিসীর গলা কানে আসতে সাগ্রহে কান পাতল।

—তোর সবেতে বেশি বেশি, ওইটুকু ছেলের রোজ অত পথ হাঁটতে কষ্ট তো হয়ই—একটা সাইকেল কিনে দিবি-দিবি করেও তো দিলি না।

বাবার চাঁছাছোলা জবাব।—ওর থেকে ঢের বেশি কষ্ট আমরা করেছি—এখনো করছি। অত বেশি আসকারা দিও না, গরিবের ছেলে গরিবের মতো বাড়তে দাও। একটা সাইকেল কিনতে অনেক টাকা লাগে, বুঝলে?

ঠক করে কাঠের মেজেতে চাবি ছুঁড়ে দেওয়ার শব্দ। তা সত্ত্বেও পিসীর গলা কানে এলো আবার, তুই তো কেবল আসকারা দিতেই দেখিস—কবে পাঁচ-পাঁচ দশ মাইল রাস্তা ঠেঙিয়ে স্কুলে গেছিস এসেছিস—বাড়ির দোরগোড়ায় স্কুল ছিল। নতুন না পারিস, দেখে-শুনে একটা পুরনো কিনে দে না—

আড়ালে বাপীর উৎফুল্ল মুখ। পিসীর সাহস আছে বলতে হবে। বাবার ফটফট চটির আওয়াজেই মেজাজ বোঝা যায়। বাপী আড়াল থেকে হাওয়া।

খেয়েদেয়ে সময়মতো কাঁধে বইয়ের থলে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। এই মেঘলা

দিনে স্কুলে যেতে হচ্ছে। মুখ ভার। কিন্তু পিসীর ওপর আর রাগ করা সাজে না। বাইরে বেরিয়ে সরোষে আকাশের দিকে তাকাতে মেজাজ আরো বিগড়লো। নীল আকাশের বুক-জোড়া মস্ত একখানা কালচে অথচ হালকা মেঘের চাদর বিছানো। গা-পোড়ানো রোদের ছিটে-ফোঁটা নেই। ঠাণ্ডা, মিষ্টি বাতাস। বাঁধানো রাস্তার পাশ ঘেঁষে জঙ্গল। অদূরের লম্বা-লম্বা গাছগুলো এখন থেকেই গম্ভীর। বাপীকে স্কুলে যেতে হচ্ছে বলে ওরাও যেন মনমরা। সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল বাবা বলে কোনো মানুষ যদি দুনিয়ায় না থাকত।

—কি রে, স্কুল চললি? পিছন থেকে কাঁধের কাছে মাঝারি জোরের চাপড় একখানা। আবু রব্বানী। ওর হাতে নিজের মাথার থেকেও এক হাত লম্বা সেই পাকা পোক্ত লাঠি —যেটা দেখলে বাপীর দু চোখ জুড়িয়ে যায়। আবুরও সব থেকে পিয়ারের জিনিস ওইটি। লাঠির একদিকে রূপোর মতো ঝকঝকে বড়-সড় একটা ইস্পাতের ফলা গোঁজা। ওটা দিয়ে সাপ-খোপ ছেড়ে মাঝারি সাইজের জন্তু-জানোয়ারকে অনায়াসে ঘায়েল করা যায়। ঘায়েল করার দৃশ্য বাপী নিজের চোখেই কম দেখেনি। কিন্তু বাইরে থেকে ইস্পাতের ধারালো ফলা দেখা যায় না। লোহার প্যাঁচঅলা ক্যাপে ঢাকা। যেন একদিকে লোহা বাঁধানো পাকাপোক্ত লাঠিই একটা। আবুর হাতে ওই লাঠি দেখেই বাপী বুঝে নিল ও এখন জঙ্গল চুঁড়তে যাচ্ছে।

—পড় পড়, ভালো করে লেখা-পড়া না শিখলে মানুষ হবি কি করে। লেখা-পড়া শিখে বাবু হবি, এই আবুই তখন আবার তোকেও সেলাম ঠুকবে—

পর পর অনেক বার ফেল করে আবু এ বছরই স্কুল ছেড়েছে। নইলে এবারে বাপীর সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তে হত। মুখে বিকার নেই, কথাগুলোও গম্ভীর। বাপীর তবু মনে হল ঠাট্টাই করছে। এই দিনেও স্কুলে যেতে হচ্ছে ঠাট্টা করবে না তো কি। লাঠি হাতে আবুকে দেখেই স্কুলের বিতৃষ্ণা আরো বুক ঠেলে বেরিয়ে আসছে। জিজ্ঞাসা করল, তুমি জঙ্গলে যাচ্ছ বুঝি?

—তা ছাড়া কোন চুলোয় আর যাব। বাপের হুকুম সকাল-বিকেল এখন জাঙল ঠেঙাতে হবে। মতলবখানা বুঝলি না, এরপর তোর বাপকে ধরা-করা করে বীটম্যানের খাতায় আমার নামটা ঢোকাতে চেষ্টা করবে।

বাপীর বিবেচনায় সেটা মস্ত ভাগ্যের কথা। বাবার মতো কেরানীবাবু হওয়ার থেকে বীটম্যান হওয়া ঢের ভালো। একটা বড় নিঃশ্বাস ঠেলে বার করে সখেদে বলল, আমার আজ একটুও স্কুলে যেতে ইচ্ছে কচ্ছিল না—বাবার গুঁতোয় যাচ্ছি।

আবুর সঙ্গে আবুর মতো করেই কথাবার্তা বলতে চেষ্টা করে বাপী।

ঢিমেতালে চলতে চলতে তাচ্ছিল্যভরে আবু জবাব দিল, ইচ্ছে না করলে কোন বাপ আবার ঠেলে পাঠাতে পারে—মন না চায় যাবি না।

লোভ বাড়ছে। আবার ভয়ও।—বাবা টের পেয়ে গেলে?

—ভোঁতা মাথা হলে টের পাবে আর গায়ের ছাল ছাড়াবে। সময়ে স্কুলে রওনা হয়েছিস, আবার সময়ে লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘরে ফিরবি—টের পাবে কেমন করে?

চাপা উত্তেজনায় বাপীর বুক দুরুদুরু। তার পরেই আবার হতাশা।—অ্যাবসেন্ট হলে কাল যে আবার দরখাস্ত দিতে হবে স্কুলে, তখন টের পাবেই।

দাঁড়িয়ে গিয়ে আবু ঘাড় বেঁকিয়ে ওর বুদ্ধির বহর দেখে নিল। তারপর হালছাড়া

গলায় বলল, তুই বরং স্কুলেই চলে যা। কি করে যে পাসটাসগুলো করিস বুঝি না —এক বাবা ছাড়া পিরথিবীতে আর গার্জেন নেই? পাঁচ দিন সাত দিনের জন্য বাপ অন্য জঙ্গলের কাজে গেছে বললে মাস্টাররা কি যাচাই করে দেখতে আসবে নাকি? বাপ না থাকলে তখন পিসী সই করলে চলবে না? পিসীর সই করা মানে বাঁকা-চোরা করে তোর সই করা—

বুকের ভিতরে আবার দুরুদুরু বাপীর।

—শোন, তোকে ধরার তালেই ইদিক দিয়ে এলাম। আমি সামনে এগিয়ে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ছি—ইচ্ছে থাকে তো তুইও ফাঁক বুঝে ঢুকে পড়। মেঘলা দিনে আবার জন্তু-জানোয়ারগুলোর প্রেম বেশি চনমন করে ওঠে—

লোভের শেষ আস্ত রাজভোগখানা ছুঁড়ে দিয়ে আবু হনহন করে খানিক পথ ভেঙে জঙ্গলে ঢুকে গেল। বাপী সেখানেই মিনিট খানেক ঠায় দাঁড়িয়ে। এই লোভ সামলানোর সাধ্যি আর নেই। পিছনের জঙ্গলের মধ্যেই আবুদের মেটে ঘর। ওকে ধরার জন্যেই এই পথ ধরে এসেছে। ওইটুকু সব বাধা আর সব নিষেধ তুচ্ছ করার মতো যথেষ্ট। তার ওপর মেঘলা দিনে জন্তু-জানোয়ারগুলোর প্রেম চনমন করে ওঠার কথা।

পিছনে ঘুরে দেখে নিল। কেউ আসছে না। চোখের পলকে সে-ও ওখান থেকেই জঙ্গলের আড়ালে।

প্রেম বলতে বাপী এতকাল পিসীর মুখে রাজপুত্র রাজকন্যার প্রেমের কথাই শুনে এসেছে। রূপকথার রাজপুত্র মেঘ-বরণ চুল রাজকন্যার খোঁজে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে জঙ্গল পাহাড় টপকে সাগর পেরিয়ে রাক্ষসের দেশ থেকে ঘুমন্ত রাজকন্যাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসছে। পাশা খেলে ডাইনী পাশাবতীর দফা রফা করে, নয়তো একডুবে কাজলদীঘির তলা থেকে সোনার কৌটা তুলে তলোয়ারের ঘায়ে ভোমরা-ভোমরি দুখানা করে এক-একটি রাজপুত্র এক-একটি সোনার বরণ রাজকন্যাকে ঘরে এনে ধুমধাম করে বিয়ে করেছে। পিসীর মুখে ওইসব গল্প শুনেও বুকের রক্ত টগবগ করে ফোটে, উত্তেজনায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়। খানিকক্ষণের মধ্যে বাপী নিজেই সেই সব রাজপুত্র বনে যায়।

কিন্তু জঙ্গলের জীবগুলোর প্রেম একেবারে অন্য ব্যাপার। কোন্‌টা ওদের ভালবাসা-বাসি আর কোন্‌টা মারামারি খেয়োখেয়ি এখনো ভালো বুঝতে পারে না। এই ব্যাপারে আবু ইদানীং ওকে একটু-আধটু পাঠ দিচ্ছে। একটু একটু করে ভারী মজাদার নিষেধের জগতের পর্দা সরাচ্ছে। নইলে আগে চোখে দেখতে পেলেও বাপী কি কিছু বুঝতে পারত! এখনো পারে না, আবু বলে দিলে ঠকে শেখে। ভালবাসা-বাসি করতে হলে জীবগুলোরও একটা মেয়ে, আর একটা পুরুষ দরকার হয়, তা-ই জানত না।

এই পাঠ শুরু মাস দুই আগে। দূরে একটা বন-মোরগকে ছুটে আর একটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে বাপী হাতের পাথর তুলেছিল। দুটোকেই একসঙ্গে শেষ করবে। আবু থামালে।—দাঁড়া, প্রেম করছে দেখছিস না, এ সময় মারতে হয়!

বাপী হাঁ।—মারামারি করছে না?

আবু হেসে সারা। তারপর এযাবৎ আশপাশের অনেক জানোয়ারেরই প্রেম করাটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে ওকে। এমন কি খরগোশ বা কাঠবেড়ালীর প্রেমও বাপী

এখন একটু-আধটু আঁচ করতে পারে। তবু গেল রোববারেই তো এক তাজ্জব ব্যাপার দেখে ঠকেছে।

সেদিন জঙ্গলে পাশাপাশি চলতে চলতে আবু কি দেখে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেছল। তারপরেই সেই অদ্ভুত দৃশ্যটা বাপীও দেখেছে। দুটো সাপ একটা আর একটাকে জড়িয়ে পাকিয়ে লেজে ভর করে একেবারে ভুঁয়ে পোঁতা লাঠির মতো দাঁড়িয়ে আছে। দুটোর ফণাও মুখোমুখি, লাগালাগি।

আবুর সঙ্গে আড়ালে সরে গিয়ে তাজ্জব দৃশ্যটা অনেকক্ষণ ধরে দেখেছে। আবু ফিস্ ফিস্ করে বলেছে, প্রেমে বাগড়া দিলে ক্ষেপে গিয়ে দুটোই একসঙ্গে তাড়া করবে। সাবধান, জোরে নিঃশ্বাসও ফেলবি না!

হাঁ করে বাপী দেখেছে আর বুঝেছে, এ-ও প্রেম। সেই দিনই পরে আবুর মুখে বাঘের প্রেমের গল্প শুনে বাপীর গায়ে কাঁটা! প্রেম করার সময় হলে বাঘিনী নাকি ডেকে ডেকে কাছাকাছির বা দূরের বাঘকে জানান দেয়। সেই প্রেমের ডাক আবু নিজের কানে শুনেছে। ওই ডাক শুনে কখনো আবার একটার বেশি পুরুষ বাঘ এসে হাজির হয়। বাঘিনীকে পাবার জন্য দুই বাঘের মধ্যে তখন যাকে বলে একেবারে খতমের লড়াই। যে জিতবে বাঘিনী তার। আর, বাঘিনীর প্রেমের ডাকে সাড়া দিয়ে যদি একটাই বাঘ আসে তো সে ব্যাটাও নিজের বীরত্ব দেখিয়ে বাঘিনীর মন পাবার জন্য একগাদা পশু মারবে—যা খাবে না তার থেকেও ঢের বেশি।

ক'দিন ওই প্রেমের পাঠ শুনে আর নিজের চোখেও অনেক দেখার পর বারো বছরের বাপীর ধারণা, জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারের ভালোবাসা-বাসিটা রূপকথার রাজপুত্র রাজকন্যার মতো। ঝাঁপাঝাঁপি ঝকাঝকি জড়াজড়ির ব্যাপার। তার চোখে দেখা বানারজুলির মানুষ বা মেয়েমানুষেরা রূপকথার ছেলেমেয়ের মতো নয়। আবার জঙ্গলের জীবজন্তুর মতোও নয়। অথচ আবু বলে, মেয়ে-পুরুষের ভালোবাসাবাসি না হলে কেউ জন্মাতোই না—বাপী না, আবু না, পৃথিবীর কেউ না। অবাক কথা। বাপী যেটুকু বোঝে তার থেকে বেশি অস্পষ্ট থাকে। কেউ বলে দেয়নি. নিজের ভিতর থেকেই কেমন করে জেনেছে এসব দেখাশোনা বা বোঝাটা ভয়ানক গোপনীয় ব্যাপার। আবার এত গোপনীয় বলেই জানার ভীষণ লোভ।

আজকের মতো এমন দিন হয় না। বাবার ভয়-ডর উবে গেছে। এমন ছুটির স্বাদ আলাদা। কেবল একটু আফসোস হাতে নিজের লাঠিটা নেই। জঙ্গল থেকে সরু একটা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে মনের আনন্দে ছোট গাছ আর ঝোপঝাড় পেটাতে পেটাতে আবুর পাশাপাশি চলেছে। কাঁধের বই-খাতার থলের বোঝাটা একজন বীটম্যানের কুঁড়েতে জিম্মা রেখে নিশ্চিন্ত। ঘরে ফেরার সময় তুলে নিয়ে যাবে।

মেঘলা আকাশের ঠাণ্ডা অথচ ঝিমুনো ছোঁয়াটা জঙ্গলে সেঁধিয়েছে। এ রকম হয় বলেই বাপীর ভালো লাগে। আজ অনেক দূরে চলে যাবার ইচ্ছে। একেবারে পাহাড়-ঘেঁষা বাঘ বা চিতার ডেরার দিকে না হোক, এক-আধটা ভালুক-টালুকের মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছে। বিপাকে না পড়লে এখানকার ভালুক মানুষ তাড়া করে না, উল্টে পালায়। আবু অনেক দেখেছে। ও নাকি ভালুকের ভালোবাসাবাসিও দেখেছে।

কিন্তু কিছুটা যেতে যে জিনিসটা চোখে পড়ল সে অন্য ব্যাপার। খুব সুন্দরও। একটা

বড় ময়ূর রং-বেরঙের বিশাল পেখম মেলে দাঁড়িয়ে আছে। আর ঘুরেফিরে এক-একবার ঢং করে নাচছে। ওটার সামনে আর একটা পেখমছাড়া ময়ূর পোকামাকড় খুঁটে খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে মুখ তুলে পেখমমেলা বড় ময়ূরটাকে দেখছে।

আবু মন্তব্য করল, কেমন প্রেম করছে দ্যাখ—

বাপী দাঁড়িয়ে গেল। মেঘলা দিনে পেখম ছড়ানো ময়ূর অনেক দেখেছে। নাচতেও দেখেছে। কিন্তু প্রেমের ব্যাপারটা মাথায় আসেনি।

—সামনের ওই কুচ্ছিতটা মেয়ে ময়ূর?

—না তো কি। নেচে নেচে রূপের বাহার দেখিয়ে ওকে ভোলাচ্ছে।

বাপীর আরো খানিক দাঁড়িয়ে দেখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আবু তাড়া দিল, এসব তো দুধের খোকারা দেখবে—আয়।

ঘণ্টা দুই আড়াই জঙ্গলখানা মন্দ চষা হল না। এরকম তো কতদিন কতবার করেছে, কিন্তু আনন্দটা সব সময় আনকোরা নতুন। বাপীর একটু খেদ বড় জানোয়ার একটাও চোখে পড়েনি। বাপী আর এক দিকের গভীরে খানিক এগোতে চেয়েছিল। আবু বাধা দিয়েছে, ওদিকে নয়, বুনো শূয়োর বেরোতে পারে।

দাঁতাল বুনো শূয়োর কি ভয়ংকর জীব বাপীর শোনা আছে। ভালুকের মতো নয়, দেখলে সোজা তেড়ে আসে। এ জায়গাও নিরাপদ খুব নয়, এসে হাজির হলেই হল। তখন চটপট কোনো গাছে উঠে পড়লে বাঁচোয়া। এদিকে সেরকম গাছের অভাব নেই।

আবু আর ঘুরতে রাজি নয়। তার খিদে পেয়েছে, ঘরে যাবে। বাপীকেও আসতে বলল। যা আছে ভাগ করে খাওয়া যাবে। তারপর ফের জঙ্গলে এসে আড্ডা দাও বা যত খুশি ঘোরো।

কিন্তু দু কদম না এগোতেই ঝমঝম চেনা শব্দ। তারপর যে কাণ্ড দুজনারই খিদে-টিদে সিকেয়। দিব্যি বড়সড় সজারু একটা। ওদের দেখেই পালাচ্ছে। ওটাকে দেখামাত্র চাপা উত্তেজনায় আবুর অন্য মুখ। ফলে বাপীরও। চোখের পলকে ছিটকে গিয়ে আবু ওটার পিঠে ডাণ্ডার গোটাকতক পেল্লায় ঘা বসিয়ে দিল লোহামোড়া দিকটা দিয়ে। সারা গায়ের এক বিঘৎ মোটা মোটা কাঁটাগুলো মেলে দিয়ে সজারুটা দাঁড়িয়ে লড়ছে, আবার গর্তের দিকে ছুটছে। ওর গর্ত সামনের ওই চারা গাছগুলোর বেড-এর দিকে।

আবু ছুটে গিয়ে সেই গর্তটা বার করে তার মুখ আগলালো। ওকে চেঁচিয়ে হুকুম করল, হাতে পাথর তুলে নে, ওদিক দিয়ে না পালায় তুই দ্যাখ—একটা সজারু মারার সাধ অনেক দিনের—এ শালাকে আজ মারবই। বলতে বলতে লাঠি থেকে লোহার খাপ খুলে ইস্পাতের ঝকঝকে ধারালো ফলাটা বার করে লাঠি বাগিয়ে ধরল।

কিন্তু অত বড় সজারু মারা সহজ নয়। ওই বড় বড় কাঁটার আড়ালে আসল জীবটিকে পাওয়া ভার। না চলে লাঠি, না পাথর। ওটার যেমন প্রাণপণ বাঁচার লড়াই এদের তেমনি মারার। ইস্পাতের ফলার খোঁচায় কাঁটাগুলো রক্তাক্ত। লাঠি আর পাথরের ঘায়ে ভেঙেছেও অনেকগুলো। শেষে ওটা ঝিমিয়ে পড়তে আবু অনেক কাছে গিয়ে ধারালো ফলার দিকটা মোক্ষমভাবে বসাতে পারল। ওরকম বার কয়েকের চেষ্টায় ওটার ভবলীলা সাঙ্গ।

এই উত্তেজনার ফাঁকে কম করে ঘণ্টা-সোয়াঘণ্টা পার। বাপীর হাঁপ ধরে গেছে।

ধুলোমাখা রক্তাক্ত জীবটাকে দেখে গাও ঘুলোচ্ছে। কিন্তু আবু ফূর্তিতে টইটম্বুর। পকেটে ধারালো ছোরা একটা থাকেই। গাছ থেকে দড়ির মতো একটা লম্বা ঝুরি কেটে এনে তার এক মাথা দিয়ে ওটার গলার দিকটা শক্ত করে বাঁধল। তারপর টেনে নিয়ে চলল। আবুর কথা শুনে বাপীরও গা-ঘুলনো ভাবটা গেছে। অত বড় সজারুটা মারার জন্য আবু নাকি জঙ্গল আপিস থেকে এক টাকা বা দু টাকা প্রাইজ পাবে। সজারু চারাগাছের বেড-এর নরম মাটির তলা দিয়ে লম্বা গর্ত করে চারাগাছের বারোটা বাজিয়ে দেয়। তাই সজারু মারলে পুরস্কার। তাছাড়া সজারুর মাংস খেতে চমৎকার। কম করে সাত-আট সের মাংস হবে ওটার। আবুর বাড়িতে আজ ভোজ লাগবে। বাপীর নেমন্তন্ন তো বটেই। আর বড় সজারুর কাঁটাও ফেলনা নয়। ড্রইং করার কলম হয় ওই দিয়ে। আবু হেসে উঠল।—আচ্ছা ওরা প্রেম করে কি করে বল তো, নড়লে চড়লেই তো বড় বড় কাঁটা।

মাথা ঘামিয়ে বাপীও ভেবে পেল না।

আধ ঘণ্টা ধরে পালা করে ওটাকে হিঁচড়ে টেনে জঙ্গলের বাইরে পাকা রাস্তায় এনে ফেলল। টানতে সুবিধে, কেরামতিটাও লোক দেখবে। আনন্দে বাপী স্কুল পালানোর বিপদও ভুলেছে। কারণ এত বড় একটা বাহাদুরির পিছনে সেও আছে। রাস্তার লোকেরা জীবটাকে দেখছে আর ওদেরও দেখছে। কেউ কেউ আবার দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করছে—কোথায় পেল, বা কি করে মারল।

লম্বা রাস্তাটা বাঁক নিতে সামনের দিকে চেয়ে দুজনেই অবাক। খোদ বড় সাহেবের ছবির মতো সুন্দর বাংলোর সামনে মালবোঝাই ট্রাক একটা। তার পিছনে জিপ।

সেখানে ছোট সাহেব অর্থাৎ ফরেস্টার, ফরেস্ট গার্ড, কেরানীবাবু অর্থাৎ বাপীর বাবা, আবুর বাবা হেড বীটম্যান কালু, তার সঙ্গে আরো কয়েকজন বীটম্যান পিওন—সকলেই ব্যস্তসমস্ত। নীচের কর্মচারীরা ট্রাকের দড়ি খুলে মাল নামানোর তোড়জোড় করছে।

বানারজুলি জঙ্গলের সর্বময় কর্তা রেঞ্জ অফিসারের বাংলো ওটা। বড় সাহেবের বাংলো। অবাঙালী বড়সাহেব বদলি হবার ফলে প্রায় তিন সপ্তাহ বাংলোটা খালি পড়ে ছিল।

আবু বলল, নতুন বড়সাহেব এলো বোধহয়। শীগগির আয়—

বাঁধা সজারুটাকে টানতে টানতে প্রায় ছুট লাগালো আবু। সেখানে আব্বা আছে, কেরানীবাবু আছে, ছোটসাহেব আর বীটম্যানরা আছে—সকলের সামনে খোদ বড়সাহেবকে কেরামতিটা দেখাবার এমন মওকা আর পাবে কোথায়?

পায়ে পায়ে বাপীও এগিয়ে এসেছে। স্কুল পালানোটা আর মনেই নেই। জিপটার দিকে চোখ। ফরেস্টার সাহেব আর বাবা যাকে তোয়াজ করছে ওই ছিপছিপে সুন্দরপানা সাহেবটিই নিশ্চয় নতুন রেঞ্জ অফিসার। তার দু হাত দূরে ঝকমকে শাড়ি পরা মেমসাহেব। বেশ সুন্দর দেখতে। মেমসাহেবের সামনেই একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। ছেলেটা বড়। পরনে ধপধপে সাদা হাফপ্যান্ট আর হাফশার্ট। আর চকচকে রঙীন ফ্রক পরা মেয়েটার ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল, ফুটফুটে ফর্সা রং, ফোলা ফোলা লালচে গাল...পুতুল পুতুল মুখ।

বাপী হাঁ করে মেয়েটাকেই দেখছে।

আবুর বরাত খারাপ। লতার দড়ি-বাঁধা ওই পেল্লায় মরা সজারু এনে ফেলতে সকলে যখন সচকিত, খোদ বড়সাহেবের বিরক্ত মুখ। মেমসাহেব আঁতকে ওঠার দরুন হতে পারে। আরদালি পিওন ফরেস্ট-গার্ড বীটম্যানরা দুচার মিনিটের জন্য অমনোযোগী হল বলেও হতে পারে। এতে হয়ত দণ্ডমুণ্ডের মালিকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার গুরুত্বে ঘা পড়ল। তার ওপর মেমসাহেবের নাক-মুখ কোঁচকানো বিরক্তি।—মাগো, কি বিচ্ছিরি —সরিয়ে নিতে বলো!

আবুর ভেবাচাকা মুখ। ছেলের কেরামতি দেখে ওর বাবা কালুর দু চোখ আনন্দে চকচক করে উঠেছিল। বড়সাহেবের বাহবা আশা করেছিল। মেমসাহেবের কথা শুনে আর বড়সাহেবের মুখ দেখে রক্ত জল। আগুন চোখে ছেলের দিকে ফিরে তাকানোর আগেই ত্রস্ত আবু তার সজারু সমেত রাস্তার ওধারে জঙ্গলে নেমে গেল। সব থেকে বেশি ঘাবড়েছে ও-ই।

ফুটফুটে মেয়েটা সভয়ে মায়ের তিন পা পিছনে চলে গেছল। দেখার জন্য এবারে রাস্তার এধারে এগিয়ে এলো। তার দাদাকে রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের দিকে খানিকটা নেমে দাঁড়াতে দেখে এগিয়েছে। তবু সাহস দেখে বাপীর হাসি পাচ্ছে। মেয়েটা বলছে, এই দাদা, আর নামিস না—

জঙ্গল থেকে রাস্তা অনেকটা উঁচু। মরা সজারুটাকে টেনেহিঁচড়ে আবু ততক্ষণে ঝোপঝাড়ের আড়ালে। বাপীর বরাত ভাল, তার ব্যস্তসমস্ত বাবা তখন মাল রাখার তদারকির কাজে বাংলোর ভিতরে। এই অপ্রিয় ব্যাপারটা দেখলে বা জানলে দুর্ভোগ হত। ঘর্মাক্ত কলেবরে এবারে বাইরে আসতে ছেলের দিকে চোখ গেল। বাপী জঙ্গলের দিকে মুখ করে সাহেবের মেয়ের পিছনে দাঁড়িয়ে।

কাঁধের নীচে বাবার হাতের হ্যাঁচকা টান পড়তে মুহূর্তের জন্য মুখ আমসি। পরের মুহূর্তে অবাক। ঘাম-ঝরা হাসিমাখা মুখ বাবার। স্কুল-ফুল ভুলে গেছে। ওকে বড়সাহেবের সামনে টেনে বলল, প্রণাম কর্—

সাহেবের ধুলোমাখা বুটে প্রণাম ঠুকে ওঠার ফাঁকে আবার বাবার চিনিগলা কথাই কানে এলো।—মা-মরা এই একটাই ছেলে আমার স্যার, আশীর্বাদ করুন—

বড়সাহেব সামান্য মাথা নাড়লেন। বাবার হুকুমে মেমসাহেবকেও স্যাণ্ডালপরা পা ছুঁয়ে প্রণাম সারতে হল। তাদের মেয়ে এদিকে ঘাড় বেঁকিয়ে ওকে দেখছে।

বাবার ভাবনা গেছে। হাল্কা পায়ে বাপী আবার মেয়েটার কাছে এসে দাঁড়াল। আগের আধ-বুড়ো খোট্টা বড়সাহেবের ছেলেমেয়ে ছিল না। মেয়েটার সঙ্গে কথা বলার লোভ খুব। চেষ্টার দরকার হল না, ও-ই কথা বলল।

—ওটা কি মেরে এনেছিলে?

—সজারু।

—কি করে মারলে?

—লাঠি পাথর আর লাঠির মধ্যে ইস্পাতের ফলা গোঁজা আছে—তাই দিয়ে।

—তুমি মারতে দেখেছ? শুনেই গা শিরশির করছে যেন মেয়েটার।

—আমি আর আবুই তো মারলাম ওটা।

এবারে বড় বড় চোখ করে ওকে ভালো করে দেখার দরকার হল যেন।—ভয় করল না?

—নাঃ।

—ওটা তাড়া করল না?

—তাড়া করবে কি, ভয়ের চোটে গর্তে ঢুকতে চাইছিল। আবু গর্তের মুখ আগলে ছিল।

মেয়েটার চোখেমুখে অবিশ্বাস। আর একবার ওকে ভালো করে দেখে নিল।—তুমি এইটুকু ছেলে, তুমি মেরেছ না আরো কিছু—

ওকে বিশ্বাস করানো যেন বাপীর দায়।—আবুকে জিগ্যেস করে দেখো, ও তো আর মিথ্যে কথা বলবে না।

বিশ্বাস করা তবু সহজ নয়।—তোমার নাম কি?

—বাপী।

হেসে উঠল। সার বাঁধা ছোট দাঁতের সারির ঝিলিক।—বাপি তো বাবাকে বলে--ওই তো বাপি।

হাত তুলে বাবাকে দেখালো।

মজার কথায় বাপীরও মজা লাগল একটু। জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি?

—মিষ্টি।

এবারে বাপী হাসল।—মিষ্টি তো লোকে খায়—

মেয়েটা প্রতিবাদ করল, যেমন বুদ্ধি তোমার, আমি মিষ্টি দেখতে বলে দাদু নাম রেখেছিল মিষ্টি—আমার ভালো নাম মালবিকা নন্দী—তোমার ভালো নাম নেই?

মনে মনে বাপী বলল, মেয়ের অহংকার দেখো, নিজেই বললে মিষ্টি দেখতে। কিন্তু মিষ্টি যে সত্যি ভারী মিষ্টি দেখতে অস্বীকার করার উপায় নেই।

—বিপুলনারায়ণ তরফদার।

—মা-গো, কি বিচ্ছিরি নাম তোমাদের জংলা দেশে বুঝি এ-রকম সব বড় বড় নাম হয়?

নাম নিয়ে বাপী কখনো মাথা ঘামায় না শুনে রাগ হলেও প্রকাশ করার উপায় নেই।—এর আগে তোমরা জঙ্গলে ছিলে না

—ছিলাম তো, ময়নাগুড়ির জঙ্গলে ছিলাম। সেখান থেকে এখানে বদলি হয়ে এলাম।

বাপীর হাসিই পাচ্ছে, যেন ও-ই রেঞ্জ অফিসার, এক জঙ্গল থেকে আর এক জঙ্গলে বদলি হয়ে এলো। বলল, তাহলে তুমিও তো জংলা দেশের মেয়ে।

তক্ষুণি মুখ-মচকানো জবাব।—এঃ, আমার কলকাতায় জন্ম—বুঝলে? সেখানে মায়ের বাবা থাকে, দাদুর কাছে ছ বছর ছিলাম আমরা—তুমি কলকাতা দেখেছ?

দেখেনি যখন বাপীর মাথা নাড়া ছাড়া উপায় কি। মেয়েটা মুখ ঘুরিয়ে দেখে নিল, বাবা-মা বাংলোর ভিতরে চলে গেছে, দাদাও রাস্তায় নেই।

—কলকাতা দেখনি আবার ফটফট করছ—তুমি জংলি ভূত একটা—

খিল খিল করে হাসতে হাসতে বাংলোর দিকে ছুট।

বাপীর রাগ হবার কথা। কিন্তু একটুও রাগ হচ্ছে না। অবাক চোখে বাংলোটাকেই দেখছে। ওই আঙিনায় ঢোকার তাগিদ কখনো বোধ করে নি। আজ করছে। ঢুকলে সাহেব মেমসাহেবের কথা জানে না, বাবা যে তেড়ে আসবে এটুকু বোধ আছে।

রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে নামল। আবুর টিকির দেখা নেই। এতক্ষণে তার ঘরের কাছাকাছি চলে গেছে হয়তো। বেচারা আবুর এমন একখানা সজারু মারার কদর হল না। ওই মেমসাহেবের জন্যেই হল না। একেবারে ননীর শরীর, দেখেই মূর্ছা গেলেন। না, দেখতে ভালো হলেও মেমসাহেবকে ওর একটুও ভালো লাগে নি। ওদের ছেলেটারও দেমাক খুব, একটা কথাও বলল না। কিন্তু মিষ্টি মেয়েটা কি মিষ্টি কি মিষ্টি! হাসলে সুন্দর, মুখ মচকালে সুন্দর, আবার সজারু দেখে ভয়-পাওয়া মুখখানাও সুন্দর। কথা শুনে এক-একবার রাগ হচ্ছিল বাপীর। কিন্তু তাও বেশ লাগছিল। চা-বাগানের বাবুদের ছোট-বড় আরো অনেক মেয়েকে খুঁটিয়ে দেখেছে, কিন্তু মিষ্টির মতো কেউ না। আর তাদের এত দেমাক যে কেরানীবাবুর ছেলের সঙ্গে কথাই বলে না। বড়সাহেবের মেয়ে মিষ্টি সেধে কথা বলেছে। কত কথা আর মিষ্টি মিষ্টি কথা।

জঙ্গলের পথ ছেড়ে আবার রাস্তা ধরল। বাড়ি। বই খাতা সেই বীটম্যানের ঘরেই পড়ে থাকল তাও মনে নেই। ঘরে ঢোকার মুখে মনে পড়ল। পিসী সামনে নেই, জেরায় পড়তে হল না।

—পিসী! মিষ্টি এসে গেছে—!

ভিতরের দাওয়ায় বসে ওর জন্যেই জলখাবারের রুটি বেলছিলেন সুধারাণী। অবাক হবারই কথা, বাইরে থেকে মিষ্টি কখনো কেউ আনে না। কখনো-সখনো তিনিই ঘরে তৈরি করে দেন।

—কোত্থেকে এলো, কে আনল?

বাপীর মুখে দুষ্টু-দুষ্টু হাসি—জঙ্গলের বড়সাহেব এলো আজ, আর তার সঙ্গে মেমসাহেব এলো—তাদের সঙ্গে মিষ্টি এলো।

ভালোমানুষ পিসী প্যাঁচ বুঝবে কেমন করে।—তোদের জন্যেও দিল বুঝি? কি মিষ্টি?

—বড়সাহেব আর মেমসাহেবের মেয়ে মিষ্টি। পিসীকে ঠকাতে পেরে বাপী হেসে উঠল।—নাম মিষ্টি দেখতে মিষ্টি কথাও মিষ্টি—আমার খেয়েই নিতে ইচ্ছে করছিল গো!

সুধারাণী বুঝলেন এবং ভাইপোর বজ্জাতির কথা শুনে না হেসেও পারলেন না। —শুনলে তোর নোলা ছিঁড়ে দেবে একেবারে—কি পাজী হয়েছিস তুই। যা মুখ হাত ধুয়ে আয়, আমি রুটি কখানা করে দিই চট করে—

পেটের আগুনও জ্বলছে এতক্ষণে। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই ঘুরে এসে পিসীর সামনে দাওয়ার ওপরেই বসে পড়ল। থালায় খাবার দেখে আর পিঁড়ি পাতার তর সইল না।

জঙ্গলের নতুন মনিবের খবর নেবার কৌতূহল সুধারাণীর। মনিব ভালো মানুষ হলে ভাইয়ের ভাগ্য। নইলে অনেক হেনস্থা। যখন-তখন ডাক পড়ে, কথায়-কথায় শাসায়। কেরানীবাবু-টাবুরা ঘরের কেনা গোলাম।—সাহেব মেমসাহেবকে কেমন দেখলি?

রুটি তল করতে করতে বাপী জবাব দিল, সাহেবের হুমো গম্ভীর মুখ, মেমসাহেব আর তার মেয়ে মরা সজারু দেখে ভিরমি খায়। দৃশ্য মনে পড়তেই হাসি। সোৎসাহে

সজারু মারা, আর আবুর সেটা সাহেব মেমসাহেবকে দেখাতে আনার ফলখানা বলে ফেলল।

গালে হাত দিয়ে শুনছিলেন সুধারাণী। শোনার পরে খটকা।—তুই স্কুলে ছিলি তো সজারু মারলি কি করে?

রুটি গলায় ঠেকার দাখিল। ফলে স্বর চড়া এবং বিরক্তি ভরা।—মাঝে মধ্যে স্কুল হাফ-হলিডে হয়ে যেতে নেই—বারো মাসই পুরো স্কুল হয়?

আর কাছে বসে থাকা নিরাপদ নয় বাপীর সে-জ্ঞান টনটনে। পিসীর চোখে ধুলো দিয়ে বই-খাতার ঝোলাটা নিয়ে আসতে হবে। শেষ আস্ত রুটি আর তরকারিটুকু একেবারে মুখে পুরে উঠে পড়ল।

পরের দশটা দিনের মধ্যে দুটো রবিবার, দুটো শনিবারের হাফ-ডে, আর কি এক পরব উপলক্ষে এক দিন ছুটি গেছে। সেই পাঁচটা দিনের বেশির ভাগ সময় বাপীর রেঞ্জ অফিসারের বাংলোর সামনে আর আশপাশে ঘুর ঘুর করে কেটেছে। স্কুলের দিনেও বিকেলে একবার করে পা দুটো ওকে এ-দিকে টেনে এনেছে। বাংলোর ভিতরের চত্বরে আর সামনের ওই চেয়ার-টেবিল সাজানো কাঠের বারান্দায়ও পা দিয়েছে। পরবের ছুটির দিনের সমস্ত দুপুরটা মিষ্টির সঙ্গে গল্প করে কেটেছে। ওর বাবা ভিতরে ঘুমুচ্ছিল। দীপুদা চা-বাগানের কোন্ নতুন বন্ধুর বাড়ি টহল দিতে বেরিয়েছে। বাইরের টেবিলে মিষ্টির একটা পাতলা বই, খাতা আর পেনসিল।

দুপুরেও মেয়ের পড়ায় কি মন—রাস্তার ঠিক পরেই ওদের গেটের মুখোমুখি ছোট গাছটার একটা ডালে গ্যাঁট হয়ে বসে বাপী মজা দেখছিল।...মিষ্টি পড়ার টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে কাঠের মেঝেতে বার কয়েক ঝাঁপ খেল। প্রতিটি ঝাঁপের পরে ঘাড় বেঁকিয়ে ঘরের দিকে তাকাচ্ছে। অর্থাৎ মা-বাবা ভিতর থেকে টের পেল কিনা। শব্দ না করে ঝাঁপ খাওয়ার কেরামতিটাই রপ্ত করছে মনে হল বাপীর। সে-খেলা শেষ হতে হাতের রাবার মেঝেতে ফেলে ফেলে এক পা তুলে টেবিল-চেয়ারের চারদিক ঘুরে এক্কা-দোক্কা খেলা চলল খানিক। তারপর লালচে মুখে খানিক এগিয়ে এসে গেট বরাবর মুখ করে দাঁড়িয়ে একটু একটু হাঁপাতে লাগল।

বাপী এই মওকায় কোকিলের ডাক ডেকে উঠল একটা। তারপর আরো একটা। কানা মেয়ে এদিক-ওদিক তাকালো। গাছটাও দেখল। কিন্তু পা ঝুলিয়ে বসে থাকা সত্ত্বেও ওর দিকে চোখ গেল না।

বাপী অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করছিল। অবাধ্য পা দুটো এর পর ওই গেট পেরুতোই, কিন্তু মনের তলায় মেমসাহেবের ভয়। মুখে কিছু না বললেও ওর আসাটা যে পছন্দ নয় সেটুকু বাপী গেল দিনই আঁচ করতে পেরেছিল। বিকেলে মিষ্টির ডাকেই ভিতরে ঢুকেছিল, তারপর সামনের আর পিছনের বাগানে মিষ্টির সঙ্গে ছোটাছুটি করে খেলা করছিল। এই মেয়ে ওর সঙ্গে ছুটে পারবে কেন। দশ গজ এগিয়ে দিয়েও ওকে হারিয়ে আগে গিয়ে বুড়ী ছুঁয়েছে। বারান্দার চেয়ারে বসে আগেও মেমসাহেব ওদের ছোটাছুটি লক্ষ্য করেছে। তার মুখখানা বাপীর অপ্রসন্ন মনে হয়েছে। গেল দিনে সব থেকে বেশি মনে হয়েছে। বার বার হেরে আদুরে মেয়ের মেজাজ খারাপ হচ্ছিল। এবারে তার অর্ধেকের বেশি এগিয়ে দাঁড়িয়ে ওকে হারানোর গোঁ। কিন্তু বাপী এমন অন্যায় হারা

হারতে রাজি নয়।

এই থেকে কথা কাটাকাটি। মেমসাহেব তখন বারান্দার এ-মাথায় এসে কড়া গলায় মেয়েকে চলে আসতে হুকুম করল। আর ওর দিকে এমন করে তাকালে যে বাপীর পা দুটো আপনা থেকেই গেটের দিকে। ফলে ভিতরের তাড়না সত্ত্বেও এ-দিনের দুপুরে ওই ছোট গেট পেরুনো নিরাপদ হবে কিনা ভাবছিল।

কোকিলের ডাকে কাজ হল না দেখে বাপী একটু জোরেই বার-দুই হাততালি দিল। গাছের ডালে এবারে ওকে আবিষ্কার করতে পেরে মেয়েটা পলকের জন্য হাঁ। তারপর এঁকমুখ হাসি। এমন মজার ব্যাপার আর যেন হয় না। তরতর করে কাঠের সিঁড়ি টপকে ছুটে গেটের কাছে এলো।

বাপী হাতের ইশারায় ওকে কাছে আসতে বলল। ঘুরে দাঁড়িয়ে মিষ্টি একবার ওদের ঝিমুনো বাংলোটা দেখে নিল। তারপর আস্তে আস্তে গেটের আঙটা সরিয়ে তিন-চার লাফে রাস্তার এধারে।

সামান্য গলা চড়িয়ে বাপী বলল, এক ঘণ্টা ধরে বসে আছি, টেবিল থেকে লাফালি, ধেই ধেই করে নাচলি, আর এদিকে একবার তাকালি না।

এর মধ্যে বাপী অনায়াসে তুমি থেকে তুই-এ চলে এসেছে। মিষ্টির কানে সেটা একটুও লাগে নি। হি-হি করে হেসে উঠল।—গাছের ওপর তোমাকে ঠিক হনুমানের মতো লাগছে।

রাগ হতে পারত, কিন্তু মিষ্টির হাসি দেখতে বেশি মজা। কাঠবেড়ালের মতো তরতর করে গাছ থেকে নেমে এলো।—জঙ্গলের ভেতরে যাবি? চল, খুব ভাল লাগবে—

ভয়ে ভয়ে মিষ্টি জঙ্গলের ভিতর দিকে চোখ চালাল একবার। লোভ একটু হচ্ছে। বাবার লোকজনের সঙ্গে ময়নাগুড়ির জঙ্গলে গেছে। মজা লাগে আবার গা ছমছমও করে।—তুমি একলাই জঙ্গলের ভিতরে চলে যাও?

—হরদম যাই। তোর ভয় করছে?

—ভয় করবে কেন, মা জানতে পারলে বকবে না? তাছাড়া বারোখানা অঙ্ক করে রাখতে বলেছে, না হলে দেবে একেবারে—

—কি অঙ্ক?

—কঠিন কঠিন অঙ্ক, দেখবে এসো না!

—তোর মা রাগ করবে না?

—রাগ করবে কেন, আমাকে বাইরে দেখলে বরং রাগ করতে পারে। তাছাড়া মা তো এখন ঘুমুচ্ছে—

অগত্যা বাপী ওর সঙ্গে কাঠের বারান্দায় চলে এলো। মিষ্টির কঠিন কঠিন অঙ্ক দেখে হাসিই পেয়ে গেল। পুঁচকে পুঁচকে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ।—এই অঙ্ক তোর! বারো মিনিটও লাগবে না, আমি উত্তর বলছি তুই লেখ—

এই প্রস্তাব পছন্দ। চটপট কাজটা সারা হয়ে গেলে গল্প করার সুবিধে। কিন্তু বই থেকে অঙ্কগুলো ঠিক-ঠিক খাতায় তোলার ঝামেলা আছে। চেয়ারে বসলে টেবিল বেশি উঁচু। মিষ্টি দাঁড়িয়েই কাজে মন দিল। বাপীও ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। একটা হাত মিষ্টির ঝুঁকে পড়া পিঠের ওপর দিয়ে টেবিলের ওদিকে। মেয়েটা জানতেও পারছে না ওই

হাতটা ওকে আরো কাছে আগলে রাখতে চাইছে। এত কাছাকাছি লাগালাগি হয়ে থাকতে এত ভাল লাগে দু মিনিট আগে বাপীও কি জানত! মিষ্টির গায়ে আর ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুলে ভারী একটা মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ। গন্ধটা আরো ভাল করে নিতে গিয়ে নিজের গালের সঙ্গে ওর মাথাটা ঠেকেই গেল একবার।

—আঃ, সরো না! কাঁধ আর কোমর দিয়ে মিষ্টি ওকে ঠেলে দিল একটু। মন দিয়ে সব কটা অঙ্ক আগে খাতায় তুলে ফেলেছে।

সরতে একটু হল বটে কিন্তু বাপীর অবুঝ একটা ইচ্ছে আরও বেড়ে গেল। ইচ্ছেটা ঠিক যে কি নিজেও জানে না।

অঙ্কগুলো এরপর টকাটক হয়ে গেল বটে। এত তাড়াতাড়ি যে মিষ্টি ভারী অবাক। বাপী চোখ দিয়ে দেখে, আর ওকে লিখতে বলে। মিষ্টির মনে হল বাপীর মত এমন অঙ্ক-বিশারদ আর হয় না। অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞাসা করল, সব রাইট?

—রাইটের বাবা।

মিষ্টি খুব খুশি। চুপি চুপি এও এক মজার খেলা সাঙ্গ হল যেন।—তুমি বলে দিয়েছ মা যেন কক্ষনো জানতে না পায়, তাহলে দুজনকেই ধরে দেবে—

মুখোমুখি চেয়ার পেতে গল্প করতে বসল দুজনে। বাপীর গল্প মানে জঙ্গলের গল্প। জঙ্গলে ঘুরতে কেমন লাগে। কাছাকাছির মধ্যে হামেশা কোন্ কোন্ জীবের দেখা মেলে। তাড়া করলে ওরা কিভাবে পালায়। কোন্গুলোকে অনায়াসে পাথর ছুঁড়ে মারা যায়। ও কত মেরেছে। মিষ্টি ওর সঙ্গে জঙ্গলে গেলেই দুই-একটা মেরে দেখাবে।

ফাঁক পেলে এর পর মিষ্টিকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে যাবার মতলব। এই জন্যেই লোভ দেখানো।

—আর ওরা কেমন জোড় বেধে খেলা করে জানিস? কক্ষনো দুটো পুরুষ আর দুটো মেয়েতে খেলা করে না। একটা পুরুষ আর একটা মেয়ে—

মিষ্টি হাঁ করে ওর কথা শুনছে।

—বুঝলি না বোকা মেয়ে! যেমন ধর একটা পুরুষ খরগোশ আর একটা মেয়ে খরগোশ, একটা পুরুষ ময়ূর আর একটা মেয়ে ময়ূর, একটা পুরুষ সাপ আর একটা মেয়ে সাপ—

সাপ শুনেই মিষ্টির গায়ে কাঁটা দিল।—সাপেরাও খেলা করে? তুমি দেখেছ?

—দেখিনি আবার! এই সেদিনই তো দেখলাম দুটো পেল্লায় সাপ একটা আর একটাকে পেঁচিয়ে লেজে ভর করে লাঠির মত দাঁড়িয়ে আছে।...এটা অবশ্য ঠিক খেলা নয়, তুই বুঝবি না...।

মিষ্টির দু চোখ বড় বড়।—মারামারি?

—দূর বোকা। না, আমার বলতে লজ্জা করছে...

সাপের কথা বলতে লজ্জা করবে কেন মিষ্টি ভেবে পেল না। লজ্জার কথা শুনে আরও কৌতূহল।—মারামারি না হলে কি বলো না?

—ভালবাসা-বাসি।

শুনেই মিষ্টি হেসে সারা। হাসির চোটে একঝাঁক চুল মুখের ওপর এসে গেল। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে সেগুলো সরাতে সরাতে তেমনি হাসি আর অবিশ্বাসে ভেঙে পড়ে

বলল, সাপ আবার ভালবাসে নাকি?

চুল সরানো মুখখানা রসে টইটম্বুর ফলের মত টুপটুপ করছে। গাল দুটো ধরে টিপে দিতে ইচ্ছে করছে বাপীর।

একটুও যদি বুদ্ধি থাকত তোর, পুরুষ সাপ মেয়ে সাপকে ভালবাসবে না কেন--এ কি মানুষ নাকি যে দেখলেই ছুবলে দেবে! আমার সঙ্গে জঙ্গলে এলে কত কি দেখতে পাবি।

—না বাবা, মিষ্টি মাথা দোলাল, আমার সাপ শুনেই ভয় করছে।

—আচ্ছা ভীতু মেয়ে তো, ও-সব সাপ-টাপ বা পাজী জানোয়ার সব বেশি জঙ্গলে থাকে, বুঝলি? তাছাড়া আমি সঙ্গে থাকলে আর ভয় কি!

বাপীর বিশ্বাস ভুলিয়ে-ভালিয়ে দুই একবার জঙ্গলে নিয়ে ঢোকাতে পারলে মিষ্টিও ওই জঙ্গলটাকে ওর মতই ভালবেসে ফেলবে। বানারজুলির জঙ্গল কেউ ভাল না বেসে পারে না।

কিন্তু সব উৎসাহের মুখে বড় রকমের হোঁচট খেতে হল। বেলা যে চারটে গড়াতে চলল, বাপী বা মিষ্টি কারোরই খেয়াল ছিল না। দুপুরের ঘুমভাঙা ফোলা-ফোলা মুখে মেমসাহেব ঘর থেকে বেরুল। সঙ্গে সঙ্গে চোখে কাঁটা বিঁধল। দুটো চেয়ার মুখোমুখি লাগানো। আর তাতে মুখোমুখি আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে দুজনে।

মেমসাহেবের ভ্রূকুটি দেখেই চোরের দায়ে ধরা পড়ল বাপী। নড়া-চড়া ভুলে শুকনো মুখে একটা শাস্তির অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

ঝাঁঝালো গলায় মেমসাহেব প্রথমে মেয়েকে জিজ্ঞেস করল, অঙ্ক হয়েছে?

মেয়েও ভয়ে-ভয়ে মাথা নাড়ল। হয়েছে। তার ভয়, কি করে হয়েছে মা না সেটা বুঝে ফেলে।

এবারে বাপীর পালা। মেমসাহেবের ভুরুর ভাঁজ সোজা হয়নি তখনো।—তোর বাড়ি কোথায়?

একটা হাত তুলে বাপী শুধু রাস্তার দিকটাই দেখিয়ে দিল।

আরও ঝাঁঝালো গলায় মেমসাহেব বলে উঠল, মেয়েদের সঙ্গে তোর এত কি খেলা আর গল্প—যা বাড়ি যা—আর কক্ষনো যেন এভাবে না দেখি!

গেটের বাইরে পা দিয়ে বাপী হাঁপ ফেলে বাঁচল বটে, কিন্তু তার পরেই যত রাগ ততো দুঃখ। একটু আড়াল নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাংলোটাকেই দেখল খানিক। মিষ্টি তার মায়ের সঙ্গে ঘরে চলে গেছে। নিজের দোষেই এমনটা হল। খেয়াল করে ওই মহারাণীর ঘুম ভাঙার আগে সটকান দিলে এই গণ্ডগোল হত না।

পরের দুটো দিন সকালে আর স্কুল-ফেরত বাড়িতে না ঢুকে বাংলোটার সামনের রাস্তায় কতবার ঘোরাঘুরি করেছে, হিসেব নেই। বাইরের ওই কাঠের বারান্দায় সাহেব বা মেমসাহেবকে দেখলে সরে যায়। মিষ্টি ঠাণ্ডা মেয়ে নয় একটুও, যে ঘরের মধ্যে সেঁধিয়ে থাকবে। ওর দেখাও অনেক বার করে মেলে। আর বাপীর পা দুটো তখন ওই গেট ভেঙে ভিতরে ঢুকতে চায়। মেমসাহেব না থাকলে গেটের কাছাকাছি এগিয়েও আসে। মিষ্টি তখন ওকে ঠিক দেখতে পায়। ওর সঙ্গে খেলা করতে বা গল্প করতে যে ভাল লাগে মিষ্টির, বাপী সেটা মুখ দেখলেই বুঝতে পারে। ফাঁক বুঝে হাতের ইশারায়

বাপী ওকে গেটের বাইরে চলে আসতে বলেছিল। জবাবে মেয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে হাতের ছোট্ট বুড়ো আঙুল নেড়ে যা বোঝাবার বুঝিয়েও দিয়েছে। অর্থাৎ ওর আসাটা বা বাপীর সঙ্গে খেলা করাটা মা বরদাস্ত করবে না। ফিক-ফিক করে হেসেওছে আবার। বাপী জ্বলতে জ্বলতে ফিরে গেছে।

একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। বড়সাহেব আর মেমসাহেবের ডাঁটের ছেলে দীপুদার মন পেলে আবার ও-বাড়ির গেট দিয়ে ঢোকা সহজ হতে পারে। সুদীপ নন্দী। বাবা-মায়ের আদরের নাম দীপু। একই স্কুলে ওর থেকে তিন ক্লাস ওপরে অর্থাৎ ক্লাস নাইনে পড়ে দীপুদা। বছরের চার মাস কেটে গেলেও স্কুলে ভর্তি হতে অসুবিধে হয় নি। বাপীর ধারণা বড়লোকের ছেলে বলেই হয় নি। জঙ্গলের জিপে চড়ে স্কুলে যায় জিপে চড়ে ফেরে। মিষ্টি তো কাছের চা-বাগানের মেয়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছে। বাপী ভাবে খুব মজা ওর। সকাল আটটায় স্কুল, বারোটায় ছুটি। সমস্তটা দুপুর হাতের মুঠোয়। দীপুকে জিপে চেপে স্কুলে যেতে দেখে বাপীরও জিপে ওঠার লোভ খুব। কিন্তু এত দিন সাহস করে বলতে পারে নি।

তোয়াজ কি করে করতে হয় বাপীর একটু-আধটু জানাই আছে। বাবাকে দেখেছে, আবুর বাবা কালুকে দেখেছে, চা-বাগানের অনেক বাবুদেরও সায়েবকে তোয়াজ তোষামোদ করতে দেখে আসছে।

সেদিন স্কুল-গেটে জিপটা থামতেই বাপী ছুটে গেল। জিজ্ঞেস করল, তোমার বইখাতাগুলো আমি ক্লাসে দিয়ে আসব দীপুদা?

কেরানীবাবুর ছেলেকে দীপু বেশ চেনে। বাড়িতে বোনের সঙ্গে খেলা করতেও দেখেছে।

—কেন?

—তোমার কষ্ট হবে। তাই...।

তোয়াজটুকু মন্দ লাগল না। কিন্তু ধমকের সুরে মুখে বলল, ভাগ—।

মুখ কাঁচুমাচু করে টিফিনের সময় ফাঁক বুঝে আবার দীপুদার সামনে।—পিসী চমৎকার আমসত্ত্ব বানায় দীপুদা, আজ তোমার কথা বলতে অনেকটা দিয়ে দিয়েছে —আর পাকা কামরাঙাও আছে, খুব মিষ্টি—খাবে?

তার এক হাতে মস্ত একটা লোভনীয় কামরাঙা আর অন্য হাতে সোনা-রঙ আমসত্ত্ব খানিকটা।

ও-দুটো নিয়ে দীপু ওকে কৃতার্থ করল। খেতে খেতে মন্তব্য করল, বেশ তো...। কাল আবার আনিস—

পরদিনও ওই একই ঘুষ। সঙ্গে একটা বাড়তি টোপ।—আমাতে আবুতে জঙ্গল থেকে বন-মোরগ বা খরগোশ মেরে বাড়িতে দিয়ে আসব দীপুদা?

আবুকেও দীপুদার চেনা হয়ে গেছে।—দিস। মাকে বলব'খন আবুকে বখশিশ দেবে। দুই-ই খুব ভালো খেতে...

বাপীর বলার ইচ্ছে, আবু বখশিশ-টখশিশ নেয় না। বলা গেল না।

—তোর কোন্ ক্লাস রে?

—ক্লাস সিকস...!

এই মওকাতেই বুকের দম আটকে বাপী বলে ফেলে, রোজ পাঁচ মাইল করে হেঁটে আসতে-যেতে আমার খুব কষ্ট হয় দীপুদা, তোমাদের জিপে করে যদি আমাকে একটু—

কথাটা আর শেষ করে উঠতে পারল না। তার আগেই দীপুদা কট কট করে বলে উঠল, ও...এই মতলবে আমার মন ভেজানো হচ্ছে। সাহস তো কম নয়, তোর সঙ্গে আমি এক জিপে আসব যাব?

বাপী চুপসে গেল। কিন্তু আমসত্ত্ব কামরাঙার লোভে হোক বা বন-মোরগ খরগোশ ভেটের আশায় হোক, দীপুদা একেবারে অনুদার হতে পারল না, বলল, আচ্ছা, এক কাজ করিস, আসার সময় মাইলটাক হেঁটে এসে রাস্তার এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকিস, আমি তুলে নেব—আবার স্কুলের আধ-মাইলটাক আগে নেমে যাবি। ফেরার সময় হেঁটেই যেতে হবে, উঁচু ক্লাসের এত ছেলের সামনে তোকে সঙ্গে নিতে পারব না।

বাপীর পিত্তি জ্বলে গেল। ও যেন চার পয়সা ভিক্ষে চেয়েছে আর বড়লোকের ছেলে দয়া করে একটা পয়সা দিলে। ওই জিপের দিকে বাপী যদি জীবনে আর ফিরেও তাকায়।

সাহেব বাংলোর দিকে মনটা পড়ে থাকার ফলে আবুর সঙ্গে কদিনের মধ্যে দেখাও হয় নি। সেই সজারু-ভোজের সন্ধ্যার পর থেকে। ওকে দেখেই আবু ঠেস দিয়ে বলল, কি রে, সাহেবের মেয়ের সঙ্গে এত ভাব-সাব যে ইদিক মাড়াতেও ভুলে গেলি?

দোষটা প্রায় স্বীকার করে নিয়েই বাপী জিজ্ঞাসা করল, তুমি জানলে কি করে?

—সেদিন ও-দিক দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম বাগানে মেয়েটার সঙ্গে খুব হুটোপুটি করছিস।

বিমর্ষ মুখে বাপী বলল, আর যাই না, বারণ করে দিয়েছে—

মুখ দেখে আর কথা শুনে আবুরও কৌতূহল।—কে বারণ করল?

—মেমসাহেব মহারাণী—আবার কে!

আবু হাসতে লাগল।—তুই হলি গিয়ে ওদের চোখে একটা কাক—পেখম লাগিয়ে দহরম-মহরম করতে যা আরো!

কাকের ময়ূরপুচ্ছ পরার গল্পটা বাপীও জানে। তবু আবুর কথায় মন খারাপ হয়ে গেল। বলল, আমার ভাল লাগে যে—

—কি ভাল লাগে?

এবারে লজ্জা-লজ্জা মুখ বাপীর।—তুমি কাউক্কে বলবে না?

আবু মাথা নাড়ল। বলবে না।

আমার ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

—আবুর হাঁ হবার পালা এবার।—কাকে রে?

—ওই মিষ্টিকে।

—বলিস কি রে। এই পুঁচকে মেয়ের যে চোখই ফোটে নি এখনো!

শুনে শুনে আবুর ঠাট্টা এখন বুঝতে পারে বাপী। আর আবুর কাছে লজ্জা-শরমেরও ধার ধারে না। বলল, হলই বা ছোট—বড় হবে তো?...ওর গায়ে আর চুলে কি মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ, আর হাতটাতগুলো যা নরম না!

—বা বা বা বা! এরই মধ্যে এতটা এগিয়েছিস! হাসতে হাসতে আবু বেশ জোরেই পিঠ চাপড়ে দিল।—লেগে থাক, লেগে থাক—ও মেয়ে বড় হলে খাসা দেখতে হবে ঠিকই, আর পছন্দ হলে তখন তোকে একটা বেয়ারা-টেয়ারা করে নেবে।

আবুর এই ঠাট্টায় বাপীর যথার্থ রাগ হয়ে গেল। ওর ডাকে সাড়া না দিয়ে হন-হন করে চলে এলো।

বাংলোর সামনের রাস্তায় পা ফেলতে গিয়েও পিছু হটে সেই গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।...বারান্দায় সাহেব মেমসাহেব আর মিষ্টি। সাহেব মেমসাহেব কথা কইছে। মিষ্টি এক পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে হাত দুটো দু পাশে পাখির ডানার মত ছড়িয়ে বন-বন করে দফায় দফায় পাক খাচ্ছে। আর থেকে থেকে নিজের মনেই হাসছে।

বাপী দেখছে।

...বাংলোটা ওর চোখে রূপকথার দেশের কোন নিষেধের বাড়ির মতো ক'দিন ধরে সেই রকমই মনে হচ্ছে। মিষ্টিকে কিন্তু কোন রূপকথার রাজকন্যা ভাবা মুশকিল। রূপকথার মেয়েরা কখনো ফ্রক পরেছে শোনে নি, তাই মেলে না। না মিললেও ছুটে যেতে ইচ্ছে করে। আর সাহেব-মেমসাহেবকে রাক্ষস-রাক্ষসীর মত কেটে কুচি কুচি করে ফেলতে ইচ্ছে করে।

...রাক্ষস-রাক্ষসী কেটে ফেললে রূপকথার মেয়েরা খুশি হয়। হাসে কিন্তু বাবা-মাকে কাটলে মিষ্টি বোকা মেয়ের মতো ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কাঁদবে।

সেই অবুঝপনার জন্যেই গাছের আড়ালে বাপীর দু চোখ রাগে বোঝাই।

হাতির নাম বনমায়া। বানারজুলি জঙ্গলের পোষা হাতি। কাঠ টানে। আর জিপ চলে না এমন জায়গায় যেতে হলে জঙ্গলের বাবুরা ওর পিঠে চাপে। পিঠে তখন হাওদা লাগানো হয়। বনমায়াকে বাপী জন্ম থেকে দেখে আসছে। ওর পিঠে চেপেওছে কত। বনমায়া নামটাও খুব মিষ্টি লাগে। চা-বাগানের সাহেব বাংলোয় একটা নেপালী মেয়ে কাজ করত। তার ওই নাম ছিল। বছর তিনেক আগে ওই মেয়েটাকে নিয়ে কি একটা হুজ্জত হয়েছিল খুব। এখানকার অনেক লোক সাহেবদের ওপর ক্ষেপে গেছল। আর তারপর থেকে সেই মেয়েটা একেবারে হাওয়া। বাপী তখন আরো কত ছোট। ভালো করে কিছু বুঝতেই পারে নি।

কিন্তু বাপীর মাথা এখন আর তত কাঁচা নয়। বনমায়া নাম থেকে নিজেই বুঝে নিয়েছে এটা মেয়ে হাতি। আবু হেসে হেসে বলে, বনমায়ার রূপ খুব। ওকে দেখলে চা-বাগানের আর জঙ্গলের কণ্ট্রাক্টরদের মর্দা হাতি দুটো নাকি ছোঁক ছোঁক করে কাছে আসতে চায়। কিন্তু বনমায়ার রূপ যেমন দেমাক তেমন। কাউকে পাত্তাও দেয় না। রূপের কথা বনমায়ার মাহুত ভীম বাহাদুরও বলে। ভীম বাহাদুরের সঙ্গেও বাপীর মন্দ খাতির নয়। মাস গেলে মাইনেটা তো বাপীর বাবার হাত থেকেই নিতে হয়। তা বনমায়ার রূপ নিয়ে ভীম বাহাদুরেরও খুব গর্ব। এদিককার সব নেপালী আর অবাঙালী মেয়ে-পুরুষই মোটামুটি পরিষ্কার বাংলা বলে। ভীম বাহাদুরের জন্ম-কম্ম সব এখানেই। বনমায়ার মাথা চাপড়ে ভীম বাহাদুরকে বাপী নিজের কানে বলতে শুনেছে, তোর মরদ খুঁজে বার করতে হলে আমাকে আফ্রিকার জঙ্গল চুঁড়ে আসতে হবে।

আবুও শুনেছিল। সে হেসে সারা। কিন্তু বাপীর মাথায় কিছুই ঢোকে নি। পরে আবু খোলসা করে বলতে কিছু কিছু বুঝেছে।...বনমায়ার বয়েস নাকি মাত্র কুড়ি। আশী-নব্বুই একশ দেড়শ বছর পর্যন্তও বাঁচে হাতিরা। তা এই বয়সেই বনমায়ার সর্ব অঙ্গে রূপ চুঁয়ে পড়েছে। আর স্বাস্থ্যখানাও তেমনি হয়েছে। প্রায় দশ ফুট উঁচু, পাঁচ ফুটের মতো শুঁড়। ওর যুগ্যি বর সে-রকম জাঁদরেল মরদ হাতি এখানে কোথায় জুটবে? বরের খোঁজে তাই আফ্রিকায় যাবার কথা বলছিল ভীম বাহাদুর। এখানকার কোনো পোষা মরদ হাতির হাতে ও নাকি কখনো ওকে ছেড়ে দেবে না।

হাতির বর শুনে বাপীর হাসি পেয়ে গেছল। হাতির রূপ কাকে বলে অতশত বোঝে না। একটা হাতির সঙ্গে আর একটা হাতির তফাতও ভালো করে আঁচ করতে পারে না। তবে অনেক দেখার ফলে ছাড়া অবস্থায় একলা চড়ে বেড়ালেও বনমায়াকে ঠিক চিনতে পারে। আর বনমায়া তো ওকে চেনেই। দেখলেই শুঁড় উঁচিয়ে সেলাম ঠোকে। কেরানীবাবুর ছেলেকে সেলাম করাটা ভীম বাহাদুর শিখিয়েছে।

রূপ না চিনলেও বনমায়ার মতো সভ্যভব্য ঠাণ্ডা জীব বাপী আর দেখে নি। হাজার দৌরাত্ম্যেও ওর মেজাজ গরম হয় না। শুঁড় ধরে ঝুলে পড়লেও ও মজা পায় আর দোলা দেয়। কলা বেল আখ শুঁড়ের কাছে ধরে বার বার সরিয়ে নিলে পিটপিট করে তাকায়, তারপর ঝাঁ করে ঠিক সময় কেড়ে নেয়। বাপী তখন রাগ দেখিয়ে চড়চাপড় ঘুষি বসিয়ে দেয়। কিন্তু বনমায়া তখন সাত চড়ে রা নেই এমন ঠাণ্ডা।

দেড় মাস আগে, আবুর কথায় যাকে বলে এই বনমায়ার নামেও কলঙ্কের ঢি ঢি পড়ে গেছল একেবারে। সেই বিষম ঘটনার আগের রাতে জঙ্গলের এ-ধারের আর আশপাশের অনেকেই একটা বুনো হাতির ডাক শুনেছিল। সে নাকি সাংঘাতিক ডাক। দলছাড়া ক্ষ্যাপা বুনো হাতি ভয়ঙ্কর জীব। কাছে ঘেঁষবে কে?

দূরের জঙ্গলে বা পাহাড়ী এলাকায় দল-বাঁধা বুনো হাতির উপদ্রব নতুন কিছু নয়। ছোট পাহাড়ী নদীগুলোর নাম খোল। সেই খোলে ওরা জল খেতে আসে। একসঙ্গে অনেকগুলো পাহাড়ের দিক থেকে নেমে এসে এক-এক সময় জঙ্গল তছনছ করে, চাষের খেত মুড়িয়ে দেয়। ওদিকের লোকেরা তখন দল বেঁধে মশাল জ্বেলে ঢাক ঢোল কানেস্তারা বাজিয়ে হাতি তাড়ায়। ওদিকের ফরেস্ট গার্ডকেও তখন বন্দুক নিয়ে ছুটতে হয়। কিন্তু হাতির দঙ্গল এদিকের জঙ্গলে বা লোকালয়ে আসে না। আবু বলে, বুনো হলেও ওরা বুদ্ধি ধরে। চা-বাগান আর জঙ্গলের সব বাংলোগুলোতেই বন্দুক আছে। এদিকে এলে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে সে ওরা বেশ জানে। ক্ষ্যাপা হাতির কথা আলাদা। ক্ষেপে গেলে কারই বা কাণ্ডজ্ঞান থাকে। সেদিন ওটার হাঁকডাক শুনে জঙ্গলের কুঁড়েতে যারা থাকে তাদের রক্ত জল। ওটা হানা দিয়েছিল চা-বাগানের দিকে। ওটাকে ভয় পাওয়ানোর জন্য বাগানের সাহেবরা তখন এক-ধার থেকে জঙ্গলের দিকে রাইফেল ছুঁড়েছে। হৈ-হৈ কাণ্ড যাকে বলে। দূরে হলেও থমথমে বেশি রাতের সেই গুলির শব্দ আর হাতির ডাক বাপীরও শোনার কথা। কিন্তু বাপী বিছানায় গা দিল কি ঘুমে কাদা।

পরদিন সকালে সকলের চক্ষু ছানাবড়া। বনমায়ার পায়ের শেকল ছেঁড়া। বনমায়া হাওয়া। ভীম বাহাদুরের মাথা খারাপ হওয়ার দাখিল। পাগলের মতো বনমায়ার খোঁজে তামাম জঙ্গল চষে বেড়াল। সব দোষ এসে চাপল ওরই ঘাড়ে। বুনো হাতির ডাক শুনে

ও কেন আগে থাকতে বন্দুক-অলা ফরেস্ট গার্ড এনে বনমায়াকে পাহারা দিল না। ভীম বাহাদুর যত বলে, বুনো হাতি এসে বনমায়ার শেকল ছেঁড়ে নি—তাহলে বনমায়াও চেঁচিয়ে একাকার করত, আসলে বনমায়াই শেকল ছিঁড়ে পালিয়ে গেছে—আগের বড়সাহেব ততো রেগে যায়। চাকরি তো গেলই তার ওপর ওর বিচার হবে। একটা হাতি খোয়ানো কম ব্যাপার নয়।

আবু চোখ টিপে হেসে হেসে বলেছিল, ভীম বাহাদুরের কথাই ঠিক। ওটা ছিল বুনো মস্তির প্রেমের ডাক। বনমায়া সাড়া না দিয়ে পারে নি।

তার আগেই ওর কাছ থেকে বাপীর বুনো জীব-জন্তুর প্রেমের পাঠ নেওয়া শুরু হয়ে গেছল। তখন পর্যন্ত মস্তি কথাটা শোনে নি। মস্তি কি?

আবু বলেছে, মরদ হাতির মাথায় প্রেম জাগলে বিষম ব্যাপার। তখন সঙ্গিনী না পেলে ক্ষেপে যায়। সেই সময় ওদের মাথায় আপনা থেকেই এক রকমের রস গড়ায়। ওই দশার সময় ওদের মস্তি বলে। কিন্তু দলছুট মস্তি সঙ্গিনী পাবে কোথায়? তখন আরো ক্ষ্যাপা দশা। পোষা হাতী দেখলে শিকল ছিঁড়ে দাঁতের ঘা মেরে মেরে ওটাকে টেনে নিয়ে যাবেই। না গেলে মেরে ফেলবে। আবুর মতে বনমায়ার দুর্জয় সাহস। নিজে থেকে নিঃশব্দে শেকল ছিড়ে ওই বুনো মস্তির সঙ্গে পালিয়েছে। পোষমানা মেয়ে হাতিরা তো বুনো মস্তিকে সাংঘাতিক ভয় করে।

সব জানা আর শোনার পর বাপীর বনমায়ার জন্য খুব চিন্তা হয়েছিল। বুনো মস্তি শেষ পর্যন্ত ওটাকে মেরেই ফেলে কিনা কে জানে। আর ভীম বাহাদুরের জন্য বেজায় দুঃখ হয়েছিল। পাগলার মতো ও তখনো বনমায়াকে খুঁজেই চলেছে।

তিন সপ্তাহ বাদে আবার এক দারুণ ব্যাপার। আর সেই ব্যাপারের নায়ক কিনা বাপী নিজেই। বনের পশু-পাখির কিছু ভালবাসাবাসি দেখার তাড়নায় ছুটির সেই নির্জন দুপুরে একলাই জঙ্গলে ঢুকেছিল। হঠাৎ দেখে দশ গজের মধ্যেই একটা হাতি! ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। ভালো করে দেখবে কি, ভয়ে গায়ের রক্ত জল।

তার পরেই কি কাণ্ড। ও যে বনমায়া! ওই তো শুঁড় উঁচিয়ে সেলাম করল ওকে! বাপী বিশ্বাস করবে না স্বপ্ন দেখছে?

আনন্দে আর উল্লাসে পাগলের মতো নাচই শুরু করে দিয়েছিল বাপী। আর ওর শুঁড় ধরে টানাটানি করে বলেছিল, চল শীগগির চল, তোর জন্য এদিকে কত কাণ্ড!

কিন্তু বনমায়া কম বজ্জাত নয়। পাছে একলা গেলে মার-ধর খেতে হয়, বাপীর ধারণা সেই জন্যেই শুঁড়ে পেঁচিয়ে ওকে মাথায় তুলে বসিয়ে নিয়ে তারপর চলল।

কি মজাই না হল তারপব। যে দেখে সে হাঁ। বনমায়ার মাথায় চড়ে বাপী আসছে! কাতারে কাতারে লোক ছুটে আসতে লাগল। আর ভীম বাহাদুর তো বনমায়াকে দেখে কেঁদেই ফেলল। প্রথমেই রাগের চোটে ওর শুঁড়ে দুমদাম কটা ঘুষি। তারপর কান্না! শেষে সকলের সামনে বাপীকে জড়িয়ে ধরে কি আদর কি আদর!

শুঁড় দুলিয়ে দুলিয়ে সেই বনমায়া আসছে জঙ্গল ধরে। ওর পিঠে হাওদা, তাতে মিষ্টি বসে, দীপুদা বসে আর বন্দুক হাতে ফরেস্ট গার্ড দেবকী দাস বসে। মাথার ওপরে ঘাড়ের দিকে ভীম বাহাদুর।

পরের রবিবারে সকালে জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে বড়সাহেবের বাংলোর দিকেই

আসছিল বাপী। এই দৃশ্য দেখে পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে গেল।

বনমায়া গলা দিয়ে ঘোঁৎ করে একটু আনন্দ জানিয়ে শুঁড় উঁচিয়ে বাপীকে সেলাম ঠুকলে। তাই দেখে মিষ্টি আর দীপুদা অবাক। আনন্দে হাততালি দিয়ে মিষ্টি বলে উঠল, কি মজা দাদা, বাপীকে তুলে নে না, ও জঙ্গলের কত কি জানে—ও লোভ দেখিয়েছিল বলেই তো বাবা-মাকে ধরে আজ জঙ্গলে আসা হল—

দাদার হুকুমের পরোয়া না করেই ভীম বাহাদুর সানন্দে ডাকল, জলদি উঠে এসো বাপী ভাই, আজ বহুত মজা হবে।

রক্ত নেচে উঠলেও বাপী নড়ছে না। জিপে করে স্কুলে যেতে চাওয়ার অপমান ভোলে নি। দীপুদার মুখ দেখে মন বোঝার চেষ্টা।

জঙ্গলে ঢুকতে যাচ্ছে বলেই দীপুদার আজ উদার হতে বাধল না। একজন বাড়লে জোরও একটু বাড়ে। বলল, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন, উঠে আয়—

না, ওর ওঠার জন্য বনমায়াকে ওয়েট করানোর দরকার নেই। বাপী ওর শুঁড় বেয়ে তরতর করে উঠে এলো। ভীম বাহাদুরকে পেরিয়ে হাওদায় মিষ্টির গা ঘেঁষে বসে পড়ল। ওর বরাত বটে একখানা আজ। আনন্দের চোটে গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো, দুর্গা দুর্গা—

মিষ্টির আবার খিল খিল হাসি।—দুর্গা দুর্গা কেন, আমরা কি শিকারে চলেছি?

বাপীর মাথায় দুষ্টুমি খেলে গেল তক্ষুনি। বলল, তা না, নাম নিলে যাত্রা ভালো হয়, গাছ থেকে তো অনেক সময় সাপ-টাপও লাফিয়ে পড়তে পারে—

—অ্যাঁ? শিউরে উঠে বাপীর সঙ্গে একেবারে লাগালাগি হয়ে বসল মিষ্টি।

দীপু এদিকের জঙ্গল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয় তেমন। অস্বস্তি তারও, চোখ পাকালো—তুই ওকে ভয় দেখাচ্ছিস?

বাপীর মুখ আমসি। এক্ষুনি না ওকে আবার নেমে যেতে বলা হয়। সামাল দিল দেবকীনন্দন, কিছু ডর নাই ছোট হুজুর, তার আগেই আমি গুলি করে খতম করে দেব।

ফাঁড়া কাটল। বনমায়া হেলে দুলে চলেছে। আর তাইতে মিষ্টির ছোট্ট শরীর ওর গায়ে কেবলই ঠোক্কর খাচ্ছে। তাছাড়া লেগেই বসে আছে ওর সঙ্গে। মেয়েটার শরীরের হাড়গোড়সুদ্ধু নরম। চুরি করে বেশ বড় বড় নিঃশ্বাস টানছে বাপী। মিষ্টির গায়ের গন্ধ, আর চুলের গন্ধ।

দেবকীনন্দন কত রকমের জানোয়ার আছে এই জঙ্গলে দীপুদাকে শোনাচ্ছে। নটখট জানোয়ারের মধ্যে চিতাবাঘ, ভালুক, বুনো শুয়োর, বুনো হাতি, বনবেড়াল—ঢাউস সাপ-—এই সব।

চকিতে বাপীর মাথায় আবার এক মতলব খেলে গেল—দীপুদা, আবুকে তুলে নিই চলো। তাহলে দারুণ হবে—ভালুক-টালুক এসে গেলে ও কেমন নেমে গিয়ে তাড়া করে দেখবে—কোথায় কোন রকমের জানোয়ার থাকে ও সব জানে। সঙ্গে সঙ্গে আরো লোভের টোপ ফেলল, তাহলে আজই খরগোশ বা বন-মোরগও ঠিক পেয়ে যাবে—

আবু ছেলেটা যে ডাকসাইটে দীপুর জানা হয়ে গেছে। এখানকার নতুন বন্ধুদের মুখে শুনেছে। প্রথম দিনের সেই সজারু মেরে আনাটাও ভোলে নি। তাছাড়া ওর বাবা কালু তো ওকে তার বড়সাহেবের কাছে বাংলোতে এনে হাজির করেছিল। সাহেবকে

ছেড়ে আবু দীপুকেও বুকে মাথা ঠেকিয়ে আদাব জানিয়েছিল। একটা দুটো বনমোরগ নিয়ে বাংলোয় ফিরলে বাবা-মাও খুশী হবে। এদিকে বনমোরগ মারার মজাটাও মন্দ হবে না। তাছাড়া অচেনা জঙ্গলে তার মতো একটা ছেলে থাকলে আরো নিশ্চিন্দি।

তবু ইতস্তত ভাব একটু—তুলে এনে বসাবি কোথায়, এই হাওদার মধ্যে গ্যাঁজাগেঁজি হয়ে বসতে পারব না।

বাপী বুঝল আসলে বাবুর মানে লাগছে। ব্যস্ত হয়ে বলল, সে তুমি কিচ্ছু ভেব না দীপুদা, আবু ঠিক ভীম বাহাদুরের পাশে জায়গা করে নেবে।

আবুকে তুলে নেওয়ার কথায় ভীম বাহাদুরও তক্ষুনি সায় দিল। বলল, হাঁ, ঠিক হোয়ে যাবে ছোট সাব, বনমায়া কি ছোট মেয়ে।

নিজের নাম শুনেই হাতিটা কান খাড়া করল। আর ছোট মেয়ে শুনে মিষ্টির খিল-খিল হাসি। হাসলেই ওর ঝাঁকড়া চুলের মাথাটা বাপীর বুকে ঠেকছে।

দীপুই কর্তাব্যক্তি এখানে। আবেদন মঞ্জুর করল, ডেকে নে তা হলে, কতদূর?

হাতিতে চেপে গেলে কি আর দূর, ভীম বাহাদুর চলো। সোনায় সোহাগা গোছের আনন্দ বাপীর।

আবু কতটা খুশী দেখে বোঝা ভার। সাহেবের ছেলে সঙ্গে আসতে বলেছে শুনে তেরছা চোখে বাপীর দিকে তাকালো। মিষ্টির দিকেও। উল্লাস মাখা চোখ দুটো দিয়েই বাপীর ওকে আনার তাগিদ। ঘর থেকে নিজের লাঠিখানা নিয়ে আবু এসে হাতির শুঁড়ে চেপে বসল। সকলের আনন্দ ষোল কলায় পূর্ণ।

আনন্দের হুল্লোড়ের মধ্যে তিনটে ঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে গেল। আবুকে নিয়ে বাপীর গর্ব সার্থক। দীপুটা আর মিষ্টি দুজনই ওর তারিফ করেছে। আবুর কথামতো হাতি নিয়ে এক এক দিকে হানা দেবার ফলে ওরা দু'দুটো ভালুক পালাতে দেখেছে। একটা বুনো শূয়োর দেখেছে। বুনো শূয়োরটার বেজায় রাগ, আবুর দিকে তেড়ে এসেও শেষে ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে জঙ্গলে ঢুকে গেল। আবু তখন হাতির শুঁড় ঘেঁষে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল। একলা পেলে ওই বুনো শূয়োর ওকে আস্ত রাখত না। হাওদায় বসে থাকলেও মিষ্টির গা ছমছম করছিল, ভালুক আর ওই শূয়োর দেখে এক হাতে বাপীকে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরছিল। বরাতজোরে একটা বাঘ-টাগ যদি বেরিয়ে পড়ত, নিদেনপক্ষে কাছাকাছির মধ্যে কোথাও বাঘের গর্জন-টর্জনও যদি শোনা যেত, মিষ্টি তাহলে দু'হাতেই ওকে জাপটে-মাপটে ধরত বোধ হয়। লাগালাগি হয়ে তো বসেই আছে, তাছাড়া আনন্দের ফাঁকে ফাঁকে মিষ্টির অজান্তে কতবার যে ওর পায়ে পিঠে কোমরে হাত দিয়েছে বাপী, সে শুধু ও নিজেই জানে।

বুনো শূয়োর দেখার পর দেবকীনন্দন আর ঘন জঙ্গলের দিকে যেতে রাজি হয় নি। বড়সাহেবের বকুনির ভয় আছে। ফেরার সময় আবুর সঙ্গে বাপীও কিছু কেরামতি দেখাতে পেরেছে। তিন-তিনটে বনমোরগ মারা হয়েছে, তার মধ্যে হাতির পিঠ থেকে নেমে একটা ও মেরেছে। বাকি দুটো আবু। খরগোস মারা গেল না। দীপুর একটা হরিণ মারার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সাহেবের হুকুম ভিন্ন দেবকীনন্দন রাজি হল না। শিকারের ব্যাপারে রিজার্ভ ফরেস্টের আইন-কানুন সে-সময়েও ছিল। কিন্তু শিকারীরা সে-সময় আইনের পরোয়া বড় একটা করত না। কিছু টাকা খসালেই ফরেস্ট গার্ডের মুখ সেলাই।

কিন্তু খোদ বড়সাহেবের ছেলের সঙ্গে এসে দেবকীনন্দন আইন অমান্য করে কি করে।

সকলের সঙ্গে এইদিন বাপীও নির্ভয়ে বড়সাহেবের বাংলোয় ঢুকতে পেরেছে। বনমোরগ নিয়ে দীপুদা যেন দিগ্বিজয় করে ঘরে ফিরেছে। তিন-তিনটে বনমোরগ দেখে মেমসাহেবও খুশি। তার মধ্যে একটা বাপী মেরেছে মিষ্টি সে-খবরও তার মাকে জানিয়ে দিল। বাপী আশা করেছিল, মেমসাহেব একটা মোরগ অন্তত ওকে আর আবুকে দিয়ে দেবে। কিন্তু সে গুড়ে বালি।

বাপীর তা বলে আফসোস নেই খুব। বাধা নিষেধ ঘুচল ভেবে আনন্দে আটখানা। মিষ্টিকে এক ফাঁকে জানিয়ে দিল, দুপুরে খেয়ে-দেয়ে আবার সে আসছে। বলেই ছুট। আবু আগেই বেরিয়ে এসেছিল। তাকে ধরল।

আবু ঘাড় বেঁকিয়ে তাকালো ওর দিকে। গম্ভীর। কিন্তু ভিতরে হাসছে বোঝা যায়। একটা চোখ ছোট করে বলল, কি রে, খুব মজা লুটলি বুঝি আজ—মেয়েটাকে তো কোলে সাপটে নিয়ে বসেছিলি দেখলাম—

বারো বছরের জীবনে বাপী এত আনন্দ আর পেয়েছে কিনা জানে না। অচেনা গোছের ভারী অদ্ভুত স্বাদ এ আনন্দের। শরীরটার ভেতর পর্যন্ত নরম-নরম একটা স্পর্শ এখনো ছড়িয়ে আছে। আবুর কথা শুনে লজ্জা পেল। এক ও ছাড়া আর সকলের চোখে ধুলো দিতে পেরেছিল। এমন কি ওই বোকা মেয়েটার চোখেও।

আবু এবারে নিজে থেকেই মন্তব্য করল, তোর স্বভাবচরিত্তি আমার থেকে ভালো বলতে হবে—

আবুর কোনো কথাই বাপীর কাছে হেলা-ফেলার নয়। ঠাট্টা হলেও না। মুখ দেখে বোঝার চেষ্টা।—কেন?

—একটা দুধের মেয়েকে নিয়ে দিব্যি মেতেছিস। তোর মতো বয়সে আমার ষোল-আঠারো বছরের মেয়েগুলোকে ভালো লাগত।

বাপী বিমূঢ় একটু। আবু এখন বড়জোর সতের পেরিয়েছে। বাপীর বয়েসে মানে বারো বছর বয়সে ষোল-আঠারোর মেয়েদের ভালো লাগত! অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে এখন?

—এখন কি?

—এখন কোন বয়সের মেয়েদের ভালো লাগে?

ফোঁস করে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে আবু।—আর বলিস না, আমার বারোটা বেজে গেছে। বয়েস-টয়েসের ধার ধারি না, ভালো এখন শুধু একটা মেয়েকেই লাগে—কিন্তু ভীম বাহাদুর টের পেলে আমার মুখ থেঁতো করে দেবে—

শুনে বাপী হাঁ একেবারে।—কেন? কোন্ মেয়েকে ভালো লাগে তোমার?

—বনমায়াকে। মানুষের মেয়ে-টেয়ে আর ভালো লাগে না। অমন ডাকাবুকো প্রেম ওই বজ্জাতের মতো আর কোনো মেয়ে জানে না। ডর-ভয়ের মাথা খেয়ে একুশ দিনের মধ্যে একটা বুনো হস্তিকে ঠাণ্ডা করে ঘরের মেয়ে আবার ঘরে ফিরে এলো—চাট্টিখানি কথা!

বাপী এরপর হেসে বাঁচে না। ঘরে ফিরেও আবুর হাতি-মেয়ের প্রেমে পড়ার কথা যতবার মনে এসেছে, কেবল হেসেছে।

কিন্তু আবুর ঠেসের কথায় বাপী একটুও হতাশ হয় নি। মিষ্টিটা ছোটই বটে। কিন্তু যে মিষ্টিকে ওর খুব ভালবাসতে ইচ্ছে করে সে যেন ঠিক অত ছোট নয়। বাপী নিজেও তো সকলের চোখে কত ছোট, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ও কি আর তেমন ছোট? মিষ্টিরও দেখতে দেখতে আর একটু বুদ্ধিসুদ্ধি হবে। আর, আবু তো নিজেই বলেছে বড় হলে ওই মেয়ে খাসা দেখতে হবে।

পিসীর চোখে ধুলো দিয়ে সময় হিসেব করে বাপী দুপুরে আবার মিষ্টিদের বাংলোর সামনে হাজির। কিন্তু সামনের বারান্দা ফাঁকা। এই হিসেবে গরমিল দেখেই বাপীর মেজাজ গরম। দুটো বেজে গেছে, চারটের মধ্যেই তো ওর মা মহারানী দিনের ঘুম সাঙ্গ করে হেলে দুলে ওই বারান্দায় এসে দাঁড়াবেন। গেটটা ধরে বাপী শূন্য কাঠের বারান্দার দিকে চোখ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু ঘরের জানলা দিয়ে মিষ্টি ওকে ঠিকই দেখেছে। বাবা নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। ওদিকে মায়েরও পাকা ঘুমের ঘন নিঃশ্বাস। মিষ্টির ওপরেও মায়ের আজ একটু ঘুমোনোর হুকুম ছিল। দাদা যে ছুটির দিনে আড্ডা দিতে বেরোয় সেটা কিছু নয়। ঘুম-টুম ধারে কাছে নেই মিষ্টির। উপুড় হয়ে শুয়ে মুখ তুলে জানলা দিয়ে গেটের দিকে দেখছিল।

পা টিপে বিছানা থেকে নেমে এলো। তারপর বারান্দায় এসেই ফিক করে হাসি। এই লুকোচুরির দেখাশুনার মধ্যে বেশ মজা আছে।

মজার ছোঁয়া বাপীর মুখেও। হাত তুলে মিষ্টিকে কাছে আসতে ইশারা করল। মিষ্টি দ্বিধায় পড়ল একটু। ওর ইচ্ছে বাপী আসুক। কিন্তু গেল সপ্তাহে ওকে এখানে এনে বসানোর ফলটা ভালো হয় নি মনে আছে। দেড় দু'ঘণ্টা এখন আনন্দে কাটানোর ইচ্ছে ওরও।

গেটের কাছে আসতে এ-ধার থেকে বাপী জিজ্ঞাসা করল, কি কচ্ছিলি?

—মায়ের কাছে শুয়ে ছিলাম, আর তুমি আস কিনা জানলা দিয়ে দেখছিলাম—

—মা কি কচ্ছে?

—মা-বাবা দু'জনেই ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে—ভারী খাওয়া হয়েছে তো।

—খুব মুরগির মাংস সাঁটালি বুঝি?

মিষ্টির মুখে এখনো জল গড়ানোর দাখিল · কি সুন্দর খেতে, মা নিজে রান্না করল। দাদা তো নিজে পেট ঠেসে খেয়ে টিফিন বাক্সয় করে তার বন্ধুর জন্যেও নিয়ে গেল—

বাপী এবারে ঠেস দিতে ছাড়ল না। বলে উঠল, আমরা মেরে এনে দিলাম আর নিজেরাই স্বার্থপরের মতো খেলি—আমাদের কথা একবার মনেও পড়ল না?

মিষ্টি বিপাকে পড়ল। বাপী বলার পরে মনে হল ওদেরও দেওয়া উচিত ছিল। বলল, মা না দিলে আমি কি করব...এখনো আছে বোধ হয়, মা ঘুম থেকে উঠলে তোমাকে দিতে বলব?

—আমার খেতে বয়ে গেছে, আমি কি ভিখিরি? শব্দ না করে শেকল সরিয়ে আস্তে আস্তে গেটটা খুলল।—নে, বেরিয়ে আয় চট করে, জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে খেলা করিগে চল্।

কিন্তু মিষ্টির অত সাহস নেই।—মা জানতে পারলে রক্ষে রাখবে না।

—তুই আচ্ছা ভীতু। মা জানছে কি করে, তার ঘুম ভাঙার ঢের আগেই তুই চলে

আসবি। তোকে নিয়ে কি আমি দূরে যাব নাকি, কাছেই খেলা করব—জঙ্গলের মতো মজা আর কোথাও আছে নাকি, নিজেই তো দেখলি!

মিষ্টি তবু ভয় পাচ্ছে দেখে এবারে রেগেই গেল।—মায়ের পাশে শুয়ে তুইও তাহলে ঢেপসির মতো ঘুমোগে যা—মুরগির মাংস খুব ভালো হজম হবে'খন—স্বার্থপর মেয়ে কোথাকারের, আর কক্ষনো যদি আসি।

গেট ছেড়ে বাপী রাস্তাটার ওপারে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। ভাবখানা এক্ষুনি ও একলাই জঙ্গলে নেমে যাবে।

বাপীকে অন্তত না দিয়ে নিজেদের মুরগির মাংস খাওয়াটা যে স্বার্থপরের কাজ হয়েছে মিষ্টি এখন আর সেটা অস্বীকার করে কি করে। তাছাড়া সকালে ওই ছেলের সঙ্গে জঙ্গলে ঘোরার মজাটাও কম হয় নি। ও চলে গেলে সত্যি খারাপ লাগবে। রাগ করে যদি আর না আসে তাহলে আরো খারাপ লাগবে।

একটা হাত তুলে বাপীকে দাঁড়াতে বলল। তারপর হালকা পায়ে ছুটে বাংলোয় উঠে গেল। বাবা মা কেমন ঘুমোচ্ছে উঁকি দিয়ে দেখে নিল। কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে আবার ছুটে চলে এলো। সন্তর্পণে গেটের শিকলটা তুলে দিয়ে সেও রাস্তার এ-ধারে। উত্তেজনায় বুকের ভিতরে ঢিপঢিপ।

মিষ্টির একটা হাত বাপীর দখলে। তরতর করে রাস্তার ঢল বেয়ে নেমে চোখের পলকে দু'জনে জঙ্গলের আড়ালে। মিষ্টির গা ছমছম করছে। এখন তো আর বড় কেউ সঙ্গে নেই। ভিতরে পা দিয়েই মনে হল জঙ্গলটা ভীষণ নিরিবিলি এখন।

বাপীর বুঝতে দেরি হল না। হাতির পিঠে বসেই ভালুক আর বুনো শূয়োর দেখে ওই মেয়ে ওকে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরছিল। ওর যেন সুবিধেই হল।

–ভয় করছে বুঝি?

মিষ্টির স্বীকার করতে আপত্তি, আবার একেবারে অস্বীকারও করতে পারছে না।

—দূর বোকা মেয়ে, আমি তো সঙ্গে আছি। হাত ছেড়ে বাপী এবারে ওর কাঁধ ধরে নিজের গায়ের সঙ্গে আগলে নিয়ে পা বাড়ালো।

ভয়-ডর কিছুক্ষণের মধ্যেই মিষ্টিরও উবে গেল। দুটো রঙ-চঙা প্রজাপতির পিছনে ছোটাছুটি শুরু করে দিল। পাথর হাতে করে গাছের ডোরা-কাটা কাঠবিড়ালিও তাড়া করল দু'জনে। একটা খরগোস ও-দিক ফিরে গাছের কচি পাতা খাচ্ছিল, একেবারে একটুর জন্যে বাপীর ঢিলে থেঁতো হবার হাত থেকে বেঁচে গেল।

এ এক ভিন্ন রোমাঞ্চ। ছোটাছুটির ফলে মিষ্টি অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে। বাপীর চোখে তাও মিষ্টি মিষ্টি লাগছে। ফোলা ফোলা গাল দুটোতে এখন যেন আলগা রং লেগেছে। চুলের গোছা মাঝে মাঝেই মুখে এসে পড়ছে। বাপী লক্ষ্য রাখছে, ফাঁক পেলে ওর আগে নিজে হাত বাড়িয়ে সেগুলো পিছনে সরিয়ে দিচ্ছে।

এরপর একটা গাছের বুক-সমান নীচু মোটাসোটা ডাল বেছে নিয়ে বাপী দু'হাতে ভর দিয়ে সেটার ওপর লাফিয়ে উঠে বসল। তারপর ঝোলানো পা দুটোকে শক্ত করে একটু ঝুঁকে মিষ্টির হাত দুটো ধরে হুকুম করল, নে, পায়ের ওপর পা দিয়ে উঠে চলে আয়।

মিষ্টির এখন সবেতে আনন্দ। গাছের ডালে কখনো চড়ে নি বা বসে নি। বাপীর

হাত ধরে ওর পা বেয়ে উঠতে চেষ্টা। খিল খিল হাসি। ওঠা হল, এখন হাত ছেড়ে বাপীর পাশে গাছের ডালে বসে কি করে?

কি করে বসবে বাপী সেটা ভালোই জানে। একটা হাত ছেড়ে কোমরের কাছটা জড়িয়ে ধরে নিজের কোলের ওপর টেনে নিয়ে এলো ওকে। মুখে মুখে ঠেকল, মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি। তারপর দু'হাতে একরকম জাপটে ধরেই পাশে ডালের ওপর বসিয়ে দিল।

মিষ্টি আনন্দে আত্মহারা। আর আনন্দের সঙ্গে বাপীর হাড় মাংসের মধ্যে আরো অচেনা কিছুর ঝিলিক। গাছে বসার পরেও এক হাতে নিজের গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে আছে ওকে।

কিন্তু মিষ্টির এখন সাহস খুব।—আঃ, সাপটে ধরে আছ কেন, ছাড়ো না!

জবাবে একটু ধমকের সুরে বাপী বলল, হ্যাঁ:, পড়ে গেলে তখন? তোর কি অভ্যেস আছে? পড়ে গিয়ে ওই ননীর শরীর একটু ছড়ে গেলে তোর মা আস্ত রাখবে আমাকে? গাছে একটা বাঁদর-টাদর এসে বসলেই তো তুই ভিরমি খেয়ে পড়ে যাবি।

মিষ্টি সভয়ে গাছের ওপরটা দেখে নিল একবার।—বাঁদর এসে বসবে নাকি?

বাপী যথাসম্ভব গম্ভীর।—আমি থাকলে ভয় নেই, এখানকার বাঁদরেরা আমাকে ওদের হেডমাস্টার ভাবে।...বাড়ির থেকে এখানে তোর ভালো লাগছে কিনা বল—

সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টির অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস।—খু-উ-ব ভালো লাগছে। সকালেও ভালো লেগেছিল। বাড়িতে কিচ্ছু মজা নেই।

সোৎসাহে বাপী বলল, তাও তো এখন পর্যন্ত কিছুই দেখিস নি তুই। জঙ্গলে জীব-জন্তুরা যে কি-কাণ্ড করে না!

ওদের ভালবাসাবাসির ব্যাপারটা বলতে গিয়েও বলল না। হাঁদা মেয়ে বাড়ি গিয়ে যদি আবার কাউকে বলে দেয় তাহলে চিত্তির। জোরে শ্বাস টানল বার কয়েক। মিষ্টির চুলের গন্ধ আর গায়ের গন্ধ। সকালে আবু ঠাট্টা করে বলছিল, হাওদার ওপর ও নাকি মিষ্টিকে কোলে সাপটে নিয়ে বসেছিল। না অতটা পারে নি। ওকে গাছে টেনে তোলার সময় বরং ঢের বেশি চালাকি করা গেছে। সেই চালাকির ঝোঁকটাই মাথায় চেপে বসছে আবার।

—তোর চুলে আর গায়ে সুন্দর গন্ধ...কি করে হল রে? কি মাখিস?

মিষ্টি বলল, চুলে মা গন্ধ তেল মাখিয়ে দেয়, চানের সময় গায়ে সাবান ছাড়া আর তো কিছু মাখি না—

বাপী ওর গলার নীচে নাক ঠেকিয়ে জোরে দু'বার শ্বাস নিল। তারপর মন্তব্য করল, তোর গায়েও সুন্দর গন্ধ।

নিজের বুকে চিবুক ঠেকিয়ে মিষ্টি বুঝতে চেষ্টা করল কি-রকম সুন্দর গন্ধ! তারপর বলল, আমি তো পাচ্ছি না!

বাপী বলল, নিজেরটা নিজে পাওয়া যায় না বোধ হয়, আমার পাস কিনা দেখ্ তো।

মিষ্টি ওর বুকে নাক ঠেকিয়ে জোরে শ্বাস টেনেই মুখটা বিকৃত করে ফেলল।—

এঃ, বিচ্ছিরি ঘামের গন্ধ।

রাগ না করে বাপী হাসতে লাগল। বলল, আমি তো ছেলে, বুঝলি না—ছেলেদের গায়ে কি মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ মানায়!

আনন্দে যত বিভোর হোক, আজ সময়-জ্ঞান ভোলেনি বাপী। ধরা পড়লে আজকের আনন্দ তো মাঠে মারা যাবেই, পরেও আর কোনো আশাই থাকবে না। লাফিয়ে ডাল থেকে মাটিতে নেমে পড়ল। তারপর দু'হাত বাড়িয়ে মিষ্টিকে ডাকল, আয়।

ওর মতো লাফিয়ে নামতে পারে কিনা মিষ্টি একবার দেখে নিল। লোভ হচ্ছে, কিন্তু খুব ভরসা পাচ্ছে না। সেটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে বাপীর গলায় শাসনের সুর।—হাতে পায়ে লেগে গেলে জঙ্গলে ঘোরার মজা একদিনেই শেষ—চলে আয়।

দু'দিকের পাঁজর ধরে বাপী নিজের বুকের ওপর টেনে নামাল ওকে। তারপর তক্ষুনি মাটিতে না নামিয়ে সেই ভাবেই দশ বারো পা এগিয়ে গেল। বুক ছেড়ে মুখের সঙ্গেও মুখ ঠেকে আছে। এবারে মিষ্টির অস্বস্তি।—মাটিতে নামাচ্ছ না কেন!

—দাঁড়া, পিঁপড়ের ডাঁই-ফাই দেখেছিলাম ও-দিকটায়। দাঁড়িয়ে গেল। মুখে হাসি। —আমার গায়ে কত জোর জানিস, তোকে আমি এমনি করে ওই রাস্তা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি—যাব?

—না-না। মিষ্টি এবারে হিঁচড়ে নেমে এলো।—আমি কি ছোটি, কেউ দেখে ফেললে?

মাটিতে নেমে গেলেও বাপী ওর হাতের ওপর দখল নিতে ছাড়ল না। রাস্তার কাছাকাছি এসে হাতও ছাড়ল।—শোন, বাড়িতে কাউকে কিছু বলবি না কিন্তু খবদ্দার!

ঠোঁট উল্টে মিষ্টি জবাব দিল, কি বুদ্ধি তোমার, বললে তো মা আমাকেই আগে ঠেসে বকুনি লাগাবে।

ছুটে রাস্তায় উঠে গেল। বাপীও এগিয়ে এসে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে। সন্তর্পণে গেট খুলে আবার শেকল লাগিয়ে দিয়ে মিষ্টি চোরের মতোই বাংলোয় উঠে গেল। ঘরের মধ্যে একবার উঁকি দিয়ে একমুখ হেসে আবার সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালো। গাছের আড়াল থেকে বাপীও গলা বাড়িয়েছে। হাত নেড়ে মিষ্টি বুঝিয়ে দিল, বাবা-মা এখনো ঘুমোচ্ছে।

বাপী হাওয়ায় ভেসে বাড়ি চলল। আবুটা শুনলে কি বলবে ভাবছে আর হাসছে। সেই সঙ্গে একটা অবুঝ আনন্দ ভিতর থেকে উপচে পড়তে চাইছে। এটা কি রকমের আনন্দ বা এ-রকম কেন হয় বাপীর কাছে এখনো খুব স্পষ্ট নয়।

... তবে আবুর একটা কথা ঠিক, মিষ্টিটা এখনো বড্ড ছোটি। আজ এত কাণ্ড হয়ে গেল, ও কিছু বুঝতেই পারল না। তাই ওর এই আনন্দের এক ফোঁটাও ভাগ পেল না।

...বাপীর যদি সে-রকম মন্ত্র-টন্ত্র কিছু জানা থাকত, মিষ্টিটাকে তাহলে রাতারাতি আর একটু বড় করে ফেলত।

ঠিক এক বছরের মাথায় বনমায়াকে নিয়ে আবার একপ্রস্থ হৈ-চৈ। আর তার এক মাসের মধ্যে ওর মাহুত মন-মরা ভীম বাহাদুরের আশা আর ভবিষ্যদ্বাণী দুই-ই তাক লেগে যাওয়ার মতো সফল।

বনমায়া আবার পালিয়েছে। এক মাস না যেতে ঠিক আগের বারের মতো একা নিজেই আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু ওর এবারের পালানোটা একেবারে অন্যরকম। এবারে আর জঙ্গলের কেউ বা আশপাশের বন্দুক-অলা সাহেবদের কেউ দ্বিতীয় কোনো বুনো হাতির হাঁকডাক শোনে নি। এদিকে প্রথমবার পালানোর ফলে বনমায়ার পায়ের শেকল বদলে ঢের শক্ত-পোক্ত শেকল আনা হয়েছিল। পেল্লায় শাল-গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা সেই শেকল ছেঁড়া একলা বনমায়ার কর্ম নয়। একলা যে ছেঁড়ে নি তারও প্রমাণ মিলেছে। আগের রাতে অল্প অল্প বৃষ্টি হয়েছিল। সেখানকার মাটিতে বনমায়া ছাড়া আরো একটা হাতির পায়ের ছাপ দেখা গেছে। আর জঙ্গল থেকে দূরের পাহাড়ের দিকে পাশাপাশি দুটো হাতি চলে যাওয়ার হদিসও মিলেছে।

মোট কথা, এটা স্পষ্ট বোঝা গেছে, বুনো মরদ হাতিটা এবার নিঃশব্দে এসেছে। দুজনে মিলে শিকল ছিঁড়ে তেমনি নিঃশব্দে একসঙ্গে পালিয়েছে। এই পাহাড়ী জঙ্গল এলাকায় একটু বৃষ্টি হলেই দিব্যি ঠাণ্ডা পড়ে। সাহেব-সুবোরা বিলিতি আর জঙ্গল বা চা-বাগানের নিচের ধাপের জোয়ান-বুড়োরা দিশী মদ টেনে পাকা ঘুম লাগায়। বড় রকমের হাঁক-ডাক না হলে এমনিতে তাদের অসময়ে ঘুম ভাঙার আশা কম।

বড়সাহেব সন্দীপ নন্দী গেল বছরের হাতি পালানোর ফিরিস্তি শুনেছেন। এবারে এমন নিঃশব্দে পালানোর ব্যাপারটা নিজে চাক্ষুষ তদারক করে ভীম বাহাদুরের খুব একটা দোষ খুঁজে পেলেন না। কিন্তু মরা হাতির দাম যেখানে লাখ টাকা, সেখানে পোষা জ্যান্ত হাতি পালালে সরকারী কৈফিয়তে দোষ-ত্রুটি তো কিছু বার করতেই হবে। হাতি তার প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়েছে অতএব কারো দোষ নেই এ-কথা লিখতে পারেন না। ও-দিকে চোখের জল ফেলে আর দু-হাত জোড় করে ভীম বাহাদুর যা বলছে তাতে তড়িঘড়ি শাস্তি দেওয়া দূরের কথা, গম্ভীর থাকা দায়। তার আর্জির সার কথা, সাহেব যেন নারাজ না হন, সে নিরপরাধ হলেও দোষ মেনে নেবে যদি না বনমায়া ফিরে আসে। গা জুড়োলেই বনমায়া ফিরে আসবে। আসবেই।

ওর সমব্যথী ফরেস্ট গার্ড আর বীটম্যানদেরও সেই বিশ্বাস। অতএব বড়সাহেব তদন্তসাপেক্ষ রিপোর্ট দিয়ে বিচার স্থগিত রেখেছেন। আর মুখে ভীম বাহাদুরকে বলেছেন, ভালো করে তল্লাসি চালিয়ে যেতে, না পেলে মুশকিল হবে।

ভীম বাহাদুরের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি প্রমাণ করে গেলবারের মতোই, এক মাসেরও আগে বনমায়া যেমন নিঃশব্দে গেছল তেমনি নিঃশব্দে আবার ফিরে এসেছে। আর রাগের চোটে ভীম বাহাদুর পাগলের মতো কাণ্ড করেছে। ঘর থেকে ডাঙশটা এনে ওর মাথায় চেপে বসে এলোপাথাড়ি মার শুরু করেছিল। বনমায়াও তেমনি গাঁ-গাঁ করে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল। ভীম বাহাদুরের একটা পা ধরে টেনে আবু ওকে হিঁচড়ে নামিয়েছে। তারপর ঝাঁঝিয়ে উঠে বলেছে, কি বুদ্ধি তোমার, প্রেম মাথায় চড়লে ও পালাবেই; কিন্তু এরকম মার খেলে আর ফিরে আসবে?

ওর যুক্তির কথা শুনে বনমায়াকে ভীম বাহাদুরের এরপর সে কি আদরের ঘটা।

কত কি আছে যা ভাগ না করলে ভোগের আনন্দ বাড়ে না। বাপীরও সেই গোছের খেদ। খেদ কেন, রাগই বলা যেতে পারে। রাগ মিষ্টির ওপর, মিষ্টির মায়ের ওপর, এমন কি কলকাতায় কারা সব ঘোড়ার ডিমের আত্মীয় আছে ওদের, তাদের ওপরেও। এক

মাসের ওপর হয়ে গেল ছেলেমেয়ে নিয়ে মিষ্টির মা কলকাতায় গেছে কোন্ আত্মীয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে। মহারাণীর এখনো ফেরার নাম নেই। আসলে ছেলেমেয়ের অ্যানুয়াল পরীক্ষা হয়ে গেছে, পরীক্ষার ফল বেরুলেও নতুন ক্লাস এখনো শুরু হয় নি, তাই ফেরার তাড়াও কম। কিন্তু বনমায়াকে নিয়ে এ-দিকে এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল আবার, মিষ্টি জানতেও পারল না।

এই একটা বছরে বাপীর বুদ্ধিসুদ্ধি আরো পেকেছে। ওর জন্যেই জঙ্গলে বেড়ানোর নামে মিষ্টির এখন জিভে জল গড়ায়। আগের থেকে ওর সাহসও অনেক বেড়েছে। ছুটির দিনের দুপুরে ও-ই বরং বাপীর অপেক্ষায় ঘর বার করে এখন। খরগোস কাঠবেড়ালি বা বনমোরগ তাড়া করার ঝোঁকে বাপী যে এক-একদিন ওকে নিয়ে কতটা দূরে চলে যায় মিষ্টি ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারে না। আবু সঙ্গে থাকলে তো কথাই নেই। মিষ্টি তখন নিজের খুশিতেই একটু দূরে পা বাড়াতে চায়। বাপীর বোল-চালের ফলে হোক বা আবুর হাবভাব দেখেই হোক, মিষ্টির এখন বিশ্বাস বাঘ-ভালুক সামনে পড়ে গেলেও আবু ওদের কলজে ফুটো করে দেবে। আবু নিজেই বলে, তোমাদের যেমন দেবতা আছে, জঙ্গলের তেমনি অপদেবতা আছে। আমি হলাম গিয়ে সেই অপদেবতা, আমি সঙ্গে থাকলে তোমার কোনো ভয় নেই খুকুমণি।

কিন্তু বাপীর নিজের দোষেই মিষ্টি একটা জিনিস ইদানীং বুঝে ফেলেছে। ফাঁক পেলেই ওর এই সুন্দর শরীরটার ওপর ও হামলা করে। চালাকি করে গায়ে পিঠে হাত দেয়, মিথ্যে ভয় দেখিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে। নিজে এখন অনায়াসে উঠতে পারলেও বুকের সঙ্গে সাপটে ধরে গাছের ডালে বসায় নয়তো ডাল থেকে নামায়। একদিন তো ডাল থেকে নামার সময় ইচ্ছে করেই ওকে নিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেল। এমনি করল যেন টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেছে। মিষ্টির অবশ্য লাগে নি, লেগে থাকে তো ওরই একটু-আধটু লেগেছে। কারণ মিষ্টি ওপরে আর ও নীচে। কিছু বুঝুক না বুঝুক, মিষ্টির এরকম হামলা করতে দিতে আপত্তি। আগেও বলেছে—দাদা মারলে মা দাদাকেই বকে, মেয়েদের গায়ে হাত তুলতে হয় না, বুঝলে? আর তুমি কেবল আমাকে পেলেই ধরে টানাটানি করো। এরকম করলে মাকে আমি বলে দেব।

বাপীর রাগ যেমন ভয়ও তেমনি। হেসেই ওকে ভোলাতে চেষ্টা করেছে, তুই যেমন বোকা, মেয়েদের মারতে নেই বলে গায়ে হাত তুলতে নেই—আমি কি তোকে মারার জন্যে গায়ে হাত দিই?

—তবে কেন দাও?

বাপী ভয়ে ভয়ে খুব মোলায়েম করে বলেছে, আমার ভালো লাগে।

—আমার বিচ্ছিরি লাগে। তুমি ও-রকম করলে আমি আর আসবই না।

বাপী কথা দিয়েছিল ও-রকম আর করবে না। কিন্তু তার পরের ছুটির দিনেই ইচ্ছে করে গাছের ডাল থেকে নামানোর সময় ওকে নিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেয়েছে। মিষ্টি আর কিছু না বুঝুক, এটুকু বুঝেছে ওর শরীরের ওপর হামলা করতে ওই পাজী খুব মজা পায়।

এরপর কলকাতায় যাবার আগে মাত্র দুটো ছুটির দিনে জঙ্গলে এসেছিল। দুদিনই মিষ্টি বেঁকে বসেছিল, আসবে না। দাদার বন্ধু দাদাকে বলেছে, চা-বাগানের এক দুষ্টু লোক

একটা মেয়ের গায়ে হাত দিয়েছিল, সেই জন্য রেগে গিয়ে অন্য লোকেরা ওই লোকটাকে মেরেছে। মিষ্টির মা বলেছে, বেশ করেছে মেরেছে, ও-রকম অসভ্য লোককে মারাই উচিত।—জঙ্গলে গেলে তুমিও অসভ্যের মতো করো, তোমার সঙ্গে যাব না!

নিরুপায় বাপী তখন নিজের কান মলেছে। বলেছে, ও-রকম করাটা যে অসভ্যতা ও ঠিক জানত না—আর কক্ষনো ও-রকম করবে না।

এরপর মিষ্টি এসেছে। বাপী ওর হাত ধরেছে তাতে খুব আপত্তি হয় নি। হাত ধরাটা তো আর গায়ে হাত দেওয়া নয়। পরের বারেও মিষ্টি আগে থাকতে গায়ে হাত না দেবার কড়ার করে তবে জঙ্গলে ঢুকেছে। বাপীর তাতেই প্রচণ্ড রাগ হয়েছে, হাত দুটো আরো বেশি নিশপিশ করেছে। আর অতটা বাড়াবাড়ি করে ফেলার জন্য মনে মনে নিজেকেই গালাগাল করেছে।

রাগ বাপীর ওই বড়সাহেবের বাংলোর সকলের ওপরেই। মিষ্টির বাবা-মা, দীপুদা সকলের ওপর। ও-বাড়িতে ঢুকতে হলে আবুর সঙ্গে খরগোস বা বনমোরগ নিয়ে, আম-জাম-জামরুল-পেয়ারা-খেজুর নিয়ে, ঝুড়ি ভরতি শাল-পলাশ নিয়ে, বা চাক-ভাঙা মধু নিয়ে যেতে হয়। আবুর আশা মেমসাহেবের নেকনজরে পড়লে সে বীটম্যান হবে। আর বাপীর আশা, মেমসাহেব বা দীপুদার কাছে ওর একটু আদর হবে, যার ফলে যখন-তখন এই বাংলোয় আসাটাও সহজ হবে। কিন্তু একটা বছরে এটুকু ভালোই বুঝে নিয়েছে, আদরের আশা দূরে থাক, এই বাংলোর মানুষেরা ওদের মানুষই ভাবে না। জিনিস-টিনিস পেলে এমন ভাব দেখায় যেন এসব তাদের পাওনা। এমনিতে মিষ্টির সঙ্গে একটু গল্প কবার লোভে বাংলোয় পা দিলেই মেমসাহেবের দুই ভুরুর মধ্যে বিরক্তির ভাঁজ পড়ে। সকালে জিনিস দেবার পর বিকেলে এলেও এমনিই অখুশি মুখ দেখে মেমসাহেবের। আর একদিন আবুর সঙ্গে এক ভাঁড় চাকভাঙা মধু নিয়ে এসে মেমসাহেবের মুখে হাসি দেখে সাহসে ভর করে তার সামনেই মিষ্টিকে ডেকে বলেছিল, মিষ্টি, একটা কথা শুনে যা—

সঙ্গে সঙ্গে মেমসাহেবের ক্রোধ-মূর্তি।—এই ছেলে, অসভ্যের মতো তুই-তুকারি করিস কেন? ফের শুনি তো কান ছিঁড়ে দেব—

অপমানে বাপীর মুখ কালি একেবারে। বাইরে এসে আবু আবার তার ওপর হেসে হেসে নুন ছড়িয়েছে।—কি রে, ওই মেয়ের সঙ্গে আর প্রেম করবি না কি এরপর ওর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে পেন্নাম ঠুকবি?

রাগের চোটে বাপী জ্বলে উঠেছিল, ওই মিষ্টিকে একদিন আমি একেবারে গিলে খাব দেখে নিও।

পিঠ চাপড়ে দিয়ে আবু বলেছিল, এই তো মরদের মতো কথা।

মেমসাহেব তো তবু মুখে বলেছে কান ছিঁড়ে দেবে। দীপুদা যখন তখন কান টেনেই ধরে, আর মাথায় খট-খট করে গাঁট্টা বসিয়ে দেয়। সব ছুটির দিনেই একলা মিষ্টিকে নিয়ে জঙ্গলে ঢোকার সুযোগ হয় না। কোনো কোনো ছুটির দিনে ওদের বাংলোয় অতিথি আসে, কোনদিন বা দীপুদা এমনিই বেরোয় না। তখন একলা মিষ্টিকে নিয়ে জঙ্গলে ঢোকার আশায় ছাই। বাপী তখন ছুটে গিয়ে আবুকে ধরে নিয়ে আসে। আবুকে দেখলে দীপুদার জঙ্গলে বেড়াতে আপত্তি নেই। বাড়িতে লোকজন দেখে বেরুবার আশায় এই লোভটা

মিষ্টিই একদিন দাদাকে দেখিয়েছিল, আর বাপীকে বলেছিল আবুকে ডেকে আনতে। তারপর থেকে ঘরে থাকলে দীপুদাও জঙ্গলে ঘোরার রস কিছু পেয়েছে। এক-একদিন নিজেই ওকে ডেকে বলে দেয়, আবুকে ডেকে নিয়ে আসিস—

এক জায়গায় বেশি দিন থাকলে ভয়-ডর আপনা থেকেই কমে আসে। মিষ্টি এখন সামনের রাস্তা পেরিয়ে একলা জঙ্গলে নামলে আর খুব কাছাকাছির মধ্যে ঘোরাঘুরি করলেও ওর মা বকা-ঝকা করে না। কেবল বলে দেয়, খবরদার দূরে যাবি না, এখান থেকে ডাকলে যেন শুনতে পাস—

ছেলে আর আবু সঙ্গে থাকলে কিছুই বলে না। তার ধারণা কাছাকাছির মধ্যেই থাকে ওরা। সে-সময় দীপুদার মাতব্বরী আর শাসন দেখে বাপীর গা জ্বলে যায়। জঙ্গলটা যেন ওদের সম্পত্তি। ইচ্ছেমতো বাপী এদিক ওদিক ছুট লাগালে চোখ পাকাবে। পশু-পাখি টিপ করে পাথর ছুঁড়লেও এক-এক সময় আচমকা গাঁট্টা। কি, না আমি মারতে যাচ্ছিলাম, তুই আগে মেরে বসলি কেন? ওর সঙ্গে ছুটতে গিয়ে মিষ্টি হোঁচট খেয়ে ব্যথা পেল কি পেল না, দীপুদার চড়-চাপড়টা এসে পড়ল ওর ওপর। বাপীর সব থেকে বেশি অপমান হয় এসব যখন আবু দেখে আর তেরছা চোখে ওর দিকে তাকায়। যেন বলতে চায়, ভালবাসার আর দাম দিবি, এরপর কি জুতোপেটা শুরু হলে আক্কেল হবে?

সেই এক বছর আগে মিষ্টিকে ভালবাসতে ইচ্ছে করার কথাটা বোকার মতো আবুকে যদি না বলে ফেলত, তাহলে এতটা খারাপ লাগত না। মিষ্টির মা বা দীপুদা শাসন করলেও আবু এভাবে তাকিয়ে মজা পেত না, বা ঠাট্টা-ঠিসারা করত না। ওই বাংলোর মহারাণী আর তার ছেলের ওপর কত যে রাগ বাপীর সে শুধু ওই জানে। রাগ বড়সাহেবের ওপরেও। বাপীর বাবার থেকে এত ওপরের একজন না হলে ওকে এত হেলা-ফেলা কেউ করত না। আর রাগ সময় সময় তাদের আদুরে মেয়ের ওপরেও। ওই মিষ্টির থেকে বনমায়া ঢের ভাল। পায়ে শেকল বাঁধো আর যা-ই করো, ভালবাসার পুরুষ হাতি এলে সব ভয়-ডর বিসর্জন দিয়ে ও তার সঙ্গে চলে যাবেই। মিষ্টি যদি বনমায়ার মতো হত।

বনমায়াকে নিয়ে আবুর সঙ্গে অনেক রসের কথা হয়েছে বাপীর। সে-সব কথা মিষ্টিটাকে বলাও যাবে না। এক বছরেই বাপী ভিতরে ভিতরে যেমন ধাঁ-ধাঁ করে বড় হয়ে গেছে, ও তো আব অতটা হয় নি। আর আবুর তো কথাই নেই, আঠেরো বছর পার—জঙ্গলের যাকে বলে বুক-চিতানো মরদ একখানা। ওকে দেখলেও বাপীর চোখ জুড়োয়।

কিন্তু মিষ্টিরা নতুন বছরের ছুটির মধ্যে এখানে না থাকাতে জন্ম থেকে দেখা এই বানারজুলির জঙ্গলটাকেই আরো চেনা আরো জানার সুযোগ হয়েছে বাপীর। অ্যানুয়াল পরীক্ষা শেষ, ছুটির আগে রেজাল্টও বেরিয়ে গেছে। নতুন ক্লাসের বইপত্রই কেনা হয় নি এখন পর্যন্ত—বই নিয়ে বসার তাড়াই বা দেয় কে? তার ওপর স্কুল ছুটি।

সকাল দুপুর বাপীর আবুর সঙ্গেই কাটছে। আঠারো পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবুর বীটম্যান হওয়ার দাবী। এতদিন স্কুল-ছাড়া সার্টিফিকেটে ওর বয়েসটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চাকরির জন্য আবু এখন কোমর বেঁধে তৈরি। ওর বাবা কালুকে নিয়ে বাপীর বাবার সঙ্গে দেখা করে দরখাস্ত পেশ করেছে। বাবা দরখাস্ত রেখেছে, আশাও দিয়েছে।

চাকরি দেওয়া না দেওয়ার মালিক বড় সাহেব—মিষ্টির বাবা। সেটা সকলেই জানে। কিন্তু তার কাছে সুপারিশ তো কাউকে করতে হবে। বাপীর বাবা সেই সুপারিশের আশ্বাস দিয়েছে।

আবুকে মুখে কিছু না বললেও এখানেই বাপীর যা একটু সংশয়। বড়সাহেবকে দশ গজের মধ্যে দেখলেই বাবার চোখ-মুখের যা অবস্থা হয় তার দ্বারা ধরা-করার ব্যাপারটা কতদূর হবে কে জানে। তবে আবুকে অন্য দিক থেকে একটু আশার কথা শোনাতে পেরেছে বাপী। বাবা ওর দরখাস্ত বড়সাহেবকে দিলেই ও মিষ্টিকে ধরবে। মিষ্টি বাপের আদুরে মেয়ে, তার ওপর আবুকে ওরও ভারী পছন্দ। তাছাড়া এটা ওটা ভেট দিয়ে দিয়ে আবু মেমসাহেবকেও খুশি রেখেছে। আবুর চাকরি তাহলে হবে না কেন?

কিন্তু আবু কোনো চিন্তা-ভাবনার ধার ধারে না। নিজের কাছে ও পাকাপোক্ত বীটম্যান একজন হয়েই বসেছে। বাপ অর্থাৎ হেড বীটম্যান কালুর চার ভাগের তিন ভাগ কাজ ও-ই করছে এখন। বীটম্যানদের প্রথম কাজ জঙ্গলে টহল দেওয়া। বাপী তার সেই টহলের দোসর এখন।

জঙ্গলের মধ্যেই মাটির ঘরে থাকে ওরা। সব বীটম্যানরাই তাই। অনেকটা দূরে দূরে ওদের ঘর। ভাড়া গুনতে হয় না, এমনিতেই থাকতে পায়।

সকালে মুখে কিছু গুঁজেই বাপী ছোটে আবুর ওখানে। দেরি হলে আবু একলাই বেরিয়ে পড়বে। কারণ কালু তো এখন আর সকালের মুখ দেখে না। পড়ে পড়ে ঘুমোয় বা ঝিমোয়। বাপীর ধারণা ছেলে অনেক কাজ বুঝে নেবার পর থেকে ওর নেশার মাত্রা বেড়েছে। আর নিজে থেকে কিছু বলে না বলে বাপীও মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞেস করে না।

টহল দেবার সময় বীটম্যানদের হাতে পাকানো বাঁশের লাঠি থাকে। কিন্তু আবু নিজের পিয়ারের সেই লোহার খাপআঁটা ইস্পাতের ফলা বসানো লাঠিটা সঙ্গে নেয়। বাপীর হাতেও থাকে তার নিজের ছোট লাঠি। শাল শিশু অর্জুন জারুল দেবদারু ইউক্যালিপটাস গাছগুলোয় ঘা মারতে মারতে এগোয় তারা। ফুর্তি করার জন্য ঘা মারা নয়। কোনো গাছে পোকা ধরল কিনা ঘা মারার শব্দ থেকে সেটা বোঝা যায়। বাপী বুঝতে পারে না, কিন্তু আবু ঠিক বুঝতে পারে। গাছের শত্রু উই, গান্ধীপোকা, গঙ্গাফড়িং, পঙ্গপাল। কোন শত্রু নিকেশের জন্য কি ওষুধ দরকার আবু তাও জেনে ফেলেছে। কোনো গাছের পোকা ধরলে বা শত্রুর সন্ধান পেলে বীটম্যানের কাজ ওপরঅলার কাছে রিপোর্ট করা।

ফাঁকি না দিলে বীটম্যানের আরো অনেক কাজ। চারাগাছের বেড নিয়ম করে পরীক্ষা করা একটা বড় দায়িত্ব। জলের নালা দিয়ে ঠিক মতো জল আসছে কিনা, বেশি জল আসছে কিনা, ওর কাছাকাছি সজারু গর্ত খুঁড়ল কিনা, এইসব। বুনো শূয়োরও কত সময় চারাগাছ মুড়িয়ে দিয়ে যায়। সেরকম সম্ভাবনা দেখলে লোকজন ডেকে লাঠি আর টিন কানেস্তারা নিয়ে আশপাশের বড় গাছের ডালে বসে পাহারা দিতে হয়। পাহারা মানে টিনকানেস্তারা পিটে জানোয়ারদের ভয় দেখানো।

কিন্তু আবুর সেরকম পাহারাদার হতে ইচ্ছে করে না। বীটম্যান হলেই ও একটা বন্দুক পেতে চেষ্টা করবে। ওর বাপের যদি সেরকম হিম্মত থাকত তাহলে ঠিক একটা

বন্দুক আদায় করতে পারত। কিন্তু রাত হলেই তো নেশায় পেয়ে বসে বাপটাকে। তার হাতে বন্দুক দেবে কে? না, বাপের ওপর খুব একটা শ্রদ্ধাভক্তি নেই আবুর। বাপীর বাবা মানে কেরানীবাবু নেহাত ভালোমানুষ বলে ওর বাপের দোষত্রুটি ধামাচাপা দিয়ে রাখে—এ কথা আবু নিজের মুখে ওকে বলেছে।

জঙ্গলের মধ্যেই একটা ভাটিখানা আছে বাপী এতদিন সেটা জানত না। একদিনের অভিজ্ঞতায় তাও জানা হয়ে গেল। বেশ ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই যাচ্ছিল দুজনে, হঠাৎ কোত্থেকে একটা বড়সড় হরিণ ঝড়ের মতো ওদের পাশ দিয়ে ছুটতে লাগল। ওটার গায়ে একটা তীর বেঁধা। ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে।

ব্যাপার ভালো করে বোঝার আগেই বাপী দেখে আবুর দুচোখ ঝলসে উঠেছে, চোয়াল কঠিন। হ্যাঁচকা টানে বাপীকে টেনে নিয়ে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু তীর ধনুক হাতে উল্টোদিকের ছুটন্ত লোক দুটো দেখেই ফেলল ওদের। থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

আবু তারস্বরে একটা বিকট চিৎকার করে লোক দুটোকে তাড়া করল। জঙ্গলচোর বা অন্য কোনো বিপদ-আপদ দেখলে বীটম্যান অন্য বীটম্যানদের বা ফরেস্ট গার্ডদের এমনি চিৎকার করে জানান দেয়।

লোক-দুটো চোখের পলকে উধাও। আরো কয়েকবার চিৎকার করেও আর অন্য কোনো বীটম্যানের সাড়া পেল না। ওর যতো উত্তেজনা ততো রাগ। মাল বা পলিয়া জঙ্গল-চোরদের এই কাজ। ফাঁক পেলে তীর ধনুক দিয়ে তারা হরিণ মারে, রাতে কাটা গাছের কাঠ সরায়।...হরিণটা নিশ্চয় কোথাও মরে পড়ে থাকবে। তখন প্রথম দোষটা পড়বে ওর বাবার ঘাড়ে। এ-এলাকায় তার নিজের টহল দেবার কথা, অন্য লোকও মোতায়েন রাখার কথা। আর এ-দিকের ফরেস্ট গার্ডের কাছেও জবাবদিহি করতে হবে।

আবু তার বাবার খোঁজে ছুটল। পিছনে বাপী। কিন্তু কালু ঘরে নেই। দাঁত কড়মড় করতে করতে হনহন করে আবু আবার জঙ্গলের আর এক দিকে চলল।

গাছ-গাছড়ার আড়ালে একটা মাটির ঘর। সেখানে আসতেই একটা বিচ্ছিরি গন্ধ নাকে এলো বাপীর। সামনেই পেল্লায় কড়ার মধ্যে ফুটছে কি। উৎকট গন্ধটা সেদিক থেকে আসছে। এদিকটায় মাটির ওপরেই বসে আছে আবুর বাবা কালু, তার সঙ্গে আরো তিন-চারজন। সকলের হাতেই মাটির ভাঁড়।

আবু ঝাঁঝালো গলায় খবরটা কালুকে দিল। কালু বসে বসে দুলছিল। ঘোলাটে চোখ। জঙ্গল-চোরের উদ্দেশ্যে একটা বিচ্ছিরি গাল দিয়ে উঠল সে। তার সঙ্গীরা আরো কিছু গালাগাল যোগ করল। কালু ছেলেকে হুকুম করল, চোর দুটোকে গাছের সঙ্গে কষে বেঁধে রাখ—আমরা যাচ্ছি। আর বলল, খুঁজে-পেতে মরা হরিণটাকে ঘরে নিয়ে যেতে—রাতে ভোজ হবে।

বাপীর হাত ধরে টেনে আবু রাগে গজগজ করতে করতে ফিরল আবার। অভিসম্পাতও করল, দিনের বেলায়ই বেহেড মাতাল হয়ে আছে—মরুক—ধরা পড়ে মরুক সব!

বাপী সেই প্রথম জানল ওটা ভাটিখানা। চুরি করে মদ চোলাই হয় ওখানে। সকলেই জানে, পাহারাদাররাও জানে। কিন্তু ভাবখানা দেখায় যেন কেউ কিচ্ছু জানে না।

বাপী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, হরিণ মারার ব্যাপারটা ধরা পড়লে তোমার বাবার শাস্তি হবে?

আবু ঝাঁঝালো জবাব দিল, হওয়া তো উচিত। কিন্তু শাস্তি দেয় কে—এখানে ছোট থেকে বড় সব শালা চোর!

বাপী ঘাবড়েই গেল।—আমার বাবাও?

—না, তোর বাবার অত সাহস নেই—তা বলে তোর বাবার বাপ-খুড়োরা কেউ কম যায় না—বুঝলি?

বাপীকে হাঁ করে থাকতে দেখে রাগের মুখেও আবু হেসে ফেলেছিল। তারপর চুরির ব্যাপারটার ব্যাখ্যাও করেছিল। বাপীর বাবার বাপ-খুড়ো বলতে জঙ্গলের বড় মাঝারি ছোট সাহেবরা। এবারের বড়সাহেব অর্থাৎ মিষ্টির বাবা আসার পর থেকে জঙ্গলের চুরি নাকি আগের থেকেও বেড়ে গেছে। কন্ট্রাকটারদের গাছ ইজারা দেওয়ার সময় মোটা ঘুষের টাকা ওই সাহেবসুবোদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়। অনেক শিশুগাছে ইচ্ছে করেই চিহ্ন দেওয়া হয় না। চিহ্ন না থাকা মানেই সরকারী হিসেবে সে গাছ নেই। শিশুগাছ খুব দামী। ভালো কাঠ আর তক্তা হয়। টাকা খেয়ে বড়সাহেব মেজসাহেবরা সেই সব মার্কা ছাড়া গাছ কাটতে দিলে কে আর ধরবে? কার বুকের পাটা আছে যে বলে দেবে? তাছাড়া ঘুষ দিয়ে বেআইনী শিকারও কম হচ্ছে নাকি এখন এখানে?

মিষ্টির বাবা পর্যন্ত এরকম খারাপ কাজের মধ্যে আছে শুনে বাপীর মুখে কথা সরে না। কিন্তু কাউকে বলার জো নেই, এমন কি পিসীকেও না। আবু সাবধান করে দিয়েছে, খবদ্দার কাউকে বলবি না—তোর বাবার কানে গেলে উল্টে তোকেই ধরে পিটবে। আর বড়সাহেব মেজসাহেবদের কানে গেলে তো তোর আমার বাবারই চাকরি নট।

মুখে না বলতে পারুক, এত সব জানার ফলে বাপীর ভিতরে ভিতরে রাগ খুব। জঙ্গলটা একটু আদর-যত্ন আর দেখা-শুনার আশায় মানুষের মুখ চেয়ে আছে, আর মানুষই কিনা সব থেকে বেশি হামলা করছে তার ওপর।

বড়সাহেবের বাংলোয় ওই আদুরে মেয়ের দেখা পাওয়া গেল স্কুল খোলার ঠিক আগের দিনটিতে। এসেছে বাপী তাই জানত না। তবে রোজই একবার করে এদিকটায় টহল দিয়ে যায়।

সকালে মিষ্টিকে বারান্দায় দেখেই আনন্দে বুকের ভিতরটা দাপাদাপি করে উঠল। কিন্তু ডাকবে কি, বড়সাহেব এই বারান্দায় বসেই কাগজ পড়ছে।

ডাকতে হল না, মিষ্টি নিজেই দেখল ওকে। ঘাড় বেঁকিয়ে বাপকে একবার দেখে নিয়ে ও গেটের কাছে চলে এলো।

বাপী গেট-এর ওধারে।

—জানো, আমি ফার্স্ট হয়েছি—বাবা বলল। দাদাও পাশ করেছে—

ফার্স্ট বা পাশের ধার ধারে না বাপী, ওকে দেখেই খুশিতে টইটম্বুর।—কবে ফিরলি?

—কাল বিকেলে। ছুটির মধ্যে তুমি আর আবু খুব জঙ্গল চষলে তো?

খুব। বাপী কথা বলবে কি প্রায় দেড় মাস বাদে মিষ্টিকে দেখে চোখে পলক পড়ে না। মিষ্টির বয়েস এখন মাত্র নয়, কিন্তু এই দেড়টা মাসের মধ্যে ও যেন দিব্যি বড়সড় হয়ে উঠেছে। মাথায় বেড়েছে, মুখ আরো ফর্সা হয়েছে। বলল, এদিকে কত কি কাণ্ড

হয়ে গেল তুই জানিসও না—দুপুরে জঙ্গলে আসবি তো? সব বলব—

—মিষ্টি!

পিছনের বারান্দা থেকে ধমকের সুরে মায়ের আচমকা ডাক। তাঁর হাতের কাচের গেলাসে দুধ। অপ্রসন্ন চাউনি।

জবাব দেওয়া হল না। মিষ্টি ঘুরে আবার বারান্দার দিকে ছুট। বাপীর আর দাঁড়িয়ে থাকার সাহস নেই। মহারাণীর মুণ্ডপাত করতে করতে বাড়ির দিকে চলল। ফিরে আসা হয়েছে জানলে বাপী ঠিক হাতে করে কিছু না কিছু নিয়ে আসত। শুধু কর্তা কেন, ঘুষ ছাড়া গিন্নীরও খুশি মুখ দেখা যায় না। এখন কতক্ষণে দুপুর হবে আর কতক্ষণে একলা পাবে মিষ্টিকে ঠিক নেই।

ঠিক সময়েই দুপুর হল। মিষ্টিকেও একলাই পেল। কিন্তু এতদিন বাদে জঙ্গলে বেড়ানোর সুযোগ পেয়েও মেয়েটার হাব-ভাব অন্য রকম। গেট পর্যন্ত ছুটে চলে আসারও তাড়া নেই। নেহাত গেট-এর কাছে কেউ দাঁড়িয়ে আছে বলেই আসা।

বাপীর সবুর সয় না। আবার ওর মুখ দেখে শংকাও একটু। গলা চেপে জিজ্ঞাসা করল, তোর মা ঘুমোয়নি?

—ঘুমিয়ে কাদা। আর বাবাও বাড়ি নেই।

—তাহলে কি হল, জঙ্গলে যাবি না?

মিষ্টি একবার চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিল ওকে। এরকম করে দেখাটাও নতুন ঠেকছে বাপীর।

—আবু কোথায়?

—আবুকে দিয়ে কি হবে? সে জঙ্গলে ঘুরছে কি বাড়িতে ঘুমুচ্ছে কে জানে!

কড়ার করে নেওয়ার সুরে এবারে মিষ্টি বলল, জঙ্গলে ঢুকে তুমি আমার গায়ে হাত দেবে না?

এতদিন বাদে এসেও সেই পুরনো কথাই আগে বলবে বাপী ভাবেনি। বলার ফলে রাগের সঙ্গে ওই লোভটাই ভিতর থেকে ঠেলে উঠতে লাগল।—তোর কি ননীর শরীর নাকি যে হাত দিলে গলে যাবি? হাত দেব না সে তো সেই কবেই বলে রেখেছি!

গেট খুলে আর বন্ধ করে মিষ্টি বেরিয়ে এলো। কত দিনের মধ্যে জঙ্গলে পা দেয়নি। বেরুনোর তাগিদ তারও কম নয়। জঙ্গলে ঢুকে বাপী ওর হাত ধরার সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে উঠে তার ছাড়িয়ে নিল!

—ফের?

বাপী থতমত খেল একদফা। দেড় মাসের মধ্যে কতটা বড় হয়ে গেছে ঠাওর করে উঠতে পারল না।—হাত ধরতেও দিবি না?

—না। কলকাতার সোনাদি বলেছে তুমি একটা অসভ্য ছেলে, তোমার সঙ্গে একলা জঙ্গলে আসতেই বারণ করেছিল। বলেছিল, তোমার মতলব খারাপ।

বাপী হতভম্ব।—সোনাদি কে?

—আমার এক দূর-সম্পর্কের মাসির মেয়ে। তারও এখন তোমার মতো তেরো বছর বয়েস।

—সে আমার কথা জানল কি করে?

—সোনাদির কাছে তোমার সঙ্গে চুপিচুপি জঙ্গলে বেড়ানোর গল্প করেছি না? আমাকে একলা পেলে তুমি কত রকমের দুষ্টুমি করো তাও বলেছি। তাই শুনেই তো সোনাদি আমাকে সাবধান করে দিল—আমি কি অত বুঝতাম?

বাপীর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। আবার ভয়ও কম নয়।—আর তোর সোনাদি তোর মাকেও বলে দিল?

ঠোঁট উল্টে মিষ্টি জবাব দিল, হুঁ, সোনাদি অত বোকা কিনা। ওদের বাড়ির পাশের এক বজ্জাত ছেলে এক সন্ধ্যায় চুপি চুপি ছাদে উঠে গিয়ে সোনাদিকেই পিছন থেকে জাপটে ধরেছিল—সোনাদি সেকথাই তার মাকে আজ পর্যন্ত বলেনি— তারপর সেই পাজী ছেলে চুমু খেতে চেয়ে সোনাদিকে চিঠি পর্যন্ত লিখেছে—সোনাদি তাও মাসিকে বলেনি, বুঝলে?

বাপীর ভয়-ডর উবে গেল। এ কথা শোনার পর একটা অজানা ইচ্ছে মুখের দিকে এগিয়ে আসছে, আর হাত দুটো আগের থেকে আরো বেশি নিশপিশ করছে। বলল, তোর সোনাদির খুব বুদ্ধি, তোর যদি সে-রকম বুদ্ধি থাকত!

সঙ্গে সঙ্গে বনমায়ার গল্পে চলে এলো সে। আগের বার বনমায়ার পালানো আব ফিরে আসার গল্প ঢের আগেই মিষ্টিকে বলেছিল। এবারেও বনমায়া কি কাণ্ড করে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে তার ভালবাসার পুরুষ হাতির সঙ্গে চলে গেছল, একমাস ধরে ফূর্তিটুর্তি করে কবে আবার ফিরেছে—ওকে দেখে ভীম বাহাদুর ক্ষেপে গিয়ে কি করেছিল, আর আবু কি বলেছিল—এই সব।

এই গল্প শোনানোর ফাঁকে বাপী তখন ওর একটা হাত নিজের হাতের দখলে নিয়ে নিয়েছে, মিষ্টির খেয়ালও নেই। ও-দিকে মিষ্টিও এবারে সোৎসাহে কলকাতায় টারজানের ছবি দেখে আসার গল্প বলল। জঙ্গলের রাজা টারজান। টারজানের মতো বীর আর কাউকে হতে হয় না—গাছের ঝুরি ধরে অনেক দূবের গাছে দোল খেয়ে চলে যায়, পাহাড় থেকে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ে, তার সেই ভীষণ ডাক শুনলে হাতি-বন্ধু আর শিম্পাঞ্জী চলে আসে, লড়াই করে বাঘ সিংহ কুমির মেরে ফেলে। মনে করতেও গায়ে কাঁটা মিষ্টির।

ভাগ্য বটে মিষ্টিটার। কলকাতায় গিয়ে এমন ছবিও দেখে এলো। শুনেই বাপীর রক্ত নাচছে, আর টারজান হবার সাধ যাচ্ছে। হঠাৎ কি ভেবে জিজ্ঞাসা করল, জঙ্গলে টারজানের সঙ্গে কোনো মেয়ে ছিল না?

—ছিল না কি গো! টুকটুকে মেমসাহেব মেয়ে! তারও পরনে টারজানের মতো এইটুকু চামড়ার মতো কি—আর বুক শুধু একটু ঢাকা—তাতেও কি সুন্দর দেখাচ্ছিল।

বাপীর নিঃশ্বাস বন্ধ—টারজান সেই মেয়ের গায়ে হাত-টাত দিত না?

মিষ্টির খিলখিল হাসি। দিত না আবার—দুজনে জড়াজড়ি করে গাছের শিকড় ধরে দোল খেত, টারজান মাটিতে শুয়ে থাকলে মেয়েটা তার বুকের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ত—

আনন্দে বাপী মিষ্টির দু কাঁধ ধরে বড়সড় দুটো ঝাঁকুনি দিল।—তবে? তোর সোনাদি জঙ্গলের খেলা কিচ্ছু জানে না—বুঝলি? জঙ্গলের সব অন্য রকম।

টারজানের ছবি চোখে লেগে থাকায় মিষ্টি খুব যেন সেটা অস্বীকার করে উঠতে পারল না।

নতুন বছরের শুরু থেকেই বাপীর পড়াশুনা শিকেয় উঠেছিল। সেবারের হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষার রিপোর্ট দেখে ভালোমানুষ হরিবাবুরও মেজাজ গরম। ভালো নম্বর কিছুতে নেই, তার মধ্যে দু'পেপারে ফেল। পড়াশুনার জন্য সেই প্রথম ছেলের গায়ে হাত তুলতে গেছলেন তিনি। এক স্কুলে যাওয়া-আসা ছাড়া ঘরের বাইরে পা দিলে আস্ত রাখবেন না বলে শাসিয়েছেন।

বাপী কি করবে? দু'বেলাই বইখাতা নিয়ে সময়মতো পড়তে বসে। কিন্তু ওর চোখের সামনে কেবল জঙ্গল আর আবু আর মিষ্টি আর টারজান। পড়ার ফাঁকে তারা কখন যে এসে হাজির হয় বাপী নিজেও জানে না। তাছাড়া পড়তে বসেই দীপুদার ওপর রাগ, আবুর এই ছ'মাসের মধ্যেও চাকরি না হওয়ার জন্য বড়সাহেবের ওপর রাগ। আর সব থেকে বেশি, চাকর-বাকরের মতো ওকে হেলফেলা করার জন্য মিষ্টির মায়ের ওপর রাগের যত সব কাল্পনিক ফয়েসলা মাথায় ভিড় করে আসে।

...এর মধ্যে চালাকি করে একদিন মিষ্টিকে বাড়িতেও আনা গেছল। তারপর আর একদিন মিষ্টি নিজেই এসেছে। পিসী বড়সাহেব-টাহেব পছন্দ করে না। কিন্তু বড়সাহেবের এই মেয়েটাকে পিসীরও ভালো লেগেছিল। দুদিন আদর করে খেতে দিয়েছে। আর বাপীকে বলেছে সুন্দরই তো মেয়েটা, আর বেশ বাড়ন্ত গড়ন।

পড়তে বসলে এ-সবও বাপীর মনে পড়ে। বাড়ন্ত গড়নের মেয়ে আরো একটু চটপট বড় হয় না কেন তাও ভাবে।

পরীক্ষার ফল নিয়ে বাবার কাছে বকুনি খাওয়ার দিন-কতকের মধ্যে আবার বিপর্যয় নেমে এলো একটা। অথচ এর উল্টো হবার কথা।

মাত্র চারদিন আগে বড়সাহেবের কাছেও আবুর একটু খাতির কদর হয়েছে। আবুটা ডাকাতই বটে। সাঁঝের আঁধারের আগে গভীর জঙ্গলে ঢুকেছিল। একা। গাছে একটা বন-বিড়াল দেখে পিছন থেকে বড় পাথর ছুঁড়ে ওটাকে পেড়ে ফেলেছিল। বন-বিড়াল এমনিতেই ভীষণ হিংস্র। পাথরের ঘায়ে ভালো মতো জখম হয়েও মাটিতে পড়ে ওটা তেড়ে এসে আবুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু আবুর লাঠির পেল্লায় ঘায়ে আবার মুখ থুবড়ে পড়েছে। তারপর আবু লাঠিপেটা করেই ওটাকে শেষ করেছে।

এই বন-বিড়ালটাই একধার থেকে জঙ্গলের ছাগল ভেড়া আর মুরগি মারছিল। এমন দুঃসাহসের জন্য বড়সাহেব সন্দীপ নন্দী পাঁচ টাকা পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন। আর চাকরির আশ্বাসও দিয়েছেন।

বাপীর আনন্দ ধরে না। বাবা যতই শাসন করুক, ছুটির দিনে ঘরে বসে থাকা ওর কুষ্ঠিতে নেই। চারদিন পরের রোববারে মিষ্টিকে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছিল। আর মনের আনন্দে বেশ দূরেও চলে গেছল। আবুর এত বড় বীরত্বের পর ওদেরও যেন ভয় সাজে না।

গোঁ-ভরে একটা খরগোসের পিছনে ছুটেছিল বাপী। ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে মিষ্টি দাঁড়িয়ে গেছল।

একটু বাদে বিশহাত দূরের শিশুগাছটার দিকে চোখ পড়তে মিষ্টির ছোট্ট শরীরটা একেবারে নিস্পন্দ কাঠ যেন। সব রক্ত যেন ঠাণ্ডা জল হয়ে যাচ্ছে।

গাছের মোটা গুঁড়িটার পাকে-পাকে জড়িয়ে আছে একটা অতিকায় ময়াল সাপ। সমস্ত গায়ে ঝকঝকে কালো-সাদার ছোপ-ছোপ দাগ। তার লম্বা চ্যাপটা মুখটা সামনের দিকে টান হয়ে এগিয়ে আছে। চোখ দুটো মিষ্টির চোখের সঙ্গে আটকে আছে। একটা সোঁ-সোঁ নিঃশ্বাস যেন মিষ্টির গায়ে এসে লাগছে।

নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। সর্ব অঙ্গ অবশ। গলা দিয়ে একটু শব্দও বার করতে পারছে না।

ওকে দুচোখে আটকে নিয়ে সাপটা আস্তে আস্তে গাছের গুঁড়ি থেকে শরীরের প্যাঁচ খুলছে!

তারই মধ্যে ফিরে এসে বাপী এই দৃশ্য দেখে ভেবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল প্রথম। তার পরেই মাথার মধ্যে যা খেলে গেল ও-ই জানে। বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে মিষ্টিকে এক ধাক্কা। সেই ধাক্কায় চার-পাঁচ হাত দূরে ছিটকে পড়ল ও। সঙ্গে সঙ্গে বাপী ওকে টেনে তুলল।—ওঠ! ছোট্! নইলে আস্ত গিলে ফেলবে।

পাগলের মতোই ছুটেছে দু'জনে। বাংলোয় এসেও মিষ্টির সমস্ত মুখ নীলবর্ণ। থরো-থরো কাঁপুনি। বাপীর সেই ধাক্কার ফলে হাত-পা কেটে ছড়ে রক্তাক্ত। কি ব্যাপার বুঝতে না পেরে বাইরের লোক পর্যন্ত ছুটে এসেছে। বড়সাহেব বাংলোতেই ছিলেন।

কি হয়েছে না হয়েছে তাঁর জেরায় পড়ে বাপীকে সবই বলতে হয়েছে। কোথায় কত দূরে ঘটেছে এ-ব্যাপার—তাও। আর মায়ের ধমকে ছুটির দিনে জঙ্গলে বেড়ানোটাও মিষ্টি ফাঁস করে দিয়েছে।

তারপর বাপীরও তার বুদ্ধি আর বীরত্বের পুরস্কার মিলেছে।

বড়সাহেবের থমথমে মুখ। তিনি কিছু বলেননি। মেমসাহেব সকলের চোখের সামনে বাপীর একটা কান ছিঁড়েই নিতে চেয়েছে। তারপর গালাগাল করতে করতে ঘাড় ধরে বাংলো থেকে নামিয়ে দিয়েছে।

সন্ধ্যার পর বাবার সপাসপ গোটাকতক চটির ঘা।

জীবনের সব সাধ-আহ্লাদই বুঝি শেষ বাপীর। নিঝুম রাত। পিসীর দু'হাত তফাতে সরে শুয়ে আছে। ঘুমোতেই চাইছে।...ভাবছে, রাতের ঘুম সকালের মধ্যে আর একেবারে না ভাঙলে কি হয়?

'পাথরে পাঁচ কিল'—রেগে গেলে পিসী বলত কথাটা। বলত, তোকে কিলোলে কি হবে, তার পাঁচগুণ ব্যথা নিজের হাতে ফিরে আসবে। ফাঁক পেলেই অপমানের ব্যথা ও রকম পাঁচগুণ ফিরিয়ে দেবার গোঁ এখন বাপীর। ওকে এরপর বাংলোর গেটের কাছে দেখলেই দীপুদা তেড়ে আসে। মেমসাহেব মহারাণীর সঙ্গে চোখাচোখি হলেই ভ্রূকুটি। যেন বাইরের এই রাস্তাটাও তার খাস দখলের। চাকরির লোভে আবু যখন তখন বাংলোয় যায়, মেমসাহেবকে ভেট দেয়, মিষ্টিকেও এটা সেটা দিয়ে বা জঙ্গলের গল্প বলে তোয়াজ করে। আগের মতো আবুও ওদের অত দোষ ধরে না। উল্টে উপদেশ দেয়, ভালো করে মন দিয়ে পড়াশুনা কর, মানুষ হ'—নইলে ওদের কেন—কারোরই কোনোদিন পাত্তা পাবি নে।

বাপীর সব থেকে বেশি রাগ মিষ্টির ওপর। ও না থাকলে তো সাপের পেটেই চলে

যেত একেবারে। যে যা-ই বলুক, ওর তো কেনা হয়ে থাকা উচিত বাপীর কাছে। তা না, হাব-ভাব এমন, যেন দোষটা বাপীরই।

এর পরেও ছুটির দিনের দুপুরে আর সুযোগ পেলে সকালেও বাংলোর দিকে হানা না দিয়ে পারে না। বকা-ঝকা মার-ধরের পরোয়া করে না। কিন্তু মিষ্টি সহজে কাছেই আসতে চায় না, দূর থেকে মাথা ঝাঁকিয়ে জা য় দেয় আসবে না। বাপীর মাথায় তখন সব থেকে বেশি আগুন জ্বলে। রাগের চোটে ভেংচি কাটে। ডবল রেগে গিয়ে মিষ্টিও জিভ ভেঙায়, তারপর মায়ের কাছে বা দাদার কাছে নালিশ করতে ছোটে। বাপী ওর রাস্তায় বেরুনোর অপেক্ষায় ওঁত পেতে থাকে। একলা পেলে মিষ্টিকে খেয়ে ফেলার কথা বলে, মিষ্টি খেয়ে জল খাবার কথা বলে, জিভ চকচক করে ওকে শোনায় মিষ্টি খেতে কত আরাম। তার ফলে বাবার কাছে বেদম প্রহার আবার একদিন।

দিন গেলে সব শাসনের কড়াকড়ি আপনা থেকে কমে আসে, সেই হিসেব বাপীরও আছে। ওই মহারাণী কদিন আর মেয়েকে চোখে চোখে আগলে রাখবে? জঙ্গলের স্বাদ একবার পেলে বাতিল করা আর সহজ নয়। বিকেল হলে মহারাণী মেয়ের রাস্তায় আসা ঠেকাতে পারে না। আর ফাঁক পেলে ওই মেয়ে এখনো জঙ্গলে ঢুকে পড়ে—কিন্তু দূরে যায় না, খুব কাছাকাছির মধ্যেই থাকে। বাপীরও সেই সুযোগের অপেক্ষা।

ওকে দেখলেই মিষ্টি চোখ পাকায়, মা তোমার সঙ্গে মিশতে বারণ করেছে, কথা বলতেও বারণ করে দিয়েছে। ফের আমার সঙ্গে দেখলে তোমাকে রক্ষে রাখবে না বলে দিলাম।

বাপীর মাথায় রক্ত ওঠে। আর মিষ্টির মাথাটা আচ্ছা করে কোনো গাছে ঠুকে দিয়ে পালাতে ইচ্ছে করে। অথচ মনের মতো পেয়ারা কুল কামরাঙা আচার-টাচার ঘুষ পেলে মিষ্টি নিজেই স্বীকার করে বাপীর কোনো দোষ নেই—ওর জন্যেই ওকে ময়াল সাপের পেটে ঢুকতে হয় নি। একদিন এ-ও কবুল করেছে যে বাপীর সঙ্গে জঙ্গলে বেড়াতে ওর খু-উ-ব ভালো লাগে, কিন্তু মায়ের ভয়ে পারে না।

ওই মায়ের অবাধ্য হবার মতো এতটুকু সাহস নেই বলেই বাপী আরো রেগে যায়। ওকে বেইমান বলে, ভীতু বলে। বলে, ননীর পুতুল—মায়ের আঁচলের তলায় থাক্‌গে। ধরা পড়ার ভয় না থাকলেও মিষ্টি বারান্দা ছেড়ে গেটের দিকে আসতে না চাইলে কিল চড় দেখায়, জিভ ভেঙায়। আদুরে মেয়েও বিষম রাগে ফোঁস করে উঠবেই। নিজেও যা-তা বলবে, পাল্টা কিল চড় দেখাবে, জিভ ভেঙাবে—আর তারপর মায়ের কাছে বা দাদার কাছে নালিশও করবে। এমনি নালিশের ফলে ওর মা মহারাণী আবার একদিন ওকে ডেকে কান মলে দিয়েছিল। দীপুদাও বোনের নালিশ শুনলেই গাঁট্টা মারতে ছুটে আসে।

এমনি করেই আবার একটা বছর শেষ। বাপী নতুন ক্লাসে উঠেছে। বরাতজোরে কিনা জানে না, মোটামুটি ভালই পাস করেছে। ফেল করলে ওর নিজের অন্তত অবাক হবার কিছু ছিল না। কারণ পরীক্ষার আগে পর্যন্তও মনের অর্ধেকটা ওই সাহেববাংলোর দিকে পড়ে থাকত। আর পরীক্ষার পরের ছুটির দিনগুলোতে তো মিষ্টিকে ধরে একেবারে ছিঁড়ে খেতে ইচ্ছে করত। ক্লাস পরীক্ষায় এবারও ফার্স্ট হয়েছে সেই দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না মেয়ের। বাড়ির চাকর বা বাগানের মালির সঙ্গে জঙ্গলে বেড়াবে, তবু ওর

সঙ্গে নয়। তিন-চারটে মেয়ে বন্ধু হয়েছে এখন। চা-বাগানের ছোট বা মাঝারি সাহেবদের মেয়ে, সঙ্গে লোক নিয়ে ওর চোখের ওপর দিয়ে হাসতে হাসতে তাদের বাড়ি চলে যায়। ডাকলে মুখের ওপর বলে দেয়, তুমি বজ্জাতি করো, তোমার সঙ্গে মিশব না। কেবল ভালো কিছু লোভের টোপ ফেলতে পারলে একটু আধটু আসে। আর এলেও বাপীরই বেফাঁস রাগের ফলে ঝগড়া বেধে যেতে দশ মিনিটও সময় লাগে না।

এটাই যে জীবনের সব থেকে দুর্বৎসর বাপী জানত না। বছরের মাঝামাঝি সময়ে মন-মেজাজ বরং একটু ভালো হয়েছিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বেরুতে দীপুদা কলকাতায় পড়তে চলে গেছে। বাপী অনেকখানি নিষ্কণ্টক। দাদা না থাকার ফলে ওই মেয়ে এখন অনেকটা একলা হয়ে যাবে। বাপীর আশা, ভুলিয়ে-ভালিয়ে আবার ওকে আগের মতো জঙ্গলে টানা যাবে।

...সকলে ধরে নিয়েছিল এ-বছর বনমায়ার চরিত্র ভালো হয়ে গেছে। দেখা গেল তা নয়, এবারে দিনমানে ছাড়া অবস্থাতেই পালিয়েছে। গাছ পাতা খাওয়ানোর জন্য ভীম বাহাদুর ওকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছিল। ছেড়ে দিয়ে ঘণ্টা দু' ঘণ্টার জন্য নিজেও কোথায় গেছল। ফিরে এসে দেখে বনমায়া উধাও। ডেরাতেও নেই। পরে বাপীকে আবু হেসে হেসে বলেছে, বনমায়া গেলেই দোষ, ওকে জঙ্গলে ছেড়ে ভীম বাহাদুর নিজে কোথা গেছল?

কোথা গেছল শুনে বাপীর রক্তেও দোলা লেগেছে। ভীম বাহাদুর চা-বাগানের আড়াই-পাত্তি তোলা এক কামিন মেয়ের প্রেমে পড়েছে। ওকে বিয়ে করবে বলে টাকা যোগাড়ের চেষ্টায় আছে। ফাঁক পেলে সেই মেয়ের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করতে যায়।

বরাত ভালো, কর্তাবাবুরা এবারে আর বনমায়ার পালানো নিয়ে ভীম বাহাদুরের ওপর মারমুখী হয়ে ওঠেনি। তারাও বুঝে নিয়েছে, বছরে দেড় বছরে বনমায়া একবার করে পালাবেই আর দিনকতক গেলে নিজে থেকে ফিরেও আসবে।

কিন্তু উধাও হবার সেই রাতেই বনমায়া তার প্রেমিক হাতিকে নিয়ে বেশ একটা রগড়ের কাণ্ড করে গেছে। আসলে ওরা বানারজুলি জঙ্গলের খুব দূরে কোথাও যায়নি তখন পর্যন্ত। বেশি রাতে দুটোতে মিলে জঙ্গলের সেই গোপন ভাঁটিখানায় এসেছে। সেখানে যে দুটো লোক ভাঁটি আগলায় প্রাণের ভয়ে তারা একটা গাছের মগডালে গিয়ে উঠেছে। বনমায়া আর তার সঙ্গী বুনো হাতি হাঁড়ি-ভরতি দারু চোঁ-চোঁ করে মেরে দিয়েছে। তারপর দুটোতে মিলে সে কি আহ্লাদ আর নাচানাচি। সেই আহ্লাদে আর নাচানাচিতে ভাঁটিখানা ভেঙে গুঁড়িয়েছে, সামনের অনেক ছোট গাছপালা মুড়িয়েছে। আবু আর বাপী ছুটে গিয়ে সেখানকার অবস্থাখানা দেখে এসেছে। বাপের আড়ালে হেসেছে শুধু আবু। নইলে ওর বাবা কালু আর অন্য বীটম্যানদের বনমায়ার ওপর সে কি রাগ!

ভালো মেয়ের মতো এবারে বনমায়া দু সপ্তাহের মধ্যেই ফিরে এসেছে। এবারে আর ভীম বাহাদুর রাগ করবে কোন্ মুখে? দৃশ্য দেখে বাপীর বেজায় হাসি পাচ্ছিল। বনমায়া তার খুদে চোখ দুটো বেঁকিয়ে ভীম বাহাদুরকে দেখছিল আর থেকে থেকে মাথা নাড়ছিল আর শুঁড় দোলাচ্ছিল। যেন বলছে, এমন কাজ আর কক্ষনো করব না। ভীম

বাহাদুরও যেন আড়ি করে অর্থাৎ মুখখানা হাঁড়ি করে গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে আছে।

এই সময় আবুর একটা কথায় সামনে যারা ছিল সকলেই হেসে উঠেছে। এমন কি ভীম বাহাদুরও। বনমায়ার বুকের কাছে পেল্লায় দুটো আদরের চড় বসিয়ে আবু বলল, তিন বছর ধরে পালিয়ে গিয়ে রস করে আসছিস—বাচ্চা-কাচ্চা হবার নাম নেই কেন? তোর মরদটাকে ধরে এনে ডাক্তার দেখা—

সকলের সঙ্গে বাপীও হেসেছে বটে, কিন্তু এ-সব কথা শুনলেও ভিতরে ভিতরে কি-রকম হতে থাকে। সকলের অলক্ষ্যে বনমায়ার সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। জন্তু জানোয়ারের প্রেম বা ভালবাসাবাসির কিছুই আর অস্পষ্ট নয় ওর কাছে। বয়েস তো চৌদ্দ গড়াতে চলল, তবু মানুষের ব্যাপারটাই যা একটু আবছা এখন পর্যন্ত। আবু অবশ্য বলে, সব এক ব্যাপার। মানুষ ওদের থেকে আরো পাজী জানোয়ার। ভালোবাসাবাসির ব্যাপারে বেশির ভাগ জন্তুর সময়ের বাছবিচার আছে, বছরের মধ্যে কোনো একটা সময় ধরে ওরা মেলে। মানুষ সম্বৎসর ভোগের দাস।

এই ভোগটা ভালো করে বোঝার জন্য একটা দুর্বোধ্য তাড়না। ফাঁক পেলে এক-এক সময় চা-বাগানের দিকে চলে যায়। সেখানকার পাতা-তোলা সোমত্ত বয়সের মেয়েগুলোকে চেয়ে চেয়ে দেখে বিশেষ করে। এদের মধ্যে কোনটা ভীম বাহাদুরের ভালবাসার মেয়ে জানতে ইচ্ছে করে। ওরা গায়ে জামা-টামা পরে না, খাটো কাপড় একদিকের কাঁধ-বুক পেঁচিয়ে হাঁটুর নিচে পর্যন্ত নেমে আসে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ওদের ঢলঢলে শরীরের বাঁধুনিতে আর উঁচু বুকে কি-রকম মিষ্টি-মিষ্টি ঢেউ খেলে। চোদ্দ বছরে বাপী এখন মাথায়ও ঢ্যাঙা হয়েছে বেশ। ওর সেই হাঁ করে দেখাটাও কম-বয়সী কতগুলো মেয়ে বোধ হয় টের পেয়ে গেছে। ওর দিকে চেয়ে খিলখিল করে হাসে এক সময়। কালো মুখে সাদা দাঁতের সারি ঝকঝক করে। একটা দুটো মেয়ে আবার দুষ্টুমি করে হাত তুলে কাছে ডাকেও। বাপী তক্ষুনি ছুটে পালায়। কিন্তু তারপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে মাথাটা ঝিমঝিম করে।

আজ আবুর ওই রসিকতার কথাগুলোই বাপীর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। আবু অন্য কাজে চলে না গেলে সঙ্গ নিত। বড়সাহেবের বাংলোর কাছে এসে পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে গেল।

বারান্দায় দুহাত শূন্যে ঝাঁকিয়ে মিষ্টি তার বাবার কাছে কিছু একটা আব্দার করছে। ওর পরনে একটা লাল ডুরেশাড়ি। গায়ে চকচকে নতুন জামা!

বাপীর চোখে পলক পড়ে না। এই বেশে মিষ্টিকে আর কখনো দেখেনি। জামা আর শাড়ির একটা লালচে আভা মিষ্টির চোখে মুখে ঠিকরোচ্ছে। মিষ্টিরও বয়েস দশের মাঝামাঝি এখন। আগের থেকে মাথায় বেড়েছে আর আরো হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে বাপী সেটা আগেই লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু এখন ওকে দেখেই মনে হল ও হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে মস্ত বড় হয়ে গেছে। রূপকথার সেই রাজকন্যাদের মতো হয়েছে।

বাবার পিছনে মিষ্টি ঘরে ঢুকে যাচ্ছিল, বাপী জোরে একটা হাততালি দেবার লোভ সামলাতে পারল না। মিষ্টি ঘাড় ফেরালো। অন্য দিন হলে ও হয়তো জিভ ভেঙচে ঘরে সেঁধিয়ে যেত। গত পরশুও তাই করেছে। বাপীকে পাল্টা ভেঙচি কাটার সুযোগ না

দিয়ে ঢুকে গেছল। কিন্তু আজ এই নতুন সাজটা দেখানোর তাগিদে পায়ে পায়ে বারান্দা থেকে নেমে গেটের দিকে এগুলো। বাপীর অমন ভেবাচেকা খাওয়া চাউনি দেখে ওর ঠোঁটে টিপ-টিপ হাসি।

সব রেষারেষি ভুলে বাপী বলেই ফেলল, কি সুন্দর দেখাচ্ছে রে তোকে মাইরি বলছি।

মিষ্টিরও একমুখ হাসি।—কলকাতায় দিদিমাকে চিঠি লিখেছিলাম, আমার জন্য সুন্দর দেখে একটা শাড়ি কিনে পাঠাতে—লোকের সঙ্গে কাল শাড়ি জামা দুইই পাঠিয়েছে। বাবাকে আজ আচ্ছা করে ধরেছি জিপে করে বিকেলে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে, আমি এই শাড়ি পরে যাব—বাবা রাজি হয়ে গেছে।

শুনে সত্যি হিংসে হচ্ছে বাপীর। চাইলেই শাড়ি পায়, বাবার সঙ্গে জিপে করে বেড়াতে পায়। মাথা খুঁড়লেও শাড়ি-পরা মিষ্টির পাশে বসে জিপে করে একটু বেড়ানোর উপায় নেই। সাহেব মেমসাহেব ছেড়ে মিষ্টিকেও এ কথা বললে ও বেয়াদপী ভেবে মুখ মচকাবে। কি, না ওর বাবা কেরানী, কেরানীর ছেলের এত সাহস বরদাস্ত হবার নয়। কেরানীর বোনের হাতের তৈরি আমসত্ত্ব-আচার বা দুধ-কলা-মুড়ি তো বেশ চেটেপুটে খেতে পারিস।

তবু, এই মিষ্টিকেই আজ দারুণ লাগছে বাপীর। তাই ঠেস-ঠিসারায় ওকে রাগাতে চাইল না। উল্টে খুব মোলায়েম করে বলল, আজ দুপুরে এই শাড়িটা পরে চুপিচুপি জঙ্গলে বেড়াতে আসবি? আয় না, একেবারে জঙ্গলের দেবীর মতো দেখতে লাগবে তোকে—

মিষ্টির মন ভিজল, কিন্তু ভরসা পেল না। ঠোঁট উল্টে জবাব দিল, হুঁ, বাড়িতেই বলে শাড়ি সামলাতে পারি না, এদিক ধরি তো ওদিক খোলে—শাড়ি পরে জঙ্গলে ঢুকে আছাড় খেয়ে মরি আর কি।

—না রে না, আমি তো থাকছি সঙ্গে, আছাড় খাবি কেন?

শোনামাত্র মিষ্টি চোখ পাকালো। ও, এই ফাঁকে আমার গায়ে হাত দেবার মতলব তোমার—কেমন? ফের তুমি আমাকে তুই-মুই করে কথা বলছ?

মুহূর্তের মধ্যে বাপীও আগের সেই বাপী। দু চোখে রাগ জমাট বাঁধছে। সেই সঙ্গলোভও চিকিয়ে উঠছে। অনেক দিনের মধ্যে গায়ে দূরে থাক, হাতে হাত ঠেকাবারও সুযোগ হয়নি। রাগের চোটে হাত দুটো ডবল নিশপিশ করছে, আর ওই ফোলা গাল দুটো ছিঁড়ে নিয়ে আসতে ইচ্ছে কবছে।

কিন্তু মিষ্টিও সেয়ানা কম নয় এখন। এই চোখ-মুখ দেখেই গেট ছেড়ে এক ঝটকায় তিন পা পিছিয়ে গেল। তারপর বাপীর মতো করেই পলকা রাগে চোখ পাকাতে চেষ্টা করল। এখানে ও-ছেলের কোনো জারিজুরি খাটবে না জানে বলেই ঠোঁটে মজার ছোঁয়া।

—ডাকব মাকে?

গেট ছেড়ে বাপী হনহন করে হাঁটা দিল। রাগের মাথায় বনমায়ার ফিরে আসার খবরটাই ওকে বলা হল না। কিন্তু রাগটা আজ আর বেশিক্ষণ ধরে রাখা গেল না।...আবু যদিও বলে ভালোবাসাবাসির ব্যাপারে মানুষে জানোয়ারে তফাৎ নেই, তবু ওর চোখে মেয়েরা এখনো আবছা রহস্যের মতো। আজ শাড়িপরা মিষ্টিও যেন ওমনি একটু রহস্যের

ওধারে চলে গেছে।

এর দিন-কতকের মধ্যে সেই রহস্যের পর্দা ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার। কি কারণে স্কুলের ছুটি চলছে তখন।

কলকাতা থেকে জাঠতুতো ভাই মণিদা এসেছে। সঙ্গে তার নতুন বউ গৌরী। গৌরী বউদি। মাত্র মাসখানেক আগে বিয়ে হয়েছে তাদের। কলকাতা থেকে নেমন্তন্নর চিঠি এসেছিল। বাবা লিখেছে যাওয়া সম্ভব নয়। সুযোগ সুবিধে হলে মণিদা যেন বউ নিয়ে বেড়াতে আসে।

নতুন বউ নিয়ে মণিদা গেছল দার্জিলিং বেড়াতে। ফেরার পথে দিন চার-পাঁচের জন্য এখানে আসা। আগে থেকে জানান দিয়েই এসেছে তারা। শুনে বাপী একমাত্র কারণে খুশী হতে পারে নি। দুখানা মাত্র ঘর। অতিথিরা এলে থাকার ব্যবস্থা কি হবে শুনেই বাপীর মাথা গরম হয়েছিল। বাবার ঘরটা বড় একটু। পিসীর সঙ্গে সেই কটা রাত বাপীকে বাবার ঘরে শুতে হবে। এমন বিড়ম্বনার মধ্যে বাপীকে স্মরণীয়কালের মধ্যে পড়তে হয় নি।

কিন্তু মণিদা আর তার নতুন বউ গৌরী বউদিকে দেখে বাপীর সেই চাপা কৌতূহল নতুন খোরাক পেল। গৌরী বউদির বছর কুড়ি হবে বয়েস আর মণিদার আটাশ। বয়সের তুলনায় মণিদাকে একটু ভারিক্কি গোছের দেখায়। ওদিকে নাম গৌরী হলেও গৌরী বউদি ফর্সা নয় আদৌ। কালোই বলা চলে। কিন্তু মুখখানা বেশ চকচকে, চোখ দুটো হাসি-হাসি।

উঠতে বসতে চলতে ফিরতে পুষ্ট যৌবনের কোনো মেয়েকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হল বাপীর। আরো কিছু উষ্ণ অথচ মজার খোরাক পেতে লাগল মণিদার উদ্দেশ্যে গৌরী বউদির হাসি-মাখা চোখের ইশারার ব্যাপার-ট্যাপারগুলো লক্ষ্য করে। মণিদা হয়তো পিসীর সঙ্গে কথা কইছে দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর, গৌরী বউদিও সেখানেই। হঠাৎ দেখা গেল, পিসীকে গোপন করে চোখের ইশারা করে আর সামান্য একটু ঘাড় বেঁকিয়ে কি বোঝাতে চেষ্টা করে গৌরী বউদি ঘরে চলে গেল। আর তার একটু বাদেই মণিদাও চলল সেদিকে। বাবার সামনেও দু'রাত এই কাণ্ড দেখেছে। খাওয়া-দাওয়ার পর বেশ গল্পসল্প অনেকক্ষণ ধরে। বাপীকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়, ও ঠিক লক্ষ্য করেছে। গৌরী বউদি উসখুস করছে একটু আর মণিদার দিকেই চেয়ে আছে। চোখাচোখি হতে গৌরী বউদির সেইরকম ইশারা আর তারপর নিঃশব্দে উঠে চলে যাওয়া। তার একটু বাদেই মণিদা গোটা দুই হাই তুলে বলল, যাই, শুয়ে পড়িগে।

বাপীর অজানা রহস্যের সব কিছু এখন ওই একটা ঘরের আড়ালে। ভিতরে এক অবুঝ অবাধ্য তাড়না। ওই কাঠের ঘরের কোন্ ফাঁকে বাইরে থেকে চোখ লাগালে ভিতরের সব দেখা যায় তাও ওর জানা। ওটা পিসীর আর ওর ঘর। আচার আমসত্ত্ব এমন কি পয়সা চুরি করার জন্যও নিজের উপস্থিতি গোপন করে পিসী ঘরে আছে কিনা বা কি করছে না করছে—কত সময়ে দেখতে হয়। জলে-টলে ভিজে এলে তো দেখতেই হয়—কারণ ওই এক ব্যাপারে পিসীর মাথার ঠিক থাকে না।

...বাবা শুলেই ঘুম। পিসীকে বাইরে যাবার কথা বলে পা টিপে বাইরের সেই ফাটলেও চোখ লাগিয়েছে। কিন্তু ভেতরে ততক্ষণে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। চোখ নিঃশব্দে দিনের বেলাতেও লাগিয়েছে। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া সারতেই বেলা হচ্ছে ইদানীং। মণিদাকে

ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোতে দেখে, আর গৌরী বউদিকে কলকাতা থেকে আনা গল্পের বই পড়তে দেখে।

মণিদাকে দেখে বাপীর মনে হয়েছে, মোটাসোটা ভাল মানুষ। খেতে আর ঘুমোতে ভালবাসে। যার মধ্যে রহস্যের ছিটে-ফোঁটাও নেই। যা-কিছু সব ওই গৌরী বউদিকে ঘিরে। চোখের ইশারায় বা ভ্রূকুটি বা ঠোঁটের হাসি দিয়ে মণিদাকে যেন যেমন খুশি চালানোর ক্ষমতা রাখে।

বাপীর একটা সুবিধে, নতুন যে দেখে সে-ই ওকে খুব নিরীহ গো-বেচারা গোছের ছেলে ভাবে। মণিদা আর বিশেষ করে গৌরী বউদি তো ভাবেই। নইলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়ানোর সময় বুকের কাপড় খসে গেলেও পিসীর সামনে যেমন তাড়াতাড়ি তুলে দেয়, ওর সামনে নয়। সকাল সাড়ে নটার মধ্যে সেদিন বাপীর সঙ্গে গৌরী বউদি আর মণিদার জঙ্গল দেখতে বেরুনোর কথা। জঙ্গলের ব্যাপারে ও যেমন ডানপিটে সেটা অবশ্য তারা জেনেছে। পাথর দিয়ে একদিন দুটো বুনো মুরগী মেরে এনে তাদের খাওয়ানো হয়েছে। তাদের অবাক হতে দেখে পিসী ওর জঙ্গলের দস্যিপনার গল্প করেছে। কিন্তু ওর পড়াশুনার ব্যাপারে বাবা আবার যা বলেছে তাতে সকলেই ওকে হাবাগোবাই ধরে নিয়েছে। তা না হলে জঙ্গলে বেরুনোর আগে গৌরী বউদি এমন কাণ্ড করে সেদিন।

...গৌরী বউদি বলেছিল, একেবারে স্নান সেরে বেরুবে। দেরি দেখে তার ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে বাপী ঢুকে থতমত খেল। কিন্তু ওকে দেখে মণিদা বা গৌরী বউদির ভ্রূক্ষেপ নেই। প্যান্ট আর শার্ট পরে তৈরি হয়ে মণিদা চৌকিতে বসে সিগারেট টানছে। গৌরী বউদির হাতে পাট-ভাঙা শাড়ি, তার উল্টো-সোজা দেখে নিচ্ছে। পরনে শুধু ব্লাউস আর সায়া। ওকে দেখে শাড়ির দিকে চোখ রেখেই বলল, দাঁড়া রে বাবা, যাচ্ছি তো জঙ্গলে, অত তাড়া কিসের—এ তো আর সিনেমার টিকিট ফুরিয়ে যাবার মতো কিছু নয়!

স্নানের আগে বাপী গৌরী বউদিকে একবার তাড়া দিয়েছিল বটে। এখন ঘর থেকে সরে না গেলেও কেউ কিছু ভাববে মনে হল না। গৌরী বউদি যত্ন করে শাড়ি পরছে। বাপী আড়চোখে দেখছে দাঁড়িয়ে, আর মণিদা আগে কখনো জঙ্গল-টঙ্গল দেখেছে কিনা সে-সম্বন্ধে দুই একটা অবান্তর কথা জিজ্ঞাসা করছে।

ধীরে সুস্থে শাড়ি পরা শেষ হল গৌরী বউদির। ঘাড় বেঁকিয়ে পিছন দিকটা দেখে নিয়ে ওকে বলল, পিছনে পায়ের দিকটা টেনে দে দেখি।

এ-রকম উদ্ভুট ফরমাসের জন্য বাপী আদৌ প্রস্তুত ছিল না। পিছনে গিয়ে উবু হয়ে বসে শাড়ির ওপর দিয়ে দু'হাতে একটা পা ধরল, কিন্তু কি ভাবে টানবে বুঝতে পারছে না!

গৌরী বউদি হেসে বাঁচে না। হাসছে মণিদাও। গৌরী বউদি হাসি সামলে বলল, তুই এ-রকম হাঁদা, অ্যাঁ? পা ধরে টানছিস! শাড়ির তলার দিকটা টান করে দিতে বললাম তোকে আর তুই পা চেপে ধরে শাড়িটা কুঁচকে দিলি?

এবারে বাপীর মাথায় ঢুকেছে। তাই করেছে। আর সন্তর্পণে বড় নিঃশ্বাস নিয়েছে। স্নো পাউডারের গন্ধ...। মিষ্টির গায়ের মতো নয়।

ওদের নিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে। গা ছমছম করছে বলে হোক বা পায়ে ঠোক্কর খাবার ভয়ে হোক, গৌরী বউদি বেশির ভাগ সময় বাপীর হাত ধরে থেকেছে। জঙ্গলের গল্প করতে করতে বাপীর মাথায় আরো বেশি হাবা-গোবা সাজার ঝোঁক চেপেছে। ভিতর থেকে কে যেন ইন্ধন যুগিয়েছে। খুব বোকার মতো যে-প্রসঙ্গে আসতে চায় তার সুযোগের অভাব জঙ্গলে নেই। দুটো বনমোরগ দেখে লোভীর মতো মণিদা বলে উঠল, মার না—পারবি?

বোকা-বোকা গম্ভীর মুখে বাপী মাথা নেড়েছে। ও দুটোর একটা পুরুষ, একটা মেয়ে —ভালবাসাবাসির সময় মারতে নেই।

এই প্রসঙ্গে আসতে চায় বলেই বলা। নইলে আগে-পিছে মুরগি দুটো এমনিই চরছিল। ওদের দেখে জঙ্গলে ঢুকে গেছে। কিন্তু এ-কথা শুনে মণিদা আর গৌরী বউদি দুজনেই হাঁ প্রথম। তারপর তাদের দুজনের চোখোচোখি। মণিদা মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। আর গৌরী বউদি হাসি সামলানোর চেষ্টায় হাত ছেড়ে শাড়ির আঁচল মুখে গুঁজেছে। তাও কি সহজে হাসি থামে।

তেরছা চোখে চেয়ে গৌরী বউদি জিজ্ঞাসা করল, তুই জানলি কি করে?

আরো সাদা মুখ করে বাপী জবাব দিল, জঙ্গলে বেশিদিন থাকলেই জানা যায়। আমাদের সাড়া পেয়ে ঝোপে ঢুকে গেল বলে, নইলে দেখতে একটা আর একটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

আবার ঝলকে ঝলকে হাসি গৌরী বউদির, আর মণিদার সঙ্গে চোখোচোখি। এত হাসির কি হল বাপী যেন বুঝতেই পারছে না।

গৌরী বউদি জিজ্ঞাসা করল, তুই নিজে থেকে জেনেছিস, না কেউ তোকে বলে দিয়েছে?

বাপী সতর্ক। আবার প্রসঙ্গ বিস্তারের ঝোঁকও অদম্য।—গোড়ায় গোড়ায় আবু বুঝিয়ে দিয়েছে। ও তো সব জন্তু-জানোয়ারের নাড়ি-নক্ষত্র জানে, আর চোখেও দেখেছে।...ওর সঙ্গে থেকে আমিও কম দেখি নি।

এমন সাদাসিধে ছেলের মুখ থেকে আরো শোনার লোভ গৌরী বউদির। তক্ষুনি জিজ্ঞাসা করল, তুই আর কি দেখেছিস?

বাপী তখন ভালবাসাবাসির সময় পুরুষ ময়ূর পাখনা মেলে মেয়ে ময়ূরকে কেমন নাচ দেখায় সেকথা বলেছে, সাপের সেই পাকে পাকে জড়ানো মারাত্মক ভালবাসাবাসির কথা বলেছে। একই প্রসঙ্গে তিন বছর ধরে বনমায়ার বজ্জাতির কথাও বলেছে।

আদিম ইশারা কাকে বলে বাপী সঠিক না জানলেও নতুন কিছু দেখছে। গৌরী বউদির কালো মুখে লালের ছোপ লেগেছে। থেকে থেকে মণিদার সঙ্গে চোখে চোখে কিছু কথা হচ্ছে তার। দুজনেরই, বিশেষ করে গৌরী বউদির মুখে চাপা হাসি ঠিকরে পড়ছে।

কি দিন কি দিন আজ! ফেরার পথে একদিকে চোখ পড়তে বাপীর পা দুটো আটকে গেল মাটির সঙ্গে। অদূরে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে আছে ভীম বাহাদুর। তার তিন হাত দূরে বসে একটা উঠতি বয়সের কালো-কালো পাহাড়ী মেয়ে। বাপী দেখামাত্র বুঝে নিয়েছে মেয়েটা কে।

এই দলটিকে দেখে ভীম বাহাদুর বেশ লজ্জা পেয়েছে। কারণ বাপী তো আর ওর অচেনা নয়। ওদের হাব-ভাব দেখে আর বাপীর মুখ দেখে গৌরী বউদি কৌতূহলে টইটম্বুর। খানিক এগিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুই চিনিস নাকি এদের?

—চিনব না কেন। লোকটা হল ভীম বাহাদুর, বনমায়ার মাহুত—মেয়েটা ভীম বাহাদুরের ভালবাসার মেয়ে। কাজে ফাঁকি দিয়ে দুটোতে জঙ্গলে এসে ঢুকেছে—

এর পর বাড়ি ফেরা পর্যন্ত মণিদার চাউনি দেখে বাপীর মনে হয়েছে তার বেজায় জল-তেষ্টা পেয়েছে। আর জলের অভাবে ঘন ঘন গৌরী বউদির দিকে তাকাচ্ছে। গৌরী বউদি কেবলই হাসি চাপছে, আর সঙ্গের হাবা ছেলেটাকেই গোপন করে ইশারায় মাথা নাড়ছে বা ভ্রূকুটি করে মণিদার কোনো ইচ্ছে নাকচ করে দিচ্ছে।

...নিঝুম দুপুরের বাতাসেও কি যে কানাকানি ছিল বাপী জানে না। বাবা বেরিয়ে গেছে। পিসীও শুয়ে। ও-ঘরের দরজা বন্ধ। কেউ যেন জোর করে বাপীর পা দুটোকে সেই ঘরের পিছনে টেনে নিয়ে গেল। তাবপর একটা চোখ সেই ফাটলে।

তার পরেই বাইরে একেবারে কাঠ ও। ভিতরে প্রবল ঝাঁকুনি। বুকের ধপধপানি ভিতরের কেউ শুনতে পাচ্ছে কিনা সেই ভয়। শরীরের রক্ত শিরশির করে গা বেয়ে নামছে তো নামছেই। আবার একই সঙ্গে মাথার দিকে আগুন ছুটেছে। নদীর ঢেউয়ের মতো পায়ের নিচের মাটি দুলছে।

কতক্ষণ কেটেছে জানে না। হঠাৎই আবার একটা ঝাঁকুনি খেয়ে চমক ভাঙল। আর সঙ্গে সঙ্গে বাপী ঘরের বাইরে ছুটল। ছুটে একেবারে জঙ্গলে। সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছে। বুকের ভিতরটা আরো বেশি টিপ টিপ করছে।

জঙ্গলে ঢুকেও হন হন করে হেঁটেই চলেছে বাপী। অথচ এর থেকে বাড়ির কুয়োটাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে ভালো হত। গা মাথা ডুবিয়ে বসে থাকতে পারলে ভালো হত।

চোখের সামনে আর রহস্যের পর্দা বলে কিছু নেই। এতদিন সেটা অল্প অল্প নড়ছিল, দুলছিল। তার ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু আভাস উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছিল তার সবটাই যে এমন আজব কল্পনা বাপী ভাবতেও পারে নি। কিন্তু তাই যেন ঢের ভালো ছিল আর মিষ্টি ছিল।

এক হ্যাঁচকা টানে পর্দাটা ছিঁড়ে দিয়েছে কেউ। কেউ কেন, বাপী নিজেই দিয়েছে। আর সেই মুহূর্তে ওর বুকের তলার রূপকথার জগৎটা ভেঙে গুঁড়িয়ে একাকার হয়ে গেছে।

গৌরী বউদিকে নিয়ে মণিদা চলে গেছে। বাপী হাঁপ ফেলে বেঁচেছে। গৌরী বউদির পাশে মণিদাকে একটু বেঁটে দেখায়। বাপী গৌরী বউদির মাথায় মাথায় হবে। যাবার আগে গৌরী বউদি ওকে দু গাল টিপে আদর করে গেছে। কলকাতায় গেলে তাদের ওখানেই উঠতে বলেছে। মাঝের দুটো দিন বাপী আগের মতো কাছে যেতে পারে নি, তাকাতে পারে নি। মনে হয়েছে, ভালো করে ওর মুখের দিকে তাকালেই চুরি ধরা পড়ে যাবে। একেবারে জল-ভাত ছেলে না ভাবলে গৌরী বউদির সন্দেহ হতে পারত।

যেমন আবুর হয়েছিল।

আগেও বাপীকে তারিফের সুরে অনেক সময় বলেছে, তুই একটা ভিজে বেড়াল, দেখলে মনে হবে কিছু জানিস না, কিছু বুঝিস না—ভাজা মাছখানাও উল্টে খেতে জানিস না। মজা লুটতে চাস তো এই ভাবেই থাকবি আর দরকার হলে ঝোপ বুঝে কোপ মারবি।

মণিদারা চলে যাবার পরেও বাপীর মনে স্বস্তি নেই একটুও। ও যেন কি একটা সংকটের মধ্যে পড়ে গেছে। তার থেকে যত বেরিয়ে আসতে চায়, ওটা ততো টানে। আর ভিতরে একটা অজানা যন্ত্রণা ছড়ায়। নিজেকে শাস্তি দেবার জন্যেই বিনা তাগিদে পড়ার বই নিয়ে বসে চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করে। কিন্তু যন্ত্রণাটা তখন মাথায় নড়াচড়া করতে থাকে। বই ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

ছোট লাঠিটা হাতে করে জঙ্গলে চলে আসে। দমাদম পিটে এক-একটা গাছের ছাল তুলে দেয়। নয় তো পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঘা করে দেয়। একটা ময়ূর দেখে পাথর নিয়ে ক্ষ্যাপার মতো তাড়া করেছিল। এরকম করলে যন্ত্রণার চাপ-ধরা বাতাসটা হাল্কা হতে থাকে।

কিন্তু সে আর কতক্ষণ। অবাধ্য পা দুটো তারপর ওই বড়সাহেবের বাংলোর দিকে এগোবেই। বরাত এমন, পর পর দুদিনই মিষ্টির বদলে ওর বাবা-মাকে বারান্দায় দেখেছে। মেয়ে ফার্স্ট হয় ক্লাসে, সকালের দিকে ঘরে বসে তার পড়াশুনা করাই স্বাভাবিক এটা মনে হয় না। অকারণ রাগে একটা খারাপ গালাগাল ভিতর থেকে ঠেলে বেরোয়। সঙ্গে সঙ্গে ওই সাহেব আর মেমসাহেবকে ঘিরেই একটা কুৎসিত ছবি মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে। নিজের ভিতর থেকে সেটা উচ্ছেদ করার তাগিদে বাপী হনহন করে সামনে এগিয়েছে।

সেই সামনে এগনোর শেষ চা-বাগানের আড়াই-পাতি তোলা মেয়েদের কাছাকাছি এসে। যে মেয়েগুলো ওকে দেখলেই মজা পায়। দাঁত বার করে হাসে। ওকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-তামাসা চলে মনে হয়। সেদিনও এক ফুর্তিবাজ মেয়ে হাত তুলে ওকে ডেকে বসল। বাপী সেদিন আর আগের মতো ছুটে পালালো না। কটা দিনের মধ্যে ভিতরটা কত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে নিজেরও জানা ছিল না। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল।

মেয়েটা কম করে আট-ন বছরের বড় ওর থেকে। ঠোঁট আর কালো কালো চোখ দুটোও হাসিতে ভেজা। বেতের ঝুড়ি বাঁধা কোমর সোজা করে দাঁড়াল। অবাক সুরে জিগ্যেস করল, তুমি ইখেনে কি দেখতি আস গো খোকাবাবু?

বাপী বলল, তোমাদের পাতা তোলা দেখতে ভালো লাগে।

শুনে মেয়েটা শক্ত মাটিতে আছাড় খেল যেন।—পাতি তুলা দেখতি ভালো লাগে-—মোদের দেখতি লয়। হায় হায় হায় হায়—

আশপাশের আট-দশটা মেয়ে খিল-খিল করে হেসে উঠল। বোকা মুখ করে বাপীও হেসেছে একটু একটু। তারপর চলে এসেছে। একটা ছোট ছেলেকে রসে পেয়েছে ভেবেই এমন হাসাহাসি ওদের। বয়েসটা যে বাপীর রাতারাতি কত বেড়ে গেছে ওরা জানবে কি করে। এত বেড়েছে যে নিজের ভিতরে আর কুলিয়ে উঠছে না। মনে হয় এজন্যেই এমন যন্ত্রণা।

ঘরের সামনের জমিতে বসে হাত-দা দিয়ে একটা বাখারি চাঁচছিল আবু রব্বানী। বাপী কাছে আসতে মুখ তুলে একবার দেখে নিয়ে আবার নিজের কাজে মন দিল।

বাপী সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিল মেজাজ-পত্র ভালো নয়। ওর পাশে আরো কটা চাঁচা বাখারির টুকরো পড়ে আছে।

হাত দুই ফারাকে বাপীও মাটির ওপরেই বসল। বলল, দুপুরে অনেকক্ষণ ঘুরে তোমাকে জঙ্গলে না পেয়ে এখানে এলাম—

বাখারি চাঁচার ফাঁকে আবু একবার টেরিয়ে দেখে নিল ওকে। তারপর ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করল, ছুটির মধ্যে এ কদিন সকাল দুপুর কোথায় ডিউটি দিলি—বড়সাহেবের বাংলোয়?

বাপী ঢোক গিলল।—না, কলকাতা থেকে দাদা-বউদি এসেছিল।

এবার আবু অবাক একটু।—তোর আবার দাদা-বউদি কে?

জ্যাঠতুতো দাদা।...বিয়ের পর নতুন বউ নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল। এখানেও এসে ছ-সাত দিন ছিল—

বাখারি ছেড়ে আবুর ছোট ছোট চোখ দুটো এবার সোজা ওর মুখে এসে আটকালো। এভাবে কি দেখার আছে ভেবে না পেয়ে বাপীর অস্বস্তি।

—দাদার বয়স কত?

—সাতাশ-আটাশ।

—আর বউদির?

—বছর কুড়ি। আবুর চাউনি আর রকম-সকম দেখে বাপী ঘাবড়েই যাচ্ছে।

—দেখতে কেমন?

—কালো।...তবে ভালোই।

আবু এবার কানে গোঁজা একটা বিড়ি টেনে নিয়ে দাঁতে লাগালো। কোমরের লুংগিতে গোঁজা দেশলাই বার করে ধরালো সেটা। বন-বেড়াল মারার পর চাকরিটা হয়েই গেছে ধরে নিয়ে বিড়ি খেতে শুরু করেছিল। ওকে বলেছিল, কোনো একটা নেশা না থাকলে পুরুষমানুষকে মানায় না। কিন্তু বাপের হাল দেখে হাঁড়িয়ার ওপর হাড়ে চটা। তাই বিড়ি ধরেছে।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে এবার হাল্কা চালে বলল, তাই বল, নতুন বউদির সেবা-যত্ন করে বেশ রসে-বসে ছিলি কটা দিন—নইলে ছুটির দিনগুলোতেও তোর মতো ছেলে সকাল দুপুর ঘরে কাটায়।

বাপীর ফাঁপরে পড়ার দাখিল। আবু নিজেই বলে জঙ্গলের সব জানোয়ারের মন-মেজাজ বোঝে। এখন মনে হল, ওর দিকেও আর একটু ভালো করে তাকালে ভিতরে যা আছে সব গলগল করে বার করে নেবে।

হেসেই পাশ কাটাতে চেষ্টা করল।—বাবা আপিস নিয়ে এত ব্যস্ত এ কদিন, আমাকে বাজার পর্যন্ত করতে হয়েছে—বুঝলে?

ডাহা মিথ্যে কিছু বলে নি। সত্যি কদিন ধরে বাবার কাজের ব্যস্ততা বেড়ে গেছে। রাতে ছাড়া কলকাতার অতিথিদের সঙ্গে দুদণ্ড বসে গল্প করারও সময় পায় নি। কৈফিয়ত দিয়েই জিজ্ঞাসা করল, তুমি আজ জঙ্গলে যাও নি যে?

বিড়িটা দাঁতে চিবিয়ে আবু অস্ফুট রাগত জবাব দিল, এ শালা জঙ্গলের নিকুচি করি আমি।

জঙ্গল-অন্ত-প্রাণ আবুর মুখে এ কি কথা।—কেন, চাকরি হবে না তোমার?

—হবে। তোর শ্বশুরের নাতি-নাতনী হবার পরে হবে।

শ্বশুর কাকে বলছে বাপীর সেটা বুঝতে অসুবিধে হল না। আগেও ঠাট্টা করে বড়সাহেবকে ওর শ্বশুর বলেছে। কিন্তু নাতি-নাতনী হবার কথাটা শোনামাত্র একটা দৃশ্য ভিতর থেকে ঠেলে ওঠার উপক্রম, সঙ্গে সেই যন্ত্রণাটাও। আবু নিজের খেয়ালে আছে তাই বাঁচোয়া। বলল, তোর পিসীর কাছ থেকে কিছু ধার যোগাড় করে দিতে পারিস—একটা খাকী ফুল-প্যান্ট আর মোটামুটি একটা ভালো জামা দরকার। শিলিগুড়ি চলে যেতে পারলে একটা কাজ হয়ে যেত—যুদ্ধের চাকরিতে সেখানে অনেক লোক নিচ্ছে শুনলাম।

বাপী হতভম্ব।—যুদ্ধের চাকরি!

আবুর গলায় বিরক্তি।—কি লেখাপড়া করিস, পৃথিবীর কোথাও যুদ্ধ হচ্ছে কিনা জানিস না?

—সে তো ইংরেজদের সঙ্গে জার্মানির—এখানে কি?

—এখানেও হতে পারে, নইলে ঝুড়ি ঝুড়ি লোক নিচ্ছে কেন? আবার পাঠিয়েও দিতে পারে, এই বানারজুলির রাস্তা দিয়েও ট্রাক বোঝাই মিলিটারি যাচ্ছে আসছে, দেখিস না?

বাপী ভয়ানক দমে গেল। বানারজুলি ছেড়ে, এই জঙ্গল ছেড়ে আর ওকে ছেড়ে আবু কোথাও চলে যেতে পারে ভাবলেও বুকের ভেতর টনটন করে। তার ওপর বলে কিনা যুদ্ধের চাকরি নেবে, যুদ্ধে যাবে!

—কি রে, শুনেই ঘাবড়ে গেলি যে। ওর মুষড়ে পড়া মুখ দেখে আবুর একটু ভালো লেগেছে।—আরে এই শর্মা না পারে কি, কোনো শালার একটা চান্স দেবার নাম নেই—এখানে বসে বসে ভ্যারেণ্ডা ভাজব?

গলায় একটু জোর এনে বাপী বলল, এখানেই ঠিক তোমার কাজ হয়ে যাবে, দেখো।

—আর হয়েছে। আমাদের বড়সাহেবের ছোট বাবা এসে সক্কলের পেছনে হুড়ো দিয়ে গেছে, এখন চাচা যে যার আপনা প্রাণ বাঁচা—কে কাকে দেখে? চোখ-কান বুজে নতুন বউদির সেবা-যত্নই করে গেলি, এদিকের কোনো খবরই রাখিস না বুঝি?

মাথার যে অবস্থা চলেছে সত্যি কোনো খবরই রাখে না বাপী। বাবাকে একটু বেশি ব্যস্ত দেখেছে কদিন এই যা। আর মণিদারা চলে যাবার পর এ দুদিন বাবার সঙ্গে দেখাই হয় নি বলতে গেলে। আগেই বা কতটুকু হত।

আবুর মুখে মোটামুটি খবর শুনে সেও তাজ্জব। বড়সাহেবের ছোট বাবা বলতে উত্তরবঙ্গের সহকারী ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসার—দু'কথায় অ্যাসিসট্যান্ট ডি এফ ও। তার ওপরে ডি এফ ও—সে লালমুখো খাঁটি সাহেব। আর ওই এ-ডি-এফ-ও এদেশের মানুষ হলেও বাঙালী নয়। কারো লাগানো-ভাঙানোর জন্যে হোক বা বানারজুলি জঙ্গলের রিপোর্ট দেখে হোক, জানান না দিয়ে সে হুট করে এসে হাজির হয়েছিল। চার-পাঁচ দিন থেকে সব দেখে শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ফিরে গেছে।

না বুঝেই বাপী জিগ্যেস করল, অত রেগে গেল কেন?

—রেগে যাবে না, যার চোখ আছে সে-ই বুঝবে এ জঙ্গলের বারোটা বাজতে আর বেশি বাকি নেই। আধ্যেক নালা শুকনো, জল চলে না, কত চারা-বেড শুকিয়ে খরখরে হয়ে গেল, তাও ছাগল-গরুতে মুড়িয়ে যাচ্ছে, দামী দামী শিশু গাছগুলোর চার ভাগের এক ভাগ লোপাট, শালজঙ্গল তো আরো বেশি ফাঁকা হচ্ছে—ওদিকে জঙ্গল কৃপ-এর ইজারাদাররা সেই একই টাকা দিচ্ছে। সাহেবদের পিয়ারের বা খদ্দের-শিকারীরা এসে একধার থেকে বাঘ ভালুক শূয়োর হরিণ মেরে মেরে জঙ্গল কানা করে দিচ্ছে—জঙ্গল বাঁচবে কি মন্ত্রের জোরে? ছোট থেকে বড় সব শালা চোর—বুঝলি?

সত্যিকারের রাগে বেগনে মুখ আবুর। বাপী কিছু জানত, কিন্তু এতটা জানত না। শেষের কথায় আরো মুখ শুকালো। ভয়ে ভয়ে বলল, আমার বাবাও?

—ধেৎ। এবারে আবু ঠাণ্ডা একটু।—তোর বাবা হল গিয়ে ধার্মিক চুনোপুঁটি মানুষ, তেনার কথা কে বলছে। জঙ্গলটা সায়েব-সুবোদের লুটের মাল, তাদের পেট মোটা হচ্ছে। নড়ুক নড়ুক—ধম্মের কল বাতাসে ভালো করে নড়ুক।

ঝটকা মেরে উঠে ঘরে চলে গেল। হাত-দা'টা ওর হাতেই। বাপীর মনে হল, হাতের কাছে তেমন কাউকে পেলে একটা কোপ-টোপ বসিয়ে দিতে পারে।

মিনিট সাত-আটের মধ্যে আবার বেরিয়ে এলো। পরনে হাতে-কাচা পরিষ্কার পাজামা গায়ে ফুলকাটা পাঞ্জাবি। এ-ই ওর বাবু-পোশাক। চাঁছা বাখারিগুলো জড়ো করে হাতে নিল।—চল্।

আবু চল বললেই চলে অভ্যস্ত বাপী। ওর হাতের বাখারিগুলো বেশ পুরুষ্ট। ভাবল তেমন ভালো কোনো চারাগাছের জন্য হয়তো ওগুলোর দরকার। কিন্তু আবু জঙ্গলের পায়ে-হাঁটা পিছনের রাস্তা ধরে চলল। ও-দিকে শুধু ঝোপঝাড় আর নীচু-জাতের খেটে-খাওয়া মানুষদের একটা দুটো করে মাটির ঘর ছাড়া আর কিছু আছে বলে জানে না। এদিকে যারা থাকে তারা বেজায় গরিব।

আরো একটু ভিতরের দিকে প্রায় দেড় মাইল হাঁটার পর আবু ওকে নিয়ে এক জায়গায় এসে থামল। একই মাটির ছাদের নিচে পাশাপাশি দুটো ঘর। একটা সামান্য বড় আর একটা ছোট। ছোট ঘরটার সামনেটা হাঁ করা, অর্থাৎ দরজা নেই। বড় ঘরের সামনে হোগলার ওপর বাখারি লাগিয়ে দরজা বসানো। ঘর দুটোর চারদিকে একটু জায়গা নিয়ে গাছের ডালের বেড়া দেওয়া হয়েছে। ডালগুলো বাঁশের খুঁটির সঙ্গে মোটা তার দিয়ে কষে বাঁধা। সামনেও দুটো বাঁশের খুঁটির সঙ্গে আটকানো গাছের ডালের গেট।

কাছাকাছির মধ্যে আর কোনো মাটির ঘরও নেই।

আবু গলা চড়িয়ে হাঁক দিলে, কই গো, বাদশা-বেগমরা এখনো সব ঘুমিয়ে নাকি?

বাপীর মুখে কথা নেই, ভিতরে বেশ অবাক। আবুর সঙ্গে এতকাল ঘুরছে, কিন্তু এখানে এই প্রথম।

প্রায় একই সঙ্গে পাশাপাশি ঘর দুটো থেকে দুটি মেয়ে বেরিয়ে এলো। আর দরজাঅলা ঘরটার ভিতর থেকে পুরুষের গলা ভেসে এলো, আবু ভাই এলে? দুলারি, আবু ভাইকে ভিতরে আসতে বল্ না—

দুজনেরই পরনে আধ-ময়লা জোড়াতাপ্পির শাড়ি। পুরুষের গলা থেকে বোঝা গেল হোগলার দরজার সামনে যে, সে-ই দুলারি। বছর উনিশ-কুড়ি, অর্থাৎ আবুর বয়সী হবে।

যেমন ঢ্যাঙ্গা, তেমনি আঁটোসাঁটো শরীর। গায়ের রং কালো ঘেঁষা তামাটে। মাথার এলোমেলো লালচে চুলে কখনো বোধ হয় তেলের ছোঁয়া পড়ে নি। সুন্দরও নয়, কুৎসিতও নয়। রুক্ষ মুখ, ধার-ধার চাউনি।

বাপীকে দেখে নিল একবার। তারপর আবুর দিকে চোখ। গলার স্বরও পুরুষালি ধাঁচের, ঘরের লোকের উদ্দেশ্যে জবাব দিল, বলতে হবে না, শুনতে পাচ্ছে।

দরজাশূন্য পাশের ছোট ঘরের সামনের মেয়েটা হয়তো দুলারির থেকে বছর দুই ছোট হবে। অত লম্বাও নয়। বেশ ফর্সা। ঢলঢলে মুখ। নাক চাপা একটু। তেলের অভাবে এরও মাথার চুল রুক্ষ, তবু অন্যজনের মতো নয়। চাউনি দেখে মনে হবে এই মেয়েটার একটু রস-বোধ আছে।

গেট সরিয়ে আবু ভিতরে ঢুকল। এতক্ষণের বিরক্তি-ভরা মুখটা একটু হাসি হাসি দেখাচ্ছে এখন। ঘাড় ফিরিয়ে বাপীকে বলল, আয়—।

বড় মেয়েটার সামনে এসে হাতের বাখারিগুলো বাড়িয়ে দিল, ধরো, কাল এসে ও-ঘরের দরজা বানিয়ে দেব।

—তোমার দরজার জন্যে আমরা মরে যাচ্ছিলাম? ওই রেশমাকে দাও, ঘরে কেউ ঢুকতে চাইলে বাখারি-পেটা করবে।

রেশমা কোনো মেয়ের নাম হয় বাপী জানত না। কিন্তু বেশ মিষ্টি লাগল। মেয়েটার চোখে ভ্রূকুটি, ঠোঁটে হাসি।

হাতের বাখারি আবু মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল, ওঃ, সব দায় যেন আমার—ওসব দরজা-টরজা নিজেরাই বানিয়ে নিও। যতো ভালো করতে যাই ততো সব পেয়ে বসে—

দুলারিরও ঠাণ্ডা তেরছা জবাব।—অত ভালো করার জন্য কে সাধছে তোমাকে?

—ফের তুই আবু ভাইয়ের সঙ্গে ক্যাটক্যাট করে কথা বলিস দুলারি? ভিতর থেকে পুরুষের কর্কশ গলা।

যে-মুখ করে দুলারি ঘরের দিকে চোখ ফেরালো এবার, বাপীর মনে হল ভিতরে যে আছে তাকে সে একটুও কেয়ার করে না। আবু এগিয়ে যেতে দরজা ছেড়ে একটু সরে দাঁড়াল। আবু ভিতরে চলে গেল।

বাপী হাঁ করে দাঁড়িয়ে। এরকম বাতাস থেকে ঝগড়া টানার কারণ কিছু বুঝছে না। এবারে দুটো মেয়েরই ওর দিকে চোখ। তারপর দুলারির আবার তেমনি ঠাণ্ডা চাঁছাছোলা কথা।—কি বুদ্ধি, এখেনে বাবু-ঘরের ছেলে এনে হাজির!

ভিতর থেকে আবু ডাকল, বাপী, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন, ভিতরে আয়।

অগত্যা বাপীও পায়ে পায়ে ভিতরে এসে ঢুকল। পিছন থেকে এগিয়ে এসে দুলারি গম্ভীর মুখে একটা তেলচিটে ছেঁড়া-খোঁড়া চাটাই মাটিতে পেতে দিল।

চাটাইয়ের ওপর আবু গ্যাঁট হয়ে বসল। হাত ধরে ওকেও বসালো। দড়ির খাটিয়ায় বসা কালো কালো দাড়ি-বোঝাই লোকটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বাপী বিমূঢ় হঠাৎ। এই লোকটাকে তো ও খুব চেনে। কাঁধের পেল্লায় ঝোলায় ছোট-বড় তিন-চারটে ঝাঁপড়ি নিয়ে সাপুড়ের পেটমোটা বাঁশি বাজিয়ে বানারজুলির রাস্তায় আর বাড়ি বাড়ি ঘুরে কত রকম সাপের খেলা দেখাতো। বছরখানেক হল একে আর দেখছে না। তার এ কি হাল।

দাড়ির জন্য গাল দেখা যাচ্ছে না, সমস্ত কপাল নাক আর চোখের নিচটা বসন্তের শুকনো গর্তে ছেয়ে আছে। চাউনিও কি-রকম ঘোলাটে।

আবু জিজ্ঞাসা করল, ছট্টু দাদাকে দেখেছিস কখনো?

বাপীর নাম জানা ছিল না। বলল, সাপের খেলা দেখাতো...

লোকটার বয়েস চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে। দাড়ির জন্য দুলারির ডবল বয়েস মনে হল। ফোঁস করে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, নিজে এখন খোদার খেলা দেখছি।

আবু বলল, গেলবারের বসন্তে ছোট্টু দাদার চোখ দুটোও গেছে। এখন আবার বুকের ব্যামোয় ধরেছে। এই হল ছোট্টু দাদার বিবি দুলারি আর ওই রেশমা—ছোট্টু দাদার বোন।

দুলারি খাটিয়ার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, আর রেশমা দরজার কাছে। ওদের দিকে একবার করে তাকাতে গিয়ে ঘরের এককোণে থাকে থাকে সাজানো কটা সাপের ঝুড়িও চোখে পড়ল। ওগুলোতে এখনো সাপ আছে মনে হল।

বাপীর পরিচয় শুনেই ছোট্টু দাদা বলল, বাপকে-ধরে আবুর চাকরিটা জলদি পাইয়ে দাও খোকাভাই—নইলে ও যুদ্ধে চলে যাবে বলছে।

এরপর আবুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ সে। আবুর মতো ছেলে আর হয় না। আল্লার শেষ মার থেকে ও-ই তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। ভাঙা ঘর মেরামত করে দিয়েছে, জঙ্গলে মুরগী খরগোস যা পায় মেরে এনে ওদের দিয়ে যায়, নইলে কাঠ বেচে দুলারি আর কটা টাকা পায়, গোটা মাসের আটা-চালও হয় না তা দিয়ে। ঘরের পিছনে খানিকটা জমি সাফ করে এই আবুই চারদিকে গাছের ডালের বেড়া দিয়েছে। পিছনের জমিতে এখন লাউ কুমড়ো আর শাকটাক বেশ হচ্ছে। সোৎসাহে ছোট্টু মিয়া বলল, তোমার লঙ্কা গাছে এখন খুব লঙ্কা ধরেছে আবু ভাই।

আবু নির্লিপ্ত মুখে নিজের প্রশংসা শুনছিল। ওদিকে দুলারির মুখে কৃতজ্ঞতার ছিটেফোঁটা নেই। শুধু রেশমার হাসিমাখা দুচোখ আবুর মুখের ওপর। দেখামাত্র বাপীর স্নায়ুতে সাড়া জাগল একপ্রস্থ। আবু যে খুব ভালো তাতে ওরও কোনো সন্দেহ নেই। তবু আবুর এত দয়া এত উদারতা সব ওই রেশমার জন্য। এ একেবারে অকাট্য সত্য। এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

আবু উঠে পড়ল। ওকেও ডাকল, চল, কেমন লঙ্কা হল দেখে আসি।

এদিক থেকে দুলারি হুকুম করল, রেশমা যা—

আবু অমনি ঝাঁঝিয়ে উঠল, রেশমা যাবে কেন, আমি চিনি না?

পাল্টা ঝাঁঝে দুলারি বলল, গেলে তোমার গায়ে হলকা লাগবে?

সঙ্গে সঙ্গে ছোট্টু মিয়া খেঁকিয়ে উঠল, আবু ভাইয়ের সব কথায় তুই জবাব দিস কেন?

পিছনের ছোট সবজিবাগান দেখতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। রেশমা ওদের দশ হাতের মধ্যেই ছিল। আবু ওর দিকে ফিরেও তাকায় নি। বাপীর তবু মজা লাগছিল। আবুর সঙ্গে এতদিন এত মিশেছে, অথচ এত বড় ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরে জানতে পারে নি। ওর পেটে পেটে এত!

কিন্তু ফেরার পথে ওই রেশমার কথা শুনে বাপী অবাক আবার। রেশমার বিয়ে হয়ে গেছে। ঘরে মরদও আছে। লোকটা আবার মুসলমান নয়, খ্রীষ্টান। জঙ্গলে কুলির

কাজ করে কাঁদনা—রেশমা তার বউ। দিন-রাত মদ খায় লোকটা, ঘরে এক পয়সাও দেয় না। নেশায় বাগড়া দিতে গেলে বউটাকে ধরে দেদার ঠেঙায়। মেরে শুইয়ে ফেলে একেবারে। যেদিন খুব বেশি মারধর হয়, রেশমা তার ভাজের কাছে পালিয়ে আসে। দুদিন চারদিন বাদে আবার যায়, আবার মার খায়, আবার আসে। ছ' মাস ধরে এরকমই চলছে।

শুনে বাপীর মনটাই খারাপ হয়ে গেল। তাহলে আবুর কি-যে আশা ভেবে পেল না।

দু' সপ্তাহের মধ্যে বানারজুলির জঙ্গলের শান্তি তছনছ হয়ে গেল। নাড়াচাড়া কিছু পড়বে সেটা সহকারী ডি. এফ. ও. চলে যাবার পরে সকলেরই মনে হয়েছিল। কিন্তু সেই নাড়াচাড়ার ফল যা দাঁড়াল সেটাই নীল আকাশ থেকে আচমকা বাজ পড়ার মতো।

আবু আর বাপীর অন্তত সেই রকমই মনে হল।

মাঝে এখানকার রেঞ্জ অফিসার সন্দীপ নন্দী তিন-চার দিনের জন্য হেড-কোয়ার্টাস চলে গেছলেন। এর দিনকতক বাদে স্বয়ং ডি. এফ. ও.—লালমুখো খাঁটি সাহেব এসে হাজির। সকলকে অবাক করে এখানকার বড়সাহেব অর্থাৎ নন্দী সাহেবের বাংলোয় তিন দিন তিন রাতের অতিথি হলেন তিনি। আগের সহকারী ডি. এফ. ওর জন্য চা-বাগানের বাংলো ঠিক করা হয়েছিল। এবারের পরিদর্শনের ফল কি দাঁড়াবে তখনো কেউ জানে না। আবু চুপি চুপি বাপীকে বলেছিল, তোর শ্বশুরের বাংলোয় শহর থেকে বাবুর্চি আর খানসামা এসেছে, আধপেটি বিলিতি বোতলও এসেছে—আর কত রকমের মাংস আছে ঠিক নেই।

বিলিতি সাহেবকে নিয়ে ঘটা করে দুদিন জঙ্গল দেখানো হল। ফাইলপত্রও পরীক্ষা করা হল। জঙ্গলের গলদের প্রধান আসামী আবুর বাবা কালু রব্বানী। লালসাহেব জানলেন, জঙ্গলের ভিতরে ভাঁটিখানা গজিয়ে ওঠার মূলে সে। আসামীর তালিকায় আরো তিনজন বীটম্যান, একজন ফরেস্ট গার্ড, একজন সেচের বাবু। বাপীর বাবা হরিবাবুর ফাইল আর গাছপালার হিসেবনিকেশও বিলিতি সাহেবের কাছে সন্তোষজনক নয়। এদের সকলের যথাযোগ্য দণ্ডের নির্দেশ দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

এরপর এখানকার বড়সাহেবের সেই দণ্ড বিধানের পালা। হেড বীটম্যান কালু রব্বানী, তিনজন বীটম্যান, একজন ফরেস্ট গার্ড আর সেচবাবুর চাকরি গেল। তদন্তসাপেক্ষে হরিবাবুকে সাসপেণ্ড করা হল।

কপাল শুধু আবু রব্বানীর। বড়সাহেব নিজে ডেকে তাকে বীটম্যানের চাকরি দিলেন। চাকরি পেয়ে আবু সাহেবকে সেলাম ঠুকল আর ঘরে এসে নিজের কপাল চাপড়ালো।

বাবার চোখে জল দেখেছে বাপী। পিসীর পায়ে হাত রেখে বাবাকে বলতে শুনেছে, আমি কোনদিন এক পয়সাও কারচুপি করিনি, তুমি তো জানো।

পিসীর চোখেও জল। বাবাকে হাত ধরে টেনে তুলেছে আর বলেছে, এত ভেঙে পড়িসনে, ঠাকুর এত বড় অবিচার কক্ষনো করতে পারেন না।

ঠাকুরের ওপর বাবার ভরসা এখন কতটুকু বাপী জানে না। দিনের মধ্যে পাঁচবার

করে তাকে ঘর থেকে ছুটে বেরুতে দেখছে। কোথায় যায় বাপী তাও আঁচ করতে পারে। বিচার যে করবে তার কাছে। ওই বড়সাহেবের বাংলোয় মেজসাহেবের বাংলোয়। চোখে না দেখলেও বাপী জানে, আবুর মতে আসল চোর যারা, বাবা তাদেরই হাতেপায়ে ধরছে, কান্নাকাটি করছে।

আরো তিন সপ্তাহ বাদে বাবার ছট্‌ফটানি কমল। মুখ থমথমে এখন। তার বিচার হয়ে গেছে। বড়সাহেব দয়া করেছে। চাকরি থাকল। তিন বছরের ইনক্রিমেন্ট বন্ধ। সঙ্গে ওয়ার্নিং।

এবারেও আবু ওকে চুপিচুপি বলেছে, পাছে মরীয়া হয়ে বাবা হেড কোয়ার্টারস-এ ছোটে আর হাটে হাঁড়ি ভেঙে সব ফাঁস করে দেয় সেই ভয়ে বড়সাহেব আর মেজসাহেব এই দয়া দেখালো। বলেছে, তোর বাবা তো আর আমার বাপের মতো মুখ্‌খু নয়!

ভেতর-বার সব জ্বলছে বাপীর। সেই কবে থেকে জ্বলছে। দূর থেকে বাংলোটাকে দেখে। চোখের আগুনে ওটা ভস্ম হয় না। বাড়ির মানুষগুলোও ভস্ম হয় না।

...তারপর সেই দিন। যে দিনটা বাপী এ জীবনে আর কোনদিন ভুলবে না। কোনদিন না।

মিষ্টি জঙ্গলে। মিষ্টি একা। ওদের বাংলোর খুব কাছেই। একটা রঙিন প্রজাপতির পিছনে তাড়া করেছে।

সেটা শনিবার। প্রচণ্ড কিছু ঘটবে বলেই বাপীর এই মতি কিনা কে জানে। আকাশ সেদিনও মেঘলা ছিল। বানারজুলি জঙ্গল ওকে বড্ডোই টানছিল। শনিবার দেড়টায় ছুটি। ক্লাসের মাস্টারমশাইকে পিসীর শরীর খারাপের কথা বলে বারোটায় বেরিয়ে এসেছে। তারপর বাড়ি। তারপর জঙ্গল। নিজের মনে বেশ খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর দূর থেকে দুটো চোখে একবার মিষ্টিকে ভস্ম করার আশা নিয়েই এদিকে এসেছিল। বেলা এখন আড়াইটের কম নয়।

দূর থেকে মিষ্টিকে দেখেই বাপীর পা দুটো থেমে গেল একবার। ওকে দেখে নি। দেখলেই ছুটে পালাবে। সেই পথ আগলানোর জন্যেই আধ মিনিটের মধ্যে পিছন দিকে চলে এলো। মিষ্টি এখনো প্রজাপতির পিছনে। মাঝে কিছুদিন কাছাকাছি না হওয়ার ফলে বেশ ডাগরটি লাগছে। বাপীর দু চোখ লোভে চিকচিক করছে। আগের মতো নয়, এই লোভ বাপীর কাছেও নতুন। চোখের সামনে জোড়া জোড়া মুখ। মণিদা আর গৌরী বউদি...ভীম বাহাদুর আর তার ভালবাসার মেয়ে...আবু আর রেশমা। পিছন থেকে বাপী নিঃশব্দে এগোচ্ছে। তার চোখে শুধু লোভ নয়, দুর্জয় আক্রোশও।

প্রজাপতির পিছনে আর না গিয়ে মিষ্টি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বাপী তখন ওর পাঁচ হাতের মধ্যে। মিষ্টি থমকে তাকিয়ে মতলব বুঝতে চেষ্টা করল। বলল, পিছন থেকে চুপি চুপি আসা হয়েছে—কেমন?

একেবারে কাছে এসে বাপী জবাব দিল, চুপি চুপি আসব কেন। তোকে দেখেই তো এলাম—

একটা হাত ধরল। এক ঝটকায় সেই হাত ছাড়িয়ে মিষ্টি ধমকে উঠল, ফের গায়ে হাত! গিয়ে বলব মাকে?

প্রাণপণ চেষ্টায় বাপীর বাইরেটা মোলায়েম তখনো।—ঠিক আছে, আমাদের বাড়ি চল্, পিসী ক্ষীরের পুলি বানিয়েছে—খেলে আর ভুলতে পারবি না।

মিষ্টি মুখ মচকে জবাব দিল, হ্যাঃ, তোমার বাবা চুরি করে ধরা পড়েছে, আমার বাবা ক্ষমা করে দিল বলে—আর কক্ষনো তোমাদের বাড়ি খেতে যাই—

কথাগুলো মুগুরের ঘায়ের মতো মগজে এ স লেগেছে। তারপর যা ঘটার চোখের পলকে ঘটে গেল। আচমকা দুটো হাতসুদ্ধু বেড়িয়ে নিজের বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে বাপী ওকে শূন্যে তুলে নিয়ে ভিতরের দিকে ছুটল। মিষ্টি ভালো করে চেঁচাবারও ফুরসৎ পেল না। ওর হাঁ-করা মুখের মধ্যে বাপী নিজের মুখ চেপে ধরেছে।

পঁচিশ-তিরিশ গজের বেশি এগনো গেল না। ওর ঠোঁটে মুখে মিষ্টি দাঁত বসিয়ে দিয়েছে। জুতোসুদ্ধু পা ছুঁড়ছে।

দাঁড়িয়ে গেল। তার পরেই মিষ্টি মাটিতে। বাপী ওর ওপরে। ভিতর থেকে যে শয়তানটা বেরিয়ে এসেছে, বাপী নিজেও তাকে ভালো চেনে না। তার স্থান কাল বোধ নেই, ভালো-মন্দ জ্ঞান নেই, পরিণামের হিসাব নেই। তার শুধু লোভ, শুধু আক্রোশ। মুখে দাঁতে ঠোঁটে জিভে নরম মাংসের স্পর্শ। মুখে মুখ চেপে গলা দিয়ে ওকে টুঁ শব্দও বার করতে দিচ্ছে না। আর হাত দুটোরও সর্বাঙ্গের মাংস খুবলে তুলে নেবার উল্লাস।

এই উল্লাসের মুখে আবার একটা ধাক্কা খেয়েই শয়তান থমকালো। তারপর পলকে কোথায় সেঁধিয়ে গেল। এবার বাপী দেখছে। দেখছে মিষ্টির সমস্ত মুখ আবির-গোলা লাল। চামড়া ফেটে এক্ষুনি রক্ত বেরিয়ে আসবে বুঝি। বড় হাঁ-এর মধ্যে একটা বিকট কান্না টাক ধরে আছে। ওটা মুক্তি না পেলে দম-বন্ধ হয়ে মরেও যেতে পারে।

নিজের অগোচরেই ওকে ছেড়ে বাপী হাত-দুই সরে গেল। খুব শব্দ না করেই কান্নাটা মুক্তি পেল। তারপরেই ত্রস্তে উঠে দাঁড়িয়ে মিষ্টি পনের-বিশ হাত ছুটে গেল। পলকের জন্য ঘুরে দাঁড়াল একবার। মাটি থেকে বড়সড় একটা পাথর তুলে নিয়ে প্রাণপণ জোরে ছুঁড়ে মারল ওকে। লাগলে কি হত বাপী জানে না। লাগল না। বাপী নিজের অজান্তে মাথা নুইয়ে ফেলেছিল। মুখ তুলে দেখে মিষ্টি নেই।

তখনো বিকেল। আবুর ঘরের সামনের উঠোনে বসেছিল বাপী। শরীর অবসন্ন। কিছু একটা ঘটবে জানে। কিন্তু ও কি করবে জানে না। তাই এখানে।

আবু এলো। সঙ্গে আরো দুজন বীটম্যান। আবুর থমথমে মুখ। বলল, বাড়িতে না দেখেই বুঝেছি তুই এখানে। চল্ বড়সাহেবের বাংলোয় যেতে হবে, তোকে ধরে নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে—

বাপী ওর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

আবু রেগে গেল।—হাঁ করে দেখছিস কি, আমি বড়সাহেবের গোলাম না এখন? তারপর ঝুঁকে গলা খাটো করে বলল, তোর বাবাও আছে সেখানে, দুষ্টুমি করেছিস, না হয় মারধর খাবি একটু, অত ভয়ের কি আছে, চল্—

কি দুষ্টুমি বা ভয়ের কতটা, আবুও জানত না। বাংলোর বারান্দায় মেমসাহেব, সাহেব আর বাপীর বাবা। দরজার ও-ধারে মিষ্টি।

আর কাউকে কিছু করতে হল না। যা করার বাবাই করল। চুলের মুঠি ধরে কিল-চড় ঘুঁষি মেরে মেরে ওকে কাঠের মেঝেতে ফেলল প্রথম। তারপর একজন বীটম্যানের

হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে পাগলের মতো পিটিতে লাগল। চাপা আর্তনাদ করে করে বাপী উল্টে-পাল্টে যাচ্ছে। কিন্তু বাবা ওর প্রাণটা বার হওয়ার আগে আর থামবেই না। পিঠ হাত পা কপাল নাক মুখের চামড়া ফেটে চৌচির। নাক মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে। জিভে ঠোঁটে গরম তাজা রক্তের নোনা স্বাদ।

এবার চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে বাপীর। আরো অন্ধকার। গায়ে মুখে মাথায় লাঠির ঘা পড়ছে এখনো কিন্তু আর যেন অত লাগছে না। ও কি রকম ঘুমপাড়ানি অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে।

সবটাই একটা দুঃস্বপ্ন কিনা বাপী ঠাওর করে উঠতে পারল না। নিজের ঘরের চৌকিতে শুয়ে আছে। কোণে ডিম-করা হারিকেন। আলোর থেকে অন্ধকার বেশি। ঘরে কেউ নেই।

পিসী রাত থাকতে ওঠে। তাই উঠে গেছে বোধ হয়। কিন্তু তা হবে কেমন করে। রাতে শোবার পর ঘরে হারিকেন জ্বলে না। তাহলে ও শুয়ে কেন?

মাথা উঁচিয়ে খোলা দবজার দিকে দেখতে গিয়ে টের পেল কেন। ঘাড়ে মাথায় কপালে মুখে আর সমস্ত গায়ে ভীষণ যন্ত্রণা। শুধু ব্যথা নয়, জ্বলেও যাচ্ছে। নাক দিয়ে গরম নিঃশ্বাস বেরুচ্ছে।

স্বপ্ন নয়। মনে পড়ছে। সাহেববাংলোর বারান্দা থেকে কে যেন এক সময় ওকে পাঁজাকোলে তুলে নিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছিল। তারপর একবার দুবার চোখ তাকিয়ে খুব সম্ভব আবুর মুখখানাই দেখেছিল। জিভটা মুখের ভিতর নড়াচড়া করল, তারপর নিজের ঠোঁট দুটোও চেটে দেখল। না, রক্ত লাগছে না। কেবল জ্বালাই করছে। ঠোঁটে আর তার ওপরে নিচে কোন ওষুধ-টষুধ লাগানো হয়েছে বোধ হয়। জিভটা বিচ্ছিরি হয়ে গেল। কিন্তু তার থেকে ঢের বিচ্ছিরি নোনতা রক্ত। সেটা মনে পড়তে গা-টা কেমন করে উঠল। নিজের শরীরের রক্তের এমন গা গুলনো গরম নোনতা স্বাদ, জানত না।

—ক'বার তোকে ঘরে যেতে বললাম, বসে বসে রাত করছিস কেন?

বাইরে বাবার বিরক্তি-ঝরা ভারি গলা। বাপীর দু কান খাড়া। কিন্তু যাকে বলল তার কোন জবাব শোনা গেল না...কাকে বলল? নিশ্চয় আবুকে। ও হয়ত চলে গেল। কারণ একটু বাদেই পিসীর কথা কানে এলো।

—এটুকু আর বাকি রেখে জ্যান্ত ফিরিয়ে আনলি কেন—একেবারে শেষ করে দিলেই তো হত।

আর এক প্রস্থ চাবুকের মতই বাবার ঝাঁঝালো জবাব।—শেষ করতেই চেয়েছিলাম, আর শেষ করাই উচিত ছিল—বুঝলে? কিন্তু ও শেষ হবার ছেলে নয়, তার আগে আমাকে শেষ করবে।

মুখের মধ্যে বাপীর জিভ নড়ে-চড়ে উঠল আর একবার। ঠোঁট দুটো চেটে নিল। রক্ত নয়। রক্তের থেকেও বিস্বাদ কিছু যেন ভিতর থেকে ঠেলে উঠেছে। যত রাগ ততো ঘৃণা। বাবার গলা শুনেই এই, মুখ দেখলে হয়তো ফিনকি দিয়ে রক্তই ছুটবে।

কিন্তু মুখ রাতে দেখা গেল না। সকালেও না। সকালে যখন চা-বাগানের ডাক্তার এলো, তখনও না। রাতে বা সকালে পিসীর সঙ্গেও কোন কথা হয়নি বাপীর। রাতটা

কি-রকম ঘোরের মধ্যে কেটে গেছে। পিসী ডাক্তারকে বলল, সমস্ত রাত জ্বরে ভাজা-ভাজা হয়েছে।

ডাক্তার পরীক্ষা করল। নাক মুখ আর সমস্ত গা হাত পা উল্টে-পাল্টে দেখল। তারপর গম্ভীর মুখে বাইরে চলে গেল। একটু বাদেই বাপীর কানে মধু। পিসীকে ডাক্তার বলছে, চিকিৎসা যা করার করছি, কিন্তু আপনার উচিত পুলিশে খবর দেওয়া—ছেলেকে এ-রকম শাসন করা চলে কিনা সেটা তারা বুঝিয়ে দেবে।

ঘাড় উঁচিয়ে বাপী পিছনের দরজার দিকে তাকালো। বাবা কোথায়? বাবা কি শুনল?

দুপুরে আবু এলো। বাবা তখন আপিসে। পিসী তার পুজোর জায়গায়। আবু ঘরে ঢুকলে পিসীকে গোবরজলের ছড়া দিতে হয় বলে ভিতরে কমই ঢোকে। আজ ও ঘরে পা দিতেই একটা উদ্‌গত অভিমানে বাপী অন্য দিকে মুখ ফেরাল।

পিসী শোয় বলে আবু চৌকি ছোঁবে না। হাত দুই তফাতে দাঁড়িয়ে ওকে দেখল একটু। বলল, রাগ তো হবেই তোর, আমি শালা কেমন গোলাম ভাল করে দেখে রাখ—

বলার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা বাপীও বুঝল। আস্তে আস্তে ওর দিকে ফিরল আবার। আর মনে মনে ভাবল, চোখে যদি জল আসে তো নিজের চোখ দুটো উপড়ে ফেলবে।

আবু বলল, কাল রাতেও খবর নিতে এসেছিলাম। পিসী বলল খুব জ্বর তোর। তোর বাবার মুখের দিকে চেয়ে আর ঘরে ঢোকার সাহস হল না। এখন আপিসে কাজ করছে দেখে ঝট করে চলে এলাম।

বাপী বলল, একটা কিছু টেনে নিয়ে বোসো না—

—আর বসে না, এক্ষুনি তো জঙ্গল ঠ্যাঙাতে বেরুতে হবে। তারপর গলা খাটো করে বলল, এত বড় কাণ্ড হবে জানলে আমি তোকে বানারজুলি থেকেই পাচার করে দিতাম। সামনে ঝুঁকল একটু, কি করেছিলি রে তুই—মেয়েটার একেবারে সব্বোনাশ টব্বোনাশ করে বসে আছিস নাকি? কুকুর বেড়ালকেও তো কেউ এভাবে মারে না—

সর্বনাশ কাকে বলে বাপী তাও এখন বেশ বুঝতে পারে। একটা মেয়ের নরম মাংসের ওপর পাগলের মতো সেই হামলার পর ভিতরের শয়তান আরো বেপরোয়া কিছুর দিকে ঝুঁকতে চাইছিল। কিন্তু মিষ্টির হাঁ-করা মুখের দম-আটকানো কান্না দেখে সেই শয়তান উধাও হয়েছিল। এখন খেদ। আবু যা বলছে তাই হলে কি হত? না-হয় একেবারে মেরে ফেলা হত ওকে। তার বেশি কি হত?

আবু চেয়ে আছে। কিন্তু বাপী কি করেছে না করেছে মুখে কি বলবে? মাথা নাড়ল। অর্থাৎ, অতটা না।

দাঁতে দাঁতে ঘষে আবু বলল, যদি মরদ হোস তো একদিন শোধ নিবি। তারপর একটা চোখ ছোট করে অন্য চোখে সটান তাকিয়ে শুধলো, কি-রকম শোধ বুঝলি?

কেন যেন বাপীর জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়োচ্ছে একটু। মাথা নাড়ল। বুঝেছে।

কিন্তু দু মাস না যেতে রাগে আর পরিতাপে নিজের মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে ইচ্ছে করেছে বাপীর। জঙ্গলের হিংস্র জানোয়ারের মতোই একটা চলন্ত জিপে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছে। রেঞ্জ অফিসার সন্দীপ নন্দী দিনাজপুর না কোথাকার জঙ্গলে বদলি

হয়ে গেল এ-খবর প্রথম আবুই দিয়েছিল ওকে। বলেছিল, অনেক দুর্নাম রটেছে বড়সাহেবের নামে, কত আর চাপা দেবে? তাই মানে মানে নিজেই তদবির করে সরে পড়ছে।

আগে কায়মনে কিছু চাইলে বাপী সেই প্রার্থনা ভগবান নামে অদৃশ্য কারো কাছে পেশ করত। সেই মারের পর ভগবানের নাম আর মুখেও উচ্চারণ করে নি। তবু নিজের বুক চিরে কাউকে রক্ত দিলে যদি এই বদলি বন্ধ হত, তাও দিত। কিন্তু কিচ্ছু করা গেল না। ওরা চললই।

এত দিনের মধ্যে বাপী আর বাংলোর কাছে আসেনি। আজও দূরেই দাঁড়িয়েছিল। দূর থেকে ব্যস্তসমস্ত বাবাকে দেখেছে। মেজসাহেব ছোট সাহেব, ফরেস্ট গার্ড, বীটম্যানদের দেখেছে।...মেয়ের হাত ধরে মেমসাহেব জিপে উঠল। সাহেব সামনে। জিপটা আসছে। বাপী রাস্তা আগলে দাঁড়িয়েছিল, ধারে সরে গেল। মিষ্টি দেখেছে ওকে। মাকেও দেখিয়েছে। জিপটা বেরিয়ে গেল। বাপী মিষ্টির দিকেই চেয়ে আছে। মিষ্টিও। সামনে বাবা, পাশে মা, তবু ওর ভয়-ভয় মুখ।

জিপ দূরে বাঁকের আড়ালে মিলিয়ে গেল। শিরায় শিরায় রক্ত ফুটছে বাপীর। মুখে বলছে না কিছু। মনে বলছে। কদ্দূর পালাবি? তোকে আর পাব না ভেবেছিস?

পরের দু বছরে বাপীর ভেতর-বার বদলেছে। পড়াশুনাটা মোটামুটি ভাবে করে গেছে। সামনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা। পৃথিবীর যুদ্ধ তখন ঘরের কোণে এসে গেছে। চা-বাগানের ক্লাবে খবরের কাগজ আসে। রোজ সন্ধ্যার পর সেখানে গিয়ে বাইরের বেঞ্চিতে বসে বাপী কাগজ পড়ে। কিন্তু যুদ্ধের এত খবব মনে খুব একটা দাগ কাটে না। ওরও ভিতরে অবিরাম যে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছে সেটা কম কিছু নয়। মিষ্টি নামে একটা মেয়ে কোথাও না কোথাও আছেই। বাপী হিসেব ভোলেনি। ওই মেয়ে বারো পেরিয়েছে এখন। কল্পনায় আর একটু বড় দেখেছে ওকে। আরো সুন্দর দেখেছে। আরো বড় হোক। আরো সুন্দর হোক। দেখা হবে। হবেই হবে।

বানারজুলির জঙ্গল তেমনিই টানে ওকে। আবু ভীষণ ব্যস্ত। তার দেখা কম মেলে। কাজে গাফিলতি নেই। তার ওপর রোজ চা-বাগানের বস্তি এলাকায় গিয়ে বাপের জন্য হাড়িয়া যোগাড় করে নিয়ে আসতে হয়। চাকরি খোয়ানোর ফলে কোন সন্ধ্যাতেই এই জিনিস থেকে ও বাপকে বঞ্চিত করে নি। জঙ্গলে বেশির ভাগ সময় একলাই ঘুরে বেড়ায় বাপী। কিন্তু এ ঘোরাটা অন্য রকম। জীবজন্তুর ভালবাসাবাসির দিকে আর চোখ নেই। এ দু' বছরেও বনমায়া তার হিসেবমতো নিখোঁজ হয়েছে আর সকলের প্রত্যাশিত সময় মতোই ফিরেছে। কিন্তু এ নিয়েও বাপী আর আগের মতো অত উত্তেজনা বোধ করে না। এমন কি চা-বাগানের আড়াইপাতি তোলা হাসি উছলানো মেয়েদের দিকেও আর বেশি ঘেঁষে না। নিজের মনে জঙ্গলে ঘোরে। এখানকার নিস্তব্ধতা ভালো লাগে। গাছপালার সড়সড় শব্দও ভালো লাগে।

যা একটু কৌতূহল কেবল বসন্তের কোপে অন্ধ সাপুড়ে ছট্টু মিঞার বউ দুলারি আর তার ননদ মাতাল কাঁদনার বউ রেশমাকে নিয়ে। দুলারি এক রকমই আছে। পুরুষালি ছাঁদ, মুখে কম কথা, আর আবুকেও চোখ রাঙানোর সাহস। কিন্তু মাতাল স্বামীর হাতে মার-খাওয়া রেশমার মুখখানা আরো ঢলঢলে হয়েছে। বছর উনিশ এখন ওর বয়েস।

আবু বলেছে মাসের মধ্যে কম করে বিশ-বাইশ দিন রেশমা এখন তার ভাজের কাছেই থাকে। কাঁদনা এসে হাতেপায়ে ধরে খুব কাকুতি-মিনতি করলে তবে যায়। কিন্তু দুদিন বাদে আবার দাগড়া-দাগড়া মারের দাগ নিয়ে পালিয়ে আসে। মদ খেলেই ইদানীং ওর নাকি বউয়ের স্বভাব-চরিত্র নিয়ে মাথায় সন্দেহ গজাতে থাকে। তারপর মেরে শুইয়ে না ফেলা পর্যন্ত সন্দেহের পোকাগুলো মাথা থেকে সরে না। রেশমা আর নাকি তার মরদের ঘরে যাবেই না পণ করেছে।

এত কথা বাপী আবুর মুখ থেকে শুনেছে। আর কাঁদনার সন্দেহ কতটা সত্যি আবুর মুখের দিকে চেয়ে তাই আঁচ করতে চেষ্টা করেছে। ওদের নিয়ে কৌতূহলের আরো কারণ, দুলারি আর রেশমা দুজনেই এখন রোজগারের রাস্তায় নেমে পড়েছে। সাপের ঝুড়ি আর বাঁশি নিয়ে দুজনে একসঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে সাপ-খেলা দেখাতে বেরোয়। দু বছরে অন্ধ ছট্টু মিঞার কাছে বিদ্যেটা রপ্ত করে নিয়েছে। সকালে ঘরের কাজ থাকে, রান্নাবান্না থাকে, খুব বেশি ঘুরতে পারে না। কিন্তু দুপুর পেরুনোর আগে অনেক দূরে দূরে চলে যায় ওরা। ভয়-ডর নেই। দুলারির তো একেবারে নেই।

ওরা কোথাও সাপ খেলা দেখাচ্ছে দেখলে বাপী গুটিগুটি না এগিয়ে পারে না। শুধু বাপী কেন জোয়ান বয়সের অনেকেই এগোয়। দুলারি আর রেশমা দুজনেই ঘাগরা পরে বেরোয়। সেই ঘাগরা ওদের হাঁটু ছাড়িয়ে এক বিঘতও নামে না। গায়ে রংবেরংয়ের আঁট কোর্তা। ছট্টু মিয়ার খেলা অনেক দেখেছে বাপী। সেই একই খেলা এদের হাতে যেন অন্যরকম। গাল ফুলিয়ে সাপুড়ের বাঁশি বাজিয়ে পালা করে খেলা দেখায়। সাপ ডাইনে বাঁয়ে দোলে। হাঁটু মুড়ে বসে ওরাও তেমনি দোলে। ছোবল মারার মতলবে সাপ সামনে পিছনে দোলে। ওদের তখন উত্তেজনা বাড়ে। ওরাও সামনে পিছনে দোলে। ছোবল খাবার জন্য মাটিতে উল্টো করে হাত পাতে, আবার ছোবল পড়ার আগে পলকে হাত সরায়। এই করে সাপের উত্তেজনা বাড়ায়। নিজেদের আর যারা গোল হয়ে দাঁড়ায় —তাদেরও। সাপের ছোবল একবার না একবার লেগেই যায়। ঝর ঝর করে রক্ত পড়ে। তখন ঠাণ্ডা হয়ে পাতা আর শেকড়বাকড় চিবিয়ে চটপট লাগিয়ে দেয়।

বাপী লক্ষ্য করেছে ছোবল খাবার লোভ রেশমার থেকেও দুলারির বেশি। অন্ধ ছোট্টু দাদাকে যত বুড়োই দেখাক, দুলারির বয়েস এখন বড় জোর বাইশ। কিন্তু সাপ খেলা দেখানোর সময়েও মুখখানা করে রাখে বত্রিশের মতো। রেশমার মতো হাসে না। কিন্তু ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে দোলে ওর থেকেও বেশি। খপ করে একসময় দু-হাতে সাপের গলা চেপে ধরে বুকের কাছে নিয়ে আসে। সাপের মুখ নিজের মুখের কাছে। সাপের চেরা-জিভ চিড়বিড় করে। দুলারিও তখন ঘন ঘন জিভ বার করে আর টেনে নেয়। যেন জিভেই ছোবল নেবার বাসনা। বাপীর কেন যেন তখন সাপের চেয়েও ওই দুলারিকেই বেশি ভয় করে।

পরীক্ষা এসেই গেল। পড়াশুনায় আপনা থেকেই একটু মন বসেছে। তারই মধ্যে আচমকা দুর্যোগ। যে 'মালোরি' জ্বরের ভয় পিসীর, তাই তাকে খেয়ে বসল। পাঁচদিনের মাথায় ধুপ করে মরে যেতে বোঝা গেল ওটা ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। ডাক্তারের মুখে ওই নাম বাপী পরে শুনেছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার মাত্র আট দিন বাকি তখন।

বাবা কাঁদল না। পাথর হয়ে থাকল। বাপীও কাঁদল না। বুকের একখানা হাড় খসে

গেল। তবু না। আছড়ে পড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। তবু না। কেবল আবুর চোখে জল দেখেছিল।

পরীক্ষায় ছেদ পড়ল না। পরীক্ষা শুরু হল, শেষও হল। গত দু বছরের মধ্যে বাবার সঙ্গে বাপীর কদিন মুখ-দেখাদেখি হয়েছে হাতে গোনা যায়। পিসী চোখ বোজার পর মুখ-দেখাদেখি দু বেলাই হচ্ছে এখন। বাবা মোটামুটি রাঁধতে জানে। বাপীর হাতে ছেড়ে দিলে রান্না একরকম সে-ও করতে পারে। কিন্তু বাবা মুখ বুজে নিজেই রান্না করে। বাপী দেখে। কিছু বলে না। পরীক্ষা হয়ে যাবার পর বাবা সকালের বাজারটা ওকে মাঝে মাঝে করতে দেয়।

একই বাড়িতে দুটি প্রায় অচেনা বাসিন্দা দুজন। সকালে বাবার আপিস থাকে। আগে খেয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু রাতে বা ছুটির দিনেও খাবার সময় বাপী দূরে সরে থাকে। বাবা বুঝে নিয়েছে ও তার সঙ্গে বসে খাবে না। তাকে সামনে দেখলে আজও বুকের একেবারে তলা থেকে একটা বিতৃষ্ণা ঠেলে ওঠে বাপীর। বাবা তাও বুঝতে পারে কিনা বাপী জানে না। বাবা ডাকে না। ওরটা সাজিয়ে রেখে নিজে খেয়ে চলে যায়।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বেরোল। বাবা এতটা আশা করে নি নিশ্চয়। আর বাপী ফল নিয়ে মাথাই ঘামায় নি। পাশ করবে জানত।

...ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে। খবর আসার পরদিনই বাবার মুখ দেখল। এ-ঘরে এসে বলল, বড়সাহেবের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে, কাল বিকেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। আমি নিয়ে যাব।

কে এখন বড়সাহেব বাপী সে-খোঁজও রাখে না। কি কথা হয়েছে বা কেন দেখা করতে হবে না বুঝে মুখের দিকে চুপচাপ চেয়ে রইল।

বাবা বলল, এ জঙ্গলে আর একজন ক্লার্ক নেওয়া হবে সেটা আগেই ঠিক হয়ে ছিল। বড়সাহেবকে তোর কথা বলে আমি আটকে রেখেছিলাম। ম্যাট্রিক পাশ চাই। আজ রেজাল্টের কথা বলতে সাহেব কালই দেখা করতে বললেন।

কথা শেষ করে বাবা চলে যাচ্ছিল, বাপী বলল, আমি কলেজে পড়ব।

হরিবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন। ছেলের মুখ এবারে ভালো করে দেখে নিলেন। সেই পুরনো বিতৃষ্ণা আর ঘৃণা নিজের মুখে আরও কত এঁটে বসেছিল বাপী জানে না। গলার স্বরেও কিছু প্রকাশ পেয়েছে কিনা বলতে পারে না।

হরিবাবুর মুখে কঠিন আঁচড় পড়তে লাগল। গলাও অসহিষ্ণু ভারী।—কলেজ মানে তো সেই জলপাইগুড়ি, সেখানে হস্টেলে থেকে পড়ার ইচ্ছে?

বাপী চুপ।

—আমার সে ক্ষমতা নেই।

বাপীর জবাবও এবারে স্পষ্ট।—অর্থাৎ একবার সেখানে গিয়ে দেখব কোন ব্যবস্থা হয় কিনা।

হরিবাবু থমকালেন। মুখের ওপর এতকাল কোন কথা শুনে অভ্যস্ত নয়। তাঁর চোখে এটা অবাধ্যতা। কিন্তু সামনে যে দাঁড়িয়ে সে এখন তাঁর চেয়েও তিন আঙুল ঢ্যাঙা। দু বছর আগের সেই মারের পর থেকে ছেলে বদলেছে এ তিনি লক্ষ্য করেছেন। শাসন নিষ্ফল হয় নি ভেবেছেন। দিদি মাঝে না থাকাতে বাপ-ছেলের ফারাকটা এখন আরও

বেশি স্পষ্ট। কিন্তু ছেলের এই মুখে আর এই স্পষ্ট জবাবে যেন আরও কিছু লেখা আছে।

অসহিষ্ণুতা চাপতে পারলেন না।—সেখানে গিয়ে ব্যবস্থা হয় কিনা দেখার জন্য এখানকার চাকরি বসে থাকবে?

বাপী নিরুত্তর।

এই নীরবতার মধ্যেও ধৃষ্টতা দেখলেন হরিবাবু।—ম্যাট্রিক পাশ করে খুব লায়েক ভাবছিস নিজেকে, কেমন? স্টুপিড! এখানে আমার ব্যবস্থাই ব্যবস্থা এ যেন মনে থাকে!

থমথমে মুখে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

পরদিন খেয়ে-দেয়ে সকাল দশটা নাগাদ আপিসে বেরুনোর জন্য তৈরি হয়ে ছেলেকে কাছে ডাকলেন। বললেন, চারটে বাজার মিনিট পনের আগে আপিসে আসতে হবে, সেখান থেকে আমি সঙ্গে করে বড়সাহেবের বাংলোয় নিয়ে যাব।

বাপী চুপচাপ অন্য দিকে চেয়ে রইল।

আপিসে বেরুনোর সময় মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে চান হরিবাবু। আজ রাখা গেল না। চাপা গর্জন করে উঠলেন, আমার কথা কানে যাচ্ছে?

বাপী এবারে সোজা বাবার মুখের দিকে তাকালো। ঠাণ্ডা মুখ। ঠাণ্ডা গলা।—তুমি আর না পড়াতে পার, পড়াবে না। এভাবে জুলুম করছ কেন?

হরিবাবু ঠিক দেখছেন? ঠিক শুনছেন? পায়ে এখন চটি নেই, ফিতে বাঁধা জুতো। তাই খুলে হাতে নেবেন? কিন্তু ছেলের এই মুখের দিকে চেয়ে কটা মুহূর্তের মধ্যেই আবার তাঁর মনে হল, আগের সেই দিন আর নেই। কতটা নেই ঠাওর করে উঠতে পারলেন না। ছেলের ঠাণ্ডা চাউনির ভিতর থেকে কিছু ঠিকরে পড়ছে মনে হল তাঁর। উদ্গত রাগ ঠেলে তল করলেন।

—আচ্ছা, বড়সাহেবের সঙ্গে দেখাশুনা কথাবার্তা হোক। তারপর আর কিছু ভাবার থাকে তো বিকেলে ঘরে এসে ভাবা যাবে।

হরিবাবু হনহন করে চলে গেলেন।

বাপী তার এক ঘণ্টার মধ্যে স্নান সারল। খাওয়া সারল। অন্য দিন দেরি হয়। আজ তাড়া।

এরই মধ্যে আবু এসে হাজির। খুশি উপছানো মুখ।—তোর পেটে পেটে এত যে আমাকে খবর পর্যন্ত দিলি না—অ্যাঁ?

—কি খবর?

—আজ বড়সাহেবের সঙ্গে তোর মোলাকাত হবে, কাল পরশু থেকে তুই আমাদের ছোট কেরানীবাবু। শুনেই ছুটে চলে এলাম আমি—

বাপীও হাসছে অল্প অল্প।—কার কাছে শুনলে?

—একবার আপিসে গেছলাম, তোর বাবাই ডেকে খবরটা দিলেন। আমি তোকে এর পর কি বলে ডাকব রে—হ্যাঁ? লোকের সামনে না হয় আপনি-টাপনি করে বলব —কি বলিস?

—আগে কাজ হোক, তারপর ভেবো। চকিতে ভেবে নিল কি।—বাবা নিজে ডেকে তোমাকে শুধু এই খবরটা দিল, না আর কিছু বলল?

—খবরটা জানিয়ে আমাকে বললেন, সাড়ে তিনটের সময় ঘরে গিয়ে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসিস। চারটেয় বাংলোয় বড়সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা।

বাপী হাসছে মনে মনে। বাবার তাহলে নিজের হুকুমের ওপর ভরসা একটু কমেছে। মনে মনে নয়, বাইরেও হাসল বাপী। বলল, ওই বাংলোর বারান্দাতেই বাবা আমাকে মেরে মেরে একেবারে শুইয়ে ফেলেছিল—নিজের রক্তে গড়াগড়ি খাচ্ছিলাম আমি।

আবু থতমত খেল একটু।—দূর, দু বছর আগের সেই মার তোর গায়ে লেগে আছে, না সেই বড়সাহেব আছে। এই লোকের কাছে কাজের কদর আছে বলেই তো তোর বাবার সুবিধে হয়েছে।

বাপীর মজাই লাগছে। আবার বলল, আর পরদিন দুপুরে এসে তুমি বলেছিলে, যদি মরদ হোস একদিন শোধ নিবি—আর আজ ছোট কেরানী হয়ে বসছি দেখেই এত খুশি তুমি?

এবারে আবুকে ঢোক গিলতে হল।—আচ্ছা ছেলে তো তুই, সেসব কথা এখনও মনে করে বসে আছিস! তারা এখন পৃথিবীর কোন রাজ্যে আছে তার কিছু ঠিক আছে? তাছাড়া খোদার মর্জি হলে ছোট কেরানী হলেও শোধ নেবার দিন আসতে পারে। খুশির দিনে ও-সব মাথায় রাখিস না, অনেক কাজ এখন, যাই—ঠিক সাড়ে তিনটেয় এসে যাব, রেডি থাকিস—

চলে গেল।...না ওকেও কিছু বলা গেল না। বলা নিরাপদ ভাবল না। সমূহ সমস্যার সমাধান পিসীই করে রেখে গেছে। নইলে আবুকেই বলতে হত। তার কাছ থেকেই সাহায্য চাইতে হত। তার দরকার হল না, বাঁচোয়া। আবু যে ওকে ভালবাসে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাপীর মতলব জানলে ওকে আগলাবার জন্য কি কাণ্ড করে বসত, কে জানে। হয়ত বাবার কাছেই ছুটত আবার। চাকরি ওর কাছে মস্ত জিনিস এখন।

...কি করবে না করবে বাপী গত রাতেই ঠিক করে ফেলেছিল। দরকার শুধু নগদ কিছু টাকার। বানারহাট পৌঁছুতে পারলে সেখান থেকে জলপাইগুড়ি পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ মাইলের বেশি নয়। ভাড়া সেই দিনে বড়জোর এক টাকা। খুব কম হলেও আরও তিন-চার টাকা বাপীর হাতে থাকা দরকার। সপ্তাহের বাজার আর টুকিটাকি কেনার জন্য বাবা ওর হাতে পাঁচ টাকা দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু বাপী বরং ওই পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল হেঁটে যাবে, তবু ও-টাকার এক পয়সাও ছোঁবে না। আবুকে বলে দেখবে ভেবেছিল পাঁচটা টাকা ধার দিতে পারে কিনা।

কিন্তু গত রাতের মধ্যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। চৌকির নিচে পিসীর ছোট বাক্সটার কথা মনে পড়ল। চাবি বাপীর কাছেই। পিসী মারা যাবার পরে এ পর্যন্ত আর খুলে দেখা হয় নি ওতে কি আছে না আছে। যদি কিছু থাকে তা বাপীর ছাড়া আর কার?

জামাকাপড়ের তলা থেকে হাতে তৈরি ছোট্ট থলে বেরুলো একটা। বেশি শব্দ না করে বিছানায় উপুড় করে ফেলল। সবই কাঁচা টাকা, আর একটা আধুলি। মোট সাড়ে সতের টাকা। বাপীর কাছে ঐশ্বর্য। টাকা থলেয় পুরে ওটা কপালে ঠেকাল। ভগবান-টগবান নয়, পিসীকে প্রণাম করল। তরপর সমস্ত রাত আর সকাল কাটল এই দুপুরের প্রতীক্ষায়।

সঙ্গে যা নেবার চটপট গুছিয়ে নিল। টিনের ছোট সুটকেসে ধুতি, শার্ট, গেঞ্জি একটা গরম সোয়েটার। শতরঞ্জী মোড়ানো পুঁটলিতে শুধু নিজের পুরনো কম্বল, রঙিন চাদর একটা, আর গায়ের আলোয়ান। বিছানা-বালিশের বিলাসিতা মন থেকে ছেঁটে দিয়েছে। ওই টিনের সুটকেসই দিব্যি মাথায় দিয়ে শোয়া যাবে।

বারোটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল। বাবার বাজারের টাকা তার বিছানায় বালিশ চাপা দিয়ে রেখে এসেছে।...আবু আসবে সাড়ে তিনটেয়। ঘরে শেকলতোলা দেখে ভাববে ও আগেই বাবার আপিসের দিকে চলে গেছে। আপিসে না পেয়ে আবার ঘরের দিকে ছুটবেই। মোট কথা, ও নেই জানাজানি হতে বিকেলে চারটে গড়াবে। ততক্ষণে ও অনেক দূরে।

জঙ্গল দিয়ে নয়, সোজা রাস্তা দিয়েই চলল। জঙ্গলে আবুর সঙ্গে ফের দেখা হয়ে গেলে মুশকিল। ভয় শুধু ওকে। রাস্তায় আর কোন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই বা। কে কি বুঝবে? বেরিয়ে যখন পড়েছে, আর ওকে ফেরাবার সাধ্য কারও নেই।

বরাত ভাল। আধ মাইল না যেতে এক ঠেলা-অলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দুটো লোক ঠেলায় লোহালক্কড় চাপিয়ে বানারহাট যাচ্ছে। বাপীর কাছে প্রত্যেকটা পয়সা দামী এখন। তবু দু আনায় রফা করে টিনের সুটকেস আর শতরঞ্জীর পুঁটলি ঠেলায় তুলে দিল। ঝাড়া হাত-পায়ে ওকে দেখলেও এখন আর কেউ কিছু সন্দেহ করবে না।

আরও মাইলখানেক এগিয়ে বাপী মনে মনে নিজের বিবেচনার তারিফ করল। সামনের দিক থেকে আসছে সাপুড়ে ননদ-ভাজ। দুলারি আর রেশমা। পরনে খাটো ঘাগরা, মাথায় ছোট বড় সাপের ঝুড়ি। ও-দিক থেকে খেলা দেখিয়ে ফিরছে। রোদের তাতে দুজনারই লালচে মুখ।

ওকে দেখে রেশমা দাঁড়িয়ে গেল। তাই দুলারিও। মরদের হাতে ঠেঙানি খেয়ে রেশমা কাঁদে কেমন বাপী জানে না। কিন্তু হাসে বেশ।

—ভরদুপুরে কোথায় গো বাপী-ভাই?

আবুর সঙ্গে এত খাতির, বয়সেও বছর দুই বড় হবে, রেশমা ওকে তাই বাপীভাই বলে ডাকে। দুলারির মুখে এযাবৎ কোন ডাক শোনে নি।

—এই সামনে। তোমাদের আজ এত বেলা, দূরে গেছলে বুঝি?

—হ্যাঁ গো, আজ ভাল রোজগার হল। কদিনের মধ্যে তোমার বীটম্যান সাহেবের দেখা নেই কেন?—বলো, দাদা খোঁজ করছিল।

দুলারির কপালে ভ্রূকুটি।—বলো রেশমা খোঁজ করছিল।

নিরীহ মুখে বাপীও একটু মজাই করল। বলল, খানিক আগে আমার ওখানেই ছিল, এতক্ষণে বোধহয় তোমাদের ঘরেই বসে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে রেশমা বলল, চল ভাবী, পা চালিয়ে চল—বেলা বাড়ছে।

গম্ভীর চোখে রেশমার মুখে ঝপ করে একটা ছোবল বসাবার মত চাউনি দুলারির।

ওরা এগুলো। বাপী দাঁড়িয়ে দেখছে। সঙ্গে সঙ্গে লজ্জাও পেল। এক সঙ্গে দুজনেই ওরা পিছন ফিরে তাকালো। বাপী ঘুরে তাড়াতাড়ি পা চালাল।

...মাতাল ঠেঙাড়ে সোয়ামীর সঙ্গে রেশমার ছাড়াছাড়ি এক-রকম হয়েই গেছে যখন, আবুটা ওকে নিকে করে ফেলছে না কেন বাপী ভেবে পায় না। ওদের সমাজে

এটা কঠিন ব্যাপার মনে হয় না।...তবে যত সেয়ানাই হোক, আবুর ভেতরটা নরম। হয়তো ওই মাতাল কাঁদনার জন্যও ওর একটু দরদ আছে। কিংবা দুজনাই এখন ওরা জঙ্গলের চাকুরে বলে হয়তো চক্ষুলজ্জায় পেরে উঠছে না।

বানারহাটে পৌঁছে প্রথমেই নিশীথের মামা-বাড়িতে এলো বাপী। নিশীথ সেন। ক্লাসে ওর সঙ্গেই সব থেকে বেশি খাতির। নিশীথ সেন জন্ম থেকেই বলতে গেলে দিদিমার কাছে মানুষ। বাবা-মা কলকাতায়। বাবা সেখানে কবিরাজ। অন্য ভাই-বোনেরা তাদের কাছেই থাকে।

এ-বাড়িতে বাপীর আগেও যাতায়াত ছিল। শুনল, নিশীথ আগের দিনই জলপাইগুড়ি চলে গেছে। সেখানে ওর আর এক মামা থাকে। কাঠের কারবারী। ভাল অবস্থা। এখন সেখানেই উঠেছে। তারপর হস্টেলে থেকে কলেজে পড়বে। জলপাইগুড়ির মামার অনেকগুলি ছেলেপুলে। সেখানে থাকলে ওর পড়াশুনার ব্যাঘাত হবে।

ঠিকানা নিয়ে বাপী আবার বেরিয়ে পড়ল।

সমস্যার সমাধান এত সহজে হয়ে যাবে কল্পনাও করে নি। কলেজে পড়ার জন্য ও কিভাবে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে শুনে নিশীথও প্রথমে বেশ ঘাবড়েছিল। বাপীও আই. এস-সিই পড়বে। সায়েন্সের মাইনে সাত টাকা। ভর্তির ফী ছাড়াও অ্যাপারেটাসের জন্য কশান মানি পনের টাকা জমা রাখতে হয়। হস্টেলে থাকা-খাওয়া বাবদ এ-সবের ওপর মাসে আরও চল্লিশ টাকার ধাক্কা।

মুশকিল আসান এক দিনের মধ্যে ওই নিশীথই করে ফেলল। এখানকার মামাও নিশীথকে বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করার জন্য বকাঝকি করেছিল। ও রাজী হয় নি। মামা-মামীর সঙ্গে কথা বলে তাদের একচৌকি ছেলেমেয়ে অর্থাৎ দুটি ছেলে আর দুটি মেয়েকে পড়ানোর ভার বাপীর ওপর চাপিয়ে দিল। মামা-মামীকে বোঝালো ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করা বন্ধু অল্পের জন্য স্কলারশিপ মিস করেছে। এমন মাস্টার পাওয়া ভাগ্যের কথা। বিনিময়ে বাপী এখানেই থাকবে খাবে আর দশ টাকা মাইনে পাবে।

মামার কাছ থেকে ছ মাসের মাইনে আগাম পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল। পনের টাকা বাপীর কাছে আছে, বাকি যা লাগে নিশীথ ধার দিল। কলেজে ভর্তি হওয়ার সমস্যা মিটল।

কিন্তু কদিনের মধ্যেই বাপীর ক্লান্তি এসে গেল। ওর কল্পনা যে সাম্রাজ্যের সিংহাসনের দিকে ছোটে, বাস্তবটা সে তুলনায় একটা কুৎসিত ঘায়ের মতো। নিশীথের মামার ছেলে-মেয়েদের প্রতিও ভিতরটা বিরূপ। যুদ্ধের চাকরিতে লোক নেওয়া হচ্ছে। ভাবে সব ছেড়েছুড়ে ওতেই ঢুকে পড়ে কোথাও নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে কেমন হয়। আবার নিজেই জানে, সব সম্ভাবনা তাহলে ভরাডুবি হয়।

দিন-কুড়ির মধ্যে কলেজের আপিসে ডাক পড়ল। কেন, বাপী কল্পনা করতে পারে নি। বানারজুলি থেকে বাবা আপিসে চিঠি দিয়েছে তার ছেলে ওখানে ভর্তি হয়েছে কিনা। হয়ে থাকলে কোন্ ঠিকানায় আছে। জবাবে আপিসের কেরানীবাবু ওর ঠিকানা জানিয়ে দিয়েছে, আর ওকে জিজ্ঞেস করেছে, বাবা ছেলের ঠিকানা জানে না, এ কেমন কথা?

বাপী যা-হোক জবাবদিহি করে চলেছে।

মাসের শেষে ওর নামে বাবার কাছ থেকে তিরিশ টাকা মনিঅর্ডার। কুপনে শুধু

লেখা মাসে-মাসে তিরিশ টাকার বেশি পাঠানো সম্ভব নয়।

মাসে তিরিশ টাকা পাঠানোই বাবার পক্ষে কতখানি বাপী তা জানে। টাকার জন্য নয়—সেই ঘৃণা, সেই বিদ্বেষ। টাকা নিয়ে তক্ষুনি পোস্ট অফিসে ছুটল। গাঁটের পয়সা খরচ করে তিরিশ টাকাই ফেরত পাঠাল। কুপনে লিখল, টাকার দরকার নেই। কারও কাছ থেকে কোন আশা নিয়ে সে ঘর ছেড়ে আসে নি।

পরের মাসের মাঝামাঝি টেলিগ্রাম। কাউকে দিয়ে আবু তার পাঠিয়েছে। হরিবাবুর অবস্থা সংকটাপন্ন। চলে এস।

এবারে বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছে বাপীর। কিন্তু তবু অভিমান। তবু বিদ্বেষ। যাবে? যাবে না।...যাবে?

...সেই দিনই বানারজুলি পৌঁছেছে। তার পরদিন বেশি রাতে বাবা চোখ বুজল। হঠাৎ বুকের বাঁ দিকে প্রচণ্ড ব্যথায় শয্যা নিয়েছিল। তার পরেই এমন অবস্থা যে স্থানীয় ডাক্তার হাসপাতালে সরাতেও সাহস করে নি। আগের সমস্ত রাত এমন কি পরদিন বিকেল পর্যন্ত বাবার পুরো জ্ঞান ছিল। বাপী এসে দাঁড়াতেই বাবা বড় বড় চোখে ওকে দেখেছে। সেই বড় বড় চোখের জল দুই গালে গড়িয়েছে। বাবা যেন অব্যক্ত আকুতিতে ওকে সব ভুলে যেতে বলছে।

বাপীর ভিতরটা দুমড়ে ভেঙেছে। সমস্ত রাত বসে তার বুকে হাত বুলিয়েছে। বাবা তারপর পরম তৃপ্তিভরে থেকে থেকে ওকে দেখেছে।

পরদিন ভোররাতে সব শেষ। পিসী যেতেও বাপী কাঁদতে পারে নি। এখনও পারল না। পিসীর বুকে আছড়ে পড়ে যেমন কাঁদতে ইচ্ছে করেছিল, বাবার দিকে চেয়েও তেমনিই একটা ইচ্ছে ভিতর থেকে ডুকরে উঠছে। এত দিনের সব ঘৃণা আর বিদ্বেষ ফিরে ওকেই চাবুক হেনেছে।

বাবার কাজ মেটার পরেও কিছুদিন থেকে যেতে হল। এবারের বড়সাহেব সত্যি ভাল লোক। বাবার প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের বারোশো কত টাকা ওর হাতে তুলে দিলেন। মালপত্রসহ ওকে বানারহাট পৌঁছে দেবার জন্য জীপও দিলেন।

সঙ্গে আবু। বানারহাট পর্যন্ত ওর সঙ্গে যাবে। কিন্তু মুখে কথা নেই।

যেতে যেতে বাপী এবারে লোভীর মতই বানারজুলির জঙ্গল দেখছে। আবার সামনে তাকিয়েই জীপটা দাঁড়াতে বলল। পথের ধারে গাছের গুঁড়িতে বনমায়া বাঁধা। ও সামনে যেতেই গলা দিয়ে শব্দ বার করে শুঁড় উঁচিয়ে সেলাম জানালো। বাপী ওর কপালে আর শুঁড়ে বারকয়েক হাত বুলিয়ে আবার ফিরে এলো। চোখের কোণ দুটো বড় বেশি শিরশির করছে। গেল বার বানারজুলি ছাড়ার সময় এমন হয় নি।

একটু সহজ হবার জন্যেই আবুকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার বিয়েটা হচ্ছে কবে?

বিরক্ত মুখ করে আবু জবাব দিল, বিয়ের নিকুচি করেছে। শালার মরদ ঘরে থাকতে তার বিবিকে বিয়ে করা এত সোজা!

বাপী হেসে ফেলল। কিন্তু ভেতর হাল্কা হল না। আবুর সঙ্গে, এই বানারজুলির সঙ্গে, বানারজুলির জঙ্গলের সঙ্গে, বানারজুলির আকাশ-বাতাসের সঙ্গে কি-যে নাড়ির যোগ এ আগে জানত?

সেই যোগ ছিঁড়ে আজ ও ভেসে চলল। একেবারে একা।

জলপাইগুড়ি ফিরে বাপীর প্রথম কাজ ঠাঁইবদল। নিশীথের মামা-বাড়িতে ওই দু মাসের মধ্যেই হাঁপ ধরে গেছল। পড়ার সময় ছাড়াও ছোট চারটে ছেলেমেয়ে ছেঁকে ধরে থাকে ওকে। ওদের সঙ্গে খেলতে হবে, গল্প শোনাতে হবে। তাছাড়া নিশীথের মামা-মামীরও বাড়তি ফাইফরমাসের কামাই নেই।

নিশীথের সঙ্গে হস্টেলে থাকার বায়না ছিল বাপীর। হাতে সাড়ে বারোশ'র ওপরে টাকা তখন অনেক টাকা। কিন্তু মাসে সর্বসাকুল্যে পঞ্চাশ টাকা খরচ ধরলে দু' বছরের মধ্যে ও-টাকা ফুরোবে বাপীর সে-হিসেব আছে। তাই নিশীথকে বলল, খাব-দাব না, তোর মামাতো ভাইবোনদের পড়ানোর টাকা কতটা বাড়াতে পারিস দেখ, নইলে আই. এস-সি পাশ করতেই জমা টাকা শেষ হবে।

নিশীথের কানে কিছু ঢোকালে ভালই ঢোকে। কোমর বেঁধে মামা-মামীর সঙ্গে ফয়সলা করে এলো। বন্ধুর জন্য মাসে পঁচিশ টাকাই দাবী ছিল তার—একটা জোয়ান ছেলের দু'বেলার ভাত আর জলখাবার দিতে মাসে পনের টাকাও খরচ হত না নাকি মামার? যুদ্ধের বাজারে খাওয়া-পরার খরচ বাড়ছে না?

মামা-মামী মাসে কুড়ি টাকায় ফয়সলা করল। সেই সঙ্গে বিকেলের জল-খাবার যোগান দিতেও রাজি হল। ছেলেমেয়ের রেজাল্ট ভালো হলে পরের বছরে আরো মাইনে বাড়ানোর কড়ার করে নিশীথ হস্টেলে ফিরল। এবারে আর এক প্ল্যান মাথায় ঘুরছে তার। এখন পুঁজি থেকে মাসে তিরিশ টাকা খরচ হলেও দু' বছরে আই. এস-সি শেষ করার পর বি. এস-সি পড়ার পুরো টাকা হাতে থাকে না। তাই বাপীকে পরামর্শ দিল, তোর ওই কামানো টাকা নিয়ে প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা কর, কলেজের মাইনে সাত টাকা আর হস্টেলের সীট-রেন্ট ছ' টাকা যদি মাপ হয়ে যায়, তাহলে বি. এস-সি পাশ করা পর্যন্ত আর ভাবনা থাকবে না।

কিন্তু বাপী রাজি হল না। এক পিসীর কাছে ভিন্ন এযাবৎ আর কারো কাছে মুখ ফুটে কিছু চায় নি। এ-প্রস্তাব সরাসরি ভিক্ষে চাওয়ার মতো! কিন্তু নিশীথ নাছোড়বান্দা। হস্টেলের সুপারিনটেন্ডেন্টকে ধরে ওর সীট-রেন্টের ছ'টা টাকা বাঁচিয়ে ছাড়ল।

বাপীর এতেও খারাপ লাগল খুব। তবে এবারে অনেকটা নিশ্চিন্ত বটে। আবু রব্বানী বানারজুলির বাড়িটা কি করবে কে জানে। বাপী ওটা ওকে বিক্রী করে দিতে বলেছিল। শুনে রাগ-রাগ মুখ করে আবু বলেছে, তুই কি একেবারে বিবাগী হতে যাচ্ছিস নাকি —ছোট-বড় দেড়খানা কাঠের ঘর বিক্রী করে কি ঐশ্বর্য পাবি শুনি? তার থেকে বাপ আর পিসীর স্মৃতি থাক না—

বলেছে ঠিকই। তবে দেড় ঘরের সামনে পিছনে আর পাশে জমি খানিকটা আছে। কিন্তু তারও কি-বা দাম তখন। পিসীর মুখে গল্প শুনেছিল, বাবা যখন ওখানে ঘর তুলেছে, সর্বসাকুল্যে খরচ পড়েছিল নব্বুই টাকা। জমির দাম ধরে। কাঠ জঙ্গল থেকে ওমনি পেয়েছিল বাবা। শুধু ঘরামি আর মিস্ত্রীর খরচ। তারাও আবার জঙ্গলের খাতিরের কন্ট্রাকটারের লোক।

আবুর মন বুঝে বাপী ওকে ভাড়াটে পাওয়া যায় কিনা দেখতে বলে এসেছে। মাসে

পাঁচ-সাত টাকা যা মেলে। ও-সব জায়গায় তাও পাওয়া সহজ নয় জানে। যতদিন না ভাড়াটে জোটে আবুকে বাড়িটা দেখাশুনা করতে বলেছে ; আর সম্ভব হলে রাতে ওখানে ওকে থাকতে বলেছে।

খুব একটা বড় ভাবনা বাপীর মাথার ওপর কিছু নেই এখন। তবু ভালো লাগে না। বাপীর কিছুই ভালো লাগে না। না নিজে পড়তে, না নিশীথের মামাতো ভাইবোনগুলোকে পড়াতে। বয়েস সবে সতের এখন। কলেজে ওর বয়সী বা ওর থেকে বড় ছেলেরা কত রকমে হৈ-চৈ ফুর্তিতে দিন কাটায়। কিন্তু বাপীর ভিতরের বয়েসটা ওদের সক্কলকে ছাড়িয়ে ঢের এগিয়ে গেছে। ও-সব খেলাধুলো হৈ-চৈ ওর জন্য নয়। তার থেকে নিরিবিলি ভালো লাগে। ভাবতে ভাল লাগে। ভাবনার মধ্যে অনেক বড় হতে ভাল লাগে। বয়সে নয়, ক্ষমতায়। এমন ক্ষমতা, যার কোনো শেষ নেই। তল-কূল নেই। কেরানীর ছেলে বলে যারা নাক সিঁটকেছে, যারা চোখ তাকিয়ে দেখে নি, তাদের চোখ ঠিকরে যায় এমন বড়।

ছুটির দিনে বা অন্য দিনেও ফাঁক পেলেই বিকেলের দিকে একলা দু' আড়াই মাইল পথ হেঁটে করলা নদী বা তিস্তার ধারে এসে বসে থাকে। করলার থেকে তিস্তার দিকটা বেশি নিরিবিলি। সামনে সরু খালের মতো তিরতিরে জল। হাঁটুরও আধখানা ডোবে না। তার ওধারে ধু-ধু বালুর চর। তার শেষে ডুয়ার্স-এর জঙ্গলের রেখা। সতৃষ্ণ চোখে বাপী সেই সবুজ রেখার দিকে চেয়ে থাকে। তখন বানারজুলি ওকে ভয়ানক টানে। খাল পেরিয়ে কতদিন সেই চড়ার ওপর দিয়ে ওই জঙ্গলের রেখা লক্ষ্য করে কতদূর হেঁটে চলে গেছে ঠিক নেই। কিন্তু ওই সবুজ রেখা ঠিক তেমনি দূরে।

মাথার ওপর দিয়ে আজকাল ঘন ঘন এরোপ্লেন উড়ে চলে যায়। বাপী কাগজ পড়ে রোজ। পৃথিবীর যুদ্ধ এখন ঘরের কোণে। কিন্তু মাথার ওপর এরোপ্লেন দেখলে ওর যুদ্ধটুদ্ধ মনে থাকে না। মনটা ঢের ওপর দিয়ে উড়ে চলতে থাকে।

...বিষম চমকের দিনের সেই শীতের বিকেলেও বাপী তিস্তার পারে একলা বসে। যুদ্ধের বোমা কলকাতায় পড়েছে। রেডিও মারফৎ সর্বত্র সেই গায়ে কাঁটা দেওয়া খবর এসে গেছে। অনেকে বলাবলি করছে জাপানীদের দলে ভিড়ে সুভাষ বোসের এই কীর্তি। তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ নাকি ভারতের কোন কোন জায়গা দখল করেছে। এবার বার্মা থেকে কলকাতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এটা তারই সূচনা।

দিকে দিকে আতঙ্ক। এমন কি এই জলপাইগুড়িতেও। কিন্তু বাপীর ভিতরে আতঙ্কের বদলে অন্য রকম উত্তেজনা। আর মাথার ওপরের ওই এরোপ্লেনের মতো তার উদ্ভট কল্পনা পাখা মেলে দিয়েছে। সুভাষ বোস আর যা-ই করুক দেশের ক্ষতি কক্ষনো করতে পারে না। বোমা ফেললেও না। গত বছরের জানুয়ারিতে ওই লোকের ইংরেজের তাঁবেদার পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বাড়ি থেকে উধাও হবার খবর ছড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বাপীর বুকের তলায় যে আনন্দের বান ডেকেছিল আজও মনে আছে। তখন ও বানারজুলি চা-বাগানের ক্লাবের বারান্দায় বসে রোজ সন্ধ্যায় খবরের কাগজ পড়ত। এ খবর পড়ে আবুর সঙ্গে পরামর্শ করেছিল, সুভাষ বোস যদি পালিয়ে এই বানারজুলির জঙ্গলেই এসে উপস্থিত হয়, তাহলে কেমন করে ও আর আবু তাকে এই জঙ্গলের মধ্যেই সকলের চোখের আড়ালে রাখবে। বাপীর তখনো ধারণা, পালানোর সব থেকে ভালো জায়গা একমাত্র জঙ্গল।

এই সুভাষ বোস নাকি ভারতের কোনো কোনো মাটিতে স্বাধীনতার পতাকা তুলেছে—ফিসফিস করে এ কথাও কেউ কেউ বলে। বাড়িতে রেডিও আছে এমন বড়লোকের ছেলেও কলেজে আছে। তাছাড়া সৈন্য বিভাগের দুই একজন হোমরা-চোমরার আত্মীয়ও দু'পাঁচ জন আছে। এরাই বলাবলি করে।

বাপীর বদ্ধ বিশ্বাস, কলকাতায় বোমা পড়েছে এবং আরো পড়তে পারে—সে শুধু শত্রু নিপাতের জন্য। যারা দেশের শত্রু তাদের ছাড়া আর কারো কোনো ক্ষতি হবে না বা হতে পারে না। কলকাতা কেমন, কলকাতা কি তাও বাপী জানে না। কিন্তু কলকাতা শুনলেই কতগুলো মুখ সামনে ভেসে ওঠে। কলকাতায় থাকুক না থাকুক, ওটা যেন তাদেরই খাস বাসের জায়গা। তা ছাড়াও বাপীর বিশ্বাস তারা কলকাতাতেই আছে। অতএব বোমায় যে শত্রুরা নিপাত হয়েছে বা হবে তাদের মধ্যে ওই চেনা মুখ কটা আছে।...সন্দীপ নন্দী তার মেমসাহেব মনোরমা নন্দী আর তাদের ছেলে সুদীপ নন্দী। বাপীর এই কল্পনায় ওরা দেশেরও শত্রু। কলকাতার এই বোমায় বা পরের বোমায় তারা সব শেষ হয়ে গেলে থাকল শুধু একজন। মিষ্টি।

কল্পনায় সেই অবস্থায় মিষ্টিকে মুখোমুখি দেখছে বাপী আর হাসছে। মিষ্টিও দেখছে ওকে। এখন এক বাপী ছাড়া ওর কোনোদিকের কেউ নেই। এবারে বাপী কি দণ্ড দেবে ভেবে না পেয়ে ওর চোখেমুখে এত ভয়!

বাপীর তাই আরো বেশি হাসি পাচ্ছে। ও-যে কত উদার হয়ে একলার জগৎ থেকে মিষ্টিকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে এসেছে তা জানবেই বা কেমন করে, বিশ্বাসই বা করবে কি করে।

মাথার ওপর গোঁ-গোঁ শব্দে আবার একটা এরোপ্লেন উড়ে গেলে বাপীর চমক ভাঙল। সামনে তিস্তার খাল। তারপর ধূ-ধূ বালুচর। তার ওধারে ডুয়ারস-এর বনের রেখা।

বাপী হাসছে আবারও। একটা বয়েস ওর অন্য ছেলেদের থেকে ঢের এগিয়ে গেছে বটে, কিন্তু একই সঙ্গে আর একটা বয়েস কল্পনার জগতের মধ্যে আটকে আছে। নইলে কোথায় বোমা আর কোথায় মিষ্টি।

জলপাইগুড়ি এসে বানারহাটের একজন অসম বয়সী সঙ্গী পেয়েছে বাপী। এখন সঙ্গী, আগে ছিলেন সেখানকার স্কুলের ড্রইং মাস্টার। নাম ললিত ভড়। বছর চল্লিশ বয়েস। ম্যাট্রিক পাশ। আর্ট স্কুল বা কলেজের ডিপ্লোমা ডিগ্রি কিছু নেই। নিজগুণে আর্টিস্ট। তাই কোনো সরকারী স্কুলে চাকরি জোটেনি। বেশ বড়সড় মোটা মানুষ। পান-খাওয়া কালো ছোপ ধরা দাঁত। একমাথা চুল আর একগাল খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। তিন মাসে একবার চুলে কাঁচি পড়ে, আর মাসে দুবার গালে ক্ষুর। আঁকার থেকেও ললিত ভড়ের শাস্ত্রজ্ঞান বেশি। চুল-দাড়ি কাটা না কাটা নিয়েও দু'পাঁচটা সংস্কৃত শ্লোক ঝেড়ে দিতে পারেন। বানারহাটের স্কুলের সব ক্লাসেই একটা বেত নিয়ে ঢুকতেন। কিন্তু সেই বেতের ঘা একমাত্র টেবিলের ওপর ছাড়া কখনো হয়তো কারো গায়ে পড়েনি। বেত হাতে ক্লাসে ঢোকেন কেন জিজ্ঞাসা করলে নিজেই বলতেন, ওটা পারসোনালিটি কমপ্লেকস। বুঝলি কিছু?

বুঝুক না বুঝুক, ছেলেরা মাথা নাড়ত, বোঝেনি। ললিত ভড় তখন কালো ছোপ-ধরা দাঁত বার করে ধমকের সুরে বলতেন, সব তো বুঝে ফেলেছিস এখন এটা বাকি—বড় হ', বুঝবি।

জলপাইগুড়িতে তাঁর পৈতৃক ভিটে। বাড়ি বলতে দু'খানা খুপরি কাঠের ঘর। এককালে এই জলপাইগুড়ির কোথায় নাকি তাঁদের ঘর-বাড়ি আর অনেকটা জমিজমা ছিল। বন্যায় সব খেয়ে দিয়েছে। বানারহাটে থাকতেই ভদ্রলোক এখানকার কোনো বে-সরকারী স্কুলে চাকরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই চাকরি এতদিনে হয়েছে।

বানারহাটের স্কুলের ছেলেরা ললিত ভড়কে বলত পেটুক ভড়। না, কেউ তাঁকে পেটুকের মতো খেতে দেখেনি কোনদিন। তবু তাঁকে পেটুক বলার পিছনে একটা মজার ব্যাপার আছে। আঁকার হাত পরিষ্কার। বোর্ডে যা এঁকে দেন ছেলেদের তাই আঁকতে হয়। কিন্তু কোনদিন কেউ তাঁকে ফুল লতা পাতা গাছগাছড়া নদী পাহাড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিষয়ে কিছু আঁকতে দেখে নি। তাঁর আঁকার মধ্যে খাবার বিষয় থাকবেই। আম, আতা, কলা, পেঁপে, আঙুর, বেদানা, পেয়ারা, জাম-জামরুলের থোকা—লাউ, কুমড়ো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, আলুর ঝুড়ি, বড় বড় টোমাটো, ফলন্ত শিম গাছ, বেগুন গাছ—হাঁড়িভরতি রসোগোল্লা বা দই, ডিশভরতি সিঙ্গাড়া বা তালশাঁস সন্দেশ—দশ বিশ সের ওজনের রুইকাতলা, পোলাউ কালিয়া পঞ্চব্যঞ্জনের সামনে বসা তৃপ্তমুখ ভোজনবিলাসী—কথামালার সেই লোলুপ নেকড়ের সামনে নধর মেষশাবক, নাগালের বাইরে থোকা-থোকা আঙুর ডালের নিচে শেয়াল, কাকের মুখে মাংসের টুকরো দেখে ধূর্ত শেয়ালের চাটু কথা—এইসব তাঁর আঁকার বিষয়। সর্ব ব্যাপারে কিছু না কিছু খাওয়ার যোগ থাকবেই।

মাস দেড়েক আগে রাস্তায় একদিন হঠাৎ দেখা তাঁর সঙ্গে। বাপীকে দেখে আনন্দে আটখানা। ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতোই কাঁধ জড়িয়ে ঘরে নিয়ে গেলেন। বানারজুলিতে গরিবদের কুঁড়েঘর তো কতই দেখেছে বাপী। নিজেদের অবস্থাও সেই রকমই ছিল। কিন্তু ঘুণ-ধরা এই কাঠের খুপরি ঘর দুটোয় এসেই বাপীর মনে হয়েছিল, দারিদ্র্য এখানে একেবারে হাঁ করে আছে।

হাঁক দিয়ে স্ত্রীকে ডাকলেন। দুটো ছেলে ঘরে এলো। পরনে হাফপ্যান্ট, আদুড় গা। আট আর বারোর মধ্যে বয়েস। দরজার কাছে ময়লা শাড়ি জড়ানো বছর চোদ্দর একটা মেয়ে। এই ছেলে দুটো আর মেয়েটা বেশ লম্বা আর ফর্সাও—কিন্তু গায়ে কারো মাংস নেই। শুধু হাড়গুলো চামড়ায় মোড়া। এত রোগা ছেলে-মেয়ে বাপী আর দেখেইনি বোধ হয়।

মাস্টারমশাইর বউ এলেন। উনিও হাড়-চামড়া-মোড়া লম্বা ফর্সা কাঠি একখানা। ললিত ভড় বললেন, আমার বানারহাট স্কুলের ছাত্র বিপুল, ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করে কলেজে পড়তে এসেছে—দেখ তো ওকে দেবার মতো ঘরে কিছু আছে কিনা।

মুখে হাসিও না রাগও না, একবার ওর দিকে তাকিয়ে ভড়-গিন্নী কলের পুতুলের মতো চলে গেলেন। বাপীর মুখের দিকে চেয়েই ললিত ভড় বললেন, থাক, তোকে আর লজ্জা পেতে হবে না, স্কুলে তোরা আমাকে পেটুক-ভড় বলতিস আমি জানি না নাকি! কিছু খেতে না দিলে মনে মনে ঠিক নিন্দে করবি—

লাল-কালো দাঁত শুধু না, খোঁচা খোঁচা দাড়ির ফাঁক দিয়েও খুশি ঠিকরে পড়ছিল। এর পরেই সোৎসাহে ওকে শোনাতে লাগলেন, হাতে কিছু টাকা এলেই পিছনের জমিটুকুতে কি-কি আনাজ লাগাবেন—ভালো মাটি, খাসা তরিতরকারি হবে।

চকিতে রেশমা আর দুলারির কথা মনে পড়ে গেছল বাপীর। অন্ধ ছট্টু মিয়ার ঘরের

পিছনে তারাও তরকারির বাগান করেছিল। কিন্তু তাতে অভাব মেটেনি। তারা এখন সাপের খেলা দেখায়।

একটা মাঝারি সাইজের ডালায় নুন আর গোলমরিচ ছড়ানো তেলে ভাজা চিঁড়ে এনে সামনে রাখল সেই রোগা মেয়েটা। কিছু সেদ্ধ মটরশুঁটিও আছে ওতে।

—খা-খা—খাসা জিনিস। ললিত ভড় নিজেও ডালা থেকে একমুঠো তুলে নিলেন।

সত্যি মুখরোচক। রোগা ছেলে দুটো হাঁ করে দেখছে। বাপী কাছে ডাকতে ওরাও এসে খেতে বসে গেল। মেয়েটা আবার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। বাপী বলল, তুমিও চারটে নাও না, আছে তো—

ললিত ভড় ডাকলেন, লজ্জা কি রে, আয় আয়। বাপীকে বললেন, আমার মেয়ে কুমকুম, ও-ই বড়, ক্লাস এইট-এ পড়ে—খুব ভালো মেয়ে।

কিন্তু ভালো মেয়ে এলো না। অন্য ঘরে চলে গেল। বাপী বিমনা একটু।...মিষ্টির থেকে বছরখানেকের বড় হতে পারে মেয়েটা। কিন্তু কৌতূহল হওয়া দূরে থাক, মেয়ে বলেই মনে হয় না।

চিঁড়ের ডালার অবস্থা দেখে হাসি পাচ্ছিল, আবার বুকের ভিতরে কেমন করছিলও। কথা বলতে বলতে ললিত ভড় চিঁড়েভাজা তুলে নিচ্ছেন। ছেলে দুটো চটপট খাওয়া সারছে। ওই চিঁড়ের ডালায় বাপী আর একটিবার মাত্র হাত দিয়েছে। তার মধ্যে ডালা খালি।

ললিত ভড়ের শিল্প-কলায় সর্বদা ভালো ভালো খাবার জিনিস থাকে কেন বাপী তা এতদিনে বুঝতে পারছে।

মনের মতো শ্রোতা পেলে ড্রইং মাস্টার ললিত ভড় সব থেকে খুশি। ভালো খাবার পাওয়ার থেকেও কিনা তা অবশ্য বাপীর যাচাই করার সুযোগ হয় নি। এই তিস্তার পারেই মাঝে মাঝে দেখা হয় তাঁর সঙ্গে। লম্বা হাঁটার ঝোঁকে অনেক দিনই এদিকে চলে আসেন। ছেলেমেয়ে বউ যত হাড়-চামড়া-সার হোক, তাঁর দেহখানা লম্বার ওপর নাদুসনুদুস।

দেখা হলে এ-সময় যুদ্ধের কথা ছাড়া আর কি কথা হবে। তখন যুদ্ধ নিয়েই অনর্গল বলে যান ললিত ভড়। মেজাজ তিরিক্ষি হতেও সময় লাগে না।—ওসব যুদ্ধ-টুদ্ধ হল রাজরাজড়ার ব্যাপার, বুঝলি? ও আমাদের কিছু নয়। আমাদের শুধু পেটের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ লেগেই আছে। আমাদের গোলাম বানিগে রেখে ইংরেজ এই যুদ্ধটাই বেশ করে শিখিয়েছে। ইচ্ছে করলেই ওরা বেশি দিতে পাবে, কিন্তু দেবে কেন? ভরা পেটে আর গোলাম হতে চাইবে কেউ? ইস্কুল-কলেজের বড় বড় ছেলেগুলোকেও এটা বোঝাতে গেলে ওরা আবার বোকার মতো হাসে। ওদের কাছে আমি সদৃশপ্রাজ্ঞ, মানে যেমন চেহারা, তেমনি বুদ্ধি।

এই প্রসঙ্গে লাল-কালো দাঁত আর দাড়িগোঁফেঝাই মুখ খিঁচিয়ে একদিন বলেছিলেন, শ্লোক আছে, স্বদেশের ঠাকুর, বিদেশের কুকুর—মানে জানিস? স্বদেশে যার সম্মান, বিদেশে তার অনাদর। আমাদের ঠিক উল্টো। ইংরেজ বিদেশে এসে ঠাকুর আর আমরা স্বদেশে থেকে কুকুর। আমাদের মরণ ভাগাড়ে, অপরং বা কিং ভবিষ্যতি—যুদ্ধ লাগুক, থামুক, আমাদের আবার ভবিষ্যৎ কি?

পরের বছরেও ড্রইং মাস্টার পেটুক-ভড়ের মুখে হা-হা হাসি দেখেছে বাপী। কিন্তু

তাঁর কথাবার্তা আর শ্লোকের ধার আরো ঝাঁঝালো। কলকাতার কাগজগুলোতে তখন সমস্ত চব্বিশ পরগণা আর বাংলার বহু জায়গা জুড়ে দুর্ভিক্ষের বার্তা। চালের বস্তা সব নাকি পাখা মেলে উবে যাচ্ছে। ডাল তেল নুন মশলাও উধাও। ভাত ছেড়ে ভাতের একটু ফ্যানের জন্য দিকে দিকে আর্তনাদের খবর। দুর্ভিক্ষ শব্দটাই শুধু শোনা ছিল, ব্যাপারখানা কি বাপীর জানা ছিল না। এখনো খুব স্পষ্ট নয়। কারণ উত্তর বাংলা মোটামুটি ধান-চালের দেশ। কিন্তু অন্য প্রান্তের দুর্ভিক্ষের বাতাসে এখানেও অনেক কিছুর দর চড়া। ত্রাসে যে যতটা পারছে ঘরে এনে মজুত করছে। পড়াতে গিয়ে নিশীথের মামাবাড়িতেই তো কত চালের বস্তার ঠিকি দেখেছে বাপী।

এই প্রসঙ্গে পেটুক-ভড়ের রুদ্রমূর্তি এক এক সময়।—রাশি রাশি লোক মরছে বুঝলি? খিদের জ্বালায় মানুষগুলো পিঁপড়ের মতো পটাপট মরে যাচ্ছে। ওরা হিসেব দিচ্ছে পনের লক্ষ, কিন্তু কম করে পঁয়ত্রিশ লক্ষ হবে, শুনে রাখ আমার কাছে। সরকারী ফিগার চ্যালেঞ্জ করে কাগজে ওই খবর বেরিয়েছে। দুর্ভিক্ষ অল্পকাল, স্মরণ থাকে চিরকাল—সেই চন্দ্রগুপ্তর আমল থেকে এ পর্যন্ত কত কোটি লোক দুর্ভিক্ষে মরেছে এই দেশে তাও আমি হিসেব করে বলে দিতে পারি। কিন্তু আগের কালে পথঘাট ছিল না, গাড়িঘোড়া ছিল না—যেখানে দুর্ভিক্ষ হত পটাপট লোক মরত। কিন্তু এখন হয় কেন? এখন মরে কেন? আগের কালে দুর্ভিক্ষ তাড়ানো ছিল রাজধর্ম—রাজরাজড়ারা সুফলার ধান আগেকার জন্য মজুত রাখত আর বিলোতো। এখন কে মজুত করেছে? কারা বিলোচ্ছে? আমি ছবির মধ্যেও খাবার যোগান দিই, কিন্তু এই রাজরাজড়ারা কি করে?

আর একদিন শুকনো মুখ দেখেই বাপীর মনে হচ্ছিল ভদ্রলোকের কিছু খাওয়া হয় নি। সকাল থেকেই খাওয়া হয় নি কিনা কে জানে। কথার ফাঁকে দু'বার উঠে তিস্তার ওই তিরতিরে জলেই কুলকুচি করে এসেছেন।

—শাস্ত্রমতে দুর্ভিক্ষ কেন হয় জানিস? ঈতির দোষে। 'ঈতি' কি জানিস? ঈতি হল অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি পঙ্গপাল মূষিক আর যুদ্ধ। এই দুর্ভিক্ষে ঈতির প্রথম চারটেই বাদ। কেবল যুদ্ধ। যুদ্ধ মানে কি? মানুষের উপদ্রব আর মানুষের লোভ। বুঝলি? কিন্তু আমার কথা কে শোনে—আমার হল গিয়ে 'দারিদ্র্যদোষোগুণরাশিনাশী'—অভাবের আগুনে সব গুণ পুড়ে ছাই। স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছেলেদের সেদিন এই দুর্ভিক্ষটা কি আর কেন তাই বলছিলাম—পাশ দিয়ে যেতে পণ্ডিতমশায় এই টিপ্পনী কেটে গেল।

ফেনা-ওঠা শুকনো মুখ আবার তিস্তার জলে ধুতে গেলেন। বাপী পকেটে হাত দিল। একটা আধুলি আছে জানে। পারতপক্ষে খরচ করে না।

মুখ ধুয়ে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।—চলুন।

খেয়াল না করেই ললিত ভড় ওর সঙ্গে চললেন। মুখেরও কামাই নেই—আসল কথা হল টাকা, বুঝলি? টাকা থাকলেই জ্ঞান বুদ্ধি মান সম্মান প্রতিপত্তি সব থাকল তোর। আর টাকা না থাকলে নিজের জনেরাও চিবুনো ছিবড়ের মতো ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তোর এখনো কেউ নেই বলেই বলছি এটা মনে রাখিস—নইলে ঠকতে হবে।

লোকালয়ে এসে বাপী একটা জিলিপি ভাজা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। রাস্তার মধ্যে ফুরফুরে টাটকা মুড়ি।—গরম জিলিপি আর মুড়ি খেতে ইচ্ছে করছে মাস্টারমশাই।

এবারে বাস্তবে ফিরলেন ললিত ভড়। থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন ওর সঙ্গে।

জিলিপি-ভাজা বড় কড়ার দিকে চেয়ে চোখ দুটো একটু চকচক করে উঠল কিনা বাপী জানে না।

—আজ থাক, তোকে আর একদিন খাওয়াব'খন।

বাপী জোর দিয়ে বলল, আজ আমি। একদিন আমি আপনাকে খাওয়াতে পারি না? পকেট থেকে আধুলিটা বার করে দেখালো, এই দেখুন পয়সাও এনেছি—

দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। ললিত ভড় পিছনে। আমতা আমতা করে বললেন, তোর যখন এত ইচ্ছে, একটা কাজ কর তাহলে...কিছু বেশিই নে, বাড়ি নিয়ে গিয়ে খাওয়া যাবে...ওরাও মুড়ি আর গরম জিলিপি খুব ভালবাসে। আর, আমার জন্যে এক পয়সার পান কেন, মুখটা কেমন হয়ে আছে।

চার আনায় মস্ত এক ঠোঙা মুড়ি, পনের পয়সার তিরিশটা গরম জিলিপি আর দু'হাত দূরের দোকান থেকে এক পয়সার দুটো পান কেনা হল। একটা পান ললিত ভড় তক্ষুনি মুখে পুরে দিলেন।

কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি এসে কি যে আবার দরকারী কাজ পড়ে গেল তাঁর বাপী বুঝল না। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললেন, আচ্ছা তুই যা, আমি একটা কাজ সেরে এখনই আসছি—আমার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না, তোরা শুরু করে দে—

বাপী কিছু বলার অবকাশ পেল না, তার আগেই হন হন করে উনি আর একদিকে চলে গেলেন।

ওঁর বাড়িতে পা দেবার পর ব্যাপারখানা বোঝা গেল। প্রথম দিনের পর বাপী এযাবৎ আরো চার-পাঁচ দিন এখানে এসেছে। ভড়-গিন্নী কাছে আসেন না, মেয়ে আর ছেলে দুটোর সঙ্গে কথাবার্তা হয়।

ওকে দেখে রোগা পাংশুমূর্তি কুমকুম এগিয়ে এলো। পিছনে ভাই দুটো। হাতে মুড়ির ঠোঙা আর জিলিপির ঝুড়ি দেখে ছেলে দুটোর চোখে মুখে চাপা উল্লাস। পারলে ছিনিয়ে নেয়।

কুমকুম জিজ্ঞাসা করল, এ-সব কেন?

আমতা আমতা করে বাপী বলল, মাস্টারমশাই পাঠালেন, কোথায় একটু কাজে গেলেন, এখুনি আসবেন—

হাত বাড়িয়ে কুমকুম জিলিপি আর মুড়ির ঠোঙা নিলে আর সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে বলে উঠল, সমস্ত দিন বাড়িসুদ্ধ সকলকে উপোস করিয়ে এখন জিলিপি পাঠালেন—

থতমতো খেয়ে জিজ্ঞাসা করল, বাড়িসুদ্ধ সকলে উপোস কেন?

—মাসের শেষে মায়ের বাক্স থেকে বাবা দশ টাকা চুরি করে ধরা পড়েছে তা তোমাকে বলেনি বুঝি! মায়ের জেরার চোটে ধরা পড়েছে। দশ-দশটা টাকা কলকাতায় কোন্ দুর্ভিক্ষের ফাণ্ড-এ মনি-অর্ডার করে পাঠানো হয়েছে। রাগ করে মা আজ সমস্ত দিন নিজেও রাঁধেনি, আমাকেও রাঁধতে দেয়নি—দুপুর থেকে সব্বার উপোস চলছে।

বাপী পালিয়ে এসেছে।

আবার একটা অদম্য ইচ্ছা মাথায় নতুন করে চেপে বসেছে। অনেক অনেক বড় না হলেই নয়। অনেক—অনেক টাকা রোজগার না করলেই নয়।...অপমানের শোধ নেবার

জন্য অনেক বড় হওয়া দরকার, আর অনেক টাকা দরকার। আবার ললিত ভড়ের মতো মানুষের জন্যেও দরকার।

পড়াশুনা ভালো লাগুক না লাগুক, পরীক্ষায় পাশ না করলে চলবে না, এটা ভালোই জানে। নিশীথের সঙ্গে একঘরে থাকে তাই বই-এর সমস্যা নেই। ফাইনাল পরীক্ষার চার-পাঁচ মাস মাত্র বাকি আর। নিশীথের ঘুম ভাঙার আগেই ও পড়াশুনো কিছুটা সেরে রাখে।

বিষম হাঁপাতে হাঁপাতে ললিত ভড়ের বারো বছরের বড় ছেলেটা ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলো। সমস্ত রাস্তা ছুটেই এসেছে বোধ হয়। দু' চোখ কপালে।—বাপীদা শীগ্গির দিদি তোমাকে যেতে বলল, একপাল পুলিশ এসে আমাদের ঘর তছনছ করছে, বাবাকে তারা ধরে নিয়ে যেতে এসেছে।

বাপী হতভম্ব কয়েক মুহূর্ত। তারপর বুকের মধ্যে কাঁপুনি। প্রথমেই ক'মাস আগে গিন্নীর বাক্স থেকে মাস্টারমশাইর দশ টাকা চুরি করে দুর্ভিক্ষের ফাণ্ডে পাঠানোর ব্যাপারটা মনে পড়ল। এবারে কি বাড়ির বাইরে কোথাও কিছু করে বসল নাকি ভদ্রলোক!

কিন্তু এই বাচ্চা ছেলে কি আর বলতে পারবে; জামা গায়ে চড়িয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। নিশীথ তখনো ঘুমুচ্ছে।

...বাড়িতে অনেক পুলিশই বটে। পাড়ার মানুষেরা সব দূরে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। কেউ এগিয়ে আসতে ভরসা পাচ্ছে না। ছেলেটার হাত ধরে বাপী পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো। ললিত ভড়কে বাইরে নিয়ে আসা হয়েছে। এবারে পুলিশ ভ্যানে তোলা হবে।

বাপীকে দেখে লাল-কালো দাঁত বের করে অদ্ভুত বোকার মতো হাসলেন ললিত ভড়। সমস্ত ব্যাপারখানা যেন তাঁর কাছেও দুর্বোধ্য। বিড়বিড় করে বললেন, কি ব্যাপার কিছু বুঝছি না, তুই এদের একটু দেখিস—

একজন পুলিশের ভদ্রলোক বাপীর দিকে এগিয়ে এলো হঠাৎ। গম্ভীর কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল, হু আর ইউ?

—বিপুল তরফদার।

—ইনি কে হন? আঙুল তুলে ললিত ভড়কে দেখালেন।

—আমাদের মাস্টারমশায় ছিলেন।

—কি করা হয়?

—আমি? কলেজে পড়ি...।

—কোথায় থাকা হয়?

—কলেজের হস্টেলে।

লোকটা ফিরে গেল। তার দু'মিনিটের মধ্যে ললিত ভড়কে ভ্যানে তুলে নিয়ে ওরা চলে গেল। আশপাশের সকলে ছুটে এলো। সকলের মুখে এক কথা, হাটে বাজারে লেকচার দিয়ে বেড়ানোর ফল। চেঁচামেচি করে ছেলেগুলোর কান বিষানোর খবর কি ওরা রাখে না—আগে ধরে নি সেটাই আশ্চর্য।

ললিত ভড়ের ঘরে এলো বাপী। দুটো ঘরই লণ্ডভণ্ড করে রেখে গেছে ওরা। কাগজপত্র ছড়ানো। বিছানা-টিছানাগুলো মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। বাক্স-প্যাঁটরা হাঁ-করা খোলা। রোগা মেয়ে কুমকুম মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছে। হাড় বার করা ছেলে দুটোর

চোখে ভয় আর বিস্ময়। ভড়-গিন্নীরই শুধু তেমনি কলের পুতুলের মতো মুখ।

পুলিশের এক অফিসারের ছেলে কলেজে পড়ে। নিশীথের সঙ্গে তার বেশি ভাব। নিশীথকে বলে সেই ছেলের মারফৎ খোঁজ নেবার পর জানা গেল, পুলিশের চোখে 'বিপজ্জনক' মানুষের লিস্ট-এ নাকি ললিত ভড়ের নাম উঠেছে। পোলিটিকাল প্রিজনারদের এখন আর শীগ্‌গির ছাড়া পাবার কোনো আশা নেই।

পরের দশ-পনের দিনের মধ্যে বাপী অনেকবার ললিত ভড়ের বাড়ি এসেছে। কিন্তু ভড়-গিন্নীর কলের মুখখানা মনে পড়লে আসতে ইচ্ছে করে না। ললিত ভড়ের খবর নেবার চেষ্টাও তলায় তলায় করেছে। একদিন শুনল, তাঁকে জলপাইগুড়ি থেকে বাইরে কোথায় চালান করে দেওয়া হয়েছে।

সেদিনই তাঁর বাড়ি এসে দেখে বাইরে থেকে ঘর তালাবন্ধ। পাশের বাড়িতে খবর নিয়ে জানল, ছেলেমেয়ে নিয়ে ভড়-গিন্নী বাড়ি তালাবন্ধ করে দিনাজপুরে চলে গেছেন। সেখানে তাঁর ভাইয়ের বাড়ি।

এ-খবর জানার পর বাপী হালকা বোধ করেছে একটু। ছেলে দুটো, মেয়ে আর কলের মুখ ভড়-গিন্নীর ভাবনায় ওর গলার কাছে কি দলা পাকিয়ে থাকত।

সেই থেকে বাপীর উপচে-ওঠা গলগলে ঘৃণা আর বিদ্বেষের পাকে আর একটা নাম জড়িয়েছে।

সে-নাম পুলিশ।

আই. এস-সি পাশ করল। তারপর আরো নিঃসঙ্গতার মধ্যে পরের দুটো বছরও কেটে গেল। আই. এস-সি পাশ করে নিশীথ কলকাতায় পড়তে চলে গেছল। মেডিকেল কলেজে জায়গা না পেয়ে সে কলকাতায় বি. এ পড়া শেষ করেছে। মাঝেমাঝে চিঠি লেখে। বি. এ. পাশ করার খবর দিয়েছে। এদিকে বাপী বি. এস-সি পাশ করেছে।

নিশীথের মামা-বাড়িতে চার ছেলেমেয়ে পড়ানোয় ছেদ পড়েনি। মাইনে পঁয়তিরিশ টাকায় উঠেছে। এক মাস দেড় মাসের ছুটিছাটায় হস্টেল বন্ধ থাকলে নিশীথের এই মামা-বাড়িতেই এসে থাকতে হয়, খেতে হয়। তখন মাইনে আবার কুড়ি টাকায় নেমে আসে। ফোর্থ ইয়ারের শুরু থেকে বাপী স্কুলের উঁচু ক্লাসের তিনটে ছেলেকে একসঙ্গে পড়ানোর কাজ জোটাতে পেরেছিল। বিকেলে হস্টেলে এসে ঘড়ি ধরে দেড় ঘণ্টা পড়ে যেত। অঙ্ক, অ্যাডিশানাল অঙ্ক আর মেকানিক্‌স- এই তিন বিষয়। এখনো পড়ে। দশ টাকা করে দেয়। তিনজনে তিরিশ টাকা। ফোর্থ ইয়ারে উঠে বাপীর ব্যাংকের বাকী শ'আড়াই টাকা আর খরচ হয় নি। মুশকিল দাঁড়িয়েছে বি. এস-সি পরীক্ষার পর। সেই তিন ছেলের একজনের বাড়ি গিয়ে পড়িয়ে আসতে হয়—বাকি দু'জনও সেখানেই আসে। আবার বাপীকে নিশীথের এই মামা-বাড়িতে ঠাঁই নিতে হয়েছে। তবে মাইনে এবার কুড়ির বদলে পঁচিশে এসেছে। মোট রোজগার তিরিশ আর পঁচিশ পঞ্চান্ন। খরচ নেই বললেই হয়।

বি. এস-সি'র ফল বেরিয়েছে জুনের শেষে। বাপী পোস্ট অফিসে এসেছিল। একটা খাম কিনে সেখানে দাঁড়িয়েই কলকাতায় নিশীথকে চিঠি লিখেছে। ওর বি-এ পাশের রেজাল্ট কিছুদিন আগেই জেনেছিল। নিশীথ বাপের কাছে কবিরাজি শিখবে আর চাকরির চেষ্টাও করবে লিখেছিল। বাপী তাকে লিখল, সুযোগ-সুবিধে হলে ওর জন্যেও একটা

চাকরির চেষ্টা যেন অবশ্য করে। চাকরির সুবিধে হতে পারে কলকাতায় নিশীথের বাবার সঙ্গে এমন অনেকের চেনা-জানা থাকা সম্ভব।

খাম পোস্ট করে ফেরার সময় অবিশ্বাস্য চমক। উল্টো দিক থেকে যে মানুষটি আসছেন তাঁকে দেখে বাপী হাঁ—

ড্রইং মাস্টার ললিত ভড়।

চুলদাড়ি বোঝাই সেই মুখ। তবে চুল আর দাড়ি দুই-ই কাঁচা-পাকা। সেই রকম কালো ছোপ-ধরা লাল দাঁত। আড়াই বছরে ভদ্রলোক শীর্ণ হয়েছেন একটু। বাপীকে দেখে খুশীতে উপচে উঠলেন।—কদিন ধরে তোর কথাই ভাবছি, কলেজ বন্ধ হস্টেল বন্ধ—কে খবর দেয়? আমি ভাবলাম কোথাও চলেই গেছিস।

খুশী বাপীও কম নয়।—আপনি কবে ছাড়া পেলেন? কবে এলেন?

—বারো-চৌদ্দ দিন হবে। এখান থেকে রাজসাহীতে চালান করে দিয়েছিল, সেখানেই ছিলাম।

—কেমন ছিলেন?

—খারাপ আর কি। গোড়ার কিছুদিন গুঁতোর চোটে চোখে অন্ধকার দেখতে হত, কিন্তু আমি কার নাম আর কি চক্রান্তের কথা বলি বল? ওরা বিশ্বাসই করতে চায় না। তারপর অবশ্য ভালই ছিলাম, ওরা আমাকে নিয়ে মজা করত, ভালো-ভালো খাবারের ছবি এঁকে দিলে আমাকে একটু ভালো খেতে দিত। হা হা হাসি।

কিন্তু বাপীর দু' চোখ জ্বলছে পুলিশ মার-ধর করেছে, অকারণে আড়াইটে বছর আটকে রেখেছে, সামান্য সম্বল চাকরিটাও গেছে। জিগ্যেস করল, আপনি ফিরেছেন আপনার ছেলেমেয়ে জানে? তারা তো সব দিনাজপুরে চলে গেছল...

—হ্যাঁ, বউয়ের ভাই সেখানে কোর্টের মুহুরি। নিজের জায়গা-জমি আছে, গোরু আছে দুটো, পুকুরে মাছ আছে—ভালই আছে নিশ্চয়।

—আপনি ফিরে এসে সেখানে যান নি?

—যাব রে, সবে তো এলাম। হাসছেন।—চাকরিটা আবার হল কিনা বোঝার জন্য স্কুলের হেড-মাস্টারের সঙ্গে দেখা করতে গেছলাম। দেখেই আঁতকে উঠল ভদ্রলোক, চাকরির কথা বলব কি। আরো হাসছেন।—তার আর দোষ কি বল, ছাপোষা মানুষ, জেল-খাটা লোককে টানাবে কোন্ ভরসায়?

জেল-খাটা লোককে বাপী একটা মিষ্টির দোকানের দিকে টেনে নিয়ে গেল। খুশি-খুশি বিব্রত মুখে ললিত ভড় বললেন, আবার এখানে কেন রে?

বাপী বলল, আপনার খাওয়া পাওনা আছে মাস্টারমশাই—আমি বি. এস-সি পাশ করেছি, ডিসটিংশনও পেয়েছি।

শুনেই সানন্দে খেতে বসে গেলেন ললিত ভড়। কাউকে খাইয়ে এত তৃপ্তি আর কি পেয়েছে বাপী? প্রচুর খাওয়ার পর খুশির ঢেকুর তুলে ললিত ভড় মন্তব্য করলেন, তুই বড় ভালো ছেলে, আর বড় নরম মন—তোর কি-স্সু হবে না।

অর্থাৎ ভালো ছেলে আর নরম হলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বাপী হেসেই ফেলেছিল।

আবার ঠাঁই বদল। নিশীথের মামার বাড়ি ছেড়ে বাপী ললিত ভড়ের দু ঘরের একটাতে উঠে এসেছে। কেন তাঁকে বুঝতে দেয় নি। উল্টে বলেছে, ও-ই একটু মাথা

গোঁজবার জায়গা পেল। ললিত ভড় কেন স্ত্রী বা ছেলেমেয়েকে দেখতে একবার দিনাজপুর যান নি, কেন জেলখানা থেকে ছাড়া পাওয়ার খবরটা পর্যন্ত তাদের দেন নি সেটা বাপীর থেকে ভালো আর কে আঁচ করতে পারে? বাপী এখানে চলে না এলে মানুষটার উপোস বরাদ্দ। হাতে অঢেল সময় এখন, আর একটা টিউশন যোগাড় করে নেওয়া বাপীর পক্ষে খুব অসুবিধে হবে না। যাদের পড়ায় তাদের বললেই হতে পারে। তাদের কাছে ওর অঙ্ক শেখানোর সুনাম খুব।

ললিত ভড়ের কাছে উঠে আসার ফলে বাপীর লাভও কিছু হয়েছে। এক তো মানুষটার সঙ্গ ভালো লাগে। ভদ্রলোক নিজে রান্নাবান্নায়ও পটু বেশ। দেড় মাস তাঁর কাছে থেকে বাপীর মোটামুটি রান্নাও শেখা হয়ে গেল। আর তাঁর কাছ থেকে কিছু যোগব্যায়ামও শেখা হয়েছে। বেশি খিদে হয় বলে নাকি ও-পাট ছাড়তে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু জানেন অনেক কিছু।

মাত্র দেড় মাস। ছেচল্লিশ সালে ষোলই আগস্ট থেকে তামাম ভারতে এক লণ্ডভণ্ড কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। হিন্দু-মুসলমানদের দাঙ্গার আগুন জ্বলে উঠল। গোটা দেশ রক্তে ভেসে যেতে লাগল। সে এক বীভৎস সময় এখানেও। মানুষের বিশ্বাস গেছে, বুকের ভেতরটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। দুদিন আগের গলাগলি ভাব গলা-কাটাকাটির দিকে গড়ালো। কেবল ভয় আর কেবল সন্দেহ সম্বল। বাপীর থেকে-থেকে তখন বানারজুলির আবু রব্বানীর কথা মনে হয়েছে। দুলারি আর রেশমার কথা মনে হয়েছে। বাপীকে কাছে পেলে তারা এখন কি করবে?

গোলযোগের প্রথম ঝাপটার পরেই ললিত ভড় বাপীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে দিনাজপুরে ছুটে গেছেন। তারপর একটা বছরের মধ্যে একটা চিঠি না, একটা খবর না। কেউ বেঁচে আছে কি নেই তাও বাপী জানে না।

এক বছর বাদে, সাতচল্লিশের পনেরই আগস্ট জলপাইগুড়ির মানুষ অন্তত হেসেছে আর হাঁপ ফেলে বেঁচেছে। একদিন আগেও বুক ধুকধুক সকলের। দেশ স্বাধীন হবে, দুশ' বছরের দাসত্বের শেকল ভাঙবে—কিন্তু এ-জায়গার মানুষদের ভাগ্যে কি আছে?

পরদিনই বিপরীত উল্লাস। জলপাইগুড়ির বলতে গেলে সবটাই ভারতের এলাকায় পড়েছে। কিন্তু দিনাজপুরের অনেকটা পাকিস্তানের দিকে চলে গেছে। দিনাজপুরের মানুষ কি করছে বাপী জানে না। বিপুল উল্লাসের জয়ধ্বনি দিয়ে জলপাইগুড়ির মানুষ ট্রেজারিতে স্বাধীন ভারতের তিন-রঙা পতাকা তুলেছে।

কলকাতায় নিশীথের সঙ্গে বাপীর চিঠিপত্রের যোগাযোগ ছিল। পরের মাসেই নিশীথের টেলিগ্রাম। চাকরির একটা ব্যবস্থা হয়েছে। পত্রপাঠ চলে এসো।

টেলিগ্রাফ হাতে বাপী বিহ্বল খানিকক্ষণ।

...কলকাতা!

...চাকরি করতে বাপী সত্যি কলকাতা যাবে?

...এই বাইশ বছরের জীবনের বুকের তলার সব থেকে বড় সাধ সফল হবে এবার?

...দশ বছর আগে বানারজুলির বড়সাহেবের আট বছরের এক মেয়ে প্রথম দিনের আলাপে ওকে বলেছিল, কলকাতা দেখনি আবার ফটফট করছ— তুমি জংলি ভূত একটা। সেই কলকাতা!

কলকাতা।

হাওয়ায় ভেসে কলকাতা এসেছে বাপী। ওকে নেবার জন্য নিশীথ স্টেশনে হাজির ছিল। নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলেছে। বাপী ওকে চিঠিতে লিখেছিল দুদিন ওর বাড়িতে থেকে জ্যাঠাতুতো দাদার অর্থাৎ মণিদার বাড়িটা খুঁজে নেবে। আপাতত সেখান থেকেই চাকরি করবে।

মণিদার বাড়ির ঠিকানা জানা থাকলে তাকেও চিঠি লিখত। জানে না। ঠিকানা বানারজুলির বাড়িতে কোথাও পড়ে থাকতেও পারে। বাপীর স্মরণশক্তি প্রখর। মণিদা কাস্টমস-এ চাকরি করে এটুকু আজও মনে আছে। কারণ বাবা এক রাতে ঠাট্টা করে তাকে বলেছিল, কাস্টমসের চাকরির তো মাইনে থেকে উপরি বেশি শুনেছি।

বাবার কথায় মণিদা খুব হেসেছিল।

কিন্তু মণিদার আপিসের ঠিকানাই বা পাবে কোথায় যে একটা চিঠি লিখে জানাবে, ও আসছে?

শনিবার সকালে এসে পৌঁছেছিল। নিশীথ সেদিন ছুটি নিয়েছে। ও প্রায় বছরখানেক আগেই চাকরিতে ঢুকে গেছে। ওর আপিস ডালহৌসিতে। কেরানী হলেও আপার ডিভিশন।

শনি-রবি দুটো দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে নিশীথ কলকাতা দেখালো ওকে। চিড়িয়াখানা মিউজিয়াম বোটানিক্যাল গার্ডেনও বাকি থাকল না। ঠাট্টা করে বলল, সব দেখে রাখ, এই প্রথম কলকাতায় এসেছিস বুঝতে পারলে লোকে বাঙাল বলবে।

দেখে শুনে গোড়ায় বাপী হাঁ হয়ে গেছল সত্যি কথা। বই-এ পড়েছিল, আজব শহর কলকাতা। এমন তাজ্জব রকমের আজব কে জানত! ট্রাম বাস লরি ট্যাক্সি মোটর ঠেলা রিকশার মিছিল দেখে দুদিনেই মাথা ঝিম-ঝিম করেছে। গোটা কলকাতা শহরটা যেন সদা ব্যস্ত, ছুটছে আর ছুটছে। আসার সময় ট্রেনে বসে ঘুরে ফিরে মিষ্টির কথাই বেশি মনে এসেছিল। কোথায় আছে ওরা এখন জানে না। কিন্তু বাপীর বদ্ধ ধারণা, কলকাতায় আছে। মিষ্টি কথায় কথায় একদিন বলেছিল, একটু উঁচু ক্লাসে উঠলেই ও কলকাতায় দাদুর কাছে থেকে পড়াশুনা করবে। ওর মা-তে বাবা-তে সেই রকমই নাকি কথা হয়ে আছে।

ট্রেনে আরো কিছু মনে পড়াতে বাপীর হাসি পেয়ে গেছল। নাওয়া-খাওয়া ভুলে দু-দুবার সেই বিশাল ছাপা সরকারী গেজেট এনে পড়া। কেন সে শুধু ও-ই জানে।

সেই থেকে বিশ্বাস আরো বদ্ধমূল, আর কেউ থাকুক না থাকুক, মিষ্টি অন্তত কলকাতাতেই আছে। একদিন না একদিন দেখা হয়ে যাবেই। একটা ক্রূর অভিলাষ ভিতর থেকে ঠেলে উঠতে চেয়েছে। কলকাতায় চাকরি হওয়াটা সেই অনেক অনেক বড় হওয়া আর শোধ নেওয়ার প্রথম ধাপ। কিন্তু এই কলকাতা দেখে বাপী হকচকিয়ে গেছে। ওদের হদিস মেলা দূরে থাক, এই ব্যস্তসমস্ত শহর থেকে মণিদাকে খুঁজে বার করবে কি করে ভেবে পেল না।

মণিদাকে না পেলেও অবশ্য ঘাবড়াবার খুব কিছু নেই। হাতে চারশ টাকার মতো মজুত আছে। চাকরির মাইনেয় কোনো মেসে থাকার খরচা চলেই যাবে। তবু নতুন জায়গায় একটু অভ্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত মণিদাকে পেলে ভালো হয়।

যে জন্যে কলকাতায় আসা সেটা আর যাই হোক, লোয়ার ডিভিশন কেরানীর চাকরি নয়। এ রকম চাকরি বাপী চার বছর আগে ঘরে বসেই করতে পারত। করবে না বলেই ঘর ছেড়েছিল, বাবাকে ছেড়েছিল। চার বছর বাদে বি. এস-সি পাশ করার পর সেই লোয়ার ডিভিশন চাকরি মনে ধরার কথা নয়। আকর্ষণ একটাই। কলকাতা। বড় হতে চাও তো বড় গণ্ডিতে এসে বোসো। কলকাতা সেই বড় গণ্ডি। ভাগ্যের জোর থাকলে এখান থেকেই ফকির উজির হয়, ছেঁড়া কাঁথার মানুষ হাত বাড়িয়ে স্বপ্নে লাখ টাকা মুঠোয় ধরে। বাপী তাই কলকাতার এই বড় গণ্ডিতে এসে একটু বসার জায়গা পেয়েই খুশিতে আত্মহারা হয়েছিল। আপার ডিভিশন লোয়ার ডিভিশন নিয়ে মাথা ঘামায় নি। নইলে ওর থেকে অনেক খারাপ ছাত্র নিশীথ সেন আপার ডিভিশন। যত ছোটই হোক, বাপীর কাছে কলকাতায় এসে স্থিতি হতে পারাটাই ভাগ্যের পাশার একটা বড় দান।

কিন্তু বাস্তবের মুখোমুখি হতে না হতে ভিতরে ধাক্কা খেল। কবিরাজ বাবার একজন অন্তরঙ্গ ভক্তকে নিশীথ রামকাকা বলে ডাকে। নাম রামচরণ গাঙ্গুলী। ব্রুকলিনের কোনো বিভাগের তিনি মেজবাবু। বড়বাবু মন্মথ সোমের সঙ্গে তাঁর বেজায় খাতির। রেসের মাঠে হরিহর আত্মা দুজনে। এই খাতিরের সুতো ধরে বাপীর চাকরি। বড়বাবু মন্মথ সোমকে অজীর্ণ রোগে ধরেছিল। রামকাকার অনুরোধে নিশীথের বাবা দু'মাস বিনে পয়সায় চিকিৎসা করে তাঁকে সারিয়ে তুলেছেন। সেই মওকায় নিশীথ রামকাকাকে বন্ধুর চাকরির জন্যে ধরে পড়েছিল।

কিন্তু প্রথম দিন খিদিরপুর ব্রুকলিন ডিপোয় হাজিরা দিয়ে বাপী ভিতরে ভিতরে হতাশ। যদিও সেই দিনই কাজে জয়েন করার ব্যাপারে কোনরকম অসুবিধে হয় নি। রামকাকা বাপীকে বড়বাবু মন্মথ সোমের কাছে নিয়ে এসেছেন। বিশাল হলের এক কোণে তিন দিক ঘেরা একটু ছোট জায়গায় তিনি বসেন। সামনে তাকালে সমস্ত দপ্তরটি তাঁর চোখের সামনে।

বাপীর পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। যুদ্ধোত্তর হওয়ায় কলকাতার কেরানীবাবুরাও বেশির ভাগ তখন ধুতি ছেড়ে ট্রাউজার আর শার্ট ধরেছে। ধুতি পাঞ্জাবি পরে প্রথম দিন আপিসে উপস্থিত হওয়াটা নিশীথের পছন্দ ছিল না; কিন্তু উপায় কি? বিকৃত মুখ করে বলেছিল, একটু কম ঢ্যাঙা হলেও তো আমারটা দিয়ে দিনকতক চালিয়ে দিতে পারতিস।

বড়বাবুকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে বলে দিয়েছিলেন রাম গাঙ্গুলি। কিন্তু তার সুযোগ কম দেখে বাপী স্বস্তি বোধ করল। চার দিকের চেয়ার ঠেলে টেবিলের তলায় পায়ের নাগাল পাওয়া সহজ নয়। দুহাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার জানালো।

বাপী জানে আগে থাকতে বলা কওয়া আছে। তবু রাম গাঙ্গুলি পরিচয় দিতে মুখ তুলে চুপচাপ খানিক দেখলেন ওকে। ছোটখাটো রোগা মানুষ ফ্যাকাশে মুখ। গম্ভীর। যাচাই করে দেখার মতো হিসেবী চাউনি। বসতে বললেন না।

—এ-বছর বি. এস-সি পাশ করেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দ্বিতীয় প্রশ্নের আগে বাপী এবারে বুদ্ধিমানের মতো বলল, আমার নাম বিপুল, আপনি তুমি করে বলুন।

—ডিসটিংশনে পাশ করেছ?

—হ্যাঁ স্যার।

—অনার্স পড়লে না কেন?

বাপী এর কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। চুপ করে রইল।

—কোন্ কলেজ থেকে পাশ করেছ?

বলল।

—বাড়ি কোথায়?

বলল।

—দেশ?

এবারে একটু মাথা খাটাল বাপী। দেশ ভাগ হয়েছে যখন কাজে লাগতেও পারে। বলল, দেশ কখনো দেখিনি স্যার, শুনেছি পূর্ববঙ্গে।

বাপী কেন, বাপীর বাবাও দেশ দেখেনি। বড়বাবুর দু চোখ আবার ওর মুখের ওপর আটকে রইল খানিক। তারপর যে মন্তব্যটা করলেন সেটাই অপ্রত্যাশিত এবং হতাশার কারণ।—একেবারে ভাঙা হাটে এসেছ, চাকরি আজ আছে কাল নেই, কি লাভ।

নিশীথ অবশ্য কলকাতায় আসার পর পর বলেছিল, টেম্পোরারি চাকরি। বাপী জানে গোড়ায় সব চাকরিই টেম্পোরারি। তাছাড়া কেরানীর পাকা চাকরি করছেই বা কে। কিন্তু ভাঙা হাটের চাকরি, আর, আজ কাছে কাল নেই শুনে ঘাবড়ালো একটু।

বড়বাবু চেয়ার ঠেলে উঠলেন। ওকে আসতে ইশারা করে সামনে এগোলেন। হল পেরিয়ে বারান্দার ওদিকে আর একটা ঘর। দরজার বাইরে চাপরাসী টুলে বসে। বড়বাবুকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল।

বাপীকে অপেক্ষা করতে বলে বড়বাবু সুইং ডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন। এবং দু মিনিটের মধ্যে ওরও ডাক পড়ল।

মস্ত টেবিলের ওধারে যিনি বসে তিনি বড়বাবুরও ওপরওয়ালা বোঝা গেল। বাঙালী। বড়বাবু অবশ্য তাঁর সামনের চেয়ারে বসে। সাহেব তাঁর সমবয়সী হবেন।

বাপী এবারেও দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার সারল। বাঙালী সাহেব মাথা নাড়ালেন কি নাড়ালেন না। পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার শুধু দেখলেন ওকে। তারপর বড়বাবুকে বললেন, ঠিক আছে।

বড়বাবুর ঠোঁটের ফাঁকে এবারে সামান্য হাসির রেখা লক্ষ্য করল বাপী।

ওকে সঙ্গে করে নিজের জায়গায় ফিরলেন আবার। নিজে বসে এবারে ওকেও বসতে বললেন। সেই ফাঁকে আবার একটু দেখেও নিলেন।

—বয়েস কত?

—বাইশ।

বয়েস পছন্দ হল না কি আর কিছু বাপী সঠিক বুঝে উঠল না। বয়েসই হবে বোধ হয়। কারণ, আর একবার মুখ থেকে বুক পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার বললেন, ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটের বয়েস যাই থাক, ঠিক ঠিক বয়েস কত? বলতে বলতে একটা ছাপা ফর্ম বাড়িয়ে দিলেন ওর দিকে, বয়েসের জন্য তোমার চাকরি আটকাবে না—আমার তো তেইশ-চব্বিশ মনে হচ্ছে।

চাকরি পাওয়ার আগ্রহটাই বাপীর সব আপাতত। প্রতিবাদ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ ভাবল। জবাব দিল, হতে পারে স্যার...সার্টিফিকেটে কমানো আছে কিনা বাবা জানতেন।

হতে পারে শুনে অখুশি নন। ভদ্রলোকের ঠোঁটের হাসিটুকু চেষ্টা করে হাসার মতো। তেমনি একটু হেসে মন্তব্য করলেন, নানা আশায় ছেলের দুই-এক বছর বয়েস সব বাবাই কমিয়ে লেখান। ওই ফর্মটা ফিল আপ করো, সার্টিফিকেটের বয়সই লিখবে।

অর্থাৎ উনি ধরেই নিলেন বাপীর বয়েস তেইশ-চব্বিশের কম নয়।

পৃথক দরখাস্ত করারও দরকার হল না। ফর্ম ফিল-আপ করা হতে ওতেই তিনি খসখস করে লিখলেন কি, নিজের নাম সই করলেন, তারপর সেটা নিয়ে আবার চলে গেলেন।

মিনিট পাঁচ-সাত বাদে খালি হাতে ফিরলেন। চেয়ারে বসে আবার একটু চেয়ে রইলেন। ভদ্রলোকের এই দেখাটাই কেন যেন অস্বস্তিকর বাপীর কাছে।

—রামবাবুর মুখে তোমার কথা সব শুনেছি, বাবা-মা তো নেই, ভাই-বোন বা অন্য কোনো আত্মীয়-পরিজনও নেই?

রামবাবুর মুখে শোনা মানে নিশীথের মুখে শোনা। সে কি বলেছে না বলেছে কে জানে। তাই জ্যাঠতুতো দাদার কথাও বলা গেল না। জবাব দিল, না স্যর...

খুব সদয় মুখ করে বললেন, ভেরি আনফরচুনেট। যাক, কাজটা কিছুই নয়, তার ওপর পিওরলি টেম্পোরারি, স্টিল ক্যারি অন।

সেইদিনই কাজে বহাল হয়ে গেল। তিন-চার দিনের মধ্যেই চাকরির ব্যাপারটা বুঝে নিল। ব্রুকলিন ডিপো যুদ্ধের বহু রকমের মাল স্টকের অফিস। এই আপিস এখন অনেকটাই গুটনো হয়ে গেছে। তবু সময় সময় কাজ জমে গেলে ছাঁটাই কর্মচারীদেরই কিছু কিছু আবার অস্থায়ীভাবে ডেকে নেওয়া হয়। বাপী ছাঁটাই মার্কা না হলেও বড়বাবুর কল্যাণে ঢুকে গেছে।

নিশীথের ওপর গোড়ায় একটু অভিমানই হয়েছিল বাপীর। এরকম চাকরির জন্য এভাবে ছুটে আসত কিনা সন্দেহ। মাইনে ষাট টাকা ডিয়ারনেস অ্যালাওয়েন্স আঠারো —সর্বসাকুল্যে মাস গেলে আটাত্তর টাকা।

মেজাজ খারাপ করে নিশীথকে বলেই ফেলেছিল কথাটা। নিশীথ কানে তোলেনি, বলেছে, ওই বড়বাবুটির ক্ষমতা কত জানিস না, লেগে থাক আর ভদ্রলোকের মন রেখে চল—

উনিশ-বিশ একই কথা রাম গাঙ্গুলি বলেছেন।—বড়বাবু কাউকে রাখবেন বলে ধরে থাকলে তাকে হটানো সহজ নয়, বুঝলে? বাজে ভাবনা না ভেবে তাঁর মন রেখে চলো।

মন রেখে কি করে চলতে হয় বাপীর সেটাই ভালো জানা নেই। চাকরির মাসখানেকের মধ্যে কপাল দেখা রতন বণিক ওর বশংবদ হয়ে ওঠার পর সেও বলেছে, আপনি হলেন গিয়ে বড়বাবুর লোক, আপনার 'রিট্রেঞ্চ'-এর ভাবনা কি! বড়বাবুর ইয়েস তো বড়সাহেবের 'ইয়েস', এনার 'নো' তো ওনারও 'নো'।

বড়বাবুর লোক ভেবেই রতন বণিক ওরও অনুগত হয়ে উঠছে কিনা, বাপীর সেই সংশয়। বড়বাবুর মন পাওয়ার আশায় বাপী শুরু থেকেই যতটা সম্ভব মন দিয়ে কাজ করছে। ছুটির পরেও এক ঘণ্টা তিনি আপিসে থাকেন। বেশির ভাগ চাকুরেরা ছুটির সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া হয়ে যায়। কিন্তু বাপী তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় বসে থাকে। বাপীর ধারণা মুখে কিছু না বললেও ভদ্রলোক ভিতরে ভিতরে খুশিই হন একটু।

মণিদার বাড়ির হদিস মিলেছে চাকরিতে ঢোকার চার দিন বাদে।

আফিস পালিয়ে নিশীথ তার স্ট্র্যাণ্ড রোডের হেড অফিসে ঠিকানার খোঁজে গেছল। বরাতক্রমে যে ঘরে ঢুকে নিশীথ মণিলাল তরফদারের খোঁজ করছিল, ভদ্রলোক সে ঘরেই দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা কইছিল। নিজের নাম কানে যেতে এগিয়ে এসেছে। মণিদা নিজেই বাড়ির ঠিকানা দিয়েছে আর বাপীকে চলে আসার কথা বলেছে। পার্ক সার্কাসের দিকে ঠিকানা। নিশীথ তাকে বলে এসেছে বাপী রোববার যাবে। খবরটা দিয়ে নিশীথ মন্তব্য করেছে, তোর মণিদাকে দেখে সেরকম বড় চাকরে-টাকরে মনে হল না রে। বলেছিলি কাস্টমস-এ ভালো চাকরি করে...পরনে দেখলাম ঢলঢলে ট্রাউজার আর গায়ে টুইলের শার্ট—তাও সে রকম পাট-ভাঙ্গা পরিষ্কার নয়।

বাপীর ধারণা ছিল মণিদা ভালো চাকরিই করে। তাই বলেছিল। একথা শোনার পর সেখানে থেকে চাকরি করার কতটা সুবিধে হবে সেই ভাবনা। মণিদার বাড়ির হদিস মিলতে এ ছাড়াও একটু অস্বস্তি। আট বছর আগে বানারজুলির একটা সকাল আর দুপুর ভিতরের কোনো গোপন সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। নিজের ছেলেবেলাটাকে এক এক সময় একেবারে শেকড়সুদ্ধু টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে বাপীর।

রবিবার সকালে নিশীথ ওকে বাড়ির সেকেলে গাড়িতেই পৌঁছে দিয়ে গেল। নিজে ঢুকল না কারণ বাবা তাড়া দিয়ে রেখেছে। রবিবার সকালে বাবার কাছে হাতে-কলমে কাজ শিখতে হয়, কবিরাজি ওষুধপত্র বানাতে হয়। কিন্তু বাইরে থেকে মণিদার ফ্ল্যাট দেখেই ও হয়তো অপ্রস্তুত একটু। বেশ ভালো চাকরি না করলে এ জায়গায় এরকম ফ্ল্যাটে থাকা সম্ভব নয়।

রাস্তার ওপর শেষ বাড়িটা মণিদার। সামনে ছোট একটু পার্কের মতো। খোলামেলা জায়গা। নিচের দরজার সামনে দো-ভাঁজ লুঙ্গি করে কাপড় পরা একটি লোক দাঁড়িয়ে। নিশীথ তাকে জিজ্ঞেস করতে সে দোতলাটা দেখিয়ে দিল।

ওকে ছেড়ে নিশীথ নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল।

একতলায় মাদ্রাজী পরিবারের বাস মনে হল। বাপী পায়ে পায়ে দোতলায় উঠে এলো। হাতে রংচটা টিনের সুটকেস আর ময়লা শতরঞ্জী মোড়া দড়িবাঁধা শীর্ণ শয্যা। সিঁড়ির মুখের দরজা পেরিয়ে ভিতরে পা দিতেই হাতের জিনিস দুটো বেমানান লাগল। এও বেশ বড়সড় একখানা ঘরের মতোই। বিস্কুট রঙের তকতকে মেঝে, মাঝামাঝি ডাইনিং টেবিলের চারদিকে চেয়ার। বাপী কখনো টেবিল-চেয়ারে ভাত খায়নি, তবু সস্তার জিনিস যে নয় ওগুলো আঁচ করতে পারে। টেবিলে শৌখিন পেয়ালা আর ছোট বড় ডিশ পড়ে আছে। একটু আগেই বাড়ির লোকেরা প্রাতরাশ সেবে উঠে গেছে বোঝা যায়। ওদিকের দেয়াল আলমারির কাঁচের পাল্লা দিয়ে ঝকঝকে ক্রকারি সেট দেখা যাচ্ছে।

সামনে পর পর তিনটে ঘর। পুরু পর্দা ঝুলছে। শেষের ঘর থেকে রেডিওর গান কানে আসছে।

হাতের টিনের সুটকেস আর বিছানার পুঁটলি চট করে চোখে পড়বে না এমন এক কোণে রাখল বাপী। তারপর প্রথম ঘরের পর্দাটা সরিয়ে দেখল।

এটা বসার ঘর। গদির সোফা সেট ডিভান সাজানো। বাপীর হকচকিয়ে যাওয়ার

দাখিল। পর্দা সরানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রথম চোখাচোখি যার সঙ্গে সে বছর ছ-সাতেক একটি ছেলে। আধশোয়া হয়ে একটা পাতলা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিল, তার একখানা পা হাতলের ওপর। পাশের সোফায় মণিদার চোখের সামনে খবরের কাগজ। মুখে আধখানা চুরুট। পরনে চকচকে লুঙ্গি, গায়ে জালি গেঞ্জি।

—বাবা!

দরজায় অপরিচিত লোক দেখে ছেলেটা মণিদাকে ডাকল।

মণিদার মুখের কাছ থেকে কাগজ সরল। চুরুটটা হাতে নিয়ে এক গাল হাসি। কাগজ ফেলে সোফা ছেড়ে উঠল—কত বড় হয়ে গেছিস রে বাপী! আয় আয়—বাড়ি চিনতে অসুবিধে হয় নি তো?

বাপী হাসিমুখে মাথা নাড়ল। অসুবিধে হয়নি। তারপর এগিয়ে এসে মণিদাকে একটা প্রণাম ঠুকল।

তিনটে ঘরেরই মাঝখানে একটা করে ভিতরের দরজা। বাইরের বারান্দার দিকেও একটা করে দরজা। ভিতরের দরজার পর্দাগুলো তোলা এখন।

মণিদা হাঁক দিলেন, কই গো কে এসেছে, দেখে যাও—

হাঁক শোনার আগেই ওই শেষের ঘর থেকে গৌরী বউদি ওকে দেখে এগিয়ে আসছিল। ও-ঘর থেকেই রেডিওর গান শোনা যাচ্ছিল। সেটা এখনো চলছে। কে এলো বা কে আসবে জানাই ছিল নিশ্চয়। কিন্তু এগিয়ে আসতে আসতে গৌরী বউদি যেন খুব পরিচিত মানুষ দেখছে না। এ ঘরে পা ফেলার আগেই বাপী যেটুকু দেখার দেখে নিয়েছে। সামান্য মোটার দিক ঘেঁষেছে গৌরী বউদি, নইলে আট বছর আগে যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে। তখন কুড়ি ছিল বয়েস, এখন আঠাশ হবে! এই আট বছরে মণিদা ফুলে আরো গোলগাল হয়েছে। ফলে তাকে আরো বেঁটে দেখায়। কিন্তু সামান্য মোটা হবার ফলে গৌরী বউদিকে আগের থেকে একটু লম্বা মনে হয়।

মণিদা জিজ্ঞাসা করলেন, ওকে চিনতে পারো?

গৌরী বউদির সেই হাসিমাখা চকচকে চোখ দুটো পরিষ্কার মনে আছে বাপীর। তখন মনে হত, ওই দুটো চোখ দিয়েই গৌরী বউদি অনেক কথা বলতে পারে। এখন কতটা পারে জানে না, এখন সামান্য একটু হাসি শুধু ছুঁয়ে আছে।

বাপীর দিকে তাকিয়েই বলল, জানা ছিল বলে পারছি, না থাকলে পারতুম না। খাসা মানিক-মানিক চেহারাখানা হয়েছে তো এখন।

বাপী তাকেও একটা প্রণাম সারতে গেল। তার আগেই গৌরী বউদি দু'পা সরে গিয়ে বলল, প্রণাম-টনাম দরকার নেই, বোস—জোয়ান-মর্দ ছেলে পায়ে হাত দিতে এলে বিচ্ছিরি লাগে।

বাচ্চা ছেলেটা বই হাতে সেইভাবেই শোফায় আধ-শোয়া হয়ে নতুন লোকটাকে দেখছিল আর মা-বাবার কথা শুনছিল। তার দিকে চোখ যেতেই গৌরী বউদির সামান্য মেজাজ চড়ল।—এই ছেলে! নবাবের মতো শুয়ে কি পড়া হচ্ছে তোর?

ছেলে সোজা হয়ে বসল।—কি করব বাবা তো শুধু কাগজই পড়ছিল, স্কুলের পড়া দেখিয়ে দিচ্ছিল না—

এমন সামান্য কারণেও গৌরী বউদির চকচকে চোখে বিতৃষ্ণাই দেখল যেন বাপী।

কথাগুলোও রূঢ় একটু।—সমস্ত দিন তো বাইরেই কাটাও, সকালের একটা ঘণ্টাও যদি না দেখতে পারো তো কাল থেকেই ওর জন্যে একজন মাস্টার ঠিক করো।

কৈফিয়ত দাখিলের সুরে মণিদা বলল, আজ রোববার, দেব'খন দেখিয়ে—

—তোমার কাছে ওর বারো মাসই রোববার। ছেলের দিকে ফিরল, ওঘরে গিয়ে নিজে যা পারিস পড়গে যা, আমি আসছি—রেডিওটা বন্ধ করে নিস।

বাপী লক্ষ্য করছে মায়ের মতোই মুখ ছেলের। মণিদার আদলের ছিটেফোঁটাও নেই। মনঃপূত হোক না হোক মায়ের হুকুমে উঠে চলে গেল। এদিকের পর্দা ঠেলে দরজার কাছ থেকেই গলা একটু চড়িয়ে গৌরী বউদি বলল, ভিখু, চায়ের জল চড়াও, আর মিটসেফ-এ খাবার কি আছে দেখো—

বানারজুলিতে নতুন বউ গৌরী বউদির সঙ্গে এই গৌরী বউদির কিছু একটা বড় তফাৎ এর মধ্যে চোখে পড়ছে বাপীর। বানারজুলি থেকে ফেরার আগে বাপীকে গাল টিপে আদর করে এসেছিল মনে আছে। এই গৌরী বউদির আর কিছু না হোক, মেজাজ বেশ বদলেছে বোঝা যায়।

সোফায় বসে মণিদা নেভানো চুরুটটা আবার ধরিয়েছে। দরজা ছেড়ে এদিকে আসতে একটু সহজ হবার তাগিদে বাপী বলল, সকালের চা জলখাবার খেয়েই বেরিয়েছিলাম—

ওর মুখোমুখি সোফাটায় বসল গৌরী বউদি।—কেন, এখানে জুটবে কি জুটবে না ভেবে?

বাপী তাড়াতাড়ি বলল, তা কেন, যতবার দেবে ততোবার খেতে পারি। চট করে অন্য প্রসঙ্গে ঘুরে গেল, ছেলেটাকে এমন তাড়া দিয়ে পড়তে পাঠালে যে আমি কে জানলও না—কি পড়ে, রোববারেও ওর কি এত পড়া?

চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে মণিদা বলল, ক্লাস ওয়ান।

ভাগ্যে বাপী হেসে ফেলেনি। কারণ সঙ্গে সঙ্গে রুষ্ট চোখের একটা ঝাপটা খেল মণিদা। সঙ্গে ঝাঁঝালো কথারও।—ক্লাস ওয়ান হোক আর যাই হোক, সঙ্গে নিয়ে না বসলে ওইটুকু ছেলে নিজে থেকে দিগগজ হয়ে যাবে? উইকলির রেজাল্টগুলো চোখ তাকিয়ে দেখেছ একবারও? লজ্জা করে না মুখ নেড়ে কথা বলতে?

মণিদার মুখখানা একটু চুপসেই যেতে দেখল বাপী। তাড়াতাড়ি ওই আবার সামাল দিতে চেষ্টা করল। তুমি কিছু ভেব না বউদি, এবার থেকে আমিই ওকে নিয়ে বসব —কি নাম ওর?

গৌরী বউদি জবাব দিল না। এবারে মণিদার আগ্রহ দেখা গেল।—তাই তো রে। তোর সেই বন্ধুটি বলছিল ডিস্টিংশনে বি-এস সি পাশ করে তুই এখানে এসে কি একটা চাকরিতে ঢুকেছিস। আমার সকাল দুপুর বিকেল রাত্তির চাকরির জোয়াল কাঁধে—তুই একটু নিয়ম করে ছেলেটাকে দেখলে তো ভালোই হয়—কি বলো?

শেষের বিনীত জিজ্ঞাসা বউয়ের উদ্দেশে। জবাব না দিয়ে গৌরী বউদি এবারে দু'চোখে বাপীকে যাচাই করে নিচ্ছে। অগত্যা বাপী বলল, ডিস্টিংশনে বি-এস সি পাশ করাটা কিছু নয়—ছেলে পড়িয়ে অভ্যেস আছে। এই করেই তো নিজের পড়াটা চালিয়েছি।

গৌরী বউদির দু চোখ ওর মুখের ওপর থেকে পাশের খোলা দরজার দিকে ঘুরল। —বাচ্চু!

মায়ের এক ডাকে ওদিক থেকে ছেলেটা ছুটে এলো। বাপীকে দেখিয়ে গৌরী বউদি বলল, এ তোর একজন কাকু হয়, এখানে থাকবে—কাল থেকে রোজ সকালে আর সন্ধ্যায় এই কাকু তোকে পড়াবে—বুঝলি?

বাপী দেখল, গৌরী বউদির মুখখানা একটু প্রসন্ন এখন। ছেলের জন্য দুশ্চিন্তা দেখে প্রথম সুযোগে পড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে। এখানে থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে যেটুকু করা যায়। তবু আধঘণ্টা হয় নি এসেছে, মুখের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে গৌরী বউদি ছেলেকে ডেকে ওই ফয়সলা করে ফেলার মধ্যে এই বিনিময়ের হিসেবটুকুই যেন বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠল। মণিদা বা গৌরী বউদি এ পর্যন্ত পিসী বা বাবার সম্পর্কে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেনি।

ছেলেটা সোজা তাকিয়ে কাকুর মুখখানা একবার দেখে নিল। জীবটি বিপজ্জনক কিনা বোঝার চেষ্টা। সে রকম মনে হল না। মায়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, মাস্টার কাকু?

মাস্টার ঠিক করার কথা প্রায়ই শোনে, তাই এ প্রশ্ন।

—না, বাপী কাকু। জঙ্গলের কতরকম গল্প বলবে তোকে শুনিস'খন। কিছু মনে পড়তে গম্ভীর মুখে সামান্য হাসির আভা ছড়ালো। কি মনে পড়তে পারে বাপী সেটা সেই মুহূর্তে আঁচ করেছে।

ছেলের গলায় অভিমান ঝরল।—হ্যা জঙ্গলের গল্প শুনবে, আজ পর্যন্ত আমাকে চিড়িয়াখানাই দেখালে না তোমরা।

—এবারে কাকু দেখাবে'খন। এখনো এক ঘণ্টা পড়তে হবে, বই নিয়ে বোসগে যা।

দ্বিতীয়বার বলতে হল না, বাচ্চু চলে গেল। ভিখু বাড়ির আধবুড়ো চাকর। তার সামনে ডিশে কিছু খাবার আর এক পেয়ালা চা রাখল। দাদা বউদির সামনেও এক পেয়ালা করে চা রেখে প্রস্থান করল।

পেয়ালা তুলে নিয়ে গৌরী বউদি আলগোছে করে জিজ্ঞাসা করল, জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ারদের আর কি নতুন ভালবাসাবাসি দেখেছিস?

ডিশের খাবার সবে একটু মুখে তুলেছিল। বাপীর বিষম খাবার দাখিল। মাথাটাও ঝিমঝিম করে উঠল। ভিতরের গোপন সুড়ঙ্গ থেকে এক দুপুরের দৃশ্যটা বেরিয়ে আসার জন্য ডানা ঝটপট করেছে। বানারজুলির জঙ্গলের সেই একটা দিন মণিদাও ভোলেনি হয়তো। বউয়ের রসিকতার কথা শুনে তার ভাবি গালের খাঁজে খাঁজে হাসি ছড়িয়ে পড়ছে।

পলকা ধমকের সুরে গৌরী বউদি আবার বলল, বল না! ইস লজ্জা দেখো ছেলের—

বাপীর মনে হয়, গৌরী বউদি ওকে সেই আট বছর আগের মতোই বোকা ভাবছে। এখনো সেই বোকাবোকা ভাবটাই ধরে রাখার চেষ্টা বাপীর। লোকের চোখে ধুলো দেবার মতো এর থেকে ভালো কৌশল জানা নেই। হাসতে চেষ্টা করে বোকার মতোই বলল,

তখন কি কিছু বুঝতাম নাকি!

...বানারজুলিতে এই গৌরী বউদির মুখে অনেক রকমের খুশির ছটা দেখেছিল বাপী, মুখে খিলখিল হাসি দেখেছিল।...জঙ্গলে যাবার আগে পাট-ভাঙা শাড়ি পরার পর ওকে পিছনে পায়ের দিকটা টেনে দিতে বলেছিল, আর উদ্ভট ফরমাসটা না বুঝে বাপী উবু হয়ে বসে শাড়ির ওপর দিয়ে দু হাতে তার একটা পা চেপে ধরে কি করে টানবে ভেবে পাচ্ছিল না। গৌরী বউদি তখন ওকে হাঁদা বলেছিল আর হেসে সারা হয়েছিল।...তারপর জঙ্গলে ওর সেই সব কথা শুনে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুলে ফুলে হেসেছিল আর ঘন ঘন সেই হাসি মণিদার দিকে ঠিকরে পড়ছিল। এ পরিস্থিতি অতটা হাসির না হলেও বাপীর মনে হয়েছে গৌরী বউদি এখন আর সেরকম হাসে না বা হাসতে পারে না। ধার ধার মুখের এই হাসির মধ্যে যেন কিছু হিসেব লুকনো আছে। অপচয় নেই।

ঠোটের ফাঁকে এমনি একটু হাসি খেলে গেল। ভুরুর মাঝে হাল্কা ভাঁজ পড়ল একটু। —এখন সব বুঝে ফেলেছিস? তার পরেই আত্মস্থ।—যাক্ জঙ্গলের গল্প করতে গিয়ে ছেলের মাথায় আবার এসব ঢোকাতে যেও না।

বাপী তখুনি মাথা নাড়ল। অমন কাজ সে করবে না। এর ফলেও গৌরী বউদি কয়েক পলক চেয়ে রইল। এই বয়সের ছেলের সরলতা দেখে ভিতরে ভিতরে মজা পাচ্ছে হয়তো।

মণিদা প্রসঙ্গ ঘোরালো। ওর চাকরির খোঁজ নিল। শোনার পর বীতশ্রদ্ধ।—বি-এস সি ডিস্টিংশনে পাশ করার পর এই চাকরি করতে ছুটে এলি. মাইনে কত?

গৌরী বউদির সামনে এ প্রশ্নটাই যেন কাম্য ছিল। অকপটে বলে দিল, সব মিলিয়ে মাসে আটাত্তর টাকা—

—দেখ কাণ্ড! হালছাড়া চোখে মণিদা একবার তার বউয়ের দিকে তাকালো। তারপর ওকেই বলল, এরকম কেরানীর চাকরি করবি তো আমাকে জানালি না কেন, আমার ওখানে চেষ্টা করে দেখতাম। কাকাও তো লিখলে পারত—

—বাবা চার বছর আগে মারা গেছেন, তোমাকে বললাম না টিউশনি করে নিজের পড়া চালিয়েছি।

গৌরী বউদি নির্লিপ্ত কিন্তু মণিদা অপ্রস্তুত একটু।—জানব কি করে বল, তুইও তো কিছু লিখিসনি। পিসীর মারা যাবার খবর অবশ্য কাকাই জানিয়েছিল।

বাপী তাড়াতাড়ি কাজের কথায় ফিরে এলো।—এ চাকরিও এক্কেবারে টেম্পোরারি, কবে আছে কবে নেই—তোমার ওখানে এখনো একটু চেষ্টা করে দেখো না মণিদা।

মণিদার গলায় এবারে অতটা উৎসাহ নেই। বলল, দেখি—

কিন্তু এটুকু আশার মুখেও গৌরী বউদি ছাই ঢেলে বসল—যাক, তোমাকে আর দেখতে হবে না, যা করছে করুক পরে দেখা যাবে'খন—তোমার ওখানে ঢুকে পরের ছেলে হাত-কড়া পড়ুক শেষে।

বাপী অবাক। সত্যি মাথায় কিছু ঢুকল না। মণিদা সামাল দিতে চেষ্টা করল, বললেই কি চাকরি হওয়া অত সহজ নাকি—

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাইরে চটির শব্দে ঘাড় ফেরালো।—এসো সন্তু এসো—

মণিদার ওখানে ঢুকলে হাত-কড়া কেন পরতে হবে তখনকার মতো বাপীর সেটা দুর্বোধ্যই থেকে গেল।

দামী চটির আওয়াজ তুলে পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকল বেশ লম্বা একজন স্বাস্থ্যবান পুরুষ। বয়েস বত্রিশ-তেত্রিশের মধ্যে। গায়ের রং ফর্সা, মুখ সুন্দর নয়। পরনে দামী কাপড়ের সাদা পাজামা গায়ে মুগার পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির দুটো হাতই পাঁচ-ছ' আঙুল করে গোটানো। এক হাতের আঙুলে ঝকঝকে সাদা পাথরের আংটি, অন্য হাতে নীল পাথরের। ডান হাতের পুষ্ট কব্জিতে মস্ত একটা সোনার ঘড়ি। পাঞ্জাবির বুক খোলা, তার একদিকে সোনার চেনে সোনার বোতাম আটকানো। সব কটা বোতামের মাঝখানে একটা করে পাথর ঝিকমিক করছে—ওগুলোর নামই হীরে কিনা বাপী জানে না।

ভদ্রলোক নতুন মুখখানা দেখে নিয়ে বলল, রোববারের আড্ডা জমে গেছে দেখছি—

সোফায় মণিদার পাশে বসল। মণিদা নেভা চুরুট অ্যাশপটে গুঁজতে গুঁজতে পরিচয় দিল, আমার খুড়তুতো ভাই বাপী এসেছে উত্তরবঙ্গের সেই বানারজুলির জঙ্গল থেকে এখানে চাকরি করতে—ওর সঙ্গে গল্প করছিলাম।

জলপাইগুড়ির পাঁচটা বছর মণিদার মাথায় নেই। ব্যাকব্রাশ চুলের দরুণ ভদ্রলোকের কপালখানা বেশি চওড়া দেখায়। সে তুলনায় চোখদুটো সামান্য ছোট। হাসিমাখা চাউনি বাপীর মুখের ওপর। হালকা মন্তব্য করল, জঙ্গল থেকে এসেছে বলছ, ভায়ার মুখখানা দেখে মনে হয় বৃন্দাবন থেকে আসছে।

মণিদা জোরেই হেসে উঠল। কিন্তু বাপীর চোখ তখন গৌরী বউদির দিকে। মুখের ধার-ধার ভাব মিলিয়ে গেছে। রসিকতা উপভোগ করল, হাসির সঙ্গে আবার একটু ঠেসও ছুঁড়ে দিল।—তোমার কি আর অত ভুল হয়, জঙ্গল থেকে এলেও ওর ভেতরখানা বৃন্দাবন থেকে আসার মতোই।

সাদা কথায় আবার বোকাই বলা হল ওকে। কিন্তু শুধু ওর ভেতর বোঝানোর জন্যে গৌরী বউদি যেন কথাগুলো বলল না। মণিদার এতেও হাসি। তারপর বাপীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, এ হল সনৎ চৌধুরী, মস্ত কন্ট্রাক্টর, পাশের বাড়িটা ওর—

বাপীর খুব ইচ্ছে করছিল, উঠে এসে সনৎ চৌধুরীকেও একটা প্রণাম ঠুকে গৌরী বউদিকে বুঝিয়ে দেয়, সত্যি কত জলভাত ছেলে ও। পেরে উঠল না। কোনরকমে দু'হাত জুড়ে নমস্কার সারল।

পকেট থেকে শৌখিন সিগারেট কেস বার করে ভদ্রলোক নিজের ঠোঁটে একটা সিগারেট ঝুলিয়ে কেসটা মণিদার দিকে বাড়িয়ে দিল।

মণিদা বলল, সিগারেট তো খাই-ই না, তবে তোমার দামী সিগারেট দেখলে লোভ হয়, দাও—

সিগারেট ধরিয়ে সনৎ চৌধুরী হৃষ্টমুখে বাপীর দিকে তাকালো—ভায়ার এখানে থাকা হবে নাকি?

হাঁ বা না কিছুই না বলে বাপী হাসতে চেষ্টা করল একটু। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে মণিদা বলল, হ্যাঁ, কলকাতায় আমি ছাড়া ওর আর কেউ কোথাও নেই—

এই প্রশ্ন আর জবাবের মধ্যে গৌরী বউদি মজার কি পেল বাপী জানে না। কিন্তু

মজাটুকু শুধু চোখেই ঠিকরলো। মুখে বলল, আমাদের তো মোটে তিনখানা ঘর, সন্তুর ওখানেও পাঠিয়ে দিতে পারো—অতবড় বাড়িতে একলা থাকে—দুজনেরই উপকার হবে।

নাম ধরে ডাকাটা বাপীর কানে ধরা পড়েছে। সনৎ বা সন্তু চৌধুরীর হাসিমাখা ভ্রূকুটি গৌরী বউদির দিকে।—উপকার হবে কিরকম?

—ও একটু চালাক চতুর হবে আর তুমি সৎসঙ্গ পাবে।

বাপী ছাড়া সকলেই হাসছে। কিন্তু শুধু মণিদার হাসিটা বোকা-বোকা লাগছে বাপীর।

মণিদা বলল, যাই বাজারটা সেরে আসি—

সন্তু চৌধুরী তক্ষুনি বলল, চলো আমিও যাই—

গৌরী বউদি সঙ্গে সঙ্গে চোখ পাকালো।—এই! একরাশ বাজার করে এনে আমাকে হেঁসেলে পাঠানোর মতলব?

সন্তু চৌধুরীর সাদামাটা জবাব, ছুটির দিনে আমার শুধু একটু ভালো খাওয়ার মতলব—সেটা তোমার ভিখুর দ্বারা সম্ভব হলে হেঁসেলে যাবে না।

এ কথার ফাঁকে বাচ্চু লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুকে সোজা সন্তু চৌধুরীর কোলে এসে জাঁকিয়ে বসল।—সন্তুকাকু, মা বলেছে আমি ওই বাপী কাকুর সঙ্গে এবারে চিড়িয়াখানা দেখতে যাব।

—খুব ভালো কথা। কবে?

জবাবের আশায় বাচ্চু তার মায়ের দিকে তাকালো। মুহূর্তের মধ্যেই কিছু একটু ভেবে নিল গৌরী বউদি। সন্তু চৌধুরীকেই জিজ্ঞাসা করল, দুপুরের দিকে তোমার গাড়িটা ফ্রি থাকবে?

—হুকুম হলেই থাকবে।

মণিদা জামা-কাপড় বদলাতে যাচ্ছিল। বাধা পড়ল।—দুপুরে তোমার কি কাজ?

মণিদার বিব্রত মুখ।—খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রামের পর আমার তো একবার বেরুতেই হবে।...গাড়ি থাকলে আর কি, বাপীই নিয়ে যেতে পারবে'খন।

ঘর ছেড়ে চলে গেল। গৌরী বউদি ছেলেকে বলল, ঠিক আছে, আজই যাবি।

বাচ্চু আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। কিন্তু সেই মুহূর্তে স্নায়ুতে স্নায়ুতে একটা সাড়া পড়ে গেল বাপীর।...গৌরী বউদির ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসি, পলকের তেরছা চাউনি সন্তু চৌধুরীর মুখের ওপর। বাপীর মনে হল, গৌরী বউদি ছেলেকেই শুধু খুশী করল না। পলকের ওই কটাক্ষে সন্তু চৌধুরীর প্রতিও কিছু যেন অযাচিত করুণার আশ্বাস।

...ভদ্রলোকের ছোট ছোট চোখে হাসি চিকচিক করছে।

সুখ কাকে বলে?

চেয়ারে বসে টেবিলের ভালো ভালো সাজানো খাবার আয়েস করে গলা দিয়ে নামানো? ভালো ঘরে খাটের উপর গদির বিছানায় শুয়ে আরামে রাত কাটানো?

তা যদি হয় তো দেড়টা মাস বেশ সুখেই কেটে গেল বাপীর। বাইশ বছরের মধ্যে এমন সুখ আর আরামের নাগাল আর কখনো পায় নি। তবু ভোর হতে না হতে ঘুম ভাঙে। এটা বরাবরকার অভ্যাস। কিন্তু এই সুখ যখন ছিল না, ঘুম ভাঙার পরেও তখন ইচ্ছে করলে বিশ-তিরিশ মিনিট আমেজের মধ্যে কাটিয়ে দিতে পারত। ঘুম ভাঙার সঙ্গে

সঙ্গে এখন এই গদির শয্যা পিঠে খোঁচা মেরে তুলে দেয়।

খাট-পাতা মাঝের ঘরটা সম্ভবত অতিথি-অভ্যাগতর জন্য। কিন্তু দেড় মাসের মধ্যে বাপী একমাত্র পাশের বাড়ির সন্তু চৌধুরী ভিন্ন এই ফ্ল্যাটে অন্য কোনো নতুন মুখ দেখে নি। শুধু খাট নয়, দেয়াল ঘেঁষে চকচকে ড্রেসিং টেবিলও আছে একটা। জিনিসপত্র রাখার দেয়াল আলমারি আছে। ড্রেসিং টেবিলের পাশে আলনাও। গৌরী বউদি বাপীর জন্য এই ঘরটাই বরাদ্দ করেছে। খাটে নিজের ছেঁড়া-খোঁড়া বিছানা-বালিশেরও ঠাঁই হয় নি। গৌরী বউদি বলেছে তোর ওই রাজ-শয্যা এখানে চলবে না—সরিয়ে রাখ।

নিজেই চাদর বালিশ আর একটা সুন্দর বেড-কভার বার করে দিয়েছে। বলেছে, সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে—আমি নোঙরা দেখতে পারি না।

গোড়ার তিন-চার দিনের মধ্যে নিশীথ ওর খবর নিতে এসেছিল। থাকার ব্যবস্থা দেখে ওরও চমক লেগেছিল।—লোয়ার ডিভিশন হলে কি হবে, রাজার হালে আছিস দেখছি।...তোর মণিদা তাহলে বড় চাকরিই করেন।

এত আরাম সত্ত্বেও ভোর না হতে বাপীর ঘুম ভাঙে। বাথরুম, মুখ-হাত ধোয়া সেরে বসার ঘরের দরজা খুলে পা-টিপে তিনতলার ছাদে উঠে যায়। আধ ঘণ্টার ওপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো মজবুত আর তরতাজা রাখার মহড়া চলে।

নিঃশব্দে খানিক হাত ছোঁড়াছুঁড়ি ঝাঁপাঝাঁপির পর লম্বা ছিপছিপে শরীরটাকে নানাভাবে দুমড়ে বাঁকিয়ে চুরিয়ে হাড়গোড়সুদ্ধু যথেচ্ছ বশে আনার চেষ্টায় দরদর করে ঘাম ছুটতে থাকলে এ-পর্বের শেষ। বানারজুলির দৌড়ঝাঁপ আর জঙ্গল টহল দিয়ে বেড়ানো বন্ধ হবার পর থেকে বাপীর এই অভ্যেস। কোনদিন বাদ পড়লে বিচ্ছিরি লাগে, গা ম্যাজম্যাজ করে। ঘরের বদলে এখানে খোলা ছাদ পেয়ে আরো সুবিধে হয়েছে। দেড় মাস ললিত ভড়ের বাড়িতে একসঙ্গে কাটানোর সময় সেই পেটুক-ভড় ওর এই কসরত করা দেখে খুশি হয়ে দু-তিনটে যোগ-ব্যায়ামও শিখিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, জানতাম তো অনেক কিছু, এসব করলে রাক্ষুসে খিদে হয়—তাই ছেড়ে দিয়েছি।

ঘাম মারতে সময় লাগে। ততক্ষণে পুবের কোণে লাল সূর্যটা খুব একটু একটু করে আকাশের ডাঙায় উঠে বসে। বাপীর ভিতরে তখন শুচি ভাব-টাব কিছু জাগে না। দেখতে শুধু ভালো লাগে। রোজ দেখে রোজই নতুন মনে হয়।

নিচে নেমে প্রথম কাজ শেভিংয়ের পর নিঃশব্দে স্নান সেরে আসা। আগে তিন দিনে এক দিন শেভ করত।—কিন্তু গৌরী বউদির তাও চোখে লেগেছিল। একবার চারদিন পরের শেভ করা মুখের দিকে চেয়ে চা খেতে খেতে বলেছিল, কালো মুখখানা তো ভালই দেখায়, খোঁচা খোঁচা দাড়ি রেখে ভূতের মতো থাকিস কেন—রোজ কামাতে পারিস না?

গৌরী বউদি মিষ্টি কথার ধার ধারে না। এই বলাটুকুর মধ্যেও বকুনির সুর। শুধু শেভ করা নিয়ে নয়, বাড়িতে আধ-ময়লা ধুতি পরে থাকাটাও তার চক্ষুশূল। সেই গোড়ার তিন-চার দিনের মধ্যেই বলেছিল, বাড়িতে পরিষ্কার পাজামা পরবি, টাকা না থাকে তো আমার থেকে ধার নিয়ে কয়েকটা করিয়ে নে—মাস কাবারে দিয়ে দিবি।

পুঁজির টাকায় হাত পড়ে নি। সেই দিনই আপিস ফেরত একসঙ্গে তিনটে পাজামা আর তিনটে সাদা পাঞ্জাবির অর্ডার দিয়ে এসেছিল। আপিসের জন্য পাঞ্জাবি বানানোর কথা আগেই ভেবে রেখেছিল।

...গৌরী বউদির ধারালো মুখে হাসি-ছোঁয়া রসিকতাও ঝরে। প্রথম যেদিন শেভিংয়ের পর স্নান সেরে মাথা আঁচড়ে সেই পাজামা পাঞ্জাবি পরে চায়ের টেবিলে এসে বসেছিল, গৌরী বউদি বড় বড় চোখ করে ওর দিকে চেয়ে ছিল। ঠোঁটে হাসির ফাটলও দেখা গেছল একটু। তারপর বাচ্চু আর মণিদার সামনেই বলেছিল, বাঃ তোকে একটা চুমু খেতে ইচ্ছে করছে যে রে!

মণিদা ভারী মুখ টিপে হাসছিল। মায়ের কথা শুনে আরো বেশি হেসেছিল সাত বছরের ছেলেটা। আর যতটা সম্ভব বোকার মতো লজ্জা পেতে চেষ্টা করছিল বাপী। কিন্তু ভিতরের গোপন সুড়ঙ্গ থেকে কারা যেন কিলবিল করে বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

স্নান সারা হবার পর বাপীর একটা বড় কাজ কাতুকুতু দিয়ে আর খুনসুটি করে বাচ্চুর ঘুম ভাঙানো। এখানে আসার চার-পাঁচ দিনের মধ্যে মায়ের কাছে বায়না তুলে বাচ্চু তার শয্যা বদল করেছে। এতদিন ছেলেটা বাড়িতে প্রায় নিঃসঙ্গ ছিল। কার সঙ্গে কথা বলবে, কার সঙ্গে খেলা করবে? সন্তু কাকা অবশ্য খুব ভালো, ওকে কত রকমের খেলনা কিনে দেয়, ছবির বই কিনে দেয়, ওর জন্য বড় বড় লজেন্স চকোলেটের বাক্স নিয়ে আসে। কিন্তু এক রবিবার সকালে ছাড়া তাকে আর পাচ্ছে কতটুকু। সন্ধ্যার পরে যখন আসে তখন কেবল মায়ের সঙ্গেই আড্ডা দেয়। বাচ্চুকে তখন পড়ার বই নিয়ে বসতে হয়। বাবা বেশির ভাগ দিন সকাল দশটায় বেরিয়ে রাত দশটার আগে বাড়ি ফেরে না। যেদিন আগে এসে পড়ে সেদিন বাচ্চুর খুব মজা। বাবা ওর সঙ্গে গল্প করে, খেলা করে, নিজের হাতে খাইয়ে দেয়। মায়ের সঙ্গেই সব থেকে কম ভাব। মা মারে-টারে না, কিন্তু একটু কিছু হলেই এমন করে তাকায় যে তাতেই ওর কান্না পায়। মা কখনো ওর সঙ্গে খেলে-টেলে কিনা বা ওকে আদর করে কিনা জিজ্ঞাসা করতে ছেলেটা পরিষ্কার জবাব দিয়েছিল, মা খেলতেও জানে না, আদর-টাদরও জানে না।

দুদিনের মধ্যেই বাপীকাকুকে খুব ভালো লেগে গেছে বাচ্চুর। ওর ভিতরেও তো কত কথা জমা হয়, কিন্তু সে-সব শোনার বাড়িতে আর দ্বিতীয় লোক নেই। বাপীকাকু শোনে, হাসে, ওর বুদ্ধির তারিফ করে। বিকেলে আপিস থেকে ফিরে ওকে নিয়ে বেড়াতে যায়, নয়তো দুজনে ছাদে গিয়ে হুটোপুটি করে। কিন্তু খেলা-ধুলো বা ছুটোছুটিতে এতবড় মানুষটা কেন যে সব সময় ওর সঙ্গে হেরে যায় বাচ্চু ঠিক বুঝতে পারে না। আর কত রকমের মজার গল্প করে করে পড়ায়। পড়তে একটুও খারাপ লাগে না।

রাতে বাপীকাকুর সঙ্গে শোয়ার হুকুম মিলেছে এই পড়াশুনার ছুতো ধরে। বাবা-মা ঘুম থেকে ওঠে সাড়ে সাতটায়, বাচ্চু তারও পরে। মুখ হাত ধোয়া আর সকালের খাওয়া সেরে পড়তে বসতেই সাড়ে আটটা। ওদিকে ন'টা বাজতে না বাজতে বাপীকাকুর আপিসের তাড়া। সকালে পড়বে কখন। অথচ বাপীকাকু ওকে বলেছে, সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে পারলে বাবা-মা ওঠার আগে ওর পড়াই শেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সকালে ও ওঠে কি করে?

পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে ছেলের পড়াশুনায় উৎসাহ তার মা ঠিকই লক্ষ্য করেছে। আর ফাঁকে ফাঁকে সকাল সন্ধ্যায় বাপীর পড়ানোর ব্যাপারটাও ঠিকই দেখেছে। যত হাঁদাই ভাবুক, গরিবের ছেলের এদিকে যে কিছু পটুতা আছে, সেটা তার মনে হয়েছে। এই জন্যেই শেষে ছেলের বাপীকাকুর সঙ্গে শোয়ার অনুমতি মিলেছে।

বাপী ঠিক ছ'টায় ওকে ঠেলে তোলে। মুখ হাত ধুইয়ে পড়তে বসাতে সাড়ে ছটা। আটটার মধ্যে পড়া শেষ। অত ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠতে সহজে চায় না। কিন্তু ওঠার পরে ওইটুকু সকালের মধ্যে স্কুলের সব পড়া সেরে ফেলার মজাটাও জানা ছিল না। আর প্রথম দিনেই ওর পড়া নিয়ে বাপীকাকুর সাহস দেখে তো বাচ্চু অবাক। চায়ের পাট শেষ হতে মা বলেছিল, যা আবার বই নিয়ে বোস্‌গে—

মায়ের হুকুম হলে বাচ্চু প্রতিবাদ জানে না। বাচ্চু কেন, কেউ জানে না। কিন্তু বাপীকাকু টক করে বলে দিল, সকালে দেড় ঘণ্টা টানা পড়া হয়ে গেছে, আবার বই নিয়ে বসবে কি? ওকে বলেছে, না রে, এখন আর পড়তে হবে না, তোর খেলার জিনিস কি আছে বার কর, আমি দেখব। তারপর আবার হেসে মাকে বলেছে, আমার হাতে ছেড়েছ, কটা দিন সবুর করে দেখো—

বাচ্চু ভেবেছিল, মা রেগেই গেল। বাপীকাকুর দিকে ভুরু কুঁচকে একটু তাকিয়েও ছিল। তারপর বাবার দিকে ফিরে কি রকম মজার সুরে বলেছিল, আবার দেমাকও একটু আছে দেখি!

বাপীর আপিস সেই খিদিরপুরে। নটার মধ্যে সে একলাই ভাত খেতে বসে যায়। মণিদা সাড়ে নটায় খেতে বসে। তার আগে বাপী খাওয়া শেষ করে বেরিয়েই পড়ে। সকালের খাওয়ার সময় কেউ তদারক করতে আসে না। তবু ভিখুর কল্যাণে সকালের সেই তাড়ার মধ্যেও খাওয়াটা ভালোই জোটে। দশটা-পাঁচটা আপিস। লোয়ার ডিভিশন হলেও সেখানকার আপার ডিভিশনরাও ইদানীং ওর প্রতি তলায় তলায় ঈর্ষান্বিত একটু। তার কারণ বড়বাবু মন্মথ সোমের অহেতুক স্নেহ। সেই স্নেহ যে এখন বাড়তির দিকে সেটা বাপীই সব থেকে ভালো অনুভব করতে পারে।

বড়বাবুকে হাসতে বড় দেখে না কেউ। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলার সময় মন্মথ সোম একটু-আধটু হাসেনও। প্রায়ই ওকে নিজের খুপরিতে ডেকে নিয়ে সামনে বসিয়ে কাজ করান। সকলের চোখে, বাপীর চোখে তো বটেই, এ-ও এক ভাগ্যের লক্ষণ। কাজের ফাঁকে অন্য কথাও দু-চারটে বলেন। বাপী এখন কোথায় আছে তাও জেনে নিয়েছেন। অত দূর থেকে ট্রাম-বাসের ভিড় ঠেলে ঠিক দশটায় হাজিরা দেওয়া ধকলের ব্যাপার। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাপীর কখনো লেট হয় না—এজন্যেও ভদ্রলোক খুশি। নিজের মুখেই সে-কথা বলেছেন। চাকরি-বাকরির মন্দা বাজার আর অনিশ্চয়তার কথাও মাঝে মাঝে বলেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ দেন, লেগে থাকো, আমি তো আছি—দেখা যাক।

দুটোর সময় নিজের একটা খুপরি ঘরে টিফিন করতে যান তিনি। ইদানীং মাঝে মাঝে বেয়ারা মারফৎ সেখানেও ডাক পড়ছে বাপীর। নিজের টিফিন বাক্স থেকে টিফিন বার করে ওকে খেতে দেন। বাপী তখন খুব লজ্জায় পড়ে যায়। কিন্তু ভদ্রলোক বলেন, আমি তো তোমার বাবার মতো, লজ্জা কি, খাও।

কেরানী মহলে মন্মথ সোমের সুনাম খুব নেই। কিন্তু বাপী মনে মনে তাঁকে শ্রদ্ধা না করে পারে না। নিশীথের বাবা তাঁর রোগ সারিয়েছেন, সেই কৃতজ্ঞতায় অজানা অচেনা একটা ছেলের প্রতি এত স্নেহ যাঁর, বাপী তাঁকে খারাপ ভাববে কেমন করে। নিশীথের রাম-কাকাও মাঝে মাঝে ওকে বলেন, বড়বাবু তোমার ওপর খুব খুশি—তোমার ভাবনা নেই।

অতএব, মাইনে যা-ই হোক, আপিসেও বাপীর সুখের দিনই চলেছে। বিকেলে বাড়ি ফেরার দশ মিনিটের মধ্যে খাবার টেবিলে ভিখু জলখাবার সাজিয়ে দেয়। পরিপাটী ব্যবস্থা। ভিখুর ওঠা-বসা চলা-ফেরা সবই বাড়ির কর্ত্রীর নির্দেশে। এখানে কর্তা কেউ নেই, একজন শুধু কর্ত্রী। ভালো খাওয়া-দাওয়া বা আরামে থাকার ব্যাপারে গৌরী বউদির এতটুকু কার্পণ্য নেই সেটা স্বীকার করতেই হবে। রাতের খাওয়া সকালের থেকেও ভালো। খাবার টেবিলে সে-সময় বাপীর দোসর শুধু বাচ্চু। মণিদা তো থাকেই না, গৌরী বউদিও সে সময় কমই বাড়ি থাকে। থাকলেও রেডিওর গান বা নাটক শোনে। নয়তো গল্পের বই পড়ে। সন্তু চৌধুরী এলে তার সঙ্গে গল্প করে।

রাতের খাওয়ার পর বাচ্চুর সঙ্গে গল্প করতে করতে আরামের শয্যায় শুয়ে ঘুম।

যা-ই হোক, সুখের এই যদি হিসেব হয়, বাপী সুখে নেই এ সে নিজেও জোর করে বলতে পারবে না। কিন্তু থেকে থেকেই বাপীর কেমন মনে হয়, এরকম সুখের সঙ্গে কোনো শিকড়ের যোগ নেই। একটা আলগা সুখের হাওয়ায় ও ভাসছে। হঠাৎ কোনো কারণে হাওয়াটা বন্ধ হতে পারে। হলে ধুপ করে মাটিতে আছড়ে পড়তে পারে।

ফলে এই দুটো মাস চোখকান সর্বদাই সজাগ তার। সুবিধে এই, মুখ দেখে সেটা কেউ বুঝতে পারে না। এই দেড়টা মাসে বাপী অনেক জেনেছে, অনেক বুঝেছে।

মণিদা তেমন বড় চাকরি কিছু করে না। কাস্টমস-এর ইন্সপেক্টর। আগে ছিল প্রিভেনটিভ অফিসার, তার থেকে ইন্সপেক্টর হয়েছে। মণিদা কথায় কথায় নিজেই গল্প করেছে, এর মধ্যেই বার দুই আর একটা প্রমোশনের কথা উঠেছিল তার। কিন্তু আর প্রমোশন-টমোশন চায় না। এই বেশ আছে।

কেন বেশ আছে বাপী ভালই আঁচ করতে পারে। সেই আটচল্লিশ সালে ইন্সপেক্টরের মাইনে সর্বসাকুল্যে সাড়ে চারশ-পাঁচশর মধ্যে। বাপীর ধারণা, ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে এই হালে মাস চালাতে কম করে বারোশ টাকা লাগে মণিদার। সেটা কি করে আসে আর কোত্থেকে আসে বোঝা কিছু শক্ত নয়। বাবার সেই ঠাট্টা ভোলে নি। বলেছিল, ওখানে তো মাইনের থেকে উপরি বেশি শুনেছি। প্রমোশন নিলে এই উপরিতে ঘাটতি পড়ে নিশ্চয়। মণিদা কেন সকাল দশটায় বেরিয়ে রাত দশটার আগে ঘরে ফেরে না তাও আঁচ করা সহজ। কাস্টমস-এর ব্যাপারে হানাদারির কাজ লেগেই আছে। এটা যত বেশি হয়, পকেটে কাঁচা টাকার আমদানিও ততো বাড়ে। শুধু টাকা কেন, ভালো ভালো জিনিসও কম আনতে দেখছে না বাপী।

ফাঁকতালে মণিদাকে নিজের ওখানে চাকরির তাগিদ দিতে গিয়ে বাপী আরো কিছু বুঝে নিয়েছে। মণিদা খোলাখুলি বলেছে, কেরানীর চাকরির ভবিষ্যৎ ওখানেও কিছুই নেই। আর প্রিভেনটিভ অফিসারের চাকরি সেরকম ধরা-করার জোর না থাকলে হয়ই না। তার ওপর ঘুষ লাগে এন্তার। এই প্রসঙ্গেও নিজের সম্পর্কে বেফাঁস কিছু বলে ফেলেছিল। প্রিভেনটিভ অফিসার থেকে প্রমোশন পেতে আমারই কালঘাম ছুটে গেছল, বুঝলি? বছরের পর বছর ওই এক জায়গায় ঘষ্টে মরছিলাম। শেষে সন্তুর এক খাতিরের মুরুব্বির জোরে হয়েছে—তাও কি এমনি, করকরে পাঁচটি হাজার টাকা তার পকেটে গুঁজে দিতে হয়েছে।

দুয়ে দুয়ে চারের হিসাবটা বাপী বড় সহজে করে ফেলতে পারে। ওর ধারণা মুরুব্বির

পকেটে গোঁজা ওই পাঁচ হাজার টাকাও সন্তু চৌধুরীর পকেট থেকেই খসেছে। কিন্তু মণিদার উন্নতির জন্য তার এত উদার হবার কারণ কি?

সন্তু চৌধুরীর গল্প শুনতেও বাকী নেই। মোটামুটি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। শিবপুরে এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পড়তে মাঝপথে ছেড়ে দিয়েছিল। মামার কনট্রাক্টরি ব্যবসায় ঢুকে পড়েছিল। সেই মামাটির আবার অনেক রকম বদ দোষ আর নেশা-টেশা ছিল। হুট করে মরেই গেল একদিন। ব্যবসার হাল সেই থেকে সন্তু চৌধুরীর হাতে। রোজগারপাতি আগেও ভালই হচ্ছিল। একেবারে লাল হয়ে গেল এক যুদ্ধের বাজারে। ধুলো-মুঠি ধরলে সোনা।

বাপী বোকা-মুখ করে জিজ্ঞাসা করেছিল, ভদ্রলোকের এত টাকাকড়ি, তবু এত বয়েস পর্যন্ত বিয়ে করলেন না যে?

কত আর বয়েস, বত্রিশ-তেত্রিশের বেশি নয়। করবে হয়তো একদিন। হেসে হেসে মণিদা বলেছিল, মেয়ে জাতটার ওপরেই ওর বিতৃষ্ণা—এখন যারা এগিয়ে আসে তারা কেবল নাকি ওর বাড়ি গাড়ি আর টাকা দেখে এগিয়ে আসে—ওকে দেখে নয়। মামার সঙ্গে যখন ছিল, তখন এক মেয়েকে ওর মনে ধরেছিল, আর স্মার্ট ছেলে দেখে সেই মেয়েও বেশ ঝুঁকেছিল। কিন্তু মামার ফার্ম শুনে বাড়ির লোক ছেড়ে সেই মেয়েও বেঁকে গেল। সেই মামার ফার্মে তখন যে ও চার আনা মালিক হয়ে বসেছে রাগের চোটে সেটা আর বললই না। আর একবার এক জায়গায় বিয়ে প্রায় ঠিক, কিন্তু সেই বাড়ির লোকেরা চুপি চুপি ওর ব্যাংক-ব্যালেন্সের খবর নিচ্ছে দেখে রেগে-মেগে বিয়ে ভণ্ডুল করে দিল।

আসলে ও একটু স্নেহের কাঙাল, বুঝলি। তোর বউদির কাছে ওটুকু পায় বলেই কেনা হয়ে আছে।

মণিদার এভাবে বলার আগ্রহটা ওর শোনার আগ্রহ থেকে কম নয়। বউদির স্নেহ আর অন্যজনের কেনা হয়ে থাকার নমুনা বাপী এই দেড় মাস ধরেই দেখছে। অবাকও লাগে। এর মধ্যে রাখা-ঢাকার কোনো ব্যাপার নেই। রোববারের সকালে ভদ্রলোকের বেশি বাজার করা এবং এখানে খাওয়া প্রায় বরাদ্দ। তাছাড়া সপ্তাহের মধ্যে সাত দিনই গৌরী-বউদি সন্ধ্যার পর হয় নিজের শোবার ঘরে বসেই তার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে, নয় তার গাড়িতে হাওয়া খেতে বেরুচ্ছে, নয়তো ছটা-নটার শোতে সিনেমা বা থিয়েটার দেখতে যাচ্ছে। মণিদা সাধারণত রাত দশটার আগে ফেরে না, কিন্তু গৌরী বউদি মাঝেসাঝে বাইরে থেকে রাতের খাওয়া সেরে আরো পরে ফেরে। এ নিয়ে মণিদার মুখে কখনো কোনো অভিযোগের লেশমাত্র দেখে নি বাপী। এমন কি ফেরার পর কোথায় গেছল, সে-খবরও নেয় না। গৌরী বউদি নিজের থেকে বলল তো শুনল।

বানারজুলির সেই হাসি-খুশি গৌরী বউদির এত উন্নতি দেখে বাপীর তাক লেগে যায়। দুনিয়ায় কাউকে যেন কেয়ার করার কিছু নেই তার।...স্নেহ পাওয়া আর কেনা হয়ে থাকার নমুনা দেখে এখানকার প্রথম সকালেই বাপীর স্নায়ুগুলো এক প্রস্থ নাড়াচাড়া খেয়েছিল।...মণিদা কাজে যাবে, সন্তু চৌধুরীর গাড়িতে বাপীর সঙ্গে ছেলেকে চিড়িয়াখানা দেখতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল গৌরী বউদি। তার পলকের কটাক্ষে সন্তু চৌধুরীও যেন কিছু অযাচিত করুণার আশ্বাস পেয়েছিল।...ও-রকম দেখাটা বা ভাবাটা নিজের একটা বিতিকিচ্ছিরি রোগ ভাবতে চেষ্টা করেছিল বাপী।

কিন্তু না। নিজের দুটো চোখ ওকে বড় ঠকায় না।

বাপীর এখন হাসি পায়। মণিদার কথা ভেবে অবাক হয় আবার একটু দুঃখও হয়। মণিদা সত্যি কি কিছু বোঝে না? আর রাগ হয় এই ছোট্ট ছেলেটার দিকে তাকালে। কাকুকে পেয়ে বাচ্চু বর্তে গেছে।

তবে গৌরী বউদিও বাপীর ওপর সদয় এখন। কারণ ছেলে। দেড় মাসের মধ্যে শেষের পর পর চারটে উইকলি রিপোর্টে বাচ্চু ক্লাসে ফার্স্ট। মাথা খাটিয়ে পড়াটা আনন্দের জিনিস করে তুলতে পারলে আর নিয়ম করে দু'বেলা নিয়ে বসলে ওটুকু ছেলের ফার্স্ট না হওয়াটাই আশ্চর্য।

বৈঠকখানায় বসে রবিবারের সেই সকালে বাচ্চুকে পালোয়ানের গল্প শোনাচ্ছিল বাপী। সামনে সেই পালোয়ানের ছবির বই খোলা। গৌরী বউদি এসে দাঁড়াল আর বিনা ভূমিকায় জিজ্ঞাসা করল, আপিসের চাকরি কেমন চলছে?

তাৎপর্য না বুঝে বাপী বলল, খাঁড়া তো ঝুলছেই, যে-কোনদিন গলায় নেমে এলেই হল।

গৌরী বউদি বলল, তোকে ভাবতে হবে না, সন্তুকে বলে রেখেছি, ও নিয়ে নেবে। আজ এলে কথা বলে নিস—

ছেলের ফার্স্ট হওয়ার পুরস্কার সেটা বুঝতে অসুবিধা হল না। বাপীর ফাঁপরে পড়া মুখ। আমতা আমতা করে জবাব দিল, এ-রকম চাকরিতে একজনের মর্জির ওপর ভালো-মন্দ, তার থেকে ওই কাস্টমসেই কিছু হয় কিনা দেখ না বউদি।...সেই গোড়ার দিনে তুমি মণিদাকে বলেছিলে হাত-কড়া পরতে হবে,...লোভটোভের মধ্যে গিয়ে না পড়লে তা কেন হবে।

ভুরু কুঁচকে তাকালো গৌরী বউদি। অখুশি, আবার একটু অবাকও। এ ছেলে এমন কথা বলতে পারে ভাবে নি। বলল, মাথা তো বেশ খেলে দেখছি। কাস্টমস-এর চাকরি কি আমার হাতের মুঠোয় যে চাইলি আর দিয়ে দিলাম।

বাইরে চটির শব্দ। বাপী আর কিছু বলার ফুরসৎ পেল না। সন্তু চৌধুরী ঘরে ঢুকল আর হেসে প্রথমে ছেলেটাকে তোয়াজের সুরে জিজ্ঞাসা করল, বাচ্চুবাবুর কি করা হচ্ছে?

গল্প আর খেলার মাঝে মায়ের এসে দাঁড়ানোটা বাচ্চুর তেমন পছন্দ হয় নি। সোৎসাহে নিজের জগতে ফেরার ইচ্ছে। বলল, বাপীকাকুর কাছে পালোয়ানের গল্প শুনছিলাম—আমিও পালোয়ান হয়ে গেছি, বাপীকাকুকে একবার পাঞ্জায় হারিয়ে দিয়েছি। আর একবার হারাবো দেখবে?

গল্পের ফাঁকে এই কসরত একবার হয়ে গেছল। সোফায় বসে হাসিমুখে সন্তু চৌধুরী তাল দিল, বেশ, কেমন পালোয়ান দেখা যাক।

—বাপীকাকু চলে এসো।

সামনে ছোট টেবিলে কনুই রেখে আর এক প্রস্থ পাঞ্জা লড়ার মহড়া হল। বাপীকাকুর হাত নড়ছে না দেখে আগের বারের মতো বাচ্চু তার ছোট শরীরটা ওই হাতের ওপর চাপিয়ে দিতে বাপী হাল ছেড়ে হার মানল।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সন্তু চৌধুরী হাসি মুখেই মন্তব্য করল, ওকে অতটা ঠকানো উচিত নয় ব্রাদার, তোমার ড্র করা উচিত ছিল।

ছোট্ট ছেলেটা কি বুঝল সে-ই জানে। চ্যালেঞ্জের সুরে বলে উঠল, তুমি বাপীকাকুর সঙ্গে জিততে পারবে? লড়ে দেখো দেখি?

সন্তু চৌধুরীর খুশীর মেজাজ। তাকেও ছেলেমানুষিতে পেয়ে বসল। সিগারেট অ্যাশপটে গুঁজে সিল্কের পাঞ্জাবির হাত গোটাতে গোটাতে এগিয়ে এলো। পরিপুষ্ট বাহু। হালকা ব্যঙ্গের সুরে বলল, ওকে জোয়ান বানাচ্ছ, তোমার নিজের কেরামতিটা দেখা যাক।

এই ছেলেমানুষি দেখেই হয়তো গৌরী বউদির ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস একটু। বাচ্চু আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। আর বাপী যেন একটু বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেল। বলল, লেগে-টেগে যাবে না তো...?

শুনে জোরেই হেসে উঠল সন্তু চৌধুরী। বলল, তোমার পক্ষে ওই বাচ্চুই নিরাপদ তাহলে—

আমতা আমতা করে বাপী বলল, না, আমি আপনার কথা বলছিলাম...

সন্তু চৌধুরী থমকালো এবার। ছোট চোখ গোল হল। নিরীহ গোছের এই শেষের কথা শুনে গৌরী বউদিও কম অবাক নয়।

—আমার লেগে যাবে! এসো এসো, দেখাই যাক একবার—

টেবিলের সামনের সোফায় জাঁকিয়ে বসল। এমন কথার পর সমুচিত শিক্ষা না দিলেই নয়।

মাথায় সমান সমানই লম্বা হবে দুজনে। কিন্তু গায়ে-গতরে সন্তু চৌধুরী হৃষ্টপুষ্ট অনেক বেশি। লোকটার গায়ে জোর কেমন বাপীর ধারণা নেই। তবু মনে হয়েছে, এই লোককে জব্দ না করতে পারলে সত্যের জোর বলে কিছু নেই। মনে হয়েছে, শরীরের জোরটাই সব নয়। তাই অমন কথা অতি সহজে ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

টেবিলে কনুই রাখল। হাতে হাত মেলালো। ও-ঘর থেকে মণিদাও এসে হাজির তখন। মজা দেখছে। বাচ্চুর উত্তেজনা চরমে। আর গৌরী বউদি যেন অবিশ্বাস্য কিছু দেখছে।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে চাপ দিয়ে বাপীর হাত নোয়াতে চেষ্টা করছে সন্তু চৌধুরী। কিন্তু হাতটা যেন মাটিতে পোঁতা লোহা একখানা। ফর্সা মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে সন্তু চৌধুরীর। নভেম্বরের গোড়ায় হালকা ঠাণ্ডা সত্ত্বেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরছে। বাপীর মুখে ছেলেমানুষি কৌতুক। এক-একবার ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকাচ্ছে আর মিটিমিটি হাসছে। ও যেন তাকে সুযোগ দিচ্ছে সময় দিচ্ছে।

হাত সোজা রেখেই সোজা হয়ে বসল একটু। তারপর জোর বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে মুখের হাসিটুকু ধরে রাখার চেষ্টা বাপীর। ও জিতবে সেটা অবধারিত এখন। সেই চাপ ঠেকানোর চেষ্টায় সন্তু চৌধুরী দরদর করে ঘামছে। তবু ঠেকানো গেল না। কাত হয়ে হাতের পিছনটা টেবিলে শুয়েই পড়ল শেষে।

আনন্দে হাততালি দিয়ে তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাগল বাচ্চু। পকেট থেকে রুমাল বার করে সন্তু চৌধুরী ঘাম মুছছে। রীতিমতো হাঁপাচ্ছেও। মণিদা অবাক বেশ। গৌরী বউদি বাপীকেই দেখছে। তার চোখে নতুন বিস্ময়।

পকেটে রুমাল রেখে সন্তু চৌধুরী হাসতে চেষ্টা করল। হাসিটা খুব অকৃত্রিম নয়। বাপীর অন্তত মনে হলো তার পুরুষকার ঘা খেয়েছে। সন্তু চৌধুরী হেসেই বলল,

কংগ্রাচুলেশনস্।...তোমার চেহারাখানা বেশ ডিসেপটিভ ভায়া, না বুঝে ঠকেছি।

বাপী লজ্জা-লজ্জা করে সোফা ছেড়ে উঠল। বাচ্চুকে নিয়ে ও-ঘরে যাবে। আর তখনি কেন যেন একটু উদার হতে চাইল সন্তু চৌধুরী। বলল, তোমার বউদি আমার ফার্মে নিয়ে নেবার কথা বলছিলেন তোমাকে...একদিন বাড়ি এসো, আলোচনা করা যাবে।

বাপী নিরুত্তর। একটু বিব্রতও। জবাব গৌরী বউদিই দিল। তির্যক সুরে বলল, কোনো একজনের মর্জির চাকরি করার ইচ্ছে নেই ওর, কাস্টমস-এ ঢুকতে চায়—

সন্তু চৌধুরী আবারও যেন তেতো গিলল একটু।—তুমি বলেছিলে বলেই বলা, ইন দ্যাট্ কেস আই কান্ট হেলপ।

বাচ্চুর হাত ধরে বাপী তেমনি বিব্রত মুখ করেই বেরিয়ে গেল। পরে সমস্ত দিনের মধ্যে গৌরী বউদি যে অনেকবার লক্ষ্য করেছে ওকে, সোজা না তাকিয়েও বাপী সেটা অনুভব করেছে।...সন্তু চৌধুরী বলেছিল, অ্যাপিয়ারেন্স ডিসেপটিভ। অর্থাৎ বাইরে যেমন দেখায় ভিতরে তেমন নয়। চাকরির কথায় আর পাঞ্জা লড়ার ব্যাপার দেখে গৌরী বউদিরও সেই সংশয়।

দিন পনের বাদে বাপীরই ভুলে সেই সংশয়ের ওপর আবার নতুন আঁচড় পড়ল একটা। রোববার না হলেও কি একটা ছুটির দিন সেটা। মণিদাও বাড়িতে। ফুরসৎ মিললে তার কাগজ পড়ার বাতিক, বসাব ঘরে কাগজ পড়ছিল। এ ঘরে বাপী আর বাচ্চু। ছেলেটার এক্ষুনি বেড়াতে যাবার বায়না। সদ্য কেনা একটা সানগ্লাস পরে গৌরী বউদি ঘরে ঢুকল। হালফ্যাশানের মোটা লালচে ফ্রেমের চশমা। মস্ত মস্ত দুটো কালচে লাল কাঁচ। চোখ দুটির ওপর নিচের অনেকটা ঢাকা পড়েছে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে নিল একটু। তারপর বাপীর দিকে।

—কেমন হল?

বাপীর মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে এলো, বেশ মিস্টিরিয়াস লাগছে। পরক্ষণে আবার সামাল দিল, বেশ ভালো লাগছে...

গৌরী বউদির নতুন চশমা হাতে নেমে এলো। ভুরু দুটো প্রায় স্বভাবে কুঁচকোয় এখন।—মিস্টিরিয়াস লাগছে মানে বেশ ভালো লাগছে?

বাপী আর তার দিকে তাকালও না, কথাও বোধ হয় কানে গেল না। বাচ্চুকে তাড়া দিল, যাবি তো চল—

গৌরী বউদি বসার ঘরে চলে গেল। সেখানে সামনে মণিদা। গৌরী বউদির ধার-ধার কথা কানে এলো, তোমার ওই ভাইকে যত হাঁদা ভাবি আমরা ততো নয়—বুঝলে? সন্তুও সেদিন ওই কথাই বলছিল।

—কি হল আবার...। মণিদার গলা।

গৌরী বউদির কথা আর শোনা গেল না। সিঁড়ি দিয়ে ততক্ষণে সে হয়তো নিচে নামছে। কারণ, নিচে থেকে তাগিদ দেবার মতো করেই গাড়ির হর্ন বেজে উঠেছে।

সরলতার মুখোশ খুলে গেলে সুবিধে হবে না বাপী জানত। কিন্তু পরের মাসে অর্থাৎ ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ওটা ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার হয়ে গেল। বাপী তার জন্য একটুও প্রস্তুত ছিল না।

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে ব্রুকলিনের বড়বাবু মন্মথ সোমের ছোট কেরানী বিপুল

তরফদারের প্রতি অমন অঢেল স্নেহের কারণটা আকাশ থেকে হঠাৎ একটা গোলার মতো নেমে সোজা ব্রহ্মতালুতে আঘাত করেছে। শনিবার হাফ-ডে। আপিসের কিছু কাজের অছিলায় সেদিন মন্মথ সোম তাকে সঙ্গে করে নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন। থাকেন হাওড়ায়।

ফাইল মেলানো দশ মিনিটে হয়ে গেল। তারপর ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা প্রচুর আপ্যায়ন করলেন। ঘরের তৈরি অনেক কিছু খাওয়ালেন। কিন্তু সেই ভালো ভালো খাবার বাপীর গলা দিয়ে নামে না। কারণ, সেই আপ্যায়নে যোগ দিয়েছে বছর একুশ-বাইশের একটি মেয়ে। সোম কর্তা-গিন্নীর একমাত্র মেয়ে। নাম ঊষা। ফর্সা আর মোটাসোটা, কিন্তু মুখে কোন রকম শ্রীর লেশমাত্র নেই। সেই মুহূর্তে বাপী ব্যাপার বুঝে নিয়েছে। আর সেই প্রথমে ওর বাইশ বছর বয়েস শুনে মন্মথ সোম কেন খুশি হন নি তাও বুঝেছে। এমন কি ছাঁটাইয়ের বাজারে চাকরি কেন পেয়েছিল তাও আর অস্পষ্ট নয়। কর্তা-গিন্নী মেয়ের সামনেই মেয়ের অনেক প্রশংসা করলেন।

পরের সপ্তাহেও এক রকম কাচপোকার মতোই মন্মথ সোম বাড়ি টেনে নিয়ে গেলেন ওকে। আপ্যায়নের ত্রুটি নেই। এবারে মেয়েকে রেখে কর্তা-গিন্নী মাঝে মাঝে উঠেও গেলেন। মেয়ের মুখ দেখেই বাপীর মনে হল সে স্থির জেনে বসে আছে দুজনের সম্পর্কটা কি দাঁড়াবে। বাপীর পছন্দ অপছন্দের কোনো প্রশ্ন নেই, ওই মেয়ের ওকে পছন্দ হয়েছে সেটা স্পষ্ট।

সরাসরি প্রস্তাব এল মেজবাবু রামনারায়ণ গাঙ্গুলি—নিশীথের রাম কাকার মারফৎ। সঙ্গে লোভের টোপ।—আর কি, বরাত তো ফিরে গেল তোমার, ওই একটিই মেয়ে, বড়বাবুর বাড়ি ঘরদোর যা-কিছু সব তোমারই—আর, মেয়েটারও খুব পছন্দ দেখলাম তোমাকে।

না, তাঁর গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় নি বাপী। বলেছে, মাপ করবেন, বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

রামবাবু আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন, ঝাঁঝালো মুখে বাপী চেয়ার ঠেলে উঠে চলে গেছে।

চাকরি থাকবে না বুঝেছে। আর সেই দুর্ভাবনার কথাটা মণিদাকে না বলেও পারে নি। মণিদা যে সেটা গৌরী বউদিকে বলে দিয়েছে সেটা পরদিনই বোঝা গেছে। কারণ গৌরী বউদির চোখে কৌতুকের ঝিলিক। বিয়ে করতে রাজি নয় বলে চাকরি যাচ্ছে মণিদা তাও বলে দিয়েছে নিশ্চয়।

বড়বাবু—মন্মথ সোমের টেবিলে ডাক পড়েছে। থমথমে মুখ কিন্তু গলার স্বর নরম। —তুমি ভেবে দেখো একটু, লোয়ার ডিভিশন থেকে তোমাকে আপার ডিভিশন করে দিতেও আমার বেশি দিন লাগবে না।

—মাপ করবেন।

নিজের চেয়ারে ফিরে এসেছে।

মাসের সতের তারিখে রামবাবু ছাঁটাইয়ের নোটিস ওর হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, কাল দুটোর মধ্যে এসে এ ক'দিনের মাইনে নিয়ে যেও।

হ্যাঁ, বাপী জ্বলতে জ্বলতেই বাড়ি ফিরছিল। মেয়েরাই ওর জীবনের প্রধান শত্রু।

সমস্ত মেয়ে জাতটাকে ছারখার করে দেবার মতোই ভিতরের আক্রোশ আর জ্বলুনি।

দুপুর আড়াইটে তখন। মাথার ওপর শীতের সূর্যটাও আজ বেশি জ্বলছে। বাপী শর্টকাট করে সামনের ছোট পার্কের ভিতর দিয়ে আসছিল। পা দুটো থেমে গেল। সামনের বারান্দায় গৌরী বউদি দাঁড়িয়ে। আর লাগোয়া পাশের বাড়ির বারান্দায় সন্তু চৌধুরী দাঁড়িয়ে। সে যেন চোখের ইশারায় মাথা নেড়ে নেড়ে নিঃশব্দে কিছু আর্জি পেশ করছে। বাপীর মনে হল, গৌরী বউদিকে ডাকছে বা নিজে আসতে চাইছে। গৌরী বউদির ঠোঁটে হাসি, চোখে হাসি। অল্প অল্প মাথা নেড়ে আর্জি নাকচ করছে।

রাস্তাটা পার হবার পর দু'জনেই দেখল বাপীকে। বাপীর স্নায়ু আর নিজের বশে নেই তখন। ওকে দেখেই সন্তু চৌধুরীর বিমর্ষ মুখ। গৌরী বউদি সচকিত একটু। তারপর সন্তু চৌধুরীর দিকে চেয়ে হাসছে।

বাপীর ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। বসার ঘর দিয়ে ঢুকতে হবে। এটাও দুপুরে বন্ধই থাকে। খটাখট শব্দে জোরেই কড়া নাড়ল।

গৌরী বউদি দরজা খুলে দিল। মুখখানা দেখল একটু ভালো করে। একেবারে অন্য রকম লাগছে। জিজ্ঞেস করল, এই মূর্তি কেন, কে তাড়া করল? সঙ্গে সঙ্গে নিজেরই হয়তো মনে পড়ল কিছু।—এ সময়ে যে? চাকরিটা গেল বুঝি?

ভিতরের গোপন সুড়ঙ্গের দরজা খোলা পেয়ে এক মুহূর্তে সেই আদিম হিংস্র পশুটা সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল। বাপীর আর অস্তিত্ব বলে কিছু নেই, কাণ্ডজ্ঞান নেই। সামনে খোলা চুল পিঠে ছড়ানো, ঢিলে-ঢালা বেশ-বাসে যে দাঁড়িয়ে—তার মুখ দেখছে, বুক দেখছে—এক উপোসী জানোয়ার বড় লোভনীয় গ্রাসের কিছু দেখছে।

হ্যাঁ, চাকরিটা গেল।...এ সময়ে এসে গেলাম বলে তোমার খুব অসুবিধে হল?

জবাবটা দেবার আগে হঠাৎ ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়ে গৌরী বউদি তিন-পা পিছনে সরে গেছে। আর, তারপরে বিস্ময়ের অন্ত নেই তার। সে-ও চেয়ে আছে।

...তারপর। গৌরী বউদি পিছন ফিরে ঢিমেতালে এ ঘরের দরজা দিয়ে মাঝের ঘরে। সে-ঘরের খোলা দরজা দিয়ে নিজের ঘরে।

বাপীর বুকের তলার দানবটার তখনো দাপাদাপি থামে নি।

বসার ঘরের দরজা বন্ধ করে মাঝের ঘরে অর্থাৎ নিজের ঘরে এলো। সামনের ঘরের খোলা দরজার দিকে চেয়ে নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে রইল খানিক। স্নায়ুগুলো কাঁপছে। কটা মুহূর্তের মধ্যে কি ঘটে গেল খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু জানোয়ারটা আবার ভিতরে সেঁধিয়েছে।

আস্তে আস্তে সামনে এগলো। খোলা দরজা দুটো শব্দ না করে বন্ধ করতে গেল। আধখানা বন্ধ করার আগেই নিশ্চল আবার।

ও-ঘর থেকে গৌরী বউদি ডাকল, বাপী শোন তো—

গলার স্বর যেমন সহজ তেমনি নির্লিপ্ত।

আধ-ভেজানো দরজা খুলে ভিতরে এসে দাঁড়াল। গৌরী বউদি শয্যায় শয়ান। কাঁধের শাড়ি আধখানা খসে বুকের ওপর উঁচিয়ে আছে। ঘাড় ফিরে তাকালো। চোখে হাসি। ঠোঁটে হাসি।

—এদিকে আয়।

ভিতরের জানোয়ারটাকে আর চেষ্টা করেও খুঁজে পাচ্ছে না বাপী। কয়েক পা এগিয়ে এলো।

অল্প অল্প হাসছে গৌরী বউদি। সেই হাসিটা ওকে শয্যার আরো কাছে টেনে নিয়ে যাবার মতো।

—তুই এত পাকা হলি কবে থেকে?

—তোমরা বানারজুলি যাবারও অনেক আগে থেকে।

—হুঁ? চোখে বিস্ময় ঝরল। সেই সঙ্গে আরো কিছু।—তাহলে অত বোকার মতো থাকিস কেন?

—তাতে সুবিধে।

—কি সুবিধে?

—লোকে বোকা ভাবে সেই সুবিধে।

তেমনি অল্প অল্প হাসছে গৌরী বউদি। হঠাৎ বানারজুলির সেই ননদভাজ সাপুড়ে মেয়ে দুটোকে মনে পড়ল বাপীর। বিশেষ করে ছট্টু মিয়ার বউ দুলারিকে। সাপের ছোবল খাবার লোভ, ছোবল খাওয়ার নেশা। সাপ যত ফোঁসে সামনে পিছনে সেই মেয়ে তাতে দোলে আর হাত বাড়ায়।

—গৌরী বউদির চোখেও সেই লোভ। না, তার থেকেও বেশি কিছু। তাজা কাঁচা একটা পুরুষ দেখছে গৌরী বউদি।...ব্যভিচার বয়েস জানে না। কিছু মানে না। হাসছে অল্প অল্প। বলল, বসার ঘরে দরজা বন্ধ আছে তো? কেউ ঢুকে পড়লে চেয়ার টেবিলসুদ্ধ যাবে—

শয্যার মাথার দিকের দরজার দিকে তাকালো বাপী। ছিটকিনি তোলা। বসার ঘরের দরজা বন্ধ থাকলে তিন ঘরের কোনটাতে কারো ঢোকার উপায় নেই বটে।

—দেখছি। বাপী ভিতরের দরজার দিকে পা বাড়ালো।

পিছন থেকে গৌরী বউদি বলল, দেখে আয়—তোর সঙ্গে কথা আছে।

ভিতরের জানোয়ারটার অস্তিত্বসুদ্ধ উবে গেছে। ওর সত্তা বিষাদে ডুবছে, তলিয়ে যাচ্ছে। দেয়ালে বাপীর আর বাচ্চুর নতুন তোলা ফোটো। ছেলেটা দুষ্টু দুষ্টু হাসছে বাপীর দিকে চেয়ে। বাপীর চোখ দুটো শিরশির করছে, বুকের হাড়ে হাড়ে কান্না গুমরে উঠতে চাইছে।

বসার ঘরে এলো। নিঃশব্দে বন্ধ দরজা দুটো খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালো। দরজা দুটো বাইরে থেকে আবার আস্তে আস্তে টেনে দিয়ে নিচে চলে এলো।

ফিরল রাত দশটার পরে। মণিদা তখনো বসার ঘরে। মাঝের ঘরের বিছানায় বাচ্চু নেই। অর্থাৎ আজ মায়ের কাছে ঘুমুচ্ছে। গৌরী বউদির মুখ দেখা গেল না। কিন্তু বাপী ঠিক জানে সে তার ঘরেই আছে।

...না, পরদিন সকালে মণিদার কোনো শাসন চাবুক হয়ে নেমে আসে নি। উল্টে তারই ভীরু মুখ। আমতা-আমতা করে বলল, হঠাৎ কি যে হল তোর বউদির...তোকে আজই চলে যাবার কথা বলছে।

যেতে হবে বাপী জানত। মাথা নাড়ল। আজই যাবে।

বাচ্চুর চোখে ধুলো দিয়ে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ল। মাসের ষোল দিনের মাইনে নেবার জন্য দুপুরে ব্রুকলিনে এলো। বেরিয়ে আসার সময় দুঃখ আর সহানুভূতি জানাতে জানাতে রতন বণিক গেট পর্যন্ত এলো। ভালো মানুষ বিপুলবাবুর এত চট করে চাকরিটা চলে যাবে, এ ও ভাবতেই পারে নি।

কি মনে হতে বাপী বলল, যা হবার তো হল। আমাকে দিন কতকের একটু মাথা গোঁজার মতো জায়গা বলে দিতে পারো? তুমি থাকো কোন্ দিকে?

—ভবানীপুরের দিকে। রতন বণিক অবাক একটু।

বাপী হেসেই বলল, আজ থেকে থাকার জায়গাও নেই...যেখানে হোক একটু জায়গা পেলে হত, টাকাও কিছু দিতাম।

রতন বণিকের মুখখানা দরদে ছেয়ে গেল। বলল, বাড়ুতি একটা খুপরি ঘর তো আমারই আছে...কিন্তু সেখানে তো আপনি থাকতে পারবেন না, একেবারে বস্তির মতো।

বাপী আশার মুখ দেখল। লোকটা সত্যি ভালো।...আর ভদ্রলোকের থেকে অনেক ভালো। সাগ্রহে বলল, আমি খুব পারব, তোমার অসুবিধে হবে না?

রতন বণিক এরপর ছুটে গিয়ে বাকি সময়টুকুর জন্য ছুটি নিয়ে এসেছে। তারপর বাপীর সেই সামান্য মাল-পত্র বয়ে তাকে সঙ্গে করে টালি এলাকার খুপরি ঘরে এনে তুলেছে।

...গৌরী বউদি ঘর ছেড়ে বেরোয় নি। বাচ্চু তখন স্কুলে। মণিদা আপিসে।

## ছয়

মিষ্টি হাসছে। বাপী তরফদারও।

মিষ্টি বলল, সেই দস্যি তুমি আজও আমার পিছনে লেগে আছ, কি করে বুঝব! আর আমি চিনবই বা কি করে, মাঝের আটটা বছর কি কম নাকি!

বাপী বলল, আমি তো গণৎকারের ওখানে তোমাকে দেখেই চিনেছিলাম।

মিষ্টি যেমন খুশি তেমনি অবাক।—কি করে চিনলে বলো তো! দশ বছরে যা ছিলাম, এই আঠেরো বছরেও কি তেমনি আছি নাকি আমি!...তখন তো ফ্রক পরতাম।

বাপী হাসছে। কিন্তু সত্যি কথাটা বলছে না।...বানারজুলির দশ বছরের সেই ফ্রক-পরা মিষ্টি আর কলকাতার এই আঠেরো বছরের শাড়ি-পরা আর কলেজে-পড়া মিষ্টি এক নয়। একরকমও নয়। বানারজুলির ফ্রক-পরা মিষ্টির একমাথা ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল, লালচে ফোলা-ফোলা গাল, বিশ্বাস-অবিশ্বাস আর বিস্ময়মাখা দুটো কালো চোখ, ধরে চিবুতে ইচ্ছে করত এমনি দুটো ফর্সা কচি কচি হাত আর আঙুল, গায়ে মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ। আটটা বছর জুড়লে সেই মিষ্টি এই মিষ্টি হয়, এ বাপী কল্পনাও করতে পারত না। মাথায় বড় খোঁপা। ফর্সা রঙে মেটে ছোপ ধরেছে। ফোলা গাল আর মুখের আদুরে ভাব গিয়ে অন্য ছাঁদ নিয়েছে। চোখের গোল ভাবটা পর্যন্ত এখন আয়ত-গভীর, তাতে বুদ্ধির ছোপ, কৌতুকেরও।...বেশি লম্বাও নয়, বেঁটেও নয়, মোটাও নয় আবার রোগাও নয়—পা থেকে মাথা পর্যন্ত ও যেন এখন কারো বেশ হিসেবের তৈরি। হিসেবের বাইরে যেটুকু সেটুকু

আরো বেশি লোভনীয় বলেই শাড়ির আড়ালে বেশ করে আগলে রাখার চেষ্টা। তবু সর্ব অঙ্গে তার উঁকি ঝুঁকির কামাই নেই।...না, এই মিষ্টি পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে বাপী হয়তো দাঁড়িয়ে যেত, দেখত। কিন্তু চিনতে পারত না। জ্যোতিষীর ঘরে ওর মাকে দেখে পলকে চিনেছিল। মাকে চেনার ফলে মেয়েকে চিনেছে।

কিন্তু এখন আর বুকের তলায় এতদিনের সেই ভীষণ যন্ত্রণাটা নেই। সেই ভয়ংকর আক্রোশও নেই। গোপন সুড়ঙ্গপথের সেই জানোয়ারটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। অনেক —অনেক যুদ্ধ অনেক ক্লান্তির পরে ও যেন তার লক্ষ্যে এসে পৌঁছেছে। আর তার কোনো খেদ নেই, কোনো ক্ষোভ নেই। এই মিষ্টি এখন তার মিষ্টি-মিষ্টি হাতখানা যদি মাথায় রাখে, যদি একটু হাত বুলিয়ে দেয়, পরম শান্তিতে বাপী তাহলে এখন ঘুমিয়েও পড়তে পারে।

রাগ বা ক্ষোভ না থাকুক, একটু অভিমানের কথা বলতে ইচ্ছে করছে তবু। বলল, এই আট বছরে আমি তোমাকে একটা দিনের জন্যেও ভুলিনি, কিন্তু তুমি দিব্যি ভুলে গেছলে—

মিষ্টির ঠোঁটে দুষ্টু দুষ্টু হাসি, আবার চোখের কোণে প্রতিবাদের হাল্কা কোপও একটু। জবাব দিল, এমনিতে ভুলে গেছলাম বটে, কিন্তু একেবারে ভোলার উপায় ছিল? বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু বুঝতে পারতাম, তখন হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে যেত। ...মিষ্টি খাব মিষ্টি খাব করে জ্বালিয়ে মারতে আর হাতের নাগালে পেলে কি কাণ্ড করতে। শেষে সেই একদিন...যাঃ! আমি বলব না—

বাপীর কান জুড়িয়ে যাচ্ছে; ভিতর জুড়িয়ে যাচ্ছে। সেই তাজা রক্তের স্বাদও মুখে আর লেগে নেই। বাপী হাসছে।—সেই একদিন বাবার হাতে শাস্তিখানা কেমন খেলাম তাও তো নিজের চোখেই দেখেছিলে।

মনে পড়তে গা শিউরে উঠল মিষ্টির। বাপীর তাও ভারী মিষ্টি লাগল।

—সে কথা আর বোলো না। আবু যখন তোমাকে ধরে নিয়ে এলো তখনো সবার আগে ছুটে গিয়ে তোমার মাথাটা মনের সাধে মাটিতে ঠুকে দিতে ইচ্ছে করছিল আমার। তারপর তোমার বাবার সেই পাগলের মতো মার দেখে আর তোমার নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরুতে দেখে সারা গা ঘুলোচ্ছিল, আর এত রাগ হচ্ছিল তোমার বাবার ওপর যে ইচ্ছে করছিল, বেঁটে মোটা লাঠিটা কেড়ে নিয়ে তাকেই ঘা-কতক বসিয়ে দিই।

...আশ্চর্য! সত্যি একটা মোটা লাঠির খোঁচা লাগছে গায়ে।

চমক ভেঙে বিষম ধড়ফড় করে সোজা হয়ে বসল বাপী তরফদার। না, বাপী স্বপ্ন দেখছিল না। জেগেই ছিল। বসেই ছিল। এখানে বসেই একটা খুব লোভনীয় বাস্তবের খুব কাছাকাছি পৌঁছে লাঠির খোঁচায় আচমকা এখানেই ফিরে এলো আবার। রাতের অন্ধকার ঘুটঘুটি এই পার্কে। বকুলতলার এই বেঞ্চিতে...।

...সেই থেকে বাপী তরফদার জেগেই আছে। বসেই আছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে মনে আছে। ছেলেমেয়েরা এসেছে, খেলাধুলো করছে, ছোটাছুটি হুটোপুটি করছে—মনে আছে। দিনের আলোয় টান ধরতে পার্কটা আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়েছে, সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নেমে আসতে একেবারে খালি হয়ে গেছে, তাও খেয়াল করেছিল।

তারপর এমনি বসে থেকে এমনি চোখ তাকিয়ে কতক্ষণ কিভাবে কেটে গেল তাই শুধু খেয়াল নেই। সমস্ত সত্তাসুদ্ধ কতক্ষণ উধাও হয়েছিল এখনো ঠাওর করতে পারছে না।

লাঠির খোঁচা পুলিশের। এখন সে পিছনে কাঁধ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে।

লোকটা ঝুঁকে দেখতে চেষ্টা করল, সঙ্গে সঙ্গে বড় শ্বাস টানল একটা। মদটদ খেয়ে ঝিম মেরে বসে আছে কিনা বোঝার চেষ্টা। মাথার ওপর বকুল গাছটার জন্য এখানটায় এক চাপ অন্ধকার। লোকটা মাঝবয়সী বাঙালী। কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল, এত রাতে এখানে বসে কি হচ্ছে?

বাপী বেঞ্চি ছেড়ে উঠল। সমস্ত দিন পেটে কিছু না পড়ায় মাথাটা ঘুরছে। যে বরাত, সন্দেহ হলে হয়তো টেনে নিয়ে গিয়ে লক-আপে ঠেলে দেবে। ক্লান্ত সুরে বলল, মনটা ভালো ছিল না সিপাই সাহেব...বসেছিলাম।

মাতাল-টাতাল নয়, মুখ দেখে চোর-ছেঁচড়ও মনে হল না। তবু পা থেকে মাথা পর্যন্ত আর একবার চোখ বুলিয়ে নিল। বলল, রাত বারোটায় মন ভালো করার জায়গা নয় এটা, অন্য পুলিশের খপ্পরে পড়লে আর কিছু না হোক হাতের ওই ঘড়ি খুলে দিতে হত। পা চালিয়ে চটপট ঘরে চলে যান—

পার্কের গেট পেরিয়ে কব্জির পুরনো ঘড়িতে সময় দেখল বাপী। বারোটা নয়, এগারোটা বেজে কয়েক মিনিট। ঘর এখান থেকে অনেক দূর, কম করে আধ ঘণ্টা লাগবে। শরীরটাকে টেনে নিয়ে চলল। একটা দোকানপাট খোলা নেই যে কিছু কিনে মুখে দেবে। ইচ্ছে করছে না, আবার শরীরও চলছে না।

...বিমনা হবার মতো রসদ পার্কে বকুলতলার বেঞ্চিতে বসেই সংগ্রহ করেছিল। হোক কল্পনা, কিন্তু তারই মধ্যে মিষ্টিকে খুব কাছে পেয়েছিল। খুব কাছ থেকে দেখেছিল। আর এক আশ্চর্য শান্তিতে বাপীর ভিতর-বার ডুবে গেছল। সেই শান্তির ছোঁয়ায় সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছিল কি না কে জানে! নইলে এত রাত হয়ে গেল কি করে...! এখনো সেই তৃপ্তির স্বাদটুকু ভিতরে লেগে আছে ।

মনটা সজাগ হয়ে উঠছে আবার। বেশ জোরও পাচ্ছে।...পার্কে বসে নিজের মন থেকে যে ছবি আঁকছিল সেটা এমন কিছু আজগুবী নয়। সত্যি হতে পারে না এমন কিছু নয়। বরং এর বিপরীত চিন্তাটাই বাপীর মাথায় একটা আশ্বাসের মতো এঁটে বসতে লাগল। আটটা বছরের ব্যবধান ঘুচিয়ে আবার কোনো নিভৃতে মুখোমুখি হতে পারলে বাপী যা ভাবছিল তাই হবে। মিষ্টির চোখে ওইরকমই বিস্ময় ঝরবে। তারপর মিষ্টি ওইরকম করেই হাসবে, আর ওই গোছের কথাই কিছু বলবে।

নিজের অজান্তে পা আরো দ্রুত চলছে বাপীর। দুপুরে ওই পার্কটায় বসে প্রথম যা মনে হয়েছিল, ঘুরেফিরে এখন তাই আবার মাথায় আসছে।...সাতাশি নম্বরের ওই বাড়িটার দোতলায় দাঁড়িয়ে মিষ্টি ঠাণ্ডামুখে আজ ওর নিগ্রহ দেখেছে। ওর ওপর পাড়ার ছেলেগুলোর হামলা দেখেছে। মিষ্টির চোখে সেটা অপরিচিতের নিগ্রহ। অপরিচিতের ওপর হামলা। কিন্তু এ-ই শেষ নয়। শেষ হতে পারে না। চৌদ্দ বছরের একটা ছেলের ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মুখ যদি শেষ কথা না হয়ে থাকে, আজকের এই অপমান আর নিগ্রহও শেষ কথা নয়। বাপী তা হতে দেবে না।

সামনে পিছনে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে চলেছে সেই থেকে। রাতের নির্জনে রাস্তা পাহারা দেওয়াটা ওদের যেন ডিউটি। পাড়া জানান দিতে দিতে খানিক সঙ্গ নেয়। ভয় পেলে তেড়েও আসে। ভয়শূন্য নির্লিপ্ততা দেখলে চেঁচানি থামে। তারপর আবার সামনের রাস্তার কুকুরের পালা। মিষ্টিদের সাতাশি নম্বরের বাড়ির সামনের সেই ছেলেগুলোকে আবার মনে পড়ে গেল বাপীর। আর সোনালী ফ্রেমের চশমা-পরা ফুটফুটে ফর্সা সেই ছেলেটাকে—পাড়ার ছেলেদের অসিতদা। তাদেরও কাউকে পাহারায় মোতায়েন রাখেনি কেউ। তারা নিজে থেকেই পাহারা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা খুশির ছবি চোখে ভাসল বাপীর।...এরপর মিষ্টির সঙ্গেই যদি ওরা ওকে ওই সাতাশি নম্বরের বাড়িতে ঢুকে যেতে দেখে তো কি করবে? কুণ্ডলী পাকিয়ে বসবে আর বার করা জিভ দিয়ে লালা ঝরবে?

পা দুটো থেমে গেল। পৌঁছে গেছে। ঘড়িতে রাত প্রায় বারোটাই এখন। টালি এলাকার বাইরেটা নিঝুম। ভিতরেও। তবু এত রাতে কেউ দেখে ফেললে কি ভাববে ঠিক নেই। কিন্তু সেটা সমস্যা নয়। লোকগুলো এমনিতে সরল। রতন বণিক ওদের যা বুঝিয়েছে তাই বুঝেছে। বিপুলবাবুকে ওরাও লেখাপড়া-জানা নির্বিলিক ভালোমানুষ জানে। সমস্যা অন্য। সমস্যা বাপী নিজে। সেই কারণে বিষণ্ণ। আবার সেই কারণে নিজের ওপর অসহিষ্ণু।

...সমস্যা ওর ভিতরের সেই জানোয়ারটা। ওটা খোলস থেকে বেরিয়ে পড়লে নিজের ওপর বাপীর আর এতটুকু দখল থাকে না। মেয়েরা দেখা মাত্র সেই মাংসলোলুপ জানোয়ারটাকে চেনে।...গৌরী বউদি দেখেছিল। দেখেই চিনেছিল। প্রশ্রয় দিতে চেয়েছিল। জানোয়ারটা আবার খোলসে ঢুকে গেছল বলেই মণিদার সেই আরামের ঘর ছেড়ে আজ ও এইখানে।...আজ আবার তেমনি দিনেদুপুরেই ওটা আচমকা খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। খুব কাছে এসে ঝুঁকে ছেঁড়া জামার ভিতর দিয়ে পিঠে আঘাতের দাগ আছে কিনা দেখতে গেছল রতন বণিকের বউ কমলা বণিক। জানোয়ারটা তখন দুটো চোখের ভেতর দিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে ওর ওপরেও ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিল। কমলা ওটাকে দেখেছে। চিনেছে। বিষম হকচকিয়ে গিয়ে কয়েক পা পিছনে সরে গেছে।

হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে গৌরী বউদিও খানিক পিছনে সরে গেছল। তারপর চোখের সামনে কাঁচা তাজা পুরুষ দেখেছিল। বয়েস ভুলে, সব ভুলে, পতঙ্গ পোড়ানোর নেশায় পেয়েছিল তাকে।

কমলা বণিক কি করবে?

পুলিশ তাড়া না করলে রাতটা ওই পার্কেই কাটিয়ে দিত।

পায়ে পায়ে উঠোনে চলে এলো। নিশ্চিন্ত একটু। কেউ জেগে নেই। কমলার ঘরের দরজা বন্ধ। যত সন্তর্পণে খুপরি ঘরের দরজা খুলুক, ক্যাঁচ করে শব্দ একটু হবেই। কিন্তু দরজা ঠেলতেই বাপী হাঁ একেবারে।

খাটিয়ার কাছে ছোট্ট একটা হারিকেন ডীম করা। ওটার সামনে ঝাঁপিতে কিছু চাপা দেওয়া। দেখেই বুঝল, ওটার নীচে বাপীর রাতের খাবার। এদিকের দেয়ালে ঠেস দিয়ে মেঝের ওপর হাত পা ছড়িয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে রতন বণিক।

বাপী নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল খানিক।...

সমস্ত দিন লোকটার মেহনতের মধ্যে কাটে। আপিসের কাজ কিছু আছেই, তার ওপর ভাগ্য গোনার ধকলে জিভের কামাই নেই। সন্ধ্যার পর এই খুপরি ঘরে বসে মৌজ করে একটু নেশা করে। ইচ্ছে করেই বাপী সে সময় ঘরে আর থাকেই না। নেশা বেশ জমে উঠলে রতন নিজের ঘরে যায়, খেয়েদেয়ে রাত সাড়ে আটটা ন'টার মধ্যে অঘোরে ঘুম।

...আজ বউয়ের হুকুমে ওর এই বাড়তি ধকল সম্ভবত।

কাঁধ ধরে জোরে নাড়া দেবার পর রতনের ঘুম ভাঙল। লণ্ঠনটা এত ডীম্ করা যে ভালো করে মুখ দেখা যায় না। তবু বাপীর মনে হল, ও এখানে এভাবে পড়ে ঘুমুচ্ছিল কেন নিজেই চট করে ঠাওর করে উঠতে পারছে না। বাপী বলল, ঘরে গিয়ে ঘুমোও গে যাও।

বিপুলবাবুর গলা শুনে মাথা পরিষ্কার হচ্ছে। শিথিল শরীরটা মেঝে থেকে টেনে তুলল। ঝুঁকে ছোট লণ্ঠনটা উসকে দিল। তারপর চোখ বড় করে বিপুলবাবুর মুখখানা দেখল। জিজ্ঞেস করল, রাত কত এখন?

—অনেক। বাপী বিব্রত বলেই ভিতরে ভিতরে বিরক্ত। এরকম কষ্ট করার কি দরকার ছিল, শুয়ে পড়োগে যাও।

রতনের দু চোখ ঘুমে বোঝাই। বলল, ওই আপনার খাবার ঢাকা দেওয়া আছে, খেয়ে নিন—

কথা না বাড়িয়ে ও বাইরে গিয়ে দরজা দুটো টেনে দিল। ঘুরে বাপী নির্দয় চোখে ঝাঁপিটার দিকে তাকালো। কারণ ওটার নিচে যা আছে তাই এখন সব থেকে বেশি দরকার ওর। ওটা দেখার পর পেটের তাগিদ এমনি যে গোগ্রাসে এখন গিলতে না বসে উপায় নেই।

খেতে বসল। সামগ্রী বিশেষ কিছু নয়। কিন্তু থালায় সাজিয়ে রাখার মধ্যে যত্নের ছোঁয়া আছে।...এটুকুর মধ্যেই কমলার সঙ্গে গৌরী বউদির একটা বড় তফাৎ। তবু এই রাতটা না কাটলে, বাপী কাল কি করবে? কাল কেমন করে মুখ দেখাবে? তার খাবার সাজিয়ে রাখা দেখে তলায় তলায় ভরসাও পাচ্ছে একটু।...সেই কটা স্তব্ধ হিংস্র মুহূর্তের মধ্যে কমলা সত্যি কতটা ভিতর দেখেছিল ওর? কতটুকু বুঝেছিল?...গৌরী বউদির মত অতটা নাও হতে পারে। কমলা হয়তো বা চণ্ডাল রাগ ভেবেই অমন হকচকিয়ে গেছল। আর তারপর সামলে নিয়ে নিজের জোর ফলিয়েছিল। বলেছিল, আমার ঘর থেকে আমাকে চলে যেতে বলার তুমি কে?...বাপী নিজেই চলে যাবার জন্য পা বাড়াতে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে বলেছিল, কই যাও?...মজা করে জিজ্ঞেস করেছিল, এক কাপ চা এনে দেবে কিনা। তারপর মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য ওকে চানে যেতে বলে ধীরেসুস্থে রান্না চড়াতে চলে গেছল। না খেয়ে ওকে বেরিয়ে যেতে দেখে আকুতি নিয়েই পিছন থেকে ডেকে ফেরাতে চেষ্টা করেছিল।

খেতে খেতে নিজের দিক টেনেই ভাবছিল বাপী। কিন্তু ভিতরের অস্বস্তিটা থিতিয়েই থাকল।

সমস্ত দিনের এত ধকলের পর খাটিয়ায় গা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ার কথা। কিন্তু ঘুম চট করে চোখের ধারেকাছে ঘেঁসবে না জানে।

...নিশীথ বলেছিল, তুই একটা রামবোকা। একটা মাত্র মেয়ে, তাও কালো-কোলো নয়, বেশ ফর্সা, স্বাস্থ্য ভালো। কোথায় জামাই হয়ে জাঁকিয়ে বসবি, বাড়ি-ঘরের মালিক হবি, শ্বশুর ওদিকে নিজের দায়ে তোর পাকা চাকরি আর প্রমোশনের জন্য ওপরওয়ালার কাছে হত্যা দেবে—তা না, নিজের গোঁয়ে চাকরিটাই খুইয়ে বসলি। কি লাভ হল?

রতন বণিকের এই খুপরি ঘরে এসে ওঠার পরদিন, অর্থাৎ চাকরিতে জবাব হয়ে যাবার তিন দিনের মধ্যে বাপী বন্ধুর কাছে ছুটে এসেছিল। কিন্তু কিছু বলার আগেই নিশীথের ওই কথা।

সঙ্গে সঙ্গে ভিতরটা ওরই ওপর উগ্র হয়ে উঠেছিল বাপীর। তুইও তাহলে সব জেনেশুনেই এই চাকরি নেবার জন্য আমাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলি।

পাল্টা ঝাঁঝ দেখে নিশীথ ওকে বুঝিয়েছিল, সে সময় ও সত্যি কিছু জানত না। পরে রামকাকা ওকে বলেছিল। তাও চাকরি হবার অনেক পরে, আর বড়বাবু মন্মথ সোমের ছেলে পছন্দ হবার পরে। বন্ধুকে একটু খুশি করার জন্যেও হতে পারে, নিশীথ আরো বলেছিল, তোর গায়ের রং ফর্সা না হলেও মুখের মধ্যে তো বেশ একটু মিঠে ভাব আছে—রামকাকার মুখে শুনেছি, শুধু বড়বাবুর নয়, তার মেয়েরও তোকে ভারী পছন্দ হয়েছিল...আমি কোথায় আশায় দিন গুনছিলাম, এর মধ্যে কাল রামকাকার কথা শুনে বুঝলাম সব চিত্তির। তুই বড়বাবুর আশায় ছাই দিয়েছিস, আর বড়বাবুও তোকে আপিস থেকে ছেঁটে দিয়েছে।...আমারই ভুল হয়েছে, ঘাড়ে চেপে থেকে তোকে রাজি করানো উচিত ছিল।

নিশীথের দোষ নেই বুঝে বাপীর রাগ পড়ে এসেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, তুই হলে কি করতিস?

—আমি? ওষুধের বড়ির মতো গলায় ফেলে টুক করে গিলে বসে থাকতাম। আরে বাবা, আমার কথা আলাদা, আমার যদি তেমন কোনো মেয়ে চোখে পড়ে বা মনে ধরে, তাতেই বা কি? কবিরাজের ছেলে হবু কোবরেজের সঙ্গে কোনো আধুনিক মেয়ে প্রেমে পড়ে এমন কথা নাটক-নভেলেও কখনো পড়েছিস?

...বাপী হেসে ফেলেছিল। নিশীথ আবাব বলেছিল, তোর মাথারই ঠিক নেই, নইলে কোন রূপসী আর বিদুষী তোর জন্যে মালা গাঁথছে যে এমন মওকা হেলায় হারালি!

খাটিয়ায় শুয়ে নিশীথের কথাগুলো মনে পড়ছিল। মিষ্টির সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা সেদিন কোনো কল্পনার মধ্যেও ছিল না। যত অবাস্তবই হোক, তবুও ওই কথা শোনার পর মনে হয়েছিল, কোথাও কেউ একজন ওর জন্যে অপেক্ষা করছে, করবে। করতে বাধ্য!...ব্রুকলিনের বড়বাবু মন্মথ সোমের প্রস্তাব শোনার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল কেন? এই কলকাতায় শিকড় গেঁথে বসতে পারাটাই তো তখন একমাত্র কাম্য ছিল, প্রাণপণে চাকরিটা রক্ষা করতেই তো চেয়েছিল, তবু অমন দিশেহারা দশা কেন সেদিন?

...বাপী ভাবছে কেন। মিষ্টির সঙ্গে অচিরে দেখা হওয়াটা সেদিনও কোনো কল্পনার মধ্যে ছিল না। নিশীথ যা বলেছিল সেই অসম্ভব ব্যাপারটা সত্তার মধ্যে ছিল।...কোথাও কেউ একজন ওর জন্যে অপেক্ষা করছে, করবে। করতে বাধ্য।

...কল্পনার বাইরে ব্যাপারটা ঘটেছে। সেই একজনের দেখা পেয়েছে। বাপীকে চিনতে পারেনি। কিন্তু পারলে কি হত? কি হবে? নিশীথ তবু কবিরাজের ছেলে হবু কবরেজ? বাপী কে? বাপী কি? এখন পেট ঠাণ্ডা, মাথা ঠাণ্ডা। ফলে করকরে বাস্তবটাও বেশি স্পষ্ট। এখন আর জোর দিয়ে ভাবা যাচ্ছে না কেউ একজন ওর জন্যে অপেক্ষা করছে, করবে বা করতে বাধ্য। আধুনিক মেয়ের বু কবরেজের প্রেমে পড়ার থেকেও এ বেশি হাস্যকর অবাস্তব।

স্নায়ু তেতে উঠছে আবার। যত অবাস্তবই হোক সেটা নস্যাৎ করার চেষ্টা। ...হিসেবের বাইরে কত কি ঘটে, কত কি হয়। বানারজুলির বিশালকায়া বনমায়ার চেহারাখানা সামনে এগিয়ে এলো। বুনো হস্তির ডাকে ভয়ে কুঁকড়ে না গিয়ে ওই বজ্জাত সকলের সব হিসেব বানচাল করে শিকল ছিঁড়ে ফি বছর তাঁর সঙ্গেই পালায় কেন? জাতের ভয় আর সমাজের ভয় শিকেয় তুলে ভীমবাহাদুর আর তার ভালবাসার কালো মেয়ে কাছাকাছি আসে কেমন করে? আবু রব্বানী কি এতদিন রেশমাকে নিজের ঘরে এনে তুলতে পেরেছে? এ-ও তো কোনো হিসেবের মধ্যে পড়ে না।

...অন্ধকারে বড় করে চোখ তাকিয়ে আরো কিছু দেখছে বাপী। বানারজুলি বাংলোর বড়সাহেবের সেই মেয়ে মিষ্টি আর সাতাশি নম্বর বাড়ির এই মিষ্টিকে পাশাপাশি দেখছে। কিছু ভেঙে আর অনেকটা জুড়ে সেই মিষ্টি থেকে এই মিষ্টি। বাপীও তাই। কিন্তু বাপী আর কত বদলেছে? আট বছর আগের সব কিছু তো একেবারে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যেঃ তাহলে সেই মিষ্টি বা কতটা বদলাতে পারে? কতটা বদলানো সম্ভব?

পার্কে নিজের কল্পনার ছবিগুলো সামনে এগিয়ে আসছে আবার। বাস্তব অবাস্তব সম্ভব অসম্ভবের দরিয়া পারেব ছবি।...মাথায় বড় খোঁপা। আগের ফুটফুটে ফর্সা রঙে এখন মেটে ছোপ। ফোলা গাল আর আদুরে ভাব গিয়ে এই মুখের অন্য ছাঁদ। চোখের সেই গোল ভাব এখন আয়ত গভীর। তাতে বুদ্ধির ছাপ, কৌতুকেরও।...মিষ্টি। পার্কে দেখা মিষ্টির সেই হাসি। সেই সব কথা। মন জুড়নো হাসি, প্রাণ জুড়নো কথা।

মিষ্টি! আমি বড় ক্লান্ত। তোমার একখানা হাত আমার মাথায় রাখো। আমি ঘুমিয়ে পড়ি!

বাপী ঘুমিয়েই পড়ল।

কলতলার কলরব জমে ওঠার আগে বাপী মুখ-হাত ধোয়া সেরে আসে। নইলে মেয়েদের জটলার মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়। কিন্তু অনেক দিন বাদে আজই ঘুম ভাঙতে দেরি। মাথাটাও অন্যদিনের মতো ভার-ভার নয়। উল্টে ঝরঝরে লাগছে। ওদিকে কলতলা জমজমাট।

কলসীর জল গড়িয়ে মুখ ধোয়ার কাজটুকু জানলা দিয়ে সারল। তারপর আবার শুয়ে চায়ের অপেক্ষা। এই সকালেও কমলার মুখোমুখি হওয়ার চিন্তা অস্বস্তিকর। সেটুকু চাপা দেবার জন্যই বাপী বেশি গম্ভীর। তার কেন যেন ধারণা, চা দিতে এসে কমলা আজ মুখে কোনো কথা বলবে না। শুধু চেয়ে দেখবে একটু। তারপর চায়ের গেলাস বাড়িয়ে দিয়ে চুপচাপ চলে যাবে। হাসা বা কথা বলার সুযোগ দিতেও চায় না বলে বাপী এমন গম্ভীর।...কিন্তু চা দিতে আজ দেরিই হচ্ছে।

ক্যাঁচ করে দরজা ঠেলার সেই পরিচিত শব্দ। পরের মুহূর্তে বাপী বিমূঢ়। এক হাতের

ডিশের ওপর ওর চায়ের গেলাস আর অন্য হাতে নিজের গেলাস নিয়ে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকছে রতন বণিক। আর সেই কটা মুহূর্তের মধ্যে বাপীর মনে হল, কমলার মুখে রোজ সকালের বড়বাবু ডাকটা বড় মিষ্টি লাগত।

রতন বলল, জেগে আছেন দেখছি—নিন। হাসছে।—পিওনের বউ হলে কি হবে, দেমাক খুব। বলে, আমাকে অপমান করলে আমি যাব কেন, তুমি যাও।

ডিশে বিস্কুটসহ গেলাসটা হাতে নিল বাপী। কমলা এলো না, স্বস্তি। রাগই যদি হয়ে থাকে তাহলে আরো স্বস্তি। কিন্তু এখানে অপমান শব্দটা খুব প্রাঞ্জল নয়। হাসতে চেষ্টা করে বলল, অপমান কি করলাম...।

—মেয়েছেলের কথা ছাড়েন। আপনার জন্যে রান্না হচ্ছে জেনেও আর পিছন থেকে ডাকাডাকি করা সত্ত্বেও আপনি নাকি না খেয়ে চলে গেলেন—সেই অপমান। আর বলে কি, আপনার খাবার-টাবার এবার থেকে আমাকেই দিয়ে যেতে হবে, ও পারবে না।

বাপী বলল, কিছু দরকার নেই, কাউকে দিয়ে যেতে হবে না।

রতন এবার মাথা নাড়ল—সে হবে না। বউ বলছিল, রাতে ছেড়ে দিনেও নাকি সব দিন আপনার খাওয়া হয় না। অতিথি না খেয়ে থাকলে গেরস্তের অকল্যাণ হয় এ সম্বন্ধে বউয়ের সঙ্গে আমি একমত। দিনে আপনিও কাজের ধান্ধায় ঘোরেন, আমিও সকাল সকাল আপিসে চলে যাই—যে ক'দিন না বউয়ের রাগ পড়ে, আপনার রাতের খাবার আমিই দিয়ে যাব। ফের আপনি রাতে উপোস দিচ্ছেন জানলে বউটা সত্যি ক্ষেপে যাবে...যত দেমাকই দেখাক ওর ভেতরটা ভালো, বুঝলেন বিপুলবাবু।

বাপী একটুও খুশি হতে পারছে না। বলল, তোমার বউয়ের কি ধারণা আমি পয়সার অভাবে উপোস দিচ্ছি?

রতন জিভ কাটল।—তা কেন, ছি-ছি-ছি, বউও জানে নিজের খেয়ালে থাকেন, তাই সময়ে খাওয়া হয় না—এই জন্যেই তো আরো বেশি মায়া। আপনার যদি সম্মানে লাগে না-হয় মাসের শেষে ধরে দেবেন কিছু—খাওয়াটা তো হবে।

আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই বুঝে বাপী চুপ। রতন বণিক এবারে একটু নিরীক্ষণ করে দেখল ওকে।—আপনার কপালের ভাঁজ এখন অবশ্য আরো একটু কালো হয়েছে...তা ভাল হবার আগে অনেক সময় অমন হয়। আপনার দিন ফিরতে আর খুব বেশি সময় লাগবে না, দেখে নেবেন।

হাত বাড়িয়ে ডিশ আর গেলাস নিয়ে রতন চলে গেল। বাপী বিমনা একটু। এরকম আশার কথা রতন অনেক বলেছে। বাপী কানে তোলেনি। কখনো বা হেসেছে। আজও ওর কথা বেদবাক্য ভাবছে না। শুধু রতনের এই বিশ্বাসের জোরটুকুই ভিতর থেকে যেন আঁকড়ে ধরতে চাইছে।

মাথার মধ্যে সময়ের একটা হিসেব ঘুর-পাক খাচ্ছিল বাপীর। স্নান সেরে জামাকাপড় বদলে সেই সময় ধরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। ট্রাম বা বাস ধরার দরকার নেই, হাতে সময় যথেষ্ট। হাঁটার ব্যাপারে পা দুটো বাধ্যও খুব। ট্রাম-বাসের ভিড়ে হাঁপ ধরে।

...সাতাশি নম্বরের সেই বাড়ির রাস্তা সকলের জন্য খোলা। শুধু বাপীর জন্য নয়। কিন্তু খোলা থাকলেও বাপী আজ ও-পথ মাড়াতো না। পাড়ার ওই ছেলেগুলোর হামলা

করার কোনো দরকার ছিল না। ওদের চোখের সাধ মেটানোর ভাগীদার নয় বাপী। পরের ভাবনা তাকে এমনিতেই ভাবতে হত। ভাবা হয়েছে।

...সাতাশি নম্বর বাড়ির সাদাটে গাড়ি রাস্তায় বাঁক নিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়ে। তারপর ডাইনে যায় কি বাঁয়ে, উত্তরে কি দক্ষিণে সেটুকুই আজ দেখা দরকার। আজ আর এর বেশি কিছু নয়।

সাদা গাড়ির নম্বরসুদ্ধু জানা। তাই বড় রাস্তার মুখোমুখি দাঁড়ানোরও দরকার নেই। সেখান থেকে কম করে একশ গজ দূরে একটা গাড়িবারান্দার নিচে এসে দাঁড়াল। সময় ধরে এসেছে, খুব অপেক্ষা করতে হবে না জানে। আট-দশ মিনিটের মধ্যে সেই সাদা গাড়ি বড় রাস্তার মুখে। ভাগ্য কি দুর্ভাগ্য বাপী জানে না। হর্ন বাজিয়ে গাড়িটা বাঁয়ে অর্থাৎ বাপী যেদিকে দাঁড়িয়ে সেইদিকে ঘুরল। তারপর একশ গজ গড়াতে আর কতটুকু?

মিষ্টি গাড়ির বাঁ দিকে। আপনা থেকেই বাপীর পা দুটো ফুটপাথ ঘেঁষা রাস্তার দিকে এগিয়ে এসেছে। কয়েক পলকের মুখোমুখি, চোখাচোখি। মিষ্টি চিনেছে। চিনেছে বলতে বে-পাড়ার যে ছেলেটাকে বাড়ির সামনে কদিন হ্যাংলার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে আর গতকাল দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাড়ার ছেলেগুলোর হাতে যার দুর্ভোগ দেখেছে—তাকে চিনেছে। আজ এইখানে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থটাও ওর কাছে যেন খুব স্পষ্ট। সেই কটা মুহূর্তের মধ্যে বাপীর মনে হয়েছে, মিষ্টি ওকে দেখেছে আর দেখার সঙ্গে সঙ্গে যেন তাকাতেও অরুচি।

গাড়িটা এগিয়ে গেল। বাপীর চোখে আগুন। বুকের তলায় সেই অসহিষ্ণু দাপাদাপি। কাল ওর পাড়ার ছেলেরা যে অপমান করেছিল, আজ এই বিতৃষ্ণা অবজ্ঞার চাউনি ছুঁড়ে ও যেন তার দ্বিগুণ অপমান করে গেল।

গাড়িটা কোন্ দিকে কোন্ রাস্তা ধরে যায় আজ শুধু একটু জানতে বুঝতেই এসেছিল। কিন্তু ওপরঅলার ইচ্ছে অন্য রকম। বাপী শ্যেনদৃষ্টিতে ওই চলন্ত গাড়িটার দিকেই চেয়ে ছিল। সামনেই বড় রাস্তার চার-মুখে দাঁড়িয়ে গেল ওটা। ট্র্যাফিকের লাল আলো জ্বলে উঠেছে। সবুজ হলে আবার চলবে।

সত্যি কেমন বরাত আজ বাপীর কে জানে। পরের যা প্ল্যান সেটা এই মুহূর্তে এভাবে হাতের মুঠোয় পাবে ভাবেনি। গাড়িবারান্দার ও-মাথায় একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। আট-দশ গজের মধ্যে। বাপী ছুটে গিয়ে উঠে পড়ল। বাঙালী ড্রাইভার ঘাড় ফেরাতে আঙুল তুলে সামনেটা দেখিয়ে দিল।

বাঁ দিকে পাঞ্জাবীর বুক পকেটের ওপর হাত রেখে চাপ দিল একটু। ধপ-ধপ কতটা করছে দেখার জন্যে নয়। খুচরো পয়সা নিচের পকেটে থাকে, আর টাকা পাঞ্জাবীর ভিতরের পকেটে। কলকাতার ট্রাম-বাসে চড়তে হলে সব জামার ভিতরে একটা করে পকেট দরকার সেটা নিশীথ ওকে গোড়াতেই বলে দিয়েছিল। যে কটি টাকা খরচ মাসে, ব্যাঙ্ক থেকে একবারেই তুলে ফেলে। খরচ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সে-টাকা ওর জামার সঙ্গেই ঘোরে। তবু সাবধানের মার নেই। আজ জামা আর পাজামা বদলেছে। আনতে ভুলেছে কিনা একবার ওপর দিয়ে স্পর্শ করে বুঝে নিল।

সাদা গাড়ির দুটো গাড়ি পিছনে ওর ট্যাক্সি। কলকাতার ট্যাক্সিতে বাপী এই প্রথম।

এর আগে বারকয়েক নিশীথের বাবার পুরনো গাড়িতে চাপা হয়েছে।...হলদে আলো এবং সঙ্গে সঙ্গেই সবুজ আলো। এ-দিকের গাড়ির সারি চলল।

খুব গম্ভীর গলায় ড্রাইভারকে বলল, ওই সাদা গাড়িটার পিছনে চলুন তো...। গাড়ির নম্বরও বলে দিল।—গাড়ির ওই মেয়েটি যে কলেজে পড়ে, আমার আগে সেখানে একবার যাওয়া দরকার, কলেজের নামটা মনে পড়ছে না...।

সাদা গাড়ির পিছনের কাচ দিয়ে ওই মেয়ের শুধু মাথা আর গলা দেখা যাচ্ছে। কয়েক মুহূর্তের উৎকণ্ঠার পর বাপী নিশ্চিন্ত একটু।—মিষ্টিদের বাড়ির ঠিকানা সংগ্রহ করতে গিয়ে জ্যোতিষীর হাতে নাকাল হওয়াটা ভোলেনি। ড্রাইভার ঘাড়ও ফেরালো না। সাদা গাড়ির পিছনে চলল।

হাজরায় সাদা গাড়ি ডাইনে বাঁক নিল। বাপীর ট্যাক্সিও। তারপর বেশ খানিকটা সোজা গিয়ে তারপর কোথা দিয়ে কোথায় চলল ঠাওর করা গেল না। এদিকের সব রাস্তাই বাপীর অচেনা। আরো খানিক বাদে সচকিত। এবারে চেনা লাগছে জায়গাটা। গাড়ি আর পিছনে ট্যাক্সি পার্ক সার্কাসের ময়দানের দিকে চলেছে। মণিদার বাড়ি থেকে মাইল দেড় দুই হাঁটা পথ। ওই ময়দানে বাপী অনেকবার এসেছে।...ট্যাক্সি এখন ছেড়ে দিলেও চলে। বাপী বুঝে নিয়েছে ওই মেয়ের কোন কলেজ। মেয়েদের একটাই নামডাকের কলেজ এখানে।

সামনের সাদা গাড়ি বড় ফটকের সামনে থামল। মস্ত কাঠের গেটের এক পাট খোলা। বাপী পঁচিশ-তিরিশ গজ পিছনে ট্যাক্সিটা দাঁড় করালো। সাদা গাড়ি থেকে নেমে মিষ্টিকে ভিতরে ঢুকে যেতে দেখল। গাড়িটা ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বাপী ট্যাক্সি থেকে নামল। মিটার দেখে ভাড়া মেটানোর সময় ট্যাকসিঅলা শুধু মুখের দিকে তাকালো একবার। সে হয়তো আশা করেছিল তাকে অপেক্ষা করতে হবে। কারণ ট্যাক্সিতে উঠে বাপী বলেছিল, মেয়েটি যে কলেজে পড়ে আগে একবার সেখানে যাওয়া দরকার। মুখে কিছু বলল না ট্যাক্সিঅলা, কিন্তু একবার চোখ তাকিয়ে যেন বলে গেল তোমার মতো সোয়ার আমার অনেক দেখা আছে।

পায়ে পায়ে ফটকের দিকে এগলো। গাড়িতে বাসে পায়ে হেঁটে দলে দলে মেয়ে আসছে আর ঢুকে যাচ্ছে। কলেজের চারদিক ঘেরা উঁচু পাঁচিল। এক-পাট খোলা ফটকের ভিতর দিয়ে সামনের বিশাল হলদে দালান দেখা যাচ্ছে। দুদিকে বাগান।

...না, এখন নয়। আরো ঘণ্টা কয়েক বাদে' বাপীর আর তাড়া কিছু নেই। ফিরে চলল। ময়দানে ঘোরাঘুরি করে কাটাল খানিক। তারপর আবার রাস্তা ধরে বেশ কিছুটা হেঁটে একটা বড় রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গেল। নিশীথের সঙ্গে ছোট রেস্তোরাঁয় খেয়েছে। কিন্তু এইদিন অন্য সব দিনের থেকে তফাৎ কিছু হবেই। ঢুকে পড়ল। মুখ-হাত ধোবার জায়গায় বড় আয়না। নিজেকে দেখে নিল। পাজামার বদলে পরনে ধুতি থাকলে ভাল হত। তবু পাটভাঙা পাজামা-পাঞ্জাবীতে খারাপ দেখাচ্ছে না। এ ব্যাপারে গৌরী বউদি ওকে একটু শৌখিন করে দিয়েছিল।

বেশ করে খেয়ে নিল। অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেল। হোক। সব থেকে বড় ফয়সলাই হয়তো আজ হয়ে যাবে। ছোট কিছু ভালো লাগছে না।

বাপী কিছু চিন্তা করছে না। কিচ্ছু ভাবছে না। সব ভাবনা-চিন্তা পরে। এলোমেলো

ঘোরাঘুরি করে সময় কাটাতে লাগল। দুটো যেন আর বাজবেই না।

বাজল একসময়। বাপী তখন কলেজ-ফটকের কাছাকাছি। দারোয়ান বসে আছে একজন। এখান থেকেই বাধা পড়বে কিনা কে জানে। না, কিছু বলল না। বাপী সোজা কলেজের দালানের দিকে চলল। দু-দিকের বাগানে দুটো-চারটে করে মেয়ে বসে।

হলঘরের সামনের কাঠের বেঞ্চিতে জনাতিনেক বেয়ারা বসে। ওদের মধ্যে বুড়ো মতো অবাঙালী লোকটাকে ডাকল। সে উঠে এলো।

—মালবিকা নন্দীকে চেনো? থার্ড ইয়ারে পড়ে।

পুরনো বেয়ারা, পুরনো ছাত্রীদের অনেককেই চেনে।—মালবিকা নন্দী কোন ডিপার্ট, হিস্টরি?

বাপী মাথা নাড়ল।

—কি দোরকার আপনার?

—খুব দরকার—একটু যদি খবর দাও...

আঙুল তুলে সে একটা ঘর দেখিয়ে দিল।—ওই আপিস ঘরে গিয়ে বোসেন—শিলিপ ভেজিয়ে দেন—

বাপী বলল, তুমি একটু সাহায্য করো না ভাই, আমি বাইরে থেকে এসেছি, কিছুই জানি না, একটা খবর দেওয়া খুব দরকার।

বিনয়ে তুষ্ট প্রায় সকলেই। আধবুড়ো বেয়ারা ওকে সঙ্গে করে আপিস ঘরে নিয়ে এলো। কেরানীবাবুকে নিজেই কি বলে একটুকরো সাদা কাগজ ওর হাতে দিল।—আপনার নাম লিখে দেন, আওর ঠিকানা।

পেন্সিলও সে-ই এগিয়ে দিল।

বাপী প্রথমে লিখল, মালবিকা নন্দী। তলায় লিখল, বাপী তরফদার। বানারজুলি ফরেস্ট।

বেয়ারা স্লিপ নিয়ে চলে গেল। বাপী আবার বাইরের বারান্দায়।

ছটা-সাতটা মিনিট নয় যেন একটা যুগ। বেয়ারা ফিরে এসে জানালো, পাঞ্চ মিনিটের মধ্যে কেলাস্ শেষ হোবে—ওপেক্ষা করুন, আসছেন।

অনেকক্ষণের একটা রুদ্ধশ্বাস মুক্তি পেয়ে বাঁচল। বাপী পায়ে পায়ে বারান্দা ছেড়ে নিচে নেমে এলো। তারপর ফটকটার দিকে কয়েক পা এগিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

...মিষ্টি তাহলে আসছে!

## সাত

মিষ্টি এলো। বারান্দায় পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

স্লিপটা পেয়ে আগ্রহ নিয়ে নেমে এসেছিল মনে হয়। কারণ বাপীর পুরো পাঁচ মিনিটও অপেক্ষা করতে হয়নি। কিন্তু চোখাচোখি হওয়া মাত্র তার দু'চোখে ধাক্কা খেল। বানারজুলির বাপী তরফদার এই লোক সেটা কল্পনার মধ্যেও ছিল না। শুধু অবাক নয়, অপ্রস্তুতও। কারণ, এখন হয়তো দেখা মাত্র মনে হয়েছে এই লোক বা এমন লোক বাপী তরফদার ছাড়া আর কে হতে পারে?

বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলার ইচ্ছে থাকলে বাপী এদিকে সরে আসত না। চুপচাপ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। চেয়ে রইল। দু চোখে হাসি ছুঁয়ে আছে কি নেই। বাকিটুকু প্রতীক্ষা। দেখার পর আর চেনার পর ওই মেয়ে এখন যদি মুখ ঘুরিয়ে আবার ভিতরে চলে যায়, জীবনের পুরনো অধ্যায় পুরোপুরি শেষ করে নিয়ে বাপীও নিজের পা দুটোকে গেটের বাইরে টেনে নিয়ে যাবে।

শেষ নয়। বারান্দা থেকে নামল।

...পরনে গাঢ় খয়েরি রঙের ওপর চকচকে সাদা বুটির শাড়ি। গায়ে ধপধপে সাদা ব্লাউজ। পায়ে হালকা শৌখিন স্যাণ্ডাল। বাপী ভোলে না কিছু। বানারজুলির সাহেব বাংলোয় লাল ডুরে শাড়ি পরা দশ বছরের মিষ্টিকে দেখে রূপকথার রাজকন্যার মতো মনে হয়েছিল। ওর সেই ঝলমলে শাড়ি সামলানোর বিড়ম্বনাটুকুও মনে আছে।...এখন এই পাতলা দামী শাড়ি দেহের ভাঁজে ভাঁজে অনায়াসে লেপটে আছে। একটুও বাড়তি নয়।

পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। আসার এই নিস্পৃহ ধরনটা বানারজুলির বাংলোর থেকে সেই মিষ্টির নেমে আসার সঙ্গে মেলে কিছুটা। আসার আগ্রহ যদি থাকেও, বুঝতে দিতে আপত্তি। দেড় গজ তফাতে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর একটুকরো হাসি ঠোঁটের ফাঁকে যেন এসেই গেল।

—এত দিনে চিনতে পেরেছ তাহলে?

বাপীর গলায় বাড়তি উচ্ছ্বাস নেই। অভিমানও না।

সোজা মুখের দিকে চেয়ে মিষ্টি দেখছে ওকে। বানারজুলির সেই দুরন্ত দস্যি ছেলেটাই যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হাসল। মাথা নাড়ল। চিনতে পেরেছে। হাসিমাখা কালো দুচোখ ওর মুখের ওপর নড়াচড়া করল একটু। জিজ্ঞাসা করল, তুমি চিনলে কি করে?

চোখে এর মধ্যে ওকে অনেকবার দেখেছে। আর মনে মনে তো অবিরাম দেখে চলেছে। আট বছর বাদে গলা এই প্রথম শুনল। কচি ছেলেব মতো হাল্কা মিষ্টি।

বাপী কি জবাব দেবে? বলবে গত আট বছরের মধ্যে আটটা দিনের জন্যেও তুমি আমার চোখের আড়ালে ছিলে না—আমি চিনব না কেন? গদ্যাকারের সত্যি কথাই বেরুলো মুখ দিয়ে। বলল, তোমাদের বাড়ির রাস্তার এ মাথায় এক জ্যোতিষীর চেম্বারে রাত্রে মায়ের পাশে বসে তুমি হাত দেখাচ্ছিলে...আমি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে তোমাকে দেখছিলাম।

মাত্র দিন কতক আগে মা জ্যোতিষীর কাছে নিয়ে গেছল সেটা মনে না পড়ার কথা নয়। মিষ্টি হাসছে অল্প অল্প আর দেখছে। একসঙ্গে অনেক দেখার আছে যেন। বলল, মা সঙ্গে ছিল বলে চিনেছ। ডেকে কথা বললে না কেন?

—এভাবে হঠাৎ তোমার দেখা পেয়ে খুব অবাক হয়ে গেছলাম।...তোমাদের বেরিয়ে আসার অপেক্ষায় ছিলাম।

—তারপর? মিষ্টি উৎসুক।

—তোমরা বেরিয়ে এলে। তখনো আমাকে হাঁ করে তোমার দিকে চেয়ে থাকতে

দেখে তোমার মা ঝাঁঝালো গলায় স্টুপিড বলে গাড়িতে উঠলেন। তুমিও খুব বিরক্ত হয়েছিলে—

মিষ্টির মুখে মিষ্টি বিড়ম্বনার খেলা।—কক্ষনো না, আমার কিছু মনে পড়ছে না।

মনে পড়ছে কি পড়ছে না তা নিয়ে বাপীর কোনো মাথাব্যথা নেই। মন বলছে আট বছর বাদে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে ওকে দেখে আর চিনে এই মেয়ে অখুশি নয়। আট বছর আগের সেই বানারজুলির দিনগুলি এই দুটো কালো চোখে একসঙ্গে ভিড় করে এসেছে। আসছে।

—তোমার ক্লাস আছে?

—ছিল। হাত উল্টে ঘড়ি দেখে নিল।—ক্লাস বসে গেছে, আর ঢোকা যাবে না।

—খুব ক্ষতি হল?

মিষ্টি হেসেই মাথা নাড়ল—খুব না।

—এ ঘণ্টার পরে ছুটি?

—না, আর একটা ক্লাস আছে।

একদিন এ ক্লাসও কামাই হলে?

হাসি-ছাওয়া দু'চোখ মুখের ওপর থমকালো একটু। নাকচ করার কথা কেন যেন ভাবাও গেল না। জবাব দিল, হলে আর কে কি কচ্ছে।...আচ্ছা একটু দাঁড়াও আসছি—

কয়েক পা এগিয়েই ঘুরে তাকালো।—এই একদিনই তো?

বাপী চেয়ে রইল। জবাব দেবার মতো প্রশ্ন কিছু নয়। কান-মন ভরে দেবার মতো কিছু। হালকা পা ফেলে মিষ্টি চলে গেল।

চারদিকে চেয়ে বাপী দেখছে। এটা গতকালের সেই পার্ক নয়। মিষ্টির এই আসা বা যাওয়া গতকালের মতো দিবাস্বপ্ন নয়। কিন্তু গতকালের সেই আমেজটুকুর সঙ্গে এই বাস্তবের বড় অদ্ভুত মিল। এক আশ্চর্য শান্তিতে সেই রকমই ভিতর-বার ডুবে যাবার মতো। পার্কে পুলিশের লাঠির খোঁচায় ঘোর কাটার পরেও ঘরের দিকে পা চালিয়ে বাপী ভাবছিল, আটটা বছরের ব্যবধান ঘুচিয়ে কোনো নিভৃতে এই মেয়ের মুখোমুখি হতে পারলে পার্কের সেই কল্পনার ছবিটা একেবারে মিথ্যে হয়ে যাবে না। হতে পারে না।

মিথ্যে হয়নি। বিস্ময়ের সেই হাবুডুবু ব্যাপারই দেখেছে। খুশির চাপা তরঙ্গ দেখেছে। হাসিটুকুও সেই রকমই।

মানুষের ভিতরের কোন দিকটা আসল সত্য, অনুভূতির এই জোয়ারে তারও হদিস মেলা ভার। জ্যোতিষীর ঘরে মায়ের পাশে এই মিষ্টিকে দেখা মাত্র অনেক—অনেক দিনের ক্ষুধার্ত স্নায়ুগুলো একসঙ্গে টান-টান হয়ে উঠেছিল। তারা বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কাণ্ডজ্ঞানশূন্যের মতো এই বাপী তরফদার দু'হাতের মধ্যে এসে মাকে ছেড়ে ওই মেয়েকে ব্যভিচারী দুটো চোখের বাঁধনে আগলে রাখতে চেয়েছিল। পিছনে লাল আলো জেলে সাদা গাড়িটা চলে যাচ্ছিল যখন, তখনো চৌদ্দ বছর বয়সের সেই প্রবৃত্তির আগুন বাইশ বছরের দেহের শিরায় শিরায় দাউ দাউ করে জ্বলছিল। পরেও সাতাশি নম্বরের বাড়ির রাস্তায় দাঁড়িয়ে যতবার দেখেছে ওকে, বাসনার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলেছে। আর গতকাল বাড়ির দোতলার বারান্দার রেলিং-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে নির্লিপ্ত মুখে ওর ওপর কতগুলো

হায়নার হামলা দেখছিল আর মজা পাচ্ছিল যে মেয়ে—তাকে কোন পাতালে টেনে নিয়ে যেতে পারলে সঠিক জবাব হয়, বুকের তলায় সেই নরক খুঁজে বেড়াচ্ছিল। প্রবৃত্তির সেই নিষ্ঠুর আদিম অভিলাষে সমস্ত মেয়ে জাতটাকেই দগ্ধে নিঃশেষ করতে চেয়েছে। ভিতরের পশুটা থাবা চেটেছে। তারপর একজনকে না পাওয়ার আক্রোশে আর একজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছে। কমলা বণিক কতটা দেখেছে কতটা বুঝেছে বাপী জানে না।

আজ?

পার্কের গতকালের অনুভূতিটুকুই ঠাণ্ডা প্রলেপের মতো ভিতরের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে। বুকের তলায় দুমড়ানো গুমরানো সেই ভীষণ যন্ত্রণার লেশমাত্র নেই। সেই ভয়ংকর আক্রোশ নেই। সুড়ঙ্গপথের সেই জানোয়ারটাও উধাও। তার পরিত্যক্ত শূন্য গুহা-গহ্বর খুঁজে বাপীর শান্ত দৃষ্টি আবার ওই হলঘরের বারান্দার দিকে।

আর ঘড়ি দেখেনি। তবু আট-ন' মিনিটের বেশি হবে না বোধ হয়। মিষ্টি আসছে। হাতে দুটো মোটা বই আর একটা বাঁধানো খাতা। লালচে মুখ। চোখে এখনো হাসি চিকচিক করছে। বানারজুলির বাপী ভাবত মিষ্টি কবে বড় হবে। বড় হয়েছে। বড় হবার পর বানারজুলির সেই সব কাণ্ড যদি মনে পড়ে তাহলে কোন মেয়ের মুখে না লালের আভা ছড়াবে?

বাপী হলপ করে বলতে পারে মনে পড়েছে। নইলে আসত না। পাত্তা দিত না।

কাছে এসে হাসি মুখে মিষ্টি বলল, দাদুকে অফিস চেম্বারে একটা ফোন করলাম। গাড়ি নিয়ে আসার দরকার নেই বলে দিলাম।

এই পুরস্কারটুকুও বাপী দুটো চোখ দিয়েই গ্রহণ করল। এখানে আর দাঁড়ানোর ইচ্ছে নেই। বানারজুলির মতো এই মিষ্টি মায়ের খুব পরোয়া করে মনে হয় না। তবু গেটের দিকে পা বাড়িয়ে জিগ্যেস করল, তোমার মা ভাববেন না?

মিষ্টির কথাবার্তায় আগেও ঘোরপ্যাঁচ ছিল না খুব, এখনো অনেকটা তাই, পাশে চলতে চলতে হালকা সুরে বলল, মাকে নিয়েই মুশকিল, সবসময় বেশি ভাবে—

—কি রকম?

—তাঁর ধারণা, দুনিয়ার সব ছেলে তাঁর মেয়েকে গিলে খাবার জন্য হাঁ করে আছে। হেসে ফেলে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো একবার।—কোথায় যাচ্ছি, এখানে তো বানারজুলির মতো জঙ্গল নেই...

কথাগুলো সরল হলেও একেবারে সরল ভাবা যাচ্ছে না। এই মুহূর্তে সহজ হবার দায় বাপীরই। সেও তাকালো একবার। স্বীকার করে নিয়েই জবাব দিল।—না, এখানকার জঙ্গল বানারজুলির মতো নয়...।

—এখানকার জঙ্গল মানে? মিষ্টির মুখে পলকা বিস্ময়।

বাপী হাসছে অল্প অল্প। গেটের বাইরে এসে মুখোমুখি দাঁড়াল। হালকা করে একটু ভারি জবাবই দিয়ে বসল।—বানারজুলির জঙ্গলে আর যাই বলো কোনরকম কৃত্রিমতা আর ছলনা নেই। পাঁচ মাস হল এসে দেখছি এখানে সবটাই তাই। শব্দ করে হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সামাল দেবার চেষ্টা। বলল, কেবল এই খানিকক্ষণ হল অন্য রকম লাগছে—

অর্থাৎ খানিক আগের এই যোগাযোগের পর থেকে কৃত্রিমতা বা ছলনা দূরে সরেছে। মিষ্টির আয়ত দু চোখ ওর মুখের ওপর।

কি দেখছে বাপী অনায়াসে বলে দিতে পারে। নিজের গায়ের রং কোনদিনই ফর্সা নয়। কিন্তু ছাঁদ-ছিরির কিছু প্রশংসা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছে। ড্রইং-মাস্টার ললিত ভড় বলতেন, ললিত-ঋজু-দাক্ষিণ্যে পুষ্ট হলে তবে পুরুষ। লক্ষ্য করলে ওর মধ্যেও পুরুষের এই দাক্ষিণ্যটুকু এখন মেয়েদের চোখে পড়ে। রতন বণিকের বউ কমলা বণিকের চোখে পড়েছে। মণিদার বউ গৌরী বউদির চোখে পড়েছে। ব্রুকলিনের বড়বাবু মন্মথ সোমের মেয়ে ঊষার চোখে পড়েছে। মিষ্টির চোখেও পড়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ভেতর দেখে নেওয়ার চেষ্টা। বানারজুলি জঙ্গলের চৌদ্দ বছরের বেপরোয়া ছেলের সেই হিংস্র লোলুপ তাড়না কতটা আড়াল নিয়ে আছে বোঝার চেষ্টা।

বাপীর মজা লাগছে। মুখে কিছু না বলে ওর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল।

মিষ্টি সচকিত। বাংলো থেকে ওকে বার করে জঙ্গলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে হাতের ওপর দখল নিত তাও মনে না পড়ার কথা নয়।—কি?

বইখাতা আমাকে দাও।

মিষ্টি হেসে ফেলল। দিয়েও দিল।

বাপী বলল, শহরের রীতি অনুযায়ী এখন কোথাও গিয়ে তোমাকে একটু চা খাওয়ানোর প্রস্তাব করা উচিত বোধ হয়...

তেমনি হেসেই মিষ্টি জবাব দিল, শহরের রীতি অনুযায়ী আমারও সায় দেওয়া উচিত।

সামনের দিকে এগলো দুজনে। বইখাতায় নরম হাতের স্পর্শ লেগে আছে। সংগোপনে সেটুকু অনুভব করার লোভ বাপীর।

মিষ্টি এদিকে ফিরল। দু চোখে কৌতূহল ছেয়ে আছে।—জ্যোতিষীর ওখানে দেখে তুমি আমাদের বাড়ি চিনলে কি করে?

বাপী ঘটা করে বড় নিঃশ্বাস ফেলল একটা।—সেজন্য অনেক মেহনত করতে হয়েছে। প্রথম সেই জ্যোতিষীর কাছ থেকে মিথ্যে অজুহাতে ঠিকানা আদায় করতে গিয়ে চোরের দায়ে ধরা পড়ার দাখিল হয়েছিল।

চলতে চলতে সকৌতুকে আবার ঘাড় ফেরালো মিষ্টি।—তারপর?

—তার পরের দিন দুপুর থেকে তোমাদের ওই রাস্তা চষেও কোনো হদিস পাওয়া গেল না। শেষে কলেজ স্ট্রীটে এক বন্ধুর বাড়ি এসে টেলিফোন ডাইরেকটরিতে তোমার বাবার নাম খোঁজা হল—

—বাবা তো অল ইণ্ডিয়া সার্ভিসে চলে গেছেন, এখন মধ্যপ্রদেশে পোস্টেড। আমি আর মা দাদুর কাছে থাকি, টেলিফোন দাদুর নামে—পাবে কি করে।

—পাইনি। এরপর তোমাদের গাড়ীর নম্বর সম্বল। সেটা মনে ছিল। বন্ধুর সাহায্যে মোটর ভেহিকিলস-এ এসে একজন দালালকে এক টাকা ঘুষ দিয়ে তবে ঠিকানা হাত করা গেল।

সাদামাটা সত্যি কথার সহজ প্রতিক্রিয়াটুকু লক্ষ্য করছে বাপী। মিষ্টি হাসছে। আগের কথা ভোলেনি বলেই অবিশ্বাস করছে না। বলল, ঠিকানা হাতে পেয়েও বাড়িতে না

ঢুকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে কেন?

—তোমার মায়ের ভয়ে।

বিব্রত মুখে মিষ্টি বলল, ভিতরে এলে মা কি তোমাকে সেই বানারজুলির মতো তাড়া করে আসত নাকি?

তেমনি সাদাসিধে মুখে বাপী জবাব দিল, না চিনেই স্টুপিড বলেছিলেন, চিনলে তাড়া করার কথা নয়?

মিষ্টি আর যেন তেমন জোর দিয়ে অস্বীকার করতে পারল না। বাপী বলল, তবু গতকাল কপাল ঠুকে ঢুকেই পড়ব ভেবেছিলাম। অদৃষ্টে দুর্ভোগ লেখা ছিল। তোমার পাড়ার ভক্তের দল ঝাঁপিয়ে পড়ে টানা-ছেঁড়া শুরু করে দিল। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে তুমি সেই দুর্দশা দেখেছিলে। তোমার ভক্তদের তাইতে আমাকে শায়েস্তা করার উৎসাহ আরো বেড়ে গেছল।

এ-ও সত্যি। মিষ্টির সহজ হবার চেষ্টা।—আজ তাই অন্য রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলে? ...আমার এই কলেজ জানলে কি করে?

—গাড়ি থেকে আমাকে দেখে তুমি বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নিলে। তখন ট্যাক্সিতে ফলো করে তোমাকে এই কলেজে ঢুকতে দেখলাম।

একটুও বাড়িয়ে বলেনি। রং ফলায়নি। আট বছর আগের ছেলেবেলার সেই দুরন্ত দস্যিকে এর সঙ্গে মেলানো সহজ নয়। কিন্তু মিলছেও আবার। জিগ্যেস করল, তারপর এই বেলা দুটো পর্যন্ত অপেক্ষা করে স্লিপ পাঠালে?

বাপী হাসল। বলল, স্লিপ পেয়েও তুমি আসবে কি আসবে না সন্দেহ ছিল। এতবার দেখেও যখন চিনতে পারলে না, ভাবলাম ভুলেই গেছ।

সামান্য ফিরে মিষ্টি তেরছা চোখে আর একবার দেখে নিল ওকে। পাতলা দুই ঠোঁট কৌতুকে টসটস করছে। তারপর সংকোচের কথাটা বেশ সহজেই বলে ফেলল।—তোমাকে চিনতে না পারলেও বানারজুলির বাপীকে ভোলা শক্ত।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাপীর মনে হল আট বছরের ফারাকের অর্ধেকটাই জুড়ে গেছে। তরল সুরে মিষ্টি আবার বলল, তবু কদিন দেখে তোমাকে চেনা আমার উচিত ছিল।

—কেন?

—তুমি ছাড়া এত কাণ্ড আর কে করবে। কাল তো আরো চেনা উচিত ছিল।

—কেন? দু' কান ভরে কেবল শুনতেই ইচ্ছে করছে বাপীর।

—পাড়ার ওই পাজীগুলো যখন তোমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তুমি দোতলার দিকে একবার ফিরে তাকিয়েছিলে। এমন তাকানো যেন অতটা দূর থেকেই একেবারে ভস্ম করে ফেলবে আমাকে।...আট বছর আগে বাবা বানারজুলি থেকে দিনাজপুরে বদলি হতে আমরা যখন বাংলো ছেড়ে জিপে করে যাচ্ছিলাম, রাস্তায় দাঁড়িয়ে তখন ওই রকম করে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলে তুমি। আমার ভয়ই করছিল, এই বুঝি চলন্ত জিপে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে একেবারে শেষ করে ছাড়বে।

বাপী সন্তর্পণে নিঃশ্বাস ফেলল একটা। এ কথার পর এতদিনের ব্যবধান আরো কিছুটা জুড়ে গেল। লঘু সুরে জিজ্ঞাসা করল, কালও ভয় করছিল নাকি?

হাসি মুখে মাথা দোলালো।—তা অবশ্য করছিল না।...এখন আর কোনো ভয়-ডরের

ধার ধারি না।

শেষেরটুকু যেন পুরনো দিনের এক দামাল ছেলেকে শোনানোর জন্যেই। বাপী সামনে হাঁটছে, কিন্তু মিষ্টির দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। চেয়েই আছে। সেটুকু অনুভব করার ফলে আবার চোখাচোখি। মিষ্টির ভুরুর মাঝে পলকা একটু খাঁজ।—কি দেখছ?

—মিষ্টি।

হেসে উঠল।—জল দিয়ে গিলে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে কচ্ছে?

বাপীর হাসিতে খুশির বিড়ম্বনা। আট বছরের ফারাক এবারে জুড়েই গেল বুঝি। দিনমানের এই কলকাতা না হলে হাত বাড়িয়ে আগের মতো ওর একখানা হাতের ওপর দখল নেওয়াও একেবারে অসম্ভব কিছু হত না।

এবারে মিষ্টি গম্ভীর একটু। কিন্তু হাসির ছোঁয়া লেগেই আছে। বলল, এখানে আমি মালবিকা, এক মা আর দাদু শুধু মিষ্টি বলে ডাকে।

—দীপুদা?

—দাদা বিলেতে।

ভালো খবর। তাকে নিয়ে বাপীর কথা বাড়ানোর ইচ্ছে নেই। বলল, আমি মিষ্টি ছাড়া আর কিছু ডাকতে পারব না—

তার দিকে না ফিরে এবার একটু নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিল, তেমন ডাকাডাকির চান্স পাচ্ছ কোথায়...।

বাপী ভিতরে ভিতরে থমকালো। এই জবাব আশা করেনি। আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে হাল্কা গলায় জোর দিয়ে বলল, আমি কোনো চান্সের ওপর নির্ভর করি না, গত আট বছর ধরেই ডেকে চলেছি, কোনো একটা দিনও বাদ পড়েনি।

মিষ্টি ঘাড় ফিরিয়ে সোজা তাকালো এবার। মুখ আরো একটু গম্ভীর। কিন্তু ঠোঁটে হাসির আভাস। চোখের কোণেও। তবু বাপীর মনে হল এতক্ষণের সহজ স্পষ্টতা থেকে ওর যেন একটু তফাতে সরার চেষ্টা। মন্তব্যের সুরে মিষ্টি বলল, ভালো কথা নয়। সঙ্গে সঙ্গে এ-প্রসঙ্গ বাতিল।—ক'টা দোকান তো পার হয়ে গেল, চা খাওয়াবে কোথায়?

বাপী অপ্রস্তুত।—তাই তো, তোমাকে কাছে পেয়ে কেমন দিশেহারা দেখো...ভুলেই গেছলাম।

কাছে পাওয়ার কথাটা এমন নিঃসংকোচে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে যে মিষ্টি আবারও না তাকিয়ে পারল না। বাপী বুঝল। কিন্তু বুকের ভিতরটা তার ভরাট এখন। মনে মুখে লাগাম নেই। বরং ওই মুখের বিড়ম্বনাটুকু রসিয়ে দেখার মতো।

সামনের বড় রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ল। পাশে মিষ্টি। বাপীর বাদশাই মেজাজ। পর্দা ঠেলে একটা কেবিনে বসল। মুখোমুখি মিষ্টি। বেয়ারা হাজির।

—চায়ের সঙ্গে আর কি খাবে বলো।

দু চোখ মুখের ওপর তুলে মিষ্টি কিছু বুঝতে চেষ্টা করল।—সেই সকাল দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত অপেক্ষা করলে, সমস্ত দিনে তোমার খাওয়া হয়েছে কিছু?

কথাগুলো একটু দরদের স্পর্শের মতো কানের ভিতর দিয়ে বুকের দিকে এগোতে থাকল। বাপীর খুব ইচ্ছে হল মাথা নাড়ে, বলে হয়নি। বলা গেল না। এই দিনে কোনো

মিথ্যের জায়গা নেই। সরস সত্যি জবাবই দিল।—ভাগ্যটাকে ভালো করার ঝোঁকে অন্য দিনের থেকে আজ বরং ভালো খাওয়া হয়েছে।

—তাহলে শুধু চা-ই হোক।

—তা কখনো হয়! বাপী সাগ্রহে টেবিলের মেনু কার্ড দেখতে লাগল। কিন্তু কি ছেড়ে কি আনতে বলবে ভেবে পেল না। আজ কোনো হিসেবের দিন নয়। মেনু কার্ডে যা আছে সব আনতে বললে কি হয়?

কিন্তু চায়ের সঙ্গে মিষ্টি শুধু একটা মাছের ফ্রাই ছাড়া আর কিছু নিতে রাজি হল না। অগত্যা দুজনেরই তাই। অর্ডার নিয়ে বেয়ারা চলে গেল। মিষ্টি বাপীর দিকেই চেয়ে আছে। ব্যস্ততা দেখে টিপটিপ হাসছে।

—ছেলেবেলায় তুমি কিন্তু বেশ খেতে ভালবাসতে।

—মিষ্টি চট করে জবাব দিল, ছেলেবেলা আর কদিন থাকে।

বাপীর আবারও মনে হল, প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের পর এই মেয়ে নিজেকে একটু গুটিয়ে নিচ্ছে। কথা কম বলছে। শুনছে বেশি। দেখছে আরো বেশি। শোনা বা দেখাটা নিরাসক্ত নয় অবশ্য। দেখে শুনে বা বুঝে পা ফেলার মতো শুধু নিজের সম্পর্কেই সতর্ক একটু। অস্বাভাবিক নয়। বাপীর ছেলেবেলাটা এই মেয়ের কাছে এক বিষম স্মৃতি তো বটেই। তাই ছেলেবেলা নাকচ করে ওকে কিছু বোঝানোর চেষ্টা।

কিন্তু বাপীর কাছে তার ছেলেবেলার জোরটাই সব। সেই জোরেই এ মেয়ের আজ দু-দুটো ক্লাস কামাই। সেই জোরেই আট বছর বাদে মুখোমুখি হবার সঙ্গে সঙ্গে কালো চোখের গভীরে আগ্রহের বন্যা। নিজেকে নিয়ে ও এখন একটু হিসেবী হয়ে উঠছে মনে হতে বাপীর মজাই লাগছে।

বয় বড় ডিশে দুটো ফ্রাই এনে দুজনের সামনে রাখল। আনুষঙ্গিক টুকিটাকি আরো কিছু সাজিয়ে দিয়ে গেল। অভ্যস্ত হাতে মিষ্টি কাঁটা-চামচ তুলে নিতে সপ্রতিভ মুখে বাপী বলল, আমি এখনো জংলিই থেকে গেছি—এ দুটো ঠিক চলবে না।

জবাবে অতি-আধুনিকতাব বক্রাভাস কিছু দেখা গেল না। বরং শুনে এবং বুঝে যা করল সেটুকু আরো মিষ্টি। নিজের কাঁটা-চামচ ডিশের একপাশে রেখে বেল বাজালো। বয় আসতে বলল, ওয়াটার বোউল—

হাতের চায়ের পট আর পেয়ালা সমেত ট্রে-টা টেবিলে রেখে বয় গেল আর ফিরল। এক ট্রেতে মাঝারি আকারের দুটো সাদা বাটি। তাতে হাত ধোয়ার গরম জল।

আট বছর বাদে দাক্ষিণ্যের ভরা ডালিসুদ্ধ খসে পড়ার মতোই দিন এটা। বাপীর দুচোখে লোভ চিকিয়ে উঠছে কিনা জানে না। উঠলেও এখন আর বাপী একে ঠিক লোভ বলতে রাজি নয়। সামনে যে বসে তাকে আর নিছক লোভের দোসর ভাবতে চায় না। আরো কিছু। ঢের বেশি কিছু।

মিষ্টি টান হয়ে বসে আছে এখন। পরিপুষ্ট দু হাতের কনুই টেবিলের ওপর। দু হাতের দু জোড়া আঙুলের মাথায় ফ্রাইটা ঝুলছে। অল্প অল্প দাঁতে কাটছে আর টুকটাক এটা সেটা জিজ্ঞাসা করছে। বাপী জবাব দেবে, না এই সহজ সুঠাম ভঙ্গীটুকু দেখবে?

মিষ্টি পিসীর কথা জিজ্ঞাসা করল। তারপর বাবার কথা। কেউ নেই শুনে চাউনি উতলা একটু।—তোমার আর কে থাকল তাহলে?

কে থাকল বলায় একটা অদম্য লোভ ঠেলে তল করতে হল। কিন্তু চোখে গোপন থাকল না বোধ হয়। কারণ এই চোখে চোখ পড়তে মিষ্টির দুই হাতের আঙুলে ঝোলানো ফ্রাইয়ে বড় কামড় পড়ল একটা। চকচকে দাঁতের সারি দেখা গেল। দৃষ্টিও প্লেটের দিকে নেমে এলো।

একটু পরেই ঠোঁটের ফাঁকে আবার চাপা হাসি।—তোমাদের সেই বনমায়ার খবর কি?

প্রসঙ্গান্তর সরস বটে।—গত চার-পাঁচ বছরের খবর রাখি না। তার আগে পর্যন্ত বছরে একবার করে সাধ্বী মেয়ের মতো বনমায়া সেই একই পুরুষ-হাতির সঙ্গে শিকল ছিঁড়ে পালিয়েছে আর ওর সময়মতো ফিরেও এসেছে। এখনো সেই রকমই চলছে মনে হয়।

মিষ্টির মুখে লালের ছোপ একপ্রস্থ। সেধে বিড়ম্বনা ডেকে আনা। তাড়াতাড়ি জিগ্যেস করল, আর তোমার জঙ্গল-গুরু সেই আবু রব্বানী?

বাপী হাসছে মিটিমিটি।...বীটম্যান হবার পর সেও এক বীটম্যানের বউয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে দেখেছিলাম। সেই লোকটা মদে বেহুঁশ হয়ে থাকে, আর হুঁশ ফিরলে বউ ঠেঙায়। আবু তার লিভার পচে মরার অপেক্ষায় ছিল, এতদিনে বউটাকে নিজের ঘরে এনে তুলতে পেরেছে বোধ হয়।

—কি বিচ্ছিরি। মিষ্টির মুখ আরো লাল। ফ্রাইয়ের শেষের সামান্যটুকু ডিশে ফেলে রুমালে হাত মুছে চায়ের পটসুদ্ধ ট্রে-টা কাছে টেনে নিল।

বাপীর আগেই খাওয়া হাত-মোছা শেষ। টেবিল থেকে মিষ্টির মোটা বইটা হাতে তুলে নিল। খুলে দেখল, ইংরেজি ইতিহাস বই। আর একটু কাছে তুলে সন্তর্পণে নিঃশ্বাস নিল। প্রত্যাশিত একটা সুবাস বইটার মধ্যেও ছড়িয়ে থাকতে পারে।

বইটা আবার যথাস্থানে রেখে জিগ্যেস করল, হিস্ট্রি অনার্স পড়ছ?

চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে মিষ্টি মাথা নেড়ে সায় দিল।

—থার্ড ইয়ার তো?

—তুমি জানলে কি করে?

—আমার হিসেব আছে। ম্যাট্রিকে তুমি ইতিহাস আর সংস্কৃতয় লেটার পেয়েছিলে, আই-এতে শুধু ইতিহাসে। হিংসেয় আমার বুক চড়চড় করেছিল। এখন আনন্দ হচ্ছে।

মিষ্টির দু চোখ এবার যথার্থ বিস্ফারিত।

খুশির মেজাজে রহস্যটা এবারে নিজেই ফাঁস করল বাপী।—তোমার পাশের দু বছরের দুটো গাবদা গেজেট আমাকে পড়তে হয়েছে—কলকাতার সব কটা মালবিকা নন্দীর থেকে ঠিক তোমাকে বেছে নিয়েছি।

এই ছেলের অসাধ্য কি, মিষ্টি যেন নতুন করে আবার তাই দেখছে। চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিল। নিজের পেয়ালা কাছে টেনে নিল। এখন গম্ভীর-গম্ভীর। কেন বাপী আঁচ করতে পারে। আজও ও কত আগ্রহ আর কত কৌতূহল নিয়ে বসে আছে সেটা বড় বেশি স্পষ্ট।

—গেজেট পড়ে তোমার হিংসে হত কেন? নিজে ওদিক মাড়াওনি?

আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে বাপীর নিজেরও বলার তাগিদ। জানানোর তাগিদ ছেলেবেলার

মতো প্রবৃত্তিসর্বস্ব হয়েই গত আটটা বছর কাটিয়ে দেয়নি। নিজের বিদ্যেবুদ্ধির বড়াই কখনো করেনি, আজও করার ইচ্ছে নেই। কিন্তু এই একজনেরই যেন ওর সবটুকু জানা দরকার, চেনা দরকার, বোঝা দরকার।

তাই বরাতজোরে নিজের ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করার কথাটা এসেই গেল। পাশের পরে জঙ্গলের ছোট কেরানীর চাকরি না নেওয়ার জন্য বাবার সঙ্গে মন-কষাকষি আর বাড়ি ছেড়ে জলপাইগুড়ি পালানোর কথাও। তারপর চার-চারটে বছর টিউশনের জোরে আর কপালজোরে আই-এস সি আর ডিস্টিংশনে বি-এস সি উতরে যাওয়ার বৃত্তান্ত।

হালকা চালেই বলেছে। প্রাণান্তকর অনিশ্চয়তা বা অনটনের দিকটাও ফাঁপিয়ে তোলেনি। মিষ্টির অপলক দু চোখ ওর মুখের ওপর। যেটুকু বোঝার বুঝেছে হয়তো।

—তারপর কলকাতায় কি, চাকরি না এম-এস সি?

বাপী হাসতে লাগল।—চাকরি। এখানকার এক বন্ধুর সাহায্যে একটা লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের চাকরি যোগাড় করে চলে এসেছিলাম। দেড় মাসের ওপর হয়ে গেল সেটাও গেছে—

পরের প্রশ্নটা যাতে করে সেই আশা নিয়েই বাপী ওরকম হাসছিল।

—চাকরি গেল কেন?

—যুদ্ধের আপিসের টেম্পোরারি চাকরি...তবে আমার গেল অন্য কারণে। হাসিটুকু এখন শুধু চোখে লেগে আছে বাপীর।—সেখানকার বড়বাবুর একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করে গলায় ঝোলাতে রাজি হলে চাকরিতে প্রমোশন হত আর তাদের বাড়িটাও দখলে আসত। রাজি হলাম না বলে সেই মেয়ে যেমন মনমরা তার বাপের তেমনি রাগ। এই দুইয়ের ধাক্কায় চাকরি খুইয়ে ছিটকে বেরিয়ে এলাম।

যেভাবে বলল, মিষ্টিরও হেসে ফেলার কথা। কিন্তু মুখে হাসির লেশমাত্র নেই। শোনার পর চায়ে মনোযোগ।

মিনিট পনের বাদে পায়ে পায়ে বড় ময়দানের দিকে আসছিল দুজনে। ময়দানের অন্য প্রান্তে সেই সভা। গান্ধী-প্রয়াণের শোকসভা। আটচল্লিশের ফেব্রুয়ারির দশ কি এগারো তারিখ এটা। এরই মধ্যে বিকেলের আলোয় টান ধরেছে। বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব। দুজনের কারো সঙ্গেই গরম কিছু নেই। কিন্তু বাপী অন্তত ঠাণ্ডা-গরম কিছুই টের পাচ্ছে না।

এবারে সামনের রাস্তার দিকে এসে মিষ্টি দাঁড়িয়ে গেল। স্বাভাবিক সুরেই বলল, আর দেরি করলে মায়ের বকুনি খেতে হবে।

বাপীও মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়াল। খানিকক্ষণ যাবৎ কেন যেন চিনচিন করছে ভিতরটা। সেটা আরো বাড়ল।—আবার কবে দেখা হবে?

—অনার্স ক্লাস তো বেশি কামাই করা চলে না, ওদিকে ক্লাস শেষ হবার আগেই দাদুর গাড়ি এসে হাজির হয়—

—আমি জিজ্ঞেস করছি, আবার কবে দেখা হবে?

মিষ্টির দু চোখ এবারে ওর মুখের ওপর থমকে রইল।—তুমি থাকো কোথায়?

শিরায় রক্তের তাপ বাড়ছে বাপীর। গড়গড় করে বলে গেল, ভবানীপুরের টালি কোয়াটারস-এ। আসলে সেটা একটা টালির বস্তি। পঁচিশ ঘর বাসিন্দা থাকে। চাকরি যাবার

পর সে অফিসের পিওন রতন বণিক আর তার বউ কমলা বণিক সেখানে তাদের একটা খুপরি ঘরে আমাকে আদর করে রেখেছে।...শুনে আরো ঘাবড়ে গেলে বোধ হয়?

হকচকিয়ে গেল যে তাতে কোনো ভুল নেই। বাপীর দু চোখ তার মুখের ওপর এঁটে বসল আরো।—শোনো মিষ্টি, কেরানীগিরির চাকরির আশায় আমি কলকাতায় ছুটে আসিনি—এসেছি একদিন না একদিন তোমার দেখা পাব বলে! আজই আমি খুব ভালো করে জেনেছি, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক হওয়াটা যেমন আমার অদৃষ্ট নয়, রতন বণিকের বস্তিতে থাকাটাও তেমনি আর বেশিদিনের সত্যি নয়। সব বদলাবে, একেবারে অন্য রকম হয়ে যাবে—তুমি চাইলেই হবে।

মিষ্টি শুনছে। চেয়েও আছে। ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসি ফোটানোর চেষ্টা।—ভালো কথা তো, আমি চাইব না কেন...

—তাহলে কবে দেখা হবে, কাল বিকেলে তোমাদের বাড়ি যাব?

মিষ্টি যেন নিজের সঙ্গেই যুঝছে।—পাড়ার সেই ছেলের দঙ্গল আছে না? বাড়িতে মা আছে না? মায়ের আজকালকার মেজাজ জানো?

বাপী কানেও নিতে চাইল না। পাড়ার ছেলেদের আমি পরোয়া করি না। মায়ের ভাবনা তোমার। যাব?

মিষ্টির ঠোঁটের ফাঁকের আয়াসের হাসিটুকু মিলিয়ে যেতে লাগল। আয়ত কালো দু চোখ বাপীর মুখের ওপর স্থির হয়ে বসতে লাগল। দেখছে। দেখছেই। অপলক।

—দেখা করতেই হবে?

—দেখা করতেই হবে।

—তাহলে এসো।...তবে বাড়িতে নয়।

—কোথায়?

—লেক চেনো?

মাথা নাড়ল। চেনে।

একটা নিশানা বলে দিল।—কাল বিকেল সাড়ে চারটেয় এসো। আমি বাসে চলে যাচ্ছি, সঙ্গে আসার দরকার নেই।

উল্টো দিক থেকে বাস আসছে একটা। হনহন করে রাস্তা পার হয়ে গেল। বাস এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে উঠে পড়ল।

বাসটা ছেড়ে যাবার পরেও বাপী নিশ্চল দাঁড়িয়ে। অনেকক্ষণের একটা দমবন্ধ নিঃশ্বাস আস্তে আস্তে মুক্তি পেয়ে বাঁচছে।

রাতের খাবার কে ঢাকা দিয়ে রেখে গেছল বাপী জানে না। সকালে আজও চা-রুটি নিয়ে রতন বণিক ঢুকল। কমলা নয় অর্থাৎ কমলা বণিকের রাগ হোক বা আর কিছু হোক এই দুদিনেও সেটা তেমনি আছে।

সে না আসায় গতকালের থেকে আজ আরো বেশি স্বস্তি।...কমলা বণিকের সামনে সেদিনের সেই হিংস্রলোলুপ মুহূর্তের ছায়াসুদ্ধু মুছে দিতে পারলে বাপী তরফদারের আত্মশুদ্ধি হত। প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও কমলার পরের আচরণ ভোলেনি। আজকের এই দিনে বাপী সেই স্মৃতি থেকেও নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে আসতে চায়।

রতন বলল, আজ আবার একটু ফ্যাসাদ হয়েছে বিপুলবাবু, নাইট ডিউটি পড়েছে। ওই দেমাকীকে বুঝিয়ে বললাম, আজকের রাতে অন্তত আপনার খাবারটা যেন দিয়ে যায়। কিছু বলল না...দেবে নিশ্চয়, রাগ করুক আর যাই করুক, আপনার ওপর দরদ তো একটু আছেই—

বাপীর মুখে গরম চায়ের ছেঁকা লেগে গেল। তাড়াতাড়ি বাধা দিল, না—না, তার কিছু দরকার নেই, রাতে আমি খেয়ে আসব।

—তা কি হয়!

বাপী সত্যি বিরক্ত।—কথা শোনো, রাতে আমার এক জায়গায় খাবার কথা আছে, আমি নিজেই তোমাকে বলতাম—ওকে বারণ করে দাও আজ খাবার রাখার দরকার নেই।

—তাই বলুন, রতন নিশ্চিন্ত, আমি ভাবলাম আপনিও বুঝি আবার রাগ-টাগ করলেন।

বাপী মিথ্যে বলেনি খুব। সকালে ঘুম ভাঙতেই ভেবে রেখেছে বিকেলের কথাবার্তার পর সন্ধ্যায় মিষ্টিকে কোনো ভালো জায়গায় নিয়ে গিয়ে রাতের খাওয়া সারবে। মিষ্টির কোনো ওজরআপত্তি শুনবে না।

বেলা বারোটা নাগাদ একেবারে তৈরি হয়ে বেরুলো। আগে ব্যাঙ্ক থেকে কিছু টাকা তুলতে হবে। এ মাসের খরচটা হিসেবের মধ্যে থাকবে না। সঙ্গে কিছু টাকা থাকা ভালো। তারপর দুপুরে কোথাও যা হোক কিছু খেয়ে নেওয়া। তারপরের সময়টুকু কি করে কাটাবে সে দেখা যাবে।

ঘরের বাইরে পা দিয়েই দাঁড়িয়ে পড়তে হল। ও-ঘরের দাওয়ার সামনে কাঠের থামে ঠেস দিয়ে কমলা দাঁড়িয়ে। একঝাঁক খোলা শুকনো চুল পিঠে ছড়ানো। চান করেনি এখনো।

ওকে দেখে একটুও নড়ল না। চোখ বেঁকিয়ে তাকালো।

বাপী তাড়াতাড়ি দাওয়া থেকে উঠোনে নামল। তারপরেই সহজ হওয়ার তাড়না একটু। না এগিয়ে কমলার দিকে ফিরল।—রাতে খাবার রাখার দরকার নেই, রতন বলেছে তো?

কমলা জবাব দিল না। মাথাও নাড়ল না। সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। সেই রকমই চেয়ে রইল।

এবারে বাপীর দ্রুত প্রস্থান। ওই চাউনি দিয়েই কমলা যেন সারা গায়ে জল-বিছুটি ছড়িয়ে দিল খানিকটা। আর বলতে চাইল, যত ভালো মুখ করেই থাকো, তোমার ভেতর দেখা চেনা আর বোঝা আমার হয়ে গেছে।

বাইরে এসে বাপী সেই দিনটার জন্য নিজেকেই চাবকাতে চাইল আর এক প্রস্থ।

অনেক ধৈর্য আর অনেক প্রতীক্ষার সেই বিকেল। ঘড়িতে চারটা পঁচিশ। দূরে দাঁড়িয়ে বাপী দেখল যেখানে থাকার কথা, মন্থর পায়ে মিষ্টি সেদিকে চলেছে। বাপী আরো বিশ মিনিট আগে থেকে একটু আড়াল নিয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে আছে।

দু'চোখে খুশি উপচে উঠল। ডাকল না। নিজেও তক্ষুনি এগিয়ে এলো না। এই দেখাটুকু বাড়তি পাওনার মতো। আজ ফিকে বাসন্তী রঙের শাড়ি পরেছে। মিষ্টি তো জানেও না এই রংটা বাপীর কত পছন্দ।

মিষ্টি বেঞ্চিতে বসল না। পায়ে পায়ে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। পিছন ফিরে একবার চারদিক দেখে নিয়ে আবার জল দেখতে লাগল।

বাপী এগিয়ে এলো। হাসিতে খুশিতে উদ্ভাসিত মুখ। মিষ্টি ঘুরে দাঁড়াল।

তার ঠোঁটে বা চোখে হাসির ছিটেফোঁটাও নেই। কাল বাসে ওঠার আগে যেমন দেখেছিল তেমনি চাউনি। তারপর সামনের রাস্তায় দৃষ্টি ফেরালো একবার।

বাপী অবাক একটু।—কি?

মিষ্টি জবাব দিল না। তেমনি চেয়ে রইল। পরক্ষণে দু'চোখ আবার ওই রাস্তার দিকে। কি ব্যাপার ভেবে না পেয়ে বাপীও সেদিকে ঘাড় ফেরাতেই সমস্ত শরীরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি একটা। মাথার মধ্যিখানে আচমকা একটা মুগুরের ঘা পড়েছে।

...হনহন করে এদিকে আসছে একজন। এসে গেছে। চেনা মুখ। পরনে ট্রাউজার আর সিল্কের শার্ট। ফর্সা রং। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। মিষ্টিদের উল্টো দিকের বাড়ির দোতলার সেই একজন। পাড়ার ছেলেদের অসিতদা।

বিমূঢ় মুখে মিষ্টির দিকে ফিরল বাপী। পরমুহূর্তে শরীরের সমস্ত রক্ত মাথার দিকে ধাওয়া করল। মিষ্টির ঠোঁটের ফাঁকে এখন একটু হাসির আভাস।

সোনালি চশমা হাজির।—এই যে ব্রাদার, মালবিকার কাছে তোমার ছেলেবেলার কিছু কথা আর কালকের অ্যাডভেঞ্চারের কথা শুনলাম। সেদিন গলাধাক্কা খেয়েও শিক্ষা হল না, আজ যে ভায়া আরো কপাল মন্দ।

মুখের কথা শেষ হবার আগেই কোথা থেকে আরো তিন-তিনটে ছেলে ছুটে এলো। পাড়ার সেই ছেলেরাই। এসেই একজন জামার বুকের কাছটা মুঠো করে ধরল।

—এই যে চাঁদ, আজ তোমাকে কোন বাবা রক্ষা করবে?

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বলে উঠল, না অসিতদা, আজ আর তোমার কোনো কথা শুনছি না—চাঁদুকে তুমি আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, আমরা ওদিকে নিয়ে গিয়ে যা বোঝাবার বেশ করে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু পলকের মধ্যে যা ঘটে গেল তার জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিল না। যে ছেলেটা জামা চেপে ধরেছিল, মিষ্টির দু হাতের আচমকা ধাক্কায় তার হুমড়ি খেয়ে পড়ার দাখিল। মিষ্টির মুখ টকটকে লাল, ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত গলার স্বর।—এ কি? এদের কে আসতে বলেছে। ও যাতে বুঝতে পারে সেইজন্য আমি তোমাকে আসতে বলেছিলাম—তুমি এদের এনেছ কেন?

সোনালি চশমার ভেবাচাকা মুখ। ছেলে তিনটেরও। ওই তিনজনের দিকে ঘুরে মিষ্টি আবার ফুঁসে উঠল, যাও বলছি এখান থেকে—চলে যাও!

ছেলে তিনটে গুটিগুটি সরে দাঁড়াল একটু। রমণীর মতিগতির কুলকিনারা পাচ্ছে না তারা।

কিন্তু বাপীর পৃথিবী উল্টে গেছে। মাথায় সেই পুরনো আগুন দ্বিগুণ জ্বলে উঠেছে। বুকের পাতালের শূন্য গুহায় সেই জানোয়ারের দাপাদাপি। সবার আগে ওই মেয়ের ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্রূর অভিলাষ।

বাপীর গলার স্বর চড়া নয়, কিন্তু সকলের শোনার মতো। মিষ্টিকে বলল, আর বোঝানোর দরকার নেই। আমি বুঝতে পেরেছি।...তোমার এই বীরপুরুষেরা যদি মায়ের

ছেলে হয়, একে একে আসতে বলো, এই চারজনকেই লেকের জল খাইয়ে আনতে পারি কিনা দাঁড়িয়ে দেখো।

...কি! সোনালি চশমা রুখে এলো।

চকিতে মিষ্টি এগিয়ে এসে বাধা দিল আবার।—থাক হয়েছে। বাপীর দিকে ফিরল। গলার স্বর তপ্ত।—বুঝে থাকলে চলে যাও। আর এসো না।

রাত অনেক। সেদিনের পুলিশের লাঠির খোঁচা মনে ছিল। এত হেঁটেও পা দুটোকে অবশ করা গেল না। বাপী তরফদার ঘরের দিকে চলেছে এখন। মুখে আবার আট বছর আগের সেই রক্তের স্বাদ। ভিতরের জানোয়ারটা অবিরাম ফুঁসছে। গজরাচ্ছে।

টালি এলাকার নিঝুম উঠোন পেরিয়ে নিঃশব্দে দাওয়ায় উঠে এলো। খুপরি ঘরের দরজা ঠেলতে ক্যাঁচ করে সেই পুরনো শব্দ একটু। আজ খাবার ঢাকা নেই, তাই ডীম-করা হারিকেনও নেই। জামাটা খুলে ঘুটঘুটি অন্ধকারে দড়ির ওপর ফেলল। তারপর শরীরটা খাটিয়ার ওপর আছড়ে পড়তে চাইল।

কিন্তু এ কি! এ কি! এ কি!

মাথায় বিদ্যুৎতরঙ্গ। ভালো করে বোঝার আগেই অন্ধকারে ওই শয্যা থেকে দুটো হাত অমোঘ নিবিড় বেষ্টনে তাকে বুকেব ওপর টেনে নিল। রমণীর হাত। রমণীর বুক। সর্বাঙ্গে তপ্ত স্পর্শের তড়িৎপ্রবাহ। শুকনো দুটো ঠোঁট বিস্মৃতির উষ্ণ ঘন অধরের গ্রাসে।

## আট

রাতেব অন্ধকার ফুঁড়ে ট্রেন ছুটেছে। কামরার বেশির ভাগ লোক ঘুমোচ্ছে। জায়গা না পেয়ে কেউ কেউ বসেই ঝিমুচ্ছে। বাপীর কারো দিকে চোখ নেই। দু' চোখ জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে। ভিতরে আরো বেশি দমবন্ধ-করা অন্ধকার।

মা বলে কি কেউ কোথাও আছে? নিজেরই বিষে ভিতর-বার কালি হয়ে গেলেও যার কাছে ছুটে যাওয়া যায়, যার বুকে মুখ গোজা যায়, মুখ লুকনো যায়? বুকের জমাট-বাঁধা কান্নার স্তূপ যার স্পর্শে গলে গলে নিঃশেষ হয়ে যায়? বাপী জানে না। মা কাকে বলে জানে না। কিন্তু মায়ের মতো করে কেউ ডাকছে ওকে। বানারজুলি ডাকছে। বানারজুলির জঙ্গল হাতছানি দিচ্ছে। এত বড় পৃথিবীতে শুধু সেখানে একটু আশ্রয়। সেখানে একটু মুখ লুকানোর জায়গা।

বাপী তরফদার সেইখানে চলেছে।

সেই রাতের পর আরো দুটো রাত রতন বণিকের খুপবি ঘরে বিনিদ্র কেটেছে। নাইট ডিউটি দিয়ে রতন বণিক সকাল সাতটার মধ্যে খুশি মেজাজে ঘরে ফিরেছিল। সপ্তাহে একদিনের নাইট ডিউটিটা ওর চক্ষুশূল। বাকি ছ'টা দিন নিশ্চিন্ত। কমলা নয়, ও-ই চায়ের গেলাস হাতে করে ঘরে ঢুকেছে। জিগ্যেস করেছে, রাতে খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো হয়েছিল তো?

নিঃশঙ্ক, নিশ্চিন্ত মানুষ। কথাগুলো তাই পিঠে বিবেকের চাবুক হয়ে নেমে এসেছিল। তার থেকে যদি বাপীর মুখের দিকে চেয়ে এই সাদাসিধে ভালোমানুষটার চাউনি ঘোরালো

হয়ে উঠত, তাহলেও কিছু সান্ত্বনা থাকত। মুখের দিকে না চেয়ে বাপী বিড়বিড় করে জবাব দিয়েছে, রাতে খাব না বলেই তো রেখেছিলাম—

...সকাল দশটার মধ্যে রাস্তায় নেমে এসেছিল। কিন্তু যাবে কোথায়? দুর্ভর দিন কাটবে কেমন করে? সঙ্গোপনের পশুটা প্রাণভয়ে গুহা ছেড়ে উধাও। তখন তার অস্তিত্বও নেই।

কমলা বণিক কোনদিন তার শিকার ছিল না। সেই রাতেও না। দেহ যারই হোক, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে শেকল-ছেঁড়া ক্ষিপ্ত আহত জানোয়ার অপটু উল্লাসে যাকে নিয়ে বিস্মৃতির অতলে ডুবেছিল, সে আর কেউ। আর একজন। তারপর চেতনার কশাঘাতে জেগে ওঠা সেই রূঢ় বাস্তব। বাপী তরফদারের যন্ত্রণা সম্বল।

বিকেলের দিকে কে যেন লেকে টেনে এনেছে তাকে। আগের দিনের সেইখানে এসে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতর ওপর হিংস্র নখের আঁচড় পড়েছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটেছে। মাথায় আগুন জ্বলেছে।

বাপী তরফদার এরই মধ্যে সচকিত। একটা অস্বস্তির ছায়া পড়ছে।...জানোয়ারটা ওঁত পেতে ছিল কোথায়। সুযোগ আর সময়ের প্রতীক্ষায় ছিল। গুটি গুটি এবারে তার আশ্রয়ের দিকে এগোচ্ছে। বিবেকের কশাঘাতে বাপী তরফদার ওটাকে ধরাশায়ী করতে চেয়েছে, নির্মূল করতে চেয়েছে। কিন্তু ওই শয়তান তার সময় জানে। সুযোগ জানে। পায়ে করে তাকে থেঁতলে থেঁতলে বাপী তরফদার হনহন করে লেক থেকে বেরিয়ে এসেছে। তবু তার পায়ের শব্দ বাড়ছেই, বাড়ছেই। যত বাড়ছে, নিজের ওপর বাপীর ততো দখল কমছে।

...রাত সাড়ে আটটায় কে তাকে ঘরে টেনে এনেছে। হাতের ধাক্কায় নড়বড়ে দরজা দুটো আর্তনাদ করে উঠেছে। এখন ওর কাছে পাশের ঘরের ওই একজন ক্ষমার পাত্রী নয়, দয়ার পাত্রী নয়। কোনো মেয়েই নয়। আগের রাতের তিমির তৃষ্ণার অনুভূতি হাড়ে-পাঁজরে যন্ত্রণার বাষ্প ছড়াচ্ছে।

...ছোট লণ্ঠন হাতে ঢুকেছিল রতন বণিক। খোশ মেজাজ। টেনে টেনে বলেছিল, ক'দিনের মধ্যে আজই একটু তাড়াতাড়ি ফিরলেন দেখছি।

সকালে যে মানুষটার কথায় বিবেকের চাবুক পড়েছিল পিঠে, এখন তাকে ঠেলে সরানোর তাগিদ।—খেয়ে এসেছি। খাবার আনার দরকার নেই।

—কেন? আমার বউটার ওপর আপনি রেগেই গেলেন নাকি?

অসহিষ্ণু ঝাঁঝে বাপী বলেছে, কি বাজে বকছ!

—ঠিক আছে, আপনার যেমন সুবিধে।

লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেশ দুলছিল রতন বণিক। মুখের খুশি কাঁচা-পাকা দাড়ি বেয়ে চুঁয়ে পড়ছিল। মাছের মতো চোখ। চার হাত দূর থেকেও চেনা গন্ধ বাপীর নাকে আসছিল। মাত্রার ঠিক ছিল না। বোঝা যায়। কিন্তু ওর ঢলো-ঢলো কথা শুনে বিরক্তির বদলে বাপীর দু'কান সজাগ।

—বউটার মতিগতি আজ বদলেছে বিপুলবাবু—বুঝলেন। বোতল নিয়ে আজ আর এ-ঘরে আসতে হল না, ঘরে বসেই খেতে দিলে। আর তোয়াজ করে সেই সঙ্গে এটা-সেটা ভেজে খাওয়ালে। ফুর্তির চোটে একটা গোটা বোতল সাবড়ে দিলাম দেখেও রাগ

করল না। শব্দ করে রতন বিশাল হাই তুলল একটা।—আপনার খাওয়ার পাট নেই যখন, যাই শুয়ে পড়িগে—

দুলতে দুলতে চলে গেল। লণ্ঠনটা রেখে যেতেও ভুলেছে।

দুর্বার লোভে দু' চোখ কতখানি চকচক করে উঠেছিল, বাপী খবর রাখে না। কিন্তু অনুমান করতে পারে। রতনের কথাগুলো শেষ হতে না হতে বুঝেছিল, এই রাতেও কমলা আসবে।

...এসেছিল।

তার পরের রাতেও।

একই আধারে ওই অবুঝ লুব্ধ জানোয়ার আর মানুষ পাশাপাশি বাস করে কেমন করে। নগ্ন উল্লাসে জানোয়ারটা যখন নখ-দাঁত বার করে, মানুষটার তখন অস্তিত্ব নেই। আবার লজ্জায় ক্ষোভে নিদারুণ ধিক্কারে মানুষ যখন যন্ত্রণার মাটিতে ঘষে ঘষে নিজেকেই রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে, ওই শয়তান তখন নিখোঁজ। বাপী তরফদার এমন দুটো দুর্বার সত্তা আর কত বইতে পারে?

রাতে ঘুম হয়নি। সকালের মধ্যে মনস্থির। ভালো করে ভোর হবার আগে সকলের অগোচরে এখান থেকে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাওয়ার দুর্বল ইচ্ছেটা বাতিল করেছে। অন্য সব বাসিন্দাদের মনে খটকা লাগতে পারে, সংশয়ের আঁচড় পড়তে পারে। রতন বণিকের সেটা প্রাপ্য নয়।

আজও সকালে রতনই চা-রুটি নিয়ে হাজির। বাপী ওইটুকু ঘরেই পায়চারি করছিল। আসা মাত্র বলল, আমি আজ চলে যাচ্ছি রতন।

শুনে রতন বণিক একেবারে হাঁ। যাবার কথা বিপুলবাবু মাঝেসাঝে বলে বটে, কিন্তু কাজকর্মের সুরাহা হবার আগে সত্যি যাবে ভাবেনি। তাই ধাক্কাই খেল।—আজই যাবেন!...আমাদের ওপর রাগ করেছেন?

সামান্য কথায়ও বুকের তলায় মোচড় পড়ে। বাপী মাথা নাড়ল। বলল, তোমাদের ঋণের কথা ভুলব না, তোমার মতো ভালোমানুষও আমি কম দেখেছি রতন।

রতন বণিক নিশ্চিন্ত, খুশিও।—বি যে বলেন, আপনি ছিলেন, আমাদের কত ভাগ্যি। ...আজই যাবেন কেন, কাজটাজের কিছু খবর পেয়েছেন?

—দেশে যাব, সেখানে একটু তদ্বির-তদারক করতে পারলে চা-বাগানের কাজ কিছু পেয়ে যেতে পারি। বাপী ভেবে বলেনি, কিছু বলা দরকার তাই বলেছে। আসলে বাপী কোথায় যাবে সে ফয়সালাও নিজের সঙ্গে তখন পর্যন্ত হয়নি। এখান থেকে নড়বে এটুকুই স্থির।

রতন বণিক চেয়ে রইল একটু। বলল, কাজ পেতে পারেন না—পেয়ে যাবেন। ক'দিন আগে যা দেখেছিলাম, তার থেকে আপনার কপালের রং অনেকটা ভালো হয়ে গেছে। আমার কথা মিলিয়ে নেবেন, দিন ফিরলে ভুলবেন না যেন। বউটাকে বলি, ভালো কিছু রাঁধুক আজ, আমি না-হয় এ-বেলা হাফ-ডে ছুটি নিয়ে ও-বেলা আপিস যাব।

বাপী ব্যস্ত হয়ে উঠল, না-না, তার কিছু দরকার নেই, আমি ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে বেরিয়ে পড়ব, সকালের দিকে গাড়ি। মুখে হাসি টানার চেষ্টা, খাওয়ার জন্য ব্যস্ত কেন, কম খেলাম নাকি এ পর্যন্ত।

—তাহলে ভালো করে একটু জলটল খেয়ে নিন, আমি চট্ করে দোকান থেকে ঘুরে আসছি।

দু'ঘণ্টার আগেই বাপী বেরিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত। চলে যাচ্ছে শুনে এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকে দেখা করে গেল। রতন তাদের বলেই ফেলেছে, চা-বাগানের মস্ত একটা কাজের খবর পেয়ে বিপুলবাবু চলে যাচ্ছেন।

রতন ট্যাক্সি ডাকতে গেল। খুপরি ঘরে বাপী একা নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে। ও-ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একবার কি বলে আসবে, আমি চলে যাচ্ছি?

কমলা নিজেই এলো। দরজা দুটো খোলা। আজ এক পাটও বন্ধ করল না। বাইরে থেকে সরাসরি চোখে না পড়ে সেই ভাবে দেওয়ালের দিক ঘেঁষে দাঁড়াল।

কিন্তু কমলার এই মুখ দেখবে বাপীর কল্পনার মধ্যেও ছিল না। গত তিন রাতের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে লোলুপ সান্নিধ্যের উদ্‌ভ্রান্ত মুহূর্তেও তার মুখ দেখতে পায়নি। নিঃশব্দে এসেছে। নিঃশব্দে চলে গেছে। একটি কথাও বলেনি। আজ ওকে দেখে বাপীরই বিস্ময়। কমলার এমন ঢলঢলে অথচ প্রশান্ত কমনীয় শামলা মুখ আর কি কখনো দেখেছে? সংকোচের লেশ নেই, অনুতাপের চিহ্ন নেই, বিবেকের তাড়নার এতটুকু ছায়ামাত্র নেই। মুখের দিকে চেয়ে রইল একটু, বলল, তুমি চলে যাবে জানতাম, আজই যাবে ভাবিনি...ভালই হল।

বাপীর খুব ইচ্ছে জিগ্যেস করে, কেন ভালো হল। মুখে কথা সরল না। নির্বাক দু' চোখ ওর মুখের ওপর।

কমলাও দেখছে। বলল, এর পর তুমি কেবল আমাকে ঘেন্নাই করবে জানি। কিন্তু আমি হয়তো তোমাকে পূজো করেই যাব, আর ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করব যেন তোমাকে ভালো রাখে।

ভিতরে ভিতরে বাপী হঠাৎ বড় রকমের নাড়াচাড়া খেল একটা।...ওর জন্যে, ওর ভালোর জন্যে দু' চোখে এত মায়া বাপী আর কার দেখেছে? মনে পড়ছে কার দেখেছে। বানারজুলির পিসিমার দেখেছে। আর সেই মুহূর্তে সত্তার নাড়িতে টান পড়েছে একটা। পিসিমা নেই। বানারজুলি আছে। মা কাকে বলে বাপী জানে না। মায়ের মতো করে বানারজুলি তাকে ডাকছে। অনেক ডেকেছে। বাপী শোনেনি। এখন আবার ডাকছে।

বাপী চলেছে।

জলপাইগুড়িতে এবারে আর দু' ঘণ্টাও ভালো লাগল না। যাঁর টানে এসেছিল তিনি নেই। ড্রইং-মাস্টার ললিত ভড়। তাঁর ঘরে সেই মরচে-ধরা তালা ঝুলছে এখনো। চারদিক আগাছায় ভরে গেছে, দু ঘরের পিছনেরটা পড়ো-পড়ো। বুকের তলায় কারো জন্য এখনো যে একটু দরদের জায়গা আছে বাপী জানত না। এখন টের পাচ্ছে। ভিতরটা টনটন করছে। সপরিবারে একটা মানুষ একেবারে হারিয়েই গেল।

জলপাইগুড়ি থেকে বানারহাট পর্যন্ত টানা বাস ছিল। সেখানে এসে শুনল আরো একটু সুব্যবস্থা হয়েছে। বানারহাট থেকে বাস সার্ভিস চালু হয়েছে বানারজুলির চা-বাগানের কল পর্যন্ত।

আসতে আসতে বাপী ভাবছিল, তার ঘরদোরেরই বা কি অবস্থা কে জানে। ভেঙে

পড়ার কথা অবশ্য নয়। আবু রব্বানী থাকলে বে-দখল হবার সম্ভাবনাও কম। কিন্তু যে মেজাজের মানুষ ও, এখনো বীটম্যানের কাজ নিয়ে পড়ে আছে কিনা কে জানে। থাকলেও বাড়ি খালি পড়ে আছে কি ভাড়াটে বসানো হয়েছে জানে না। বাবা মারা যাবার পরে চলে আসার সময় আবুকে বাড়িটা বেচে দিতেই বলে এসেছিল। আবু রাজি না হওয়াতে ভাড়াটে দেখতে বলেছিল। দেড়ঘরের কাঠের বাড়ির পাঁচ-সাত টাকা যা ভাড়া জোটে। গত পাঁচ বছরের মধ্যে বাপী নিজে একটা চিঠি লিখেও খবর নেয়নি। এর মধ্যে কত কাণ্ড। যুদ্ধের নিষ্পত্তি হয়েছে। দেশ দু-খণ্ড হয়েছে, স্বাধীন হয়েছে। এই তোড়ে তার দেড়ঘরের বসতবাড়ির অদৃষ্ট চোখে না দেখা পর্যন্ত ভরসা করার কিছু নেই।

চা-কলের সামনে বাস এসে দাঁড়ানোর আগেই বাপী ভাবনাচিন্তা ভুলে গেল। সেই বানারজুলি। আকাশের গা ঘেঁষা সেই পাহাড়ের সারি। তার গায়ে থাক-থাক পেঁজা তুলোর মতো সাদাটে মেঘ।...ওই বানারজুলির জঙ্গল। দিনটা ঠিক মেঘলা নয় আজ। কিন্তু জঙ্গলের দিকটা মেঘলা দিনের মতোই লাগছে।

.ওই মাথা-উঁচু শাল শিশু অর্জুন জারুল দেবদারু ইউক্যালিপটাস গাছগুলো যেন সেই আগের মতো বাপী নামে এক দুরন্ত ছেলের পা ফেলার অপেক্ষায় ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে আছে। বাসের মাথা থেকে টিনের সুটকেস আর বাঁধা বিছানা নামানো হতেই বাপীর ছোটার তাড়া। কিন্তু বাক্সবিছানা নিজে বয়ে নিয়ে যাবার মতো এখন আর অত হাল্কা নয়। জিনিস তো কিছু বেড়েইছে।

পয়সা কবুল করে একটা লোক জোটানো গেল। তারপর জুতোর তলা দিয়েও পায়ে সেই পরিচিত পথের স্পর্শ। এদিকের চা-বাগানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সেই পুরনো দৃশ্য চোখে পড়ল। নানা বয়সের নানা রংয়ের মেয়েরা আড়াইপাতি তুলছে আর কোমরের সঙ্গে বাঁধা বেতের ঝুড়িতে ফেলছে। বাপী একটু না দাঁড়িয়ে পারল না। হঠাৎ দেখলে মনে হবে কিছুই বদলায়নি, জীবনের স্রোত সেই একভাবেই চলছে।

বদলেছে শুধু বাপী নিজে। আগের মতো ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে ওরা আর সেরকম করে হাসবে না, রঙ্গকৌতুকে উছলে উঠবে না। ওরা মতলব দেখবে, লোভের ছোবল ভাববে। অথচ সেই চৌদ্দ-পনের বছর বয়সে যেমন ছিল সেই মুহূর্তে অন্তত সেটুকু লোভেরও ছিটেফোঁটা নেই।

চা-বাগানের সাহেববাংলো কটা পার হবার সঙ্গে সঙ্গে বাপীর উৎসুক দু চোখ আর এক দিকে ছুটল। রাস্তার ঢালের ওধারে শালগুঁড়ির দিকে। তারপর সেই ছেলেবেলার মতোই ছুটে যেতে ইচ্ছে করল।

বনমায়ার একটা পা শালগুঁড়ির সঙ্গে শেকলে বাঁধা। সামনে ডালপালা ছড়ানো। বনমায়ার খাবার তাড়া খুব নেই। বেছে একটা দুটো তুলে মুখে দিচ্ছে। সঙ্গের লোকটাকে দাঁড়াতে বলে বাপী নেমে গেল। শালের ছায়ায় বছর আঠারো-উনিশের একটা ছেলে মাটিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

বাপী আট-দশ হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল। এবারে হাতিটা দেখল ওকে। পেল্লায় শরীরের ক্ষুদে চোখ দুটো স্থির খানিক। তারপরেই বিশাল দেহে আনন্দে তরঙ্গ তুলে শুঁড় উঁচিয়ে মস্ত সেলাম। গলা দিয়ে আনন্দের টানা ঘড়ঘড় শব্দে গাছতলায় ছোকরার ঘুম ভেঙে গেল।

বাপীর গলার কাছে আনন্দের ডেলা আটকেছে একটা। আর চোখের দু কোণ শিরশির করছে। এগিয়ে যেতে বনমায়া ওকে শুঁড় দিয়ে আলতো করে জড়িয়ে ধরে সোহাগ জানালো। যেন বলতে চায়, এতদিন কোথায় ছিলে, কত খুঁজেছি তোমাকে। ছেড়ে দিতে বাপী ওর শুঁড়ে হাত বুলিয়ে আদর করল খানিকক্ষণ। বলল, ছ' বছর বাদে দেখেও তুই আমাকে ঠিক চিনে ফেললি! কি করে চিনলি? একবার চিনে রাখলে তোরা আর ভুলিস না?

গাছতলার ছেলেটা মুখ উঁচিয়ে এই আদরের মাখামাখি দেখছিল। ভূমিশয্যা ছেড়ে অবাক মুখে উঠে এলো। বাপী দেখেনি। বনমায়ার নাকেমুখে এবার ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনে ঘুরে তাকালো। মনে হল, এই ছেলেটাকে বনমায়া তেমন পছন্দ করে না।

বাপীর পরনে পরিষ্কার পাজামা-পাঞ্জাবি। এই এখন সর্বদার পোশাক। কিন্তু বনমায়ার হাবভাব দেখে হোক বা যে কারণেই হোক ছেলেটা হয়তো বিশেষ কেউ ভেবে বসল ওকে। ফিরে তাকাতে সসম্ভ্রমে সেলাম ঠুকল।

—তুমি কে?

—জী লছমন...

—ওর মাহুত ভীমবাহাদুর কোথায়?

লছমন সবিনয়ে জানালো, ভীম বাহাদুর চার বছর আগে এ-জায়গা ছেড়ে পালিয়ে গেছে। এখন ও-ই বনমায়ার মাহুত।

বাপী তক্ষুনি বুঝে নিল এই পালানোর সঙ্গে ওর সেই ভালবাসার মেয়ের কিছু যোগ আছে। কিন্তু চাকরি ছেড়ে বনমায়াকে ছেড়ে একেবারে পালানোর দরকার হল কেন বোঝা গেল না। যতদূর মনে পড়ে, আবুর মুখে শুনেছিল ভীমবাহাদুর পণের টাকা জমাচ্ছে। যে মেয়েকে চায় তাকে পেতে হলে তার বাপকে পণের টাকা গুনে দিতে হবে।

কথার ফাঁকে বাপী বনমায়ার শুঁড়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। বনমায়ার হঠাৎ ফোঁস-ফোঁসানি তাইতে থেমেছে ছেলেটা তাও লক্ষ্য করল। একটু আগ্রহ নিয়ে বলল, আপনাকে হুজুর এই গোঁয়ার হাতিটা খুব ভালোবাসে দেখছি।

এক প্রেমিকের সঙ্গে পালানো ছাড়া বনমায়া গোঁয়ার এমন অপবাদ বাপীর কানে এই প্রথম। জিজ্ঞেস করল, কেন, তোমাকে ভালবাসে না?

লছমনের মুখখানা বিষ একটু। মাথা নেড়ে জানালো, ভালবাসে না। তারপর ওর কথা থেকে সমস্যা বোঝা গেল। ভীমবাহাদুর চলে যাবার পর চার বছরে একে একে পাঁচজন মাহুত বনমায়ার কাজে লেগেছে। ও ছ-নম্বর। গোড়ায় তিন-তিনটে মাহুতকে এই জিদ্দী হাতি কাছেই ঘেঁষতে দেয়নি। কাছে গেলে তেড়ে এসেছে। টানা দুটো বছর ওকে দিয়ে জঙ্গলের কাজ হয়নি। পরের দুটো মাহুতও খুব সুবিধে করতে পারেনি। এখন অবশ্য আগের তুলনায় অনেক ঠাণ্ডা, কিন্তু এখনো রাগে ফোঁস ফোঁস করে, আর মাঝে মাঝে ক্ষেপে যায়! ক'দিন বেশ ঠাণ্ডা ছিল, আজ আবার মতিগতি সুবিধের নয়।

বাপীর ধারণা, ওকে দেখে বনমায়ার ভীমবাহাদুরকে আজ বেশি মনে পড়ছে। তাই রাগ। জিজ্ঞেস করল, ও ফি বছর একবার করে পালাতো—এখনো পালায়?

লছমনের হাসি-হাসি মুখ। জবাব দিল, সে-বেলায় ঠিক আছে। কোনো বছর বাদ

যায় না। আবার ফিরেও আসে। পালালে সাহেবরা এখন আর রাগটাগ করে না, জানে ফিরে আসবে। কেবল যতদিন না আসে আমার হয়রানি। আমি কাজ নেবার তিন সপ্তাহের মধ্যেই ও পালিয়েছিল।

বাপী ভেবে পেল না, এই মেজাজ যখন, বনমায়া পালিয়ে গিয়েও আবার ফিরে আসে কেন? হয়তো ভীমবাহাদুরের টানে আসে। ভাবে ফিরে এলে ওকে দেখতে পাবে। হয়তো বা সভ্যভব্য হাতি জংলি দোসরের সঙ্গ খুব বেশিদিন বরদাস্ত করতে পারে না। আবুর একটা কথা মনে পড়তে বনমায়াকে আর একবার ভালো করে দেখে নিল।...সেবার ফিরে আসার পর বনমায়াকে একটা বড়সড় আদরের চাপড় মেরে আবু বলেছিল, তিন বছর ধরে পালিয়ে গিয়ে রস করে আসছিস—বাচ্চা-কাচ্চা হবার নাম নেই কেন? তোর মরদটাকে ধরে এনে ডাক্তার দেখা।

বাচ্চা আজও হয়নি বোধ হয়। হলে দেখতেই পেত। লছমনকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি আবু রব্বানীকে চেনো?

সঙ্গে সঙ্গে ও ঘাড় হেলিয়ে জানালো, খুব চেনে। আঙুল তুলে জঙ্গলের দূরের দিকটা দেখিয়ে দিল। ওই জঙ্গলে থাকে।

আবু এখানেই আছে জেনে বাপী নিশ্চিন্ত একটু। তারপরেই মনে হল সঙ্গের মাল নিয়ে সোজা নিজের ডেরায় গিয়ে কি লাভ। খালি আছে কিনা ঠিক নেই, আর খালি যদি থাকেও, ও আসবে বলে কি কেউ ঘরদোর খুলে বসে আছে? আবুর সঙ্গেই আগে দেখা হওয়া দরকার।

লছমন এতক্ষণে ভরসা করে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে হুজুর?

বাপী হেসেই জবাব দিল, আমি তোমাদের হুজুর-টুজুর কেউ নই। এখানেই জন্মেছি এখানেই বড় হয়েছি। পাঁচ-ছটা বছর এখানে ছিলাম না—

কোনো ভদ্রলোক এভাবে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে সদালাপ করে না হয়তো। খুশি-মুখ দেখল। সেই সঙ্গে হঠাৎ কিছু প্রত্যাশাও যেন।—আমার একটু উপকার করবেন বাবু?

বাপী অবাক!—আমি আবার তোমার কি উপকার করতে পারি?

গলায় আব্দারের জোর ঢেলে লছমন বলল, আপনি একটু চেষ্টা করলেই পারবেন বাবু—ওই জেদী হাতি আপনাকে কত ভালবাসে স্বচক্ষে দেখলাম। এক ভীমবাহাদুরকে এ-রকম ভালবাসত শুনেছি। আপনি একটু চেষ্টা কবলে ও আমাকেও ঠিক পছন্দ করবে—ওরা যাকে ভালবাসে তাদের কথা শোনে, বোঝে। ওকে দিয়ে এখনো জঙ্গলের কাজ ভালো করে করাতে পারি না, না পারলে সাহেবরা বা ঠিকাদার খুশি থাকে না। এরকম হলে আগের মাহুতদের মতো আমারও কাজ যাবে—

এমন উপকারের বায়না বাপী আর শোনেনি। হড়হড় করে এতগুলো কথা বলার পর ছেলেটার কালো মুখ প্রত্যাশায় জ্বলজ্বল করছে। বাপীর হাসি পাচ্ছে। বানারজুলিতে পা দিয়েই একটা কাজের মতো কাজ পেল বটে।

—আবু রব্বানীকে বলোনি কেন, ওকেও তো বনমায়া ভালবাসে।

এবারে লছমনের মুখ দেখে মনে হল প্রায় অসম্ভব প্রস্তাব কিছু। বলল, সে তো এখন মস্ত লোক বাবু, অনেককে টপকে জঙ্গলের হেড বীটম্যান হয়েছে, বন্দুক নিয়ে ঘোরে, বড়সাহেব তাকে পছন্দ করে—তার কাছেই তো যেতে সাহস হয় না। কখনো

দেখা হয়ে গেলে বনমায়াকে একটু আদর করে, আর আমাকে বলে, ভালো সেবা-যত্ন করে ওকে বশ কর, নইলে তোরও সময় ঘনালো বলে। না বাবু তাকে দিয়ে হবে না, আপনি চেষ্টা করলেই হবে—আপনাকে ও আবুর থেকেও বেশি ভালবাসে স্বচক্ষে দেখলাম।

...আবু রব্বানী তাহলে এখন হেড বীটম্যান আর মস্ত লোক। একটা বন্দুক বাগাতে পারেনি বলে নিজের বাপকে অকর্মণ্য ভাবত, তাও মনে আছে। কি ভেবে নিয়ে রাস্তার বাক্সবিছানা মাথায় লোকটাকে ডাকল। অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। লছমনকে বলল, আমার এই জিনিসগুলো তোমার জিম্মায় রাখো, আমি একটু ঘুরে আসছি। আবু রব্বানীর ওখানেই যাব—

সভয়ে লছমন বাবু থেকে আবার হুজুরে উঠে এলো তক্ষুনি।—আমার কথা যেন কিছু বলবেন না হুজুর!

বাপী হেসেই আশ্বাস দিল, তোমার কিছু ভয় নেই, বনমায়া যাতে তোমাকে পছন্দ করে আমি নিজেই সে-চেষ্টা করব। বনমায়ার শুঁড় চাপড়ে দিল, লছমনকে ভোগাচ্ছিস কেন, অ্যাঁ?

লোকটার পয়সা মিটিয়ে আবার রাস্তায় উঠে এলো। যত এগোচ্ছে চোয়াল দুটো এঁটে বসছে। ধমনীতে রক্তের স্রোত বদলাচ্ছে। আর খানিক এগোলেই সেই বাংলো। বানারজুলি জঙ্গলের বড় সাহেবের বাংলো।

এলো। রাস্তা ছেড়ে সেই ধারের গাছটার সামনে দাঁড়াল। যে গাছের নিচু ডালে বসে মিষ্টিকে নানা কৌশলে ওই বাংলো থেকে টেনে আনত। বাইরের কাঠের বারান্দায় মাঝবয়সী একজন আয়া গোছের কেউ বসে।

আট সাড়ে আট বছর আগে ওই বারান্দায় এই শরীরটা বাবার চাবুকে লুটোপুটি খেয়েছিল। গায়ের চামড়া ফেটে ফেটে যাচ্ছিল। ঠোঁট ফেটে কেটে মুখ রক্তে ভরে গেছল।...ওই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মিষ্টি দেখছিল। আর এই সেদিন বিকেলে লেকের ধারে ভিতরটা যখন তার থেকেও বেশি ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছিল...মিষ্টি দেখছিল।

কিন্তু আশ্চর্য! বাপীর চোয়াল দুটো আরো এঁটে বসছে, একটা ক্ষমাশূন্য অভিলাষ ভিতরে দাপাদাপি করছে, অথচ প্রতিশোধের সেই সাদা আগুন এই মুহূর্তে ঠিক তেমন করে জ্বলছে না।...কেন? নিজে ভ্রষ্ট হবার ফল? অপরাধচেতনা?

বাপী সামনের ওই বাংলোর দিকে চেয়ে আছে বটে, কিন্তু দেখছে নিজেকে। আরো কিছু দেখার আছে যেন, বোঝার আছে। সব প্রত্যাশার বুকে ছুরিবসানো আচমকা অপমানের আঘাতে আর আত্মঘাতী ক্রোধে আর নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে প্রবৃত্তির ক্রূর উল্লাসে সেই আরো-কিছু-দেখা বা বোঝার ব্যাপারটা দূরে সরে গেছল। বাপীর ভেতর-বার এই মুহূর্তে আবার অদ্ভুত ঠাণ্ডা। এখানে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বনের হাতি বনমায়া সেই ঠাণ্ডা প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছে।

...পুরনো দিনের অন্তরঙ্গ সঙ্গীকে বনের পশুও ভোলে না। মানুষ ভোলে? মিষ্টি কি একেবারে ভুলতে পেরেছিল? স্লিপ পাঠানোর তিন-চার মিনিটের মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে নেমে এসেছিল, তার দু'চোখে বিস্ময় আর আগ্রহের বন্যা দেখেছিল—সে কি মিথ্যে! ...সেই সন্ধ্যায় চলে যাবার আগে ওর জুলুমে পড়ে অমন করে মুখের দিকে চেয়ে মিষ্টি

কি দেখছিল? শুধু দেখছিল, না নিজের সঙ্গে যুঝছিল? তারপর ভব্যভাবে বাপীকে অকরুণ কিছু বুঝিয়ে দেবার জন্যে একই সঙ্গে ওই সোনালী চশমাকেও লেকে ডেকেছিল বটে। আট বছরের ফারাকে কেউ যদি তার মন কেড়েই থাকে, ছেলেবেলার সাথীকে দেখামাত্র তাকে নাকচ করে দেবে এমন আশা বাতুলে করে। ঠাণ্ডাভাবে এটুকুই হয়তো বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল। পাড়ার ভক্তের দল এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে সে-আঘাত চারগুণ হয়ে বাপীর বুকের ভিতরটা ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়েছিল সত্যি কথাই। কিন্তু মিষ্টি যে মূর্তিতে ওদের ধাওয়া করে তাকে আগলেছিল আর সেই মন-কাড়া সোনালি চশমার ওপর যে-রকম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল—সেই সত্যটা কি কম কিছু?

...পুরনো লোভ পুরনো আশা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে আবার। ওই মাখনের দলা সোনার চশমা মিষ্টির জীবনের দোসর হতে পারে না। মিষ্টি বাপীর জগৎ থেকে একেবারে মুছে যাবে এমন হতে পারে না। দুনিয়া যত বড়ই হোক, আবার যোগাযোগ হবে, আবার কিছু ঘটবে। ঘটতে বাধ্য। যা ঘটেছে সেটা এখনো শেষ নয়, শেষ কথা নয়।

কিন্তু এই উদ্দীপনার পিছনে বিষাদের ছায়া দুলছে। সত্তার দুর্বার জোরের অনেকখানি কলকাতার সেই টালি এলাকায় খুইয়ে এসেছে। দোষ কমলা বণিকের কি নিজের সেটা কোনো সান্ত্বনা নয়।

অসহিষ্ণু তাড়নায় চিন্তাটা বাতিল করার চেষ্টা বাপীর। এখান থেকেই জঙ্গলে ঢুকত মিষ্টিকে নিয়ে। বাপী নেমে এলো। জঙ্গল তেমনি আছে, শুধু অনেকদিন না দেখার ফলেই হয়তো ঘন লাগছে একটু।

...সব যেন সেদিনের কথা, সেদিনের ব্যাপার। এদিকটায় ওরা রঙিন প্রজাপতি আর কাঠবেড়ালি আর খরগোশের পিছনে ছোটাছুটি করত। বাপী তরফদার দেখছে, দাঁড়াচ্ছে, আবার চলছে।...ওই সেই ছোট গাছটা। বাপী এই ছোট ডালটায় পা ঝুলিয়ে বসেছিল, দু হাতে দুটো হাত ধরে মিষ্টিকে প্রথমে পায়ের ওপর তুলেছিল, তারপর বুকে জাপটে ধরে পাশে বসিয়ে দিয়েছিল। নামার সময় তেমনি বুকে করে নামিয়েছিল—দশ-বারো গজ অমনি টেনে নিয়ে তবে ছেড়েছিল।

পা দুটো আড়ষ্ট আবার এক জায়গায়। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।...সামনে সেই শিশুগাছ যার মোটা গুঁড়িতে পাকে পাকে জড়িয়ে ছিল সাদা-কালো ছোপের বিশাল ময়াল সাপ, চ্যাপ্টা মুখটা সামনে টান হয়ে মিষ্টির দিকে। ওটার সোঁ-সোঁ নিঃশ্বাসে মিষ্টির সর্বঅঙ্গ অবশ, নড়াচড়ারও ক্ষমতা ছিল না। ওকে দুচোখে আটকে নিয়ে সাপটা আস্তে আস্তে গাছের গুঁড়ি থেকে নিজের শরীরের প্যাঁচ খুলছিল।...বাপীর আচমকা প্রচণ্ড ধাক্কায় মিষ্টি চার-পাঁচ হাত দূরে ছিটকে পড়েছিল। তারপর পাগলের মতোই ছুটেছিল দুজনে।

বাপীর কপালে ঘাম। সংকট যেন সদ্য কেটেছে।...পুরস্কারও পেয়েছিল। মেয়েকে জঙ্গলে টেনে আনার অপরাধে মেমসাহেব সকলের চোখের সামনে বাপীর কান টেনে ছিঁড়তে চেয়েছে, আর গালাগাল করে ঘাড় ধরে বাংলো থেকে নামিয়ে দিয়েছে।

সেই বাপী আজ এই মুহূর্তেও ভাবছে যে-মেয়েকে ধরা-বাঁধা মৃত্যু থেকে ফিরিয়ে এনেছে, তার ওপর সব দখল কার? শুধু তার ছাড়া আর কার হতে পারে?

পা দুটো আরো এক জায়গায় থেমে গেল। সেখানে সেই শেষ কিছু ঘটেছিল। যার ফলে মুখের গা-ঘুলনো রক্তের স্বাদ জীবনে ভুলবে কিনা জানে না। স্থান-কাল

ভাল-মন্দ ভুলে, পরিণামের হিসেব ভুলে উন্মাদ লোভে আর আক্রোশে সেই মেয়েকে এখানে এনে ফেলেছিল আর তার সর্বাঙ্গের নরম মাংস খুবলে নেবার উল্লাসে মেতেছিল। বাপী তরফদারের মুখের রেখা কঠিন। কপালে ভ্রুকুটি। শিরায় শিরায় উষ্ণ তাপ। টালি এলাকার খুপরিঘরে আত্মবিলোপের দাহ বুকে লেগে আছে। কিন্তু এখানকার সেই স্মৃতির কোনো দাহ নেই। অনুতাপ নেই। বরং সেই দখল অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়ায় পরিতাপ। ওই একজনের ওপর তার সত্তার অধিকার। কোথা দিয়ে কেমন করে সেই অধিকার এসেছে, চৌদ্দ বছরের বাপী জানত না, আজকের বাপী তরফদারও জানে না। সেই অধিকার নাকচের যন্ত্রণা সেদিনও যেমন, আজও তেমনি।

আবু রব্বানীর ডেরার সামনে এসে বাপীর ধোঁকা লাগল বেশ। খুব ভালো জানা না থাকলে চেনা যেত না এমনি ভোল পাল্টেছে। দুখানা ঘরের পাশে এখন আরো একটা ঘর। সামনে পিছনের অনেকটা জায়গা পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। চারদিকের সবটা জুড়ে শক্তপোক্ত বাঁশের বেড়া। সামনে বাঁশের মজবুত গেট। এদিকে পাহাড়ী ফুলের বাগান।

বনমায়ার ছোকরা মাহুত লছমন সসম্ভ্রমে বলেছিল, আবু রব্বানী মস্ত মানুষ একজন। এখন তার ভেতর কেমন কে জানে। গেট খুলে পায়ে পায়ে ঘরের দিকে এগলো। ঘর থেকে মোটাসোটা তিন সাড়ে-তিন বছরের কালো-কোলো ন্যাঙটা ছেলে ছুটে বেরিয়ে এলো। ওকে দেখে থমকে দাঁড়াল, তারপর হাঁ করে চেয়ে রইল!

ছেলেটা নয়, ভেবাচাকা খেয়ে গেল বাপীই বেশি। শুধু বিয়ে নয়, আবুর এর মধ্যে ছেলেও হয়ে গেছে! এরপর যে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো তাকে দেখে বাপী সত্যি হাঁ। ছট্টু মিঞার বউ দুলারি। তার কোলে আর একটা আট-ন' মাসের বাচ্চা। কিন্তু দুলারি কেন? রেশমা নয় কেন?

বাড়ির আঙিনায় ঢুকে একটা লোককে সঙের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দুলারি ছেলে কোলে নিয়েই গম্ভীর মুখে আরো খানিকটা এগিয়ে এলো। জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল কাকে চাই বা কি চাই? করা হল না। তামাটে মুখে বিস্ময়ের আঁচড় পড়তে লাগল।

—বাপীভাই না?

অবাক চোখে দুলারির দিকে চেয়ে বাপী মাথা নাড়ল। আগে ওকে কখনো বাপীভাই বলে ডেকেছে মনে পড়ে না। তামাটে রঙে এখন আর অতটা কালচে ভাব নেই। ঢ্যাঙা শরীর এখনো প্রায় আগের মতোই আঁটোসাঁটো। মাথার চুল এলোমেলো, লালচে নয় আগের মতো। বেশ সুবিন্যস্ত আর তেল-চকচকে। মুখের সেই রুক্ষভাব আর নেই, চাউনিও তেমন ধার-ধার নয়।

তবে স্বভাব-গম্ভীর মেয়ের আপ্যায়নে উচ্ছ্বাস বেশি ধরা পড়ে না। এত বছর বাদে ওকে দেখে অখুশি নয় এটুকুই বোঝা গেল।

—বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, দাওয়ায় উঠে এসো। কত বড়টি হয়ে গেছ, অনেক লম্বাও হয়েছ—আমি হঠাৎ চিনতেই পারিনি। কবে এলে?

—আজই। বাপী খানিকটা এগিয়ে এলো বটে, কিন্তু মাটি ছেড়ে দাওয়ায় উঠল না। কোলের বাচ্চাটা আঙুল চুষছে আর কুতকুত করে তাকাচ্ছে। বড়টাও দুলারির গা ঘেঁষে ড্যাবডেবে চোখে ওকে নিরীক্ষণ করছে। জিজ্ঞেস করল, আবু কোথায়?

—খানিক আগে তো তোমার ঘরের দিকেই যাচ্ছে বলে গেল, তুমি ও দিক থেকে আসছ না?

—না। ব্যাপারটা এখনো বোঝার চেষ্টা বাপীর।—ছট্টু মিঞার খবর কি?

সামনের আকাশের দিকে একবার একটু মুখ উঁচিয়ে নির্লিপ্ত গলায় দুলারি জবাব দিল, তার খবর তো ওখানে, সেই যেবারে তুমি শেষ এলে সে-বছরই চলে গেল—

বাপী ভাবল, আর কেউ নেই বলে আবু রেশমার সঙ্গে ওকেও ঘরে এনে রেখেছে। তবু কেন যেন বোকার মতোই জিজ্ঞাসা করল, এরা কার ছেলে?

এত অবাক হতে দেখেই হয়তো তামাটে মুখে হাসি ফুটল একটু—যার কাছে এসেছ তার, আবার কার?

—রেশমা কোথায়?

জবাব দেবার আগে দুলারি এবারে ওকে ভালো করে দেখে নিল একটু। তারও অবাক লাগছে বোধ হয়। সাপ নাচাতো যে মেয়ে সে বাঁকা তাকাতে জানে, বাঁকা কথাও বলতে পারে।—এতকাল বাদে এসেই রেশমার খোঁজ কেন—সে তার ঘরেই হবে।

বাপী এখনো কি শুনছে কি বুঝছে ঠিক নেই।...রেশমা তার ঘরে আর দুলারি আবুর ঘরে! হঠাৎই রহস্যের পর্দাটা উঠে গেল। কিন্তু সে-ও তো বিস্ময়ে হাবুডুবু খাবার মতোই ব্যাপার!

বিড়ম্বনার ধকল সামলে বলল, আচ্ছা এখন যাই, আবুকে ধরতে পারি কিনা দেখি। পরে আবার আসব—

তড়িঘড়ি পা চালিয়ে একেবারে আঙিনার বাইরে। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নিজের ঘরের পথ ধরেও মাথায় এই বিস্ময়টুকুই ঘুরপাক খাচ্ছে। সাপ খেলানোর ব্যাপারে দুলারি রেশমার থেকেও ঢের বেশি চৌকস ছিল বটে। হতেই পারে, ঘরের লোকের কাছ থেকে সরাসরি শিখেছে। রুক্ষ মুখে পেটমোটা বাঁশি লাগিয়ে গাল ফুলিয়ে হেলেদুলে সাপের ফণার সঙ্গে তালে তালে ঝোঁক মিলিয়ে সাপ খেলানোর দৃশ্য চোখের সামনে ভাসছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুলারি এ কি খেলা দেখালো।

আরো একটু ধাক্কা বাকি ছিল বাপীর...।

নিজের বাড়ির সামনে এসেও হাঁ। এরও ভোল বদলে গেছে। ছোট-বড় দুখানা ঘরের পাশের খালি জমিতে লাগোয়া আর একটা বড় ঘর গজিয়েছে। কাঠের বাড়িতে আগে রঙের বালাই ছিল না, এখন ওটার সর্বাঙ্গে রঙের জেল্লা। হালে সংস্কারও করা হয়েছে সন্দেহ নেই। তকতকে ছোট্ট বাংলোর মতো দেখাচ্ছে। সামনের চিলতে বারান্দায় বেতের চেয়ার বেতের টেবিল। ধপধপে সাদা টেবিল-ক্লথ।

আবু রব্বানী সত্যি কি-রকম গণ্য মানুষ হয়েছে বাপী ভেবে পেল না। সামনের দরজা খোলা দেখে ভাবল আবু ভিতরেই আছে।

পায়ে পায়ে উঠে এলো। তারপর খোলা দরজার ভিতরের দিকে এক পা ফেলে মুখ বাড়াতেই বিষম চমক।

—হু ইজ ইট! হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?

মহিলা কণ্ঠের ঝাপটা খেয়ে দু' পা পিছনে ছিটকে এলো বাপী। সঙ্গে সঙ্গে উগ্রমূর্তি মহিলাটিও বাইরে। বাঙালীর মতোই শাড়ি পরা, কিন্তু এক নজরেই বোঝা যায় বাঙালী

নয়। নেপালী। চল্লিশ-বিয়াল্লিশের মধ্যে বয়েস। ফর্সা মুখে লালিত্য কম। এই মুহূর্তে অন্তত উগ্রমূর্তি, রুষ্ট চাউনি। তার পিছনে বছর উনিশের একটি মেয়ে। কমনীয় মুখ, হৃষ্টপুষ্ট সুডৌল চেহারা। পরনে রঙিন ঘাগরা, গায়ে লম্বাটে সাদা ব্লাউস।

বাপীর অমন বিমূঢ় মুখখানা দেখেও মহিলা সদয় নয়। তেমনি রুক্ষ স্বরে আবার জিজ্ঞাসা করল, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?

বাপীর গলা দিয়ে শুধু বেরুলো, আবু রব্বানী...

ওর আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে নেপালী মহিলা এবারও একটু কড়া গলায় কিন্তু পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠল, আবু রব্বানীর খোঁজে এসে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন কেন? কি দরকার তাকে?

পিছনের সুদর্শনাটি মহিলার মেয়েই হবে হয়তো। দুর্দশা দেখছে। বাপী নিজেকে অথৈ জল থেকে টেনে তুলল এবার। মোলায়েম করেই বলল, দরকার কিছু না...। এতকাল আমি জানতাম এটা আমারই বাড়ী...বছর কয়েক ছিলুম না এখানে, দরজা খোলা দেখে ভিতরে আবু আছে ভেবে ঢুকতে যাচ্ছিলাম।

এমন জবাব আশা করেনি বোঝা গেল। মহিলার গোল চোখ আর একটু গোল হতে দেখা গেল। মেয়ের চাউনিও বদলেছে।

এর পরেও মচকাবার পাত্রী নয় মহিলা। গলার ঝাঁঝ একটু কমল শুধু। কি নাম আপনার?

—বাপী তরফদার।

ভুরু কুঁচকে কিছু স্মরণ করার চেষ্টা। স্মরণ হল কিনা বোঝা গেল না। তারপর সাফ কথা—আবু রব্বানী খানিক আগে এসেছিল, চলে গেছে। আপনার কিছু জানার বা বোঝার থাকে তো তার সঙ্গে দেখা করুন।

কথা শেষ হবার আগেই ঘরে চলে গেল। বাপী এবারে কয়েক পলক মেয়েটার মুখোমুখি। ভিতর থেকে আবার একটা তাড়া খাওয়ার সম্ভাবনা মনে আসতেই বাপী তাড়াতাড়ি নেমে এলো।

বিশ-বাইশ গজ দূরে এসে সন্তর্পণে ফিরে তাকালো একবার। মেয়েটা দাঁড়িয়েই আছে আর তাকিয়েই আছে। যার ঘর-বাড়ি তারই এমন হেনস্থার প্রহসনটা বেজায় উপভোগ্য যেন।

অগত্যা সামনের সোজা রাস্তা ধরে বাপীর দ্রুত প্রস্থান।

## নয়

হাসি আর থামেই না। হাসির দমকে জঙ্গলের গাছপালাকে সুদ্ধু তাক লাগিয়ে দিচ্ছে আবু রব্বানী। অদূরের নতুন চারা বেড-এ যে তিন-চারটে লোক কাজ করছে তারাও মাঝে মাঝে এদিকে ঘাড় ফেরাচ্ছে। আবু রব্বানী জঙ্গলের অনেকগুলো খেটেখাওয়া লোকের মুরুব্বি এখন। দস্তুরমতো কড়া মানুষ আর দাপটের মানুষ। সেই লোকের এত ফুর্তি আর এমন হাসি ওদের কাছেও নতুন কিছু।

একটু সামলে আবু বলল, তুমি বাপীভাই সেই আট বছর আগে থেকে ধরে নিয়ে

বসে আছ আমি রেশমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি! এত চৌকস হয়েও তুমি ভাবলে কিনা রেশমার জন্য আমার কলজে পুড়ছে। রোসো, ঘরে ফিরি আগে, দুলারি শুনলেও হেসে গড়াবে।

বোকা বনলেও বাপী হাসছে। নিজের এমন বিতিকিচ্ছিরি ভুলটা স্বীকার করতে আপত্তি নেই। ওর এত হাসি আর এত আনন্দ দেখে স্বস্তিও বোধ করছে। বাইরে যত হোমরাচোমরা হয়ে উঠুক ভিতরের মানুষটা খুব বদলায়নি।

নিজের ঘর-বাড়িতে অমন একখানা ঝাপটা খেয়ে তিক্ত মেজাজে বাপী আবার জঙ্গলে ঢুকেছিল। বাড়তি ঘর তুলে সাজিয়েগুছিয়ে ওই নেপালিনী যে-রকম জাঁকিয়ে বসেছে, তাতে নিজের ডেরায় ঠাঁই মেলার আশায় জলাঞ্জলি। ভরসা আবু রব্বানী।

জিগ্যেস করতে আঙুলের নিশানায় একটা লোক বলে দিল—ওদিকে নয়া চারা বেড হচ্ছে, আবু রব্বানী সেদিকে আছে—

নিশানা ধরে এগোতে এগোতে বাপীর মনে হল জঙ্গলটার কিছু উন্নতি হয়েছে। বড় বড় গাছগুলোর সাদা রং মাখানো গুঁড়ির ওপর কালো কালো নম্বরগুলো বেশ চকচকে লাগছে। পড়ন্ত বেলাতে এদিক সেদিকে দুই-একটা করে লোক কাজ করছে। রাবারের নল দিয়ে কেউ গাছে জল দিচ্ছে, কেউ আগাছা পরিষ্কার করছে। কাগজে-কলমে কাজের লোক আগেও ছিল, কিন্তু বেশির ভাগ সময় তাদের খুঁজেপেতে বার করতে হত। বাপীর মনে হল জঙ্গলটা কিছু যত্নের ছোঁয়া পেয়েছে।

পিছন ফিরে থাকলেও দূর থেকে আবুকে চিনতে অসুবিধে হল না। পরনে খাকি ফুল প্যান্ট। গায়ে চক্রদার মোটা আঁট গেঞ্জি। চওড়া কাঁধ, আগের থেকেও কিছু লম্বা লাগছে ওকে। কালো সুপুষ্ট দুই বাহু। এক হাতের কব্জিতে ঘড়ি, অন্য হাতে ছোট মোটা ছড়ি। ছড়ি দেখে ওর হাতের সেই লম্বা শক্ত পোক্ত লাঠিটার কথা মনে পড়ে গেল, যার একদিকে ইস্পাতের ঝকঝকে ধারালো ফলা গোঁজা আর তার ওপরে লোহার ক্যাপ। ওই লাঠি আবুব চোখের মণি ছিল একদিন। মস্ত মানুষ হয়ে এখন কি সেটা বাতিল করেছে? দেখলে মনে হবে জঙ্গলের কোনো ছোটোখাটো অফিসার লোক দিয়ে কাজ করাচ্ছে।

—হেঁজিপেঁজি ব্যাপার নয়, এ চন্দ্রার বেড ইয়াদ রেখো সাঙাতরা—বড় সাহেবের স্পেশাল অর্ডারের জিনিস। চারা গজালেই সাপে ছুবলোনো বেজির উৎপাত হবে—খুব হুঁশিয়ার, নষ্ট হলে কারো কাঁধে মাথা থাকবে না।

পিছন থেকে আলতো করে বাপী বলল, কাঁধের ওপর নিজের মাথাটা তো খুব টান দেখছি—এদিকে ফেরাও।

ঝটকা মেরে ঘুরে দাঁড়াল। আর তার পরেই খুশিতে আনন্দে দুই চক্ষু বিস্ফারিত একেবারে। ঠিক দেখছে কিনা সেই সন্দেহ।

—বাপী তুই! মা-মানে বাপীভাই তুমি!

দেমাক না বেড়ে থাকলে এই উচ্ছ্বাসই প্রত্যাশিত। বাপী হাসছে।—আবার তুমি কেন!...

লাঠিসুদ্ধু দু হাত বুকের সঙ্গে জাপটে ধরল ওকে। সঙ্গের লোক ক'টা হাঁ মেরে গেছে দেখে ছেড়ে দিল। কপট গাম্ভীর্যে ইশারায় ওদের কাজে মন দিতে হুকুম করল।

তারপর আবার বে-সামাল খুশির উচ্ছ্বাস।—আরে বাপরে বাপ, এখন তুমি কত বড় কত বিদ্বান মানুষ—আর এখানে থাকলে তো কবেই আমার মুরুব্বি হয়ে বসতে—আনন্দে মুখ ফসকে ওরকম বেরিয়ে গেছল—এবার থেকে বাপীভাই-ই বলব। কিন্তু তুমি আজ কোত্থেকে? তোমাকে কত খুঁজেছি, তোমাদের কলেজের ঠিকানায় চিঠি লিখেছি—চার-পাঁচ মাস আগে তোমার খোঁজে জলপাইগুড়িও চ. ল গেছলাম। শুনলাম প্রায় দেড় বছর আগে গ্র্যাজুয়েট হয়ে তুমি নিপাত্তা—

কাঁধ জড়িয়ে ধরে পনের-বিশ গজ সরে এসে ওকে নিয়ে বসল এক জায়গায়। —পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে একটা চিঠি নেই, একটা খবর নেই—ভাবলাম বানারজুলির এই জংলিটাকে ভুলেই গেছ। কবে এলে? আজই?

হাসি মুখে মাথা নেড়ে বাপী বলল, এসেই পর পর দুটো রাম-ধাক্কা।

—সে আবার কি, কোথায়?

—প্রথমটা তোমার বাড়িতে।

—গেছলে বুঝি? তা ধাক্কা কেন, দুলারিকে দেখে?

বাপী হাসতে লাগল। লজ্জা লজ্জা মুখ করে আবু বলল, ওকে যখন ঘরে আনি তোমার কি কোনো পাত্তা ছিল যে খবর দেব!

—সেজন্যে নয়, আমি বরাবর জানতাম রেশমাকে নিজের ঘরে এনে তোলার জন্য তুমি হাঁ করে আছ।

আবু রব্বানীর এবারে আকাশ থেকে পড়া মুখ।—রেশমাকে! এ আবার তোমার মাথায় গজালো কি করে?

অবাক বাপীও কম নয়। কারণ তখনো ধারণা বিশেষ কোনো ঘটনার ফলেই রেশমার বদলে দুলারি তার ঘরে। কিন্তু আবুর মুখ দেখে আর কথা শুনে মনে হচ্ছে তাও না। কি মনে পড়তে বাপী বলল, বাবা মারা যাবার পর বানারজুলি ছাড়ার আগে তোমার বিয়েটা কবে হবে, জিগ্যেস করতে বিরক্ত মুখ করে তুমি বলেছিলে, শালার মরদ ঘরে থাকতে তার বিবিকে বিয়ে করা এত সোজা!...সে তবে কার কথা বলেছিলে?

—কেন, সেই ছট্টু মিঞার কথা। তুমি কি ভেবে বসেছিলে রেশমার মরদ কাঁদনা?

বাপী বোকার মতো মাথা নাড়ল। এতদিন সেই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল বটে।

তাই শুনে আবুর সেই হাসি।—এমন হাসি যে আশপাশের ওই লোকগুলোও সচকিত। তারপর বলল, তোমার দোষ নেই, বলতে গেলে তো ছেলেমানুষই ছিলে তখন। তাছাড়া আধ-মড়া মরদের সেবাযত্ন করলেও আমার ভিতরের মতলবখানা দুলারি টের পেয়ে গেছল। তাই কড়া ভাব দেখাতো আর ছুবলোতে আসত। রেশমা আঁচ পেয়েছিল দুলারির কাছ থেকে—ননদ-ভাজে ভারী ভাব তো—তাই রেশমা আমার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করত। এই সব দেখেই তুমি উল্টোপাল্টা ভেবে বসে আছ।

চওড়া বুক চিতিয়ে আর এক দফা হাসল।—আরে আমি হলাম গিয়ে জঙ্গলের সেই অপদেবতা আবু রব্বানী—আমার যুগ্যি বিবি তামাম বানারজুলিতে দুলারি ছাড়া আর কেউ আছে নাকি! ছট্টু মিঞা মারা যাবার তিন দিনের মধ্যে দুপুরের নিরিবিলিতে ছোঁক ছোঁক করে যখন গিয়ে হাজির হলাম, দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল, তারপর বলল, কালকেউটের ঝুপড়িটা এনে খুলে দেব? দুদিন বাদে আবার গিয়ে হাজির হতে বলল, একটা চেলা

কাঠ ঠিক করি আগে, তারপর এসো।

বাপী উৎসুক।—তারপর?

—আমিও সেই ছেলে। পরদিন দুটো লোকের মাথায় দেড়-দেড় তিন মণ চেলা কাঠ এনে ওর উঠোনে ফেললাম। আর গ্যাঁট হয়ে ওদের দাওয়ায় বসলাম। আবুর প্রাণখোলা হাসি।—দুলারির তখনকার মুখখানা যদি দেখতে!

আবুর এখন সবদিক থেকে সুদিন আর সুখের দিন চলছে বোঝা গেল। বাপী পর পর দুটো রাম-ধাক্কা খাওয়ার কথা বলেছিল মনে পড়তে জিজ্ঞেস করল একটা ধাক্কা তো দুলারি, আর একটা কি?

—তোমাকে না পেয়ে নিজের ঘরে গেছলাম। সেখান থেকে নেপালী মহিলার তাড়া খেয়ে বেরুতে হয়েছে।

—এই রে! তোমার ঘরবাড়ি তো বেদখল। চার-পাঁচ মাস আগেও যদি একটা খবর পেতাম তাহলে ছাড়ি? তোমার খোঁজে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত গেছলাম—

বাপী শংকিত।—বেচে দিয়েছ নাকি?

আবু এটুকুতেই আহত।—আমি যেমন লোকই হই, তোমার সঙ্গে বেইমানি করব বাপী-ভাই? আমাকে জিম্মাদার করে গেছ আর আমিই খেয়ে নেব?

বাপীর তাড়াতাড়ি সামাল দেবার চেষ্টা।—খেয়ে নেবার কথা বলিনি, সুবিধে পেলে বেচে দেবার কথা তো আমি লিখেই দিয়ে গেছলাম তোমাকে।...তাহলে কি ভাড়া দিয়েছ?

—ভাড়াই বলতে পারো, তবে তার মধ্যেও প্যাঁচ-ঘোঁচ আছে। মওকা পেয়ে আমি তোমার ভালোই করতে গেছলাম, বাড়ির চেহারাখানা কেমন হয়েছে ভালো করে দেখেছ?

বাপী মাথা নাড়ল। দেখেছে।

—গেল মাসে আবার ইলেকট্রিক লাইটও আনা হয়েছে। ও তল্লাটে এখন কেবল তোমার বাড়িতেই বিজলির আলো জ্বলে—অনেক খরচা করে চা-বাগানের কোয়ার্টারস থেকে লাইন টানা হয়েছে—তা কে তাড়া করল, নেপালী মেমসাহেব...মানে গায়ত্রী রাই নিশ্চয়?

—নাম কি করে জানব, যার বয়েস বেশি।

—হ্যাঁ, গায়ত্রী রাই। তার মেয়ে ঊর্মিলা রাই। মেয়েকে দেখেছ?

—হুঁ।

একটা চোখ সামান্য ছোট করে আবু হাসল একটু।—বেশ খাসা, না!

আগের দিনের মতো চটুল প্রসঙ্গ বাপীর ভালো লাগল না। তার বুকের তলার ক্ষত আবু জানে না। তাছাড়া স্বাস্থ্য ভালো আর রং ফর্সা হলে বয়েসকালের সব নেপালী মেয়েরাই মোটামুটি সুশ্রী। যে তপ্ত নিঃশ্বাস মুচড়ে বেরিয়ে আসছে সেটা গোপন করার তাগিদ।...ওই মেয়েকে খাসা বলছে, মিষ্টিকে দেখলে কি বলত?

হাল্কা সুরেই জবাব দিল, মায়ের তাড়া খেয়ে আর অত দেখা হয় নি।

আবুর এতেও হাসি।—দেখতে গেলে আরও বেশি তাড়া খেতে—মা'টি জাঁদরেল মেয়েমানুষ। সব বলব'খন—তা তোমার সঙ্গে তার কি কথা হয়েছে?

এ প্রসঙ্গও সংক্ষেপে সারল বাপী। তারপর বলল, এখানে থেকে যাব বলেই

এসেছিলাম, যা হোক কিছু করে চালিয়ে নিতাম—তাও হবার নয় দেখছি।

আবু প্রায় আগের মতোই তিরিক্ষি।—আমি থাকতে তোমার এখানে থাকার জায়গার অভাব হবে? চলে যেতে হবে? তুমি কিছু ভেবো না, সব আমার ওপর ছেড়ে দাও। এই আবু রব্বানী এখন খোদার দয়ায় অনেক কিছু পারে—বুঝলে?

বোঝা যায় কি যায় না এমন একটু শ্লেষ মাখিয়ে বাপী বলল, এখানে পা দিয়েই শুনেছি তুমি এখন একজন মস্ত লোক এখানকার—

—কোন শালা—। বেফাঁস শব্দটা মুখ দিয়ে বার করেই জিভ কাটল আবু রব্বানী —তুমি এখন অনেক পাশটাশ করা ভদ্রলোক মনে থাকে না, আমি শালা সেই জংলিই আছি—

বাপী বলল, জংলিই ভালো, মনে রাখার দরকার নেই।

আবুর হৃষ্ট মুখ।—আসলে কি জানো বাপীভাই, দাপটে না চললে সকলে ঘাড়ে পা দিতে চায়, তা বলে তুমি মস্ত লোক বলবে?

—আচ্ছা বলব না। কিন্তু আমাকে থাকতে দেবে কোথায়, নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলবে?

নিরীহ মুখে আবু ফিরে জিজ্ঞাসা করল, তুললে অসুবিধে হবে?

—তা হয় না—।

আবু হেসে উঠল।—আমি মস্ত লোক হয়েছি, না তুমি ভদ্দর লোক হয়ে গেছ বোঝো তাহলে। কিছু ভেবো না, তোমাকে আমি জঙ্গলের ঘরে রাখব না। উঠে দাঁড়াল।—কিন্তু আমার ঘরে গিয়ে কিছু মুখে দিতে আপত্তি নেই তো?

বাপীও উঠে পড়ল। মনের অবস্থা আবুর বোঝার কথা নয়। জঙ্গলের ঘরে কেন, একেবারে গহন জঙ্গলে সেঁধিয়ে যাবার মতোই ভিতরের তাড়না। একা থাকতে চায়। নিরিবিলিতে থাকতে চায় দিন-কতক। গুলি-বিদ্ধ বাঘও হিংস্র আক্রোশে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, তারপর ক্ষত শুকোনোর তাড়নায় নিরিবিলি আড়াল খোঁজে। সামনে দিয়ে তখন হরিণ নেচে গেলেও মুখ ফিরিয়ে থাকে।

—চলো। খিদের চোটে অন্ধকার দেখছি।

যত খুশিই হোক, আবুর কাজে গাফিলতি নেই। নতুন চারা-বেডটার দিকে এগিয়ে গেল। একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে লোক ক'টাকে বলল, রাতে এরপর দুজন করে পাহারা দিতে হবে মনে থাকে যেন, নইলে বেজিতে শেষ করে দেবে।

যেতে যেতে বাপী বলল, বড়সাহেবের স্পেশাল অর্ডারের চন্দ্রা না কিসের বেড বললে ওটা, জঙ্গলে ফুলের চাষ-টাষও হচ্ছে নাকি আজকাল?

আবু মিটি মিটি হাসতে লাগল। দুদিন সবুর করো, সব জানবে। চন্দ্রা কোনো বাহারী ফুল নয়, ওর আর একনাম সর্পগন্ধা—অ্যালোপ্যাথি কবরেজি হোমিওপ্যাথি এই তিনেতেই এর দারুণ কদর। এছাড়া হাতুড়েরাও পাগলদাওয়াই বানাবার জন্যে এর ফুল ফল পাতা শেকড়বাকড় সব কেনে।

সর্পগন্ধা নাম বাপীরও জানা। কিন্তু বীটম্যান আবুর এত-সব জানার কারণ কি, আর ওর মুখেই বা এরকম হাসি কেন? জিজ্ঞেস করল, বড়সাহেবের হুকুমে জঙ্গলে ওষুধের গাছ-গাছড়াও চাষ হচ্ছে এখন?

—হচ্ছে না, আমি হওয়াচ্ছি। আর একটু কায়দা করে বড়সাহেবের হুকুমটা আদায় করে নিতে হচ্ছে। খুশিতে টইটুম্বুর মুখ আবুর।—বললাম তো, ক'টা দিন সবুর করো, সব জানবে সব শুনবে। তুমি এখানেই থেকে যাবে শুনে আমার বুকের ছাতি ডবল হয়ে গেছে—তুমি যা-হোক কিছু করে চালিয়ে নেবার কথা বলছিলে—এখানে পয়সার ছড়াছড়ি, বুঝলে দোস্ত—শুধু মাথা খাটিয়ে তুলে নিতে জানলেই হয়।

আবু রব্বানী মাথা খাটাচ্ছে আর পয়সাও তুলছে এটুকু বোঝা গেল। সেটা যে চাকরির পয়সা নয়, বাড়তি কিছু, তাও স্পষ্ট।

আরো একটু এগিয়ে বাপী দাঁড়িয়ে গেল।—বাক্স-বিছানা এদিকে রেখে এসেছি, নিয়ে নিলে হত।

—কোথায় রেখেছ?

বাপী ইচ্ছে করেই লছমনের নাম করল না। হেসে বলল, বনমায়ার জিম্মায়।

—বনমায়া! আমাদের বনমায়া?

সায় দিয়ে বাপী বলল, এখানে এসেই তো সবার আগে ওর সঙ্গে দেখা করলাম।

—তোমাকে চিনল?

—খুব। শুঁড় উঁচিয়ে আগের মতো সেলাম বাজালো, শুঁড় পেঁচিয়ে আদর করল।

শুনে আবুও খুশি। বলল, এক ভীমবাহাদুর ছাড়া বনমায়ার কদর এখানে কেউ বুঝলই না। ভেবে নিল কি একটু।—বাক্স-বিছানা ওখানেই থাক এখন...আপাতত ওদিকেই তোমার থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। লছমন দেখে রেখেছে তো?

সায় পেয়ে ঘরের দিকেই চলল আবার। আবু বলল, ভীমবাহাদুর নেই, বনমায়ার মেজাজেরও ঠিক নেই; তবে ফি বছর মরদের সঙ্গে পালানোটা ঠিক আছে!

—বনমায়াকে ছেড়ে ভীমবাহাদুর পালালো কেন?

শুনল কেন। না পালালে ভীমবাহাদুরকে জেলে পচতে হত। এখনো ওর নামে হুলিয়া বহাল আছে। ভালবাসার মেয়েকে ঘরে আনার আধা-আধি টাকার যোগাড় হয়ে গেছল। সেই টাকা জমানোর নেশায় ভীমবাহাদুর ভালো খেত না পর্যন্ত। চা-বাগানের এক উঠতি বয়সের দাপটের বাবু ওই পাহাড়ী মেয়েকে ছলাকলায় ভুলিয়ে নিজের বাংলোয় নিয়ে এসেছিল। তারপর যা, তাই। মেয়েটা বাবুর গায়ে দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল বলে সে তাকে চাবুক দিয়ে মেরেছে পর্যন্ত। আর দরজায় পাহারা মোতায়েন রেখেছে। মাঝরাতে ভীমবাহাদুর বাংলোয় ঢুকে তার বুকে ছুরি বসিয়েছে। আধ ঘুমন্ত পাহারা-অলা ওর সেই মূর্তি দেখে পালিয়ে গেল। বাবুটি তখন নেশা করে ঘুমোচ্ছিল। সে ঘুম আর তার ভাঙেনি। সেই রাতেই ভীমবাহাদুর তার ভালবাসার মেয়েকে নিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে।

বাপী মুখ বুজে চলেছে। কিন্তু ভিতরে নাড়াচাড়া পড়ল একপ্রস্থ। দক্ষিণ কলকাতার কোনো এলাকার আতাশি নম্বর বাড়ির উল্টো দিকের দোতলা বারান্দার সোনালি চশমা রাঙামুখো একজনের কলজে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেবার সুযোগ পেলে তার নিজের হাত একটুও কাঁপত কি? নাকি রাতের অন্ধকারে খুপরি ঘরে ঢুকে রতন বণিক তার বউ কমলা বণিকের আর বাপী নামে এক বেইমানের বুকে ওমনি ছুরি বসিয়ে গেলে খুব অন্যায় হত?

কথায় কথায় আরো কিছু খবর জানালো আবু রব্বানী।...ওর বাবা কালু তিন বছর আগে মারা গেছে। শেষের দিকে ছেলের ওপরেও তার অভিমান, যেন ওকে হটিয়ে ছেলে তার জায়গাটা জুড়ে বসেছে। অথচ শেষ সময় পর্যন্ত আবু তাকে নেশার জিনিস যুগিয়ে এসেছে—শহর থেকে সেরা জিনিস এনেও খাইয়েছে। আর গেল বছর রেশমার মরদ কাঁদনা মাটি নিয়েছে। ওর আর পেট বলে কিছু ছিল না, হেজে পচে গেছল। ও মরে বেঁচেছে, রেশমারও নিষ্কৃতি।

বাপী জিগ্যেস করল, রেশমা একাই সাপ খেলা দেখাচ্ছে এখন?

—ছোঃ! তার থেকে ঢের ঝাঁঝের খেলা দেখাচ্ছে। আবু হাসতে লাগল, রেশমা আর সে রেশমা নেই, বুঝলে? এখন বুকের পাটা কত, বিষাক্ত সাপগুলোর খপাখপ টুঁটি টিপে ধরা দেখলে তোমার তাক লেগে যাবে।

বাপী ভেবে নিল সাপ ধরে রেশমা এখন অন্য সাপুড়েদের কাছে বেচে দেয়। আবুর কথায় আর হাব-ভাবে কিছু রসের ছোঁয়া থাকলেও বাপী আর কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ চলতে লাগল। রস চুলোয় যাক।

আবু হঠাৎ উৎসুক চোখে ঘাড় বেঁকিয়ে ওকে দেখে নিল।—আগে তোমার কথা শুনি বাপীভাই, অ্যাদ্দিন ছিলে কোথায়?

—কলকাতায়।

—চাকরির চেষ্টায়?

—মাস কয়েক যুদ্ধের আপিসে টেম্পোরারি চাকরি করেছি।

—তারপর বেকার বসে ছিলে?

বাপী মাথা নাড়ল। তাই। এ নিয়েও কথা বাড়াতে চায় না। কিন্তু আবু খুশিতে ডগমগ। —খোদার খেল দেখো, তার মরজি না হলে টান পড়ে না—এখানে কাজই উল্টে তোমার জন্যে হাঁ করে আছে! আমি কতদিন তোমার কথা ভেবেছি, দুলারিকেও বলেছি, এ-সময় বাপীভাই এখানে থাকলে জমত ভালো—নেপালী মেমসাহেবকে ওই বাড়িটা দেবার সময় তোমার কথা তো খুব হত—

আবু রব্বানী এ ক'বছরে আরো কত চতুর হয়েছে বাপীর ধারণা নেই। বাড়িটা হাতছাড়া হয়েছে বলে এমন আশার কথা শোনাচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। বাপী ভিতরে উৎসুক একটু, বাইরে প্রায় নির্লিপ্ত।—কি কাজ, চাকরি-টাকরি?

—চাকরি করলে চাকরি, নয়তো চুক্তিতে রফা হলে চুক্তি—ধৈর্য ধরে সব দেখেশুনে যা তুমি ভালো বুঝবে। বললাম না পয়সার ছড়াছড়ি এখানে। মাথা খাটাও, দিল লাগাও আর কড়ি তোলো। তোমার মতো ভদ্দরলোকের চামড়া গায়ে থাকলে আর বিদ্যের জোর থাকলে এই আবু রব্বানীকে আজ দেখতে হত! নেপালী মেমসাহেবের ওই প্যাঁচামুখো লাটসাহেবকেই লাট খাইয়ে দিতাম না!

এও দুর্বোধ্য। তবে নেপালী মেমসাহেব যে ওর স্বার্থের কোনো বিশেষ জায়গা জুড়ে আছে, এটুকু স্পষ্ট।

আবু আর একবার ঘাড় ফেরালো, তারপর বলল, তুমি একটু বদলে গেছ বাপীভাই...

—কেন?

—আগে আমার সব ব্যাপারে তোমার কত আগ্রহ ছিল, উৎসাহ ছিল—প্রায় ছ'বছর

বাদে দেখা, আর তুমি যেন আমার কাছ থেকে ছ'হাত দূরে দূরে হাঁটছ।

আবু চালাক বলেই একটু ঘুরিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করল। নইলে সাদাসাপটা বলে বসত, আগে তো আমার চেলাটি ছিলে, আমাকে গুরু ঠাওরাতে। এখন সেরকম দেখছি না। বাপী হাসল একটু, জবাব দিল, আধ-হাত দূর দিয়েও তো হাঁটছি না!

হঠাৎ আগের মতোই সন্ধানী চাউনি আবুর। কথার ধরনও তেমনি চাঁছাছোলা— সাহেব বাংলোর তোমার সেই মহারাণীর মেয়ের খবর কি, আর দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে?

আবুর সঙ্গে দেখা হলে এ-কথা উঠবে জানত। আর যতটা সম্ভব নির্লিপ্ত মুখে এ-প্রসঙ্গ ধামা-চাপা দেবার চেষ্টাই করবে ভেবে রেখেছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে আবুকে আগের মতো সেই কাছের মানুষ মনে হতে বুকের তলায় মোচড় পড়ল। জবাব না দিয়ে একবার তাকালো শুধু।

আবু লক্ষ্য করছে। উৎসুকও।—দেখা হয়েছে তাহলে! কেমন এখন? বহুত খুবসুরৎ?

—ভালোই।

খপ করে শিকার ধরে তোলার মতো চকচক করছে আবুর দু চোখ।—কত দিন আগে দেখা হয়েছে?

বাপী কি হঠাৎ জোর গলায় ওকে ধমক লাগাবে একটা? পারা গেল না। বিড়-বিড় করে বলল, বেশি দিন নয়।

যন্ত্রণার আঁচ আবু কতটা টের পেল সে-ই জানে। সব ঝেড়ে ফেলার মতো করে বলল, গুলী করে মেরে দাও বাপীভাই, আমি তো সেই কবেই বলে রেখেছিলাম ও-মেয়ে বেশি দিন বাপ মায়ের সিন্দুকে বসে থাকবে না। যেতে দাও—নিজের দুটো পায়ের ওপর শক্ত করে দাঁড়ালে অমন কত হুরী-পরী এসে গড়াগড়ি খাবে!

বাপী সন্তর্পণে বড় নিঃশ্বাস ফেলল একটা। আবু ধরে নিয়েছে মিষ্টি অন্যের হেপাজতে চলেই গেছে আর সেই মনস্তাপেই কলকাতা ছেড়ে ও আজ বানারজুলিতে। একেবারে সত্যি না হলেও কত আর ভুল...।

ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আবুর আর এক মূর্তি। ঘরে ঢুকল না তো একখানা দুরন্ত খুশির ঢেউ আছড়ে পড়ল যেন। হাতের লাঠি একদিকে ছুঁড়ে ফেলল। সাড়ে তিন বছরের ছেলেটা ছুটে এসে, তার সাধ্যমতো একটা লাফ দিয়ে দু-হাতে বাপের কোমর জড়িয়ে ধরে ঝুলতে লাগল। ওদিকে দুলারির কোলের আট-ন' মাসের ছেলেটাও দু-হাত তুলে বাপের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ব্যগ্র। হাত বাড়িয়ে আবু আগে ওকে নিয়ে লোফালুফি খেলল খানিক। ছেলেটার ভয়ডর নেই, খিক-খিক হাসি। তারপর একটু দূর থেকেই ওটাকে মায়ের কোলে ছুঁড়ে দিয়ে আবু বড়টার সঙ্গে ছোটাছুটি আর মেকি মারামারি ঘুষোঘুষি শুরু করে দিল। বাপীকে বলল, কালে দিনে এ দুটো আমার থেকেও কড়া অ্যালসেসিয়ান হয়ে উঠবে দেখে নিও—

ছেলেটাকে উসকে দেবার জন্য আবু একটু জোরেই ঘা বসাচ্ছে এক একবার আর ওটা দ্বিগুণ গোঁ-ভরে বাপের ওপর চড়াও হচ্ছে। দুলারির তামাটে মুখ প্রসন্ন, কিন্তু ধমকেই উঠল, আঃ থামবে। বাপীভাই যে কাণ্ড দেখে হাঁ হয়ে গেল!

মায়ের ধমকেই ছেলের দৌরাত্ম্য থামল। কি মনে পড়তে আবুর হাসিমুখ বিপরীত

গাম্ভীর্যে ঘোরালো করে তোলার চেষ্টা। গলায় কপট শ্লেষ মিশিয়ে বলল, রেশমার বদলে তোমাকে আমার ঘরে দেখে বাপীভাই তার থেকে ঢের বেশি হাঁ হয়েছে—বুঝলে? আমি রেশমার জন্য পাগলা হয়ে গেছলাম দেখে গেছে আর আজ ঘরে এসে দেখে বিবি বদল।

দুলারি হাসছে না ঠিক, তামাটে মুখে হাসির আভা ছড়াচ্ছে। বলল, বাপীভাইয়ের তখন চোখ কানা ছিল বোধ হয়।

আবু হা-হা শব্দে হেসে উঠল। হাসছে বাপীও। আর মনে মনে সায় দিচ্ছে, কানা যে ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আবু বলল, দুজনেরই খিদে পেয়ে গেছে, কি আছে জলদি দাও—বাপীভাইকে নিয়ে এরপর আবার নেপালী মেমসাহেবের কাছে যেতে হবে।

সুপটু গৃহিণীর মতো পাঁচ মিনিটের মধ্যে একরাশ জলখাবার নিয়ে দুলারি হাজির। বাপী আসবে ধরেই নিয়েছিল বোধ হয়। খুশি মুখে আবু টিপ্পনী কাটল, এত সব আজ তোমার খাতিরে, আমার অত জোটে না।

দুলারিরও সমান জবাব।—বেইমানি কথা শুনলে জিভে গরম ছেঁকা লাগাব।

আবু সঙ্গে সঙ্গে চোখ পাকালো।—আমার জিভে ছেঁকা লাগালে আখেরে কে পস্তাবে?

সাপুড়ে মেয়ের তামাটে মুখে শরমের রং। কটাক্ষের চাবুক হেনে চটপট সরে গেল। আবু হাসতে লাগল।

বাপী সুখের ঘর দেখছে।

জলখাবারের পাট শেষ হতে আবু আয়েস করে বিড়ি ধরালো একটা। বাপীকে বলল, সিগারেটও আছে—চলে?

বাপী মাথা নাড়ল, চলে না। নিজের বাড়ির খবর জানার তাগিদ। জিগ্যেস করল, নেপালী মেমসাহেবের কাছে যাবে এখন?

—যাব'খন। হাসল।—ওই ঠাকরোনটির কাছে যেতে হলে এমনিতেই বেশ করে দম নিয়ে যেতে হয়—তার ওপর আজ বাড়ির মালিককে দেখে ক্ষেপেই আছে কিনা কে জানে।

—কেন?

—কেন আর, নতুন ঘর তুলে তোমার বাড়ির ও-রকম ভোল পাল্টাতে এককাঁড়ি টাকা খরচ হয়েছে—আমাকে হিসেব দেবে বলছিল।...লাইট-ফাইট জল-কলসুদ্ধু কম করে পাঁচ হাজার হবে—সে বাজার কি আর আছে!

বাপীর দু'কান খাড়া। বাড়ির দায় ওর ওপরেই ছেড়ে দিয়ে গেছল। ভাড়া আর বিক্রীর দুটো পরোয়ানা ওকেই লিখে দিয়েছিল। বেচে যে দেয় নি সেটা আবু আগেই বলেছে। আবার ভাড়া নিয়েও কি প্যাঁচ-ঘোঁচের ব্যাপার আছে বলছিল। কি শর্তে নেপালী মেমসাহেব ওই বাড়ির পিছনে অত টাকা ঢেলেছে আবু এখন পর্যন্ত সেটাই বলে নি।

সে বাড়ির মালিক শুনে মহিলা থমকেছিল বেশ, বাপীর মনে আছে। জিজ্ঞেস করল, তা আমাকে দেখে ক্ষেপবে কেন?

হাতের বিড়িটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলল আবু রব্বানী।—মেমসাহেব জানে বাড়ির মালিক

বে-পাত্তা! কোন দিন ফিরবে কি ফিরবে না তারও ঠিক নেই। আর জানে, আমি বাড়ির জিম্মাদার, আমি সব্বে-সর্বা—তাই নিশ্চিন্ত মনে ঘর তুলেছে আর বাড়ি সাজিয়েছে—আমার সঙ্গে এখন পর্যন্ত সইসাবুদটা পর্যন্ত হয়নি, এরমধ্যে খোদ মালিক হাজির দেখলে কি আহ্লাদে আটখানা হবে?

বাপী ভিতরে ভিতরে স্বস্তি বোধ করল একটু।—বাড়ির ব্যাপারে এত সব তোমার পারমিশন নিয়ে করা হয়েছে?

—হুঁঃ, সেই মেয়ে! পারমিশন-টারমিশনের ধার ধারে না, তাঁর মর্জি-মাফিক কাজ—ম্যানেজারকে দিয়ে তোমার বাড়ির খোল-নলচে পাল্টানোর পর চুক্তির কথা তুলেছে—আমি মওকা পেয়ে চুপ মেরে ছিলাম—

—নেপালী মেমসাহেবের আবার ম্যানেজারও আছে নাকি?

—নেই আবার—হেঁজিপেঁজি মেয়েমানুষ নাকি! সে শালাই তো তার প্যাঁচামুখো লাটসায়েব।

জঙ্গল ভেঙে ঘরে ফেরার পথে আবু বলেছিল বটে, বিদ্যেবুদ্ধির জোর থাকলে নেপালী মেমসাহেবের কোন প্যাঁচামুখো লাটসায়েবকে লাট খাইয়ে দিত।

বাড়ি আর চুক্তির ব্যাপারটা বাপী আব একটু বিশদ করে শুনে নিল। গায়ত্রী রাই পাশের জমিসুদ্ধু বাড়িটা কিনে নিতে চেয়েছিল। যুদ্ধের পর জায়গা-জমির দাম এ-দিকেও হু-হু করে বাড়ছে দেখে আবু রাজি হয় নি। তাছাড়া দোস্তের পৈতৃক ভিটের ওপর তারও কম মায়া নয়। গরজের দায়ে গায়ত্রী রাই চড়া দামের লোভ দেখিয়ে চাপাচাপি করছিল। মিনমিন করে আবু তখন একটা মিথ্যে কথাই বলেছে। ও বাড়ির জিম্মাদার ইচ্ছে করলে ভাড়া দিতে পারে, বেচতে-টেচতে পারে না।

গায়ত্রী রাইয়ের দাপটের ম্যানেজারের নাম রণজিৎ চালিহা। আসামের মানুষ। ধরাকে সরা ভাবে। বাড়ির মালিক পাঁচ বছর যাবৎ নিখোঁজ, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে ওটা জবরদখলের মতলব দিয়েছিল মেমসাযেবকে। বলেছিল, সব নিজের ভেবে তুমি যা-খুশি করে নাও, কেউ দাবি ফলাতে এলে আমি আছি। কিন্তু গায়ত্রী রাই যত জাঁদরেল মেয়েমানুষই হোক, অমন কাঁচা ঠকবাজি পছন্দ করে না। তাছাড়া বেগতিক দেখে মেমসায়েবের কাছে আবু বাপীর মরা বাপকে এই জঙ্গলের অফিসার বানিয়ে দিয়েছিল। বলেছে, এখানকার সরকারী ছোট অফিসার ছিলেন ভদ্রলোক—আর মস্ত ধার্মিক মানুষ ছিলেন, সক্কলে তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা কবত। তাঁর ছেলের সঙ্গে এ-রকম করাটা ঠিক হবে না, তাছাড়া বাড়ির দলিলপত্র মালিকের কাছে আছে—নিখোঁজ হলেও সে সব তো আর হাতছাড়া হয় নি।

গায়ত্রী রাই হাঁ-না কিছুই বলেনি। কারো উপদেশ বরদাস্ত করার মেয়ে নয়। আবুকে ধমকে যে ওঠেনি তাতেই বোঝা গেছে বড়দরের অন্যায় কিছু করবে না। বাড়ির ভোল বদলানোর পর আবুর ডাক পড়েছে; গায়ত্রী রাই জানিয়েছে সব ঠিক-ঠাক করে নিতে পাঁচ হাজার টাকার মতো খরচ পড়েছে। হিসেব তার ম্যানেজারের কাছে আছে। এ-টাকাটা ভাড়ার টাকা থেকে কাটান যাবে—সব শোধ হলে তবে মাসের ভাড়া হাতে আসবে।

এই মওকা ছাড়ার পাত্র কি আবু রব্বানী? ভিজে বেড়ালের মতো মুখ করে ভাড়ার ফয়সলায় নেমেছে। শুধু বসতবাড়ি তো নয়, বাড়তি ঘরখানা তোলা হয়েছে ব্যবসার

কাজে লাগানোর জন্য। তাছাড়া যুদ্ধের সময় থেকে এই বানারজুলিতেও সেলামীর ভূত নেমেছে—ইজেরাদার ঠিকেদারদের কল্যাণে এখন একখানা ঘর পেতে হলে আগে নজরানা গুনে দিতে হয়। আবুর বরাত ভালো ম্যানেজার তখন ট্যুরে। গায়ত্রী রাইয়ের পায়ের কাছে বসে অনেক কথা নিবেদনের সুযোগ পেয়ে গেছল। যেমন বাড়ির মালিক বাপী তরফদার তার প্রাণের দোস্ত—আর তার বাপের দয়াতে ওর এখানকার জঙ্গলের চাকরি, সেই দোস্ত ফিরে এসে যদি ওকে বেইমান ভাবে তাহলে খোদার বজ্র ওর মাথায় নেমে আসবে। তাই বাড়ির ব্যাপারে আবুর মুখ না চেয়ে হকের ফয়সালাই করতে হবে—কারণ পাঁচ হাজার ভাড়া থেকে কাটানো গেলে এখন যা হয়েছে তার সবটাই তো বাড়ির মালিকের। তাই পাঁচ হাজার থেকে প্রথমেই হাজার টাকা সেলামী বাবদ কাটান যাবে। আর একশ টাকার নিচে এই দিনে এরকম বাড়ির ভাড়া তো হতেই পারে না।

কলে পড়লে নেপালী মেমসাহেবের দরাজ হাত। এ নিয়ে খুব একটা ঝকাঝকি করেনি। সেও আবু রব্বানীকে সেয়ানা জানে কিন্তু বেইমান ভাবে না। ভাববেই বা কেন, আবু তাকে বলেছে, সেলামী বাদ দিয়ে বাকি চার হাজার টাকা থেকে একশ টাকা করে কাটান দেবার চুক্তি সে-ই করবে—তত-দিনে বাড়ির মালিকের দেখা নিশ্চয় মিলবে, আর না যদি মেলে তো মেমসায়েব যেন তার পরের টাকা বানারহাটের সরকারী দপ্তরে বাড়ির মালিকের নামে চেকে জমা করে দেন। ও তো আর হাত পেতে একটি পয়সাও নিচ্ছে না।

হাজার টাকা সেলামী আর একশ টাকা ভাড়া শুনে ম্যানেজার রণজিৎ চালিহা নাকি আবুকে ধরে এই মারে তো সেই মারে। কিন্তু গায়ত্রী রাইয়ের জবান খসলে পাকা ব্যাপার। তার কথামতো কাগজপত্র তৈরি। কিন্তু হচ্ছে হবে করে এই চার মাসেও সইবাবুদের ফুরসৎ মেলেনি। ম্যানেজার মাসের অর্ধেক সময় বাইরে বাইরে ঘোরে, নেপালী মেমসায়েবও হুট হুট করে তার পাহাড়ের বাড়িতে চলে যায়। আর দুজনেই যখন এখানে তখন এত কাজের চাপ আর এত রকমের প্ল্যান-প্রোগ্রাম হিসেব-নিকেশ যে এই সামান্য ব্যাপারটা হয়তো মনেই থাকে না।

এবারে তিন নম্বর বিড়িটা আবু বাইরে ছুঁড়ে ফেলে হিসেব দাখিল করল, খরচের মোট পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে হাজার টাকা সেলামী বাদ দিলে থাকল চার হাজার। তার থেকে গত চার মাসের চারশ টাকা ভাড়া আর তার আগের চার মাসে পঞ্চাশ টাকা করে ধরে মোট ছ'শ টাকা তোমার শোধ হয়েই গেছে। হেসে উঠল, হাঁ হয়ে গেলে যে—মওকা পেয়ে আবু রব্বানী দোস্তের ভালো করেছে কি খারাপ করেছে?

বাড়ির ব্যাপারে বাপী অন্যরকম ভাবছিল বলে নিজেরই খারাপ লাগছে। বলল, এর থেকে ভালো আর কি হতে পারে—

আবু এতেই খুশি। দুনিয়ার অনেকখানি হাতের মুঠোয় এমন সুরে বলে উঠল, ভালোর এখনো ঢের বাকি, সবে এলে, এখন তোমার আমার দু মাথা এক হলে কি যে হবে দেখো!

ওকে পেয়ে আবুর মাথায় কিছু মতলব গজিয়েছে আগেই সেটা বোঝা গেছে। ঘরে আসার পথে ওর মুখে ফূর্তি উপচে পড়ছিল, কলকাতায় বাপী বেকার বসেছিল শুনে বলেছিল, খোদার মর্জি না হলে টান পড়বে না—এখানে কাজই উল্টে তার জন্যে হাঁ করে আছে। দুলারিকেও নাকি কত সময় বলেছে, এ-সময় বাপীভাই এখানে থাকলে

জমত ভালো।...আর বলছিল, পয়সার ছড়াছড়ি এখন এখানে—মাথা খাটাও, দিল্ লাগাও আর কড়ি তোলো। ওকে পেয়ে আবুর মাথা খাটানো দিল্ লাগানোর জোর আর কড়ি তোলার আশা অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু এ-দিকটা বাপীর কাছে দুর্বোধ্য এখনো।

আবু রব্বানীর জিভের লাগাম আরো ঢিলে এরপর। খুশি-ঝরা দুচোখ বাপীর মুখের ওপর। দেখছে কিছু। তরল গলায় বলল, তোমার মুখখানা এখন আগের থেকে ঢের মিষ্টি লাগছে বাপীভাই—দেখলেই মনে হয় ভেতর-বার সাফ—নেপালী মেমসাহেবের ঠিক পছন্দ হয়ে যাবে।

শোনার পর কান খাড়া, বাপী হাল্কা সুরে ইন্ধন যোগালো, কেন—মেয়ের জন্য পাত্রটাত্র খুঁজছে!

রসের কথায় আবু আর চাঁচাছোলা মানুষ নয় আগের মতো। হেসে উঠে জবাব দিল, মেয়ের জন্য কেন, নিজের জন্যেই খুঁজছে—ঠাকরোন বিধবা জানো তো?

নেপালিনীদের কী দেখে সধবা বিধবা বোঝা যেতে পারে বাপীর ধারণা নেই। পাত্র খোঁজার রহস্যটা আবু আর একটু বিস্তার করল। নিজের কাজের জন্যেই খুব একজন বিশ্বাসী আর লেখাপড়া জানা চৌকস লোক খুঁজছে নাকি গায়ত্রী রাই। ম্যানেজারের অনুপস্থিতিতে চা-বাগান থেকে দুবার দুটো ভদ্রলোক ছেলেকে এনে কাজে বহাল করেছিল। দুজনেই তারা চা-বাগানের কেরানী। চা-বাগানের কর্তাব্যক্তিরা গায়ত্রী রাইকে চোখে বড় দেখে না কিন্তু মানে-গনে খুব। দরকার শুনে তারাই দুবার দুজনকে লম্বা ছুটি দিয়ে আর বেশি টাকার লোভ দেখিয়ে মহিলার যাচাইয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু একজনও টিকে যেতে পারে নি। গায়ত্রী রাই দুজনকেই ছেঁটে দিয়ে চা-বাগানে ফেরত পাঠিয়েছে। আবুর মতে ওই দুজনের একজন অন্তত বেশ শিক্ষিত আর চালাকচতুর, আবু ধরে নিয়েছিল সেই লোকটা টিঁকেই যাবে। রসের ছোঁয়া পেলে আবুর এক চোখ এখনো একটু ছোট হয়ে যায়। মুচকি হেসে বলল, আমার ধারণা ওই লোকটার ঘাড়ে ঠাকরোনের খাঁড়া নেমেছে অন্য কারণে, নইলে কাজকর্ম ভালই করছিল, আর পরে ম্যানেজারও তাকে ভালো চোখেই দেখছিল।

মুখ দেখে বোঝা না গেলেও রস-টস কানে নেবার মন নয় বাপীর। সাদাসিধে ভাবেই জিগ্যেস করল, আমার মুখ দেখে আর ভেতর-বার সাফ ভেবে তোমার নেপালী মেমসায়েব এখন আমাকে সে জায়গায় নিয়ে নেবে ভাবছ?

—নিশ্চয় নেবে। আবুর গলার জোর বাড়ল।—একে তোমার বাড়ির সে ভাড়াটে, তার ওপর ওই বাড়ির ব্যাপারেই তোমার সম্পর্কে আমি একরাশ গুণ গেয়ে রেখেছি না! যেমন লোকই হই, ঠাকরোন আমাকে দারুণ বিশ্বাস করে—লেখাপড়া জানা একজন ভালো অথচ চালাক-চতুর মানুষ তার খুব দরকার এ কথা নিজে আমাকে বলেছে। চাকরি না পোষায় চুক্তিতে কাজ করতে পারো, তবে ঘাটঘাট সব বুঝে নিয়ে মেমসাহেবের গলায় দাঁত বসাতে হলে চাকরিতে লেগে যাওয়াই ভালো। হেসে উঠল, ভেবো না, দাঁত বসানোর মওকা আমিই করে দেব—

বাপীর চোখে বা মুখে উৎসাহের চিহ্ন নেই। ওর মিষ্টি মুখের ছলনার ওপর আবু কিছুটা নির্ভর করছে মনে হতে খারাপই লাগল। বলল, আমার ভেতর-বার সাফ ভেবে নেপালী মেমসাহেবের পছন্দ হলে তোমার কি লাভ—ভাঁওতাবাজীর ব্যাপার কিছু?

এবারে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল আবু রব্বানী। মেজাজী পুরুষ!—দেখো বাপীভাই, আমি লোক যেমনই হই আর যা-ই করি নিজেকে খোদার গোলাম ভাবি। তুমি লেখাপড়া জানা ভদ্রলোকের ছেলে, আমার দোস্ত—তোমাকে নোংরামির মধ্যে যেতে বলব কেন, আর তুমিই বা তা বরদাস্ত করবে কেন? তোমাকে মেমসায়েবের সঙ্গে জুড়ে দিতে চাই কেরামতি দেখিয়ে একদিন ওই চালিয়াৎ ম্যানেজারকে টিট করার জন্য, আর আমাদের ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা ঠিক-ঠিক পাইয়ে দেবার জন্য। এরই নাম দাঁত বসানো, নইলে তো ওই আধবয়সী মেয়েমানুষের বদলে তার মেয়েকেই দেখিয়ে দিতাম।

উষ্মার মুখেই হেসে ফেলল আবার।—খবরদার, মেয়ের দিকে তাকিয়েছ কি কেস গড়বড়—এ-ব্যাপারে মা-টি যাকে বলে বাঘিনী। মেয়ের পিছনে ছোঁকছোঁক করতে দেখেই চা-বাগানের সেই চৌকস লোকটিকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়েছিল।

ঘরে বাতাসের অভাব, না বুকে? দুনিয়ায় কি এমন জায়গা নেই যেখানে মেয়ে নেই? বাপী বিড়বিড় করে বলল, মেয়ের কথায় কাজ নেই, মায়ের কথা বলো।

গায়ত্রী রাইয়ের মেজাজ বা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বাপীর মিনিট কয়েকের পরিচয়। একটা উটকো মানুষ অন্দরে ঢুকে পড়েছে ভেবে তার ঝাঁঝ দেখে আর ঝাপটা খেয়ে চলে এসেছিল। ওটুকু দিয়ে মহিলার বিচার সম্ভব নয়। তবু বাপীর মনে হয়েছিল তার রমণীসুলভ কোমলতার দিকটায় কিছু ঘাটতি আছে।

কিন্তু আবুর প্রগলভ বিস্তারের সার থেকে ওই রমণীর যে ছবিটা পেল তেমনটি হাজার গণ্ডা মেয়েছেলের মধ্যে একজনকেও দেখা যাবে কিনা সন্দেহ।

...বানারজুলির এই জঙ্গল ভারত সীমার মধ্যে। কিন্তু জঙ্গলের পরিধি ভুটান পর্যন্ত জুড়ে আছে। ভুটান স্বাধীন। এখান থেকে মাত্র সাত মাইল দুরে সেই স্বাধীন ভুটানের বাসিন্দা গায়ত্রী রাই।

সেখানে একটা ছোট্ট পাহাড়ের মাথায় তার নিজস্ব বাড়ি। বাড়িটা করেছিল তার স্বামী বীরেশ্বর রাই। হিমালয়ের নিচের দিকে অমন ছোট ছোট অজস্র পাহাড় আছে। যারা অবস্থাপন্ন তারা নামমাত্র টাকায় সেই সব পাহাড় ইজারা নিয়ে তার ওপর ঘরবাড়ি তোলে। বীরেশ্বর রাই টাকার মুখ দেখার পরেই পাহাড়ের ওই বাড়ি করেছিল, কিন্তু সেই বাড়ির চেহারা এখন যা দাঁড়িয়েছে তার বারো আনা গায়ত্রী রাইয়ের কৃতিত্ব। সে-এলাকায় অমন বাড়ি এখন খুব বেশি নেই। পাহাড়ের সেই বাড়িতে আবু বার কয়েক গেছে। গায়ত্রী রাইয়ের হুকুমে তার কাজ নিয়েই যেতে হয়েছে। গায়ত্রী রাইয়ের নিজের ভ্যান আছে একটা। স্বামীর আমলে জিপ ছিল। সেই জিপ বেচে দেওয়া হয়েছে। এখন ভ্যানেই যাতায়াত চলে।

আবুর যাতায়াত ভ্যানেই। ভ্যানে পাহাড়ের তলা থেকে উঠে একেবারে পাহাড়ের ডগায় বাংলোর কম্পাউন্ডে পৌঁছে যেতে পারে। তলা থেকে লাল কাঁকরের রাস্তা পাহাড়টাকে পেঁচিয়ে ওপরে উঠে গেছে। গায়ত্রী রাইয়ের স্বামীর আমলে রাস্তাটা ভাল ছিল না। সেই রাস্তার সংস্কারও গায়ত্রী রাই করিয়েছে আর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খোলা দিকে অর্থাৎ পাহাড়ের দেয়ালের উল্টো দিকে তারের বেড়া লাগিয়েছে।

কারণ তিন বছর আগে কিছুটা স্বামীর দোষে আর কিছুটা বা ওই রাস্তার দোষে গায়ত্রী রাইয়ের কপাল ভেঙেছিল। আবু রব্বানীর অবশ্য ধারণা সেই থেকে নেপালী

মেমসাহেবের কপাল খুলে গেছে।

গায়ত্রী রাইয়ের ওই পাহাড়ের ঘরবাড়ি দেখার জন্য একজন লোক আর একটা মালী আছে। আর সেখানে তার পেশার কাজে সাত-আটজন নানা জাতের পাহাড়ী লোক বহাল আছে। এদের সকলের মাথার ওপর যে তার নাম ঝগড়ু। দেশ বিহারে। কিন্তু সেই ছেলেবেলা থেকে এদিকের জঙ্গলে আর পাহাড়ে বাস। তার বউ বুনো হাতির পায়ের তলায় চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে মরেছে। দু-দুটো জোয়ান ছেলের একটাকে সাপে কেটেছে আর একটাকে ভালুকে মেরেছে। কিন্তু আবু সে-জন্যে লোকটার বড় রকমের শোক-পরিতাপ কিছু দেখে নি। কেবল সাপের গলা টিপে বিষ নিঙড়ে বার করার সময় তার চোখ দুটো সাপের থেকেও বেশি জ্বলতে দেখে, আর ভালুক শিকারের গন্ধ পেলে এই বয়সেও যে অস্ত্র সামনে পায় হাতে নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসে। এই বয়সে বলতে লোকটার বয়স এখন সত্তরের কাছাকাছি। এখনো পাথরে কোঁদা মজবুত শরীর। বীরেশ্বর রাইয়ের ব্যবসার শুরু থেকে তার সঙ্গে আছে। এখন তো মেমসায়েব না থাকলে ও-ই পাহাড়ের বাড়ির সর্বেসর্বা।

বয়সের অনেক ফারাক সত্ত্বেও এই ঝগড়ুর সঙ্গে আবুর গলায় গলায় ভাব এখন। ভাব দু-তিন কারণে। স্বয়ং কর্ত্রীর যে বিশ্বাসের পাত্র ঝগড়ুর কাছে তার কদর বেশি। তা ইদানীং তো কর্ত্রীর অনেক রকমের জরুরী কাজে আবুর ডাক পড়ে। সে হেড বীটম্যান হবার পর মেমসাহেবের আয়-পয় আরও বেড়েছে। দ্বিতীয় কারণ, আবুকে সত্যিকারের মরদ ভাবে ঝগড়ু। পাহাড় থেকে নেমে এ-পর্যন্ত তিনটে ভালুক শিকার করেছে ওরা। আবুর বন্দুক আছে এখন, কিন্তু বন্দুক দিয়ে শিকার করাটা কি এমন মরদের কাজ! দুজনে মাথা খাটিয়ে জাঁদরেল ভালুককে নাজেহাল করে হাতের অস্ত্র দিয়ে ঘায়েল করতে পারলে তবে তো কথা। তাই করেছে। আর সে-সময় আবুর সাহস আর বুদ্ধি বিবেচনা দেখে ঝগড়ুর তাক লেগে গেছে।

গলায় গলায় ভাবের তৃতীয় কারণ—কারণ। অর্থাৎ সরাব। ভুটানে এই জিনিসটি অঢেল। বাজারে অনেক রকমের সস্তার মাল মেলে। আবার দামী বিলিতি জিনিসও এন্তার পাচার হয়ে আসে। দামী হলেও অন্য জায়গার তুলনায় ঢের সস্তা। কিন্তু গরীব মানুষ ঝগড়ুকে কম পয়সার দিশী মালই গিলতে হয়। অথচ সে বিলিতি বা দামী সরাবের ভক্ত। গন্ধ পেলে জিভে জল গড়ায়। ভাল জিনিসের স্বাদ জেনেছিল মনিব অর্থাৎ বীরেশ্বর রাই বেঁচে থাকতে। তখন দিশী জিনিসের দিকে ফিরেও তাকাত না ঝগড়ু। মনিবটি একদিকে যেমন দিলদরিয়া মানুষ ছিল, অন্যদিকে তেমনি সরাব-রসিক ছিল। কত রকমের দামী মাল ঘরে মজুত রাখা হত তখন। সাহেব দরাজ হাতে তার ভক্তকে প্রসাদ দিত—সিকি বোতল আধ-বোতল যা অবশিষ্ট থাকত ঝগড়ুর ভোগে আসত। ঝগড়ুর সেই সব সুখের দিন গেছে। ভাল জিনিস আর মেলেই না। কর্ত্রী ঘরে থাকলে এখন কত লুকিয়ে-চুরিয়ে আর মেহনত করে তাকে একটু-আধটু দিশী মাল খেতে হয়। টের পেলে এত পুরনো খাতিরের লোককেও ওই মনিবানি খাতির করবে না। যা-ই হোক, মেমসায়েবের ফরমাশ মত আবু পাহাড়ে গেলে বেশি দামের ভাল মালই ঝগড়ুকে খাওয়ায়। এরই ফলে দোস্তি জমজমাট। সেই দিলখুস নেশার সময় ঝগড়ুর মুখ থেকে এই পরিবারের নাড়িনক্ষত্র জেনেছে আবু রব্বানী।

ওষুধের বনজ কাঁচা মাল সরবরাহের ব্যবসা ফেঁপে উঠেছিল বীরেশ্বর রাইয়ের। অ্যালোপ্যাথী, কবিরাজি আর হোমিওপ্যাথী ওষুধের কারখানায় যে-সব শিকড়-বাকড় লতাপাতা বীজ ফলমূল গাছগাছালির বিশেষ চাহিদা। আশপাশের হেকিম ওঝা হাতুড়ে বদ্যিরাও এ-সবের খদ্দের। ভেষজগুণে দামী আর দুষ্প্রাপ্য মাল সংগ্রহের দিকে বেশি ঝোঁক ছিল বীরেশ্বর রাইয়ের। এ ব্যাপারে দারুণ পরিশ্রমী ছিল নাকি মানুষটা। নিজে পড়াশুনা করত, ওষুধের গাছগাছড়া লতাপাতা চেনে এমন লোকদের খুঁজে বার করত, তাদের নিয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। এই করে ওষুধের গাছ যোগাড় করা আর চাষ করার একটা দলই তৈরী করে ফেলেছিল। তারা এখনো আছে, নতুন লোককেও শেখাচ্ছে। পাহাড় আর জঙ্গলের মানুষেরা বেশির ভাগই ভীষণ গরিব। পয়সার মুখ দেখলে তাদের উৎসাহের অভাব হয় না, জঙ্গলের বাঘ-ভালুকেরও পরোয়া করে না। ওষুধের গাছ, লতাপাতা, বীজ, দানা চেনার ব্যাপারে সব থেকে চৌকস হয়ে উঠেছিল ওই ঝগড়ু। মনিব এ-জন্যে ওকে সব থেকে বেশি ভালবাসত। বয়েস হয়েছে, এখন আর যোগাড়ের কাজে বেরোয় না। পাহাড়ের বাংলোর পিছন দিকে কিছু দামী ওষুধ গাছের চাষের বাগান আছে, সেটা দেখাশুনা করে আর অন্য লোকদের তালিম দেয়।

বীরেশ্বর রাইয়ের এই সব বনজ কাঁচা মালের পসরা ভুটান সিকিম ছেড়ে আসাম আর উত্তর বাংলার দিকেও ছড়িয়ে গেছল। ও-সব দিকে তখনও কবিরাজি চিকিৎসার প্রাধান্য। অশিক্ষিত বা গরিব-মধ্যবিত্ত মানুষেরা আগে হেকিম বা কবিরাজের কাছে ছুটত। ফলে ছোট-বড় কবিরাজি ওষুধ তৈরির কারখানাও গজিয়ে উঠছিল। তা ছাড়া ছোট-বড় কবিরাজেরা নিজেরা তো ওষুধ তৈরি করেই। এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের জন্য দফায় দফায় লম্বা ট্যুরে বেরুতো বীরেশ্বর রাই। ফলে সুনাম আর তার কাঁচা মালের কদর দুই-ই বেড়েছে।

এই ব্যবসা সামনে রেখে কাঁচা টাকা রোজগারের আর একটা দিকও হাতের মুঠোয় এসে গেছল বীরেশ্বর রাইয়ের। পাহাড়ী বনজঙ্গলে ওষুধের গাছ-গাছালি ছাড়া নেশার জিনিসও কত রকমের গজায় তার ঠিক নেই। আফিম গাঁজা ভাঙ তো আছেই, আরও অনেক রকমের ছোট-বড় নেশার জিনিসের হদিস মেলে। এ-ব্যাপারেও যেটুকু জ্ঞানগম্যি থাকা দরকার বীরেশ্বর রাইয়ের সেটুকু ছিল। এ ব্যবসা সে বাইরে চালাত না। এই সব নেশার জিনিস ভুটানের রাজধানী থিম্পু আর পারোর মত দুই একটা বড় শহরে চালান দিত। তাইতেই অনেক টাকা ঘরে আসত।

ব্যবসা ফেঁপে উঠতে বীরেশ্বর রাই একা আর পেরে উঠছিল না। রণজিৎ চালিহা তখন চা-বাগানে চাকরি করে। তার বন্ধু আর এক গেলাসের ইয়ার। চালাক-চতুর চৌকস মানুষ। টগবগ করে অসমীয়া বাংলা হিন্দী ভুটানী নেপালী আর ইংরেজীতে কথা বলতে পারে। রণজিৎ চালিহার ওপর আগে থাকতেই চোখ ছিল বীরেশ্বর রাইয়ের। আসামের মানুষ, তাকে পেলে আসামের বাজারটা ভাল মত কব্জায় আসতে পারে। তাছাড়া অতগুলো ভাষা জানা একটা চৌকস লোককে হাতে পেলে সব-দিক থেকেই সুবিধে। হাতে পাওয়ার ব্যবস্থা ওপরঅলাই করে দিলেন। হঠাৎ কি গোলযোগে চা-বাগানের চাকরি নিয়ে টানাটানি রণজিৎ চালিহার। সেই মওকায় বে-ইজ্জত হবার আগেই বীরেশ্বর রাই আরও কিছু বেশি মাইনের টোপ ফেলে ব্যবসায় টেনে নিল। সেই থেকে সে ম্যানেজার।

বন্ধু আর এক গেলাসের ইয়ার হলেও ব্যবসার কাজকর্ম আর টাকা-পয়সা লেনদেনের ব্যাপারে কড়া মানুষ ছিল বীরেশ্বর রাই। সব দিকে তার চোখ ছিল। রাতে গেলাস নিয়ে বসলে বা মেয়ে-বউ নিয়ে তার সঙ্গে কোন ফুর্তির সফরে বেরুলে তখন বন্ধু। অন্য দিকে ম্যানেজার রণজিৎ চালিহাও চতুর কম নয়। মনিববন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে মন বুঝতো আর চটপট সেই মতো কাজ সেরে ফেলত। ফলে ঝগড়ু দুই বন্ধুর মধ্যে ঝগড়া ভুল-বোঝাবুঝি কখনও হতে দেখে নি। একসঙ্গে চার বছর কাজ করেছে তারা, ততদিনে ব্যবসা আরও চাঙা হয়ে উঠেছে। মালিক তার ওপর খুশি ছিল, আর ফুর্তিবাজ কাজের মানুষটার ওপর মালকানও অখুশি ছিল না। মালিক বেঁচে থাকতে ম্যানেজার কত মাইনে আর উপরি পেল বা এখন কত মাইনে পায় ঝগড়ু বা আবুর কোন ধারণা নেই। মাইনে এখন আরও বেশি পায় নিশ্চয়, কিন্তু আবুর ধারণা, ইদানীং তার বাড়তি রোজগাব মাইনের থেকে বেশি ছাড়া কম নয়। যতই হোক মাইনের টাকায় এত মদ খাওয়া ফুর্তি করা বা এমন চালের ওপর থাকা সম্ভব নয়। আবুর আরও ধারণা, তার বাড়তি রোজগারের ব্যাপারটা গায়ত্রী রাইও জানে কিন্তু কিছু বলে না। বলবে কি করে, ব্যবসায় অনেকখানি তো বলতে গেলে এখনও তারই হাতে।

যতখানি সম্ভব গায়ত্রী রাই নিজেই ব্যবসার হাল ধরেছে আর ধরে আছে। বীরেশ্বর রাই মারা গেছে তিন বছর আগে। আচমকা অঘটন, আচমকা মৃত্যু। পাহাড়ের বাংলোয় ওঠার পথে বেসামাল জিপ নিচে পড়ে যায়। জিপ চালানোর ব্যাপারে মানুষটা বেপরোয়া হলেও পাকা হাত। তখনও বর্ষা শুরু হয়ে যায় নি। বর্ষাকালে পাহাড়ের বাংলোয় থাকাই যায় না। প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়। রাস্তা খারাপ হয়ে যায়। ধবস নামে। রাস্তা বন্ধও হয়ে যায়। প্রতি বছর বর্ষা নামার আগে সপরিবারে পাহাড় থেকে নেমে আসতে হয়। ওই সময়টা কাছাকাছির কোন শহরে বা চা-বাগানের বাংলো ভাড়া করে থাকে তারা। বর্ষা শুরু না হলেও সেদিন প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল, আব পাহাড়ী রাস্তাও বেশ খারাপ হয়ে গেছল। তাছাড়া তখনকার সেই রাস্তাও এখনকার মত ছিল না। সেই অঘটনের ফলেই এককাঁড়ি টাকা খরচ করে এখনকার এই রাস্তা বানিয়েছে গায়ত্রী রাই। যা-ই হোক, বৃষ্টিতে রাস্তা খারাপ থাকলেও বীরেশ্বর রাইয়ের মতো অমন পাকা হাতে এইগোছের অ্যাকসিডেন্ট হবার কথা নয়। আসলে একটা মস্ত বড় কাজ হবার ফলে মনের আনন্দে এন্তার মদ গিলে দুই বন্ধু বাড়ি আসছিল। পোস্ট মরটেম রিপোর্ট থেকে সেটা বোঝা গেছে। রণজিৎ চালিহারও সেই রাতে পাহাড়ের বাংলোতেই খাওয়া আর থাকার কথা। কিন্তু কিছু টুকিটাকি কাজ সারার জন্য সে আগেই নেমে গেছল। কাজ শেষ করে ঘণ্টা দু ঘণ্টার মধ্যে ফিরবে। এক কথায় আয়ুর জোর ছিল লোকটার। নইলে একসঙ্গে দুজনেই শেষ হয়ে যেত।

সেই থেকে মদ দু চোখের বিষ গায়ত্রী রাইয়ের। তার কাজের লোকদের কারও মদ খাওয়া বরদাস্ত করে না। একমাত্র রণজিৎ চালিহাকেই কিছু বলে না। স্বামী বেঁচে থাকতে ব্যবসার হিসাবপত্র রাখা আর পার্টির কাছে চিঠিপত্র লেখার কাজ গায়ত্রী রাই করত। কিন্তু সে মারা যাবার দু মাসের মধ্যে মহিলা এমন শক্ত হাতে ব্যবসার হাল ধরবে কেউ ভাবে নি। প্রখর বুদ্ধিমতী তো বটেই, এই তিন বছরে ব্যবসা ডবল ফাঁপিয়ে তোলার ব্যাপারে কম সাহস দেখায় নি। অবশ্য এই সাহসও রণজিৎ চালিহাই যুগিয়েছে। একটু বেপরোয়া হতে পারলে কত সহজে আরও কত বেশি টাকা রোজগার করা যায় সে-

পথ সে-ই গোড়ায় দেখিয়েছে। না, টাকার গন্ধ পেলে মহিলা পেছু পা হবার মেয়ে নয়। ভুটান সিকিম উত্তরবাংলা আর আসামের নানা জায়গায় বনজ ওষুধের কাঁচা মাল মজুতের পাকাপোক্ত ঘাঁটি করা হয়েছে। সেই সব জায়গার কাজ চালানোর জন্য লেখাপড়া জানা স্থানীয় এজেন্ট বাছাই করে বহাল করা হয়েছে। তাদের ব্রোকাররা জায়গায় জায়গায় গিয়ে অর্ডার বুক করে। কমিশন পায়। এই নির্ভরযোগ্য লোক বাছাইয়ের কাজও মহিলা নিজেই করেছে। এ-সব কাজেও ম্যানেজার চালিহা তার ডান হাত—সে সঙ্গে থাকত। এ-রকম ঘাঁটি করার ফলে কারবারের মাল এখন ওদিককার বড় বড় অনেক শহরেই পৌঁছে যাচ্ছে।

এদিকে নেশার কারবারটি আগের থেকে চারগুণ জমজমাট। গায়ত্রী রাইয়ের কাছে নেশা করাটা চক্ষুশূল, কিন্তু নেশার জিনিস বিক্রী করে ঘরে টাকা তুলতে আপত্তি নেই। ভুটানের থিম্পু বা পারো ছেড়ে বর্ডারের কাছাকাছি বড় শহর ফুন্টশোলিঙ পর্যন্ত নেশার মাল পাচার হয়ে যাচ্ছে। আর সে-সব জায়গা থেকে এখানে আসছে ভাল ভাল মদ। বানারজুলি আর আশপাশের অনেক চা-বাগানের সাহেব-সুবোরা এই মদের এখন বড় খদ্দের। হবে না কেন, ও-সব জিনিসের এখানে অনেক দাম—আর আনাও সহজ ব্যাপার নয়। সুবিধের দামে হাতের কাছে মজুত পেলে তারা ঝুঁকবে না কেন? সুবিধের দামে দিয়েও রাইয়ের মোটা লাভ থাকে।

ব্যবসার আরও একটা বড় শাখা বিস্তার করেছে গায়ত্রী রাই। সাপের ব্যবসা। এ-দেশ থেকে বহু সাপ বিদেশের নানা জায়গায় চালান যায়। আমেরিকা ইংল্যান্ড পশ্চিম জার্মানি হল্যান্ড জাপান সকলেরই সাপের চাহিদা। বিষাক্ত সাপ তো বটেই, নির্বিষ সাপও চাই তাদের। এখানে এত খবর কে রাখত? সাপুড়ে আর বেদে-বেদেনীদের কাছে দালালদের আনাগোনা বাড়তে ব্যাপারটা বোঝা গেছে। তারা তো খবর রাখেই। এই বানারজুলি থেকে শুরু করে বিশাল তরাইয়ের জঙ্গলের সর্বত্র বিষধর আর নির্বিষ সাপ কিলবিল করছে। সাপের কি শেষ আছে এ-সব দিকে! গায়ত্রী রাইয়ের এই ব্যবসা শুরু করার পিছনে আসল কৃতিত্ব আবু রব্বানীর। এদিককার জঙ্গলের সে হেড বীটম্যান। দালালরা তার কাছে আসত, তার পকেটে টাকা গুঁজে দিয়ে অনুরোধ করত লোক লাগিয়ে জ্যান্ত সাপ ধরে দাও। এমনি সাপ হলে কম পয়সা, বিষাক্ত সাপ হলে বেশি। যে ধরে দেবে তাদেরও এক-একটা সাপের জন্য আট আনা থেকে দেড়-দু টাকা পর্যন্ত দিত তারা। পাইথন পেলে দশ-পনের টাকা দিতেও রাজি। তাজ্জব ব্যাপার।

কিন্তু সরকারী চাকুরে আবু দালালদের খুশি করে কি করে? তারা এলে তখন সাপের খোঁজ। সে তো আর সাপ মজুত করে রাখতে পারে না বা আগে থাকতে লোক লাগিয়ে গাঁটের পয়সা খরচ করে সাপ কিনে রাখতে পারে না। কথায় কথায় একদিন দালালদের চাহিদার ব্যাপারটা সে গায়ত্রী রাইকে বলেছিল। মেমসাহেবের একটা মজা আছে, নিজে কথা বেশি বলে না কিন্তু সকলের সব কথা শোনে। শোনার পর ম্যানেজারকে ডেকে বলল কি ব্যাপার খবর নিতে। এ-সব ব্যাপারে রণজিৎ চালিহা তৎপর খুব বলতেই হবে। আট-দশ দিনের মধ্যে সমস্ত খবর তার ঠোঁটের ডগায়। শতকরা পঁচানব্বই ভাগ সাপ বিদেশে যাচ্ছে। বাকি পাঁচ ভাগ দেশের গবেষণার কাজে লাগছে। বাইরে সাপ চালানের প্রতিষ্ঠান আছে এ-দেশে। দালালদের হাত ঘুরে সেই সাপ প্রতিষ্ঠানে পৌঁছয়। দালালরা

তো লাভ করেই, খোদ কারবারীরাও তার ওপর মোটা লাভ করে সাপ বিদেশে চালান দেয়। প্রতিষ্ঠান বড় দালালদের কাছ থেকে কোন্ জাতের সাপ কি দরে কেনে শুনে মেমসাহেব পর্যন্ত হাঁ একেবারে। বিষাক্ত সাপের দাম ছয় থেকে বিশ টাকা পর্যন্ত ওঠে। তার মধ্যে একটা শঙ্খচূড়ের দাম একশ থেকে তিনশ সাড়ে তিনশ পর্যন্ত হয়। যত বড় হবে ততো দাম চড়বে। আর নির্বিষ সাপের মধ্যে পাইথনের দামও একশ থেকে আড়াইশ-তিনশো হতে পারে।

ব্যস, আবুর হুকুম হয়ে গেল বেদে সাপুড়ে বা জঙ্গলের লোকের কাছ থেকে একটা সাপও যেন দালালরা না পায়। সাপের খোঁজে এলে তাদের গায়ত্রী রাই অথবা ম্যানেজারের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। আর সকলকে জানিয়ে দিতে হবে জ্যান্ত সাপ ধরে আনলে দালালদের থেকে অনেক ভাল দামে তারা সেগুলো কিনে নেবে। বিয়ের আগে দুলারিরা যে ডেরায় থাকত সেটা এখন নানা জাতের আর নানা রকমের সাপের গুদাম। মাস গেলে দুলারি এখন কুড়ি টাকা করে ডেরার ভাড়া পায়। আর আরও পঞ্চাশ টাকা পায় এই ব্যবসা দেখাশুনা করার জন্য। দেখাশুনা বলতে সাপ ধরার লোকদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা আর দালালদের সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেলে মালকান বা ম্যানেজারের নির্দেশমত তাদের হাতে সাপ জিম্মা করে দেওয়া। দুলারির নামে এই দেখাশুনার ব্যাপারটা সব আবুই করে। দু-দুটো বাচ্চা নিয়ে তার অত সময় কোথায়। দুলারি এখন পাকা সংসারী হয়ে গেছে।

সাপের বিষও যে সোনার দরে বিকোয় তাই বা কে জানত? কিন্তু গায়ত্রী রাই ঠিক জেনেছে। সাপের বিষের চাহিদা অবশ্য সামান্যই সে-সময়। কিন্তু যেটুকু আছে তাতেও কম লাভ নয়। বাছাই করা কিছু বিষাক্ত সাপ গায়ত্রী রাইয়ের পাহাড়ের বাংলোয় চলে যায়। সেখানে একটা সাপের ঘরই করে দেওয়া হয়েছে। ওদিকটার ভার ঝগড়ুর। ওর হাতের টিপুনির চাপে সাপগুলো গলগল করে বিষ ঢেলে দেয়। সাপের বিষ পেতে হলে খদ্দেরদের সেই পাহাড়ের বাংলোয় যেতে হয়।

গায়ত্রী রাইয়ের সঙ্গে ম্যানেজার রণজিৎ চালিহার অবনিবনা কেউ কখনও দেখে নি। বরং এই একজনের সঙ্গেই শুধু মেমসাহেব হাসিমুখে কথাবার্তা বলে, আর বেশির ভাগ ব্যাপারে তার সঙ্গেই পরামর্শ-টরামর্শ করে। কিন্তু একবার মেমসাহেবের সঙ্গে তার মনকষাকষি একটু হয়েছিল সে-খবর শুধু ঝগড়ু রাখে। আবুকে এই গোপন কথাও সে-ই বলেছে। সাহেব মারা যাবার বছরখানেকের মধ্যে রণজিৎ চালিহা নাকি গোটা ব্যবসাটা তিনজন পার্টনারের নামে চালাবার প্রস্তাব দিয়েছিল। একজন গায়ত্রী রাই, একজন তার মেয়ে উর্মিলা রাই আর একজন সে নিজে। সাদা কথা, তিন ভাগের এক ভাগ মালিক হতে চেয়েছিল। মেয়ের সঙ্গে গলায় গলায় ভাব ঝগড়ুর। এ খবর সে-ই চুপি চুপি ফাঁস করেছে তার কাছে। মেয়ে তখন নাবালিকা। মেমসাহেব সে-প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে। ম্যানেজারের তখন নাকি মেজাজ বিগড়েছিল। মেমসাহেব কোন্ কায়দায় তাকে ঠাণ্ডা করেছে, ঝগড়ু জানে না। তবে মাইনে যে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর ঝগড়ু লক্ষ্য করেছে, তারপর থেকে বাড়িতে লোকটার আদর-আপ্যায়নও বেড়েছে।

রণজিৎ চালিহার বউ ছেলে মেয়ে আছে। আগে বছরের বেশির ভাগ সময় তারা আসামেই থাকত, মাস-কতকের জন্য বানারজুলিতে আসত। গত দু বছরের মধ্যে আর

আসেই নি তারা। ফলে দেড়-দু মাস অন্তর ম্যানেজারের আসামে ট্যুর প্রোগ্রাম পড়ে। অবশ্য ব্যবসার বাজারও সেখানে ভালই জমে উঠেছে। আগে মেমসাহেবের কাছে লোকটার খাতির কদর দেখে আবুরা ভাবত লটঘটের ব্যাপার কিছু আছে। অমন কড়া মালকান এই লোকের কাছে শুধু নরম নয়, হাসি-খুশিও। প্রেমের আবার বয়েস বলে কিছু আছে নাকি? মেমসাহেব পাহাড়ের বাংলোয় থাকলে ম্যানেজার সেখানে মাঝেসাজে গিয়ে উপস্থিত হয়, খানাপিনা করে, রাতে থাকেও। ওদিকে ম্যানেজারের বউ ছেলে মেয়ে এ-দিক মাড়ায় না। কিন্তু দু-দুটো বছর একভাবে কেটে গেল, নানা কারণে আবুর আর এখন সে-রকম কিছু মনে হয় না। তাছাড়া সে-রকম হলে ঝগড়ু নেশার মুখে ঠিক বলে দিত। ম্যানেজার লোকটাকে ঝগড়ু খুব একটা পছন্দ করে না। পছন্দ কোন কর্মচারীই করে না। লোকটার এমন হাবভাব যেন সে-ই সব-কিছুর হর্তাকর্তা বিধাতা। নিজে কত দিকে কত ভাবে টাকা কামাচ্ছে ঠিক নেই, অন্যকে হকের পয়সা দেবার বেলায় বকাঝকি করে মালিককে খুশি করার চেষ্টা। নেশার মুখে ঝগড়ু বরং বলেছে, তেমন দরকার পড়লে মালকান গাল বাড়িয়ে ব্যাঙের লাথি খেতে পারে, আবার দুশমন টিট করতেও জানে। দরকার হলে যত লায়েকই হোক ওই ম্যানেজারকেও টাইট দিতে ছাড়বে না। কেন বলতে পারবে না, আবু এখন তার মেমসাহেবের এই চরিত্রটাই বেশি বিশ্বাস করে।

আবুর সঙ্গে মেমসাহেবের যোগাযোগ দু বছরেরও বেশি। আর বছর খানেকের ওপর হল ও তার একজন বিশ্বস্ত লোক। বর্ষায় তো পাহাড় থেকে নেমে আসতেই হয়, আবার কড়া শীতেও নেমে আসতে হয়। এই জন্য মেমসাহেব পাকাপোক্ত ডেরার খোঁজে ছিল। ইদানীং বানারজুলির দিকে কাজ বেশি, আবার এখানে থাকলে যোগাযোগের সুবিধেও বেশি। আট মাস আগে আবু বাপীর বাসাটা তার জিম্মায় ছেড়েছে। দুলারিও এই পরামর্শই দিয়েছিল। মেমসাহেবের নেকনজরে পড়ার আরও কারণ আছে। ও কাজের লোক কেমন তা তো দেখেছেই। তার ওপর ও এ-জঙ্গলের হেড বীটম্যান হবার দরুন সুবিধেও কম পাচ্ছে না। যেমন, জঙ্গলে আজ বাপী স্বচক্ষে যে চন্দ্রা বা সর্পগন্ধার বেড দেখে এলো, সেটা ওখানে হচ্ছে কার জন্যে? হচ্ছে কি করে? হচ্ছে ওই মেমসাহেবের জন্যে, খরচ একরকম নেই-ই বলতে গেলে। আর হচ্ছে আবুর দৌলতে। মাথা চুলকে বড়সাহেবের কাছে আর্জি পেশ করল, কিছু ভাল ওষুধ-গাছের বীজ তার হাতে এসেছে, জঙ্গলের মধ্যে একটু জায়গা নিয়ে চাষ করতে দিলে অনেক গরীব লোকের উপকার হয়। নি-খরচায় লোকের উপকার করে নাম কিনতে পারলে বড়সাহেবই বা আপত্তি করবে কেন? জঙ্গলে তো আর জায়গার টানাটানি নেই। তাছাড়া আবুর কল্যাণে জঙ্গলের কম জিনিস কি তার বউয়ের হেঁসেলে বা ভাঁড়ারে যায় যে আর্জি নাকচ হবে?

গল্পে গল্পে কখন সন্ধ্যা পার বা কখন দুলারি ঘরে হারিকেন রেখে গেছে দুজনের কেউই তেমন খেয়াল করে নি। এই সমাচার আরও কতক্ষণ চলত কে জানে। বাধা পড়ল।

আবু এ-দিক ফিরে ছিল, ঘরে যে ঢুকল, তাকে দেখে বাপীই প্রথমে সচকিত। দুলারি নয়।

রেশমা।

অন্দরে একজন বাইরের লোক দেখে ভিতরে ঢুকে ও থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্ত, তারপরেই মুখে বিস্ময় ভাঙল।—বাপীভাই মনে হচ্ছে—অ্যাঁ?

আবু ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। তারপর কিছু একটা রসিকতা করতে গিয়েও বাপীর মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেল। মজা দেখছে।

কারণ বাপীর মুখে কথা নেই। চেয়েই আছে। সেই রেশমাই বটে, অথচ অনেক তফাৎ।...বছর দুই বড় হবে বাপীর থেকে, বছর চব্বিশ-পঁচিশ হবে বয়েস এখন। কিন্তু এত দিনেও মেয়েটার বয়েস বাড়ে নি, শুধু চেকনাই বেড়েছে। আগের থেকে অনেক তাজা আর পুষ্ট লাগছে। পরনের খাটো ঘাগরা আগের মত মলিন নয়। গায়ের আঁট জামাটাও চকচকে। মাথার সেই উস্কো-খুস্কো চুল মিশকালো এখন—পিঠের ওপর ছড়িয়ে আছে। সুর্মা-টুর্মা কিছু লাগানোর দরুন চোখ দুটো গভীর টানা দেখাচ্ছে।

বাপীর এই গোছের দেখার জালে পড়লে রেশমা আগে খিলখিল করে হেসে উঠত। এখনও হাসছে বটে, কিন্তু এখনই যেন সত্যিকারের সাপের খেলা দেখানো মেয়ের হাসি।

পরের মুহূর্তে মেয়ে গম্ভীর। একটু এগিয়ে এসে আবুর মুখোমুখি দাঁড়াল। দু হাত দু দিকের কোমরে উঠে এলো। চোখে ভ্রূকুটি।

কপট যন্ত্রণায় আবুর মুখ কুঁচকে গেল।—অমন করে চোখ দিয়ে বিঁধিস না মাইরি, বাপীভাই এসেই আমার ঘরে তোর বদলে দুলারি কেন জিগ্যেস করে বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে!

খেদ শেষ হবার আগে দুলারিও ঘরে। আবু এখন কোন্ দিক সামলাবে। মেকি ত্রাসে পিছিয়ে বসল একটু।—মুখ ফসকে বলে ফেলেছি, বাপীভাই বাঁচাও!

রেশমা ফিরে দেখল দুলারিও মুখ টিপে হাসছে। তাকে নিয়ে রসের কথা কিছু হয়েছে বুঝেও তেমন কৌতূহল দেখাল না। আবুর দিকে ফিরে শাসনের সুরে বলল, এই জন্যেই তোমার পাত্তা নেই—বুকে বসানোর জন্য মালকান ওদিকে ছুরি হাতে অপেক্ষা করছে—যাও। ম্যানেজারও আছে—

—শালারা খেলে দেখছি। রস ভুলে আবু তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।—বাপীভাই চলো, অনেক দেরি হয়ে গেছে।

বাপীর দু চোখ তখনও রেশমার মুখের ওপর। রেশমা কটাক্ষে এ-দিকে তাকালো একবার। ঠোঁটে হাসি ঝিলিক দিল।—আবু সাহেব তুমি একলাই যাও, বাপীভাই এখন আমাকে দেখতে ব্যস্ত।

পিছন থেকে দুলারি একটা থাপ্পড় বসালো তার পিঠে। আত্মস্থ বাপী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। আবুকে বলল, চলো।

## দশ

চারদিকের আবছা অন্ধকারের মধ্যে শুধু বাপী তরফদারের বাড়িটাই আলোয় ঝলমল করছে। লাইন ধরে কাছে-দূরের আর সব লণ্ঠন কুপী মোমবাতির টিমটিম আলো। ওই বাড়িটা এখন চোখ টানার মতোই ব্যতিক্রম। নেপালী মহিলার রুচির প্রশংসা করতে হয়। দিনের বেলায়ও বাপী বাড়িটার ছিমছাম চেহারা দেখে গেছে।

সামনের বারান্দায় আরো চড়া আলো জ্বলছে। টেবিলের দুদিকের শৌখিন বেতের চেয়ারে গায়ত্রী রাই আর তার ম্যানেজার রণজিৎ চালিহা বসে। হাসিমুখে কথাবার্তা চলছে। আবু বলছিল, ওই ম্যানেজার ছাড়া মেমসাহেবকে আর কারো সঙ্গে হেসে কথা বলতে দেখে না ওরা। কথা বেশি রণজিৎ চালিহাই বলছে। গায়ত্রী রাই অল্প অল্প হাসছে, এক-একবার মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছে বা কিছু বলছে। দূর থেকে এ-দৃশ্য দেখেই আবুর পিত্তি জ্বলে গেল। চাপা ঝাঁঝে বলে উঠল, শালা ঠিক গ্যাঁট হয়ে বসে আছে, আর মেমসাহেবকে কিছু লাভের রোশনাই দেখাচ্ছে। ও-ব্যাটা এখন ওখানে না থাকলেই ভালো হত, মেমসাহেবের ওপর দিয়ে কথা কইবে।

কি ভেবে মৃদু গলায় বাপী বলল, বাড়ি নিয়ে কথা উঠলে তুমি চুপ করে থেকো, আমি এসে যাবার পরে আর তোমার কোনো দায়িত্ব নেই।

এতেই আবু ঘাবড়ে গেল।—তুমি কি গোলমেলে কথা কিছু বলবে নাকি? মেমসাহেবের মেজাজ খারাপ করে দিও না বাপীভাই, আর ওই ম্যানেজারও একটুও সাদা মনের লোক নয় মনে রেখো।

বাপী আশ্বস্ত করল তাকে, ঠিক আছে।

বারান্দায় জোরালো আলো, বাইরের দিকটা অন্ধকার। তাই একেবারে দাওয়ার কাছে আসার আগে বারান্দার দু'জন ওদের লক্ষ্য করল না। দু'জন নয়, তিনজন। বারান্দা-লাগোয়া ঘরের দরজার কাছে একটা চেয়ারে বসে গায়ত্রী রাইয়ের মেয়ে উর্মিলা রাই বই পড়ছে। এদের আড়ালে দূর থেকে তাকে দেখা যাচ্ছিল না।

ভিতরে ঢুকে পড়তে বারান্দার দু'জনের ওদের দিকে চোখ গেল। সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেরই খুশি মুখ গাম্ভীর্যের আড়ালে সেঁধিয়ে গেল। কাছে এগোবার ফাঁকে প্রথম রণজিৎ চালিহাকেই এক নজর দেখে নিল বাপী। পরনে দামী স্যুট, দামী টাই, ধপধপে ফর্সা রং, চওড়া উঁচোনো কপাল, সে-তুলনায় ছোট চোখ। আসামের মানুষ দেখলেই বোঝা যায়। বয়েস বেশি হলে চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ।

ওরা কাছে আসার ফাঁকে গায়ত্রী রাই নেপালী ভাষায় চাপা গলায় রণজিৎ চালিহাকে বলল কিছু। চালিহা অল্প ঘাড় বেঁকিয়ে আবুকে ছেড়ে বাপীকে ভালো করে দেখে নিল। বাপীর ধারণা, ও যে বাড়ির মালিক মেমসাহেব তার ম্যানেজারকে সেটাই জানান দিল।

এখানে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আবু রব্বানীর অন্য মুখ। বিনয় উপচে পড়ছে। ঝুঁকে মেমসাহেবকে সেলাম জানালো। আবার মুখেও বলল, গুড ইভনিং মেমসায়েব। তারপর ম্যানেজারের উদ্দেশে আরো বিনীত অভিবাদন।—গুড় ইভনিং সার।

মনে মনে বাপী আবুকে তারিফ না করে পারল না। ও উন্নতি না করলে কে করবে!

বাপী দু হাত জুড়ে কপালে ঠেকালো, কিন্তু মহিলা ওর দিকে তাকালোই না। ফলে বাপী ম্যানেজারের দিকে আর না ফিরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। মেয়ে উর্মিলা বিকেলে বাড়ির মালিকের হেনস্থা দেখেছে, আবার সে এসে দাঁড়াতে তার বই পড়ার মনোযোগ গেল। এবার মায়ের সঙ্গে আংকল চালিহা, লোকটার কপালে দুর্ভোগ আছে ভাবছে।

বাড়ির মালিকের অস্তিত্ব স্বীকার করারও দায় নেই যেন গায়ত্রী রাইয়ের। ঈষৎ রুষ্ট স্বরে আবুকে বলল, বিকেল থেকে তোমার খোঁজে লোক পাঠানো হয়েছে—কোথায় ছিলে?

আবু রব্বানীর অপ্রস্তুত মুখ, কিন্তু জবাব সপ্রতিভ। এতকাল বাদে দোস্তকে কাছে পেয়ে ভুলে গেলাম—

আবু রব্বানীর মতো একজনের সঙ্গে এত দোস্তির কারণে কিনা বলা যায় না, বাপীকে এখনো কেউ বসতে বলছে না। আবুর জবাবও গায়ত্রী রাইয়ের কাছে তেমন খুশি হবার মতো নয়। আরো গম্ভীর।—বাড়ীর ব্যাপারে কাগজপত্র কবেই সই হবার কথা ছিল, এখনো হয়নি কেন?

আবুর বিনীত জবাব, ম্যানেজার সায়েব জানেন—

রণজিৎ চালিহা বলল, সব রেডি আছে, কালই হতে পারে।

জবাবের আশায় আবু এবার বাপীর দিকে তাকালো। কিন্তু বাপীর এমন মুখ যেন মাথায় ঢুকছেই না কিছু। অগত্যা আবু মেমসাহেবের দিকে ফিরল। বলল, ঘরের মালিক এসে গেছে, এখন যা করার সেই করবে—তাকে বলুন।

গায়ত্রী রাইয়ের এই উক্তিও পছন্দ হল না—আমি মালিক-টালিক জানি না, তোমার সঙ্গে আমার কথা পাকা হয়েছে, তাকে যা বলার তুমি বলো—কনট্রাক্ট কালই সই হওয়া চাই।

নিরুপায় আবুর দু' চোখ আবার বাপীর দিকে। দোস্ত সব জেনেশুনে ওকে এমন ফ্যাসাদে ফেলছে কেন?

অগত্যা এবারে বাপীর জিভ নড়ল। দু' চোখ মহিলার মুখের ওপরে।—কোন্ বাড়ির কথা হচ্ছে...এই বাড়ি?

গায়ত্রী রাইয়ের বিরূপ চাউনি।—সেটা এতক্ষণে বুঝলেন?

বাপীর এই মুখে কৃত্রিমতা খুঁজে পাওয়া শক্ত। বলল, আপনাদের কথাবার্তা আমি ঠিক খেয়াল করিনি—বিকেল থেকে এই ক'ঘণ্টার অর্ধেক সময় আবুর মুখে কেবল আপনার প্রশংসা শুনেছি, তাই আমি ভাবছিলাম একজন ভদ্রলোকের ছেলেকে আপনি বসতেও বলছেন না কেন...।

ধাক্কাটা শুধু সামনে মহিলা নয়, রণজিৎ চালিহা, দরজার ও-ধারের চেয়ারে বই হাতে ঊর্মিলা, এমন কি আবুর ওপরেও গিয়ে পড়ল।

—সীট্ ডাউন প্লীজ। বলা বাহুল্য, শিষ্টাচারের খোঁচা মেরে মহিলার মুখভাব আরো অপ্রসন্ন।

বাপী চেয়ার টেনে বসল। ঊর্মিলা উঠে ঘর থেকে একটা মোড়া এনে আবুর সামনে রেখে আবার নিজের চেয়ারে ফিরে গেল। ইশারায় ওকেও বসতে বলে, গায়ত্রী রাই বাপীর মুখোমুখি।

বাপী জিজ্ঞাসা করল, বলুন, বাড়ির কি হয়েছে?

—কি হয়েছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না?

কি হয়েছে দেখার জন্যেই বাপীর দু'চোখ বারান্দার চারদিকে আর ঊর্মিলা রাইকে ছাড়িয়ে ভিতরের দিকেও একবার ঘুরে এলো। মেয়েটার চাউনিতে কৌতুকের ছায়া।

এদিকে বাপীর হৃষ্ট পর্যবেক্ষণেও ভেজাল কিছু নেই। অকপট প্রশংসার সুরেই বলল, দিনের বেলা দেখে গেছলাম, রাতে আরো ভালো লাগছে...ঘর বেড়েছে, ইলেকট্রিক লাইট এসেছে...নিজের সেই বাড়ি বলে চেনাই যায় না।

গায়ত্রী রাই তেমনি গম্ভীর, কিন্তু গলার স্বর নরম একটু।—এর জন্য আমার অনেক টাকা খরচ হয়েছে, নট লেস্ দ্যান...ফাইভ থাউজ্যান্ড। এ-টাকাটা ভাড়া থেকে কিভাবে অ্যাডজাস্ট করা হবে সেটা আবুর সঙ্গে সেট্‌লড হয়ে আছে। আপনি জেনে নেবেন... এগ্রিমেন্ট রেডি হয়ে আছে। চালিহার দিকে ফিরল, গেট্ ইট সাইন্‌ড টুমরো—

বাপী পাশের দিকে অর্থাৎ ম্যানেজারের দিকে ফিরেও তাকালো না। তার আবেদন খোদ কর্ত্রীর কাছে। মুখখানা ফাঁপরে পড়ার মতো। বলল, আপনি আমার ভাঙা বাড়ির চেহারা পাল্টে যা করেছেন মিসেস রাই, আমি তার জন্য কৃতজ্ঞ। এরকম করার সামর্থ্য আমার কোনদিন হত না, সই-টইয়ের জন্যেও কিছু আটকাবে না...কিন্তু একটু মুশকিল হল আমি থাকব কোথায়?

মুখের কথা শেষ হতে না হতে চালিহা বলে উঠল, দ্যাটস্ নট্ আওয়ার লুক আউট!

বাপীর ভেবাচাকা খাওয়া মুখ। চালিহাকে একবার দেখে নিয়ে সংকোচ আর সম্ভ্রমের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, ইনি?

চালিহা থমকালো। ধৃষ্টতা দেখছে। গায়ত্রী রাই জবাব দিল, ইনি মিস্টার রণজিৎ চালিহা, আমাদের বিজনেসের চিফ একজিকিউটিভ।

আমার বিজ্‌নেস বলল না বা ম্যানেজার বলল না বাপীর কানে যেটুকু ধরা পড়েছে। সবিনয়ে তাকে নমস্কার জানিয়ে আবার মহিলার দিকে ফিরল।—বাড়ির এগ্রিমেন্ট আপনার সঙ্গে, না আপনার ফার্মের সঙ্গে?

—আমার সঙ্গে।

—তাহলে কথাবার্তাও আপনার সঙ্গে হোক।...বাড়ি নিয়ে আপনাকে আমি কোনো ট্রাবল দেব না, আবুর সঙ্গে যা সেটল্ করেছেন তাই হবে। কিন্তু আমার প্রবলেমটা আপনিও এঁর মতো এক কথায় নাকচ করে দেবেন আমি আশা করছি না।

রণজিৎ চালিহার ফর্সা মুখ লাল। সরাসরি কারো দিকে না তাকালেও বাপীর অগোচর কিছু নেই। মোড়ায় বসা আবুর উতলা মুখ। আর দরজার লাগোয়া চেয়ারে বসা ওই মেয়ের চোখের কোণে কৌতুক আরো বেশি জমাট বেঁধেছে। অর্থাৎ কর্ত্রীর সামনে বসে প্রকারান্তরে তার ম্যানেজারকে তুচ্ছ করা নতুন কিছু।

কিন্তু বাপী তরফদারের ষষ্ঠ অনুভূতি ওকে বড় ঠকায় না। আবুর মুখে গায়ত্রী রাই আর তার এই ম্যানেজারের সম্পর্কে আদ্যোপান্ত শোনার পর থেকেই একটা সম্ভাবনা মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। এখন এই কথার পরে মহিলারও গম্ভীর চাউনিতে যদি পলকের প্রশ্রয়ের আভাস সত্যিই মিলিয়ে যেতে দেখে থাকে, তাহলে তার হিসেবের সঙ্গে মেলে।

মনে হল দেখেছে।

গায়ত্রী রাইয়ের কথায় অবশ্য সেই প্রশ্রয়ের ছিটেফোঁটাও নেই। কথাও বিরক্তি-ছোঁওয়া।—আপনার প্রবলেম শুনে আমি কি করতে পারি?...বড়জোর পুরো ভাড়া একশ' টাকার জায়গায় মাসে পঞ্চাশ-ষাট টাকা করে কাটা যেতে পারে।

মহিলা চতুর কত বুঝতে একটুও সময় লাগল না বাপীর। টাকা তার কাছে কোন সমস্যা নয়। পঞ্চাশ-ষাট ছেড়ে পঁচিশ-তিরিশ টাকা করে কাটতে বললেও হয়তো রাজি হয়ে যাবে। কারণ তাতে বাড়ির দখলের দাবি অনেক বছর ধরে কায়েম থাকবে। কিন্তু

ম্যানেজার রণজিৎ চালিহা এই কূট চালের ধার দিয়েও গেল না। অসহিষ্ণু ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, তাহলে আবার ফ্রেশ এগ্রিমেন্ট করতে হয়—এমনিতেই ওই আবু রব্বানী যতটা পারে স্কুইজ করছে।

বাপী এবার তার দিকে ফিরল। ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, ওই এগ্রিমেন্টের আমি কানাকড়িও দাম দিই না।

রণজিৎ চালিহার ফর্সা মুখ তেতে ওঠার বা সামনের মহিলার দু'চোখ ঘোরালো হয়ে ওঠার আগেই বাপী একই সুরে আবার যা বলল, সেটা কেউ আশা করেনি। চোখে গায়ত্রী রাইকে দেখিয়ে ম্যানেজারকেই বলল, আমার বন্ধু আবু রব্বানী যাঁকে এত শ্রদ্ধা করে আর বিশ্বাস করে, আমারও তাঁকে তেমনি শ্রদ্ধা করতে আর বিশ্বাস করতে অসুবিধে নেই। ওই এগ্রিমেন্ট আপনি ছিঁড়েও ফেলতে পারেন, ওঁর মুখের কথাই যথেষ্ট। ধীরেসুস্থে গায়ত্রী রাইয়ের দিকে ফিরল।—সত্যিই যদি স্কুইজ করা হয়েছে মনে করেন, তাহলে বলবেন, যা উচিত বিবেচনা করবেন তাই হবে। কিন্তু আমার সমূহ প্রবলেম অন্যরকম—

কথার কলে পড়ে চালিহার মেজাজ আরো তিরিক্ষি। আবারও আগ বাড়িয়ে গজগজ করে উঠল, সেটা আমাদের বলে লাভ কি—আপনার প্রবলেম মাথায় রেখে আমরা বাড়ির রিনোভেশনে হাত দিইনি বা এত টাকা ঢালিনি।

বাপীর নিরীহ দু'চোখ প্রথমে মা, পরে দরজার ওধারে মেয়ের মুখের ওপর ঘুরে এলো। অত বিশ্বাস আর শ্রদ্ধার কথা বলার পর ম্যানেজারের এই মেজাজ তাদের কাছেও সুশোভন লাগছে না। বাপীর স্নায়ুগুলো আরো যেন নিজের বশে এখন। মোড়ায় বসা হতবাক মূর্তি আবুর দিকে ঘুরে তাকালো।—ঘর বাড়ানো বা এত সব করার পরামর্শ তুমি দিয়েছিলে?

আবুর হাঁসফাঁস দশা। কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। পাশ থেকে রণজিৎ চালিহাই খেঁকিয়ে উঠল আবার।—ও পারমর্শ দেবে কি? এই ঘর-বাড়ি ওঁর মতো মহিলার বাসযোগ্য ছিল? যেটুকু দরকার করে নেওয়া হয়েছে।

বাপীর ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসি যেন আপনা থেকেই এসে গেল। বলল, বাড়ির হাল দেখে ছেলেবেলায় আমার নিজেরই খুব খারাপ লাগত, আর তখন চা-বাগানের বড় বড় বাংলোগুলো দেখে ভাবতাম বড় হয়ে ওখানে ও-রকম একটা বাংলো তুলব। ...তা এই গরীবের কুঁড়েঘর নিয়ে টানাহেঁচড়া না করে আপনিও চা-বাগানের কোনো জমিতে ওঁর উপযুক্ত একখানা হালফ্যাশানের বাংলো তুলে দিতে পারতেন?

এই বানারজুলির জঙ্গলেই বাপী দেখেছে, তৈরি মৌচাকে ঢিলের যুৎসই ঘা পড়লে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি তাড়া করে আসে আবার চাক থেকে টসটস করে মধুও ঝরে। আবুর দিকে বাপী তাকায়নি, তার দিশেহারা অবস্থাটা আঁচ করতে পারে। বাকি তিনজোড়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টি প্রথমে ছেঁকে ধরল তাকে। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হাওয়া আর ততটা গরম মনে হল না। উর্মিলা রাইয়ের চোখের সামনে বই। গায়ত্রী রাইয়েরও বাইরে রুষ্ট মুখ কিন্তু ভিতরে তরল কিছু তল করার চেষ্টা।

..খোঁচাটা শেষ পর্যন্ত একজনেরই দম্ভের চাকে গিয়ে লেগেছে। সম্ভাবনার সেই অনুভূতিটা ভিতরে আর এক দফা নড়া-চড়া করে গেল। বাপীর হিসেব মিলছে।

রণজিৎ চালিহা চেয়ার ছেড়ে উঠেই দাঁড়াল এবার। ক্রুদ্ধ দু'চোখ গায়ত্রী রাইয়ের দিকে। এই একজনকে এরপর ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করা হবে কিনা এই জিজ্ঞাস্য হয়তো।

জবাবে রমণীর পলকা ভ্রূকুটি। গলার স্বরে হালকা শাসন, ডোন্ট বি ইমপেশেন্ট ম্যান! বোসো!। তারপরেই রসকষশূন্য গম্ভীর দু'চোখ বাপীর মুখের ওপর চড়াও হল। গলার স্বরে ঠাণ্ডা ঝাপটা।—ওঁকে ও-কথা বলবার অর্থ কি, এ বাড়ি আমরা জবর-দখল করে খুশিমতো রেনোভেট করে নিয়েছি?

বাপীও ঠাণ্ডা মুখেই মাথা নাড়ল।—না। যা করেছেন একটু আগে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছি, আর ভাড়া-টাড়ার ব্যাপারে আপনি যা বলবেন তাই হবে বলেছি।

ঘরে বসে আবু বলছিল, বাপীভাইয়ের মুখখানা আগের থেকে ঢের মিষ্টি লাগছে, দেখলে মনে হয় ভেতর বার সাফ—নেপালী মেমসায়েবের ঠিক পছন্দ হয়ে যাবে। আবুর সে-আশায় এখন ছাই পড়েছে কিনা জানে না, কিন্তু মুখের দিকে চেয়ে ওর মেমসায়েবের এখন ভিতর দেখার চোখ।

—ঠিক আছে। থাকার জায়গার প্রবলেমের কথা শুনেছি। কিন্তু আমরা কি করতে পারি?

এ-প্রশ্নের জন্য বাপী প্রস্তুতই ছিল। জবাব দিল, বাড়ির জন্য আপনি অনেক খরচ করেছেন আরো কিছু খরচ করলে সমস্যা মেটে। পাশের খালি জমিতে সেপারেট আর এক্সক্লুসিভ অ্যারেঞ্জমেন্ট সুদ্ধু আমার জন্য একখানা ঘর তুলে দিন।

প্রায় কর্কশ স্বরেই গায়ত্রী রাই বলে উঠল, অ্যাবসারড! এখানে আমি থাকি, আমার মেয়ে থাকে—আমাদের অসুবিধে হবে!

দরজার কাছে সেই মেয়ে তেমনি বসেই আছে। বাপীর সহিষ্ণুতায় এবারে চিড় খেল একটু। সব মেয়েই মেয়ে। হয়তো ওকে করুণাপ্রার্থী ভাবছে এবার। সংযত সুরেই বলল, অসুবিধে আমারও খুব হবে মিসেস রাই...নিজের নিরিবিলি শান্তির ঘরে একটু আশ্রয় পাব বলে কলকাতা থেকে চলে এসেছিলাম। যাক, মাঝে যেমন খুশি পার্টিশন দিয়ে নিতে পারেন, আর সবসুদ্ধ যা খরচ হবে তাও ওই ভাড়ার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন।

মায়ের পিছনে মেয়ে উসখুস করে উঠল একটু। অসুবিধে তারও হবে শুনে হয়তো মজার ছোঁয়া লেগে থাকবে। বাপী তাকালো না। সব থেকে বেশি অবিশ্বাস আর ঘৃণা নিজের ওপর।

গায়ত্রী রাই মাথা নাড়ছে। চাউনিও সদয় নয়। বলল, আই ডোন্ট লাইক দি আইডিয়া।

এবারেও বাপীর নরম মুখ। কিন্তু কথাগুলো স্পষ্ট।—টাকা সংগ্রহ করে নিজের জমিতে যদি সেপারেট ঘর তুলি, আপনি আটকাবেন কি করে?

এবারে যথার্থ হালছাড়া ক্রুদ্ধ মুখ মহিলার। এদিকটা ভাবেনি। তার দাপটের ম্যানেজার এতক্ষণে হয়তো ধৈর্যের শেষ মাথায় এসে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু এ কথার পর সেও আর দাপট দেখালো না। ঘাড় বেঁকিয়ে নেপালী ভাষায় কি দুই-এক কথা বলল তাকে।

কি বলল তক্ষুনি বোঝা গেল। গায়ত্রী রাইয়ের দু'চোখ আবার বাপীর মুখের ওপর এঁটে বসল। বলল, পাশের জমিসুদ্ধু বাড়িটা যদি আমি কিনে নিতে চাই? আই উইল পে ফেয়ার প্রাইস, পাঁচ হাজার টাকা আমি অলরেডি খরচ করেছি...আরো আট হাজার

টাকা দিতে পারি। এগ্রিড?

বলা নেই কওয়া নেই একটা মুখের কথায় আট হাজার টাকার মালিক হয়ে বসতে পারে—ভাবলেও বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে ওঠার কথা। আট হাজার টাকা একসঙ্গে কখনো চোখে দেখেনি। কিন্তু বাপী গরজ দেখছে। গরজ বুঝছে। রয়ে-সয়ে ফিরে জিগ্যেস করল, আপনার বিবেচনায় সব মিলিয়ে এই বাড়ি আর জমির দাম তাহলে তেরো হাজার টাকা?

—টেন থাউজ্যান্ড? ঝাঁঝালো গলায় দর চড়িয়ে গায়ত্রী রাই বলল, কিসের কি দাম আমার জানা আছে, আমার দরকার তাই এই দাম—কিন্তু আর বাড়বে না। এগ্রিড?

ঘাড় ফিরিয়ে একবার আবুর মুখখানা দেখতে ইচ্ছে করছে বাপীর। কিন্তু বেচারা বিড়ম্বনার মধ্যে পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার টালি এলাকার ব্রুকলিন পিওন রতন বণিকের কথা মনে পড়ে গেল। আসার দিনও বলেছিল, কপালের রং বদলাচ্ছে, এবারে দিন ফিরল বলে। কয়েকশ' টাকা পুঁজির বৃত্ত থেকে একেবারে দশ হাজার টাকার বৃত্তের মধ্যে এসে দাঁড়াল? কিন্তু বুকের তলায় যে বৃত্তে পৌঁছনোর তৃষ্ণা এখন, সেটা দশ হাজারের দশ বিশ গুণ হলেও কিছু নয়। আবুর কথা আর উচ্ছ্বাস সত্যি হলে এই একটি রমণীর সঙ্গে তেমন যোগ-নির্বন্ধে ভাগ্যের পাশায় তার থেকে ঢের বড় দান পড়তে পারে। দশ হাজার টাকা হাতের মুঠোয়। যে-কোন সময় হাত বাড়ালেই পাবে, কিন্তু এক্ষুনি ত বাড়ানো মানেই এই যোগের শেষ। বাপী তরফদার আজ যেখানে দাঁড়িয়ে, দশ হাজার টাকা কেন, এই জীবনটাকেও জুয়ার আসরে নামাতে আপত্তি নেই।

রমণীর অসহিষ্ণু প্রতীক্ষা মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে। দু' চোখের অকরুণ ঝাপটায় ওর মুখের জবাব টেনে বার করার মতো। বাপী বলল, না, আর বাড়াতে হবে না, মন থেকে সায় পেলে ওতেই হবে। পেলে বলব।

মহিলা চেয়েই আছে। দশ হাজার টাকার টোপ না গেলার মতো জোরটা কোথায় বোঝার চেষ্টা। এবারে ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করল, সায় পেতে কতদিন লাগবে?

এত বড় একটা লোভের থাবা থেকে এমন অনায়াসে বেরিয়ে আসতে পেরে বাপীর ভিতরটা হালকা লাগছে। সেই সঙ্গে নিজের একটা জোরের দিকেরও হদিস মিলছে। মুখে বিপন্ন হাসি।—সায় এক্ষুনি পাচ্ছি না যখন, কতদিনের মধ্যে পাব বলি কি করে...কিন্তু আপনার এত তাড়া কিসের, আমি সত্যি বাড়ি নিয়ে আপনার সঙ্গে কোনো রকম বোঝাপড়া করতে আসিনি। আপনাকে দেখতে এসে নিজের সমস্যার কথাটা বলে ফেলাই হয়তো অন্যায় হয়েছে।

গায়ত্রী রাইয়ের ব্যাপারটা দেখে ভেতর বোঝা কারো দ্বারা সম্ভব কিনা বলা যায় না। এ-কথার পরেও মুখে কোনো নরম রেখা দেখা গেল না। তবু বাপীর কেমন মনে হল, বোঝাপড়ার চেষ্টা বাতিল করে মহিলা এবারে শুধুই ওর ভেতর দেখছে।

এ-দিকে ম্যানেজার রণজিৎ চালিহা কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখল, তারপর অনেকক্ষণের একটা অসহ্য বিরক্তি ঠেলে উঠে দাঁড়াল।

গায়ত্রী রাইও সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে তাকালো। বাড়িতে ঢোকার আগে আবছা অন্ধকার থেকে মহিলার হাসিমুখ দেখা গেছল। এখন হাসি নেই মুখে, কিন্তু চাউনিটা অন্তরঙ্গ।—যাচ্ছ?

—হ্যাঁ, সাড়ে আটটায় ক্লাবে সেই পার্টির সঙ্গে মিট্ করার কথা।

—ঠিক আছে। কাল সকালে আসছ?

মাথা নাড়ল, আসছে।

সে পা বাড়াবার আগে গায়ত্রী রাই আবার বলল, ক্লাবেই যাচ্ছ যখন একটা কাজ কোরো তো, সেখানকার ম্যানেজারকে দিন-কতকের জন্য এঁকে ঘর ছেড়ে দিতে বলো...আনটিল উই রিচ সামহয়্যার।

রণজিৎ চালিহা বাপীর দিকে একটা উষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিল। বাড়ির দর দশ হাজার টাকা তুলে ফেলার জন্যেই হাবভাবে জ্বলতে দেখা গেছে লোকটাকে। এখন এই কথা। জবাব দিল, কোথাও রিচ্ করার জন্য তোমার এত ব্যস্ত হওয়ার দরকার আছে?

সঙ্গে সঙ্গে এদিক থেকে আবার সেই হাল্কা-গম্ভীর ভ্রূকুটি যার একটাই অর্থ, যা বলছি করো, এ-রকম জল-ভাত ব্যাপার নিয়ে মেজাজ গরম কোরো না।

রণজিৎ চালিহা বারান্দা থেকে নেমে অন্ধকারে মিশে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাপীর মনে হল অনেকক্ষণের একটা কৃত্রিম গুমোট কেটে গেল। সামনের মহিলা এখনো গম্ভীর বটে, কিন্তু মুখের অকরুণ টান-ভাবটা গেছে। ওদিকে তার মেয়েও বেতের চেয়ার তুলে এনে মায়ের পাশে বসল। লালচে ঠোঁটের ফাঁকে টিপ-টিপ হাসি। আরো কিছু মজার খোরাকের প্রত্যাশা।

বাপী তাকাতে চায় না। দেখতে চায় না। সব মেয়েই মেয়ে। ওর জীবনে শনি। শনির দৃষ্টিতে সব জ্বলে, সব পোড়ে। ভিতরের ক্ষতবিক্ষত সত্তা কাউকে যেন চিৎকার করে নালিশ জানাতে চাইছে, এখানেও আবার একটা মেয়ে কেন? কেন?

ঘাড় বেঁকিয়ে একবার মেয়েকে দেখে নিয়ে আবার এদিক ফিরে গায়ত্রী রাই হঠাৎ ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, ইউ রাসকেল, কাম হিয়ার।

বাপী হকচকিয়েই গেছল। কিন্তু না এই আচমকা সম্ভাষণ বা আহ্বান ওকে নয়। আবুকে। কিন্তু আবুও এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়াল।

ঝাঁঝালো গলায় গায়ত্রী রাই আবার হুকুম করল, মোড়াটা এনে এখানে বোসো।

নিজের বাঁ পাশটা দেখিয়ে দিল। আবু শশব্যস্তে হুকুম তামিল করল। ঘাড়ে কি অজানা কোপ পড়ে ভেবে পাচ্ছে না।

গায়ত্রী রাইয়ের দুই সাদাটে ভুরু কুঁচকে জোড়া লাগার দাখিল।—ক'মাস আগেও বাড়ির মালিকের সম্পর্কে তুমি আমার কাছে গাদা গাদা প্রশংসা করে গেছ—সে এই মালিক?

এবারেও আবুর হতচকিত মূর্তি। জবাব দিল, জী মেমসায়েব।

সোজা হয়ে বসে নাক দিয়ে ফোঁস করে গরম বাতাস ছড়ালো এক ঝলক।—তুমি একটা গাধা, হি ইজ্ এ ডেনজারাস্ ম্যান।

—জী মেমসায়েব—না, মেমসায়েব না। ভুল শুধরে ব্যস্তমুখে আবু উঠে দাঁড়াল একেবারে।—খোদার কসম খেয়ে বলছি বাপীভাই খুব ভালো লোক—আমার থেকে সাচ্চা লোক। ওই ম্যানেজার সায়েব খামোখা গরম হয়ে উঠতে ওর মেজাজ খারাপ হয়েছিল—বাপীভাই, মেমসায়েবকে তুমি বুঝিয়ে বলো না।

এই আবু ডিল নিয়ে বা শুধু লাঠি হাতে জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে মোকাবিলা

করে ভাবা শক্ত। কিন্তু বাপীর স্নায়ুতে স্নায়ুতে সাড়া জেগেছে আবার। ভিতরে আবার সেই অনুভূতির আনাগোনা। যে অনুভূতি আগে থাকতে কিছু ইশারা পাঠায়, কিছু বলে দেয়। আবুটা সরলই বটে। সত্যিই ডেনজারাস ভাবলে ওর মেমসাহেব এমন ঘটা করে বলত না—ভাবল না।

ওর হাঁসফাঁস দশা দেখে মেয়েটা হাসছে। বাপীর চোখে হাসি, মেমসায়েবকেই দেখছে।

আবুর কপালে আবার একটা ধমক।—ইউ শাট্ আপ অ্যান্ড সীট ডাউন! গায়ত্রী রাইয়ের দু চোখ আবার বাপীর মুখের ওপর আটকালো। ঘনিষ্ঠ আদৌ বলা যাবে না, কিন্তু সেরকম তপ্তও নয়।

—কি নাম বলেছিলে—বাপী তরফদার?

সোজা তুমি করে বলল। এতক্ষণই যেন একটা বাড়তি সৌজন্যের লাগাম ধরে বসেছিল। এ-ও বাপীর হিসেবের সঙ্গে একটু বেশিই মিলছে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আই থিংক ইউ আর নট এ স্ট্রেট ম্যান—আর ইউ?

চোখে চোখ রেখে বাপী হাসল একটু।—খুব স্ট্রেট বলেই তো মিস্টার চালিহা আর সেই সঙ্গে আপনিও একটু রেগে গেছলেন...আমি কি একটাও বাঁকাচোরা কথা বলেছি?

নিজে না চাইলে ওই মুখে নরম দাগ পড়েই না বোধ হয়। কিন্তু জবাব শুনে অখুশি মনে হল না। জিজ্ঞেস করল, পড়াশুনা কতদূর করা হয়েছে?

বলল।

—অনার্স ছিল?

আজ্ঞে না, অনার্সের বই কেনার মতো সঙ্গতি ছিল না। ডিসটিংশন পেয়েছিলাম।

আবু রব্বানীর মুখে একটা বড় আশার বাতি জ্বলে উঠেছে। তড়বড় করে বলল, দারুণ ভালো ছাত্র ছিল মেমসায়েব, আমার সঙ্গে মিশে আর দিনরাত জঙ্গল চষে অল্পের জন্য স্কলারশিপ মিস করেছে। হাই ফার্স্ট ডিভিশনে—

মেমসায়েব ওকে ধমকে থামালো, তোমাকে কিছু জিগ্যেস করা হয়নি।

বাপীই যেন হাঁপ ফেলে বাঁচল, উৎসাহের ঝোঁকে আবু ওকে আরো কত বেমক্কা ফাঁপিয়ে তুলত ঠিক নেই।

—বয়স কত?

বাপীর মনে পড়ে ব্রুকলিনের বড়বাবু মন্মথ সোম খাঁটি বয়েস জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাঁর মনে কিছু ছিল, এঁর মনে কিছু থাকা অবশ্য সম্ভব নয়। তবু পাশে এই বয়েসের একটা মেয়ে বসা বলেই নিজের বয়েস দশটা বছর বাড়িয়ে বলতে পারলে স্বস্তি বোধ করত। কিন্তু পারা গেল না, সত্যি কথাই বেরিয়ে এলো।—এবার তেইশ হবে।

এত কাঁচা বয়েস মহিলারও খুব মনঃপূত হল না যেন। কারণটাও বাপী হয়তো আঁচ করতে পারে। কিন্তু তলিয়ে ভাবার আগেই পরের প্রশ্ন।—কলকাতায় কি করা হত?

—যুদ্ধে আপিসের টেম্পোরারি চাকরি।

—গেছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ভিতরে ভিতরে কেন যেন এখন আবার মেয়েটার পাশে বসে থাকা

পছন্দ হচ্ছে না বাপীর। এখন কিছু মজার কথা হচ্ছে না, উঠে গেলেই তো পারে।

—এখন এখানে থাকা হবে?

বাপীর মনে হল প্রত্যেক কথার ফাঁকে মহিলা ওকে যাচাই করে নিচ্ছে।

—সুযোগ সুবিধে হলে সেই রকমই ইচ্ছে।

—কিরকম সুযোগ সুবিধে?

চাকরির কথা ইচ্ছে করেই মুখে আনল না। বলল, ছোটখাটো কোনো ব্যবসা যদি করতে পারি?

এই জঙ্গলে আবার কি ব্যবসা?

বাতাস অনুকূল। বাপী হেসেই জবাব দিল, সে তো আমার থেকে আপনি ভালো জানেন।

এবার চাউনিটা আবার রুক্ষ কয়েক নিমেষের জন্য।—যা জানি সে-চেষ্টা করতে গেলে আমিই তোমাকে আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেব।...চাকরি করবে?

আবুর আর সবুর সইল না।—কেন করবে না মেমসায়েব, আপনার মুখের কথা খসলে বাপীভাইকে আমি আর ছাড়ি! ওর থেকে সেরা লোক আপনি এই তামাম বানারজুলিতেও পাবেন না—এ আমি হলপ করে বলতে পারি।

জঙ্গলের নাড়ি-নক্ষত্র জানে, গাছ-গাছড়াও কম চেনে না—

—এরপর তোমাকে আমি এখান থেকে বার করে দেব!

সঙ্গে সঙ্গে আবুর উচ্ছ্বাসের গলায় কুলুপ। কিন্তু মেমসায়েবের এরকম ঠাণ্ডা দাবড়ানি খেয়ে ও অভ্যস্ত বোধ হয়। হেসেই নিজের দু'কানে হাত দিয়ে সামাল দিল।

বাপীর দিকে ফিরল গায়ত্রী রাই। আমি প্রথমে তোমাকে ছ'মাসের জন্য ট্রায়েল দেব—ইট উইল বি এ রিগরাস জব, বাট দেয়ার ইজ ফিউচার—এই ছ'মাস কি পাবে না পাবে সেটা পরে ঠিক করব।

ভাগ্যের পাশায় দান পড়েছে, শুরুতেই সেটা জোরালো করে তোলার মতো জুয়াড়ীর খেলা দেখানোর এই মওকা। বাপীর এখন বদ্ধ ধারণা, আবুর মুখে সব শোনার পর যে অনুভূতিটা মনের তলায় আনাগোনা করে গেছে তাতে কোনো ভুল নেই। ভুল হলে একটা মানুষ এখান থেকে চোখের আড়াল হবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস এমন বদলে যেত না।

বাপী চুপ। কিছুটা নির্লিপ্তও।

—ও কে?

—ভেবে আপনাকে জানাব।

জবাব শুনে আবু তড়াক করে মোড়া ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

না, মহিলাও এই জবাব আশা করেনি। ভুরুর মাঝে ভাঁজ পড়ল।—ভাবার কি আছে?

বিড়ম্বনার ধকল কাটাবার চেষ্টাতেই যেন সময় নিল একটু। বলল, যে-রকম লোক চাইছেন, ছ'মাসের ট্রায়ালে সেটা সম্ভব কিনা আপনিই জানেন।...তাছাড়া মিস্টার চালিহার জন্য আমাকে কিছুটা ফ্রীহ্যান্ড দিতে আপনারই হয়তো অসুবিধে হবে।

এটুকুতেই ঠিক বোধগম্য হবার কথা নয়, হলও না। কিন্তু এতেই চোখকান সজাগ। মনে আরো কিছু আছে তাও যেন আঁচ করতে পারছে। কোনো ব্যাপারে অস্পষ্টতা বরদাস্ত

করার মেজাজও নয় মহিলার। বলল, কারো যোগ্যতা বুঝতে ছ'মাস যথেষ্ট সময়। ফ্রি-হ্যান্ড দেবার কথা এখনই আসছে কোথা থেকে? আর তোমার জন্যে মিস্টার চালিহাকে নিয়ে আমার কি অসুবিধে হবে? হি উইল বি ইয়োর বিগ বস্...অবশ্য তোমার সম্পর্কে তিনি ভালো ইমপ্রেশন নিয়ে যাননি, তোমাকে গ্ল্যাডলি অ্যাকসেপ্ট করবেন বলে মনে হয় না। আই উইল ট্রাই—

বেশ স্পষ্ট অথচ নরম গলায় বাপী বলল, মিস্টার চালিহা আমাকে খুব গ্ল্যাডলি অ্যাকসেপ্ট করবেন মনে হলে আপনি কি অনেক আগেই আমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতেন না?

নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল গায়ত্রী রাই। এই মুখ আর এই চাউনি দেখে ওদিকে উর্মিলা রাই আর এদিকে আবু রব্বানীও চকিত বিমূঢ়।

—হোয়াট ডু ইউ মীন্?

বাপী চুপ। একেবারেই জবাব দে ার ইচ্ছে নেই।

ফলে মহিলার আরো ঝাঁঝালো গলা।—কাম স্ট্রেট, হোয়াট ডু ইউ মীন?

বেশ সহজ অথচ শান্ত মুখে বাপী বলে গেল, আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন বুঝতে পারছি, মনে যা আসে বলে ফেলে আমি অনেক সময় এরকম মুশকিলে পড়ি।...আবুর মুখে আপনার আর আপনার ব্যবসার গল্প শুনে আমার কেমন মনে হয়েছিল, এত বড় অর্গানিজেশনে বাইরের কোনো একজন সর্বেসর্বা হয়ে উঠবে এটা আপনি চান না। আর এই জন্যেই মিস্টার চালিহার মতোই যোগ্য হয়ে উঠতে পারে এমন একজন নির্ভরযোগ্য বিশ্বাসী লোক আপনার দিক থেকে আপনি চাইছেন। এ যদি ঠিক না হয়, ছ'মাসে ট্রায়েল দেবার দরকার নেই—নিজেকেই আমি বাতিল করছি।

মাত্র দু'চার মুহূর্তের জন্য বাপী যা দেখে উঠল সে কি ভুল? বুকের তলায় গোপন কিছুর ছবিটা কেউ যদি আচমকা চোখের সামনে তুলে ধরে, সে কি চকিতের জন্য এমনিই ধড়ফড় করে ওঠে না? কিন্তু সে শুধু ক'টা পলকের জন্য। গায়ত্রী রাইয়ের পালিশ-করা সাদাটে মুখে আলগা রক্ত জমাট বাঁধছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। হিসহিস স্বরে বলল, ইউ আর রিয়েলি ইমপারটিনেন্ট। আমার সামনে বসে আমারই চিফ একজিকিউটিভ সম্পর্কে তুমি এমন কথা বলো? এত সাহস তোমার? শুধু গলায় নয়, চোখেও আগুন ঝরছে।—ইউ মে গো নাও।

বাইরে পা দিয়ে আবুর হতাশা একটা আর্তনাদের মতো বেরিয়ে এলো গলা দিয়ে। —একেবারে পারে এনে এভাবে খেয়া ডোবালে বাপীভাই?

এদিকটায় রাস্তায়ও আলো নেই। বেশ অন্ধকার। চা-বাগানের কাছাকাছি হলে তবে রাস্তায় আলো। আবুর হাতে টর্চ। সন্ধ্যার পর ঘরের বার হলে এখানে সকলের হাতেই টর্চ বা হ্যারিকেন থাকে।

টর্চের আলোটা পায়ের দিকে রাস্তার ওপর। পাশাপাশি চললেও আবু ভালো করে দোস্ত-এর মুখ দেখতে পাচ্ছে না। বাপী হাসছে একটু একটু। নিজেকে নিয়ে খুব একটা ভাবনা-চিন্তা আর সত্যি নেই। কারণ খুব বড় কিছু খোয়াবারও নেই আর।

বলল, তুমি এত ঘাবড়াচ্ছ কেন?

আবু যথার্থই বেজার। একটু হয়তো বিরক্তও।—এরপর ওই মেমসাহেব আমাকেও

ছাড়বে না। তোমার ওইসব কথা ফাঁস করে দিলে ওই শালা ম্যানেজার ছাড়বে?

নির্লিপ্ত সুরে বাপী বলল, তাহলে তুমি আমাকে ছাড়ো। আমাকে ক্লাবে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গিয়ে তোমার মেমসাহেবকে বলো, পাঁচ বছরে আমি এত বদলে গেছি তুমি জানতে না।

আবুর হাতের টর্চ আস্তে আস্তে বাপীর মুখের ওপর উঠে এলো। ঠোঁটে হাসি দেখে রাগই হল।—তুমি সত্যি বেশ বদলেছো তাহলে? আবু রব্বানী মওকা খোঁজে কিন্তু আসলে কোন্ শালার পরোয়া করে? দশ হাজার টাকা বাড়ির দাম পেলে—নিলে না। সেধে চাকরি দিতে চাইল—তার জবাবে ওপর-পড়া হয়ে ওই কথা বলে এলে—তোমার মতলবখানা কি?

—টর্চ নামাও।...বাড়ির দাম মজুতই আছে। দরকার হলে ফেঁচে দেব, আর তুমি সঙ্গে থাকলে ওই টাকায় নিজেরাই কিছু করতে পারব। কিন্তু তোমার কি মত, মেমসাহেবকে যা বলেছি, সত্যি নয়?

আবু তবু ক্ষুব্ধ।—গায়ে পড়ে অত সত্যি কথা বলার দরকার কি ছিল?

বাপী আর কিছু বলল না। বলার আছেই বা কি। আবু যা ভাবছে তা হতেই পারে। গায়ত্রী রাই বাপীকে হয়তো ছেঁটেই দিল।...কিন্তু তা যদি হয়, ভাগ্যের ছকে তেমন কোনো বড় দান পড়েনি বুঝতে হবে। ছেঁটে দিলেও বাপীর খেদ থাকবে না। কিন্তু মন সে-কথা বলছে না। দেখা যাক...।

আর কিছু ভাবতে ভালো লাগছে না। রাজ্যের ক্লান্তি। কাল সমস্ত রাত ঘুম হয়নি। ঘুম ক'রাত ধরেই নেই। আজও সকাল থেকে এ পর্যন্ত ধকলের মধ্যে কাটল। এখন নিরিবিলির তৃষ্ণা। একলার কোটরে সেঁধিয়ে যাবার তাড়না।

জিগ্যেস করল, ক্লাবে আলাদা ঘর-টর একটা পাব তো?

বুক ঠুকে বলার মতো করে আবু জবাব দিল, এজন্যে ওই ম্যানেজারকে বলার কিছু দরকার ছিল না—সে-ব্যবস্থা এ-মোল্লাই করতে পারত।

## এগারো

এক ঘুমে ভোর।

চোখ তাকিয়ে বাপী নিজেই অবাক। জানলা দিয়ে বানারজুলির নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে। তার গায়ে ধূসর পাহাড়ের দেয়াল। বাপীর লোলুপ দু চোখ সেদিকে স্থির খানিক।

দু রাত আগে বুকের তলায় যখন রক্ত ঝরছিল, এই বানারজুলি তখন মায়ের মতো হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল। বানারজুলি সত্যিই আশ্রয় দেবে ওকে? নইলে এমন একটানা শান্তির ঘুম এলো কোত্থেকে?

কিন্তু এই ক্লাবে থাকা পোষাবে না। পাঁচ ছ-বছরে ক্লাবের ভোলও একেবারে বদলে গেছে। একতলা বিশাল লম্বা দালান এখন। ছোট-বড় দুটো হলঘর। বাইরের অতিথি অভ্যাগতদের দুই-এক রাত থাকার মতো মাঝারি ঘরও আছে কয়েকটা। ভাড়া লাগে না, কিন্তু কর্তাব্যক্তিদের সুপারিশ লাগে। সাজানো-গোছানো ঘর। একদিকে গদির শয্যা, দেয়ালের গায়ে ড্রেসিং টেবল, আলমারি। অ্যাটাচড বাথ। সেখানেও বেসিন, বাথ-টাব,

মাথার ওপর শাওয়ার। গায়ত্রী রাইয়ের চিফ একজিকিউটিভ ক্লাবের ম্যানেজারকে ঘরের কথা বলেই রেখেছিল। এখানে তাকে ম্যানেজার কেউ বলে না। ছোট-বড় উঁচু-নিচু সকলেরই সে ডাটাবাবু। বাপী পরে জেনেছে ভদ্রলোকের নাম বাবুলাল দত্ত—সকলের মুখে মুখে ডাটাবাবু হয়ে গেছে।

মুখ দেখে বয়েস আঁচ করা শক্ত। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে যে কোনো বয়েস হতে পারে। ঢ্যাঙা, রোগা, ফর্সা। পরনে ঢিলে-ঢালা ট্রাউজার, গায়ে ঢোলা কোট। হাসি-হাসি মুখ, চটপটে হাব-ভাব।

লোকটা আবুকেও খাতিরই করে বোঝা গেছে। বেয়ারার মারফৎ খবর পেয়ে এসেই অন্তরঙ্গ সুরে বলেছিল, কদিনই ভাবছি আবুসাহেবের একেবারে দেখা নেই কেন।

একটা চোখ একটু ছোট করে ঠাট্টার সুরে আবু জিজ্ঞেস করেছিল, মালে টান পড়েছে।

পাশে অচেনা লোক দেখে ডাটাবাবু সপ্রতিভ সৌজন্যে বাপীকে নমস্কার জানিয়েছে। —মিস্টার তরফদার? মিস্টার চালিহা আপনার কথা বলে গেছেন। সব ঘরই খালি—যেটা খুশি নিতে পারেন।

সব শেষের এই নিরিবিলি ঘরটাই বেছে নিয়েছে বাপী। বিকেলে একটু ভারী খাওয়া হয়েছিল, ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ খুব ছিল না। কিন্তু আবুর কাছে পার নেই। আজকের দিনটা অন্তত বাপীভাই তার আদরের অতিথি। ক্লাব ক্যানটিনের খানা ভালো, ওই ক্যানটিন চালিয়েই বাবু ডাটা লাল হয়ে গেল, নইলে ম্যানেজার হিসেবে তার মাইনে-কড়ি কিছু নেই—ক্যানটিনে দুজনে একসঙ্গে ডিনাব সারবে, তাকে আবু খাওয়াবে।

ডিনারের আগে ক্লাব দেখিয়েছে আবু, ক্লাবের গল্প করেছে। সব কটা চা-বাগানের মালিক আর কর্তাব্যক্তিরা জোট বেঁধে বাড়তি লাভের কড়ি থেকে এই নতুন ক্লাব করেছে। নইলে এই পেল্লায় দালান তুলতে আর সব ব্যবস্থা করতে খরচ যা হয়েছে তার সবটাই ইনকাম ট্যাক্সের পেটে গিয়ে ঢুকত। ভাগাভাগি করে সব টাকাই কোম্পানীগুলোর খরচের খাতায় উঠেছে।

ক্লাবে সাজ বা সরঞ্জামের ত্রুটি নেই। তকতকে বিলিয়ার্ড টেবল, দু সেট টেবলটেনিস বোর্ড, গোটাতিনেক ক্যারমবোর্ড. মাঝারি হলঘরের একদিকে অনেকগুলো ছোট ছোট টেবিল, চারদিকে শৌখিন চেয়ার। এখানে তাস দাবা জুয়ার আড্ডা। অন্যদিকে দুটো বড় বড় টেবলে খবরের কাগজ আর রংচঙা জার্নাল ম্যাগাজিন ছড়ানো।

রাত দশটার কাছাকাছি। তখনো জুয়ার আসর জমজমাট। দু-পাঁচজন আধবয়সী মহিলাকেও দেখা গেছে এখানে। খবরের কাগজ বা জার্নালের দিকে কেউ নেই। চার-পাঁচটা টেবিলে তিন তাস রামি-পোকার চলেছে। ওদিকে সকলেই গম্ভীর, জোরালো আলোর নীচে সিগারেটের ধোঁয়া পাক খাচ্ছে। ব্যস্ত শুধু কয়েকটা তকমা পরা বেয়ারা। অর্ডার মাফিক ড্রিঙ্ক সারভ করে যাচ্ছে আর হিসেবের খাতায় সই নিচ্ছে। হিসেবের ফয়সলা হয় প্রত্যেক জুম্মাবার অর্থাৎ শুক্রবারে। শনি রবি দুদিন চা-বাগানের ছুটি। তাই শুক্রবার রাতে হোমরাচোমরাদের নাকি দিল ভালো থাকে। ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ইত্যাদি আছে। বুঝে শুনে রকমারি মদ আমদানির ব্যবস্থা এবং তদারক তারাই করে থাকে। মেম্বাররা কি দরে সেটা এখানে ভোগ করবে তাও তারাই

হিসেব কষে ঠিক করে দেয়। এ ব্যাপারে ডাটাবাবু শুধু জিম্মাদার, সার্ভিস চার্জ ছাড়া আর বেশি কিছু লাভ করতে পারে না। তবে আবুর ধারণা বাজারে শুধু খালি বোতল বেচেই লোকটা মন্দ কামায় না। তার আসল লাভ ক্যানটিন থেকে। খানা ভালো। গলা-কাটা দাম। শুক্কুর শনি এই দুটো দিন ডাটাবাবুর লক্ষ্মীবাবুর। চা-বাগানের রইস মানুষেরা সপরিবারে ওই দু রাতে ওখানেই ডিনার সারে।

অল্প আর মাঝারি আয়ের খদ্দেরদের জন্য ডাটাবাবুর ডে-ক্যানটিন খোলা থাকে। তখন কম খরচে লাঞ্চ মেলে। আর যা মেলে সেটা ডাটাবাবুর নিজস্ব কারবার। কম দামে দিশী ভালো মালের যোগানদার ডাটাবাবু। সবাই তো আর হোমরাচোমরা চাকুরে নয় এখানে। লাঞ্চ খেতে এসে বা এমনিতেও সূয্যি ডোবার আগে এসে তারা আস্ত বোতল কিনে নিয়ে যায়। একটু অসুবিধে, ইচ্ছে করলেও এ জিনিস্ এখানে বসে খাবার হুকুম নেই। এখানকার বড় সাহেবসুবোদের সঙ্গে রণজিৎ চালিহার খাতির বাজারের থেকে সস্তায় নামী-দামী মাল যোগানোর দৌলতে, আর ডাটাবাবুর কাছে আবু সায়েবের খাতিরও অনেকটা একই কারণে। আবু বর্ডারের বাইরে গেলেই কম দামের দিশী মাল পাবার আশায় হাঁ করে থাকে ডাটাবাবু। বর্ডারের ওধারে হরেকরকমের দিশী মালেরও ছড়াছড়ি। এই দিশী মাল মানে হাড়িয়া পচাই নয়, তার থেকে ভদ্দরলোকের জিনিস।

এহেন জায়গায় কিনা বাপী তরফদার।

এরকম জায়গায় রাতটা অঘোর ঘুমের মধ্যে কেটে গেল সেটাই আশ্চর্য। আরো ক'দিন ক'রাত থাকতে হবে কে জানে। এখানে বানারজুলির বাতাস নেই, বানারজুলির মাটির গন্ধ নেই। এর থেকে আবুর জঙ্গলের ঘরের একটাতে থাকতে পেলেও বেশি স্বস্তি বোধ করবে।

মুখ হাত ধোয়া হতেই চায়ের তেষ্টা। আর তক্ষুনি বুকের তলায় মোচড়। এই দুটো কান আর দুটো চোখ একটা যন্ত্রণা বয়ে নিয়ে এলো।...এমনি সকালে খুপরি ঘরের নড়বড়ে দরজা বাইরে থেকে ঠেলে খোলার ক্যাঁচ করে শব্দ।...এক হাতে রুটি বা বিস্কুট, অন্য হাতে গরম চায়ের গেলাস...ঘুমের দাগে ফোলা ফোলা একখানা শামলা মুখ।

দরজা খুলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো বাপী। বারান্দায় একটা বেয়ারার জিম্মায় বনমায়ার নতুন মাহুত লছমন তার বাক্স আর বিছানা রেখে গেছে। আবু বলে গিয়ে থাকবে। এখানে এ দুটোর একটাও মানায় না। ঘরে ঢুকিয়ে দিতে বলে বাপী সোজা ক্যানটিনে। লম্বা লম্বা পা ফেলে আর এক দিক থেকে ডাটাবাবু সামনে এগিয়ে এলো। —গুড মর্নিং সার, রাতে কোনো অসুবিধে হয়নি?

টাটে গোলাপ কি গাঁদা ডাটাবাবু সেটা দেখে না। বাপী জবাব দিল, কিছু না।

ঘুরে দাঁড়িয়ে হালকা শিস দিতে বেয়ারা ছুটে এলো।—সাবকা ব্রেকফাস্ট।

ডাটাবাবু হাল্কা চালে কিচেনের দিকে চলে গেল। এরপর শুধু চা আর টোস্ট অর্ডার দেয় কি করে? সঙ্গে একটা ডিমের পোচ বলল। কিন্তু এরই বিল দেখে বাপীর দু চোখ কপালে। চায়ের পাট শেষ হতে বিল সামনে রেখে বেয়ারা জিজ্ঞেস করল, দুপুরে লাঞ্চ হবে কি না।

বাপী জানালো হবে। কিন্তু ভিতরে আবার আর এক চিন্তা। এখানে ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার করতে হলে তার পুঁজি ফাঁক হতে ক'দিন আর। আবু আর তার মেমসায়েব খাসা

ব্যবস্থাই করল যা হোক।

এখানে সন্ধ্যের পর কাগজ আসে। বাপী বাইরে বসে আগের দিনের কাগজটা উল্টে-পাল্টে দেখছিল। কত দিন যাবৎ বাইরের জগৎটাকেই ভুলে বসেছিল। খবরের কাগজ হাতে নিয়েও দেখেনি। কিন্তু আজও একটু বাদেই আর ভালো লাগল না।

দূরে বানারজুলির জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। ওটা টানছে ওকে। আবু সকালে আসবে বলে গেছল। তার জন্য অপেক্ষা করতে না হলে বেরিয়েই পড়ত।

কিন্তু ন'টা বেজে গেল আবুর দেখা নেই। থাকা খাওয়ার ফয়সালাই আগে করে নেওয়া দরকার। জলপাইগুড়ির ললিত ভড়ের কল্যাণে রান্নাটাও রপ্ত হয়েছিল। নিজেরটা নিজেই করে নিতে পারে। এই ক্লাবঘরে থাকলে সেটা সম্ভব নয়। একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলে গায়ত্রী রাই যদি মাসে একশ টাকা—বাড়িভাড়া থেকে পঞ্চাশ টাকা করেও ওর হাতে দেয় তাহলে খাওয়া-খরচটা অন্তত চলে যেতে পারে। ভালো খেতে ভালো লাগে না এমন নয়, কিন্তু গত পাঁচ বছরে বাপী এ ব্যাপারে অনেকখানি নিরাসক্ত হতে পেরেছে।...যাক বাড়ির দশ হাজার টাকা দাম পাবার পর মাসে মাসে খুদ কুড়নোর কথা আর ওঠেই না। বেচেই দেবে। এমন লোভনীয় দর পেয়েও কাল রাতে অমন নিস্পৃহ থাকতে পারল কি করে সেটাই আশ্চর্য লাগছে এখন।

ওই দশ হাজারের অঙ্কটা সামনে রেখে বাপীর নিজেকে একটু চাঙা করে তোলার চেষ্টা। কিন্তু গতরাতে অমন নির্লিপ্ত ভাবখানা দেখিয়ে এসে আজই আবার নিজে থেকে বাড়ি বিক্রির প্রস্তাব নিয়ে ছুটে যেতে পারে না। পরিস্থিতি বোঝার জন্যেও ক'টা দিন সবুর করতেই হবে।

আবুর এখনো দেখা নেই। বিরক্ত হয়ে পাজামা পাঞ্জাবি বদলাবার জন্য ঘরে এলো। সাড়ে ন'টা বাজে, এবারে বেরিয়ে পড়বে।

মিনিট দশেকের মধ্যে বেরুতে গিয়ে দেখে ডাটাবাবুর কিচেন ঘর থেকে আবু রব্বানী এদিকে পা বাড়িয়েছে। দরজার কাছে ডাটাবাবু দাঁড়িয়ে। অতটা দূরে থেকেও বাপীর মনে হল কাঁচুমাচু মুখ তার। আর বড় বড় পা ফেলে আবুর গম্ভীর চালের এই মুখ দেখলে কেউ বলবে না বানারজুলি জঙ্গলের বীটম্যান ও।

কাছে এসে ধমকের সুরে বলল, সকালে ব্রেকফাস্টের টাকা দিতে গেলে কেন? আর শুধু ডাল ভাত মাছের ঝোলের লাঞ্চ অর্ডার দিয়ে এসেছ কেন?

জবাব না দিয়ে বাপী চেয়ে রইল। এত দেরিতে এসেও প্রথমেই ডাটাবাবুর কাছে এই খোঁজ নিতে গেল, অবাক হবারই কথা।

ঘরে পা দিয়ে আবু আবার বলল, ডাটাবাবুকে বকে এলাম আর তোমার অর্ডার বাতিল করে ফার্স্ট ক্লাস লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে এলাম, আর বলে দিলাম এরপর যে কদিন এখানে থাকবে ব্রেকফাস্ট বা লাঞ্চডিনারের কোনো বিল যেন তোমার কাছে হাজির না করা হয়।

—সে কি! টাকা কে দেবে—তুমি?

—না, মেমসায়েব।

বাপীর স্নায়ু সজাগ। কিছু কি ঘটেছে এর মধ্যে আর সেইজন্য আবুর আসতে দেরি? কিন্তু ওর মূর্তি দেখে কিছু বোঝা দায়।

পিছনের দরজা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে আবু ভুরু কুঁচকে একবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল।—আমার দেরি দেখে সটকান দিচ্ছিলে?

—বসে বসে ভালো লাগছিল না। কিন্তু তোমার ওই—

—বোসো। আগে আমার কথার জবাব দাও। বয়সে আমি কত বড় হব তোমার থেকে?

এই গাম্ভীর্য দেখে বা প্রশ্ন শুনে বাপীর আবারও কেমন মনে হল সমাচার কিছু আছে। জবাব দিল, বছর ছয় হবে...

—তাহলে তুমি গুনে গুনে আমার দুগালে তিন-তিন ছটা থাপ্পড় মারো, আর কান দুটো ছ'বার কসে মলে দাও।

কপট রাগ আর ধরে রাখতে পারল না। দু' হাতে বাপীকে ঝুঁকে জাপটে ধরল আর দু' গালে নিজের গাল ঘষতে লাগল। এরপর চুমুটুমুও খেয়ে বসতে পারে, বাপীর নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা।

—বাপীভাই আমি একটা পাঁঠা—আমি একটা গরু—আমি একটা গাধা।

এরপর যেটুকু, বাপীর কাছে অন্তত তা আর অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। তবু দু' কান সজাগ রেখে মন দিয়েই শুনল। রাতে ব্যাজার মন নিয়ে আবু রব্বানী ঘরে ফিরেছে। দুলারিকেও বলেছে মেমসায়েবের কাছে গিয়ে বাপীভাই বিসমিল্লায় গলদ বাধিয়ে বসেছে, এখন ওর নিজের গলা বাঁচলে হয়।

সকালে জঙ্গলে যাবার আগে বাপীভাইয়ের কাছে আসার কথা, কিন্তু তার আগেই লোক মারফৎ মেমসায়েবের তলব। জলদি যেতে হবে। আচ্ছা করে ঝাড়বে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছে। মেমসায়েব বারান্দায় তার অপেক্ষাতেই বসেছিল। সামনে গিয়ে মন ভেজানোর মতো সেলাম ঠোকার সময়ও দিলে না। রক্ত জল করে দেবার মতো ঠাণ্ডা গলায় বলল, তোমার ওই লোক কাল অমন কথা বলে গেল কেন—তার কাছে তুমি আমাদের সম্বন্ধে কি বলেছ?

নিরুপায় আবু তখন আল্লার দোহাই দিয়ে জানালো, দোস্ত যা বলে গেছে তার সবটাই নিজের মাথায় গজিয়েছে, সে এরকম বলতে পারে মনে হলে এই বিপাকে পড়ার জন্য তাকে মেমসায়েবের কাছে নিয়েই আসত না। রাতে এখান থেকে বেরুনোর পর দোস্তের সঙ্গে তার এ নিয়ে একরকম ঝগড়াই হয়ে গেছে। আবু শুধু তার কাছে মিসিসায়েবের (ঊর্মিলার) এলেমদার বাপজানের জিপ অ্যাকসিডেন্টের গল্প করেছিল। ম্যানেজার চালিহা সাহেবের আয়ুর জোরের কথা বলেছিল, আর মেমসায়েব এই ম্যানেজারকে নিয়ে বুদ্ধি আর সাহসের জোরে কি করে তার খসমের ব্যবসা এমন জমজমাট করে তুললেন সেই সব গল্প করেছিল। দোষের মধ্যে মেমসায়েব এখন আর একজন লেখাপড়া জানা ইমানদার লোক খুঁজছেন আর এ পর্যন্ত দুজন লোককে ট্রায়েল দিয়ে ছাঁটাই করেছেন এ খবরটাও দোস্তকে জানিয়েছিল। ও খুব আশা করেছিল দোস্তকে মেমসায়েবের পছন্দ হবেই। কারণ এমন বিদ্যাবুদ্ধি আর সাহস ও-বয়সে কম ছেলেই ধরে। কিন্তু এখানে এসে আর চালিহা সায়েবকে দেখে দোস্ত কি ভেবে আর কি বুঝে অমন বেমক্কা কথা বলে ফেলল সেটা এখনো ওর মাথায় আসছে না।

বরফ-ঠাণ্ডা মুখ করে মেমসায়েব ওর কথা শুনে গেল। তারপর বলল, তোমার

দোস্ত একটা হাড়-পাজী ছেলে—বুঝলে?

মেমসায়েবকে একটু তোষামোদ করার আশায় আবু মাথা নেড়ে প্রায় সায় দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই অবিশ্বাস্য কিছু দেখল। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির মতো কি। আর চোখেও একটু খুশির জেল্লা।

আবু বিশ্বাস করবে কি করবে না ভেবে পেল না।

সঙ্গে সঙ্গে আবার মালকানের কড়া মুখ। ঝাঁঝালো গলায় আবুকে সাবধান করল, দোস্ত কাল রাতে এখানে কি বলেছে না বলেছে এ যেন কাক-পক্ষীতেও জানতে না পারে—জানলে দুজনেরই গর্দান যাবে। তারপর হুকুম করল তাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো। তারপর নিজেই আবার বলল, এখন থাক, সকালের দিকে চালিহার আসার কথা, বিকেল তিনটে-চারটের সময় যেন দেখা করে।

আবু রব্বানীর বুদ্ধিসুদ্ধি একরাশ ধোঁয়ার মধ্যে সেঁধিয়েছিল। এবারে খোলসা। আনন্দে সেখানেই একটা ডিগবাজী খেতে সাধ গেছল তার। কিন্তু মেমসায়েবের জেরার শেষ নেই তার পরেও। ছেলেবেলায় কেমন দেখেছে দোস্তকে, একটু বড় হবার পর কেমন দেখেছে, পাঁচ বছর দেখেনি এর মধ্যে বন্ধুর স্বভাবচরিত্র যে বিগড়োয়নি সে জানল কি করে—এই সব।

আবুও তখন লাগাম ছেড়ে বন্ধুর প্রশংসা করেছে। সত্য-মিথ্যে যা মনে এসেছে তাই বলেছে। বলেছে, পাঁচ বছরে স্বভাব বদলে থাকলে কলকাতার মতো আমোদ-আহ্লাদের জায়গা ছেড়ে সে এই জঙ্গলে ফিরে আসবে কেন। এতদিন বাদে দেখে ক'ঘণ্টার মধ্যে আবুর বরং ভয় করেছে বন্ধু বিবাগী-টিবাগী না হয়ে যায়। আর টাকার লোভ যে নেই সে প্রমাণ তো মেমসায়েব নিজেই পেয়েছেন। পকেটে দশ টাকা আছে কিনা সন্দেহ কিন্তু বাড়িটার জন্য নাকের ডগায় দশ হাজার টাকা দুলিয়েও তাকে লোভের জালে আটকানো গেল না।

বুকের তলার ক্ষতর ওপর আঁচড় পড়ল ক'টা। ওর স্বভাব-চরিত্রের খবর জানা থাকলে প্রশংসা করতে গিয়ে এই আবু রব্বানীরও জিভ আটকে যেত। প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য বাপী তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, আমার ক্লাব-ক্যানটিনে খাওয়াদাওয়ার খরচ চালানোর ভার তাহলে তোমার মেমসায়েবের?

হ্যাঁ। ভালো ঘর পেয়েছ কিনা খোঁজ করল। আমিও তক্ষুনি কাজ হাসিল করে নিলাম। বললাম, ভালো ঘর পেলে কি হবে, ওখানে ডাটাবাবুর খাওয়ার বিল মেটাতে তো এক হাত জিভ বেরিয়ে যাবে। মেমসায়েব তক্ষুনি বলে দিল, বিল সব আমার কাছে পাঠাতে বোলো। আবু হাসছে হি-হি করে।—এমনিতে মেমসায়েবের আঙুলের ফাঁকে জল গলে না, আমার যে এখানে ম্যাজিকের মতো লাগছে গো বাপী ভাই!

এবার বাপীও হাসল।—গায়ে পড়ে অত সত্যি কথা বলার দরকার কি ছিল এখন সেটা বুঝছ তাহলে?

আবু অকপটে মাথা ঝাঁকালো।—হাড়ে হাড়ে বুঝছি। কাল দুলারির কাছে তোমাকে গালই পেড়েছি আর এই ভোজবাজির কথা শুনলে ও আমাকে বোকা পাঁঠা বলবে।

ঘরের মধ্যে আর ভালো লাগছিল না। আবুর সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ল। ও এখন জঙ্গলের কাজে যাবে। হেড বীটম্যান হিসেবেও দায়িত্ব তো একেবারে কম নয়। ওর

সঙ্গে আগের মতোই জঙ্গলে কাটানোর তৃষ্ণা বাপীর।

পাশাপাশি পাকা রাস্তা ধরে চলতে চলতে বাপী জিজ্ঞেস করল, আপাতত আমার এই ক্লাবে থাকাই ঠিক তাহলে?

আবু সানন্দে জবাব দিল, খাবেদাবে তোফা আনন্দে থাকবে—গ্যাঁটের পয়সা খরচা না হলে এর থেকে ভালো জায়গা আর আছে নাকি? তবে মেমসায়েব পাশের জমিতে তোমার ঘর তুলে দেয়ার কথাটা একেবারে ছেঁটে দেয় নি। আজও বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওই খালি জমিটুকু দেখে বলছিল, ঘর একটা-দুটো আরো তোলা যেতে পারে, কিন্তু এটুকুর মধ্যে মাঝখানে দেয়াল বা কাঠের পাঁচিল তুললে বিচ্ছিরি দেখতে হয়ে যাবে। এতে রাজী হবে না বোধ হয়, কিন্তু তোমার থাকার ব্যবস্থা তো কিছু করে দিতেই হবে—বারো মাস ডাটাবাবুর বিল মেটানোর মেয়ে তো নয়।

বাপী জিজ্ঞেস করল, পাঁচিল তুলতেই হবে কেন, মেয়ের জন্য?

—আর কি। মেয়ের চারদিকে অষ্টপ্রহর চোখের পাঁচিল তো দিয়ে রেখেছে। নতুন কিছু রসের খোরাক পেয়ে আবু দাঁড়িয়েই গেল।—ওই মেয়ের কাণ্ডমাণ্ড তোমাকে কিছু বলা হয়নি—না?

বাপী সচকিত। শোনার লোভ নেই। কিন্তু সতর্কতার প্রয়োজন কতটুকু, জেনে রাখা দরকার। মাথা নাড়ল, বলেনি।

গোড়ায় এই কাণ্ডরও সবটাই আবুর সেই ভুটান পাহাড়ের বাংলোর ঝগড়ুর মুখে শোনা। হালে নিজে চোখেও কিছু দেখেছে আর তাই নিয়ে মা-মেয়ের মনকষাকষির ব্যাপারটা আঁচ করেছে।

মেমসায়েবের এই মেয়ে ঝগড়ুর চোখের মণি। ঊর্মিলার কথায় ঝগড়ুর কড়া নেশার মুখেও স্নেহ গলে গলে পড়তে দেখেছে আবু। ও তাকে আদর করে ঊর্মি বলে ডাকে। মেমসায়েবকে ভয়ও করে ভক্তিও করে, কিন্তু ভালবাসে ওই ঊর্মিকে। মেয়েটার নাকি তার বাপের মতোই দিল্‌খোলা দরাজ মন। মা-কে লুকিয়ে-চুরিয়ে ভালো মালের বোতল সময়-সময় ও-ই দিয়ে যেত ঝগড়ুকে। কিন্তু বরাত এমন দেড় বছর হয়ে গেল ওই মেয়ের সঙ্কলের ওপর রাগ আর অভিমান।

ঊর্মিলা দার্জিলিং থেকে পড়াশুনা করত বরাবর। এবারে তার বি-এ পরীক্ষা দেবার কথা। কিন্তু মায়ের কড়া দাপটে পড়াশুনায় জলাঞ্জলি দিয়ে তাকে মায়ের সঙ্গে থাকতে হচ্ছে এখন। মায়ের সাফ কথা, বাড়িতে বসে পড়াশুনা করে প্রাইভেটে পরীক্ষা দিতে পারো তো দাও, নইলে দিতে হবে না। মেয়েও রাগ করে ও-পাট বন্ধ করে বসে আছে।

মোদ্দা কথা, দার্জিলিঙের কাছাকাছি এক চা-বাগানের ছোকরা এঞ্জিনিয়ারের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে ঊর্মিলা রাই। মেয়ে চালাক যেমন সেয়ানাও তেমনি। অনেক দিন পর্যন্ত ব্যাপারখানা সকলের চোখে গোপন ছিল। কলেজের ছুটি-ছাটায় মেয়ে মায়ের কাছে এসে থাকে আবার ছুটি ফুরোলে চলে যায়। ধরা পড়বে কি করে?

কিন্তু, প্রেম পাকতে থাকলে চালাক ছেলে-মেয়েরাও বোকা হয়ে যায়, আবার বেপরোয়াও হয়। এই জন্যেই দুনিয়ার কোনো প্রেমই শেষ পর্যন্ত চাপা থাকে না বোধ হয়। মেয়ের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পর লম্বা ছুটির মধ্যেই সব ফাঁস। ঊর্মিলা মাঝে মাঝে সকালে পাহাড়ের বাংলো থেকে নেমে আসে, দুপুরের খাওয়ার সময়ের আগে

আর দেখা মেলে না। আবার খেয়ে-দেয়ে দুপুরে নামল তো সন্ধ্যার আগে আর দেখা নেই। মা বকাবকি করলেও চোখ উল্টে থাকে, নয়তো জবাব দেয়, ছুটির মধ্যে বাড়িতে ভালো লাগে না—পাহাড় আর জঙ্গল দেখে বেড়ায়।

মায়ের তাতেও দুর্ভাবনা। এসব জায়গায় একলা পাহাড় জঙ্গল দেখে বেড়ানো নিরাপদ নয়। কিন্তু ঝগড়ুকে সঙ্গে দিতে চাইলে মেয়ে মুখঝামটা দেবে। সে আর কচিটি আছে নাকি এখন?

মায়ের হাতে পড়লে বকুনি খাবে ভেবে ঝগড়ু নিজেই অনেক সময় মেয়ের ফিরতে দেরি দেখে নিচে নেমে এসেছে। কিন্তু কাছে দূরে কোথাও তার দেখা মেলেনি। এদিকে মা তো আর সর্বদা ঘরে বসে থাকে না, দিনরাতের বেশির ভাগ সময় তার মাথায় ব্যবসার চিন্তা। দু'চারদিনের জন্য আবার বানারজুলিতে বা অন্য কোথাও চলে যায়। বড় বড় পার্টির সঙ্গে নিজেরও অনেক সময় যোগাযোগ রাখতে হয় তার। মেয়ের জন্য তখন পর্যন্ত কোনো চিন্তা ভাবনা নেই। নিজের বাড়ি, ঝগড়ু আছে, চিন্তার কি আছে?

...মেয়ে একদিন সকালে বেরুলো, রাত পর্যন্ত দেখা নেই। তার খানিক আগে মালকান দু'দিনের জন্য বাইরে চলে গেছে। উর্মি অবশ্য ঝগড়ুকে বলে গেছল, দুপুরে ফিরবে না। তার চেনাজানা কয়েকজন মেয়ে এসেছে, তাদের সঙ্গে হৈ-চৈ করে কাটাবে আর বাইরে খেয়ে নেবে। কিন্তু সেয়ানা মেয়ে মা থাকতে একটি কথাও বলেনি। তারপর দুপুর গড়ালো, বিকেল আর সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হল, তার দেখা নেই! ভাবনা-চিন্তায় অস্থির হয়ে পাহাড় থেকে নেমে এলো ঝগড়ু। তাকে আর এ তল্লাটে না চেনে কে? শেষে অনেকটা দূরে সেই পাকা রাস্তার ধারে এক চালাঘরের বুড়ো সাঙাতের সঙ্গে দেখা। ঝগড়ুর দুশ্চিন্তার কথা শুনে সে যা খবর দিল, দুই চক্ষু ছানাবড়া। মিসিসায়েবকে নাকি মাঝে মাঝে জিপে করে এক ছেলের সঙ্গে হাওয়া খেতে দেখে তারা। এই রাস্তাতেই যাতায়াত তাদের। সুন্দরপানা অল্পবয়সী ছেলে, কোন দেশী বলতে পারবে না, তবে স্বজাতের নয় এটা ঠিক—অর্থাৎ নেপালী নয়। সাদা চামড়ার সায়েব-সুবো বা ফিরিঙ্গি-টিরিঙ্গিও নয়। পরনে চেকনাই প্যান্ট শার্ট, নিজেই জিপ চালায়। পাশে মিসিসায়েব। সেই সকালেও এই রাস্তায় জিপে দুজনকে দেখেছে। অমন ফুর্তির মুখ কে না চেনে। তাই তারা ভেবেছে ঝগড়ুর মালকান মেয়ের জন্যে ভিনজাতের আদমী ঠিক করে ফেলেছে।

ঝগড়ু ফিরে এসেছে। কিন্তু বাংলোয় ওঠেনি। পাহাড়ে ওঠার রাস্তা আগলে নিয়েই দাঁড়িয়ে ছিল। ওই জিপের দেখা মিলেছে আরো ঘণ্টাখানেক বাদে। রাত তখন কম করে নটা। আশেপাশে জনমানব নেই।

সামনে এসে হেড লাইটের আলোয় ঝগড়ুকে পাথরখানার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উর্মিলার প্রেমের চটকা ভাঙল। ওদিকে সেই ছেলেরও মুখ শুকনো। জিপ থেকে নেমে উর্মিলা ছুটে এলো। তার প্রথম ত্রাস, মা হঠাৎ ফিরে এসেছে কিনা, নইলে ঝগড়ু এখানে এই মুখ করে দাঁড়িয়ে কেন?

মা আসেনি শুনে মেয়ের শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা। বলল, ফিরতে দেরি হবে বলেই তো গেছল, অত চিন্তার কি আছে। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে দেরি হয়ে গেল, তাদের একজনের আত্মীয় পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে।

প্রেমিকটিও জিপ থেকে নেমে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ঝগড়ু তখন রাগে ফাটছে।

তাকে দেখিয়ে উর্মিলাকেই বলল, ফের মিথ্যে কথা বলবে তো তোমার সামনেই ওর মাথাটা ছিঁড়ে নিয়ে আসব। তোমার ওই খেলা কত দিন ধরে চলছে আমার জানতে বাকি নেই—আসুক মালকান।

ঝগড়ুর মেজাজ জানে উর্মিলা, প্রেমিকটি জিভ নেড়ে কিছু বলতে গেলে হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর। ইশারায় চটপট তাকে সরে পড়তে বলল। তারপর বাংলোয় ফিরে ঝগড়ুকে নিয়ে পড়ল। তোয়াজ তোষামোদে কাজ হল না দেখে রাগবিরাগ শুরু হয়ে গেল। মা কিছু জানবে না কথা দিতেই হবে। আর তা না হলে নিজের ওপর এমন শোধ নেবে যে ঝগড়ুকে চিরকাল পস্তাতে হবে। কি করবে রাগের মুখে তাও বলল। শেষে ছোট মেয়ের মতোই ওকে জাপটেমাপটে ধরে সে কি আদরের ঘটা। ঝগড়ুর কথা না দিয়ে উপায় কি? মদ দু'চোখের বিষ মালকানের কিন্তু ম্যানেজার বা ব্যবসার সেরকম মানী অতিথি অভ্যাগতর জন্য ঘরে দামী মাল কিছু মজুত রাখতেই হয়। মেয়ের বুকের এত পাটা, তার থেকে একটা আস্ত বোতল সরিয়ে ওকে দিয়ে দিয়েছিল। আর পরদিন সেই ছেলেকে একেবারে পাহাড়ের বাংলোয় তুলে এনে ঝগড়ুর সঙ্গে মিতালি করিয়ে ছেড়েছে।

ঝগড়ু ভয়ে বাঁচে না। আরো পাঁচজন আছে এখানে। মেয়েটার জন্য তাদেব মিথ্যে বোঝাতে হয়েছে, মিথ্যে বলতে হয়েছে। নানা রকম রইস খদ্দেরের আনাগোনা আছেই বাড়িতে। এ রকম এক দিন না। মায়ের অনুপস্থিতিতে আরো অনেক সময় ওই ছেলেকে এই পাহাড়ের বাংলোয় দেখা গেছে। উর্মিকে ঝগড়ু বকা-ঝকা করে, মায়ের কাছে বলে দেবে বলে ভয় দেখায়, নিজের বিপদের কথা বলে—কিন্তু কে কার কথা শোনে!

ছেলেটাকে অবশ্য ভালোই লেগেছিল ঝগড়ুর। মিষ্টি চেহারা। নাম বিজয় মেহেরা। পাঞ্জাবী। কিন্তু দাড়ি-গোঁফের বালাই নেই। কেতাদুরস্ত হালফ্যাশানের ছেলে। এঞ্জিনিয়ারিং পাস করে সবে মিরিকের চা-বাগানে ঢুকেছে। দার্জিলিং আর শিলিগুড়ির মাঝামাঝি জায়গা মিরিক। সুখিয়া পোখরির কাছে দল বেঁধে মেয়েরা পিকনিকে গেছল। সেখানে ওই ছেলের সঙ্গে উর্মিলার আলাপ। ঝগড়ু বলেছে প্রথম আলাপেই নাকি বেশ ঘন ব্যাপার। তারপর ফাঁক পেলেই ওই ছেলের দার্জিলিংএ ছোটা, আর ফাঁক পেলে মেয়েরও তেমনি হস্টেল পালিয়ে মিরিক বেড়াতে আসা। বিজয়ের হেপাজতে কোম্পানীর জিপ আছে একটা। তার ফলে দার্জিলিং থেকে মিরিক বা মিরিক থেকে দার্জিলিং কতটুকু আর পথ? তাছাড়া শনি রবি সপ্তাহে দুদিন তো ছুটি।

সে-ও এক শনিবার। পড়বি তো পড় বাঘিনীর মুখে। অর্থাৎ মায়ের মুখোমুখি। উর্মিলা তখন বি-এ পড়ে। গায়ত্রী রাই ব্যবসার কাজে নিজের ভ্যানে কার্সিয়াঙে এসেছিল। কাজ শেষ করে ফেরার মুখে বিপত্তি। এক জায়গায় পথ আগলে একটা বাস বিকল হতে কতগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। গায়ত্রী রাইয়ের ভ্যানও এসে থেমেছে। বাঁকা রাস্তার অদূরে একটা জিপ দাঁড়িয়ে। সেই জিপে চালকের পাশে তার মেয়ে বসে। দুজনেই হাসিখুশিতে এত মশগুল যে কোনদিকেই চোখ নেই। নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস করবে কিনা গায়ত্রী রাইয়ের সেই বিস্ময়। কোথায় দার্জিলিঙের হস্টেল আর কোথায় কার্সিয়াঙ —কম করে পনের-ষোল মাইল পথ!

ভ্যানে গায়ত্রী রাইয়ের পিছনে যে লোকটা বসে ছিল সেও এইখানে জিপে ওই

ফিটফাট ছেলের পাশে মিসিসায়েবকে দেখে হকচকিয়ে গেছে। লোকটা পাহাড়ের বাংলোয় কাজ করে। বাইরে বেরুলেই অনেক সময়ই বাংলোর কেউ না কেউ মেমসায়েবের সঙ্গে থাকে। জিপের ওই ছেলেটাকে সে পাহাড়ের বাংলোয় দেখেছে। ঝগড়ু বলেছিল, মেমসায়েবের খাতিরের খদ্দের। মেমসায়েবের এই মূর্তি দেখে আর তাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে লোকটা সে-কথাও না জানিয়ে পারল না। কারণ এখানে ওই ছেলের পাশে মিসিসায়েবকে দেখে তারও দস্তুরমতো খটকা লেগেছে।

তারপর বেড়াল যেমন ইঁদুর ধরে আনে সেই রকম করে জিপ থেকে মেয়েকে টেনে নামিযে নিজের গাড়িতে তুলল মেমসায়েব। মেয়ের তখন হয়ে গেছে। সেখান থেকে সোজা নিজের পাহাড়ের বাংলোয়। ঘরে এনে বারকতক ঝাঁকুনি দিতেই মেয়ে গলগল করে সব স্বীকার করে ফেলল, আর বি-এ পাশ করার পর ওই ছেলেকে তার বিয়ে করার সংকল্পের কথাও বলল। জবাবে মায়ের ঠাস ঠাস দুই থাপ্পড়ে সোজা বিছানায় গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হল তাকে।

বাইরে থেকে মেমসায়েবের অলক্ষ্যে ঝগড়ু মেয়ের শাস্তি দেখেছে। তারপর নিজের শাস্তির অপেক্ষা করেছে।

ডাক পড়তে ঝগড়ু মেমসাযেবের মুখের দিকে তাকাতে পারেনি। কিন্তু বলার যা বলেছে।—তাকে যেমন খুশি শাস্তি দিতে পারেন। সব জেনেও ও কিছু জানায় নি বা জানাতে পারে নি কারণ তার মেয়ে দুর্গা মায়ের নাম করে তাকে শাসিয়ে রেখেছিল মা-কে কিছু বললেই পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে শেষ করবে আর শোধ নেবে! বলেছিল, সে ওই ছেলেকে বিয়ে করবে আর সময়ে সে-কথা মা-কে নিজেই জানাবে।

না, মালকান ওকে কোনো শাস্তি দেয় নি বা কিছুই বলে নি।

পরদিন মেয়েকে নিয়ে নিজে দার্জিলিং চলে গেছে। সেখানে কি হয়েছে না হয়েছে তারাই জানে। মোট কথা এটুকু বোঝা গেছে, মেমসায়েব সেখানে বেশ কড়া ব্যবস্থাই কিছু করে এসেছিল।

কিন্তু প্রেমজ্বর ছাড়ানো মুখের কথা নয়। তিন-চার মাসের মধ্যে দার্জিলিং থেকে মেমসায়েবের নামে চিঠি এসেছে। সেটা কি চিঠি ঝগড়ু জানে না, ফলে আবুও জানে না। তবে এটা ঠিক, হস্টেল থেকে মেয়ের নামে কড়া নালিশ কিছু। চিঠি পেয়েই থমথমে মুখে মেমসায়েব দার্জিলিং চলে গেছে আর বইপত্র বাক্স বিছানাসুদ্ধ মেয়েকে নিয়ে চলে এসেছে। ব্যস, মেয়ের পড়ার পাট খতম। মা আর মেয়েকে কলেজে পাঠাবে না, মেয়েও প্রাইভেট পরীক্ষা দেবে না।

বিজয় মেহেরাকে আবু স্বচক্ষে এই বানারজুলিতেই দেখেছে। দেখেছে মেমসায়েবও। তাকে প্রাণের ভয় দেখিয়েছে পর্যন্ত। সাত-আট মাস আগে মেয়ে রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। দু'-দিন দু'-রাত নিখোঁজ। এই আবুকে সঙ্গে করেই মেমসায়েব মিরিকে চলে গেছল। যে চা-বাগানের এঞ্জিনিয়ার সেই ছেলে, তার ম্যানেজারের কাছে নালিশ করেছিল। কিন্তু অপ্রস্তুত হয়ে ফিরতে হয়েছে। কারণ বিজয় মেহেরা সেখানেই তখন কাজে ব্যস্ত। উর্মিলা ঘর ছেড়ে পালিয়েছে শুনে সে হাঁ।

দু'-দিন বাদে উর্মিলার শিলিগুড়ির এক বান্ধবী এক-রকম জোর করেই তাকে মায়ের

কাছে পৌঁছে দিয়ে গেছে। দু’-রাত সে ওই বন্ধুর বাড়িতে বন্ধুর কাছে ছিল।

তারপর থেকে এ পর্যন্ত আর গোলযোগ কিছুই দেখা যায় নি। বাইরে মেয়েকে অনেকটা শান্তই দেখা যায়। মা তাকে সারাক্ষণ চোখে আগলে রাখে। যখন যেখানে যায়, সঙ্গে নিয়ে যায়। কিন্তু আবুর এখনো ধারণা, মেয়েটার ওই ছেলের ওপরেই মন পড়ে আছে। মায়ের চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়, তবু তলায় তলায় কোন রকম যোগসাজশ আছে কিনা কে জানে। এদিকে বাইরের কোনো ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশতে দেখে না তাকে। শহর থেকে গাদা গাদা ইংরেজি গল্পের বই আনায় আর পড়ে।

আবুর মুখ চলে তো পা চলে না। এতক্ষণে ওরা বনমায়ার আস্তানার রাস্তায়। বাপী অন্যমনস্ক ছিল। এ গল্প যেমন পুরনো আবার তেমনই নতুন। ঊর্মিলার মুখখানা খুঁটিয়ে ভাবছিল। বুকের তলায় কোনো বড় ঝড় জমাট বেঁধে আছে মনে হয় নি। বরং চোখের কোণে স্বাভাবিক কৌতুক দেখেছে। ঠোঁটের ফাঁকে মজার ছোঁয়া লাগা হাসিও দেখেছে।

...তাহলে মা জিতেছে?

বনমায়ার ডাকে ঘুরে তাকালো। শুঁড় উঁচিয়ে সেলাম তুলেই আছে আর ডাকছে। একসঙ্গে দু’জন আপনার মানুষ কতকাল বাদে দেখল, এই ভাব। লছমন ওর মুখে কচি ডাল-পাতা গুঁজে দিয়ে তোয়াজ করছিল। বনমায়া শুড় দিয়ে ওকে পাশে ঠেলে সরালো।

বাপীর হঠাৎ হাসি পেল। এই বনমায়ার পায়ে কতবার কত না শক্তপোক্ত বেড়ি লাগানো হয়েছে। কিন্তু সব বাধাবন্ধ ঠেলে ওর অভিসার কেউ ঠেকাতে পারে নি।

কোনো ভদ্রলোকের মেয়ে বোধ হয় বনমায়া হতে পারে না।

## বারো

ঘড়ির দিকে চোখ ছিল না এমন নয়। হাত-ঘড়িটা হাতে পরাই আছে। তিনটে বাজতে দেখেছে। কাঁটা এরপর চারের দাগের কাছে এগিয়ে আসছে তাও লক্ষ্য করেছে। কিন্তু বাপীর কোন তাড়া নেই। চিৎপাত শুয়ে আছে।

আবু রব্বানী ওকে জঙ্গল থেকে ছেড়েছে সাড়ে বারোটার পরে। তার আগে বারকয়েক মনে করিয়ে দিয়েছে মেমসায়েবের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট তিনটের থেকে চারটের মধ্যে। চারটের দরকার নেই, বাপীভাই যেন অবশ্য সাড়ে তিনটের মধ্যেই চলে যায়। সময়ের ব্যাপারে মেমসায়েব খাঁটি মেমসায়েব। পরিস্থিতি অনুকূল জেনেও আবুর মনে একটু উদ্বেগ লেগেই আছে। মেমসায়েবের মেজাজ জানে, আবার বাপীভাইয়ের মগজের খেলার যে নজির দেখেছে তাতেও তার দুর্ভাবনা। আবার কি বলে সব বানচাল করে দেয় তার কিছু ঠিক আছে। একবার কিস্তিমাত হয়েছে বটে, কিন্তু বার বার সেই রাস্তায় এগোলে ডাকসাইটে ঠাকরোন কি আর সেটা বরদাস্ত করবে? বাপীকে বলেওছে সে-কথা।

জবাবে বাপী মিটি-মিটি হেসে বলেছে, না, এক রাস্তায় এগোলে কখনও হয়!

আবুর তাতে অস্বস্তি বেড়েছে বই কমেনি। তার ব্যস্ততায় বিরক্তির মিশেল।—না না, আর কোনো রাস্তা-ফাস্তার কথা তুমি চিন্তাই করবে না। যা বলে শুনবে আর ভালো ছেলের মত রাজি হয়ে যাবে। মগজে বুদ্ধি কেমন ধরো সেটা ঠাকরোন ভালই বুঝেছে,

আর সেই জন্যে এখন তোমার কদর। কিন্তু বেশি বুদ্ধির প্যাঁচ কষতে গেলে ভরা-ডুবি হবে বলে দিলাম। বুদ্ধি দাম পেয়েইছ, কিন্তু বিশ্বাসে এতটুকু আঁচড় পড়ল তো ভোকাটা। ঠাকরোনের কাছে ওটির কদর সব থেকে বেশি।

আবুর ভয়টা কোথায় বাপীর বুঝতে বাকি নেই! বুদ্ধির ফুটো দিয়ে শেষে বিশ্বাস না গলে যায়। বাপী ভাবতে বারণ করেছে, আশ্বাসও দিয়েছে। কিন্তু বিকেলের সাক্ষাতের ফলাফল না জানা পর্যন্ত ওর স্বস্তি নেই! দোস্তের মুখ দেখে মনে হয়েছে তার যেন খুব একটা গরজ নেই, গরজ শুধু ওরই। বারদুই বলেছে, খুব আশা করেছিল মেমসায়েব ওকেই হুকুম করবে সঙ্গে নিয়ে আসতে। তা না বলার মানে, একলা দোস্তের সঙ্গে কথা বলতে চায়।

আবুর সেই জন্যেই কি-হয় কি-হয় ভাবনা।

বাপীর বুকের ওপর কেউ হাত রেখে দেখছে না। রাখলে বোঝা যেত ঘড়ির কাঁটা যত ঘুরছে বুকের তলার ধুপধুপুনিও ততো বাড়ছে। আবার ঘড়ি দেখল, চারটে বাজতে সতের। জামা-পাজামা বদলে এক্ষুনি রওনা হয়ে পড়লেও চারটের পনের-বিশ মিনিট পরে পৌঁছুবে। বানারজুলির ওই বাড়ি এই ক্লাব হাউস থেকে আড়াই মাইল পথ। আবু এখনও ওকে শয্যায় শয়ান দেখলে ক্ষেপেই যেত বোধ হয়। ভাবত দোস্তের এতটুকু তাড়া বা গরজ নেই। কিন্তু তাড়া আর গরজ দুই-ই আছে বলে আজকের সময়ের হিসেবটা অন্য রকম। কলকাতার ব্রুকলিনে মাস-কতক থেকেই গোলামীর স্বাদ বুঝেছে। ঘাড়-নিচু ঘোড়ার পিঠে চাবুক বেশি পড়ে। দু পায়ে ভর করে দাঁড়ানোর পাটাতনটা শুরুতেই যতটা সম্ভব উঁচু করে নেওয়া দরকার। এই পাটাতনের বিচার টাকার অঙ্কে নয়। এই এক রমণীর দৌলতে বাড়তি টাকা তো বেশ আবুও কামাচ্ছে, আরও কতজনে কামাচ্ছে। দুপুরে আবু বলছিল, ঠাকরোনের সুনজরে আছে বলেই রেশমাও সুখের মুখ দেখেছে। কিন্তু বাপী আর সে রকম সুখের প্রত্যাশী নয়। ঠিক কি যে প্রত্যাশা বাপী নিজেও জানে না। সদ্য-সদ্য যে উঁচু পাটাতনের ওপর শুরুতেই দু'পা ভর করে দাঁড়াতে চায়—সেটা ওর নিজেরই সত্তা। টাকার নয়, দম্ভের নয়—শুধুই সত্তা।

তাই মন বলছে, আর একজনের মারফৎ আঙুল তুলে তু-করে ডাকা মাত্র ঘড়ির কাঁটা ধরে গোলামের মত আজ অন্তত ছুটে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। কেন সময়ের অত খেয়াল ছিল না, হালকা চালের সে কৈফিয়তও মগজে ছকা হয়ে গেছে।...কৈফিয়ৎ তলব করার আগেই আবুর মেমসায়েব বা ঘরে যদি থাকে তো তার মেয়েরও কিছু দেখে দু' চোখ হয়ত কপালে উঠবে। আবুকে ছেড়ে জঙ্গল থেকে ক্লাব-ঘরে ফেরার পথে বনমায়ার নতুন মাহুত লছমনকে যা বলে এসেছিল, খুশি আর কৃতজ্ঞতায় ডগমগ লছমন মাথা ঝাঁকিয়ে তাতে রাজি হয়েছে।

চারটেই বাজল। বাপী এবার শয্যা ছেড়ে বাথরুমে গিয়ে সাবান দিয়ে বেশ করে মুখটা ধুয়ে এলো। তোরঙ্গ থেকে নতুন আর এক প্রস্থ গেঞ্জি পাজামা আর পাঞ্জাবি বার করে পরল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরিপাটী করে মাথা আঁচড়ে নিল। শেভিং পর্ব ঘণ্টাখানেক আগেই সেরে নিয়েছিল।

—বাঃ! তোকে একটা চুমু খেতে ইচ্ছে করছে যে রে!

চমকে উঠে হাত থেকে চিরুনি ফেলে দিয়ে আয়নার কাছ থেকে সরে এলো বাপী

তরফদার। শেভিংয়ের পর প্রথম যে-দিন স্নান সেরে মাথা আঁচড়ে এমনি একসেট পাজামা পাঞ্জাবি পরে সকালে চায়ের টেবিলে এসে বসেছিল, গৌরী বউদি বড় বড় চোখ করে ওর দিকে চেয়েছিল, তার পর ঠোঁটে হাসির ফাটল ধরিয়ে বাচ্চু আর মণিদার সামনেই ওই কথাগুলো বলেছিল।

নিজের ওপরেই তিক্ত-বিরক্ত। পিছনের যা কিছু পিছনেই পড়ে থাকে না কেন? মনে পড়ে কেন? পড়ে কেন তাও জানে। মনের ব্যামোয় বাঁক ঘুরতে বাঘ দেখে।

হনহন করে পা চালিয়ে বনমায়া আর লছমনের আস্তানায় চলে এলো। পাশেই লছমনের ঝুপড়ি ঘর। সে তৈরিই ছিল। একগাল হেসে এগিয়ে এলো। ওদিকে আগেও বনমায়া যতবার দেখত বাপীকে সেলাম বাজাতো। মাঝে পাঁচটা বছর অদর্শনের ফলে এখন তো আরও খুশির সেলাম।

এই সকালটা লছমনের কাছে খুব সুদিন। বনমায়া বন-বিভাগের হাতী আর আবু রব্বানী হল গিয়ে জঙ্গলের এই এলাকার হেড বীটম্যান। সেই সুবাদে আবু সাহেবের কৃপার পাত্র। বনমায়ার মন না পেলে আর দু'জন মাহুতের মতো ওরও জবাব হয়ে যাবে—এই হুমকি সাফসুফ দিয়েই রেখেছিল। বনমায়ার তোয়াজ তার দিনরাতের কাজ। তাতে একেবারে ফল হয় নি এমন নয়। অন্য দু'জন মাহুতের মতো বনমায়া ওকে একেবারে বরবাদ করে দেয় নি। সময়ে অনেক সয়, বনমায়ারও এই তোয়াজ পেয়ে কিছুটা সয়ে এসেছিল। তবু মন পাওয়ার ব্যাপারে এই বাঙালীবাবুর কথায় আবু রব্বানী ওকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে।

দু-দুজন ভালোবাসার মানুষকে একসঙ্গে দেখে এই বজ্জাত যখন শুঁড় দিয়ে ওকে ঠেলে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিল, বা ফোঁস ফোঁস করছিল—বাঙালী বাবুর কথায় আবু সাহেব তখন এক হাতে শুঁড় আর এক হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে কাছে রেখে বনমায়াকে ধমক-ধামক করেছে। বলেছে, ও-ই এখন তোর আসল ভালোবাসার লোক, বুঝলি? ওদের দেখে লছমনের হাতে খেতে চায় নি, আবু সাহেব তখন বকেঝকে আর রাগ করে শুঁড়ে থাপ্পড় কষিয়ে ওর হাত দিয়েই খাইয়েছে। ভালোবাসার মানুষের গুঁতো খেলে কতক্ষণ আর গোঁ থাকে। এর পর বাঙালীবাবু আর আবু সাহেবকে হাতির পিঠে তুলে নিয়ে লছমনই মনের আনন্দে তাদের জঙ্গলে কাজের জায়গায় পৌঁছে দিয়ে এসেছে।

আবু সাহেবের ওপর লছমনের খুব একটা ভরসা ছিল না। কিন্তু বাঙালীবাবু এ ক'দিনের মধ্যে তার কথা রেখেছে। আর এই এক সকালের মধ্যে চাকরি খোয়াবার ভয়ও দূরে সরে গেছে। লছমন তাই কৃতজ্ঞ যেমন, খুশিও তেমনি।

হাওদা সাজিয়েই রেখেছিল। বাপী শুঁড় বেয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে-ও উঠে পড়ল।

বাপী নিজের মনে হাসছে। মাথায় কি ভূত চেপেছে? সে-রকম ভাবলে এখনও নেমে পড়া চলে। চটক দেখানোর লোভে? তাও নয়। একটু বৈচিত্র্যের লোভ অবশ্যই। এর আড়ালে নিজের প্রত্যাশার চেহারাও চাপা পড়ার কথা।

আধা-আধি পথ ভাঙার পর বাপী সচকিত। আগে আগে পায়ে হেঁটে যে চলেছে, পিছন থেকে এক নজরেই তাকে চিনেছে। রেশমা। পরনে চকচকে ঘাগরা। পুষ্ট দুই বাহুতে রূপোর দুটো পেঁচানো গয়না। ফর্সা দুই পায়েও সেই রকম প্যাঁচানো রূপোর খাড়ুর মতো। এ-রকম গয়না গত সন্ধ্যায় অন্তত দেখে নি বাপী। দেখলে মনে থাকত।

এখনও রোদ আছে। সেই আলোয় ওগুলো চকচক করছে।

রেশমা সত্যি সুখের মুখ দেখেছে মনে হয়।...আবু বলেছিল, ও আর সাপ খেলা দেখায় না, সাপ বেচে। খপাখপ বিষাক্ত সাপের টুঁটি চেপে ধরে। জঙ্গলে সাপ কিলবিল করছে। ধরলেই টাকা। গায়ত্রী রাইয়ের কাছে সেই টাকা মজুত। কোন জাতের ক'টা সাপ পেল আবু সেই হিসেব দাখিল করলেই হাতে নগদ টাকা। কিন্তু শুধু সাপ ধরে আর বেচে কত টাকা রোজগার হতে পারে আর কতটা সুখের মুখ দেখা যেতে পারে বাপীর সেটা ধারণার বাইরে। যে চালে চলেছে, যেন দুনিয়ার অনেকটা তার বশে এখন।

রেশমা কি করে সাপের টুঁটি মুচড়ে ধরে জানি না। কিন্তু বাপী নিজের প্রবৃত্তির টুঁটি চেপে ধরে আছে। রেশমা কতটা সুখে আছে বা কেমন করে আছে সে-খোঁজে তার কি কাজ? নিজের ওপর একটা আক্রোশের চাবুক হেনে অবাধ্য দুটো চোখ সামনের জঙ্গলের দিকে ফেরালো।

কিন্তু ওকে ফেরালে কি হবে। আর একটু এগোতে বনমায়ার গলার ঘন্টির ঠুনঠুন শব্দ রেশমার কানে গেছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছে। তারপর দাঁড়িয়েই গেছে। বাপী গম্ভীর। আবুর ডেরায় গত সন্ধ্যার মতো হাসিমস্করার সুযোগ আজ আর দেবে না। ওকে দেখে কাল অমন হা হয়ে যাওয়াটা নিজের কাছেই বিরক্তিকর বিস্ময়।

—ও বাপীভাই, সত্যি অত মন দিয়ে জঙ্গল দেখছ, না এদিকে তাকাবে না বলে?

ডাকবে জানাই ছিল। সামনে দশ হাতের মধ্যে রেশমা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। দু'-হাত কোমরে। কোমরে দু'-হাত তুলে দাঁড়ানোটা অভ্যাসের দরুন, না চটক বাড়ে বলে, জানে না। বাপীর আর সে-ভাবে দেখার দরকার নেই, ভাবারও নেই। এগোতে হলে বনমায়াকেই পাশ কাটাতে হবে। মেয়েটার সরে দাঁড়ানোর দায় নেই যেন।

কি করবে না বুঝে লছমন বনমায়াকেই দাঁড় করাল। বাপী সাদামাটা হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার, এদিকে কোথায়?

—মেমদিদির ওখানে, ওই নেপালী মেমসায়েবের মেয়েকে আমি দিদি বলে ডাকি। ঠোঁটে হাসির ঝিলিক।—আর হাঁটতে পারি না, আমাকে তুলে নেবে? তুমি তো এ রাস্তাতেই যাচ্ছ...

মুহূর্তের একটা অস্বস্তি সরোষে ঠেলে সরালো বাপী। এতেও লোভের হাতছানি। বলল, আমিও সেখানেই যাচ্ছি, তোমাদের মেমসায়েব ডেকেছেন। দরকারী কথা আছে। তার মধ্যে তোমাকে তুলে নিয়ে সেখানে হাজির হলে তিনি খুশি হবেন?

—ও...। কিছু যেন মনে পড়ল রেশমার।—তোমার তো তিনটে-চারটের মধ্যে যাওয়ার কথা ছিল শুনেছিলাম—এখন যাচ্ছ?

বাপী থমকালো একটু।—কোথায় শুনেছিলে?

—সকালে ওই মেমদিদির কাছেই। দু' চোখে কৌতূহল উপচে উঠল।—কাল রাতে তুমি নাকি কি সব বলেটলে ওই মেমসায়েবকেও ঘায়েল করে এসেছ—আর এই জন্যেই তোমার ডাক পড়েছে—সত্যি নাকি?

বাপী এবারে গম্ভীর একটু।—এও তোমার মেমদিদি বলেছে?

—হ্যাঁ, মেমদিদি কেবল আমার সঙ্গেই গল্প-সল্প করে, আর কারও সঙ্গে ভালো করে কথাও বলে না। আত্মতুষ্টিতে উচ্ছল মুখ।—সকালে ওই মেমসায়েবই হঠাৎ এসে

জিজ্ঞেস করলেন, আমি আর দুলারি তোমাকে চিনি কি না আর কতটা জানি। তক্ষুনি বলে দিলাম, আমরা খুব চিনি, খুব জানি—তুমি বেজায় ভালো মানুষ। কাল আবু সাহেব তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতেই বুঝেছিলাম কিছু মতলব আছে, ভাবীও তাই বলছিল। তাই চোখ কান বুজে তোমার প্রশংসা করে দিলাম।

হাসির ফাঁকে সাদা দাঁত ঝিকমিক করে উঠল। দুলারি নিজের দাদার বউ ছিল, তাই বোধ হয় এখনও ভাবী বলে।

রেশমার কথা শেষ হয় নি—তো মেমসায়েব চলে যেতেই হেসে হেসে মেমদিদির ওই কথা—বাইরে ভালো, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সেয়ানা ছেলে, কাল রাতে এসে মা-কে পর্যন্ত কাবু করে ফেলেছে। মা আবার বিকেল তিনটে চারটের মধ্যে তোমাকে আসতে বলেছে।

মেয়ে এর বেশি কিছু বলে নি বোঝা গেল। নইলে নিজের কদর বোঝানোর জন্যেই রেশমা তাও বলে দিত। তার দু'চোখ উৎসুক।—তোমার কাজকর্মের ব্যাপারে কথা নিশ্চয়?

বাপী আর কথা বাড়াতে চায় না। মাথা নাড়ল। তাই।

রেশমা খুশি।—যাও যাও, ডেকেছে যখন ঠিক হয়ে যাবে। অত দেরি করলে কেন? ...আমার এখন আর গিয়েই কাজ নেই তাহলে। তারপরেই দু'চোখ বড় বড়। তা মেমসায়েব ডেকেছে আর তুমি হাতিতে চেপে দেখা করতে চললে?

ওই খুশি আর বিস্ময়ের ফাঁকে মেয়েটার সরল দিকটার হদিস মিলল। এরই মধ্যে হাতের আর পায়ের রুপোর গয়নাও লক্ষ্য করছে বাপী। প্যাঁচানো একজোড়া করে সাপ মুখোমুখি। ওগুলোর জেল্লা আর রেশমার চোখের জেল্লায় খুব তফাৎ ছিল না এতক্ষণ।

বাপী সাদাসিধে জবাব দিল, হাতের কাছে পেয়ে গেলাম, হেঁটে লাভ কি।

এবারে রাস্তার মাঝখান থেকে সরে দাঁড়াল। হাতিতে চেপে মেমসায়েবের কাছে যাচ্ছে দেখেই হয়তো মুখে মজার ছোঁয়া।

বনমায়া আবার চলল। বাপী আর ওদিকে চোখ ফেরালো না। চোখ দুটো অবাধ্য হতে চাইছে বুঝতে পারছে। যে চাইছে তার গলা টিপে ধরলেও একেবারে শেষ হয় না কেন?

বাড়িটা আর পঞ্চাশ-ষাট গজের মধ্যে। সামনের বাঁক ঘুরলেই। বাপী লছমনকে দাঁড়িয়ে যেতে বলল। এর পরের হুকুম শুনে লছমনও অবাক। বাঙালীবাবু ওকে নামতে বলছে।

নামল।

গম্ভীর মুখে বাপী বলল, তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি ওই নেপালী মেমসায়েবের বাড়ি যাচ্ছি। সেখানে বনমায়াকে ছেড়ে দেব। এখান থেকে লক্ষ্য রেখো, ও নিজে থেকে ফিরে না এলে পাঁচ-সাত মিনিট বাদে তুমি এসে ওকে নিয়ে চলে যেও।

নেপালী মেমসায়েবকে এখানে আর কে না চেনে-জানে। কিন্তু বাঙালীবাবুর এ-রকম আদেশের কিছু মাথামুণ্ডু ভেবে পেল না লছমন। সঙের মত দাঁড়িয়ে রইল।

মেয়ে বারান্দার সামনের দিকেই মুখ করে দাঁড়িয়ে। দূরের জঙ্গল বা মেঘ বা পাহাড় কিছু দেখছিল। আজ আর পরনে শাড়ি নয়, পা পর্যন্ত ধূসর রঙের গাউন। এই বেশে

আরও কচি দেখায়। পিছনের টেবিলে মা ফাইল-টাইল কিছু দেখছে।

বনমায়া এসে লতা-ছাওয়া বাঁশের বেড়ার ও-ধারে দাঁড়াতে ঊর্মিলা রাই হতবাক প্রথম। তারপরেই পিছন ফিরে অস্ফুট বিস্ময়ে মায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করল বোঝা গেল। তারও দু'চোখ গোল একেবারে।

বাপী এটুকুই চেয়েছিল। ওই দু'জনকে অবাক হতে দেখে ওর মুখে সহজ সরল হাসি। হাতির পিঠে উঠে দাঁড়িয়েই দু'হাত কপালে তুলে গায়ত্রী রাইয়ের উদ্দেশে নমস্কার জানালো। তারপর শুঁড় বেয়ে তর তর করে নেমে এলো। শুঁড় ঠেলে তুলে চাপা গলায় পরিচিত ইশারা করতেই বনমায়া একেবারে কপালের ওপর উঁচিয়ে ওই মা-মেয়েকে দু'জনকেই লম্বা সেলাম জানালো।

মেয়ে অবাক যেমন খুশিও তেমনি। মা-টি অপলক চোখে দর্শনীয় কিছু দেখছে।

শব্দ করে আর শুঁড় ঘুরিয়ে বাপী বনমায়ার মুখটা এবারে ওই বাঁকের দিকে ফিরিয়ে দিল। বারান্দার দু'জনকে শুনিয়ে জোরে দুটো চাপড় মেরে বলল, যা—এবার ঘরে যা শীগগির।

ওকে ছেড়ে লতা-ঢাকা বাঁশের গেট পেরিয়ে হাসিমুখে সোজা বারান্দায় এসে উঠল। মা-মেয়ে দু'জনে ওকেই দেখছে এখনও। মেয়ের চোখেমুখে তেমনি মজা-লাগা বিস্ময়। মা'টি অপলক গম্ভীর।

—ঘড়িতে ক'টা এখন? গায়ত্রী রাইয়ের গলার স্বর নীরস।

থতমত খাওয়াটা গোপন করার দরকার নেই আর। হাতঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে মুখের দিকে চেয়ে বাপী আরও একটু ঘাবড়ে গেল যেন।—পাঁচটা...আমার একটু দেরি হয়ে গেছে বোধ হয়।

—তোমাকে তিনটের থেকে চারটের মধ্যে আসতে বলা হয়েছিল। হাতি ছাড়া চলাফেরা করতে পার না?

—ইয়ে, আবু বলেছিল হয়তো...আমি ঠিক খেয়াল করি নি। মুখে সরল হাসি। পিছনে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই হাতির জন্যেই তো আরও দেরি—পাঁচ-ছ' বছর বাদে দেখে শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে রাখল—কিছুতে ছাড়বে না। শেষে ওর পিঠে চেপেই চলে এলাম।

ঊর্মিলা এগিয়ে এসে মায়ের কাছ ঘেঁষে দাড়াল' উৎসুক। জিজ্ঞেস করল, ও জঙ্গল আপিসের হাতি বনমায়া নয়?

বাপী মাথা নেড়ে সায় দিল।

ওখান থেকেই মেয়ে সকৌতুকে হাতিটাকে ভালো করে দেখে নিল একবার।—ও তো এক নম্বরের পাজী হাতি—প্রত্যেক বছর জঙ্গলের কোন একটা ইয়ের সঙ্গে পালায় শুনেছি। ফর্সা মুখ লাল একটু।—আপনার সঙ্গে ওর খুব খাতির বুঝি?

—হ্যাঁ, ও আমাকে খুব ভালোবাসে। পাজী হাতি বলাটা বাপীর যেন একটু পছন্দ হল না। সেই ভীমবাহাদুরের মতো করে বলল, পালালেও বনমায়া খুব ভালো মেয়ে।

ঊর্মিলা খিলখিল করে হেসে উঠল। পরনে শাড়ি নেই যে মুখ চাপা দেবে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে হাসি চাপার চেষ্টা। অত হাসির কারণ বোঝার চেষ্টায় বাপীর মুখে বোকা-বোকা হাসি। কিন্তু দৃষ্টি বেশির ভাগ গায়ত্রী রাইয়ের মুখের ওপর। মা-ও যেন মেয়ের

অত হাসি দেখে অখুশি নয়। হয়তো ও-রকম হাসতে কমই দেখে। কিন্তু তার নিজের মুখের গাম্ভীর্য একটু শুধু হাল্কা হল, তার বেশি কিছু নয়।

হাসি শেষ হলেও তার রেশ একটু লেগেই থাকে। উর্মিলা উৎফুল্ল মুখে বলল, আমার একদিন আপনার ভালো মেয়ের পিঠে চড়ার ইচ্ছে—ব্যবস্থা করতে পারেন?

বাপী অম্লান বদনে মাথা নাড়ল, পারে।—আবুকে বললেই তো হয়, যেদিন খুশি আপনারা দু'জনে জঙ্গলে বেড়িয়ে আসুন, হাতির পিঠে জঙ্গলে বেড়াতেই বেশি ভালো লাগে।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের দু'চোখ কপালে।—মায়ের সঙ্গে হাতিতে! ভাবলেও হেসে সারা হবার মতো কিছু যেন। এবারের হাসি সামলানোর তাগিদে তাড়াতাড়ি ঘরেই ঢুকে গেল।

বাপী আবারও বোকার মতো সেদিকেই চেয়ে রইল। গায়ত্রী রাই চুপচাপ ওকেই লক্ষ্য করছে জানে।...এই মুখে নিছক সরলতা ছাড়া আর কিছু পাবে না, তাও জানে। এবারে তার দিকে চেয়ে বাপী আন্তরিক প্রশংসার সুরে বলল, আপনার মেয়েও অবিকল বাঙালীর মতোই ঝরঝরে বাংলা বলেন।

—আমার মেয়ে নিজের ভাষার থেকেও ভালো বাংলা বলে। বাচ্চা বয়েস থেকে এ-দিকে থেকে বড় হয়েছে, শুরু থেকে স্কুল কলেজে বাংলা পড়ে এসেছে, বলবে না কেন?...তা হাতির পর তুমি ভাষা নিয়ে আলোচনা করবে না কাজের কথা কিছু হবে?

—ইয়ে, না বলুন।

—চাকরি করবে?

আজ কোনো বাঁকা রাস্তায় না গিয়ে সোজা জবাব দিল, আপনি দিলে খুশি হয়ে করব।

গায়ত্রী রাই কিছু বলার আগে ভিতর থেকে মেয়ে আবার এসে হাজির। সামনের দিকে একবার তাকিয়েই বলে উঠল, আপনার ভালো মেয়ে সত্যি নিজেই ঘরে চলে গেল নাকি?

বাপীর জবাব দেবার ইচ্ছে ছিল বুনো হাতির সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে দূরের জঙ্গল থেকে ভালো মেয়ে তার খুশিমতো নিজেই আবার ঘরে ফেরে। কিন্তু আর হাল্কা কথার ধার দিয়েও গেল না। ঘুরে পিছনটা দেখে নিল একবার। বনমায়াকে আর দেখা যাচ্ছে না বটে। তবু কি ভেবে আধা-সত্যি কথাই বলল।—ওর মাহুত লছমনকে আসতে বলেছিলাম, হয়তো নিয়ে গেছে...নিজেও যেতে পারে।

মেয়ে মায়ের পাশের চেয়ারটা টেনে বসল। সেদিকে চেয়ে গায়ত্রী রাই বলল, আমরা দরকারী কথা বলছিলাম—

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরও ভ্রূকুটি!—বিজনেস না পারসোনাল?

—বিজনেস।

—এরপর তাহলে আমাকে তোমার বিজনেসে মন দেওয়ার কথা আর বোলো না। চেয়ার ঠেলে উঠতে গেল।

—সীট ডাউন! মায়ের কড়া ধমক।—আমি যেতে বলিনি, বাজে কথা বলতে বারণ করছি।

মেয়ে আবার ঝপ করে বসে পড়ল। কনুই দুটো টেবিলের ওপর, হাত দুটো দুই

ফোলা গালে।...অল রাইট, গো অ্যাহেড।

মায়ের ওপর মেয়ে বিরূপ কত, এটুকু থেকে কিছুটা আঁচ পাওয়া গেল।

মেয়ের দিকে চেয়ে গায়ত্রী রাই বলল, ও কাজ করবে বলছে আমিও নেব ভাবছি...

ঊর্মিলা সেই রকম বসে, দু'জনের মাঝখান দিয়ে সোজা সামনের দিকে চোখ। ঠোঁট উল্টে জবাব দিল, নেবে যে সে তো কাল রাতেই ঠিক করে ফেলেছ, তার আর কি কথা, নিয়ে নাও।

মায়ের রুষ্ট ঝাপটা। ডলি ডোন্ট বি সো ইমপসিবল্!

...মেয়ের ডাকনাম ডলি বোঝা গেল। চেহারার সঙ্গে এ নাম মন্দ মানায় না। ফুটফুটে রং, লালচে ঠোঁট, ফোলা গাল, কাঁধছোঁয়া বব-কাট চুল। কিন্তু বাইরেটা দেখে ভিতরে ডল-এর ভাগে যে এত ঘাটতি ঠাওর করা শক্ত। হাসলে বিপদ। বাপীর গোবেচারা মুখ।

তা সত্ত্বেও গায়ত্রী রাইয়ের দু'চোখের উষ্ণ আঁচ একটু ওর ওপরেও এসে পড়ল। —নিয়ে নেবার ব্যাপারে তুমিই গোল পাকিয়ে রেখেছ। আজ সকালে চালিহার সঙ্গে কথা হল। ওয়েস্ট বেঙ্গল রিজিয়নের জন্য একজন লোককে ট্রেনিং দিয়ে ঠিক করে নেওয়া দরকার বুঝিয়ে তাকে তোমার কথা বলেছি। কিন্তু চালিহা অন্য লোক দেবার কথা বলছে, তোমার কালকের ব্যবহারে সে একটুও খুশি নয়।

ওয়েস্ট বেঙ্গল রিজিয়ন শুনেই বাপীর বুকের তলায় নাড়াচাড়া পড়ল একপ্রস্থ। যতটুকু বুঝেছে এদের কাজের বিস্তার বেশির ভাগ উত্তর বাংলায় আর তার বাইরে। এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল বলতে খুব সম্ভব কলকাতার বাজারই আসল। কিন্তু আবার সেই কলকাতা! চিন্তাটা বাপী ছেঁটে দিল। চালিহাকে শুধু বোঝানো হয়েছিল কি-জন্যে লোক দরকার। আসলে কি-জন্যে দরকার তা এক চালিহা বাদে বাকি সবলেই জানে।

কিছু বুঝে নেবার মতো করে বাপী জিজ্ঞাসা করল, এ-কাজের জন্য আপনি যে আমাকে পছন্দ করেছেন সেটা কি মিস্টার চালিহা মোটামুটি আঁচ করতে পেরেছেন?

—হ্যাঁ। আমি তাকে বলেছি, বাড়ির টানে ওইরকম টানা-হেঁচড়া করেছে আর যা বলার বলেছে। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু চাকরির কথা উঠতে অনেক নরম হয়ে গেছে। এ-লাইনে ইন্টারভিউ করে মনে হয়েছে আমরা ভালো কাজ পাব, এ কথাও তাকে জানিয়েছি। তবু চালিহা খুব একটা সায় দেয় নি, আর একটু ভেবে দেখতে আর যাচাই করে নিতে পরামর্শ দিয়েছে। আর এক দফা ইন্টারভিউর জন্য আজ আবার তুমি আসছ তাও সে জেনে গেছে।

একটু চুপ করে থেকে বাপী বলল, আপনি তাহলে এখন চান আমাকে নেবার ব্যাপারে তিনিও খুশি হয়ে সায় দিন?

গায়ত্রী রাই অল্প মাথা নাড়লেন।—সে আমার বিজনেসের চিফ। শুরু থেকে তোমার এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট আপত্তির চোখে দেখলে অসুবিধে, সায় থাকলে ভালো হত—

বাপীর এবারের জবাব নির্লিপ্ত, কিন্তু দ্বিধাশূন্য।—তাই হবে!

গায়ত্রী রাই ঠিক বুঝে উঠল না।—কি তাই হবে?

—আমাকে নেবার জন্য দুই এক দিনের মধ্যে তিনিই আপনার কাছে সুপারিশ করবেন।

এবারে মেয়েরও টেবিল ছেড়ে সোজা হয়ে বসে এই লোককে আর একটু ভালো করে দেখার দরকার হল। গায়ত্রী রাইয়ের চাউনি স্থির, কিন্তু মুখে বিস্ময়ের আঁচড়। —কি করে?

একই সঙ্গে মেয়েও ফস করে জিজ্ঞাসা করল, আঙ্কল চালিহাকে ঘুষ দেবেন?

তার দিকে চেয়ে বাপী হাসল একটু।—ঘুষ অনেক রকমের হয়। আপনি যে ঘুষের কথা বলছেন তার টাকা আমার পকেটে থাকে না। মায়ের দিকে ফিরল।—কি করে, আমি এখনো সেটা জানি না, তবে আপনার সায় আছে এটা যখন তিনি বুঝে গেছেন, তাঁরও সায় পাবার ব্যবস্থা আমি করতে পারব—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

এই জোর কোথা থেকে পেল বাপী জানে না। কিন্তু পেল যে তাতে নিজেরও এতটুকু সংশয় নেই। ওর মুখের দিকে চেয়ে মা-মেয়েও এই জোরেরই হদিস খুঁজছে।

বাপীর ভিতরে ভিতরে হঠাৎ আবার শুরু থেকে সেই উঁচু পাটাতনে দু' পা রেখে দাঁড়ানোর তাগিদ। কর্ত্রী-কর্মচারী সম্পর্কটাকেই গোড়ায় নাকচ করার ঝোঁক। মুখখানা একটু কাঁচুমাচু করে তার দিকে তাকালো।—এবারে আমি একটা কথা বলেই ফেলি?

তক্ষুনি মহিলার মালিকের মুখ, মালিকের চাউনি।—টাকা পয়সার কথা?

বাপী অপ্রস্তুত।—সে কি! আপনার ওপর ছেড়ে দিয়েছি যখন ও তো আপনার ভাবনা। হাসল।—আমার চাওয়াটা তার থেকে অনেক কম। বিকেলে চায়ের অভ্যেস, এখনো পর্যন্ত এক পেয়ালাও জোটে নি। ভাবছিলাম, বলাটা ধৃষ্টতা হবে কিনা—

মেয়ে ছেলেমানুষ সে হেসেই ফেলল। তার গুরুগম্ভীর মা-টিকে এমন উল্টোপাল্টা পরিস্থিতির মধ্যে আর কখনো পড়তে দেখে নি। উঠতে যাচ্ছিল, ওই মা-ই ইশারায় নিষেধ করল। আর এক দফা সামনের ছেলের মুখখানা দেখে নিয়ে ভিতরের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে জোরেই ডাকল, কোয়েলা!

পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে যে রমণীটি সামনে এসে দাঁড়ালো তাকে দেখে বাপীর দু'চোখ বড় রকমের হোঁচট খেল একপ্রস্থ। কোয়েলা মানে যদি স্ত্রী-কোকিল হয় তাহলে মেয়েজাতের দিক থেকে আর গায়ের রঙের দিক থেকে মেলে অবশ্য। কিন্তু গায়ে-গতরে এমন জাঁদরেল মেয়েমানুষ কমই চোখে পড়ে। বাপীর মনে হল তাকেও আলতো করে তুলে ধরে বারান্দার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে। পরনে খাটো গাউন। কোমর বেড়িয়ে একটা মোটা এপ্রন গোঁজা। বইয়ের পাতার গাবদা আদিবাসিনীর মূর্তি। প্রমীলা-পরিবারের প্রহরী হবার মতোই।

নাম কোয়েলা!

—তিন পেয়ালা চা। কুইক।

নতুন মানুষের মুখের ওপর একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে হেলে-দুলে কোয়েলা আবার ভিতরে ঢুকে গেল। যাবার আগে সুইচটা টিপে দিয়ে গেল। দিনের আলোয় টান ধরেছে। বাপী সোজা না তাকিয়েও লক্ষ্য করছে, তিন পেয়ালা শুনেই মেয়ে যেন মায়ের মুখে না হোক চোখে একটু প্রশ্রয়ের বিরল আভাস দেখতে পাচ্ছে।

সেটুকুও গোপন করার জন্যেই হয়তো গায়ত্রী রাই ভুরু কুঁচকে তাকালো।—শুধু চা, না এরপর বলবে খিদে পেয়েছে?

লজ্জা পেয়ে বাপী হাসল।—না তা বলব না, দুপুরে ডাটাবাবু ভালো খাইয়েছে।

গায়ত্রী রাই তক্ষুনি কাজের কথায় চলে এলো—তোমার থাকার ব্যবস্থা কি হবে?

বাপী সবিনয়ে জবাব দিল, আমার সব ভার আপনি নিচ্ছেন, এটুকুও নিন...ওখানে এক রাত থেকেই আমার হাঁপ ধরে গেছে।

—কেন? ওখানকার অ্যারেঞ্জমেন্ট তো খুব ভালো শুনেছি, আর তোমার বিল তো আমিই পেমেন্ট করব বলে দিয়েছি?

—তা বলেছেন কিন্তু অত ভালো বলেই আমাদের মতো লোকের কাছে অস্বস্তি। বুদ্ধি করে আরো একটু যোগ করল।...রাতে জানলা খোলা থাকলে লিকারের গন্ধ ঘরে আসে—

এই জবাবে অখুশি নয় মনে হল বাপীর।

কোয়েলা ট্রে-তে তৈরি চায়ের পট আর পেয়ালা রেখে গেল। ঊর্মিলা উঠে দাঁড়িয়ে পেয়ালায় চা ঢালল। যে যার পেয়ালা টেনে নেবার পর গায়ত্রী রাই বলল, কিন্তু এখানে আবার একটা পার্টিশন দিয়ে ঘর তুলতে গেলে বিচ্ছিরি হবে—

নিজের পেয়ালাটা হাতে করে বাপী উঠে দাঁড়াল। তারপর বারান্দার এদিকে এসে পাশের খালি জমিটুকু দেখে নিল। মায়ের সামনে এই সহজতাটুকু মেয়েটার লক্ষণীয় বস্তু। ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসে বাপী বলল, মাঝখানে কাঠ বা ইঁটের পার্টিশন দিতে গেলে বিচ্ছিরিই হবে, মালীকে দিয়ে মেহেদীর উঁচু ঝাড় সমান করে ছেঁটে নিয়ে বসালে খারাপ দেখতে হবে না। পার্টিশনের কাজ হবে আবার দু'দিকে ফুলটুল ফুটলে দেখতেও ভালো হবে। সামনে একটা ঘর, পিছনে একটু কিচেন আর বাথ, সামান্য জায়গাই নেবে। মেহেদীর পার্টিশান করলেও দু'দিকে কিছু জায়গা ছাড় থাকবে।

এরকম পার্টিশনের কথা গায়ত্রী রাই ভাবে নি। এ ছেলের মাথা কত দিকে খেলে তাই দেখছে। একটু চুপ করে থেকে বলে, সে যা হয় দেখা যাবে, চালিহার সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি। ঘর তুলে দিলেও তো আর দু'দিন চারদিনে হচ্ছে না, আপাতত তোমাকে ওই ক্লাবেই থাকতে হচ্ছে।

—থাকব।

—বাট সাপোজ, ঘর তুলে দিয়ে ওদিকটা তোমাকে ছেড়ে দিলাম, আর এদিকটা যেমন আছে তেমনি আমি কিনে নিলাম...তাহলে আপত্তি হবে?

এবারে লুব্ধ হবার মতোই প্রস্তাব বটে। কিন্তু বাপীর হঠাৎ কেমন মনে হল এটা লোভের টোপ হতে পারে। আবু মহিলার কাছে ওকে নির্লোভের সার্টিফিকেট দিয়ে গেছে। সেটা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে এই উদার প্রস্তাব কিনা বলা যায় না। তাছাড়া, ভাগ্যের ছকে বড় দান যদি কিছু পড়ে থাকে তো এই পৈতৃক ভিটের দৌলতেই পড়েছে। মন বলছে লোভে পড়লে ভুল হব।

বাপীর মুখে বিড়ম্বনার হাসি। খুব নরম করে জবাব দিল, বিক্রী করবার দরকার হলে আপনাকেই আমি সবার আগে বলব।...আমার বাবা অনেক কষ্টে এখানে মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই করেছিলেন, এই বাড়িতে আমি জন্মেছি...বেচে দেব ভাবতে খারাপ লাগে। আপনি আপনার নিজের বাড়ি মনে করেই এখানে থাকুন না।

মেয়ে এবারে একটু শব্দ করেই বেতের চেয়ারটা ঠেলে উঠে দাঁড়াল। বলল, ফার্স্ট ডিভিশন—!

মেয়ের হঠাৎ এই আচরণ বা মন্তব্যের জন্য প্রস্তুত ছিল না মহিলা। জিজ্ঞেস করল, কি...?

বলছি একেবারে ফার্স্ট ডিভিশন। ইউ নিডন্ট গো ফারদার এবারে ছেড়ে দাও, হাঁপ ফেলে বাঁচুক। হাসি চাপার চেষ্টা।

—আঃ ডলি! ডোন্ট বি সিলি! কিন্তু মুখখানা তটা কড়া করে তোলার চেষ্টা ততোটা পারা গেল না যেন। আর অনুশাসনও বাপীর কানে তেমন জোরালো ঠেকল না।

সামনে জঙ্গল, তাই বানারজুলির এদিকটায় সন্ধ্যে হতে না হতে ঘন অন্ধকার। ফেব্রুয়ারি মাস, ছ'টা বাজতে না বাজতে সন্ধ্যা। বাইরে পা দিয়ে বাপী তরফদার অন্ধকারের মধ্যে পড়ল, আর শীতের ঝাপটা খেল। কলকাতার তুলনায় এখনো বেশি ঠাণ্ডা এখানে।

পরনে কাল রাতেও শুধু পাজামা পাঞ্জাবি ছিল। কিন্তু কাল রাতে এতটা টের পায়নি, অথবা আবুর কড়া মেজাজের মুখে পড়ার ফলে খেয়াল করে নি। বাপীর হাসি পেল হঠাৎ। আরামের শরীরে শীত-গরম কিছুই সয় না। বাপী কি তাহলে আরামের মুখ দেখতে চলল? আসলে দিনের রোদে বেরুনোর সময় গরম জামা সঙ্গে নেবার কথা মনে থাকে না। থাকবে কি করে, মাথার তো আর বিশ্রাম নেই।

জোরে পা চালিয়ে যে শরীর গরম করবে তারও উপায় নেই। অন্ধকারে ঠোক্কর খাবার ভয়। টর্চ আনতেও ভুলেছে। বাক্স থেকে টর্চটা বারই করা হয় নি। ব্যাটারি আছে না ফুরিয়েছে তাও জানে না।

বাঁক ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে সোজা মুখের ওপর এক-ঝলক জোরালো আলো। চোখ ধাঁধিয়ে উঠল। অন্যমনস্কতার দরুন চমকেও উঠল। দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু বড় টর্চের ঝাঁঝালো আলো চোখের ওপর থেকে নড়ছে না, কাছ থেকে আরো কাছে এগিয়ে আসছে।

—আঃ! টর্চটা সরাও, চোখ দুটো গেল যে! সামনে একটা হাত আড়াল করে বাপী দেখে নিয়েছে।

আবু দাঁড়িয়ে। তার এক হাতে আজ একটা মস্ত টর্চ, অন্য হাতে লাঠি। পরনে খাকী ট্রাউজার, গায়ে পুরো হাতার গলাবন্ধ মোটা গেঞ্জি। বলা সত্ত্বেও মুখের ওপর থেকে টর্চটা সরল না। খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে। একটু বেশি গম্ভীর।

—কি মুশকিল! ওর রকম-সকম দেখে বাপী হেসে ফেলল।—শিকারের টর্চ ফেলে আমার চোখ দুটো কানা করে লাভ কি!

আবু টর্চ নামাল। কিন্তু এমন করে ধরল যাতে মুখ আর পথ দুইই দেখা যায়। সঙ্গ নিয়ে বলল, মেমসায়েব তোমাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দেয় নি তাহলে?

বাপী হাসছে।—তুমি সেই রকম আশা করেছিলে?

আবু চুপ একটু। তারপর আবার প্রশ্ন।—আমি পই পই করে তোমাকে সাড়ে তিনটের মধ্যে চলে যেতে বলেছিলাম—সে জায়গায় তুমি পাঁচটায় গিয়ে হাজির হয়েছিলে?

—দেরিই হয়ে গেল। তোমাকে কে বলল?

কোনো জবাব দেবার মেজাজ নয় এখন আবু রব্বানীর। আবার প্রশ্ন।—আর, তুমি হাতির পিঠে চেপে মেমসায়েবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে?

বাপী একটু জোরেই হাসল এবার। বলল, দেখে দু'জনেরই তাক লেগে গেছল, লছমনটাকে তো ওই বাঁকের খানিক আগেই নামিয়ে দিয়েছিলাম। বনমায়াকে দেখে তোমাদের বাচ্চা মেমসায়েবের ওর পিঠে চাপার ইচ্ছে একদিন। আমি বললাম, আবুই মুরুব্বি, তাকে বললেই হবে।

আবুর হাতের টর্চ আবারও মুখের ওপর উঠে এসে তারপর নামল। অর্থাৎ ভালো করে আর এক দফা দেখা দরকার হয়েছে। ফোঁস করে একটা বড় নিঃশ্বাস ছাড়ল। —নাঃ, মেমসায়েবকে যা-ই বলে আসি না কেন, তোমার চরিত্তির বোঝা এই মোল্লারও কাজ নয় আর।

বাপীর হেসেই জিগ্যেস করল, দেরিতে আসা আর হাতিতে চেপে আসার খবর তোমাকে কে দিলে—রেশমা?

—জানো তো সবই, আর জিগ্যেস করো কেন?

—বাঃ, তোমার রাগের কি হল?

—পাঁচটায় গিয়ে হাজির হলে, মেমসায়েব কিছু বলল না?

—রাগ করল।

—আর তুমি?

—শুনলাম। দেখলাম। তুমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে?

—কম করে এক ঘণ্টা। আসার মাঝে মাঝরাস্তায় রেশমার সঙ্গে দেখা। তুমি তার মাত্র মিনিট দশেক আগে হাতি চেপে মেমসায়েবের সঙ্গে দেখা করতে গেছ শুনেই আমার মাথা খারাপ হবার দাখিল। কি হল না হল, দয়া করে বলবে এখন?

বাপী তাকে আশ্বস্ত করল, সব ঠিক আছে কিছু ভেবো না।

কি-রকম ঠিক আছে খুঁটিয়ে শুনল। এ ব্যাপারে যেমন ধৈর্য তেমনি মনোযোগ। মেমসায়েবের আচরণ আবুর কাছে নতুন কিছু নয়। কিন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার মেয়ের কাণ্ড শোনার ফাঁকে ফাঁকে হেসে উঠেছে। আর বাপীকে সাবধান করেছে, খবরদার খবরদার! তুমি পছন্দ করলেও মরেছ, মেয়ে পছন্দ করলেও মরেছ!

এত কথার ফাঁকে ক্লাবের কাছাকাছি এসে গেছে। বাপী থামতে আবারও দুশ্চিন্তা। —সবই তো ভালো, কিন্তু ওই ম্যানেজার তোমার জন্য সুপারিশ করবে বলে এলে তার কি হবে?

—করবে। ক্লাবে রোজই আসে তো।

—এখানে থাকলে আসে। টর্চের আলোয় আবু হাতঘড়ি দেখে নিল।—তার আসতে আটটা সাড়ে আটটা, এখনো ঢের দেরি। তখন আবার মদের গেলাস নিয়ে জুয়ায় বসে গেলে নড়ানো যাবে না। ডাকাডাকি করলে উল্টে বিরক্ত হবে। তার থেকে তার বাড়িতে যাও না, কাছেই—

কথাটা ভাবার মতো। মদ খেলে মতিগতি কেমন হয় বাপীর সেটা খুব ভালো জানা নেই। ঘোর-লাগা অবস্থায় রতন বণিককে দেখেছে। তবে সে লোকটা নির্বিষ ভালো মানুষ। কিন্তু মেজাজী বা প্যাঁচালো মানুষের কথা বলা যায় না। আবুর বাবা কালুকেই হাড়িয়া গিলে ছেলের ওপর হম্বিতম্বি করতে দেখেছে।

—তাই চলো।

ক্লাবের পাশ দিয়ে রাস্তা। এই এলাকায় দু'ঘরের একটা কনট্রাকটার কোয়ার্টার্স ভাড়া নিয়ে থাকে। বাপী বলল, কারো সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে যদি ক্লাবে এসে গিয়ে থাকে—দেখেই যাই।

দেখতে এসে আর এক মুশকিল। বারান্দায় পা দিতেই ব্যস্তসমস্ত ডাটাবাবু এগিয়ে এলো। মাথা চুলকে যে সমাচার জানালো শুনে আবুর মেজাজ খাপ্পা। চা-বাগানের এক ছোকরা অফিসারের বন্ধু হঠাৎ সস্ত্রীক ডুয়ার্স থেকে এসে গেছে। অফিসার তাদের আপাতত বাপীর পাশের ঘরে তুলেছে, আর ডাটাবাবুকে অনুরোধ করেছে, পরিবার নিয়ে থাকবে, ওই কোণের ঘরটা তাদের ছেড়ে দিলে ভালো হয়।

আবু খেঁকিয়ে উঠল, ও-ঘরে গেস্ট আছে শুনেও ছাড়তে বলে কি করে? আপনি বললেন না?

—বলেছি। মেয়েছেলে নিয়ে থাকা, তাই অনুরোধ করেছেন। রাজি না হলে বলে দেব। হুট করে মেয়েছেলে নিয়ে কেউ হাজির হবে আমিই কি ভেবেছি, সচরাচর তো এ-রকম হয় না।

বাপী বুঝল, চা-বাগানের অফিসারের গেস্ট বলেই ডাটাবাবু একটু বিপাকে পড়েছে। তাদেরই দাবী আগে। আবুকে থামিয়ে বাপী তাকে নিশ্চিন্ত করল।—ঠিক আছে, আমরা এক্ষুনি বেরিয়ে যাচ্ছি, আপনি কাউকে দিয়ে আমার বাক্স আর বিছানা এ-ঘরে এনে দিয়ে তাদের কোণের ঘরেই যেতে বলুন।

ডাটাবাবু কৃতজ্ঞ।

চালিহা ক্লাবে আসে নি। আবুকে সঙ্গে করে বাপী কোণের ঘর খুলে দিল। ভিতরে ঢুকে টেবিল থেকে কলমটা তুলে নিয়ে একটুকরো কাগজে গোটা গোটা করে লিখল, বাপী তরফদার—ফ্রম মিসেস গায়ত্রী রাই।

আবু জিজ্ঞেস করল, এ দিয়ে কি হবে?

—আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব, আগে তুমি গিয়ে এটা চালিহার হাতে দেবে।

বেরিয়ে আসতেই পাশের ঘরের অতিথিটির মুখোমুখি। নিজের ঘরে ঢোকার সময় দরজা বন্ধ দেখেছিল, এখন খোলা। দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। অবাঙালী বিহারী-টিহারী হবে। মোটা কালো মুখশ্রী দেখলে দ্বিতীয়বার তাকাতে ইচ্ছে করবে না। ড্যাবডেবে চোখে লোকটা ওদের দিকেই চেয়ে আছে। তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে এসে আবু অস্ফুট কটূক্তি করে উঠল, এই চেহারা নিয়ে বউয়ের সঙ্গে রস করার জন্যে শালার কোণের ঘর চাই!

বাপীও হালকা মন্তব্য করল, বউ নিশ্চয় সুন্দরী, তাই যেটুকু সম্ভব চোখের আড়ালে রাখতে চায়।

রসের ঠাট্টায় আবুও কম যায় না। তক্ষুনি বলল, মরদের যা ছিরি, তুমি সাবধান তাহলে। তোমার সঙ্গে মেয়েছেলের একটু বেশি যোগ দেখছি। একদিকে মেমসায়েব আর তার মেয়ে ঘায়েল, এদিকে ক্লাবে পরিবার সঙ্গে করে অতিথি আসে না বড়, তুমি এলে আর ওমনি একজন এসে হাজির!

ডাটাবাবুকে চাবি দেবার জন্য বাপী তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। আবুর ঠাট্টা বুকের কোথাও বেঁধার মতোই। আবুর জানার বাইরেও আরো চার-চারটে মুখ আছে। গৌরী

বউদি, ব্রুকলিন বড়বাবুর মেয়ে উষা, কমলা ব্যাংক...মিষ্টি। মিষ্টি...? হ্যাঁ মিষ্টির সম্পর্কেও আরো কিছু ভাবার আছে, কিন্তু ভাবনাটাকে এ পর্যন্ত সে জোর করে ঠেলে সরিয়ে রেখেছে।

রাস্তায় নেমে আবু জিজ্ঞাসা করল, তোমার এখন মতলবখানা কি? ম্যানেজারের হাতে-পায়ে ধরবে?

—সেই গোছেরই কিছু করতে হবে। দেখবেই তো।

এখানেও বাইরের ঢাকা বারান্দায় বসার জায়গা। জোরালো আলো জ্বলছে। সেখানে মাঝবয়সী একজন দাঁড়িয়ে। আবু চেনে তাকে। ম্যানেজার সায়েবের কমবাইনড হ্যাণ্ড। অসমীয়া। নাম অর্জুন। বারান্দার পর ভিতরে একটু প্যাসেজের মতো। প্যাসেজের দু'দিকে দুটো মুখোমুখি ঘর। বারান্দায় ওঠার পর বাপী লক্ষ্য করল, একটা ঘর থেকে প্যাসেজে সবুজ আলো এসে পড়েছে। বারান্দায় চড়া আলো, তাই লক্ষ্য না করলে চোখে পড়ে না।

আবুর ইশারায় বাপী নামের স্লিপ লোকটার হাতে দিল। কিন্তু ওটা হাতে নিয়েও তার নড়াচড়ার ইচ্ছে দেখা গেল না।

আবু জিজ্ঞেস করল, সায়েব নেই বাড়িতে?

—আছেন। পার্টির লোকের সঙ্গে কথা কইছেন। ব্যস্ত আছেন—

এবারে হুকুমের সুরে আবু বলল, এই সাযেব মালকানের কাছ থেকে আসছেন, এটা তাঁকে দিয়ে এসো।

লোকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও গেল। মিনিট খানেকের মধ্যেই রণজিৎ চালিহা বেরিয়ে এলো। পরনে চকচকে লুঙ্গি আর হালকা-নীল গরম কাপড়ের ফুল হাতার শার্ট। ফর্সা মুখ বেশ লাল। আসামাত্র বাপীর মনে হল ঘরে বসেই মদ্যপান চলছিল। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁ করে গন্ধও নাকে এলো।

বাপীর বিনীত নমস্কারের জবাবে রণজিৎ চালিহা একটু চড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?

বাপী শুকনো গলায় জবাব দিল, মিসেস রাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে বললেন, তাই অসময়ে...

—আমার সঙ্গে দেখা করতে বললেন? কখন?

—আজই তো মনে হল, এতক্ষণ তাঁর ওখানে ছিলাম, সেখান থেকেই আসছি।

ভুরু কুঁচকে চালিহা একবার আবুকে দেখে নিল। তারপর নিজে একটা চেয়ার টেনে বসে বাপীকে বলল, সীট ডাউন—কি ব্যাপার?

হুকুম পেয়েও বাপী বসল না। মুখ দেখে মনে হবে, বেয়াদপীর সাহস আজ আর নেই।—বলছি...কিন্তু তার আগে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, বাড়ির চিন্তায় কি বলে ফেলেছি না ফেলেছি, ঠিক নেই, আমার অন্যায় হয়েছে—

লোকটার নেশা হয়তো এখনো তেমন জমেনি। বাঁকা চোখে খানিক চেয়ে চেয়ে দেখল ওকে। জিজ্ঞেস করল, এখন আর বাড়ির চিন্তা নেই?

—আজ্ঞে না, মিসেস রাইকে কথা দিয়ে এসেছি, আপনি যা ঠিক করে দেবেন, তাই হবে।

—আমি?

—হ্যাঁ।

ঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেখা স্পষ্ট হল এবার। কলে-পড়া ইঁদুরের মুখ দেখছে যেন।
—ওয়েল, আই অ্যাম বিজ়ই নাও, শুট্!

একই রকম নিরুচ্ছ্বাস বিনয়ে বাপী বলল, একটা কাজের জন্য মিসেস রাই গতকাল আর আজ দু'দিন আমার ইনটারভিউ নিলেন, আপনারা আমার জন্য এতটা চিন্তা করবেন ভাবতেই পারি নি। মিসেস রাই আজ জানালেন, তাঁর কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এ-ব্যাপারে ফাইন্যাল ডিসিশন আপনার, আপনার অ্যাপ্রুভাল ছাড়া তিনি কিছু করেন না।

ঠোঁটের হাসি আরো প্রসারিত এখন।—তিনি এ-কথা তোমাকে বললেন, আর আমার সঙ্গে দেখা করতে বললেন?

এবারে সোজা তুমি। কাল হলে কি হত বলা যায় না, আজ বাপী একটু অনুগ্রহ হিসেবে গ্রহণ করল।—আজ্ঞে হ্যাঁ।

চালিহা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।—এখানে ওবিডিয়েন্স ইজ ফার্স্ট কনডিশন—এটা এরপর মনে থাকবে তাহলে?

বাপী মাথা নাড়ল। থাকবে।

—অল্ রাইট, কাল মিসেস রাইয়ের সঙ্গে কথা বলব।

আর আবুর সেলাম বা বাপীর নমস্কারের জন্য অপেক্ষা না করে ভিতরে ঢুকে গেল। ওরা দু'জন বারান্দা থেকে নেমে আবার অন্ধকারে।

আবু বলল, বয়েসে যত ছোটই হও, একটা গড় করে ফেলব?

বাপী হাসছে।

—কিন্তু তুমি অত নিশ্চিন্ত ছিলে কি করে? ওই দাপটের লোকের সঙ্গে কাল তুমি যে-রকম ব্যবহার করেছ, মওকা পেয়ে আজ যদি তোমাকে ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে বার করত?

বাপী ধীরেসুস্থে জবাব দিল, তা যে করতে পারে না একটু মাথা খাটালে তুমি নিজেও নিশ্চিন্ত থাকতে। চালিহা জানে তোমার মেমসায়েব আমার বাড়ির ভাড়াটে, জানে চাকরিব ব্যাপারে তার সঙ্গে পর পর দু'দিন আমার কথা হল, আর অত টাকা খরচ করে আমাকে ক্লাব-হাউসে রাখা হয়েছে তাও জানে—এর পরেও সে কি এত বোকা যে গোঁয়ার্তুমি করে আমাকে একেবারে ছেঁটে দেবে? বরং তোমাদের মেমসায়েব তাকে অত মর্যাদা দিল শুনে কত খুশি দেখলে না?

আবুর হাতের টর্চ বাপীর মুখের ওপর উঠে এলো।

—কি হল?

টর্চ নামিয়ে আবু হালছাড়া গলায় জবাব দিল, আর একবার তোমাকে দেখে নিলাম।

বাপী বলল, কিন্তু চালিহা ভিতরের ঘরে সবুজ আলো জ্বেলে পার্টির সঙ্গে কথা কইছিল, এ আবার কেমন পার্টি?

আবুরও তক্ষুনি টনক নড়ল।—ইস্! জানতে পারলে খুব ভালো হত। ব্যাটা ক্লাবে না গিয়ে বাইরের মানুষকে অন্দরে ঢুকিয়ে মদ গিলছিল যখন, কোনো শাঁসালো মক্কেলই হবে—কত দিকে যে ফাঁক করলে মেমসায়েবকে ঠিক নেই।

অন্ধকারে বাপী মুখ টিপে হাসছে। রসের ইঙ্গিতটা আবু ধরতে পারে নি। লুঙ্গি

পরে আর ঘরে সবুজ আলো জ্বেলে যার সঙ্গে মদ খাচ্ছিল সেই মক্কেল কোনো মেয়েমানুষ হতে পারে কিনা সেটাই তার জিজ্ঞাস্য ছিল।

ক্লাবে কে এলো বা ক্লাব থেকে কে বেরুলো ডাটাবাবু নিজের জায়গায় বসেই দেখতে পায়। বাপীকে দেখে নিজেই নতুন ঘরের চাবি হাতে দিয়ে গেল। লম্বা বারান্দা ধরে এগোতে গিয়ে কোণের ঘরের দিকে চোখ গেল। খোলা দরজার সামনে আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে একজন বেয়ারার সঙ্গে কথা কইছে ডুয়ার্সের অতিথির বউ। মুখের আধখানা দেখা যাচ্ছে। পরনে রং-চঙা সিল্কের শাড়ি, যে-হাতটা দরজার দিকে, সেই হাতে অনেকগুলো কালো চুড়ি, মাথায় কপাল-ছোঁয়া ঘোমটা, নাকে একটা ঝকঝকে পাথরের ফুল। বয়েস বেশি নয়, বেশ দীর্ঘাঙ্গী, গায়ের রঙ দস্তুরমতো ফর্সা, দোহারা চেহারা। মুখের সবটা দেখা না গেলেও বউটা যে বেশ সুশ্রী সন্দেহ নেই।

আবুর সঙ্গে চোখাচোখি হতে দু'জনেই হাসল। আবুর একটা চোখ আপনা থেকে ছোট হয়ে গেল। ফিসফিস করে বললে তোমার কথা মিলেছে, বউ সুন্দরী।...কাল বাপীকে জঙ্গলে আসতে বলে সে চলে গেল।

আজ জুয়ার আসর কেমন বসেছে দেখার জন্য বাপী সামনের বড় হলটায় ঢুকে গেল। গত রাতের মত অতটা জমজমাট নয় এখনো। এক টেবিলে ডুয়ার্সের কালো-কালো অতিথিটিকে দেখে আর একটু এগিয়ে এলো। হাতে মদের গেলাস। এরই মধ্যে বেশ টইটম্বুর অবস্থা। পাশের চেয়ারের লোকটি তার এখানকার অফিসার বন্ধু হবে।

বউ নিয়ে খাসা বেড়াতে এসেছে যা-হোক! বাপী বেরিয়ে এলো। বউটা দরজার সামনে এখন একা দাঁড়িয়ে। এদিকেই চেয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তে বাপী মুখ ফিরিয়ে নিল। কোণের ঘরের আগের ঘরটাই তার। কিন্তু কি রে বাবা, কাছাকাছি হবার পরেও বউটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। সোজা না তাকিয়েও বাপী অনুভব করল, তার দিকে চেয়েই আছে। দরজার তালা খোলার ফাঁকে বাপী একটু ঘাড় না ফিরিয়ে পারল না। সঙ্গে সঙ্গে আবার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পড়তে হল। তাজ্জব ব্যাপার। নাকের ঝকঝকে সাদা ফুলটার মতোই বউটার বড় বড় চোখ দুটোও চকচক করছিল। আর সেই চাউনি ওর মুখের ওপর আটকে ছিল।

হতে পারে পারিবারিক জীবনে বউটা অসুখী। কিন্তু তা বলে এ কি কাণ্ড? অথচ ওই চাউনিতে অশোভন যে কিছু দেখেছে ঠিক তাও নয়।

ঘণ্টাখানেক বাদে ডিনারের জন্য আবার দরজা খুলে বেরুলো যখন, ও-ঘরের দরজা বন্ধ। ডিনার সেরে ফিরল যখন, তখনো। বড় হলঘরটা একচুপি দেখে নিল। এখন মদ আর জুয়ার আসর জমজমাট। সেই অতিথির মাথা এখন চেয়ারের কাঁধে। আর সোজা রাখতে পারছে না।

এই রাতে আর ভালো ঘুম হলো না বাপীর। কাজ এবারে একটা হবে বুঝতে পারছে। গোড়াপত্তন যে রকম হল, ভালো থাকার মুখ এরপর হয়তো সেও দেখবে। গায়ত্রী রাই চালিহাকে বুঝিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল রিজিয়নের জন্য একজনকে ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করা হবে। মালিকের মাথায় মতলব যা-ই থাক, মাঝেসাঝে কলকাতায় তাহলে তাকে যেতে হবে। অস্তিত্বের মানচিত্র থেকে ওর একটা জায়গা মুছে ফেলার তাড়না তার।

কিন্তু সত্যি কি তাই? মনের তলায় এতটুকু লোভের অস্তিত্বও কি আর নেই?

বানারজুলিতে পা দিয়ে জঙ্গলের সেই সব স্মৃতি ওকে কি সেই আগের মতোই পাগল করে তোলে নি? দুর্বার আক্রোশে এক মেয়ের ওপর তার দাবীর ঘোষণা তখনো ভিতর থেকে কেউ করে নি? বলতে চায় নি আগের এই সবকিছু যদি সত্যি হয় তাহলে পরে যা ঘটেছে, তাই শেষ নয়? সেই মেয়ের সম্পর্কে যে চিন্তাটা এ পর্যন্ত ঠেলে সরিয়ে রেখেছিল সেটাই এখন এই শেষের প্রতিবাদে আঙুল তুলছে।...ওর ওপর হামলা করার জন্য পাড়ার মস্তান ছেলে কটাকে ধরে আনা হয়েছে দেখে মিষ্টির সেই রাগ, তার হাতের ক্রুদ্ধ ধাক্কায় মারমুখো একটা ছেলের দূরে ছিটকে পড়া আর তারপর সোনালি চশমার মুখের ওপর সেই আগুন ছিটানো। এর পিছনে যদি আর কোনো সত্যের অস্তিত্ব না থাকে এরকম হতে পারে কি করে?

শেষে হতাশ হয়েই হাল ছেড়েছে বাপী। এ যন্ত্রণার থেকে কি মুক্তি নেই? এত সবের পরেও আশা মরে না কেন?

সকালে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে রাস্তায় নেমে এসেছিল। খানিক ঘোরাঘুরির পর চায়ের টানে ক্লাবে পা দেবার মুখে আবার সেই ধাক্কা। কোণের ঘরের জানালায় সেই বউটা দাঁড়িয়ে। ওর দিকেই অপলক চেয়ে আছে। দিনের আলোয় নাকের সাদা পাথর অত আর চকচক করছে না, কিন্তু চোখে পড়ে।

মুখ ফিরিয়ে বাপী পা চালিয়ে ক্যানটিনের দিকে চলে গেল। আজও অস্বস্তি। বিরক্তিও।

তারপর সকাল প্রায় দশটা পর্যন্ত অর্থাৎ যতক্ষণ বাপী ক্লাবে ছিল, খবরের কাগজ পড়ার ফাঁকে আর ঘর-বার করার ফাঁকে অনেকবার বাপীর ওই চোখের ঘা খেতে হয়েছে। বাপী ভালো করে তাকাতেও পারে নি, দেখতেও পারে নি। ভালো করে চোখাচোখি হবার আগেই দৃষ্টি ফেরাতে হয়েছে। বউটার ঘরের লোকের সঙ্গেও অনেকবার দেখা হয়েছে। সামনেই বারান্দায় একটা চেয়ার পেতে বসে ছিল। তার ঝিমুনো ভাব এখনো ভালো করে কাটে নি। বউটার আচরণ ভেবেই বিস্ময়ের অন্ত নেই বাপীর। কোনরকম ইঙ্গিত ইশারার ছিটেফোঁটাও নেই, কেবল দেখাটুকুই সব।

এত বেলায় আর জঙ্গলের দিকে এগলো না। ঘুরে ঘুরে চা-বাগান দেখল। দূরে দাঁড়িয়ে মেয়েদের আড়াই-পাতি তোলার কাজ দেখল। তারপর আধ মাইল পথ ভেঙে বনমায়ার সঙ্গে খানিক খেলা করে বেলা বারোটার মধ্যেই ফিরে এলো। রাতে ভালো ঘুম হয়নি, এখন চান-খাওয়া সেরে আগে একটু ঘুমনোর ইচ্ছে।

জানলার কাছে সেই বউটা দাঁড়িয়ে। দূর থেকেই বাপী মুখ ফিরিয়ে নিল। আবার ঘুম সেরে বেলা তিনটে-চারটে নাগাদ বেরুনোর সময়েও তাই। ওই জানলার কাছেই দাঁড়িয়ে। বাপীর একবার ইচ্ছে হল সোজা ঘুরে তাকায়, আর নিজের দুটো চোখ দিয়েই জিগ্যেস করে, কি ব্যাপার? পারা গেল না। মাথায় ছিট কিনা কে জানে। নইলে বেড়াতে এসেও স্ত্রীকে ভদ্রলোক কাল বিকেল থেকে এ-পর্যন্ত ক্লাবের বাইরে নিয়ে গেল না কেন?

জঙ্গলে ঢুকলে বাপীর আর সময় কাটিতে অসুবিধে নেই। তবে যেদিকে স্মৃতির টান বেশ, আজ আর সেদিকে পা বাড়ালো না। নতুন গাছপালা আবিষ্কারের জন্য উৎসুক। কিন্তু নতুন কিছুই চোখে পড়ছে না। সবকিছু অন্তরঙ্গ পুরনো দোসরের মতো কাছে টানছে তাকে। আবুর সঙ্গে সকালে দেখা হয় নি, কোনো খবর আছে কিনা জানার জন্যও

এ-বেলা যাওয়ার কথা ভেবে রেখেছিল। কিন্তু এই জগতের নিভৃতে ঢুকে পড়ার পর কিছুই আর মনে থাকল না। আগুখেলা করছে দেখল, জোড়ায় জোড়ায় খরগোশের ছোটাছুটি দেখল, ময়ূরময়ূরী দেখল। বাপীর নিজেরই হঠাৎ মনে হল, ছেলেবেলায় ও বড় নিষ্ঠুর ছিল। কত সময় মরণপাথর ছুঁড়ে ওদের এই আনন্দ খতম করে দিয়েছে।

ঘণ্টা দুই ঘোরাঘুরির পর যেখানে এসে দাঁড়াল সে-জায়গাটা চেনা মনে হল, আর অদূরের ওই ডেরাটাও। যদিও মাটির ঘরের এখন আর সেই ভাঙা-দশা নয়, নতুন টালি বসানো হয়েছে, তবু চিনতে ভুল হল না। রেশমার মরদ মাতাল কাঁদনার ডেরা ছিল ওটা। রেশমা কি এখনো এখানেই থাকে?

আবু সঙ্গে নেই, আর এগলো না। ফিরে চলল। গেলে রেশমাই হয়তো বিশ্বাস করবে না ও বেড়াতে বেড়াতে এদিকে চলে এসেছে। কিন্তু পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে পিছনে কলকণ্ঠে—ও বাপীভাই! সামনে অত কি দেখার আছে গো, পিছনে দেখো?

রেশমা। কিন্তু রেশমার পাশে যে তাকে দেখে বাপী যথার্থ অবাক। ঊর্মিলা রাই। পরনে শাড়ি। রেশমা অবশ্য কাল বলেছিল মেমদিদি কেবল তার সঙ্গেই গপ্পসপ্প করে, আর কারো সঙ্গে ভালো করে কথাও বলে না। তা বলে দুই সখীর জঙ্গলে বেড়ানোর মতো খাতির ভাবে নি। হাসছিল সেও। এবারে ঠেসের সুরে রেশমাকেই বলল, যেভাবে দেখতে দেখতে যাচ্ছিল খাঁটি ভাবুকের মতো লাগছিল।

মুখখানা ভারিক্কি করে ঊর্মিলা বাপীর দিকে তাকালো।—মায়ের সঙ্গে আজ দেখা হয়েছে?

বাপী মাথা নাড়ল, হয় নি।

—আঙ্কল চালিহা সকালে এসেছিল, তুমি কাল রাতে তার সঙ্গে দেখা করেছ বলল, আর মায়ের কাছে তোমার বেশ প্রশংসাই করল।

এটা খুব অবাক হবার মতো খবর নয়। বিস্ময়ের ধাক্কা এই মেয়ের মুখে সরাসরি তুমি শুনে। কাল বিকেলেও আপনি করে বলেছে, আজ ওর মায়ের মতোই তুমিতে নেমে এলো।

ঊর্মিলা আবার বলল, হাঁ করে চেয়ে আছ কি—তুমি সেয়ানা কম? কিছু বুঝতে পারছ না?

বাপী সাদা মুখ করে জবাব দিল, সে-জন্য নয়, হঠাৎ অনুগ্রহ দেখে অবাক লাগছিল, কাল পর্যন্ত 'আপনি' ছিলাম, কাজ শুরু হওয়ার আগেই 'তুমি' হয়ে গেলাম।

মেয়ে বলল, আমি আপনি-টাপনির ধার ধারি না, তুমিও তাই বলতে পারো। ...আংকলকে বশ করলে কি করে, ম্যাজিক-ট্যাজিক জানো?

জবাব দেবার আগেই রেশমা আলতো করে ঠেস দিল, পায়ে ধরে কান্নাকাটি করেছে বোধ হয়। কি-যে হল বাপীর, হঠাৎ কেন যেন রেশমার মুখখানাই ভালো করে দেখে নেওয়ার ইচ্ছে। সে-চেষ্টার আগেই ঊর্মিলার ভ্রূকুটি।—এই পাজী মেয়ে, আমি বলি বলে তুইও বলবি, দু'দিন বাদে ও-ই তোর মুরুব্বি হবে সে খেয়াল আছে?

রেশমা চার আঙুল জিভ কাটল তক্ষুনি।—ও বাপীভাই, তুমি এমন করে চেয়ে আছ কেন? আমার খুব অন্যায় হয়েছে, এই নিজের কান মলছি।

সত্যি সত্যি কানে হাত দিল। তারপর হেসে ঊর্মিলাকেই বলল, আমি কি রকম

পাজী মেয়ে তোমার থেকে বাপীভাই ঢের ভালো জানে মেমদিদি—রাগ করবে না। তা আমার কি আর পৌঁছে দেওয়ার দরকার আছে—লোক তো পেলে?

উর্মিলা সঙ্গে সঙ্গে ওকে ছুটি দিয়ে দিল, ঠিক আছে, তোকে আর আসতে হবে না। ঘরে যা, বিকেলে আর সাপ-টাপ ধরতে বেরুবি না বলে দিলাম।

জঙ্গলের পথ ধরলে এখান থেকে বাড়ি খুব একটা দূরে নয়। আবার একেবারে কাছেও নয়। বাপীর অস্বস্তি লাগছে। উর্মিলা আগে আগে খানিকটা এগিয়েই ঘুরে দাঁড়াল। —এখনো কি জঙ্গলের শোভা দেখতে দেখতে যাবে নাকি? পা চালিয়ে চলো, খ্যাঁক-খ্যাঁক করার জন্য মা বাইরে বসেই আছে দেখো'খন—

বাপী যথার্থই ঘাবড়ালো, বলল, আমাকে সঙ্গে দেখলে কি খুশি হবেন...

কথাটা আদৌ তলিয়ে ভাবল না উর্মিলা। জবাব দিল, তুমি না থাকলে তো রেশমাই সঙ্গে আসত, অখুশির কি আছে!

অর্থাৎ মেয়ের যাতায়াতে একজনের সঙ্গে থাকা নিয়ে কথা। আসার সময় সঙ্গে কে ছিল সে কথা না তুলে বাপী আলতো করে জিগ্যেস করল, একা চলাফেরা উনি পছন্দ করেন না বুঝি?

—নাঃ! এক শব্দের জবাবেই একপশলা বিরক্তি।—কোথাও বেরুতে হলে সঙ্গে হয় কোয়েলা, নয় রেশমা, নয় আবু, নয় তো উনি নিজে!

তারপরেই উৎফুল্ল একটু।—প্রথম দিন দেখেই তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। তুমিই ঠিক মাকে জব্দ করেছ—ইউ উইল বি মাই ফ্রেণ্ড—উইল ইউ?

বিপন্ন মুখ করে বাপী বলল, সেটা কি আমার দিক থেকে একটু ভয়ের কথা হবে না?

—ভয়ের কথা হবে কেন?

—ইয়ে, আবুর মুখে শুনেছিলাম, আমার আগে চা-বাগানের একজন চৌকস লোককে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল...সে বন্ধুত্বের জন্য এগোতে তার চাকরি গেছে।

উর্মিলা প্রথমে অবাক মুখ করে তাকালো তার দিকে। তারপর মনে পড়ল।—তার তো অন্য রকম মতলব ছিল, আমিই তো মাকে বলে তাকে তাড়িয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে চোখ পাকালো, তোমার সাহস তো কম নয়, তুমি বুঝি সে-রকম বন্ধুত্বের কথা ভেবেছ?

বাপী তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল।—তা না...সেই একজন কি-রকম বন্ধুত্বের দিকে এগিয়েছিল আবু সেটা বলে নি।

উর্মিলা জোরেই হেসে উঠল। তরতাজা হাসি। বলল, আবু একটা ওয়ার্থলেস আর তুমি একটা সেয়ানা বোকা—ওয়েট ক্যাট।

বাপী ক্লাবে ফিরল রাত প্রায় ন'টায়। মন-মেজাজ সত্যি ভালো। গায়ত্রী রাইয়ের ঠোঁটের ফাঁকে আজ একটু হাসিও দেখেছে। দেখামাত্র বলেছে, চালিহা সকালে এসে তোমার জন্য সুপারিশ করে গেছে। তুমি তাকে কি বলেছ, তাও শুনেছি। বাট্ ডোন্ট্ এভার ট্রাই টু ওয়ার্ক দ্যাট্ স্টাফ অন্ মি...বি স্ট্রেইট অ্যান্ড বি অনেস্ট।

আজ আর মুখ ফুটে বলার দরকার হয় নি, নিজেই চা খাইয়েছে। পাশের জমিতে ওর জন্য ঘর তোলার কথাও চালিহার সঙ্গে হয়ে গেছে। সে কনট্রাক্টর লাগানোর ব্যবস্থা

করবে। ঘর না ওঠা পর্যন্ত ক্লাবে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা আবুর ঘরে এসেছে। সুখবর আবু আগেই জানে। বিকেলে ওর খোঁজে ক্লাবে এসে ফিরে গেছে। এই নতুন মানুষটার সঙ্গে বাপের জড়াজড়ি কাণ্ড দেখে ওর ছেলে দুটো খুশিতে হাঁ। দুলারি আজ আবার প্রচুর জলখাবার খাইয়েছে। আর ঘরের লোকের উদ্দেশে ঠেস দিয়ে বাপীকে শুনিয়েছে, বানারজুলিতে এতদিন একজনই বুদ্ধিমান লোক ছিল, কাল থেকে সেই অহংকার একটু কমেছে।

ক্লাবে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে কোণের ঘরটার দিকে আগে চোখ গেল। এতক্ষণ মনেও ছিল না। ঘর অন্ধকার, দরজা খোলা। দু'দিন থাকার কথা ছিল, আজই চলে গেছে হয়তো। বউটার আচরণ দুর্বোধ্যই থেকে গেল। নিজের দরজা খোলার ফাঁকেও আর একবার ও-ঘরটার দিকে তাকালো। কেউ আছে মনে হল না।

দরজা ভেজিয়ে গায়ের বুক খোলা সোয়েটার আর পাঞ্জাবি খুলে সটান শয্যায়। ভারী জলযোগের ফলে আরো ঘণ্টা দেড়েকের আগে খাবার তাড়া নেই। ডাটাবাবু হয়তো কালই আবার ওকে কোণের ঘরটা দিতে চাইবে। কিন্তু বাপীর আব দরকার নেই, এ-ই বেশ ভালো। আবার কে কখন পরিবার নিয়ে হাজির হয় ঠিক কি।

দরজায় টুক-টুক শব্দ। বাপী শুয়েই ঘাড় ফেরালো। ডাটাবাবু এই রাতেই ঘর বদলের কথা বলতে এসেছে, নাকি গায়ত্রী রাই আবার কিছু খবর পাঠালো? রণজিৎ চালিহা নয় তো...।

তাড়াতাড়ি সাড়া দিল, কাম ইন!

আস্তে আস্তে এক পাট দরজা খুলে যে এলো তাকে দেখামাত্র প্রচণ্ড বিস্ময়ে বাপী ধড়মড় করে উঠে বসল।

কোণের ঘরের বউটা।

চোখ দুটো চকচক করছে! ঠোঁটে হাসি। নাকের পাথরে সাদা জেল্লা। আরো দু'তিন পা এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল।

বাপীর গলা শুকিয়ে কাঠ। এমন বিমূঢ় যে একটা শব্দও বার করতে পারছে না।

—দু'দিন আমাকে দেখে চিনতে পারলে না বাপীদা, আমি তো তোমাকে দেখেই চিনেছি!

মাথার খাটো ঘোমটা খসে গেছে। এবারে আর এক প্রস্থ ইলেকট্রিক শক খেল বাপী। তারপর স্থান-কাল ভুলে হাঁ করে দেখছে। চেনা আদলই বটে। কিন্তু কপালে সবুজ টিপ, নাকে চকচকে সাদা পাথর, দু'হাতে এক গোছা করে কালো চুড়ি...একে বাপী কবে কোথায় দেখল? মেয়েটার ভুল হয়ে থাকলে ওর নাম বলবে কি করে—বাপীদা বলবে কি করে!

—থাক, আর চেষ্টা করতে হবে না। আমি তোমাদের ড্রইং মাস্টারমশাই ললিত ভড়ের মেয়ে কুমকুম। মনে পড়ছে, না তাঁকেও ভুলে গেছ?

মাথায় একটা মুগুরের ঘা খেয়ে আত্মস্থ হল বাপী তরফদার। তার পরেও বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা নেই। নিজের দুটো চোখের ওপর বিশ্বাস খোয়ানোর দাখিল। তেতাল্লিশ সালের গোড়ার দিকে হাড়ের ওপর সাদা চামড়া মোড়া বছর চৌদ্দর এই মেয়েটাকে প্রথম দেখেছিল। বাপের হাঁকডাকে কড়াইশুঁটি সেদ্ধ আর চিঁড়ে ভাজা খেতে দিয়েছিল।

তার বেশির ভাগ রোগা পটকা দুটো ছেলে আর মাস্টারমশাইয়ের পেটে গেছল। পরের দেড় বছরের মধ্যে মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে কমই যাওয়া-আসা ছিল, কিন্তু তখনো এই মেয়ে নিজের স্বাস্থ্যের লজ্জায় হোক, ময়লা ছেঁড়াখোঁড়া জামা-কাপড়ের লজ্জায় হোক, সামনে আসতই না। ভিতরের ঘরে সেঁধিয়ে থাকত। একদিন মাত্র রাগের মুখ দেখেছিল —যেদিন জিলিপির ঠোঙা আর মুড়ি নিয়ে যেতে ও বলেছিল, মায়ের বাক্স থেকে বাবা দশ টাকা চুরি করে দুর্ভিক্ষের ফান্ডে পাঠিয়েছিল বলে বাড়ির সকলের উপোস চলছে। ...আর মাস্টারমশাই অ্যারেস্ট হবার দিন মেয়েটা ছেঁড়া আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদছিল। দেখা বলতে সর্বসাকুল্যে তিন-চার দিনের।

পাঁচ-ছ' বছরে সেই হাড়-চামড়া-মোড়া মেয়ে এই হতে পারে কোনো কল্পনার মধ্যেও আসা সম্ভব নয়। বাপী মাথা নাড়ল বটে, মাস্টারমশাইকে ভোলে নি, কিন্তু এখনো বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না, এ সেই মেয়ে।

কুমকুম বলল, কাল সকালে চলে যাচ্ছি, আজ একবার না এসে পারলাম না।

বাপী দ্রুত নিজের মধ্যে ফিরে আসছে। কাল থেকে দেখছ, চিনেছ...এলে না কেন...বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে না কেন?

এক জবাবে কুমকুম দু'দিক সারল।—আলাপ করানোর মতো মানুষ নয়, এখনো এ-ঘরে দেখলে চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যাবে।

চমকে দরজার দিকে তাকালো বাপী। তারপর তাড়াতাড়ি উঠে এসে দরজার দু'পাটই খুলে পর্দাটাও তুলে দিল। কুমকুম হাসল একটু—তোমার ভয় নেই, আমি দেখে এসেছি, মদ আর জুয়ার নেশায় এখন আর কোনদিকে হুঁশ নেই।

হঠাৎ ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছে বাপী। কুমকুমের ঠোঁটের হাসি আর চকচকে চোখ কেন যেন খুব স্বাভাবিক লাগছে না।

—বোসো। বসার চেয়ার নিজেই সামনে এগিয়ে দিল। নিজে খাটে বলল।—তোমার বরের নাম কি

—ব্রীজমোহন। কুমকুমের মুখে অদ্ভুত হাসি।

—নিজে বিয়ে করেছ?

—তা ছাড়া আর কি। কবে থেকেই তো নিজের বাঁচার ভাবনা নিজের।

তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলালো বাপী।—মাস্টারমশাইয়ের খবর কি?

খবর বলা নয়, বাপীর বুকের ভিতরটা দুমড়ে-মুচড়ে দিল কুমকুম। মাস্টারমশাইয়ের খবর ও জানে না, বা কেউ জানে না।...দিনাজপুরে এসে প্রথম দু'আড়াই বছর তারা মামা-মামীর আদরযত্ন পেয়েছিল। মামা মুহুরী কিন্তু জনাকতক পয়সাঅলা মক্কেলের সঙ্গে তার খুব খাতির ছিল। মামার তাগিদে মামী সস্তার বাজারে কুমকুমকে আম-দুধ-ঘি খাইয়ে বেশ তাজা করে তুলেছিল। তারপর বাপের থেকেও বয়সে বড় এক বউ-মরা খাতিরের মক্কেলের সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছিল। এই সময় বাবা এসে যেতে এই বিয়ে নিয়েই মামার সঙ্গে তার ফাটাফাটি ঝগড়া। মুখ দেখাদেখি বন্ধ। ওদের এক খোলার ঘরে উঠে যেতে হল, তারপর প্রায়দিনই উপোস। মাস্টারমশাই জঙ্গল থেকে একদিন কি-সব ফল আর লতাপাতা এনে হাজির—সেদ্ধ করে নুন দিয়ে খেতে নাকি চমৎকার। কুমকুম বা তাব মা ফিরেও তাকালো না দেখে নিজেই সেদ্ধ করল। তারপর বাবা আর

ছোট ভাই তাই খেল। বড় ভাইটাকে মামা আগেই ঢাকায় এক আত্মীয়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সে বেঁচে গেল। অবশ্য বেঁচে আছে কি নেই কুমকুম জানে না। সেখানকার বড় দাঙ্গার পর থেকে সেই আত্মীয়ের কারো আর খবরই পাই নি। ওই সেদ্ধ বুনো আনাজ খাওয়ার দু'ঘণ্টার মধ্যে বাবা আর ছোট ভাইয়ের সে কি পেট কাচিয়ে রক্ত, আর আধাকাটা পশুর মতো যন্ত্রণায় ছটফটানি। রাতের মধ্যে ভাইটা মরেই গেল। বাবা শেষ পর্যন্ত সামলে উঠল, আর তারপর থেকে একেবারে পাগলের মতো হয়ে গেল। বেরিয়ে যেত, আর কখনো কখনো দু'দিন তিনদিন পরেও ফিরত। শেষে একবার আর ফিরলই না। পরের ক'বছরের মধ্যে কুমকুম আর তার দেখা পায় নি।

শোনার যন্ত্রণা কম নয়। বাপীর দম আটকে আসার দাখিল।—আর তোমার মা?

—বাবা চলে যাবার দু'মাসের মধ্যে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলেছে। তার আগের রাত পর্যন্তও আমাকে অজস্র অভিসম্পাত করেছে।

মাথাটা ঝিমঝিম করছে বাপীর। আর কিছু জিগ্যেস করতেও ইচ্ছে করছে না। ...এবারে কুমকুমের চকচকে চোখ উৎসুক একটু।—তুমি বিয়ে করো নি বাপীদা...?

—না।

—এখানেই থাকো?

বিশদ করে বলল না। জবাব দিল, থাকব বলে এসেছি—কলকাতায় ছিলাম।

শুধু চোখ নয়, কুমকুমের মুখও ব্যগ্র হঠাৎ।—কলকাতা কেমন জায়গা বাপীদা?

—আছে একরকম। অস্বস্তি বাড়ছেই বাপীর। বলল, কুমকুম এখন তুমি ঘরে যাও, ব্রীজমোহন উঠে এলে...তুমি যা...বলছ...

হ্যাঁ, খুব মুশকিল। কুমকুম তক্ষুনি উঠে দাঁড়াল। ঠোঁটের ফাঁকে তীক্ষ্ণ হাসির ফালা। —বেইমানী ভাবলে তোমার ঘাড়েও ফেলে চলে যেতে পারে!

চলে গেল। এই রাতে বাপীর আর ডিনার খেতে বেরুনোও হল না।

সকাল। বাপী ইচ্ছে করেই প্রাতরাশের পর বাইরের বারান্দায় চেয়ারে বসে কাগজ পড়ছিল। খানিক আগে একটা জিপ এসে দাঁড়িয়েছে। জিপে ড্রাইভারের পাশে চা-বাগানের সেই ছোকরা অফিসার—ব্রীজমোহনের বন্ধু।

আগে স্যুটকেস হাতে বেয়ারা কোণের ঘর থেকে বেরুলো। পিছনে বিপুলবপু ব্রীজমোহন। তার পিছনে চার আঙুল ঘোমটা টানা কুমকুম। বাপীর দিকে মেয়েটা তাকালোও না একবার। বারান্দা থেকে নেমে গেল.

অফিসার বন্ধুটি মিটিমিটি হাসছে। ব্রীজমোহনও দাঁত বার করে হেসে পিছন ফিরে কুমকুমকে দেখল একবার।

ওদের নিয়ে জিপটা বেরিয়ে গেল।

আর তক্ষুনি বাপীর চোখের সামনে থেকে একটা ঝাপসা পর্দা আচমকা ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার হয়ে গেল। কুমকুম আর কত ভাবে বোঝাবে ওকে ও কি? বলেছে, কবে থেকেই নিজের ভাবনা নিজের—বলেছে, মা গলায় দড়ি দিয়েছে, তার আগে পর্যন্ত অজস্র অভিসম্পাত করেছে—বলেছে, বেইমানী ভাবলে ওই লোক তাকে বাপীর ঘাড়ে ফেলেও চলে যেতে পারে। তার আগে ব্যগ্রমুখে জিগ্যেস করেছিল, কলকাতা কেমন জায়গা।

এই একজন নয়, পুরুষ প্রবৃত্তির কোন্ কাঁচা ভিতের ওপর কুমকুমের মরণ-বাঁচন

নির্ভর—সেটা আর কত ভাবে ও বলে যাবে?

বাপী স্তব্ধ। বিবর্ণ।

## তেরো

আবু রব্বানী আর দুলারি ধরেই নিয়েছে গায়ত্রী রাইয়ের এত বড় ব্যবসার কর্তৃত্ব এখন আস্তে আস্তে বাপী ভায়ের হাতে চলে যাবে। রাতারাতি কিছু হবে না। চালিহাকে কোন রকম সন্দেহ করার সুযোগ মেমসায়েব দেবে না। তাছাড়া চারদিকের কাজকর্মের হদিস পেতেও বাপীভাইয়ের কম সময় লাগবে না। চোখ কান খোলা রেখে সব দেখে শুনে বুঝে নিতে হবে। তারপর বাপীভাইয়ের ওপর মেমসায়েবের বিশ্বাস পাকাপোক্ত হয়ে উঠলে তখন আস্তে আস্তে মেয়েছেলের বুদ্ধির খেলা দেখা যাবে। তাই গোড়া থেকে খুব সাবধান বাপীভাই, খুব সাবধান।

একই সঙ্গে ওদের আনন্দ উৎসাহ আবার উৎকণ্ঠা দেখে বাপী তরফদারের হাসি পায়। সেই সঙ্গে অস্বস্তিও একটু। মেমসাহেবের মনে কি আছে সেটা বাপীর বোকামির জন্যে এরা টের পেয়ে গেছে। প্রথম সন্ধ্যায় গায়ত্রী রাইয়ের সঙ্গে এই বোঝাপড়ার ঝকাঝকিটা আবুর চোখের ওপর দিয়ে ঘটে না গেলে ওরা এতটা হয়তো বুঝত না। কোন্ ভবিষ্যতের দিকে চোখ রেখে মহিলা নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত লোক খুঁজছে, আর কেন ছ'মাসের জন্য ওকে ট্রায়েল দেবার আগ্রহ—বাপী সেটা তার মুখের ওপর বলেই দিয়েছিল। আবু রব্বানী সত্রাসে মেমসায়েবের প্রতিক্রিয়া দেখেছে আর বিমূঢ় বিস্ময়ে তার ফলাফলও দেখেছে। তার পরে মেমসায়েবের সঙ্গে বাপীর প্রতিটি সাক্ষাতের বৃত্তান্তও খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছে। তাই ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ছবিটা ওর স্পষ্ট আঁচ না করতে পারার কথা নয়। আর আবু জানে বলেই দুলারি সব জানে।

এখন ওরাই তাকে উপদেশ দিচ্ছে, সাবধান করছে। এর পিছনে আন্তরিকতাটুকুই সব। তবু পর পর দু'তিন দিন এ-রকম শোনার পর বাপী সেদিন বলল, তোমাদের মেমসাহেবের মতলব কি সেটা আমি গোড়া থেকেই জানি, কিন্তু তা নিয়ে তোমরা এ-রকম খোলাখুলি আলোচনায় বসলে শুরুতেই সব ভেস্তে যাবে—

দুলারি আর আবু দু'জনেই অবাক।—এখানে তো ঘরে বসে নিজেদের মধ্যে কথা কইছি, কে জানছে?

—এ-সব কথা ঘরের দেয়ালের জানা বা শোনাটাও ভালো নয়। খুব হাল্কাভাবেই জিগ্যেস করল, মেমসায়েবের মতলব আর কে বুঝছে—রেশমা?

আবু জবাব দিল, রেশমার সঙ্গে তো ক'দিনের মধ্যে দেখাই হয় নি—এক ওর মেমদিদি যদি বলে থাকে, খুব ভালবাসে ওকে...

একটু ভেবে বাপী বলল, সে রেশমাকে এ-সব কিছু বলবে মনে হয় না, তার মা-ই তাকে বারণ করবে। যা-ই হোক, তোমাদের কাছ থেকে কিছু না শোনাই ভালো।

সঙ্গে সঙ্গে আবুর মুখ বিরস একটু।—রেশমাকে তুমি অবিশ্বাস করো বাপীভাই। তুমি জানো না, ওই চালিহার ওপর আমাদের থেকে ওর ঢের বেশি রাগ, ইচ্ছে করে ওর ওপর সব থেকে বেশি অবিচার করছে। মওকা পেলে রেশমা কোন্ দিন সাপের

মতোই ওকে ছুবলে দেবে—

যত সেয়ানা হোক, আবু যে ওর তুলনায় সাদা মনের মানুষ বাপী জানে। যে সংশয়ের ছায়াটা মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিয়ে যায় সেটা ওকে বলা যাবে না। বিরক্তি চেপে জবাব দিল, বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোনো কথা হচ্ছে না—তুমি যা বললে সেটা সত্যি হলেও মেমসাহেবের মতলব ওর না জানা ভালো—ওই রাগের মাথাতেই বেফাঁস কিছু হয়ে বসতে পারে।

দুলারির গম্ভীর চাউনিটা মুখের ওপর আটকেছিল। বাপীর কেমন মনে হল, শুধু শুনছে না, একই সঙ্গে ভেতর দেখে নেবার চেষ্টা। চোখাচোখি হতে ও আবুর দিকে ফিরল। দাবড়ানির সুরে বলল, বাপীভাইয়ের ছটাক বুদ্ধিও ধরো না সেই জ্ঞান তোমার আছে? যা-বলছে মন দিয়ে শুনে রাখো, আখেরে সকলেরই তাতে ভালো মন্দ হবে না—বুদ্ধির ঢেঁকি!

এই ধমকের মধ্যে আবুকে নিরস্ত করার কোনো ইশারা ছিল কিনা বাপী ঠিক ধরতে পারেনি। বিমূঢ় মুখে আবু তার বিবিকে দেখেছে। তারপর মোলায়েম গলায় প্রসঙ্গ বাতিল করেছে।—ঠিক আছে, ঠিক আছে, একেবারে মাটি চাপা দিলাম।

কিন্তু আবু চাপা দিলেও সে-মাটি একটু অন্যভাবে খুঁড়ে দিয়ে গেল গায়ত্রী রাইয়ের মেয়ে ঊর্মিলা রাই। বন্ধুত্ব হবার ফলে বাপী ওকে ডলি নামে ডাকবে কি ঊর্মিলা, তাই নিয়েও ভেবেছিল। ডলি মিষ্টি নাম, কাছের নাম। সতর্কতার তাগিদে সেই কারণেই ডলি বাতিল। এমন কি মনে মনে বন্ধুত্বও বাতিল। নিজেকে অবিশ্বাস, গায়ত্রী রাইকে আরো বেশি।

বানারজুলির চা-বাগান এলাকায় গায়ত্রী রাইয়ের ব্যবসায় আপিসও একটা আছে। ছোট বড় তিন ঘরের আপিস। বড় সাজানো গোছানো ঘরটা চিফ একজিকিউটিভ চালিহার। এখানে থাকলে সকালের দিকে এক দেড় ঘণ্টা সে এই ঘরে এসে বসে। অন্য সময় শুধু পার্টির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে তাকে ও-ঘরে দেখা যায়। এই আপিসে সাড়ে ন'টা পাঁচটা নিয়মিত হাজিরা বরাদ্দ শুধু অ্যাকাউনটেন্ট আর টাইপিস্টের। একজন বেয়ারারও। কর্ত্রী অর্থাৎ গায়ত্রী রাইয়ের আপিসে কখনো পদার্পণ ঘটেছে শোনে নি। কারণ আসল আপিস বাপীর দু'ঘরের বাড়িতে যে নতুন ঘর উঠেছে, সেটা আর সামনের ওই বারান্দাটা। দরকারী ফাইলপত্রের বেশির ভাগ ওই ঘরে। সেখানে ছোট্ট একটা টাইপ রাইটারও দেখেছে বাপী। ওটা মালিকের নিজস্ব। তেমন জরুরী চিঠিপত্র টাইপ করার দরকার হলে গায়ত্রী রাই নিজেই করে নেয়, টাইপিস্টের আশায় বসে থাকে না। প্রয়োজনীয় দুটো একটা নৈমিত্তিক লেনদেন বা হিসেবের ফাইল সাইকেলের ক্যারিয়ারে চাপিয়ে অ্যাকাউনটেন্টকে প্রায় রোজই একবার করে দুপুরের দিকে মালিকের আপিস ঘরে হাজিরা দিতে হয়।

এ দু' সপ্তাহের মধ্যে বাড়ির আপিস ঘরে বাপীর একদিনও ডাক পড়ে নি। পড়বে জানে কিন্তু সেটা কোন ভবিষ্যতে, মহিলার মুখ দেখে আঁচ করা শক্ত। এখন পর্যন্ত কাজের কোনরকম হদিসও তার কাছ থেকে মেলে নি। শুধু বলে রেখেছে, ফাঁক পেলে মাঝে মাঝে এসো। কিন্তু কোন্ সময়টা মহিলার কাছে ঠিক ফাঁক বলে গণ্য হতে পারে বাপী এখন পর্যন্ত ঠাওর করে উঠতে পারে নি। সন্ধ্যায় রণজিৎ চালিহার সঙ্গে তার ব্যবসায়িক

কথাবার্তার বা গল্প করার সময়। সেই অন্তরঙ্গ পরিবেশে এসে হাজির হবার ফলে মহিলার সাদাটে ভুরুতে বিরক্তির ভাঁজ দেখেছে। বারান্দায় ওঠারও অবকাশ না দিয়ে বলেছে, দরকার নেই—

অর্থাৎ, যেতে পারো। দু'দিন বাদে এক সকালের দিকে আসার সঙ্গে সঙ্গে কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখেছে মহিলা। গলার স্বর নীরস। চান খাওয়া সেরে এসেছ।

বাপী অপ্রস্তুত।—না।

—এখন ন'টা বাজে, মিস্টার চালিহা দশটায় আপিসে হাজির থাকেন, তিনি দেরির কৈফিয়ৎ চাইলে আমি সদয় থাকব ভেবো না।

বাপীর পত্রপাঠ প্রস্থান। মেয়েটার সামনে ওই কথা শুনে অপমানিত বোধ করার কথা। কিন্তু বাপীর ধারণা খুব স্পষ্ট বলেই গায়ে মাখে নি। আরো অপ্রস্তুত পরের রবিবারের ছুটির দিনে বেলা দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ এসে। ছুটির দিন, সকাল থেকে আবুর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে তারপর দু'জনে গল্প করতে করতে চলে এসেছিল। সেদিন অন্তত কোনো বিরূপ আপ্যায়ন আশা করে নি।

কিন্তু ওদের দেখামাত্র মহিলার ভ্রূকুটি। পাশে মেয়ে বসে। মালিকের মুখের দিকে চেয়েই আবু ঘাবড়েছে একটু। আর বাপী ভেবেছিল, মেয়ের কোনো কারণেই মহিলার মেজাজ ভালো নয়। আবুর বিনীত আদাবের জবাবে মুখের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করল একটু। তারপর জিগ্যেস করল, কিছু বলবে?

এ-রকম অভ্যর্থনার জন্য আবুও প্রস্তুত ছিল না। জবাবদিহির সুরে সে বলল, দোস্ত আসছে দেখে সেও মালকানকে শুধু সেলাম জানাতেই এসেছে, আর কোনো কারণে নয়।

মেমসায়েবের মেজাজ এখন পর্যন্ত বাপীর থেকে ঢের ভালো বোঝে আবু। বলল, চন্দ্রার নতুন চারা বেডটা খাসা হয়েছে মেমসায়েব, পারেন তো একবার দেখে আসবেন। আচ্ছা, আমি চলি—আদাব।

আবু চলে যেতে গায়ত্রী রাইয়ের অপ্রসন্ন দু'চোখ বাপীর মুখের ওপর।—তোমার কি?

—এলাম...যদি কিছু বলেন।

—যদি কিছু বলি শোনার জন্যে সঙ্গে লোক নিয়ে আসতে হবে? এ বাড়ির রাস্তা তুমি চেনো না?

দোষের হদিস বাপী পেয়েছে, কিন্তু এ কথার আর জবাব কি দেবে। গায়ত্রী রাই আবার বলেছে, এখানে কাজ করতে হলে দোস্তি ভুলতে হবে।

নিরীহ মুখে বাপী জিগ্যেস করেছে, কাজের বাইরেও?

—কাজের বাইরে তোমার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক আছে আমার?

বাপী বিনয়-বিনম্র। মাথা নেড়েছে, নেই।

—এখন আমি তোমাকে কিছুই বলব না। যা বলার মিস্টার চালিহা বলবেন। তোমার কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে তাঁকেই বলবে।

বাপী এরপর অনায়াসে ফিরে প্রশ্ন করতে পারত, ফাঁক পেলে তাকে মাঝে মাঝে আসতে বলা হয়েছিল কেন। জিগ্যেস করল না। আনুষ্ঠানিকভাবে কাজে জয়েন করার

পর থেকেই মহিলার এমনি কড়া মেজাজ দেখছে। আবুর ভাষা অনুযায়ী এক চালিহা ছাড়া আর সব কর্মচারীর সঙ্গে এই গোছের আচরণ ঠাকরানের। বাপীর ধারণা অন্য রকম। ওকে নেবার উদ্দেশ্যটা বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল বলেই শুরুতে লাগামের মুখে রাখছে। দরকার বুঝলেই ছপটি চালাতে পারে বুঝিয়ে দিচ্ছে। আর একই সঙ্গে চালিহার মর্জির ওপর ছেড়ে দিয়ে যোগ্যতা যাচাইয়ের মহড়াও নিচ্ছে বোধ হয়। ক'দিন আগের সম্পূর্ণ অজানা অচেনা একটা লোককে শুধু মুখের কিছু কথা শুনে একটু বেশি প্রশ্রয়ই দিয়ে ফেলা হয়েছে ভাবাও বিচিত্র নয়।

অতএব বাপী বুদ্ধিমানের মতোই নরম মুখে বাংলো থেকে নেমে এসেছে। পরের এক সপ্তাহের মধ্যে আর ও-মুখো হয় নি। গায়ত্রী রাইও তার অস্তিত্ব ভুলেছে যেন। একবারও ডাকে নি। এই কারণেই বাপীর আরো বদ্ধ ধারণা, সে তার লক্ষ্যের মধ্যেই আছে, আর তার প্রতিদিনের খুঁটিনাটি হিসেবও মহিলা রাখে। হিসেব কে দেয় বাপী সঠিক না জানলেও আঁচ করতে পারে। রণজিৎ চালিহা খুব সম্ভব। তাই যদি হয় তো এটা মহিলার যে সূক্ষ্ম সুপটু চাল একটা, বাপী অস্বীকার করবে না।

টাইপিস্টকে তার ঘর ছেড়ে মেশিনপত্র নিয়ে অ্যাকাউনটেন্টের ঘরে চলে যেতে হয়েছে। তার ছোট ঘরখানা বাপীকে মোটামুটি সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। রণজিৎ চালিহার তুলনায় সে-সজ্জা কিছুই নয়। তার মতো ওর ঘরের দরজায় নামের ফলকও কিছু বসানো হয় নি। কি পোস্ট বা কি চাকরি, সে সম্পর্কে এক কর্ত্রী ছাড়া আর কারোরই হয়তো ধারণা নেই। পশ্চিম বাংলার জন্য কাজকর্ম শেখানো হবে শুনেছিল, কিন্তু কাজে লাগার পর আর কিছু কানে আসে নি।

সকাল দশটার পাঁচ-দশ মিনিট আগেই হাজিরা দেয়। অ্যাকাউনটেন্ট আর টাইপিস্ট আসে সাড়ে ন'টায়। চালিহা এলে বাপী তরফদার কর্তব্যবোধে সামনে এসে দাঁড়ায়। তার ফর্সা মুখের মিটিমিটি হাসির অর্থও খুব অস্পষ্ট নয়। গায়ত্রী রাই তাকেও নিশ্চয় ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছে সে-ই আসল মুরুব্বি ওর।

রণজিৎ চালিহা আগে তাকে ফার্মের ফাইল পড়তে হুকুম করেছে। কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে, ফাইল পড়লে মোটামুটি ধারণা হবে। আর বলেছে, জঙ্গলটা ভালো করে স্টাডি করো, জঙ্গল থেকেই আমাদের যা-কিছু। জঙ্গলের প্রসঙ্গে সাপ ধরা আর কেনা-বেচার ব্যাপারটা আরো ভালো ভাবে অর্গ্যানাইজ করা দরকার সে-কথাও বলেছে।

উড়ো খই গোবিন্দের পায়ে। ওকে নিয়ে চালিহার হাবভাবও অনেকটা সেই রকমই। সকালে সামনে এসে দাঁড়ালে মুচকি হেসে জিগ্যেস করে, ফাইল দেখছ?

বাপী সবিনয়ে মাথা নাড়লে বলে, বেশ। তারপরেই নিজের কাজে ব্যস্ত ভাব।

দ্বিতীয় সপ্তাহের তৃতীয় দিনে আপিসে ঢুকতেই অ্যাকাউনটেন্ট বলল, আপনার সাইকেলটা একবার দেখে নিন—

ঈষৎ অবাক চোখে ঘরের দেয়ালের গায়ে বাপী একটা ঝকঝকে নতুন সাইকেল ঠেস দেওয়া দেখল। দামী ভালো সাইকেল। অ্যাকাউনটেন্ট জানালো মালিকের হুকুমে এটা তার জন্য কেনা হয়েছে। এগিয়ে এসে বাপী ওটা নাড়াচাড়া করে দেখল একটু। অ্যাকাউনটেন্টকে বলল ঠিক আছে। সে তার চেয়ারে গিয়ে বসার পরেও বাপী ওটার দিকে চেয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে। পুরনো স্মৃতি ব্যথার মতো ভেতর থেকে ঠেলে উঠছে।

...নতুন নয়, একটা পুরনো সাইকেলের স্বপ্ন দেখেছে কত দিন। সাইকেল-সাইকেল করে পিসীকে জ্বালাতন করে মেরেছে আর গরিব বাপের গালাগাল খেয়েছে। মিষ্টিরা আসার পর সাইকেলের লোভ আরো বেড়েছিল। ও সাইকেল চালাবে...পিছনের ক্যারিয়ারে মিষ্টি থাকবে।

চালিহা আসতে সচকিত। অ্যাকাউনটেন্ট অ ' টাইপিস্ট শশব্যস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। এই মাঝারি ঘরের ভিতর দিয়ে তার ঘরে ঢোকার পথ। বাপীরও। একটা নতুন সাইকেলের সামনে ওকে দেখে সেও দাঁড়িয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল ওটা কার?

অ্যাকাউনটেন্ট জানালো, মিস্টার তরফদারের জন্য কেনা হয়েছে।

কার নির্দেশে কেনা হয়েছে সেটা বুঝে নিতে চালিহার এক মুহূর্ত সময় লাগল না। সপ্রতিভ তৎপরতায় মাথা নাড়।—ও, হ্যাঁ...। যেন জানাই ছিল—সাইকেল একটা কেনা হবে। মুরুব্বির সুরে চালিহা বলল, ঘরে বসা কাজ নয় আমাদের, ফিল্ড ওয়ার্কের জন্য তৈরি হও।

নিজের ঘরে ঢুকে গেল। আর তার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নিজের তৎপরতা দেখালো। তার সইয়ে একটা টাইপ করা চিঠি এলো বাপীর টেবিলে। কারো নামে চিঠি নয়। ব্যবসায়ের প্রতিনিধি হিসেবে বাপী তরফদারের নামে পরিচয়পত্র। এটা পাঠিয়ে রণজিৎ চালিহা যেন একপ্রস্থ রসিকতা করল ওর সঙ্গে। অর্থাৎ, সাইকেল পেয়েছ, পরোয়ানাও দিলাম, এবারে চরে খাও দেখি কেমন মুরোদ।

রণজিৎ চালিহা এক পা-ও এগোতে সাহায্য করবে এ-রকম প্রত্যাশা বাপীর কোনো সময় ছিল না। কর্ত্রীরও নেই নিশ্চয়। কিন্তু তার যাচাইয়ের রীতি বিচিত্র। ওপরঅলার মতো চালিহাকে সামনে রেখে পায়ে পায়ে ঠোক্কর খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। কাজকর্ম সম্পর্কেও কোনো আদেশ নেই, কিন্তু সাইকেল দেবার পিছনে কিছু ইঙ্গিত আছে। সেই ইঙ্গিত রণজিৎ চালিহাও বুঝেছে। তাই তাড়াতাড়ি পরিচয়-পত্র পাঠিয়ে দায়িত্ব সেরেছে। এখন বাপী শূন্যে ঝোলে কি হাল ছাড়ে, দু'জনার কাছেই সেই পরীক্ষা।

পায়ের নিচে মাটি চাই বাপীর। এখানে যা ফাইল আছে সব তার খুঁটিয়ে পড়া আছে। এবারে নিজস্ব ফাইলে মাইল দশেকের একটা গণ্ডী টেনে নিয়ে কাজ শুরুর ছক ঠিক করে নিল। এই এলাকার মাল বানারজুলির গোডাউন থেকে চালান যায়। ভুটানের এলাকা পর্যন্ত ধরলে আরো দুটো গোডাউন আছে। এখানকারটাই বড়। এখান থেকে উত্তর বাংলা আর তার বাইরেও অনেক জায়গায় মাল চালান যাচ্ছে। কিন্তু বাহন সাইকেল, দূরের দিকে তাকিয়ে লাভ নেই। খুচরো মালের কারবার নেই যখন, এই দশ মাইল পরিধির পাইকিরি খদ্দেররাই তার লক্ষ্য। তাদের নামধাম বার করে কে কত মাল আর কত রকমের মাল নিয়ে থাকে তার একটা খসড়া করে নিল। যারা আগে মাল নিত, কিন্তু এখন নিচ্ছে না বা কম নিচ্ছে—তারাও এখন নিজস্ব ফাইলে এলো।

সাপ চালানের ব্যবসা দেখার ব্যাপারে জোর দিয়েছিল রণজিৎ চালিহা। এর ফাইল কটাও খুঁটিয়ে দেখে নিল বাপী। কারা যোগান দিচ্ছে, কারা কিনছে, আর কত চাহিদা। চাহিদা বলতে গেলে আরো ঢের বেশি। এদিকেও নজর দেওয়া ঠিকই দরকার। এ-ব্যাপারে আবুর সঙ্গেই পরামর্শ করতে হবে। আবু বাড়িয়ে বলে নি, এখনো যে পর্যায়ের সাপ যে দামে কেনা হচ্ছে আর যে দরে বিক্রি করা হচ্ছে তার মধ্যে অনেক ফারাক। অর্থাৎ

লাভ অনেক।

মদ বিক্রি আর নেশার গাছ-গাছড়া ফলমূল বিক্রি থেকেও বছরে এন্তার টাকা আসে বাপী শুনেছিল। কিন্তু এ-সবের কোনো ফাইলের চিহ্ন নেই এই দপ্তরে। এ-সব সুড়ঙ্গ পথের কারবার, থাকবে না জানা কথাই। এই কারবারে মালিকের একমাত্র দোসর সম্ভবত রণজিৎ চালিহা। আবু রব্বানীও কিছু ভাগ পায় কিনা সঠিক জানে না।

সেদিন শনিবার। টাইপিস্ট আর অ্যাকাউনটেন্ট দুটোর পরে চলে গেছে। চালিহা আপিসেই আসে নি। বেয়ারাটা এই আপিসেই থাকে বলে সে আছে। আর নিজেরই গরজে বাপী আছে।

বেলা পাঁচটা নাগাদ হাতব্যাগ দোলাতে দোলাতে যে ঘরে ঢুকল তাকে এখানে দেখে বাপীর অবাক হবারই কথা। ঊর্মিলা রাই। পরনে হাল্কা সবুজ শাড়ি। গায়ে সবুজ ব্লাউজ। কপালে সবুজ টিপ। সুন্দরই লাগছে। কিন্তু বাপীর চোখ সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করছে না। এখানে আসার হেতু বুঝতে চেষ্টা করছে।

ঊর্মিলা এগিয়ে এসে টেবিলে ছড়ানো ফাইল ক'টা দেখল। তারপর বাপীর দিকে তাকালো। গম্ভীর। বলল, বাপী ইজ এ গুড বয়, শনিবারে বিকেল পাঁচটার পরেও কাজ করছে। মা জানলে খুশি হবে।

বাপী জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার?

—ব্যাপার কিছু না। বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। বেয়ারাটা রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, তুমি এখনো আপিসে আছ। তাই ইন্সপেকশনে এলাম। আমিও কাগজে কলমে ব্যবসার পার্টনার একজন জানো তো?

—জাগা না ঘুমন্ত?

—তার মানে?

—স্লিপিং পার্টনার কিনা জিগ্যেস করছিলাম।

—এখন পর্যন্ত স্লিপিং। মা জাগাতে চেষ্টা করছে।

বাপী বলল, তাহলে দয়া করে বসা হোক।

টেবিলের উপরেই ধার ঘেঁষে বসল ঊর্মিলা। বসার এই অন্তরঙ্গ চিত্রটা বরদাস্ত করার ইচ্ছে নয় বাপীর। বলল, চেয়ারগুলো কি দোষ করল?

—কেন, তোমার অসুবিধে হচ্ছে?

—হচ্ছে।

—কি অসুবিধে?

—দেখতে ভালো লাগছে না, এই অসুবিধে...

টেবিল থেকে নেমে ছদ্ম কোপে মেয়েটা চোখ পাকালো প্রথম। তারপর হেসে ফেলে একটা চেয়ার টেনেই বসল। বলল, এ-রকম অসুবিধে হতে দিতে আমিও রাজি নই।

বাপী জিজ্ঞেস করল, একলা বেড়াতে বেরিয়েছ?

সঙ্গে সঙ্গে রাগ।—কেন, আমি বাচ্চা মেয়ে না বাঘ-ভালুকে খাবে?

—তুমিই সেদিন বলেছিলে, মা একলা বেরুতে দেন না, সঙ্গে কেউ একজন থাকেই। মনে পড়ল। তার পরও বিরক্তি চাপা থাকল না।—আজও ড্রাইভার আছে, মায়ের

গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছি। মা-কে আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছি, বেশি আগলাতে চেষ্টা করলে আবার বাড়ি ছেড়ে পালাব।

বাপীর মুখে নিরীহ বিস্ময়।—আবার বলতে?

ঊর্মিলা ধমকালো। তারপর হেসেই জবাব দিল, একবার রাগ করে শিলিগুড়ি পালিয়ে গিয়ে এক বন্ধুর বাড়িতে দু'দিন ছিলাম। তার পরেই এ-প্রসঙ্গের ওপর যবনিকা। কাজ কি-রকম বুঝছ?

—চেষ্টা করছি।

আঙ্কলের কাছ থেকে ক্ষমতা-টমতা কিছু আদায় করতে পেরেছ?

—এখন পর্যন্ত কিছু না।

—সে কি! কাল রাতেই তো আঙ্কল মা-কে বলছিল, তোমাকে একেবারে ফ্রি-হ্যান্ড দিয়েছে।

এটা কত নম্বরি চাল চালিহার বাপী ঠাওর করে উঠতে পারল না। সাদা মুখ করে বলল, ফাইল পড়তে বলেছেন আর জঙ্গল স্টাডি করতে বলেছেন। আর গত পরশু ফার্মের রিপ্রেজেনটেটিভ হিসেবে একটা অ্যাক্রেডিটেশন দিয়েছেন। তোমার মা না চাইলে ক্ষমতা পাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না—

বাধা দিয়ে ঊর্মিলা বলে উঠল, মা কিছুই বলবে না বা কিছুই করবে না। চুপচাপ বসে তোমার মুরোদ দেখবে শুধু। একটু থেমে আবার বলল, তবে তুমি যখন আমার ফ্রেন্ড, তোমাকে চুপি চুপি বলে রাখতে পারি...তোমার ওপর মায়ের অনেক আশা—

বাপীর নিরীহ মুখ। চুপচাপ চেয়ে আছে—

—সব জেনে বুঝেও হাঁ করে চেয়ে থেকে বোকা সাজছ কেন? হাসল।—সত্যিকারের বন্ধু হলে আমিও তোমাকে কিছু কিছু সাহায্য করতে পারি।

মায়ের আশা আর নির্ভরতা আছে বলেই মেয়েও বন্ধুত্ব পাতিয়ে ওকে হাত করতে চায় এটুকু স্পষ্ট। সাহায্যের কথায় বাপী ঔৎসুক্য দেখালো।—কি রকম?

—মা তো চায়ই আমি একটু-আধটু কাজকর্ম দেখি। দেখব। কিন্তু আসলে আমার দ্বারা এ-সব কিচ্ছু হবে না। আঙ্কল তো মাসের মধ্যে সতের দিন ট্যুরে কাটায়—আজও চার দিনের ট্যুরে বেরুলো। সে না থাকলে এখানকার কাজে কি অসুবিধে হয়, আর কত রকমের গলদ দেখা দেয় সেটা বুঝতে তোমার আর কত সময় লাগবে? তুমি আমাকে বলবে, আর আমি তোমার একান্ত প্রশংসা করে মা-কে বলব। দায়িত্ব তখন তোমার হাতে সেধে আসবে দেখে নিও।

ওই মায়ের মেয়ের বুদ্ধি নেই কে বলবে।

হাসি মুখেই ঊর্মিলা আবার বলল, আমার প্রশংসার অনেক দাম আছে বুঝলে ফ্রেন্ড! এক রেশমা ছাড়া মা আমার মুখে আর কারো প্রশংসা শোনে নি কখনো—

—রেশমার অত ভাগ্য কেন?

—ও সত্যিকারের ভালো মেয়ে বলে। ভালো কথা, ওর মজুরিটা তুমি চটপট বাড়িয়ে দাও দেখি—

—কিসের মজুরি?

—সাপ ধরার। প্রাণের মায়া ছেড়ে জঙ্গলে সাপ ধরে বেড়ায়, অথচ পাওনার বেলায়

ওর ওপর অনেকদিন ধরে অবিচার হচ্ছে শুনেছি।

—আমি মজুরি বাড়িয়ে দেব?

—নিশ্চয় দেবে, যার যা পাওনা তাকে তা দেবে না কেন?

—রেশমার ওপর অবিচারের কথা তোমার মা-কে বলো না কেন?

—বলতে বাকি রেখেছি! মায়ের মতো রেশমাও দু' চক্ষে মদ খাওয়া দেখতে পারে না বলে মা ওকে পছন্দও করে, বিশ্বাসও করে—আমি বলতে ওকে রূপোর গয়নাও গড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু দেনা-পাওনার ব্যাপারে কখনো আঙ্কলের কাজে মাথা গলাবে না।

—আঙ্কলকে বলো না কেন?

হুঁঃ। বলা হয়েছে—তার কি মতলব কে জানে।

বাপী ভাবল একটু। বলল, সকলকে ছেড়ে প্রথমেই একটা মেয়ের জন্য আমার মাথাব্যথা দেখলে তোমার মা কি ভাববেন।

যুক্তিটা মেনে নিয়েও ঊর্মিলা হেসে উঠল।—ভাববে তুমি মজে গেছ। মরুকগে, আঙ্কলকে আমার কথা বলেই না হয় ওর মজুরিটা বাড়াতে চেষ্টা করো—অবিচার হচ্ছে বলে গত বছর থেকে মেয়েটা রাগে ফুঁসছে।

—ঠিক আছে। এবারে আলতো করে বাপী জিজ্ঞেস করল, তোমার সত্যিকারের বন্ধু হতে হলে আমাকে কি করতে হবে সেটা বললে না তো?

জবাবে ভ্রূকুটি। সেই সঙ্গে ঠোঁটে হাসি।—ধরে বাঁদর নাচ নাচাতে চাইলেও সেটা বরদাস্ত করতে হবে।

সাপের চালান আর চাহিদার হিসেব শুনে আবু রব্বানী বিড়ি দাঁতে চেপে এমন ভাবে তাকালো যার অর্থ, বাপীর বুদ্ধির দৌড় দেখে সে অবাকই হয়েছে। বলল, যত সাপ ধরা হয় আর চালান যায় তার সব হিসেব খাতায় ওঠে তুমি ভাবো নাকি! এর মধ্যে কালো ব্যাপার কিছু নেই?

বাপী এ-দিকটা ভাবে নি বটে। তবু চাহিদার ব্যাপারটা আবু অস্বীকার করল না। সাপ ধরার পার্টি আরো গোছালো ভাবে বড় করা যায় এও ঠিক। কিন্তু লাভের কড়ি আরো কিছু না খসালে তা হবে কেন? লাভের খবর এখন আর কে না রাখে? এ-ব্যবসায় তো মালিকদের শুধু মুনাফা লোটা ছাড়া আর কোনো কষ্ট করতে হয় না, তাহলে লাভের ন্যায্য ভাগ ওদের দেবে না কেন? আর এ-কাজে মেহনত বাড়ালে আবুরই বা বাড়তি লাভটি কি? মাস গেলে দুলারির নামে দিচ্ছে তো মাত্র পঞ্চাশটি টাকা।

আর কিছু অসুবিধের কথাও শুনল বাপী। গরীব বেদে-বেদেনীরা সাপ ধরলেই নগদ টাকা আশা করে। সেই ব্যবস্থাও দরকার। ম্যানেজার কত সময় থাকে না, তখন এক পাওনা পেতে ওদের কতদিন ঘুরতে হয়। অবশ্য টাকা অনেক সময় মালকান আগাম দেন, কিন্তু ম্যানেজারের সই না হলে হিসেব মেটে না। আবার অনেক সময় মেমসায়েবও পাহাড়ের বাংলোয় বা এ-ধার ও-ধার চলে যান। এই লোকগুলো তখন বিরক্ত হয়ে আবুকেই পাঁচ কথা শোনায়। বড় দল যে করবে, সম্বৎসরে ক'টা টাকা ওরা পায়—বছরের মধ্যে শীতের পাঁচ মাস মনসা মায়ের সন্তান-সন্ততিরা তো গর্তেই সেঁধিয়ে থাকে, আর বর্ষায় ওঁরা বাড়েন বটে কিন্তু ধরা পড়ে কম। সময়ে ভালো রসদ না পেলে দল বেঁধে

ওরা জানের ধকল পোহাতে আসবে কেন?

বাপী কথা দিল, মালিকের সঙ্গে আলোচনা করে যতটা সম্ভব সুব্যবস্থা করবে। কিন্তু ওর মুখ চেয়েও এ বছর সাপের চালান বাড়ানোর কথা আবুকে ভাবতে হবে। তারপর জিগ্যেস করল, রেশমার মজুরি নিয়ে অবিচার হচ্ছে শুনলাম, সেটা কি ব্যাপার?

আবুর একটা চোখ ছোট মানেই রসের খোরাক পেয়েছে।—অবিচারের কথা কে বলল?

—ঊর্মিলা রাই।

আবু হেসে মাথা নাড়ল।—অবিচার হচ্ছে আর সেটা হচ্ছে ওই ম্যানেজারের বজ্জাতির জন্য।

কি বজ্জাতি তাও শুনল। সাপ ধরতে সাধারণত দু'জন করে লোক লাগে। বেদেদের সঙ্গে অনেক সময় বেদেনীরাও থাকে, কিন্তু মজুরির হিসেব হয় পুরুষের নামে। রেশমার বেলায় হিসেব হয় ওরই নামে। সঙ্গীকে রেশমা ছ'আনা বখরা দেয়। ও-ই মুরুব্বি। চালিহার বিবেচনায় সব জায়গাতেই পুরুষের তুলনায় মেয়ের মজুরি কম। রেশমার রাগ কম কেন হবে, চালানের সময় কি সাপের গায়ে লেখা থাকে এটা মেয়েছেলে ধরেছে! এদিকে শুনলে রেশমাই সব থেকে বেশি যোগান দেয়। ও সাপের গর্ত চেনে, শীতের সময় শুধু ও-ই খুঁজেপেতে মাস গেলে দু'-পাঁচটা সাপ ধরে আনে।

—তাহলে ওর ওপর এই জুলুম কেন?

আবুর এক চোখ ছোট আবার।—একটু বাড়তি তোয়াজ তোষামোদের আশায়। এবাব বুঝেছ?

হাসতে গিয়েও আবুর মনে পড়ল কি। গলা খাটো করে বলল, সেদিন তুমি চলে যেতে দুলারি আমাকে বকাঝকা করছিল। সে-ও বলছিল, তোমাকে নেবার ব্যাপারে মেমসায়েবের মতলব রেশমারও না জানাই ভালো।...মেয়েটাকে দুলারিই সব থেকে বেশি ভালবাসে, কিন্তু ওর মেজাজ-মর্জির ওপর বিশ্বাস নেই। তোমার ওপর কখনো রেগে গিয়ে ওই শালার ম্যানেজারকে তোষামোদ করার জন্য যদি কিছু লাগিয়ে দেয় তাহলে চিত্তির। আবু বড় করে তাকালো বাপীর দিকে. এই জন্যেই তুমি রেশমাকেও জানাতে বারণ করেছিলে, তাই না?

বাপী অস্বীকার করতে পারে নি। কিন্তু দুলারি যে এত চতুর ধারণা ছিল না।

রবিবারের এই দুপুরেই রেশমার সাপ ধরা দেখেছে বাপী। ভয়ডর ওর নিজেরও কম, কিন্তু রেশমার আর তার সঙ্গীর দুঃসাহস দেখে বার বার গায়ে কাঁটা দিয়েছে। হাতের মুঠোয় জীবন নিয়েই ওরা বেরোয় বটে।

শুনল এই মৌসুমে এর মধ্যে আর একদিন মাত্র বেরিয়েছিল ওরা। কিন্তু তখনো শীতের আমেজ ছিল বলে একটাও মেলেনি। আজ এই দ্বিতীয় দফা বেরুলো। আবুর মুখে খবরটা শুনে বাপী আগেই রেশমার ঘরে এসে হাজির হয়েছিল। খুশি মুখে রেশমা টিপ্পনী কেটেছিল, ভয় পেয়ে আবার কেলেঙ্কারি কাণ্ড বাধাবে না তো?

কেলেঙ্কারি শব্দটা খট্ করে কানে লাগল বাপীর। সেটা বুঝেই রেশমা আবার বলল, ওই হারমা'র আগে যাকে কাজ শেখাতে গেছলাম প্রথম দিন একটা কেউটে ফণা তুলে ফোঁস করে উঠতেই ভয়ে আমাকে একেবারে জাপটে-মাপটে ধরেছিল।

দু'চোখ জোর করেই অন্যদিকে ফিরিয়েছে বাপী। এ কথার পর মেয়েটা আরো বেশি চোখ টানছিল। সাপ ধরতে বেরুনোর পোশাক বলতে পরনে একটা আঁট জাঙ্গিয়া আর গায়ে তেমনি আঁট গেঞ্জির মতো জামা একটা। পায়ে ফিতে বাঁধা জুতো। ব্যস। মেয়েটার এই যৌবন শাসনে রাখা ওই বেশের সাধ্যের বাইরে।

রেশমার এই সঙ্গীর নাম হারমা। এদিকেরই আদিবাসী। সমবয়সীই হবে দু'জনে। স্বাস্থ্য ভালো, হাবাগোবা মুখ। কিন্তু চাউনি সন্দিগ্ধ। প্রথম দেখেই বাপীর মনে হয়েছে রেশমার কাছে বাবুমানুষ আসাটা পছন্দ নয়। জঙ্গলের পথ ভাঙার ফাঁকে হেতুও বুঝেছে। ভক্ত মুগ্ধ হলে যা হয়, তাই। মুখে কথা নেই, কিন্তু চোখ দুটো নারী-অঙ্গ ছেড়ে নড়ে না। শিকারের সময়েও কি এই মুগ্ধ ভক্ত ওর দিকেই চেয়ে থাকে নাকি! তাহলে তো ছোবল খেয়ে মরার কথা।

সাপ ধরার সরঞ্জামও সাদাসিধে। হাতে এক ইঞ্চি মোটা আর দু' হাত লম্বা একটা করে লাঠি। লাঠির এক মাথায় কম্বলের টুকরোর মতো ছোট জাল আটকানো। আর বিপাকের হাতিয়ার হিসেবে কোমরে ছোরা গোঁজা। হারমার বগলে সরু আর গোল বেতের ঝুড়ি একটা, তার মধ্যে ছোট ছোট কতকগুলো দড়ির ফাঁস লাগানো থলে।

প্রথমেই অনায়াসে বড়সড় একটা নির্বিষ সাপ ধরে থলেতে পুরল ওরা। নির্বিষ সাপে পয়সা অনেক কম, কিন্তু বউনি ছাড়তে নেই। রেশমা ছুটে গিয়ে লাঠির মাথায় আটকানো কম্বলের জাল মাথায় ফেলতেই হারমা শক্ত দু'হাতে ওটার গলার কাছটা চেপে ধরে ঝুড়িতে ঢুকিয়ে দিল। তারপর থেকেই গায়ে কাঁটা বাপীর। একটা সাদা-কালো শাঁখামুটের পেছনে তাড়া করেছে ওরা। এরও ফণা নেই. কিন্তু অতি বিষাক্ত। এবারে লাঠির জালের দিকটা ওদের হাতে। তরতর করে একটা গাছের দিকে এগোতে যাচ্ছিল, তার আগেই রেশমা লেজের ওপর লাঠির ছোট ঘা বসালো একটা। সাপটা ওর দিকে তেড়ে আসতেই পিছন থেকে হারমা তেমনি লেজে ঘা মারল। এই চলল মিনিট কতক। রেশমাকে তাড়া করে তো হারমা লেজে ঘা মারে। আর হারমাকে তাড়া করে তো রেশমা। বিষাক্ত সাপের বেলায় দেখা গেল শেষ কাজ রেশমার। ফাঁক বুঝেই খপ করে এক হাতে গলার কাছটা চেপে ধরে মাটি থেকে তুলে ফেলল, আর গায়ে জড়ানোর আগেই অন্য হাতের মুঠো আর আঙুল সাঁড়াশির মতো খানিকটা নিচের দিকে চেপে ধরেছে। চোখের পলকে হারমার লাঠির জালের দিকটা শাঁখামুটের মুখের ওপর। বিষদাঁত ওই কম্বলের জালে আটকে গেল। তারপর ঝাঁপি থেকে থলে বার করে জাল সরিয়ে ওটার মুখে ধরলেই হল—তখন লেজ ওপরে মুখ নিচে। থলেতে না ঢুকে যাবে কোথায়?

এই দেখেই ঘাম ছুটেছিল বাপীর। তারপর দেড় ঘণ্টার মধ্যে পঁচিশ মিনিটের ফারাকে দু'দুটো গোখরো ধরা দেখে শরীরের রক্ত জল। প্রথমটা কম করে ছ'ফুট লম্বা হবে, পরেরটাও পাঁচ ফুটের কম নয়। আর তেমনি চক্কর বসানো বীভৎস ফণা। ধরার কায়দা একই, তবে ফণা আছে বলে আরো হুঁশিয়ার ওরা। ছোবল দেবার জন্য একজনের দিকে ফণা তুললেই অন্যজন লেজে বাড়ি দেয়। সেদিকে ফণা তুললেই অন্যজন তাই করে...রেশমার বুকের পাটা সম্পর্কে আবু বলেছিল, বিষাক্ত সাপগুলোর খপাখপ টুঁটি টিপে ধরা দেখলে তোমার তাক লেগে যাবে। একটুও বাড়িয়ে বলে নি। দেখেই বাপীর কালঘাম ছুটেছে। টুঁটি যখন চেপে ধরে তখন রক্তবর্ণ মুখ রেশমার, আর চোখ দুটোও

তখন সাপের মতোই ভয়াবহ। এক হাতে এই সাপ মুঠোয় ধরে রাখা যায় না, একটু বাদেই দু'হাত লাগাতে হয়। ততক্ষণে সাপের তলার দিকটা হারমার এক হাতের মুঠোয়। মুখে জাল লাগিয়েই অন্য হাতে ঝাঁপি থেকে থলে বার করবে।

রেশমা হাঁপাচ্ছে আর বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে। আবার হাসছেও। মুখ এখনো লাল। কাজ সারা হতেই ভক্ত হারমার মুগ্ধ দু চোখ আবার ওর দিকে তন্ময়।

বাপীর দিকে চেয়ে রেশমা বলল, রোসো, ওটার জোড়টাও এক্ষুনি এ-দিকে এলো বলে। সম্ভব হলে বাপী রেশমাকে টেনে নিয়ে চলে যেত। বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হল না, মিনিট পঁচিশের মধ্যে কোথা থেকে বেরিয়ে সাপটা সোজা তেড়ে এলো। কি ঘটেছে আঁচ করতে পেরেই হয়তো এই হিংস্র আক্রোশ। এটাকেও থলেতে পোরার পরে এই দিনের মতো ক্ষান্ত হল রেশমা।

খুশিতে আটখানা। তুমি আমার খুব পয়মন্ত লোক দেখি যে বাপীভাই! দু ঘণ্টার মধ্যে তিন-তিনটে জাতসাপ ধরে ফেললাম। তোমার পয়ে একটা শঙ্খচূড় পেলে হত—একটাতেই ডবল টাকা।

রেশমার হুকুমে ঝুড়ি মাথায় হারমা আগে আগে চলেছে—আবু সাহেবকে দেখিয়ে ওটা সাপ-ঘরে রেখে আসবে।

বাপী বলল, ভালো টাকা রোজগার হল আজ তাহলে?

—হলই তো। সঙ্গে সঙ্গে চোখেমুখে রাগের ঝলক।—অন্য লোকে ধরলে আরো বেশি টাকা পেত, আমি বলে ওই ম্যানেজারের বজ্জাতির জন্য কম পাই। ওই তিনটে বিষাক্ত সাপের জন্য অন্য লোকে কম করে তিন-পাঁচে পনের টাকা পাবে।

—আর তুমি?

—আমাকে দেবে বারো টাকা। এর থেকে হারমাকে ছ'আনা ভাগ দিলে আমার কি এমন থাকে?

অর্থাৎ একটা সাপের জন্য চার টাকা। ওর ভাগে থাকে আড়াই টাকা। বুকের তলায় মোচড় পড়ছে বাপীর। মাত্র আড়াইটে টাকার জন্য এক-একবার হাতের মুঠোয় প্রাণ!

রেশমার আবারও ঝাঁঝালো গলা—ওই ম্যানেজারকে বলে আমার পাওনাটা এবারে তুমি ঠিক করে দাও না, অন্যের থেকে আমি কম পাব কেন? .

—আমি বললে বেশি দেবে?

—হাড় পাজি ওটা, এমনি বললে দেবে না, একটু তোষামোদ করে বলতে হবে।

বাপী জবাব দিল, আমার দ্বারা ওটাই তো হয় না...

—হয় না মানে, নিজের জন্যে তো বেশ তোষামোদ করতে পারো!

কি মনে পড়তে বাপীর স্নায়ুগুলো সজাগ হয়ে উঠল হঠাৎ। ভালো করে মুখখানা দেখে নিতে ইচ্ছা করল। কিন্তু খানিক আগের ভয়াল উত্তেজনা কমে আসার পর এই মেয়ের পাশাপাশি চলাটাই অস্বস্তিকর। হারমা হয়তো রাগ বা অভিমান করেই অনেকটা এগিয়ে গেছে।

সাদা মুখেই বাপী জিগ্যেস করল, তুমি পারো না তাকে তোষামোদ করতে?

—আমি? আমি ওর ঘরে কেউটে বা গোখরো ছেড়ে দিয়ে আসতে পারি।

—সেই রাতে তাই ছাড়তে গেছলে?

এক ঝটকায় সামনে এসে মুখোমুখি দাঁড়াল রেশমা।—কোন্ রাতে?

—পনের-ষোল দিন আগে যে রাতে আবুকে সঙ্গে করে আমি নিজের জন্য তোষামোদ করতে গেছলাম?

কয়েক মুহূর্তের জন্য হতচকিত মুখ। তারপরেই দু' চোখ ঝলসে উঠল।—তোমাকে কে বলল?

—কেউ না। আমার ধারণা তুমি তখন ম্যানেজারের ভিতরের ঘরে ছিলে। বাপী হাসছে অল্প অল্প। অত চোখ লাল কোরো না, সরো!

ছিটকে সরে গিয়ে রেশমা দ্রুত হেঁটে চলল। একটু বাদেই গাছগাছড়ার আড়ালে।

বাপী সেখানেই আরো খানিক দাঁড়িয়ে। হঠাৎ মাস্টারমশাই ললিত ভড়ের মেয়ে কুমকুমের মুখখানা মনে পড়ল। পেটের দায়ের সেই মুখের সঙ্গে রেশমার এই মুখের অনেক তফাৎ।

রেশমা বারবর্ণিনী নয়। রেশমা ফণিনী।

## চৌদ্দ

দু'তিনখানা চেয়ার পড়ে সামনে সে-রকম চিলতে বারান্দা। মাঝারি সাইজের শোবার ঘর একটা। তার পিছনে পার্টিশন করা দুটো ছোট খুপরি। কিচেন আর বাথ। যেমন কথা হয়েছিল গায়ত্রী রাই তার কিছু বেশিই করে দিয়েছে। নিজের বাংলো থেকে জলের পাইপ আর ইলেকট্রিকের লাইন টেনে দিয়েছে। কাঠের কাজ সব, নগদ টাকা ফেললে এটুকু কনস্ট্রাকশনের জন্য কন্ট্রাক্টরের কত আর সময় লাগতে পারে। রাশভারী মহিলার তাড়ায় দেড় মাসের মধ্যে সব কাজ শেষ। মাঝে মেহেদির পার্টিশন বসানোও। একদিকের বারান্দা বা ঘর থেকে অন্যদিকের বাংলো শুধু দেখা যায়। মানুষ দেখা যায় না।

কর্ত্রীর নির্দেশে এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে বাপী তরফদার চা-বাগানের ক্লাব ছেড়ে এই বাসস্থানে উঠে এলো। মহিলাকে এই দু' মাস ডাটাবাবুর চড়া বিল মেটাতে হয়েছে। এ-সময়টা বাপীকে পঞ্চাশ টাকা করে পকেট-খরচ দেওয়া হয়েছে। দু'বেলার চা-জলখাবার পর্যন্ত ব্যবসার অ্যাকাউন্টে গেছে যখন বাপীর পাঁচ টাকারও দরকার হয় নি। অ্যাকাউনটেন্ট পঞ্চাশ টাকা হাতে তুলে দিতে কর্ত্রীর নির্দেশ বুঝে সে-ও নিয়ে নিয়েছে।

এর মধ্যে আর মাত্র দু'দিন বাপী তরফদার এখানে এসে কর্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিল। অ্যাকাউনটেন্ট প্রায় রোজই আসে। প্রথমবার তার মারফৎ বাপী খবর পাঠিয়েছিল, দেখা করা দরকার। গায়ত্রী রাই সেই বিকেলেই তাকে যেতে বলেছে। আর বারান্দায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঝালো গলায় বলেছে, খবর পাঠানোর মানে কি, দরকার পড়লে নিজে চলে আসতে পারো না?

বাপী তক্ষুনি রাগের হেতু বুঝেছে। অ্যাকাউনটেন্ট আর টাইপিস্ট দু'জনেই রণজিৎ চালিহার বশংবদ। জানান দিয়ে দেখা করতে আসাটা গোপন না-ও থাকতে পারে। কিন্তু কাজে নামার পর সেই কদিনে বাপীর মনের জোর আর বিশ্বাসও কিছু বেড়েছে। ঠাণ্ডা মুখেই জবাব দিয়েছিল, দরকার পড়লে চলে আসার ব্যাপারে আপনিই একটু অসুবিধের

সৃষ্টি করেছেন। কখন এলে অখুশি হবেন না বা তাড়িয়ে দেবেন না আমার পক্ষে বোঝা মুশকিল।

মুখের ওপর কথা বরদাস্ত করার মেজাজ নয় মহিলার। কিন্তু সেই তপতপে চাউনির সবটাই খুব অকৃত্রিম মনে হয় নি বাপীর। গম্ভীর। হুকুম করেছে, বোসো। দুপুরে রোজই সাইকেল নিয়ে বেরুচ্ছ?

বাপী মাথা নাড়তে আবার বলেছে, দুপুরের দিকে আমি ফ্রি থাকি, দরকার পড়লে তখন এসো।

বাপীর হাতে তার সেই নিজস্ব ফাইল আর সঙ্গে মাঝারি সাইজের একটা ডায়রি। দশ মাইল জুড়ে রোজ ঘোরাঘুরির ফলে ফাইল আরো পুষ্ট হয়েছে। ডায়রিতে প্রতি দিনের কাজের হিসাব। কোন্ তারিখে কোথায় কোন্ পার্টির সঙ্গে দেখা করেছে, তাদের কি অসুবিধা বা অভিযোগ ইত্যাদি।

বাপী ফাইল খুলতেই মহিলা চেয়ার ছেড়ে উঠে ভিতরের ঘরে গেছে। একটু বাদে খাপসুদ্ধু পড়ার চশমাটা নিয়ে এসেছে। সেই ফাঁকে বাপী দেখেছিল পাশের জমিতে তার ঘর উঠছে। আর এদিকে তিন-তিনটে মালী মেহেদির পার্টিশন বসানোর জন্য মাটি খুঁড়ছে। কিন্তু মহিলা এ-সম্বন্ধে সেদিন একটি কথাও তোলেনি। ফলে বাপীও নিরাসক্ত।

শৌখিন সোনার ফ্রেমের চশমা এঁটে ফাইলটা আদ্যোপান্ত পড়েছে। ডায়রিটাও। মুখ দেখে খুশি অখুশি কিছু বোঝা গেল না। কিন্তু বাপী জানতো অখুশি হবার কোনো কারণ নেই। অঙ্কের মাথা বরাবর সাফ। ছকে বেঁধে কাজে নেমেছে। তিন সপ্তাহ আগের আর তিন সপ্তাহ পরের লেনদেনের চার্ট পাশাপাশি রেখেছে। কি কারণে ক'জন ছোটখাটো পাইকিরি খদ্দের তাদের কাছ থেকে মাল নেওয়া বন্ধ করেছিল, আর কি শর্তে আবার তারা হাত মেলাতে রাজি—ফাইলে তাও লেখা আছে।

ফাইল দেখা আর ডায়রি পড়া শেষ করে মহিলা চশমাটা আবার খাপে পুরে শোনার জন্য প্রস্তুত—বলো।

বাপী জানিয়েছিল, কাছাকাছির এইসব ছোট পাইকিরি খদ্দেরদের বেলায় আসল গলদ সময়ে মাল পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে। মাসে একবার ঝাঁকামুটে দিয়ে বা গোরুরগাড়িতে করে তাদের কাছে মাল যায়। নয়তো লরি যখন দূরে দূরে বড় চালান নিয়ে যায় তখন পথে পড়ে বলে তারা কিছু কিছু পায়। সে-ও কচিৎ কখনো। এখন থেকে পনের দিনে একদিন সে যদি মাল সহ ভ্যান নিয়ে ঘুরে আসতে পারে তাহলে এই সার্কেলের ব্যবসাই যে আরো ছ'আনা বাড়ানো সম্ভব সেই হিসেব ওই ফাইলেই আছে।

গায়ত্রী রাই জিজ্ঞেস করেছিল, মিস্টার চালিহাকে বলেছ?

—বলেছি। তাঁর মতে এত ছোট কাজে লরি দেওয়া সম্ভব নয়, আর ভ্যান আপনার হেপাজতে।

একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করেছে, কমপ্যারেটিভ চার্টে এই তিন সপ্তাহের মধ্যে তুমি যে বাড়তি বিক্রি দেখিয়েছ, সেই মাল তারা পেল কি করে?

এই প্রশ্নটার জন্যই ভিতরে ভিতরে উৎসুক ছিল বাপী। নির্লিপ্ত মুখে জবাব দিয়েছে, খদ্দেরদের চাহিদা জেনে গুদাম থেকে ছালায় মাল বোঝাই করে সাইকেলের ক্যারিয়ারে

চাপিয়ে নিজেই পৌঁছে দিয়েছি। বিক্রি বাড়বে বোঝার পরে আপনাকে ভ্যানের কথা বলতে এসেছি।

গায়ত্রী রাইয়ের চোখে পলকের বিস্ময় দেখেছিল বাপী। এটুকুই কাম্য ছিল। বি-এস সি পাশ ভদ্রলোকের ছেলে এই মেহনতের কাজও করতে পারে ভাবেনি।

—ভ্যান পাবে। কবে চাই?

—কাল একবার পেলে ভালো হয়, চৌদ্দ দিনের মাথায় আর একবার নেব।

—ঠিক আছে।

এই ঠিক আছের অর্থ সে বিদায় হতে পারে। তার দু'দিন বাদে ঊর্মিলা বিকেল সাড়ে পাঁচটার পর আবার আপিসে হাজির। আগের দিনের পর সতের দিন বাদে এই দেখা। এই দিনেও অ্যাকাউনটেন্ট আর টাইপিস্টের থাকার মেয়াদ পার করে দিয়ে এসেছে। আগের দিন বেলা এগারটা থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ভ্যানে মাল চালানোর ধকল গেছে বাপীব। পরদিন ছুটির পর নিরিবিলিতে নিজের ফাইলে লেনদেনের হিসেব লিখে রাখছিল।

ঊর্মিলার পরনে প্রথম বিকেলে দেখা সেই রঙিন ঘাগরা, গায়ে লম্বা সাদা ব্লাউস। যা-ই পরুক, মেয়েটাকে ঝকঝকে দেখায়। কিন্তু সেইদিন মুখখানা বিবস। টেবিলের সামনে এসেই বলে উঠেছিল, মা-কে ঘায়েল করে বেশ খুশি মেজাজে আছ—কেমন?

বাপী ভিতরে উৎসুক, বাইরে অবাক।—কি করেছি? বোসো।

—ভদ্রলোকের ছেলে, সাইকেলে মাল বয়েছ, কাজ দেখিয়ে মন কেড়েছ। অসহিষ্ণু হাতে চেয়ার টেনে বসল।—প্রশংসা শুনে তোমার সম্পর্কে কড়া কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল, বলার মতো চট করে কিছু পেলাম না।

বাপী হেসে ফেলেছিল।—আমার ভাগ্য। কিন্তু তোমার রাগের কারণ কি?

—তোমার সঙ্গে আমার ফ্রেন্ডশিপ হবে না—সাফ কথা। আর, আমি পিছনে লাগলে তোমার খুব সুবিধে হবে না তাও জেনে রেখে দিও।

—কি মুশকিল, দোষটা কি করলাম?

—দোষ কি তুমি জানো না? রেশমাকে কি বলেছ?

যত রাগই দেখাক, বাপীর মনে হয়েছিল ওর মায়ের খুশির খবর দিয়ে তাকেও একটু খুশি করার তাগিদ আছে। জবাব দিয়েছে, কেন কি বলেছি তা বোধ হয় জানো না...

—তাও জানি। ওটা পাজির পা-ঝাড়া, তোমাকে আগে তোষামোদের খোঁচা দিয়েছিল নিজেই স্বীকার করেছে। তা বলে তুমি ও রকম করে বলবে? আঙ্কলের কাছে অনেকরকম কাজে গিয়ে থাকতে পারে।

—তা পারে তবে ভদ্রলোক তখন ড্রিঙ্ক করছিলেন, তাঁর ভেতরের ঘরে সবুজ আলো জ্বলছিল, রেশমা সেখানে ছিল।

—তোমাকে আব ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না, মুখ লাল ঊর্মিলার, আমি সব জানি--আমার কোনো কাজেই যদি ও গিয়ে থাকে আর আঙ্কল যদি শয়তানি করে ওকে ভিতরে ডেকে পাঠায়—ও কি করবে?

বাপীর মজাই লাগছিল। কিন্তু গম্ভীর।...রেশমাকে পাজি বললে, আঙ্কলকে শয়তান বললে আর আমাকে তো কতবার সেয়ানা বলেছ—তোমার চোখে ভালো কে?

—কেউ না। মোট কথা তুমি যা ভেবেছ সব বাজে। খবরদার, মায়ের কাছে এ-সম্বন্ধে একটি কথাও নয়।...রেশমার সাপ ধরা তো নিজের চোখেই দেখেছ, ওই মজুরিতে পোষায় না—অন্যের থেকে ওকে কম দেবার কোনো মানে হয়?

—কোনো মজুরিতেই পোষায় না আর কম দেবারও মানে হয় না। আমার হাত থাকলে তোমাদের এ-ব্যবসা আমি বন্ধ করে দিতাম।...তোমার নাম করে রেশমার মজুরি বাড়ানোর কথাও চালিহা সাহেবকে বলেছিলাম—

—তারপর? এবারে উৎসুক।

—উনি ঠাট্টা করে ফিরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার কোনো ইন্টারেস্ট আছে কিনা। আমি বলেছি নেই।

—হাড়ে হাড়ে শয়তানি। ফিক করে হেসেও ফেলেছিল।—একেবারে নেই বলে দিলে কেন, রেশমা খারাপ কি—এবারে চটে যাবার আগে পর্যন্ত দেখেছি তোমাকে ও খুব পছন্দ করত।

ভেতর-বার এক-রকম নয় বাপীর। ভেতরে আঁচড় পড়েছে। নিজেকে চোখ রাঙিয়েছে। এই মেয়ে এমন প্রগলভ হতে পারে অবশ্য ভাবেনি। ফাইলটা সামনে টেনে নিয়ে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করেছে, রেশমার সম্পর্কে তোমার এত আগ্রহ কেন?

জবাব দিতে গিয়ে থমকেছিল একটু। তারপর বলেছে, বাঃ, ওই তো একমাত্র সঙ্গী আমার এখন। তারপরেই ঝাঁঝ দেখিয়েছে,—দেখো, ফ্রেন্ড বলে আমার ওপর মাতব্বরি করতে এসো না—আমার আগ্রহ তাতে তোমার কি?

কিন্তু আর না বসে চটপট চলেও গেছে।

পনের দিন আগে গায়ত্রী রাইয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় দফা সাক্ষাৎ বাপীর। নির্দেশমতো দুপুরেই এসেছিল। সঙ্গে সেই ফাইল আর ডায়রি। সেদিনও লক্ষ্য করেছে পাশের জমিতে তার ঘরের তিন ভাগ কাজ সারা।

গায়ত্রী রাই তখন তার এখানকার আপিসঘরে। সেখানেই ডাক পড়েছে। দু'বার ভ্যান পাওয়ার ফলে বিক্রির তুলনামূলক চার্ট দাখিল করেছে বাপী। খদ্দেরের লিস্ট-এ তিনটি নতুন নামও দেখাতে পেরেছে।

ফাইল আর ডায়রির পাতায় চোখ বুলিয়ে গায়ত্রী রাই সে-দুটো আবার তার দিকে ঠেলে দিতে বাপী একটা প্রশ্ন করেছিল আর একটা প্রস্তাব দিয়েছিল। প্রশ্নটা শুনে কর্ত্রীর সতর্ক চাউনিও লক্ষ্য করেছিল।

এরই মধ্যে মোটামুটি দু'জন বড় পাইকেরি খদ্দের কিছু জিনিস চেয়েছে যা এখানকার গোডাউনে নেই বাপী জানে। কিন্তু তারা সেটা মানতে রাজি নয়, তাই বাপীর প্রশ্ন, এখানকার গোডাউনে যে-সব মাল আছে তাছাড়া মালিকের হেপাজতে আর কোনো জিনিস আছে কিনা।

শুনেই বাঁকা ঠেকেছে।—কি জিনিস চেয়েছে তারা?

—শুখাসিদ্ধি, আফিম আর মিঠা জহর।

গায়ত্রী রাইয়ের গোল দু চোখ তার মুখের ওপর নড়েচড়ে স্থির আবার।—এসব আমাদের কাছে থাকতে পারে তাদের ধারণা হল কেন?

—ধারণা নয়, তারা আছেই জানে। তাদের দাবী আগে পেয়েছে এখন কেন পাবে না?

গায়ত্রী রাইয়ের চাউনিতে বিস্ময়ের ছোঁয়া।—কত আগে পেয়েছে?

বাপী নির্লিপ্ত খুব।—কারো নামে কিছু বলতে রুচিতে বাধে, ওদের বক্তব্য শুনলে আপনার নালিশের মতো লাগবে।

ধৈর্য কম মহিলার, কড়া গলায় তাগিদ দিয়েছে, আমি শুনতেই চাই!

—তাঁদের অভিযোগ, ওসব জিনিস মিস্টার চালিহা আগে সেধে দিয়ে এসেছেন, আর তার জন্য তারা ভালো দামও দিয়েছে। কিন্তু চালিহা সাহেব এখন এত বড় হয়ে গেছেন তাঁর আর পাত্তাই নেই, ফলে তারা জিনিসও পাচ্ছে না।

মহিলার ঠাণ্ডা মুখভাবে রকমফের ছিল না খুব। তবু বাপীর ধারণা খবরটা তার কাছে নতুন—আর সেই সব মাল বিক্রির ভালো দামও তার হিসেবে আসে নি।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, এ ব্যাপারে আমি পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব। মিস্টার চালিহাকে কিছু বলেছ?

—না।

—বলার দরকার নেই।

এরপর সাপ চালানের ব্যবসা সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছিল বাপী। আবু রব্বানী আর দুলারির সঙ্গে পরামর্শ করে মোটামুটি একটা প্ল্যান ছকেই এনেছিল। সাপ ধরার দল পুষ্ট করে তুলতে হলে, অর্থাৎ প্রতি বছর যারা নিয়মিত এই কাজে আসবে এমন একটা দলকে ক্রমে বড় করে তুলতে হলে তাদের মজুরি বাড়াতে হবে, পাওনা-গণ্ডাও নগদ মিটিয়ে দিতে হবে। চালান যদি চাহিদা অনুযায়ী শতকরা পঁচিশ ভাগও বাড়ানো যায়, তাহলেও বাড়তি খরচ পুষিয়ে লাভ বেশি থাকে। তাছাড়া খরচের প্রশ্ন তুলে দালালদের সঙ্গেও দামের নতুন ফয়সলার চেষ্টা করা যেতে পারে। যে রকম চাহিদা, চাপ দিলে তাদের দাম না বাড়িয়ে উপায় নেই।

এই প্ল্যানও খুঁটিয়ে দেখে গায়ত্রী রাই খুব যে খুশি তা নয়। সাপ পিছু আট আনা এক টাকা বা শঙ্খচূড় অথবা অতিকায় ময়াল পাইথন হলে দশ পনের টাকা বেশি মজুরির প্রস্তাব। এছাড়া দল-গড়া আর পাকা তদারকির জন্য দুলারির নামে আবুর মাইনে পঞ্চাশের জায়গায় একশ টাকা আর তার সহকারী হিসেবে কাজ করার জন্য আরো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে একজন লোক রাখা, বাড়তি সাপ রাখার সুব্যবস্থা করার জন্য দুলারির ঘরভাড়া কুড়ি টাকা থেকে তিরিশ টাকায় তোলা—এসব তার তেমন ভালো লাগার কথা নয়। কিন্তু প্ল্যান অনুযায়ী কাজ হলে বাড়তি খরচ পুষিয়েও যে লাভের অঙ্ক বাড়ে, সেই হিসেব তার চোখের সামনেই। তাছাড়া এর ফলে পাহাড়ের বাংলোয় বিষ বার করার পরিমাণও বাড়বেই। তাতেও মোটা লাভ।

মুখে এতটুকু খুশি বা আশার অভিব্যক্তি নেই। উল্টে মন্তব্য করেছিল, তুমি তো দেখি দানছত্র খুলে বসতে চাও।

বাপী জবাব দিয়েছে, আমি আপাতত যা চেয়েছি সেটা মিনিমাম।

সঙ্গে সঙ্গে কড়া চাউনি মহিলার।—তার মানে এটুকু না হলে তুমি কাজে হাত দেবে না?

—না। আমার অসুবিধে হবে।...হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে কি ভয়ঙ্কর সাহসে বুক বেঁধে ওরা এই কাজ করে জঙ্গলে ঘুরে, সেটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। ভালো লাভ

সত্ত্বেও এটুকুও ওদের দিতে না পারলে আমার বিবেকে বাধবে।

নিজে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ওদের কাজ দেখার কথা শুনে মহিলার চোখে বিস্ময়ের ছোঁয়া, কি আবেগের কথা শুনে, বাপী ঠাওর করতে পারে নি। এ প্রসঙ্গও গায়ত্রী রাই সেখানেই শেষ করেছিল। প্ল্যানের খসড়া নিজের কাছে রেখে দিয়ে বলেছিল, ভেবে দেখি। তাছাড়া মিস্টার চালিহার সঙ্গেও পরামর্শ করে দেখতে হবে।

কিন্তু মেজাজের কিছু পরিবর্তন দেখাই গেছে। জিগ্যেস করেছিল, চা খাবে?

বাপী মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

তারপরেও অনেকটা নির্লিপ্ত মুখেই গায়ত্রী রাই বলেছে, তোমার ঘর তো প্রায় শেষ...দেখেছ?

মনে মনে এইটুকুও অনুগ্রহ ধরে নিয়েছিল বাপী। কারণও আঁচ করতে পেরেছিল। অখুশি নয় বোঝা গেছে। বাপী মাথা নেড়েছে, দেখে নি।

—ইচ্ছে করলে দেখে যেতে পারো।

—দেখবই তো...তাড়া কি! থ্যাঙ্কস—

পনের দিন বাদে এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহের এই রবিবার সকালে চা-বাগানের ক্লাবঘর ছেড়ে নতুন বাসায় চলে আসার হুকুম হয়েছে।

বাপী এসেছে।

ভাবছিল কিছু। নিজস্ব ঘর হল বটে, এখন তড়িঘড়ি অনেক কিছুর ব্যবস্থা করতে হবে। আজকের মধ্যেই একটা খাট কেনা দরকার। বিছানা-পত্রের যা অবস্থা সেগুলো ব্যবহার করতে নিজেরই এখন অরুচি। শৌখিন কর্ত্রীটি বা তার মেয়ে দেখলে নাক সিঁটকোবে। সে-সবও নতুন করতে হবে। বারান্দায় পাতার মতো গোটাতিনেক চেয়ার আর একটা ছোট টেবিল অন্তত চাই। যতটা সম্ভব ছিমছাম ভাবেই থাকতে হবে। পাশাপাশি ঘর তোলার কথা বলেছিল যখন, এই বিড়ম্বনার কথা ভাবেনি। এছাড়া রান্নাবান্নার সরঞ্জাম চাই, চায়ের ব্যবস্থা চাই। টুকিটাকি আরো অনেক কিছু চাই। অনেক দিনের অনভ্যাসের দরুন বাপীর হালছাড়া মনের অবস্থা।

—নিজের ঘর দেখে যে মুগ্ধ একেবারে, কোনোদিকে আর হুঁস নেই দেখছি!

ঊর্মিলা। বাপী এদিকে ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল। নিশ্চয় পা টিপে এসেছে, নইলে পায়ে ক্যানভাসের চপ্পল হলেও কাঠের মেঝেতে টের পাবার কথা।

ঘুরে দাঁড়াতে ঊর্মিলা বলল, মা ডাকছে—জলদি!

তাড়া দিল কিন্তু নিজে ঘর ছেড়ে বেরুনোর জন্য ব্যস্ত নয় একটুও। খেদের সুরে বলল, ইউ আর ভেরি লাকি। মা রাজি হলে আমি তোমাকে তার সঙ্গে ও-বাড়ি থাকতে পাঠিয়ে আমি এটা দখল করতাম।

বাপী বলল, চলো তাহলে, তাঁকে সেই প্রস্তাব দিয়ে দেখা যাক।

ঊর্মিলা প্রথমে চোখ পাকালো। তারপর হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসি আর থামতেই চায় না।

—কি হল?

হাসি থামার পরেও লাল মুখ। বলল, যে হারে তুমি মায়ের মন কাড়ছ, তার বয়েস আরো বছর বারো কম হলে বা তোমার বেশি হলে ঠিক একটা লটঘট কাণ্ড হয়ে যেত।

বাপীও হেসেই ফেলল। মেয়েটার মুখে কিছুই আটকায় না দেখছে।

মেহেদি পার্টিশনের মাঝখানে যাতায়াতের-গেট-টেট কিছু রাখা হয় নি। আসা-যাওয়ার প্রয়োজনে সামনে দিয়েই ঘুরে আসা ঘুরে যাওয়া।

গায়ত্রী রাই বারান্দার চেয়ারে বসে সোনালি চশমা এঁটে কাগজ পড়ছে। ওরা দু'জন উঠে আসতে কাগজ সরালো, চশমা খুলে খাপে ঢোকালো। গম্ভীর, তবে অপ্রসন্ন নয়। গলার স্বরও মোলায়েম। পছন্দ হয়েছে?

বাপী জবাব দিল এত ভালো আশা করি নি।

—বোসো। এত ভালো এমনি হয় নি, অনেক খরচ পড়েছে। সব হিসেব তুমি পাবে। আর—

বাপীর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েও মায়ের পাশের চেয়ার টেনে বসতে যাচ্ছিল। দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, তাহলে আমি সরে পড়ি—

—বোস্। এখানেই ব্রেকফাস্ট দিতে বলেছি। তাছাড়া এই হিসেবের মধ্যে তোর থাকা দরকার। আর কত দিন আমি একলা সব দিক দেখব?

মেয়ে হালছাড়া মুখেই বসল। কিন্তু তারপর জবাবখানা যা দিল রসিয়ে শোনার মতো। বলল, বরাবর একলাই দেখতে হবে, আমাকে তো বিয়ে দিয়ে চটপট শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর মতলবে আছ।

বাইরে বোঝা না গেলেও মহিলার মেজাজ এই সকালে প্রসন্নই বলতে হবে। বাপীর সামনে এই উক্তির দরুন একটুও রাগ করল না। মেয়ের উদ্দেশে হাল্কা জবাব দিল, সে চিন্তা তোকে করতে হবে না, বিয়ে যে করবে তাকেই এসে শ্বশুরবাড়িতে থাকতে হবে।

মেয়ে ওমনি ফোঁস করে উঠল, আই উইল নেভার এগ্রি—দ্যাট পারসন মাস্ট বি এ ভেড়া-মার্কা সামবডি।

বাপীর দিকে চেয়ে গায়ত্রী রাই বলল, সি ইজ ইনকরিজিবল।

মেয়েও তক্ষুনি বাপীর দিকে ফিরে চোখ পাকালো। এ ব্যাপারে মায়ের কথায় সায় দিলে ফ্রেন্ডশিপ ঘুচে যাবে মনে রেখো!

কোয়েলা মস্ত একটা ট্রে এনে টেবিলে রাখল খোসাসুদ্ধ তিনটে বড় কলা, দুটো ডিশে দুটো করে এগপোচ, একথাক টোস্ট, বাটির মাখনে বাটার-নাইফ গোঁজা। দুটো জেলি আর জ্যামের শিশি। একটা বড় কাঁচের বাটিতে কর্নফ্লেক্স, পাশে মিল্ক-পট আর সুগার-পট।

ট্রে থেকে কর্নফ্লেক্স-এর বাটিটা তুলে কোয়েলা কর্ত্রীর সামনে রাখল। বিধবা নেপালিনীদের ডিম বা আমিষ চলে কিনা বাপী জানে না। একটা কলা ছাড়িয়ে কোয়েলা ছুরি দিয়ে চাক চাক করে কেটে কর্নফ্লেক্স-এর ওপর ছড়িয়ে দিল। তারপর দুধ আর চিনির পট বাটির সামনে রেখে চলে গেল।

ঊর্মিলা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে ওদের দু'জনের টোস্টে মাখন মাখাচ্ছে। গায়ত্রী রাই কর্নফ্লেক্স-এর বাটিতে পটের দুধটা ঢেলে নিয়ে দু' চামচ চিনি ছড়িয়ে দিয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

আর ঠিক তক্ষুনি বাপীর জিভ এমনি সুড়সুড় করে উঠল যে সংবরণ করাই গেল

না। কারো দিকে না চেয়ে খুব সাদামাটা সুরে বলল, ব্রেকফাস্টের ব্যাপার দেখেই মনে হচ্ছে শ্বশুরবাড়িতে যে আসবে সে নিজেই আর নড়তে চাইবে না।

গায়ত্রী রাইয়ের ঠোঁটের ফাঁকে এবারে চুলের মতো একটু হাসির রেখা। শোনার পর মেয়ের দিকে চোখ। কিন্তু টোস্টের ওপর ঊর্মিলার বাটার-নাইফ থেমে গেছে। চকিতে একবার ঘাড় ফিরিয়ে ভিতরেব দরজার দিকটা দেখে নিল। তারপর ঝকঝকে দু' চোখ বাপীর মুখের ওপর।—ওই কোয়েলাকে তোমার পছন্দ হয়?

বাপীর নিরীহ আক্রান্ত মূর্তি। গায়ত্রী রাই বলে উঠল, ও ডলি!

কিন্তু মায়ের অনুশাসনে মেয়ে ভ্রূক্ষেপও করল না। ঝাপটা মেরে বলে গেল, কোয়েলার জন্য মা বর খুঁজছে, পেলে সেও এই বাড়িতেই থেকে যাবে আর ভালো ভালো খেতে পাবে—চাও তো লাগিয়ে দিতে পারি।

বলতে বলতে নিজেই হেসে ফেলে ধুপ করে চেয়ারে বসে পড়ল। নিরুপায় গায়ত্রী রাইকেও এবার হাসতেই দেখল বাপী। তারপর পলকা ধমক, দিনকে দিন ছেলেমানুষি বাড়ছে তোর ডলি!

খেতে খেতে আবার কাজের কথা, অর্থাৎ সেই হিসেবের কথা। আর এসব কথার সময় স্বভাবতই মহিলা বেশ গম্ভীর।—এ বাড়ি আর তোমার ওই ঘর তোলার জন্য মোট যা খরচ হয়েছে তার সব হিসেব রেডি করে অ্যাকাউনটেন্ট তোমাকে কপি দেবে। খরচ অনেক হলেও বাড়ি ভাড়ার একশ টাকা থেকে মাসে পঞ্চাশ টাকা করেই কাটা হবে, পঞ্চাশ টাকা হাতে পাবে—ও কে?

এ উদারতার কারণ বুঝতেও বাপীর এক মুহূর্ত সময় লাগল না। দখলের দাবী যত দীর্ঘমেয়াদী হয় ততো তার সুবিধে। বাপী ভালো মুখ করে জবাব দিল, পুরো একশ টাকাই কাটতে পারেন।

—না, পঞ্চাশ টাকাই কাটব—মাইনে তো আপাতত বেশি পাচ্ছ না। ক্লাবে থাকার খরচ চালাতে হবে বলে এতদিন পঞ্চাশ টাকা করে পকেট খরচ পেয়েছ, সেটা বড় জোর এখন দু'শ টাকা হবে। এর সঙ্গে বাড়িভাড়া থেকে কিছু না পেলে তোমার চলবে কি করে।

আগে দু'শ টাকা মাইনে শুনলে আনন্দে ভেতরে সাড়া জাগত। কলকাতার লোয়ার ডিভিশন চাকরির মাইনে ছিল সর্বসাকুল্যে আটাত্তর টাকা। কিন্তু এখন কিছুই খুব অপ্রত্যাশিত না। বাপী জানেই এও সবে শুরু। শেষ নয়।

চুপচাপ খাওয়া শেষ করে মহিলা বাটিটা পাশে সরিয়ে রাখল। অল্প একটু জল খেল। ভাবছে কিছু। খাট বেডিং টেবিল চেয়ার সবই তো কিনতে হবে তোমাকে?

টোস্ট আর পোচে বাপীর মুখ আটকানো। মাথা নাড়ল, হবে।

—অ্যাডভান্স কত দরকার?

মুখের পদার্থ জঠরস্থ করে বাপী জবাব দিল, মোটামুটি গুছিয়ে নেবার মতো কিছু টাকা হাতে আছে।

এ পাশ থেকে ঊর্মিলা ফস করে বলে বসল, আহা মায়ের কান জুড়িয়ে গেল!

মহিলা এবারে চোখেই ধমকালো মেয়েকে। বাইরের লোকের সামনে এরকম বলাটা যে বাড়াবাড়ি তাই বুঝিয়ে দিল। কিন্তু মেয়ের ভ্রূক্ষেপ নেই, অন্যদিকে চেয়ে জেলি রুটি

চিবুচ্ছে। ফাঁক পেলেই মেয়ে যে তার মাকে ঠেস দিতে ছাড়ে না, এ বাপী আগেও লক্ষ্য করেছে।

গায়ত্রী রাই জিজ্ঞাসা করল, এখানে তোমার খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে?

পরিবর্তন ভালোই দেখছে বাপী। ক'দিন আগেও মহিলা ঝাঁঝিয়ে বলেছিল, কাজের বাইরে তোমার সঙ্গে আর সম্পর্ক কি আমার?

জবাব দেবার আগে চায়ের ট্রে হাতে রঙ্গমঞ্চে আবার কোয়েলা। সেটা টেবিলে রেখে আগের ট্রেতে ডিশটিশ সব তুলে নিয়ে গেল। বাপীর দিকে চেয়ে ঊর্মিলা অস্ফুট শব্দ করে হেসে উঠল। অর্থাৎ আবারও মনে করিয়ে দিল, ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সহজেই হতে পারে।

মেয়ের প্রগল্‌ভতায় মহিলা এবারে যথার্থ বিরক্ত। তার দিক থেকে বাপীর দিকে চোখ ফেরালো। টেবিল থেকে খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে বাপী বলল, কিছু ভাববেন না, আমি ব্যবস্থা করে নেব।

কাগজের দিকে তাকালে এখনো কলকাতার খবরই আগে চোখ টানে। মাঝের এক জায়গায় একটা হেডিংয়ের ওপর দৃষ্টি আটকে গেল। কলকাতায় প্লেগ। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে একটা অদ্ভুত অস্বস্তি। গায়ত্রী রাই কি বলছে, তার মেয়ে কি করছে কিছুই আর খেয়াল নেই বাপীর। খবরটুকু পড়ে ফেলল। মধ্য কলকাতার কোনো এলাকা থেকে এ পর্যন্ত এগারোজন লোককে প্লেগ রোগাক্রান্ত সন্দেহে হাসপাতালে সরানো হয়েছে। তার মধ্যে তিনজন মারা গেছে। কলকাতা করপোরেশন তাই ওই এলাকাকে প্লেগ এরিয়া বলে ঘোষণা করেছে।

যুদ্ধের সময় বা কলকাতায় বোমা পড়াব সময় ওখানকার যে কোনো খবরের ফাঁক দিয়ে দুনিয়ার সকলকে ছেড়ে একটি মেয়েই তার চোখের সামনে এগিয়ে আসত। আজও তাই। প্লেগ কি, প্লেগ কেমন, বাপীর কোনো ধারণা নেই। শুধু জানে মারাত্মক কিছু, একটা শহরকে শহর উজাড় হয়ে যাবার মতোই কিছু। তবু, যে মেয়ের বাড়ি মধ্য কলকাতার ধারে-কাছেও নয়, দক্ষিণের এক রাস্তার সাতাশি নম্বর বাড়ির সেই মেয়েকেই যেন বিপন্ন দেখার অনুভূতি একটা। এ চিন্তা নিছক পাগলামি জানে। তবু বুকের তলায় কাঁপুনি কিছুক্ষণের—কোনো অঘটনের মধ্য দিয়ে ওপরঅলার হাত কি সব কিছু হঠাৎ মুছে দিয়ে যাবে? যার পব আর কিছু না—কিচ্ছু না?

আত্মস্থ হল। শুধু গায়ত্রী রাই নয়, তার মেয়েও ঈষৎ বিস্ময়ে ওর দিকে চেয়ে আছে। এই মিনিট কতক তারা কি দেখেছে কি লক্ষ্য করেছে, জানে না।

গায়ত্রী রাই জিগ্যেস করল, কাগজে অত মন দিয়ে কি দেখছিলে আর তারপর কি ভাবছিলে?

মুখে কিছু না বলে আঙুল দিয়ে কাগজের প্লেগের খবরটা দেখালো। গায়ত্রী রাই আরো অবাক।—কলকাতায় তোমার কে আছে?

বাপী চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল।—কেউ না। অনেক কাজ আছে, সেরে ফেলিগে।

কাজ কাজ আর কাজ। কাজের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকলে মুক্তি, কাজে ডুবে থাকলে স্বস্তি। ঊর্মিলা যখন তখন এসে ঘরে ঢুকে পড়ে। কখনো হাসে, কখনো রাগ করে, কখনো বা অকারণ ঠেস-ঠিসারায় বিদ্ধ করতে চায়। বাপী তন্ন তন্ন করে নিজের ভেতর দেখে

তখন। কোনো পাতালে প্রবৃত্তির সেই পশু আজও লুকিয়ে আছেই। লোভের সন্ধান পেলে এখনো ওটা থাবা চাটবে। সেই থাবা বাপীর দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে দেওয়ার আক্রোশ। উর্মিলার এই সহজ নিঃসঙ্কোচ যাতায়াত ভালো লাগে বলেই বাপী সেটা চায় না।

...রেশমা রাগ ভুলেছে। দেখা হলে মুচকি হাসে। দেখা হলে খুশি হয়ে এগিয়ে আসতে পারে। কথা বলতে পারে। সাপ চালানের ব্যাপারে বাপীর নতুন বন্দোবস্তের প্ল্যান ওদের মেমসায়েব সবটাই মেনে নিয়েছে। এই ব্যবসায় সেই এখন মুরুব্বি ওদের। পুরুষদের সঙ্গে ওর মজুরি সমান হয়েছে। আবুর হিসেব মতো কাগজে সই করে দিলেই একদিনের মধ্যে অ্যাকাউন্টেন্টেব কাছ থেকে নগদ টাকা মেলে। অবশ্য চালান যে হারে বাড়ছে, অ্যাকাউন্টেন্টের হিসেবের খাতায় তার সবটা উঠছে না। এ ব্যাপারে কর্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ। এ নিয়ে মাথা না ঘামালেও বাপীর নিজস্ব একটা পাকা হিসেব আছে। রেশমার রাগ ভোলার আর খুশি থাকার আরো কারণ আছে। তদারকি আর দল বাড়ানোর কাজে আবু রব্বানীর সহকারিণী হিসেবে মাসে বাড়তি পঞ্চাশ টাকা সে-ই পাচ্ছে। আবু ওকেই বাছাই করেছে। আবু দুলারির সামনেই এক চোখ ছোট করে রসিকতা করেছে, রেশমাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট পেয়ে কাজের উৎসাহ আমার চারগুণ বেড়ে গেছে-–বুঝলে বাপীভাই।

জবাবে হেসে হেসে রেশমা দুলারিকে আশ্বাস দিয়েছে, তুমি ভেবো না ভাবী, আমার সাপের টুঁটি চেপে ধরা আবু-সাহেব স্বচক্ষে দেখেছে। তারপর বাপীকেই জিগ্যেস করেছে, আমাদের এতবড় মুরুব্বিকে এখনো বাপীভাই বলো না সায়েব-টায়েব বলতে হবে?

বাপী জবাব দিয়েছে, আগে যা বলতে তাই বলবে।

এই মেয়েরও চটক আছে। চোখের কালোয় আগুন আছে। হেলে দুলে চলে যখন সেই যৌবন-ঢেউয়ের আমন্ত্রণ আছে। নিজের অগোচরে হঠাৎ-হঠাৎ ভালো লাগে বলেই রেশমাকেও কাছে ঘেঁষতে দিতে চায় না।

আবু রব্বানী আর দুলারির খুশির সংসার বলতে গেলে রোজই ওকে আশা করে। একে ভালোবাসে, তায় বাপীর জন্যেই দু'জনারই আয় বেড়েছে। এছাড়া জঙ্গলের নানা জায়গায় মালকানের দরকারী চারা বেড করা বা দরকারী গাছ-গাছড়া চাষের বাবদ ন্যায্য পারিশ্রমিক যে পাবে—সে সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত। ফলে দু'দিন দেখা না পেলে আবু মুখ ভার করে। আর দুলারি ঘরের লোককে দাবড়ানি দেবার ছলে ওকেও কথা শোনায়।—বাপী ভাই এখন কত বড় মানুষ আর কত কাজের মানুষ—তোমার সঙ্গে রোজ এসে আড্ডা দেবার অত সময় কোথায়?

কিন্তু ওদের এই সুখের সংসার দেখেও ভালো লাগে আর ভিতরে ভিতরে কিন্তু প্রত্যাশা উঁকিঝুঁকি দেয় বলেই বাপী এদেরও এড়াতে চায়। কোনো ভালো লাগার সঙ্গে তার আপোস নেই।

তাই কাজে ডুবে যাওয়া, কাজে ভেসে যাওয়া, আর কাজের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া। ফলে খুশি যার সব থেকে বেশি হবার কথা সে তো খুশি বটেই। গায়ত্রী রাই। তার গাম্ভীর্য অটুট এখনো। কিন্তু আচরণ বদলেছে। স্টোভে নিজে রান্না করে খায় বাপী। খাওয়ার ফিরিস্তিও মেয়ের কাছে শুনেছে। বাপীর সামনেই সেদিন বলেছিল, ভাতের সঙ্গে সমস্ত রকমের আনাজ সেদ্ধ আর তেল আর নুন আর কাঁচালঙ্কা—তোমার কাজের ছেলে খাসা

খানা খেয়ে কাজে ডুবে আছে।

গায়ত্রী রাইকে তাই শুনে ভাবতে দেখেছে। শেষে প্রস্তাব দিয়েছে, মাসে যা হয় ধরে দিও—তোমার দু'বেলার খাবারটা এখান থেকেই যাবে না হয়।

হেসে উঠে ঊর্মিলা বলেছিল, কোয়েলার সম্পর্কে এখনো ভেবে দেখো ফ্রেন্ড —মাসে আর তাহলে কিছু ধরে দিতেও হবে না।

একলা পেলে আর আগের চরিত্রগত মেজাজে থাকলে বাপী জবাব দিতে ছাড়ত না। রসিকতা করে বলে বসত, কোয়েলার বদলে তার মনিবের মেয়ের সম্পর্কে ভাবতে রাজি আছি। ওই জবাব মাথায় এসেছিল বলেই বাপী নিজের ওপর অসহিষ্ণু। এক কথায় মহিলার প্রস্তাব নাকচ করেছে। বলেছে, আপনি আমাকে কাজে এগিয়ে যেতে দিন শুধু, আর কিছু দেখার দরকার নেই।

তা সত্ত্বেও প্রতি রবিবার, অন্য ছুটির দিনের সকালে ওই বাংলো থেকে চায়ের আসরে তার ডাক পড়বেই। দু' দিন তিন দিন পরে পরে কোয়েলা রান্না-করা মাছমাংসও দিয়ে যাবে। বাপী প্রথম দিনেই বলেছিল, আর এ-রকম কষ্ট করার দরকার নেই—আমার এই খেতেই ভালো লাগে। তা সত্ত্বেও কোয়েলা এটা-ওটা নিয়ে আসে মানেই কর্ত্রীর নির্দেশ অমান্য করতে পারে না।

গায়ত্রী রাই তার হিসেবমতোই ধীরেসুস্থে কাজে এগিয়ে দিচ্ছে তাকে। মাসে দু'দিন করে ভ্যান ছেড়ে দেওয়ার ফলে স্থানীয় এলাকার গণ্ডী আরো বড় হয়েছে। আর, মোটামুটি বড় এবং বিশ্বস্ত পাইকারি খদ্দেররা গোপনে যা চায়, তাও তার মারফৎ পাচ্ছে। কর্ত্রীর নির্দেশে কোয়েলা মাপা শুখা সিদ্ধি, আফিম, মিঠা জহর ইত্যাদি ঘর থেকেই বার করে দেয়। এ-সব কোথা থেকে আসে, বা কে কখন চালান দেয় বাপী এখনো সে খোঁজ রাখে না। এ-সব বিক্রীর হিসেব যে অ্যাকাউন্টের খাতায় উঠবে না, তাও বলে দিতে হয় নি। এই টাকা গায়ত্রী রাইয়ের হাতেই তুলে দেয়।

তিন মাসের মাথায় গায়ত্রী রাই নিজেই ওকে সঙ্গে করে উত্তর বাংলার নানা জায়গায় বড় বড় পার্টির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। বলেছে, আমাদের রিজিওন্যাল ম্যানেজার। এবার থেকে যোগাযোগ আর সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা তার মারফৎ হবে।

কোন্ রিজিয়নের ম্যানেজার তা নিয়ে বাপী নিজেও মাথা ঘামায়নি। কাজের পরিধি ঢের বেশি বাড়ল, আরো বেশি কাজে ডোবার সুযোগ মিলল, তার এটুকুই লাভ। এই দায়িত্ব পাওয়ার ফলে চিফ একজিকিউটিভ রণজিৎ চালিহাকে সন্দিগ্ধ দেখবে বা অসন্তুষ্ট দেখবে ভেবেছিল। কিন্তু আদৌ তা না। ওই লোকের সঙ্গে মহিলার হৃদ্যতা আগের থেকে বেশি ছাড়া কম নয়। হয়তো তাকে জানিয়েই সব কিছু করা হচ্ছে।

পরে উত্তর বাংলার দু'জন বেশ বড় খদ্দেরের আচরণে বাপী ভিতরে ভিতরে ক্রুদ্ধ। আবার একটু অবাকও। বার দুই যোগাযোগের পরে আভাসে ইঙ্গিতে কিছু ব্যক্তিগত লাভের টোপ ফেলতে চেয়েছে ওই দু'জন। মাল সাপ্লাইয়ের ব্যাপারে কেউ টের পাবে না এমন সামান্য কিছু কারসাজির পথে চললে বাপী তরফদারের নিজের পকেটে অনায়াসে বেশ বাড়তি টাকা আসতে পারে আর তাদেরও কিছু লাভ হয়, তোয়াজের ছলে সেই আভাস, সেই ইঙ্গিত।

বাপী বিরক্ত হয়ে সেই পথ নাকচ করতে তারা আরো অমায়িক। তক্ষুনি সৎ মানুষের

সঙ্গে তাদের সৎ ভাবেই কাজ করার প্রতিশ্রুতি। মিস্টার তরফদার যেন কাউকে কিছু না বলেন বা নিজে কিছু মনে না করেন। বাপীর অবাকও লেগেছে, কারণ দীর্ঘকাল ধরে যে মহিলার সঙ্গে ব্যবসায়ে যুক্ত, তাদেরও এ-রকম মতি হয় কি করে! গায়ত্রী রাই সঙ্গে করে যখন নিয়ে এসেছিল, বাপী নিজের চোখেই এদের যত্ন-আত্তি দেখেছে, তোয়াজ তোষামোদ দেখেছে, সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা কইতে দেখেছে। যত ভেবেছে এদের এই ব্যাপারটা কেমন হেঁয়ালির মতো লেগেছে।...রণজিৎ চালিহার সঙ্গে কি এই গোছের ব্যবস্থা কিছু ছিল? নইলে মাত্র দুবার যোগাযোগের পরেই এরা এমন কথা বলে কি করে? ...চালিহা অনেক দিনের লোক। বাপী ক'দিনের? ভালো করে জানা চেনা বোঝার আগেই এত বেপরোয়া?

কি ভেবে গায়ত্রী রাইকে সত্যিই কিছু বলেনি বাপী। রণজিৎ চালিহাকে বলার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু শিলিগুড়ি আর মালদহের এই দুই পাইকিরি রইস খদ্দেরের টোপ ফেলার চেষ্টাটা মনে গেঁথেই থাকল।

কখনো সপ্তাহে কখনো পনের দিনে একবার গায়ত্রী রাইকে মেয়েসহ ভ্যানে করে দুতিন দিনের জন্য বাইরে যেতে দেখে বাপী। কোথায় চলল বা ক'দিনের জন্য চলল, ওকে অন্তত কিছু বলে যায় না। পরে মেয়ের মুখে শুনেছে, ভুটানে পাহাড়ের বাংলোয় যায় তারা। বাপীর ধারণা, বনজ নেশার জিনিস বা গোপন জিনিস যা আসে, ওখান থেকেই আসে। বোতলের জিনিস, অর্থাৎ মদ কিভাবে আসে সে-সম্বন্ধে এখনো সুস্পষ্ট কিছু ধারণা নেই। শুখা সিদ্ধি আফিম ইত্যাদি কোয়েলার মারফৎ এই বাংলো থেকেই বেরুতে দেখছে বাপী। তাও কাছাকাছির ছোট চালানের সময়। বড় চালনা হয়তো ওই পাহাড়ের বাংলো থেকেই সরাসরি চলে যায়। আর মদের পেটি সরাসরি চালিহার হেপাজতে গিয়ে পৌঁছয়। গত ছ'মাসে বাপীর ওপর গায়ত্রী রাইয়ের বিশ্বাস আর নির্ভরতা বেড়েছে এটুকু বুঝতে পারে। কিন্তু ওই সব মাল সম্পর্কে কোনো কথাবার্তা হয় না। এ-দিকটা এখন পর্যন্ত তার এক্তিয়ারের বাইরে। আবু রব্বানীর মুখে কিছু শোনা আছে। জিগ্যেস করলে হয়তো আরো জানা যেতে পারে, বোঝা হতে পারে। জিগ্যেস করে না। বাপী নিজের কাজ নিয়ে আছে। আর চুপচাপ দেখেও যাচ্ছে।

ঊর্মিলা বলে, তার পাহাড়ে যেতে একটুও ভালো লাগে না। মা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়।

—কেন, ওটা তো দেশ তোমাদেব।

—কে বলল? ওটা মায়ের দেশ, আমার বাবা নেপালের মানুষ ছিল।

মায়ের ওপর মেয়ের রাগ কত এই জবাব থেকেই বোঝা যায়। মায়ের কিছুই মেয়ে ভালো চোখে দেখতে রাজি নয়।

ঘরে আলো জ্বলছে দেখে সেদিনও ঊর্মিলা হাজির। গোমড়া মুখ। দিনে বাপীর টিকির দেখা মেলে না। তাই আড্ডা দেবার মেজাজ হলে আর ঘরে আলো দেখলে রাতেই আসে। ওর মা নাকি গোড়ায় গোড়ায় এটা পছন্দ করত না। কিন্তু মেয়ে তার ভ্রূকুটি বা নিষেধ উপেক্ষা করেই চলে আসত। একদিন বেশি বকাবকি করতে ও মুখের ওপর বলে দিয়েছে, নিশ্চিন্ত থাকো, তোমার কোনো হাতের মুঠোর ছেলের প্রেমে

কস্মিনকালেও আমি পড়ব না—আর ওই ত্যাঁদড় ছেলেও নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার মুখ ছেড়ে আমার মুখের দিকে কখনো তাকাবে না।

সেই থেকে রাতে এখানে আসা নিয়ে মা আর কিছু বলে না। মেয়েটার আসা-যাওয়া যেমন সহজ, তেমনি অকপট। মনের মতো কথা না হলে ঝগড়াও শুরু হয়ে যায়। তখন যা মুখে আসে তাই বলে বসে। বেশি রেগে গেলে বলে, আমার সঙ্গে লাগতে এসো না, মা-কে তেল দাওগে যাও—সুবিধে হবে।

বাপীর একটুও রাগ হয় না। কিন্তু এই মেয়ে এলে তার মায়ের কারণে হোক বা নিজেকে সংযমে বাঁধার তাড়নায় হোক, স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। একজনের প্রেমে মজে না থাকলে এই মেয়েই হয়তো আবার তাকে কোনো বিপাকের দিকে টেনে নিয়ে যেত। মা-কে জব্দ করার আক্রোশেও কখন কি মতি হয় ঠিক নেই। মায়ের ওপর মেয়ের এত রাগ এত বিতৃষ্ণা দেখেই বাপীর বিশ্বাস, আবুর অনুমান সত্য। এই মেয়ের প্রথম প্রেমের স্রোতে একটুও ভাঁটা পড়ে নি।

খাটে আধ-শোয়া হয়ে একটা বই পড়ছিল। রাতে ঘুমের আগে পর্যন্ত এখানে বই সম্বল। পড়ার অভ্যেস আগেও ছিল। ভালো-মন্দ ধর্ম-অধর্ম, হাতের কাছে যা পায়, নির্লিপ্ত মনোযোগ পড়ে ফেলে। চা-বাগানের লাইব্রেরি থেকে বই আনে। সময় কাটানোর তাগিদে ঊর্মিলারও বইয়ের স্টক কম নয়। সে-ও দেয়।

বই বন্ধ করে সোজা হয়ে বসল বাপী। মুখ দেখে বুঝে নিল মেজাজ সুবিধের নয়। রাতে বাইরের বেতের চেয়ার তিনটে ঘরে এনে রাখা হয়। তার একটা খাটের সামনে টেনে নিয়ে ঊর্মিলা বসল।

—কাল থেকে আমি কাজ শুরু করছি, আমার জন্য তোমাদের ওই আপিসে একটা ঘর ঠিক করবে। কালই চাই।

বাপী চুপচাপ চেয়ে আছে। তাতেই অসহিষ্ণু।—এই সাদা কথাও তোমার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে?

—কি কাজ?

—ব্যবসার কাজ—আবার কি কাজ? এইভাবে শুয়ে বসে ঘুমিয়ে দিন কাটবে আমার?

ফল কি হবে জেনেও খুব মোলায়েম সুরে বাপী বলল, দিন যাতে ভালো কাটে সে-চেষ্টা তোমার মা হয়তো তলায় তলায় করছেন।

গরম তেলে ফোড়ন পড়ল।—তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে কে বলেছে? মা ইচ্ছে করলেই আমার নাকে দড়ি পরিয়ে ঘোরাতে পারবে ভেবেছ? তোমাকে যা বলছি তুমি তা করবে কি না?

—কি করে করব, আপিসে ঘর তো মাত্র তিনখানা।

ঊর্মিলার মেজাজ আরো তপ্ত।—আমি কোন কথা শুনতে চাই না! তোমার নিজের ঘর ছেড়ে দিয়ে ওই আকাউনটেন্টের ঘরে বোসোগে যাও। তুমি কি ভেবেছ আমি তোমার সঙ্গে ইয়ারকি করতে এসেছি?

—তা না, বাপীর নরম মুখ, ইচ্ছে করলে তুমি তো তোমার আঙ্কলের ঘরেই বসতে পারো—তিনি তো সকালে এক-দেড় ঘণ্টার বেশি থাকেন না। ওটাই সব থেকে ভালো ঘর—

অপছন্দ হল না। বলল, এখনকার মতো তাই হতে পারে। ঠাণ্ডা একটু। গলার স্বরও অন্যরকম।—একটু আগে মায়ের সঙ্গে আমার একহাত হয়ে গেল। মা তোমাকে ডেকে পাঠাতে পারে।

বাপী ফাঁপরে পড়ল।—সে কি তোমাদের হাতাহাতির মধ্যে আমি কে?

—আঃ! শুনেই ভীতুর মত অত ঘাবড়াচ্ছ কেন? শোনো—মা কাল সকালে দু'তিন দিনের জন্য পাহাড়ে যাচ্ছে, আমি সঙ্গে যেতে রাজি নই—তাই নিয়ে ঝগড়া। আমি মা-কে বলেছি, তোমার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে কাল থেকে তোমাদের আপিসে আমি কাজে বসব, তাই আমার যাওয়া হবে না। মা তোমাকে ডেকে জিগ্যেস করলে তুমি বলবে কথা হয়েছে।

দ্বিধাগ্রস্ত মুখে বাপী বলল, দুটো তিনটে দিনের জন্য তুমি যেতে রাজিই বা হচ্ছ না কেন?

সঙ্গে সঙ্গে রাগ। কেন যাব? কি আছে সেখানে?

—এখানে কি আছে?

—এখানে কি আছে সে কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে হবে?

ঠাণ্ডা মুখে বাপী জবাব দিল, আমাকে না জড়ালে কিছুই দিতে হবে না।

আরো তেতে উঠতে গিয়েও ঊর্মিলা থমকে দরজার দিকে তাকালো। বারান্দায় পায়ের শব্দ। মুখ লাল তক্ষুনি।

ঘরে ঢুকল গায়ত্রী রাই। বাপী এখানে আসার পর এই প্রথম পদার্পণ। বরাবরকার মতোই নির্লিপ্ত গম্ভীর! একটু কঠিনও। বাপী শশব্যস্তে উঠে চেয়ার এগিয়ে দিতে যাচ্ছিল, বাধা পড়ল।

—বসতে আসি নি। খরখরে চাউনি।—ডলির সঙ্গে কাজ নিয়ে তোমার কি পাকা কথা হয়েছে শুনলাম?

মেয়ে তক্ষুনি ঝাপটা মেরে উঠল, কথা ও বলেনি, আমি বলেছি!

—আমি ওকে জিগ্যেস করছি।

ঊর্মিলার গলার ঝাঁঝ আরো বাড়ল।—কেন তুমি মাইনে-করা লোককে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে?

মহিলার দু-চোখ মেয়ের মুখের ওপর স্থির একটু।—মাইনে-করা লোককে তুই এ-সময়ে কি বলতে এসেছিস?

—আমি আমার ঘর ঠিক করার কথা বলতে এসেছি।

—সেটা মাইনে-করা লোক ঠিক করবে না আমি ঠিক করব?

মেয়ে গুম। বাপী নির্বাক দ্রষ্টা এবং শ্রোতা। গায়ত্রী রাই তার দিকে তাকালো। —ডলির কাজ শুরু করতে দুটো-তিনটে দিন দেরি হলে খুব ক্ষতি হবে?

ঊর্মিলার চোখ এড়িয়ে কলের দিকে মুখ করে বাপী জবাব দিল, না ক্ষতি আর কি...ঘুরে এসে শুরু করলেই হল।

চেয়ারটা জোরে ঠেলে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল ঊর্মিলা। তারপর বাপীর মুখের ওপর একপশলা আগুন ছড়িয়ে দুপদাপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গায়ত্রী রাই তেমনি গম্ভীর। কিন্তু ঠোঁটের ফাঁকে চুল-চেরা হাসির আঁচড়। বাপীর

বিপাকে পড়া মূর্তি দেখে চোখেই যেন আশ্বাস দিয়ে গেল একটু। তারপর সেও ধীরেসুস্থে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

হাতে কাজ না থাকলে এখনো নিজের মনে জঙ্গলেই ঘোরে বাপী। নিজেদের দরকারের গাছ লতাপাতা চিনতে চেষ্টা করে। ফাঁকা জায়গা দেখলে কোন্ জিনিসের চাষ হতে পারে আবুর সঙ্গে সেই পরামর্শ করার কথা ভাবে। গাছ-গাছড়া লতাপাতা চেনার প্রস্তুতির তাগিদে কর্ত্রীকে একটা প্রস্তাব দেবার কথা অনেকদিন ভেবেছে।'দিন-কতকের জন্য একবার গায়ত্রী রাইয়ের পাহাড়ের বাংলোয় গিয়ে থাকার ইচ্ছে। আবুর মুখে শুনেছিল, সেখানে তার স্বর্গত স্বামী বীরেশ্বর রাইয়ের এ-সম্পর্কে অনেক বইপত্র আছে। সে-সব পড়ার ইচ্ছে। তারপর সেখান থেকে ঝগড়ুকে নিয়ে পাহাড়ী জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে নিজের চোখে সেগুলো দেখা আর চেনার ইচ্ছে। বীরেশ্বর রাই তাই করত শুনেছে।

কিন্তু বলি-বলি করেও এখন পর্যন্ত বলে উঠতে পারে নি। মহিলা কি সন্দেহ করবে ভেবে দ্বিধা। এবারে পাহাড় থেকে ফিরে এলে বলবে ভাবছে। নিজের প্রয়োজনেই বাপীর ওপর বিশ্বাস তাকে রাখতে হবে।

জঙ্গলের এদিক-ওদিকে এক এক জোড়া বেদে-বেদেনীকে দেখেছে। এক মনে সাপ খুঁজছে তারা। আবার শীত এসে গেল। আর দু' চার দিনের মধ্যে ওদের এ কাজের পাট এ বছরের মতো শেষ হবে।

আপন মনে বাপী জঙ্গলের নিরিবিলি দিকটা ধরে এগোচ্ছিল ওই লোকগুলোর কাছে সে এখন মস্ত মানুষ। ওদের ব্যস্ত করার ইচ্ছে নেই। একটু বাদেই দাঁড়িয়ে পড়তে হল। অদূরের জারুল গাছটার নিচে পাথর মূর্তি মুখখানা খুব চেনা। রেশমার সাপ ধরার সঙ্গী হারমা। একলা দাঁড়িয়ে। সামনের দিকে চেয়ে নিবিষ্ট চিত্তে দেখছে কিছু। তার সামনে মাটিতে সাপ ধরার সরঞ্জাম।

বাপী পায়ে পায়ে সেদিকে এগলো। কিন্তু লোকটা এত তন্ময় যে একেবারে কাছে আসার আগে টেরই পেল না।

—কি ব্যাপার, একলা যে?

হকচকিয়ে গিয়ে লোকটা ঘুরে দাঁড়াল। তারপরেই কপালে হাত তুলে সেলাম। রেশমার কাছেই শুনে থাকবে সে তাদের কর্তাব্যক্তি।

বাপী জিগ্যেস করল, রেশমা কোথায়?

মুখে জবাব না দিয়ে আঙুল তুলে অদূরের কটা অর্জুন আর শিশু গাছ দেখিয়ে দিল। অদূরে বলতে তিরিশ-চল্লিশ গজ দূরে। সেদিকে তাকাতে বাপীর দু চোখ হোঁচট খেল একপ্রস্থ। দুটো গাছের ফাঁকে সাপ ধরার পোশাকে রেশমাকে আধাআধি দেখা যাচ্ছে। আর স্পষ্ট দেখা গেল ওর সামনে যে দাঁড়িয়ে--তাকে। চকচকে কোট প্যান্ট শার্ট টাই পরা চব্বিশ পঁচিশ বছরের একটি সুশ্রী ছেলে। রেশমার কথা শুনছে আর হাসিমুখে মাথা নাড়ছে।

—হি রেশমা!

কর্তামানুষ খোঁজ করল বলে হোক বা ওই নিরিবিলি আলাপে বিঘ্ন ঘটানোর সুযোগ পেয়ে হোক, গমগমে গলায় হারমা ডেকে বসল। সঙ্গে সঙ্গে গাছের আধখানা আড়াল ছেড়ে রেশমা এদিকে ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গের চকচকে লোকটিও। রেশমা তাকে বলল কিছু

আর চট করে হাতের কিছু একটা জিনিস নিজের বুকের আঁট জামা ফাঁক করে ঢুকিয়ে দিল।

লোকটা বড় বড় পা ফেলে অন্য দিক দিয়ে চলে যাচ্ছে। ঢিমেতালে রেশমা এদিকে আসছে। তার পরনে আগের দিনের মতোই সাপ ধরার পোশাক। যে পোশাকে ওর মতো মেয়ের যৌবন কুলোয় না।

—বাপীভাই, কি হুকুম?

—কিছু না। ওকে একলা দেখে তোমার কথা জিগ্যেস করতে ও ডেকেই বসল।

রেশমার চোখে পলকা ভ্রূকুটি। হারমাকে বলল, সেয়ানা হয়ে উঠছিস—অ্যাঁ? হাসি চেপে আর গলা খাটো করে বাপীকে বলল, কারো সঙ্গে আমাকে দু দণ্ড কথা কইতে দেখলে ওর জ্বালাপোড়া শুরু হয়।

—ভদ্রলোক কে?

—ওই যার সঙ্গে কথা বলছিলাম?...কে জানে, গাছের ইজারাদার-টার হতে পারে, জঙ্গলের কোনো কাজ ধরার মতলবে আছে বোধ হয়—আমি আবু সাহেবকে দেখিয়ে দিলাম।

যা বলল, বিশ্বাস করার মতো নয় নিজেই বুঝল হয়তো। চোখেমুখে এক ঝলক হাসি উছলে গেল—ছুতো ধরে আমাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে দুটো কথা বলার লোভ বুঝতেই তো পারছ। হারমাব দিকে ফিরে তাড়া দিল, চল চল আজ আর কিছু জুটলে হয়—

ওদের ছেড়ে বাপী পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল। মুখে ভাববিকার নেই। চোখে হাসির আমেজ। গাছগাছড়ার দিকে আর মন নেই। ভাবছে কিছু।

ওরা দু'জন আড়াল হতে বাপী ফিরল। এ সময়ে আবু রব্বানী চন্দ্রার চারা বেডের কাছাকাছি থাকে। জঙ্গলেব হাঁটাপথে সেখানে চলে এলো। চারা বেডের পরিধি আগে যা দেখে গেছল তার থেকে অনেকটা বেড়েছে। অবসর সময়ে আবুর এখন কাজের উৎসাহ খুব। অন্যদের সঙ্গে নিজেও খুরপি হাতে মাটি নিড়োচ্ছে।

ওকে দেখে হাসি মুখে খুরপি ফেলে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে কাছে এলো।—কেমন, খাসা হবে না?

কি-রকম হবে বাপীর খুব ধারণা নেই। তবু সায় দিয়ে মাথা নাড়ল।

আবু খুশি মুখেই বড় নিঃশ্বাস ফেলল একটা। বলল, সবই হল বাপীভাই, কেবল তোমার সঙ্গে দু'দণ্ড বসে মনের কথা বলার সময় কমে গেল। সমস্ত দিন তোমার কাজ। আর সন্ধ্যের পরেই বই নিয়ে ঘরে সেঁধিয়ে থাকো—

—তুমি গেলেই পারো।

কথার ফাঁকে ওকে সঙ্গে করে বাপী চারা বেডের কাছ থেকে খানিকটা সরে এসে দাঁড়িয়েছে।

—সন্ধ্যের পরে তোমার ঘরে?...যেতে তো ইচ্ছে করেই। কিন্তু তুমি আমাদের মুরুব্বি এখন, নাকের ডগায় তোমার সঙ্গে মাখামাখি করতে দেখলে মেমসায়েবের পছন্দ হবে না।

এ ব্যাপারে আবুর বিবেচনা আছে। জানলে কর্ত্রীটি হয়তো বাপীকেই ঠেস দিয়ে

কিছু শোনাবে। কিন্তু এই আবুর জন্যেই জীবনের আর এক বৃত্তে পা ফেলা সম্ভব হয়েছে। বাপী সেটা ভুলবে কি করে।

—তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না, যখন ইচ্ছে হবে চলে যাবে। যাক, ঊর্মিলা রাইয়ের সেই মিরিকের এঞ্জিনিয়ার ছেলেটার নাম যেন কি বলেছিলে—বিজয় মেহেরা?

এই প্রসঙ্গান্তরের জন্য আবু প্রস্তুত ছিল না। প্রথমে অবাক একটু, তারপর উৎসুক। —হ্যাঁ, কেন?

—দেখতে কেমন বলো দেখি?

আবু বলল।

বাপীর সংশয় খুব আগেও ছিল না। শোনার পর একেবারেই থাকল না।

আবুর দু-চোখ কৌতূহলে টুপটুপু।—কেন, তুমি তাকে দেখেছ নাকি?

—বোধ হয়।

—কবে? কোথায়?

—এদিকেই।

এদিকে বলতে কোন দিকে, স্পষ্ট বোঝার কথা নয়। বুঝলও না।—সেই মেয়ে তো তার মায়ের সঙ্গে পাহাড়ে গেছল, ফিরেছে নাকি? কার সঙ্গে দেখলে?

বাপীর এখন জবাব এড়ানোর দায়। বলল, ঊর্মিলার সঙ্গে নয়, আমার দেখে মনে হল। তোমার মেমসায়েব আর মিসি সায়েব আজ সকাল পর্যন্ত ফেরেনি, এখন ফিরে থাকতে পারে। দেখিগে যাই—

ফিরে থাকলেও ওর দেখার কিছু নেই, ছুতো ধরে আবুর কাছ থেকে সরে এলো। আপিস থেকে সাইকেলটা নিয়ে ঘরের দিকেই চলল। বিকেল তখন প্রায় চারটে। কিন্তু এখন আর বাপীর ঘড়ি ধরা আপিস নয়। দু'দিন পেরিয়ে আজ তিনদিন। ওই মা-মেয়েকে আজ হয়তো বাংলোয় দেখা যাবে।

মেয়েকে নয়, মাকে দেখা গেল। কিন্তু সাইকেল না থামিয়ে বাপী সোজা নিজের আঙিনায় ফটকে এসে নামল।

দশ মিনিটের মধ্যে মালী এসে মেমসায়েবের সেলাম জানালো। আরো মিনিট পনের বাদে বাপী হাজির।

মিষ্টি কথা মহিলা চেষ্টা করলেও বলতে পারে কিনা সন্দেহ। বারান্দায় উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখেও সোজা চলে গেলে কেন?

—সাইকেলটা রেখে মুখ-হাত ধুয়ে আসব ভাবছিলাম। খিদে পেয়েছিল, কিছু খেয়েও এলাম।

—বোসো। কি খেলে?

এরকম প্রশ্ন আর কি কখনো কোন কর্মচারীকে করেছে! বাপী হাসল, পাঁউরুটি মাখন। চা খেয়ে আসতে গেলে আরো দেরি হবে বলে সাহস পেলাম না।

—যা বলার সোজাসুজি বলবে। দরজার দিকে ঘুরে তাকালো।—কোয়েলা! বিপুলকায়া দোরগোড়ায় দেখা দিতে হুকুম হল, এক পেয়ালা চা।

বাপী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনাদেরও ও-পাট শেষ বুঝি?

মাথা নাড়ল কি নাড়ল না।—এদিকের খবর কিছু আছে?

—সে-রকম কিছু না, ছোটখাটো কটা অর্ডার আছে।

তার সাড়া পেয়েই হয়তো ঊর্মিলা রাই একটা চকচকে নতুন বই হাতে পিছনের দরজায় এসে দাঁড়াল। ফর্সা মুখ মেজাজের মেঘে ছাওয়া। বাইরে বসে পড়ার দরকার বোধেই যেন গম্ভীর মুখে বারান্দায় এসে একটা বেতের চেয়ার হাত পাঁচেক দূরে টেনে নিয়ে বসল।

এই মুখ দেখে বাপী আরো একটু তাতিয়ে দেবার লোভ সামলাতে পারল না। ভালো মুখ করে জিগ্যেস করল; পাহাড়ে বেড়ানো কেমন হল?

ঊর্মিলার হাতের বই কোলে নেমে এলো। আর ভিতরের আঁচ চোখে এসে জমতে লাগল। ঝাঁঝালো গলা।—ইয়ারকি পেয়েছ?

বাপীর ভেবাচাকা খাওয়া নিরীহ মুখ। তার মায়ের দিকে ফিরল সে, এমন গরম হাওয়ার কারণ বুঝছে না যেন।

গায়ত্রী রাইয়ের ঠোঁটের ফাঁকে খুব সূক্ষ্ম হাসির রেখা। কোয়েলা এক পেয়ালা চা এনে বাপীর সামনে রেখে গেল।

—শোনো, যে জন্যে ডেকেছিলাম। গায়ত্রী রাই একটু বেশী গম্ভীর হঠাৎ।—গত জুলাইয়ের মিডল-এ তোমার তো ছ'মাসের ট্রায়েল পিরিয়ড শেষ হয়ে গেছে?

এটা সেপ্টেম্বরের শেষের দিক। মুখের চা-টুকু তল করে বাপী জবাব দিল, শেষ হয়েছে কিনা আপনার বিবেচনা...

—এঃ! সঙ্গে সঙ্গে ও-পাশ থেকে মেয়ের ঠেস।—ভিজে বেড়াল একখানা!

সময়বিশেষে গায়ত্রী রাইও মেয়েকে ঘাঁটায় না হয়তো, তার দিকে তাকালোই না। বাপীর মুখের ওপর চোখ রেখে বলল, এ মাস থেকে পাকা খাতায় নাম উঠবে তোমার আর জুলাই থেকে রেট্রোসপেকটিভ এফেকট-এ তিনশ টাকা করে পাবে তুমি। মিস্টার চালিহাকে জিগ্যেস করেছিলাম, তিনি তাই সাজেস্ট করেছেন।

এখনো চালিহার দেয়াল মাঝখান থেকে সরাতে রাজি নয় মহিলা বোঝা গেল। মুখে কিছু বললে তার মেয়ে পাছে আবার ফোড়ন কাটে সেই ভয়ে বাপী চোখের ভাষাতেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

গায়ত্রী রাই চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল।—তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার সই করে রেখেছি, দিয়ে দিচ্ছি—

ভিতরে চলে গেল। সেই ফাঁকে বাপী আস্তে আস্তে তার মেয়ের দিকে চোখ ফেরালো। ঊর্মিলা তার দিকেই চেয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই চাপা ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, সুখবর পেয়ে মুখখানা যে আরো ওয়েট ক্যাটের মতো হয়ে গেল। এক্ষুনি ছুটে গিয়ে এক ভাঁড় তেল কিনে ঘরে মজুত রাখো!

মেয়েকে পাহাড়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মায়ের কথায় সায় দিয়েছিল বলেই এই রাগ। মুখখানা খুব নির্লিপ্ত করে বাপী বলল, আমার ঘরে এলে সুখবর আমিও কিছু দিতে পারি।

গম্ভীর, কিন্তু চোখের তারা উৎসুক। বাপীর নির্বিকার মুখ আবার সামনের দিকে। একটা ফাইল হাতে গায়ত্রী রাই ফিরে এসেছে।

চেয়ারে বসল। ফাইল খুলল। বাপী তার আগেই দেখে নিয়েছে বড় হরপের টাইপে ফাইলের ওপর বাপী তরফদার নামের লেবেল। বাপীর মনে হল তার পোশাকী নাম বিপুলনারায়ণ তরফদার হারিয়েই গেল। চার মাস আগে মহিলার সঙ্গে বাড়ির যে কনট্রাকট হয়েছিল তাতেও বাপী তরফদারই ছিল, আর সেও বিনা আপত্তিতে তাই সই করেছিল। রাই অ্যান্ড রাই লেটার হেডে টাইপ-করা আর সই-করা একটা চিঠি তার দিকে বাড়িয়ে দিল। কর্তার আমলে স্বামী-স্ত্রীর নামে ব্যবসা চালু ছিল। এখনো ওই নামই আছে। অর্থাৎ মা আর মেয়ে মালিক। পকেটে রাখার উদ্দেশ্যে বাপী চিঠিটা ভাঁজ করতে যাচ্ছিল, বিরক্তির সুরে বাধা পড়ল।

—পড়ে নাও!

পড়ল। মুখে যা বলেছিল তাই। তার সঙ্গে আরো কিছু যোগ করা আছে। রিজিয়ন্যাল ম্যানেজার হিসেবে তাকে বহাল করা হল। কোন্ রিজিয়ন এতেও তার উল্লেখ নেই। মাসমাইনে থোক তিনশ। বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টের ব্যাপারে ফার্মের ব্যবসা আর তার কর্মপটুতা বিবেচনাসাপেক্ষ। বাইরে টুরের প্রযোজনে যাতায়াত এবং থাকা-খাওয়ার খরচ দেওয়া হবে। এক মাসের নোটিসে অথবা একমাসের ক্ষতি-পূরণে মালিক কর্মচ্যুতি ঘটাতে পারে। কাজে ইস্তফা দেওয়ারও একই শর্ত।

চিঠিতে চারদিন আগের তারিখ। অর্থাৎ পাহাড়ের বাংলোয় যাবার আগেই ব্যবস্থা পাকা করে রেখে গেছল।

—ঠিক আছে?

বাপী মাথা নেড়ে সায় দিল।

ফাইলসুদ্ধু ওই চিঠির কপিটা তার দিকে এগিয়ে দিল।—রিসিভড্ দি ওরিজিন্যাল লিখে সই করে দাও, আজকের তারিখ দিলেই হবে।

পাকা কাজ। পকেট থেকে কলম বার করে বাপী লিখল। সই করল। গায়ত্রী রাইয়ের দু'চোখ সেই থেকে তার মুখের ওপর অনড়। সই করা হতে ফাইলটা টেনে নিয়ে বন্ধ করে পাশে সরিয়ে রাখল। তখনো মুখের দিকে চেয়ে নতুন করে কি দেখছে মহিলা বাপী ঠাওর করতে পারল না।

—শীত আসছে, তুমি কি এই পাজামা পাঞ্জাবি পরেই কাটিয়ে দেবে নাকি?

বাপী জবাব দিল, গরম জামা আছে, গরম চাদরও আছে।

—ট্রাউজার বা কোট?

—ওসব কখনও পরিনি।

—এখন থেকে পরো। বড় বড পার্টির সঙ্গে দেখা করতে হবে, ডিল করতে হবে —ইউ আর রিপ্রেজেনটিং এ বিগ ফার্ম। গোড়াতে কিছু আউটফিট অ্যালাউয়েন্স গ্র্যান্ট করে দিচ্ছি, যা করার করে নাও।

এতক্ষণে বাপী অনুভব করল মাঝের চালিহা-দেওয়াল কিছুটা সরেছে। দ্বিধাগ্রস্ত মুখে হেসে বলল, এই পোশাকটা বেশ ট্রেডমার্ক হয়ে গেছল...

অনেক দেখা, তবু এই বেশবাস আর এক দফা খুঁটিয়ে দেখে নিল মহিলা। তারপর মন্তব্য করল, ট্রেডমার্ক হয় নি এমন অনেক জায়গায় এরপর তোমাকে যেতে হবে।

—ঠিক আছে। প্রসঙ্গ বাতিল করে মনে যা আছে বলে ফেলার এটাই সময়।—

-আপাতত দিন কতকের জন্য আমি এখান থেকে ডুব দিচ্ছি।

শোনামাত্র তার সাদাটে দুই ভুরু-কুঁচকে গেল। অন্য দিকে কথা আর শেষ হয় না দেখে তার মেয়েও হয়তো বিরক্ত হচ্ছিল। যে মুখ করে বাপী সুখবর দেবার কথা বলেছিল, ওই মেয়ের পক্ষে ধৈর্য ধরে বসে থাকা সহজ নয়। ডুব দেবার কথা শুনে পড়ার ভান ছেড়ে সেও বই নামালো।

প্রস্তাব বাতিল করার মতোই রুক্ষ স্বরে গায়ত্রী রাই জিজ্ঞেস করল, কোথায়?

—প্রথমে আপনার ভুটান পাহাড়ের বাংলোয়, তারপর পাহাড়ে আর জঙ্গলে।

এই জবাব মা বা মেয়ে কেউ আশা করে নি। মহিলার গোল চোখ তার মুখের ওপর স্থির।

বাপী বলল, আবুর মুখে শুনেছি, আপনার পাহাড়ের বাংলোয় মিস্টার রাইয়ের পাহাড় আর জঙ্গলের দরকারি গাছগাছড়া লতাপাতা ফলমূলের ভালো ভালো বই আছে। সেগুলো আগে পড়ে নিতে চাই। তারপর ওইসব গাছগাছড়া লতাপাতা বীজদানা খুব ভালো চেনে এমন একজন লোক যদি সেখানে পাই, তাহলে নিজের চোখে সব দেখা আর বোঝার অভিজ্ঞতা হয়। যে কাজ আমরা করছি তার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত একজনের অন্তত সব চেনা আর জানা দরকার। বইপত্র ঘাঁটলে আর নিজে যাচাই-বাছাই করতে পারলে ফিল্ড বাড়ানোও সম্ভব। আর, এ অভিজ্ঞতার সব থেকে বেশি দরকার বোধ হয়. কাজটাকে ভালবাসার জন্যে।

একসঙ্গে এতগুলো কথা বাপী কমই বলেছে। মহিলার অপলক চাউনি। সাদাটে মুখে লালের আভা। এই প্রথম ওই মুখে বুকের তলার কোনো অনুভূতির প্রতিক্রিয়া দেখল বাপী। তার ধারণা, স্বামীর বইপত্র পড়া, দুষ্প্রাপ্য জিনিসের খোঁজে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘোরা, সব চেনা-জানা-বোঝার তাগিদে আহার-নিদ্রা ভুলে বনবাদাড় চষে বেড়ানো ইত্যাদি স্মৃতির কোনো নিঃশব্দ আলোড়ন চলেছে ভিতরে। অনুমান খুব ভুল নয় সেটা একটু বাদেই বোঝা গেল।

গায়ত্রী রাই বলল, বই আছে। সব চেনে জানে এমন লোকও আছে। তুমি কবে যেতে চাও।

—কালও যেতে পারি। এখানকার কাজ মোটামুটি সেরে রেখেছি, তাছাড়া মিস্টার চালিহাও কিছুদিনের মধ্যে টুরে যাচ্ছেন না শুনেছি।

চুপচাপ ভাবল একটু।—কাল হবে না, পরশু সকালে রেডি থেকো।

ওদিক থেকে তার মেয়ে আঁতকে উঠল।—আমি এখন আর এক পা-ও এখান থেকে নড়ছি না বলে দিলাম।

ভিতরে কিছুটা নাড়াচাড়া পড়েছে বলেই হয়তো মেয়ের পলকা দিকটা বেশি চোখে পড়েছে মহিলার। তার দিকে চেয়ে রুষ্ট-গম্ভীর জবাব দিল, তোকে যেতে হবে না! ওকে রেখে আমি দু'ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব।

কথা শেষ। বাপী চলে এলো। অনুমতি পেলে আবুকে সঙ্গে করে পাহাড়ের বাংলোয় যাবে ভেবে রেখেছিল—দিন দুই ওকে সেখানে ধরে রেখে ঝগড়ুর সঙ্গে ভাবসাব করে নেবে। কিন্তু তার থেকে এ অনেক ভালো হল। কর্ত্রী নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে।

বাপী এতটা আশা করে নি।

নিজের আঙিনার ফটক খুলে ভিতরে পা দিয়েই বাপী অবাক একেবারে। উঠোনে মেহেদী গাছের পার্টিশন ঘেঁষে আবু রব্বানী দাঁড়িয়ে। ওকে দেখামাত্র কেন যেন বাপীর মনে হল, গাছ ফাঁক করে ও-দিকের বাংলোর দিকে লক্ষ্য রেখেছিল। ওকে উঠতে দেখে ফিরেছে। নইলে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে যাবে কেন।

—কি ব্যাপার?

আবু রব্বানী একটা আঙুল মুখে তুলল। অর্থাৎ অত জোরে কথা নয়। বাপী আরো অবাক কারণ আবুর মুখে সত্যি উৎকণ্ঠার ছাপ। আজই দুপুরে যখন খুশি ওকে বাংলোয় আসতে বলেছিল বাপী। কিন্তু সেই আমন্ত্রণে আসে নি দেখেই বুঝছে। আর দিনের আলোয় সদর দিয়ে অর্থাৎ ওদের মেমসায়েবের নাকের ডগা দিয়ে আসে নি, বলাই বাহুল্য। জংলা পথ ভেঙে পিছন দিক দিয়ে এসেছে। এত লুকোচুরি করে আসার তাগিদ কেন বা আবুর হঠাৎ এমন শুকনো মুখ কেন বাপী ভেবে পেল না।

আবু গলা খাটো করে জিগ্যেস করল, তুমি মেমসায়েবের সঙ্গে কথা কইছিলে বাপীভাই, না তার মেয়ের সঙ্গে?

—দু'জনার সঙ্গেই। কেন?

এই জবাবে আবু নিশ্চিন্ত একটু। তবু আমতা আমতা করে আবার জিগ্যেস করলো, রেশমাব সম্পর্কে কোন কথা হয় নি তাহলে?

ভিতরে কৌতূহলের আঁচড় পড়ল এবারে। বাইরে অবাক।—রেশমার সম্পর্কে কি কথা হবে?

—যাক, আবু হাসিমুখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল একটা, আমি তো দুলারিকে কতবার বললাম, বাপীভাই যা-ই জানুক বুঝুক ফস করে মেমসায়েবকে কিছু বলে বসে থাকার মতো কাঁচা ছেলে নয়। তবু ভয়ে ভাবনায় জোর করেই আমাকে ঠেলে পাঠালো।...তুমি একবারটি চলো না আমার ওখানে, দুলারি বার বার বলে দিয়েছিল, রেশমাও সেখানে আছে—

বাপী মাথা নাড়ল।—এখন যেতে পারছি না, তোমাদের মেমসায়েবের মেয়ে এক্ষুনি আসবে।

আবু ব্যস্ত হয়ে উঠল, তাহলে আমি চলি, তুমি পরে না-হয় এসো—

বাপী মিথ্যে বলেনি। ঊর্মিলাকে সুখবর দেবার টোপ ফেলে এসেছে। যে কোন মুহূর্তে এসে হাজির হতে পারে। আবুর সঙ্গে সে-ও বেরিয়ে এলো। তারপর বাড়ির পিছনে এসে ওকে দাঁড় করালো।—কি ব্যাপার খোলাখুলি বলো তো?

আবু হাসতেই চেষ্টা করল, কিন্তু ভিতরের উদ্বেগটুকু গোপন থাকল না।—কি আর বলব, তোমার কতদিকে ক'টা করে চোখ আর কান, আর মগজে কি যে আছে ভেবে তাজ্জব বনে যাই।

কথাগুলোর মধ্যে কৃত্রিমতা নেই। বাপী হাসল।—আচ্ছা, এবার বলো।

আবু যা বলবে এতক্ষণে সেটা মোটামুটি আঁচ করা গেছল। অনেকটা তাই। আজ একটা মাত্র নির্বিষ সাপ ধরে দুলারিকে দেখিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিল রেশমা। হয়তো ঘরে ফেরার তাড়া ছিল। তাই আগে চলে এসেছে। আবুকে পেয়ে কথায় কথায় বলেছিল,

বাপীভাই আজ আপিসে না বসে জঙ্গল দেখে বেড়াচ্ছিল, তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। আবু জানিয়েছে দেখা তার সঙ্গেও হয়েছে। আর বাপীভাই চলে যাবার পর সারাক্ষণ যে-কথাটা মাথায় ঘুরছিল তাও বলেছে। মেমসায়েবের মেয়ের প্রেমের ব্যাপারটা তিনজনেই জানে, নিজেদের মধ্যে মাঝেমাঝে কথা হয় তা নিয়ে। দুলারির সামনেই আবু রেশমাকে বলেছে, তোর মেমদিদিকে বলে দিস তার প্রেমিকটিকে যেন একটু সাবধান করে দেয়—বাপীভাইয়ের কাছে ধরা পড়েছে তাই রক্ষে, মেমসায়েব বা তার ম্যানেজারের কাছে ধরা পড়লে খেল খতম হয়ে যাবে।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে রেশমার ছাইবর্ণ মুখ একেবারে! হাঁসফাঁস করে জিগ্যেস করল, বাপীভাইয়ের কাছে কবে ধরা পড়ল? কি করে ধরা পড়ল?

আবু বা দুলারি তখনো কিছু বুঝতে পারে নি। আবুর সঙ্গে বাপীভাইয়ের কি কথা হয়েছে শোনার পর রেশমা বলেছে, বাপীভাই জঙ্গলে আজ ওর সঙ্গেই বিজয় মেহেরাকে কথা কইতে দেখেছে।

শুনে আবু আর দুলারির মাথায় বজ্রাঘাত। মেমসায়েব জানতে পারলে রেশমার তো হয়েই গেল, ওদেরও গিলে খাবে। সাত-পাঁচ না ভেবে বাপীভাই যদি কথায় কথায় বলে ফেলে সেই ভয়েই আবু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছে।

বাপী হাসছে।—তোমারও এত ভয়!

আঁতে লাগল।—ভয়ের নিকুচি করেছে। শুনলে মেমসায়েব আমাকেও নিমকহারাম ভাববে, বুঝলে?

—বুঝলাম। ঊর্মিলার সঙ্গে বিজয় মেহেরার যোগাযোগটা রেশমার যোগসাজসে চলছে এ তুমি আগে বোঝোনি?

—আল্লার কশম বাপীভাই। আমার সত্যি বকরির মাথা হয়েছে আজকাল, রেশমার এত বুকের পাটা আমি ভাবতেও পারি নি, কিন্তু তোমার কি বিজয় মেহেরাকে ওর সঙ্গে দেখার আগেও সন্দেহ হয়েছিল নাকি?

বাপী হেসেই জবাব দিল, অমন ডাকসাইটে মেমসায়েবের মেয়ের সঙ্গে জঙ্গলের সাপ-ধরা মেয়ের এত গলায় গলায় ভাব খুব সাদা চোখে দেখার মতো কি? ওর মজুরি বাড়ানোর জন্য ঊর্মিলাই সব থেকে বেশি তাগিদ দিয়েছিল।...যাক, এখন রেশমা কি বলে?

—কি আর বলবে। ঘাবড়েছে ঠিকই কিন্তু মচকাবার মেয়ে নয়। দুলারি বকাঝকা করতে ফোঁস করে উঠেছে, জানলে মেমসায়েব মাথা কাটবে নাকি—না-হয় আগের মতো কষ্ট করে দিন কাটবে—তার বেশি কি হবে? তোমার কাছে ধরা পড়েছে বলে এখন তোমার ওপরেই বেশি রাগ।

হাতঘড়িতে সময় দেখল বাপী। পাঁচটা বাজে। বলল, ঠিক আছে, তুমি চলে যাও—

—তুমি পরে আসছ?

—না। গিয়ে রেশমাকে তার ঘরে পাঠিয়ে দাও। তার মেমদিদি শীগ্‌গিরই ওর খোঁজে যাবে।

আবু ভেবাচাকা খেয়ে গেল।—কেন বাপীভাই?

—জানি না। মনে হচ্ছে। বেশি কথা বলার সময় নেই, তুমি তাড়াতাড়ি যাও।

বাপী নিজেই তাড়াতাড়ি চলে এলো। ফটকের কাছে বা বারান্দায় কেউ নেই। উর্মিলার এত ধৈর্য আশা করে নি। ধীরেসুস্থে বারান্দাতেই চেয়ার টেনে বসল।

তার দু' মিনিটের মধ্যে উর্মিলা বাঁশের ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল। ভুরু কুঁচকে ওখান থেকেই দেখে নিল একদফা। তারপর গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকল। বাপীর মনে হল, না এসে পারা গেল না বলেই অমন অসহিষ্ণু হাবভাব।

বারান্দায় ওঠার আগেই তপ্ত প্রশ্ন।—ঘরদোর খোলা রেখে কোথায় হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলে? আনন্দ বুঝি আর ধরে না?

এরই মধ্যে এসে ফিরে গেছে তাহলে। জিগ্যেস করল, আনন্দ কেন?

মুখোমুখি বসল। তেতেই আছে। গলার স্বরে বক্রাভাস। চাকরি পাকা হল, আর আঙ্কল চালিহারও বারোটা বাজতে খুব দেরি নেই বোঝা গেল—আনন্দ হবে না?

—তোমার দুঃখ হচ্ছে?

—নাঃ, তোমার কেরামতি দেখে হাততালি দিতে ইচ্ছে করছে! কি বলবে বলো—!

বাপীর অবাক মুখ।—কি বলব?

—দেখো, চালাকি কোরো না। সুখবর দেবে বলে তুমি আসতে বলোনি?

—ও...! মনে পড়ল যেন। হাসছে অল্প অল্প।—তুমি কি সুখবর আশা করেছিলে?

—তোমার মতো ধড়িবাজকে বিশ্বাস কি যে আশা করতে যাব?

—তাহলে এলে কেন?

—তুমি বলবে না চলে যাব?

—বলব। বাপী গম্ভীর।—চিঠি এসেছে। নিজের হাতে দিয়ে গেছে। রেশমার সঙ্গে দেখা হলে পাবে।

মাথার ওপর আচমকা ঘা পড়ার মতো মুখ। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল খানিক। তারপর শরীরের রক্তকণাগুলো সব মুখের দিকে ধাওয়া করল। চেয়ার ছেড়ে ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বেলা ছোট হয়ে আসছে। বিকেলের আলোয় টান ধরেছে। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে বাপীর দু'কান সজাগ। পাশের বাংলো থেকে ভ্যানটা বেরুলো।

তারপর থেকে বাপী অপেক্ষা করছে। বড় রকমের কিছু বোঝাপড়া করার তাগিদে উর্মিলা রাই আজই আবার আসবে। আসবেই। বাপীর নিজের বুকের তলার একটা দিক ঝাঁঝরা। কারো প্রেম-প্রীতির ব্যাপারে নাক গলানোর ইচ্ছে ছিল না—এখনো নেই। গায়ত্রী রাইকে যতটা চিনেছে, এই মেয়ে সহায় হলেই ভাগ্যের দরজা খুলে যাবে ভাবে না। কিন্তু মেয়ে এরপর সহায় না হোক শত্রুতা অন্তত করবে না। অস্ত্র হাতে নিয়ে শুধু এটুকু আপোসের দিকেই এগোনোর ইচ্ছে বাপীর।

বাপী বই নিয়ে শুয়ে ছিল। এক পাতাও পড়ছিল না। ঝড়ের জন্য প্রস্তুত। তারপর রামধনু দেখার জন্যও।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে উর্মিলা রাই এলো। তপতপে লাল মুখ। চাউনিতে রাগ ভয় অবিশ্বাস।

বই হাতে বাপী হাসি মুখে উঠে বসল। জিগ্যেস করল, খুব সুখবর কি না?

—খুব। খাতির পাবার জন্য রেশমাই বলেছে ভেবে আমি তার টুঁটি চেপে ধরতে গেছলাম। পরে বুঝলাম সে নয়। তাহলে আবু রব্বানী বোধ হয়?

বাপীর হাবাগোবা মুখ।—আবুকে নিজের গোপন কথা তুমি বলেছিলে নাকি!

সামনের চেয়ারটা পা দিয়ে ধাক্কা মেরে সরিয়ে ঊর্মিলা ঝলসে উঠল।—কে বলেছে তাও আমার বুঝতে বাকি নেই—মদের নেশায় ঝগড়ু তাকে বলেছে—দোস্তি বার করছি আমি, ওদের কারো গায়ে আর ছাল-চামড়া থাকবে না তুমি জেনে রেখো!

খুব নির্লিপ্ত গলায় বাপী বলল, ঝগড়ুকে আমি এখন পর্যন্ত দেখি নি। ওদের দু'জনের কারো গায়ে আঁচড় পড়লে সেটা আমার গায়েও এসে লাগবে।

প্রকারান্তরে সতর্ক করার ইঙ্গিতটুকু স্পষ্ট। অর্থাৎ আঁচড় পড়ার কারণ জানলে মা ওদের ওপর অবিচার করা দূরে থাক, উল্টে আগলে রাখবে। খাঁচায় পোরা বাঘিনীর মুখ। ফাঁক পেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকেই ফালা ফালা করার আক্রোশ। বাপী আবার বলল, আমারই ভুল হয়েছে, তুমি ফ্রেন্ড বলেছিলে সেটাই সত্যি ভেবেছিলাম। সত্যিকারের বন্ধু দরকারে অদরকারে পাশে থাকে, তুমি তা চাও না বুঝিনি। উল্টে আশা করেছিলাম গোপনতা ফাঁস হয়ে গেছে দেখলে তোমার আমার সম্পর্কটা আরো সহজ হবে, সুবিধেরও হতে পারে...।

ওই মুখে রং বদলের সুন্দর একটু কারুকার্য দেখল বাপী। যা শুনল তার অর্থ না বোঝার মতো বোকা নয় এই মেয়ে। তবু এতটা বিশ্বাস করবে কি করবে না সেই সংশয়। দেখছে আর বিশ্বাসের দিকেই ঝুঁকছে। কাছে এসে পাশ ঘেঁষে খাটের ওপর বসে পড়ল। দু'হাতে বাপীর দু'গাল ধরে মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে বলে উঠল, তুমি কক্ষনো কোনো কারণে মাকে কিছু বলছ না, কিচ্ছু জানতে দিচ্ছ না—ঠিক? ঠিক?

—তুমি বাধ্য না করলে এরকম আশঙ্কার কোনো কারণ নেই।

গাল ছেড়ে খপ করে দু'হাতে মাথার চুলের মুঠি ধরে দু'বার ঝাঁকিয়ে দিল, মুখে খুশির জেল্লা।—তুমি একটা স্কাউনড্রেল, তুমি একটা শয়তান।

—কান জুড়লো।

—দরকার পড়লে তুমি আমাকে সাহায্যও করবে। করবে না?

চুলের মুঠি এখনো ওর হাতে ধরা, গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে আছে, ওর গরম নিঃশ্বাস নাকে মুখে লাগছে। বাপী অস্বস্তি বোধ করছে।—ছাড়ো, তুমি কি চুলের ঝুঁটি ধরে কথা আদায় করবে নাকি?

—আগে বলো, সাহায্য করবে?

—নিজেকে নিরাপদ রেখে যতটা সম্ভব।

হেসে আবারও গোটা দুই ঝাঁকুনি।...সত্যিকারের বন্ধু নিজের কথা ভাবে? ইউ আর মাই ফ্রেন্ড এ জেম অফ এ ফ্রেন্ড! আনন্দের আবেগে এবারে মাথাটা টেনে বাপীর গালের সঙ্গে নিজের গাল ঘষে দিল। তারপর ছেড়ে দিয়ে হাসতে লাগল।

বাপী গম্ভীর। সরে বোসো। বিজয় মেহেরা কেমন লোক আমি জানি না। কিন্তু আমি একেবারে ঢোঁড়া জাতের নই, এতটা প্রশ্রয় সহ্য হবে না।

উঠে চট করে সামনের চেয়ারে বসল। চোখে কোপ, মুখে হাসি।—তুমি একটা হাড় পাজি আমি গোড়া থেকে জানি। নইলে মা এ-ভাবে ঘায়েল হয়—আজ তো একেবারে

ট্রাম্প কার্ড ছেড়ে দিয়ে এসেছ।

প্রেমের আবেগে এই মেয়ে কতটা ডুবে আছে বাপী সেটা সহজেই আঁচ করেছে। বিজয় মেহেরার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। গলায় দড়ি দিতে হলে দেবে, তবু আর কাউকে বিয়ে করবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাপীর সঙ্গে এবার তার আলাপ করিয়ে দেবে। বাপীরও ভালো না লেগে পারবে না।

তেমনি রাগ আঙ্কল চালিহার ওপর। বিজয় মেহেরার সম্পর্কে মায়ের মেজাজ সে-ই আরো বিগড়ে দিয়েছে। কি তার মতলব কে জানে। বাবা মারা যাবার পর মাকে বিয়ে করে সব হাত করার আশায় ছিল। আর দায়ে পড়ে মা-ও তখন যেভাবে প্রশ্রয় দিয়েছিল ওই লোককে, উর্মিলা ধরেই নিয়েছিল বউকে ডিভোর্স করে আঙ্কল সব-কিছুর ওপর দখল নিয়ে বসল বলে। তখন দু'জনের একজনকেও দেখতে পারত না উর্মিলা। কিন্তু মা কত ঝানু সেটা পরে বুঝেছে। এদিক থেকে মায়েব ওপর আর রাগ নেই মেয়ের, রাগ অন্য কারণে। নিজেকে ছাড়া আর সকলকে বোকা ভাবে মা। তার ধারণা, মেয়ে বাজে লোকের খপ্পরে পড়ে সর্বনাশ ডেকে আনছে। মেয়ের মতিগতি দেখে বিজয় মেহেরা সম্পর্কে আঙ্কলকে খবর নিতে বলেছে। আঙ্কল তার সম্পর্কে যাচ্ছেতাই রিপোর্ট করেছে। মিরিকের এক পার্টিতে তাকে দেদার মদ খেতে দেখেছে বলেছে। বিজয় উর্মিলার কাছে সত্যি কথাই বলেছে। অল্প-স্বল্প মদ খেয়েছিল সত্যি সথাই। একলা থাকে, কিছু ভালো না লাগলে একটু-আধটু খায়ও। তাও ছেড়ে দেবে কথা দিয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে মায়ের আবার আঙ্কলের কথাতেই ধ্রুব বিশ্বাস। এ নিয়ে মায়ের সঙ্গে কম ঝগড়া করে নি উর্মিলা। বলেছে, বাবা তো এন্তার মদ খেত—কিন্তু বাবা কি খারাপ লোক ছিল?

—বয়েস আর বারো-চৌদ্দ বছর কম হলেও ওই আঙ্কল মাকে ছেড়ে আমাকেই বিয়ে করার জন্য উঠে-পড়ে লাগত—বুঝলে? এখনো নিজের তাঁবের লোকের কাঁধে আমাকে ঝোলানোর মতলবে মা-কে ফুসলে বেড়াচ্ছে, খুব ভালো ভালো ছেলের খবর দিচ্ছে। ভালো না হাতি—এবারও মা জোর-জার করে আমাকে পাহাড়ে ধরে নিয়ে গেছল তার খবরের এক ছেলেকে দেখার জন্য। মায়েরই পছন্দ হয় নি বলে বাঁচোয়া।

এবারে আর একটা গোপন খবর ফাঁস করল উর্মিলা। বিজয় মেহেরার সঙ্গে তার যে যোগাযোগ আছে এটা বাপীর মতো আঙ্কলও জেনে ফেলেছে। পাহাড়ের রাস্তায় এই বানারজুলির জঙ্গল থেকেই দু'জনকে একসঙ্গে দেখে জিপ থামিয়ে দাঁড়িয়ে গেছল। সে প্রায় আট মাস আগের কথা। কলে পড়ে তাকে খুশি করার জন্য উর্মিলা রেশমার মারফৎ তাকে এক বোতল ভালো মদ পাঠিয়ে দিয়েছিল। যে-রাতে বাপী আঙ্কলের মন পাবার জন্য তার বাড়ি গেছল, সেই রাতে। বাপী টের পেয়ে ওর সম্পর্কে যা-তা ভেবেছে, কিন্তু মেমদিদিকে রেশমা দারুণ ভালবাসে—তাই গেছে। আঙ্কল যদি টের পেত এ-ব্যাপারে রেশমার সঙ্গেও যোগসাজশ আছে, মওকা পেয়ে সে তাহলে ভিতরের ঘর ছেড়ে রেশমাকে বিছানাতেই টেনে নিয়ে যেত—এমন চরিত্র তার। জেরার জবাবে রেশমা শুধু বলেছে, কাগজের বাক্সটা মেমদিদি তার কাছে পৌঁছে দিতে হুকুম করেছে তাই নিয়ে এসেছে, আর কিচ্ছু জানে না। ভালো মদের বোতল ভেট দেবার অর্থ আঙ্কল ঠিকই বুঝেছে। মাকে এখন পর্যন্ত কিছু বলেনি অবশ্য, কিন্তু সেই থেকে উর্মিলার ওপরেও তার একটু সর্দারি বেড়েছে। ফাঁক পেলে ভালো মুখ করে বিজয় মেহেরাকে বাতিল

করার উপদেশ দেয়, আর মায়ের প্রতি তার নিজের কর্তব্যের কথা বলে ওকে হাতের মুঠোয় রাখতে চায়। আবার ওদের দু'জনকে হাতেনাতে ধরার জন্যে ওত পেতে আছে। রেশমাকে ধরে জেরা করে, শাসায়। উর্মিলার তাই নিজের জন্যে চিন্তা, রেশমার জন্যেও চিন্তা। এ অবস্থায় ফ্রেন্ড অর্থাৎ বাপীই একমাত্র সহায় তার।

বুকের তলার চেনা যন্ত্রণাটা থেকে থেকে মোচড় দিয়ে ওঠে। এর নাম ঈর্ষা কি হতাশা বাপী জানে না। নিজের ওপরেই বিরক্ত। কেন সেধে এর মধ্যে নিজেকে জড়াতে গেল। তার সামনে কাজ। কাজে শুদ্ধি। কাজে মুক্তি। এর থেকে ভ্রষ্ট হলে ওই হতাশার দেয়ালে মাথা খোঁড়াই সার হবে এ-কি ও জানে না?

গায়ত্রী রাই নিজে সঙ্গে করে বাপীকে তার পাহাড়ের বাংলোয় রেখে গেছে। আর ঝগড়ুকে যা বলার বলে গেছে নিশ্চয়। সমস্ত ব্যবস্থা আর কর্তব্য বুঝিয়ে দিয়ে মালকান চলে যাবার পর লোকটা অনুগত ছায়ার মতোই তার সঙ্গে লেগে আছে।

ঝগড়ু বাড়িয়ে বলেনি। পাহাড়ের ওপর সত্যি ছবির মতো বাংলো। এ তল্লাটে এমন আর দুটি নেই। পাহাড়টাকে পেঁচিয়ে লাল কাঁকরের রাস্তা বাংলোর মুখে এসে থেমেছে। থাকে থাকে পাহাড় কেটে প্ল্যাটফর্মের মতো করা হয়েছে। সব থেকে উঁচু প্ল্যাটফর্মে তিনটে বড় ঘর। তাতে কাঁচের দরজা জানালা। সামনে প্রশস্ত বারান্দা। ঢোকার পথে দিশি ফুলের বাগান। পিছনে দরকারী এবং দামী গাছ-গাছড়ার বাগান। একদিকে কাঠের মস্ত স্টোর হাউস। তার পরেই একসারি শিরীষ গাছ। স্টোর হাউসের পাশে সাপ-ঘর। ছোট-বড় গ্লাসকেসে নানা রকমের সাপ। ঝগড়ু এখানে সাপের বিষ বার করে। বাংলোর আর একদিকে একটু তফাতে কিচেন। তার পাশে ছোট ছোট দুটো ঘরে চাকর আর মালি থাকে। পরের ঘরটা ঝগড়ুর। কর্ত্রী বা অন্য লোকজন এলে সে ওই ঘর দখল করে, নয়তো বাংলোতেই থাকে। সবটা জুড়ে চারদিকে কাঁটাতারের বেড়া—তাতে বুনো ফুল আর লতাপাতা লাগিয়ে সৌন্দর্য বাড়ানো হয়েছে।

পর পর তিনটে ঘরের একটা মেয়ের, মাঝেরটা গায়ত্রী রাইয়ের। শেষেরটা অতিথি-অভ্যাগতর জন্য। ভিতরে ডাইনিং স্পেস। সামনের বারান্দায় বসার ব্যবস্থা।

গায়ত্রী রাই চলে যাবার পর বাপীর প্রথম কাজ ঝগড়ুর সঙ্গে ভাব করা! ও তাকে মস্ত হোমরাচোমরা কেউ ভেবে বসে আছে। বয়েস শুনেছে সত্তরের কাছাকাছি, কিন্তু জরা এখনো দূরে সরে আছে। শক্তপোক্ত পাকানো চেহারা। লালচে চোখ। প্রথম দিনই বিকেলে পাহাড় থেকে নেমে বাপী ওর জন্য এক বোতল দামী মদ কিনেছে। ওর হাঁসফাঁস দশা দেখে বলেছে, যতদিন আমি এখানে আছি তুমি ভালো জিনিস খাবে—ফুরোলে আবার কিনে দেব। আবু রব্বানীর কাছে আমি তোমার অনেক গল্প শুনেছি, আমাকেও তার মতো কাছের একজন ভাববে।

প্রথম সন্ধ্যে থেকেই ওই পাথুরে মুখ খুশিতে টসটসে সর্বদা। প্রথম পাঁচ ছ'দিন বাপী আর বাংলো ছেড়ে বেরোয়নি। নেশার জিনিস সব এখানেই তৈরি হয়। এর জন্য জনাকতক বাঁধা কর্মচারী আছে। মস্ত স্টোর হাউসের মধ্যেই যাবতীয় ব্যবস্থা। ঝগড়ুকে সঙ্গে নিয়ে বাপী সব খুঁটিয়ে দেখেছে, বুঝে নিয়েছে। পিছনের বাগানের প্রতিটি গাছগাছড়া চিনেছে। সাপ-ঘরে গিয়ে ঝগড়ুর সাপের বিষ বার করা দেখেছে। এও গা

ছমছম করার মতো ব্যাপার। গ্লাস-কেস একটু ফাঁক করলেই বিষধর বেরিয়ে আসার জন্য গলা বাড়ায়। ঝগড়ু সেই গলা সাঁড়াশির মতো এক হাতে চেপে ধরে একটা ছোট টেবিলের সামনে নিয়ে আসে। টেবিলে রবারের ক্যাপ আঁটা কাঁচের গেলাস। সাপের মুখ সেখানে ধরার সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ সাপ তার ওপরেই দাঁত বসায়—ফলে রবার ক্যাপে দাঁত আটকে যায়। ঝগড়ু তখন সাপের চোযালের দু'দিকে নির্মমভাবে টিপতে থাকে —গেলাসের মধ্যে তখন টস-টস করে বিষ পড়ে।

বিষ বার করা হয়ে গেলে অতি বিষাক্ত সাপের দশাও নিস্তেজ কাহিল। মাটিতে ছেড়ে দিলেও কোনরকমে এঁকেবেঁকে পালাবার পথ খোঁজে। তেড়ে আসে না।

দুপুরে আর সন্ধ্যার পরে বাপী অনেক রাত পর্যন্ত তন্ময় হয়ে বই পড়ে। সত্যি অনেক রকমের বইয়ের সংগ্রহ ছিল বীরেশ্বর রাইএর। প্রথম রাতে ভালো জিনিস খেয়ে একটু নেশা জমার পর ওকে বই পড়তে দেখে ঝগড়ুর হাপুস কান্না। নাওয়া-খাওয়া ভুলে সায়েব ওই-রকম করে বই পড়ত। সে চলে যাবার পর ও বইয়ে আর কারো হাত পড়েনি।

এরপর ঝগড়ুকে সঙ্গে করে পাহাড়ে আর জঙ্গলে ঘোরার পর্ব। এ-কাজেও ঝগড়ুর ভারী উৎসাহ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে ঘুরে তাদের দবকারের গাছগাছড়া ফুল-ফল লতা-পাতা চিনিয়েছে। কোনটার কি কাজ আর কত কদব বুঝিয়েছে। কখনো বা বাপী এ-সব সংগ্রহের বাঁধা লোকদের সঙ্গে সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যায় ফিরেছে। খাওয়া-দাওয়া হয়নি বলে ঝগড়ুর সখেদ অনুযোগ, আবার একই মুখে প্রশংসাও। সায়েবও ওইরকম করত। খাওয়া-দাওয়া ভুলে যেত। ঝগড়ুর মতে সায়েবের অনেক কিছুই বাপীবাবুর মতো। কিন্তু কাজ শেষ হলে দিলদরিয়া সাহেব গেলাস নিয়ে বসত—বাপীবাবু এ-সব ছোঁয় না, এটুকুই তফাৎ।

পনের দিনের মধ্যে বাপী অনেক ঘুরেছে অনেক দেখেছে অনেক চিনেছে। এই ঘোরা দেখা আর চেনাটা নেশাব মতো হয়ে উঠেছে। এরপর একলাই বেরুতে শুরু করল। সঙ্গে একটা দুটো বই। ঘোরে দেখে আর বইয়েব সঙ্গে মেলায়। এক-একদিন এত দূরে চলে গেছে, বাংলোয় আর ফেরাই হয়নি। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পথের ধারের ছাপরা ঘরের সরাইখানায় যা জোটে তাই খেয়েছে, আর অক্টোবরের পাহাড়ী শীতের রাত সেখানেই চাদর মুড়ি দিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। সকালে আবার পাহাড় আবার জঙ্গল।

এর মধ্যে দু'বার গায়ত্রী রাই পাহাড়ের বাংলোয় এসেছে। কিন্তু বাপীর সঙ্গে একবারও দেখা হয়নি। থাকতে আসা নয়, কাজে আসা। দ্বিতীয় দফায় চালিহা সায়েবও সঙ্গে ছিল শুনেছে। আর, প্রায় বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল মালকান। ঝগড়ু তাকে কি কথা বলেছে সেটা তাব উদ্ভাসিত মুখ দেখেই বোঝা গেছে। বাপীবাবুর সম্পর্কে বলতে গিয়ে খুব সম্ভব ওর স্বর্গত সায়েব-এর কথাই টেনে এনেছে ও। মালকান নাকি ওকে এবার থেকে বেরুনোর সময় সঙ্গে শুকনো খাবার দিতে হুকুম করে গেছে। দ্বিতীয় দফায় অনেকক্ষণ ছিল বলে ও বাপীবাবুর সংগ্রহের গাছ-গাছড়া লতা-পাতাও মালকানকে দেখিয়ে ছেড়েছে।

মনে মনে বাপী এই ঝগড়ুর কাছেও কৃতজ্ঞ।

সেদিন চেপে শীত পড়েছিল। আগের রাতে অসময়ে বৃষ্টি হবার ফলে সকাল থেকে কনকনে ঠাণ্ডা। সেই সঙ্গে ঝড়ো বাতাস চলেছে বিকেল পর্যন্ত। জঙ্গলের মধ্যে মাথা

কান আলোয়ানে মুড়ি দিয়েও বাপীর কাঁপুনি ধরেছে। তবু পাহাড়ের ধার ঘেঁষে এগিয়েই চলেছে। আর খানিক এগোলে যদি আরো নতুন কিছু চোখে পড়ে। এ-দিকটা নতুন। আগে আসেনি।

হঠাৎ এক জায়গায় পা থেমে গেল। অদূরে একটা মস্ত দেবদারু গাছের নীচে কে একজন বসে। বাপী চমকেই উঠেছিল। পাহাড় থেকে বুনো আদিবাসী নেমে এসেছে কোনো? এই ঠাণ্ডায়ও সম্পূর্ণ উলঙ্গ। বুক আর পিঠ পর্যন্ত ঝাঁকড়া কাঁচাপাকা চুল-দাড়ির জট। সর্বাঙ্গে ভস্ম-প্রলেপ। কপালেও। সামনে মাটিতে একটা লম্বা ত্রিশূল পড়ে আছে। নিজেও মাটিতেই বসে আছে, কোনো আসন নেই। হয়তো জনমানবশূন্য জায়গাটা বেছে নিয়ে সাময়িক বিশ্রামে বসেছে।

ঘাড় গুঁজে লতাপাতা গাছগাছড়া দেখতে দেখতে আসছিল। মুখ তুলে হঠাৎ দেখেছে মানুষটাকে। সে বোধ হয় দূর থেকেই লক্ষ্য করছিল তাকে। চোখাচোখি হতে বাপী স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে গেছে।

পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে চলল। নিজের ইচ্ছেয় যাচ্ছে কি ওই দুটো অপলক চোখ তাকে টানছে, জানে না। সামনে পাঁচ হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল। ওই দুটো চোখে হাসি ঠিকরোচ্ছে, কি আলো বাপী ঠাওর করতে পারছে না। সেই হাসি বা আলো যেন তার চুল-দাড়ির ফাঁকে ফাঁকেও লুকোচুরি খেলে গেল।

—আগে বাঢ়। মিল যায়গা।

বাপী চমকেই উঠল। কোনো সাধুসন্তের ধারে-কাছে ঘেঁষেনি কোনো দিন। ভক্তি-বিশ্বাসের ছিটেফোঁটাও নেই। কিন্তু ওই গমগমে গলার স্বর আর কথাগুলো এক রোমাঞ্চকর কাণ্ড ঘটিয়ে দিল। স্নায়ুতে স্নায়ুতে এক অদ্ভুত ঝঙ্কারের মতো বেজে চলল।

ত্রিশূল হাতে মানুষটা উঠে দাঁড়াল। তারপর পলকে জঙ্গলের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল।

তার পরেও ওই গলার স্বর আর ঝঙ্কারের রেশ বাপীর কানের পর্দায় ঘা দিতে থাকল।

আগে বাঢ়। মিল যায়গা!

সামনে এগোও। পেয়ে যাবে।

বাপী কি পেতে চায়? সামনে এগোলে কি পাবে? পাহাড়ের বাংলোর রাতে ঘুমের মধ্যেও ওই কথাগুলো একটা শব্দতরঙ্গের মতো কানে লেগেই থাকল। বার বার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটালো।

সামনে এগোও। পেয়ে যাবে।

আগে বাঢ়। মিল যায়গা!

## পনের

পঁচিশ দিন বাদে আবার বানারজুলি। বাপী তরফদার নিজের তাগিদে ফেরেনি। অদ্ভুত ভালো কেটেছে এই ক'টা দিন। সম্ভব হলে আরো দিনকতক থেকে যেত। কাজে ডুবে ছিল। প্রাণের গভীরেও। যে প্রাণের স্পর্শ এখন বানারজুলিতেও তেমন আর নেই। এত দিনের মধ্যেও কর্ত্রী ডেকে পাঠায়নি, ভাগ্য। এরপর তার মেজাজ বিগড়নোর আশঙ্কা।

বাইরে সেই বাপীই। কোনো পরিবর্তন নেই। কিন্তু ভিতরে কিছু তফাৎ হয়েছে। নিজের ওপর বিশ্বাস বেড়েছে। পায়ের তলায় মাটি আরো খানিকটা নির্ভরযোগ্য শক্ত মনে হয়েছে। ভিতরে কিছু বাড়তি উৎসাহ উদ্দীপনার সাড়া মিলছে। জঙ্গলের ন্যাংটো সাধুর সঙ্গে যোগাযোগটা ভবিতব্যের ইঙ্গিত বলে ভাবছে না। আর, যে-কথা সে বলেছে তারও এমন গম্ভীর কিছু তাৎপর্য নেই যা বাপীর জানা ছিল না। কিন্তু সময় বিশেষে অনেক সাধারণ কথা বা সামান্য কথাও বড় হয়ে ওঠে, ঝঙ্কার তোলে। কলকাতার ব্রুকলিন পিওন রতন বণিকের ভবিষ্যৎ বচনে আস্থা কতটুকু ছিল? তবু ভালো কি লাগেনি? ন্যাংটো সাধুও কিছু না জেনেই হয়তো বাপীর একাগ্র প্রস্তুতির মুহূর্তে সব সার্থকতার সাদা মন্ত্রটুকু কানে জপে দিয়েছে। কিছু পেতে হলে কিছু করতে হবে। আগে বাড়তে হবে। এই উদ্দীপনা কোনো দ্বিধার দোসর হতে পারে না। নিষ্ক্রিয় তো নয়ই। ভিতরের এই জোরটুকু অনুভবের বস্তু।

কিন্তু ফিরে এসেই টের পেল এখানকার সমাচার কুশল নয়।

গায়ত্রী রাইয়ের বাংলোর দরজা জানালা সব বন্ধ। বারান্দাটাও খাঁ-খাঁ করছে। বেতের টেবিল বা চেয়ার কটারও চিহ্ন নেই। উঠোনের কোণের দিকে মালিটা ঘাড় গুঁজে কাজ করছে।

ঝোলা-কাঁধে বাপী বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল খানিক। তারপর গেট খুলে মালির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, সব কোথায়?

মালি কোনো হদিস দিতে পারল না। চার দিন আগে বাংলো তালা-বন্ধ করে সব চলে গেছে। কোথায় গেছে বা কত দিনের জন্য গেছে সে জানে না।

বাপীর শোনা ছিল দূরপাল্লার সফরে বেরুনোর দরকার হলে গায়ত্রী রাই মেয়েকে রেখে যায় না, সঙ্গে নিয়ে বেরোয়। কিন্তু গত ন' মাসের যোগাযোগে তাকে এভাবে উবে যেতে আর দেখেনি। গোলযোগের গন্ধ পাওয়া বাপীর স্বভাব কিনা জানে না। তিন দিনের জন্য পাহাড়ের বাংলোয় যাবার নামে যে মেয়ে ফুঁসেছে আর গজরেছে, কিছু একটা না ঘটলে তাকে বগলদাবা করে বেরুনোটা ওই মায়ের পক্ষে খুব সহজ হবার কথা নয়। আরো মনে হল, ব্যবসার তাগিদে তড়িঘড়ি দূরে যাওয়ার দরকার হলে বাপীর কাছে ফেরার এত্তেলা যেত।

ঘরে ফিরে কাঁধের ঝোলা নামিয়েই সাইকেল নিয়ে বেরুলো আবার। আপিসে। পাঁচটা তখনো বাজেনি। অ্যাকাউন্টেন্টকে ডেকে নিজের ঘরে ঢুকল। কিন্তু না কর্ত্রী কোথায় গেছে বা কত দিনের জন্যে গেছে সে-ও জানে না। চার দিন আগের বিকেলে সে-ও দুটো দরকারী চিঠি সই করাতে গিয়ে দেখে বাংলো তালাবন্ধ। ব্যবসার কাজে বেরুলে অ্যাকাউন্টেন্টের অন্তত না জানার কথা নয়। বাপী স্বস্তিবোধ করছে না।—মিস্টার চালিহা কোথায়?

—এখানেই।

—উনি জানেন না মিসেস রাই কোথায় গেছেন?

অ্যাকাউন্টেন্ট তাও জানে না। মিস্টার চালিহা শুধু দরকারী কাগজপত্র সব তাঁকে দিয়ে সই করিয়ে নেবার হুকুম করেছেন।

পরদিন বাপী সকাল দশটার একটু আগেই আপিসে হাজির। চালিহা আসতে তার

ঘরে এসে দাঁড়াল। ঘরে এলে এই লোক এখনো তাকে বসতে বলে না। ফর্সা হাসি মুখে সুতৎপর ব্যস্তভাব।—দেখাশুনো হল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ?

—কত দিন ছিলে?

—পঁচিশ দিন।

ফাইল থেকে মুখ তুলল চালিহা। ঠোঁটের হাসি ধারালো একটু।—পঁচিশ দিন ধরে সেখানে দেখা-শোনার এত কি ছিল?

বাপী নিরুত্তর।

—মিসেস রাইয়ের সঙ্গে এ নিয়ে আমার কথা হয়েছিল। তোমার ফিরতে এত দেরি হবে তিনিও জানতেন না।...ঠিক আছে, এতদিন সেখানে তুমি কি করলে না করলে, কি রকম অভিজ্ঞতা হল তার একটা অফিসিয়াল রিপোর্ট দাও।

ভিতরটা উষ্ণ হয়ে উঠছে বাপীর। তবু যতটা সম্ভব ঠাণ্ডা এবং সংযত। একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করল, মিসেস রাই কোথায় গেছেন?

হাতের লাল পেন্সিল খোলা ফাইলের ওপর ফেলে আবার মুখ তুলল। খুব মোলায়েম স্বরে জবাব দিল, শিলিগুড়ি। সেখান থেকে আর কোথাও গেছেন কিনা জানি না। কেন—খুব দরকার তোমার?

—আজ্ঞে না। আমার ওপর তাঁর কোন ইনস্ট্রাকশন আছে?

ঠোঁটের ফাঁকে হাসির ছোঁয়া। ধারালো চাউনি মুখের ওপর আঁটকে রইল খানিক। —তোমাকে ইনস্ট্রাকশন এবার থেকে তাহলে তিনি দেবেন ভাবছ?

বাপী বিনীত অথচ স্পষ্ট জবাব দিল, তা ভাবার কোনো কারণ নেই। পঁচিশ দিন আমার এখানে না থাকার জন্যে আপনি অফিসিয়াল রিপোর্ট চাইলেন বলেই কথাটা জিজ্ঞেস করার দরকার হল।

—কেন?

—আমি যা শিখতে বা জানতে বুঝতে গেছলাম তার কোনো অফিসিয়াল রিপোর্ট হয় না। আর সেজন্যে পঁচিশটা দিনও কিছুই নয়। আমার ধারণা ছিল মিসেস রাই সেটা জানতেন। নিজে সঙ্গে করে আমাকে যখন সেখানে রেখে এসেছিলেন, ফেরার কথা কিছু বলেন নি। আর, ছ'দিন আগে আপনারা দু'জনে যখন সেখানে গেছলেন তখনো ফেরার সম্পর্কে কোনো নোট বা ইনস্ট্রাকশন পাইনি।

ফর্সা মুখে অল্প অল্প করে হাসি ছড়াতে লাগল। তুচ্ছ ব্যাপার ঝেড়ে ফেলার মতো গলার স্বর।

ব্যাপারটা তুমি সিরিয়াসলি আর ইমোশনালি নিয়েছ দেখছি। আই অ্যাম রাদার গ্ল্যাড। অলরাইট, ফরগেট ইট। রিপোর্ট দিতে হবে না—বোসো, তোমার সঙ্গে দরকারী কথা আছে।

বাপী বসল। লোকটার আচরণ এভাবে বদলাতে দেখে সতর্কও একটু।

চালিহা স্বভাবসুলভ ব্যস্ততায় খোলা ফাইলটার ওপর সামান্য চোখ বুলিয়ে সেটা সরিয়ে দিল। পাশের দুটো টাইপ-করা চিঠিতে খসখস করে নাম সই করে টেবিলের বোতাম টিপল। বাইরে প্যাঁক করে শব্দ হতে পনের সেকেণ্ডের মধ্যে অ্যাকাউন্টেন্ট

হাজির। চিঠি আর ফাইল নিয়ে সে প্রস্থান করতে খুশি মুখে চালিহা কিছু বলার জন্য প্রস্তুত।

—ওয়েল তরফদার এবারে তাহলে তোমাকে একটা সুখবর দিতে পারি। মিসেস রাইয়ের তোমার ওপর সত্যি খুব ভালো ধারণা। আমারও তাই।...আর ইউ হ্যাপি?

বাপী সবিনয়ে মাথা নাড়ল। ঠোঁটে একটু হাসিও টেনে আনলো।

—গুড। সো লেট মি গিভ ইউ এ বিট অফ হার মাইন্ড অ্যান্ড মাইন ট্যু—

এরপর বাপী কান পেতে তার বক্তব্য শুনল।...অকটোবরের শেষের দিক এটা। ডিসেম্বরের গোড়ায় চালিহা আসাম সাইডে লং টুরে চলে যাচ্ছে। বছরে দু-আড়াই মাসের জন্য ও সময় প্রতিবারই গিয়ে থাকে। সে-সময় এদিকের সবকিছু মিসেস রাই ম্যানেজ করেন। মাসের অর্ধেকটা তাঁকেও নানা জায়গায় টুরের ওপর থাকতে হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে এবারে তিনি কতটা পারবেন বলা যায় না। মনে হয় বাপীর ওপর আরো অনেক দায়িত্ব আসবে। সেই সঙ্গে এখানকার কাজের ব্যবস্থা-পত্রও আস্তে আস্তে বদলাবার কথা ভাবতে হবে তাকে। বানারজুলির জঙ্গলেব এ সাইডে কিছু কিছু দরকারী জিনিসের চাষ হচ্ছে। সেটা আরো অনেক বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু এ কাজ জঙ্গলের একজন উটকো লোকের সর্দারির ওপর নির্ভর করে চলবে এটা মিসেস রাই বা চালিহা কারোরই পছন্দ নয়। জঙ্গলের রেঞ্জ অফিসার চালিহার বন্ধুস্থানীয়। বাপীকে একদিন সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দেবে। লুকোচুরির মধ্যে না থেকে চাষের জমি বা লেবার পাবার ব্যবস্থা সরাসরি তার সঙ্গেই করে নিতে হবে। এর জন্য খরচ যা হয় হবে। মোট কথা নতুন লোক নিয়ে নতুন টিম-ওয়ার্কের প্ল্যান মাথায় রাখতে হবে। সাপ চালানের ব্যবসা সম্পর্কেও একই কথা। এও কোনো একজন মুরুব্বীর ওপর নির্ভর করে চলবে না। ফি বছর সাপ যারা ধরতে আসে তাদের থেকেই লোক বাছাই করে এই টিম-ওয়ার্কের দিকে এগোতে হবে। তবে শীত তো এসেই গেল, এক্ষুনি এ-দিকটা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। অন্য দিকের ব্যবস্থাও ধীরে-সুস্থে অর্থাৎ খুব কোয়ায়েটলি করে নিতে হবে—কোনরকম সোরগোল তোলার দরকার নেই।

বক্তব্য শেষ।—ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড মি?

বাপী হ্যাঁ বা না কিছুই বলল না। যা বলতে চায় তাব মধ্যে না বোঝার মতো অস্পষ্ট কিছুই নেই। একটা অসহিষ্ণু প্রতিবাদ ভিতব থেকে ঠেলে উঠছে। বাইরে তাই আরো নির্লিপ্ত। মুখের দিকে চেয়ে থেকে বোঝার ভান করল। তারপর বলল, মোটামুটি টিম-ওয়ার্কের দিকে আমি এগিয়েছি। রেঞ্জ অফিসারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিলে সেটা আরো ভালোভাবে অরগ্যানাইজ করা যাবে, তবে দুটো কাজেরই মুরুব্বী বলতে আবু রব্বানী। আপনারা তাকেই বাতিল করতে চান বোধ হয়?

—এক্ষুনি কিছু করতে চাই না বা কিছু বুঝতে দিতে চাই না। কিন্তু ওই লোককে সামনে রেখে তুমি কত আর এগোতে পারো—আফটার অল হি ইজ এ গভর্মেন্ট সারভেন্ট।

কাগজে কলমে আবু রব্বানীর নাম সামনে বা পিছনে কোথাও নেই। এদিকের বাড়তি উপার্জনের সবটুকুই দুলারির নামে। আবুকে নিয়ে কোন তরফেরই বিপাকে পড়ার প্রশ্ন নেই। যে কারণেই হোক ওকে এখন এরা হেঁটেই দিতে চায় বোঝা গেল। মাত্র

পঁচিশ ছাব্বিশ দিনের মধ্যে এরকম মনোভাবের কারণ কি ঘটতে পারে বাপী ভেবে পেল না।

একটু চুপ করে থেকে বাপী বলল, সে-রকম বড় প্ল্যানে যদি কাজ শুরু করি আর টাকা খরচ করতেও যদি আপত্তি না থাকে, আবু রব্বানীকে তাহলে সরকারী কাজ ছাড়িয়ে টেনে নেবার চেষ্টা করা যেতে পারে।...ওর মতো বিশ্বাসী কাজের লোক পাওয়া শক্ত মিসেস রাইও ওকে পছন্দ করেন।

মন বোঝার জন্য বলা। নইলে আবুর সরকারী চাকরির দরুন এদের সুবিধে ছাড়া অসুবিধে কিছু নেই। কিন্তু প্রস্তাবনা শোনামাত্র বিরক্তি—সি ইজ রাদার ডিসগাসটেড নাও, টেক ইট ফ্রম মি। ওদের চালচলনে উনি এখন বিরক্ত।

বাপী সচকিত। 'ওদের' বলতে চালিহা আবু ছাড়া আর কাকে যুক্ত করল?

এ-প্রসঙ্গ বাতিল করে চালিহা দরকারী আলোচনার উপসংহারে চলে এলো।—আমাদের মোটামুটি ডিসিশান তোমাকে জানিয়ে রাখলাম, নাও গো অ্যাহেড। টাকা ফেললে কাজের লোকের অভাব হবে না। দু'এক দিনের মধ্যে রেঞ্জ-অফিসারের সঙ্গে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রাখছি। নাও ফর দি টাইমবিইং এভরিথিং ইজ ভেরি ভেরি কনফিডেনসিয়াল—মাইন্ড ইউ।

রণজিৎ চালিহা এ-দিন লাঞ্চ টাইম অর্থাৎ একটার আগে তার আপিস ঘর ছেড়ে নড়ল না। কর্ত্রী এখানে না থাকার দরুন কিছু বাড়তি দায়িত্ববোধের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

নিজের ঘরে বসে বাপী মুহুর্মুহু ঘড়ি দেখছে। তার ওঠার অপেক্ষায় আছে। যে উৎসাহ আর তাজা মন নিয়ে পাহাড় থেকে ফিরেছিল সেটা আচমকা একরাশ কালীবর্ণ মেঘের তলায় চাপা পড়ে গেল। এই ক'টা দিনের মধ্যে সে-রকম কিছুই ঘটে গেছে। নইলে আবুর ওপর হঠাৎ এত বিরূপ কেন এরা?...শুধু আবুর ওপর নয়, আরো কারো ওপর। দুলারি কারো সাতে-পাঁচে থাকে না। সে নয়।

...তাহলে রেশমা!

একটু চিন্তা করলে পাকা মাথায় সোজা অঙ্কের ফল ঝপ করে সামনে এগিয়ে আসে। বাপীর চোখের সামনেও সেই গোছের একটা নির্ভুল উত্তর দুলতে লাগল। আবু রব্বানী বা রেশমা এদের কাছ থেকে টাকা পাচ্ছে বটে, কিন্তু বিনিময়ে উপকার এরাও কম পাচ্ছে না। এই লেনদেনের ফাঁক উদারতার ঠাঁই নেই। তবু ওদের ছেঁটে দেবার মতলব। ও-দিকে বানারজুলি ছেড়ে নড়ার নামে যে মেয়ের চোখে আগুন নামে, তাকে নিয়ে কর্ত্রী উধাও। এর মধ্যে ব্যক্তিগত ভিন্ন আর কিছুর যোগ কিছু থাকতে পারে না—পারেই না।

বুকের তলায় মোচড় পড়ছে। ক্ষত-বিক্ষত মন নিয়ে বানারজুলিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে এই আবু রব্বানী খুশিতে আটখানা হয়ে তাকে কাছে টেনে নিয়েছিল। বলতে গেলে ওর জন্যেই ভাগ্যের ভিন্ন বৃত্তে পা ফেলা সম্ভব হয়েছে। আজ মুরুব্বী হয়ে সবার আগে যদি ওরই বুকে থাবা বসাতে হয় তাহলে বাপী কি করবে? বসাবে?

—কি করবে জানে না।

জঙ্গল ভেঙে বাপী সোজা আবুর ডেরায়। জঙ্গলের এই সোজা পথও লম্বা লাগছিল। এ-সময় আবু খেতে আসে। নিরিবিলিতে পাওয়ার সম্ভাবনা। বাইরের দাওয়ায় দুলারি বসে। ওকে দেখেই উঠে দাঁড়াল। হাতে চাঁদ নাগাল পাওয়ার মুখ।—তুমি এসে গেছ

বাপীভাই! এদিকে যে জান্ ঠোঁটে নিয়ে তোমার অপেক্ষায় বসে আছে।

ঘরে ঢুকে একটু চেঁচিয়ে জানান দিল, বাপীভাই এসেছে! একটা চাটাই হাতে বেরিয়ে এলো।—দস্যি দুটো ঘুমোচ্ছে, এখানেই বোসো—গোসলে গেছে, বেরুলো বলে।

হালকা শীতের মিষ্টি রোদে পিঠ দিয়ে বাপী চাটাইয়ের ওপর বসল। আর তক্ষুনি প্রায় ভেজা গায়ে আবু হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এলো। ভালো করে একপ্রস্থ দেখে নিল, তারপর গলার স্বরে ক্ষোভ ঝরল।—আমরা ভাবলাম বিবাগী হয়ে পাহাড় থেকে আর কোথাও চলেটলে গেলে।

বাপীর সাদা-মাটা মুখ।—বিবাগী হতে যাব কোন দুঃখে। দুলারিকে বলল, ওকে একটা গামছা এনে দাও, গা-মাথা মুছে ফেলুক—

দুলারি ভিতরে যেতে যেতে বলল, যে রকম তেতে আছে গা-মাথার জল আপনি টেনে যাবে—

পরনের লুঙ্গি কোমরের দুদিকে একটু গুঁজে আবু চাটাইয়ে বসে পড়ল।—একলা এলে, না ঠাকরোনও এলেন?

—ঠাকরোন কোথা থেকে আসবেন?

—কেন? তারা পাহাড়ের বাংলোয় যায়নি? আবু যথার্থ অবাক।

দুলারি গামছা, ফতুয়া আর আয়না চিরুনি হাতে বেরিয়ে এলো। কিন্তু আবুর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, বাপীকেই দেখছে। সন্দিগ্ধ চাউনি।

—উনি পাহাড়ের বাংলোয় গেছেন ভেবেছিলে?

—তাছাড়া আর কোথায় যেতে পারে ভাবব! পাহাড়ে যাননি মোটে?

—না।

—তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি?

—না।

হাত বাড়িয়ে আবু দুলারির হাত থেকে ফতুয়াটা টেনে নিয়ে গায়ে চড়ালো। তারপর চিরুনি হাতে নিতে দুলারি একটু ঝুঁকে আয়নাটা তার মুখের সামনে ধরল। পরিপাটি করে মাথা আঁচড়ানো আবুর ছেলেবেলার বিলাস। এখনো সেই গোছের মনোযোগ। কিন্তু আড়চোখে বাপী দুলারির মুখখানা দেখছে। গম্ভীর হলেও শামলা মুখে পরিতৃপ্তির ছোঁয়া লেগে আছে। কে বলবে এই মেয়ে বানারজুলির পথে পথে ঘুরে সাপ খেলা দেখাতো, হাঁটু মুড়ে বসে ক্রুদ্ধ ফণা তোলা সাপের ছোবল খাবার উত্তেজনায় বারবার ভুঁয়ের ওপর হাত পেতে দিত। কেন যেন তখন রেশমার থেকেও এই দুলারিকেই বেশি ভয়াবহ মনে হত বাপীর। সেই মেয়ে এখন ঘরের লোকের মুখের সামনে আয়না ধরে আছে, আর মন দিয়ে মাথা আঁচড়ানো দেখছে।

আয়না চিরুনি গামছা নিয়ে দুলারি ঘরে চলে গেল। ওর বোধ হয় খেতে দেবার তাড়া এখন। একটা বড় নিঃশ্বাস ছেড়ে আবু বলল, দুলারি এর পর একহাত নেবে আমাকে।

—কেন?

—বার বার করে ও আমাকে পাহাড়ে তোমার কাছে চলে যেতে বলেছিল।... আমি বুদ্ধুর মতো ভেবে বসে আছি মেয়ে নিয়ে মেমসায়েব ওখানে চলে গেছে, আর তোমার

সঙ্গে শলা-পরামর্শ করছে।

—কিসের শলা-পরামর্শ?

—তুমি কি-চ্ছু জানো না—না?

—কি করে জানব। কাল বিকেলে ফিরে দেখি তোমার মেমসায়েবের বাংলো তালা-বন্ধ।

—ওই ম্যানেজার তো এখানে আছে, সে কিছু বলেনি?

—তার মেজাজ গরম দেখছি।

আবুর ছোট ছোট চোখ দুটো ছুরির ফলার মতো চকচক করে উঠল।—গরম কার ওপর, শুধু রেশমার ওপর না আমার ওপরেও?

—তোমার ওপরেই বেশি!

শোনামাত্র শিরদাঁড়া সোজা।—আমার ওপরেই বেশি? ও-শালার মেজাজের গরম আমি ছুটিয়ে দেব বলে দিলাম তোমাকে—আমার পিছনে লাগতে এলে ওর টুঁটি ছিঁড়ে না আনি তো আমার নামে কুকুর পুষো!

দু'হাতে দুটো থালা নিয়ে দুলারি দরজার বাইরে এসে থমকে দাঁড়ালো। তারপর ধমকের সুরে বলে উঠল, থাক, গলা ফাটিয়ে আর বেশি বাহাদুরি করতে হবে না। খেতে খেতে ঠাণ্ডা মাথায় বাপীভাইকে সব বলো আগে কি হয়েছে না হয়েছে—

বড় থালাটা আবুর সামনে রাখল, ছোটটা বাপীর সামনে। আবুর থালায় এককাঁড়ি গরম ভাত, আর ছোট-ছোট বাটিতে ডাল-তরকারি মাছের ঝোল। বাপীর থালায় তিনখানা পরোটা, একবাটি তরকারি।

আবুকে হাল্কা মেজাজে ফেরানোর জন্য খুশিমুখে বাপী নিজের থালা কাছে টেনে নিয়ে ওর বিবির প্রশংসা করল।—এরই মধ্যে এত সব, তুমি কি ম্যাজিক জানো নাকি!

দুলারি জবাব দিল, ছেলে দুটোর জন্যে করে রাখতে হয়, উঠলেই খাই-খাই করে। ...তোমার রুচলে হয়।

শেষের তিন কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন খোঁচা আছে একটু। দুলারির হাতের খাবার এ-যাবৎ অনেক খেয়েছে। শেষের এই ক'টা মাস সে সুযোগ হয়নি।

তিরিক্ষি মেজাজে আবু ভাতের ওপর ডাল ঢেলে দিয়ে গপাগপ কয়েক গরাস খেয়ে নিল। তারপর দুলারির দিকে চেয়ে অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠল, আগে খাওয়ার গল্পটাই হোক তাহলে—

দু'হাত দূরে গালে হাত দিয়ে খাওয়া দেখতে বসেছে দুলারি। তেরছা চোখে ওর দিকে একবার তাকালো শুধু। বাপী বলল, সব শুনে আগে মাথা ঠাণ্ডা করো—

রণজিৎ চালিহার সঙ্গে কথা হবার পর থেকে একটা চাপা অস্বস্তি বাপীর ভিতরেও ছেয়ে আছে। শোনার তাগিদেই ছুটে আসা। হেসেই আবুর দিকে ফিরল।—এত গরম হবার কারণটা কি...বিজয় মেহেরা?

খাওয়া ফেলে আবু সাগ্রহে আধখানা ঘুরে বসল।—তবে যে একটু আগে বললে তুমি কিচ্ছু জানো না?

—কেউ কিছু বলেনি। মেয়ে নিয়ে তোমাদের মেমসায়েবকে সরে পড়তে দেখে আর তোমার মেজাজ দেখে সেদিক থেকেই কোনো অঘটন ঘটেছে মনে হচ্ছে।

—তোমার মনের পায়ে গড় করি। ওই শালার ম্যানেজার মেমসায়েবের মেয়ের পিছনে চর লাগিয়ে রাখতে পারে এও তোমার মনে হয়েছিল?

বাপী জবাব দিল, একবার হাতে-নাতে ধরেছে যখন, রাখতে যে পারে মনে হওয়ারই কথা।

—কথা তো আমাকে তুমি একটু সাবধান করে দাওনি কেন, ওই হারামীর বাচ্চার কলে তাহলে এ-ভাবে পড়ি!

দুলারি ধমকে উঠল, ফের গাল পেড়ে কথা!

আবু খেঁকিয়ে উঠল, আমি ভদ্রলোকের ছেলে নই!

—ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে কথা কইছ!

একটা হাত তুলে বাপী দুলারিকে নিরস্ত করল।—বলতে দাও, অমন ঢের শুনেছি। আবুর দিকে ফিরল।—তুমি এ ব্যাপারে জড়াবে বা তোমাকে সাবধান করার দরকার হবে জানব কি করে?

—আমি জড়াইনি। আমাকে জড়ানো হয়েছে।

খাওয়ার ফাঁকে এরপর ঘটনার যে চিত্র সংগ্রহ করা গেল, তার সবটুকু নিখাদ সত্য হলে আবু পাকে-চক্রে জড়িয়ে পড়েছে সন্দেহ নেই।

...বাপী পাহাড়ে চলে যাবার পর রেশমা আবুকে দু'তিন দিন বলেছে, তার মেমদিদি বনমায়ার পিঠে চড়তে চায় লছমনকে বলে ব্যবস্থা করে দিতে হবে। হাতির পিঠে চেপে একটু-আধটু বেড়ানো নয়, একদিন দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত বনমায়াকে চাই মেমদিদির। যতদূর ইচ্ছে যাবে, যতক্ষণ খুশি বেড়াবে। অনেকদিন আগে বাপী ভাইয়ের সামনেই নাকি এরকম বেড়ানোর কথা হয়েছিল। এরপর আবু একদিন কি দরকারে মেমসায়েবের সঙ্গে দেখা করতে যেতে আগে-ভাগে তার মেয়ে এসে জানালো, অমুক ছুটির দিনে বনমায়াকে চাই-ই তার।

ছুটির দিনে জঙ্গলের হাতির খোঁজ বড় একটা পড়ে না। লছমনের সঙ্গে কথা বলে আবু ব্যবস্থা পাকা করে দিল। আর সেই ছুটির দিনে বনমায়ার পিঠে রেশমা আর তার মেমদিদিকে তুলে দিয়ে আবুর নিষ্কৃতি।

সন্ধ্যার পর মাথায় বজ্রাঘাত। ম্যানেজার চালিহা সায়েব লোক দিয়ে আবুকে ঘর থেকে তার বাংলোয় ডেকে পাঠাতেও আবুর মনে কোনো কু-ডাক দেয়নি। ভেবেছিল ভালো বোতল-টোতলের খোঁজে ডেকেছে। কিন্তু গিয়ে চক্ষুস্থির। বাংলোর গেটে মেমসায়েবের ভ্যান। বারান্দায় ম্যানেজারের পাশে মেমসায়েব বসে। সাদা পাথরের মতো শক্ত মুখ। আর হাড়-পাঁজরে ছুরি চালানোর মতো চোখ। গিয়ে দাঁড়াতেই ওই ম্যানেজার এমন জেরা শুরু করে দিল যেন আবু খুনের আসামী। জেরায় জেরায় জান জেরবার। ফরেস্টের হাতি কার হুকুমে চলে, বাইরের কোনো পার্টির বেড়ানোর জন্য সেই হাতি বেশ কয়েক ঘণ্টার জন্য কাউকে ছেড়ে দেবার এখতিয়ার হেড বীটম্যান হিসেবে আবু রব্বানীর আছে কি না। না যদি থাকে তাহলে আবু এ-কাজ করল কি করে? হাতি চড়ে বেড়ানোর কথা মিসিসায়েব বলেছে না রেশমা বলেছে, কোথায় বেড়াতে যাবে বলেছে, হাতি নিয়ে কোথায় তারা যাচ্ছে আবু যে-করেই হোক আগে থাকতে তা জানত কিনা, রেশমা কোন রকম আভাস তাকে দিয়েছিল কি না—এমনি জেরার পর জেরা। হকচকিয়ে

গেলেও আবু মোটামুটি সত্যি জবাব দিয়েছে। আর মেমসায়েব একবারও চোখের পাতা না ফেলে সত্যি-মিথ্যে ওজন করেছে।

মেমসায়েবের মন বোঝা আবুর কম্ম নয়। ম্যানেজার সায়েব যে খুশি হয়নি বা বিশ্বাস করেনি সেটুকু স্পষ্ট বোঝা গেছে। ওকে শাসিয়েছে, সত্যি কথা না বললে ফ্যাসাদে পড়তে হবে, মেমসায়েব বেইমানি বরদাস্ত করবে না।

জবাবে আবু আল্লার কসম খেয়েছে। কিন্তু ওই চালিহার ওকে কলে ফেলে কিছু স্বীকার করিয়ে নেবার মতলব। এভাবে হাতি ব্যবহার করার জন্য ওর নামে জঙ্গলের বড় কর্তার কাছে রিপোর্ট করা হবে বলে হুমকি দিল।

যতই হাঁসফাঁস দশা হোক আবুর, চাকরির গায়ে কাদা ছোঁড়ার কথা শুনলে তার মেজাজ ঠিক থাকে না। তাছাড়া যা-ই হয়ে থাক মেমসায়েবের মেয়েকে যে জঙ্গলসায়েবের কাছে এনে দাঁড় করানো যাবে না এটুকু বুদ্ধি আবুর আছে। মেজাজ খারাপ হতে মোলায়েম করে সে-ও তেরছা জবাব দিয়েছে। বলেছে, মিসি স্বীকার করেন তাহলে ওর চাকরির ক্ষতি হবে বটে। তা না হলে কিছুই হবে না। আবু রেশমা বা লছমন মাহুত কিছুই স্বীকার করবে না, আর চেষ্টা করলেও বনমায়াকে দিয়ে কিছু কবুল করানো যাবে না।

মেমসায়েবের সঙ্গে কাজের সম্পর্কের বারোটা বেজে গেছে ধরে নিয়েই আবু রাগের মাথায় আর ঝোঁকের মাথায় অমন কথা বলে এসেছে। সারাক্ষণের মধ্যে মেমসায়েব টুঁশব্দও করেনি। নড়ে-চড়ে বসেনি পর্যন্ত। কেবল দেখেছে আর দেখেছে।

ছাড়া পেয়ে আবু প্রথমে ছুটে এসেছে লছমনের কাছে। বনমায়া জায়গা মতো বাঁধা ছিল কিন্তু লছমনের টিকির দেখা পেল না। সেখান থেকে সোজা রেশমার ডেরায়। অন্ধকারে ভূতের মতো বাইরে বসে ছিল তার সাপ ধরার সাগরেদ হারমা। সে জানিয়েছে, রেশমা ঘরে নেই। তার খোঁজে মেমসায়েব দু'-দুবার লোক পাঠিয়েছিল।

রাগে জ্বলতে জ্বলতে আবু ঘরে ফিরেছিল। দুলারির সঙ্গে রেশমা দিব্যি খোশগল্প করছে বসে। দাঁত কড়মড় করে আবু ওকে বলেছে, এখানে পালিয়ে থাকলে জান বাঁচবে?

রেশমা পাল্টা চোখ পাকিয়েছে, তুমি বেঁচে থাকতে আমার জান বাঁচবে না, কেমন মরদ!

এই মেয়ে হম্বি-তম্বির ধার ধারে না। আবুর যা জানাব ঠাণ্ডা মাথায় জেনে নিল।

...বনমায়ার পিঠে চেপে এখান থেকে ছ'মাইল পথ বানারহাটে গেছল ওরা। সেখানে এক জায়গায় হাতি থামিয়ে মেমদিদি কোথায় নেমে গেছল। ঘণ্টা দুই বাদে ফিরে এসে আবার বনমায়ার পিঠে চেপে চলে এসেছে।

আবু খেঁকিয়ে উঠেছিল, হাতির পিঠ থেকে নেমে মেমদিদি দু'ঘণ্টার জন্য কোথায় গেছল তুই জানিস না?

রেশমা মুখ মুচকে জবাব দিয়েছে, মেমসায়েব জিজ্ঞেস করলে বলতে হবে কিচ্ছু জানি না।

তারপর রেশমা বলেছে, ম্যানেজার চালিহা মেমদিদির পিছনে চর লাগিয়ে রেখেছে সেটা ও বানারহাটে হাতির পিঠে দু'ঘণ্টা বসে থাকার সময় টের পেয়েছে। সাইকেলে চেপে একটা লোক আশপাশে ঘুরঘুর করছিল আর ওর দিকে চেয়ে মুখ টিপে টিপে

হাসছিল। রেশমা প্রথমে ভেবেছিল ফষ্টি-নষ্টির মতলব। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল, লোকটাকে বারকয়েক বানারজুলির রাস্তায় আর জঙ্গলে দেখেছে—ওর ডেরার আশপাশ দিয়েও যাতায়াত করতে দেখেছে। তার মিনিট দশেক বাদে মেমদিদি ফিরল যখন, তখন ওই লোকটা পনের গজ দূরে সাইকেলে বসে আর একটা থামে ঠেস দিয়ে এদিকে চেয়ে সিগারেট টানছিল। রেশমা লোকটাকে দেখিয়ে সন্দেহের কথা বলতেই মেমদিদি বিষম চমকে উঠল। মনের মানুষের সঙ্গে যতক্ষণ মেমদিদি বাইরে ছিল, তার প্রায় অর্ধেক সময় ওই লোকটা নাকি তাদের সামনে পিছনে সাইকেলে ঘুরঘুর করছিল! তারা দু'জনেই ওকে দেখেছে আর রসের খোরাক পেয়ে অমন করছে ভেবে বিরক্ত হয়েছে।

বনমায়া চলতে শুরু করতেই লোকটা সাইকেলে সাঁই সাঁই করে আবার বানারজুলির পথে এগিয়ে গেছে।

...রেশমা আর সাহস করে মেমদিদির সঙ্গে বাংলো পর্যন্ত যায়নি। আগেই বুঝেছে, ফাঁস যা হবার হয়ে গেছে। লছমন ফিরতে শুনল, ম্যানেজার চালিহা চোখ রাঙিয়ে তাকে অনেক জেরা করেছে। তারপর আর নিজের ঘরমুখো না হয়ে রেশমা গা-ঢাকা দিয়ে আছে। মেমদিদি ওকে সেই পরামর্শই দিয়ে রেখেছিল। আর বলেছিল, ও যেন কিছু জানে বলে কক্ষনো স্বীকার না করে। ওকে হাতির পিঠে বসে থাকতে বলা হয়েছিল, তাই বসেছিল। ও জানে মেমদিদি তার এক মেয়েবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছে—ব্যস। আর কিচ্ছু জানে না।

মেমসায়েবের জেরার মুখে রেশমাকে দাঁড়াতে হয়নি। পরদিনই মেয়ে নিয়ে উনি হাওয়া। ম্যানেজার সায়েব রেশমাকে আপিসে জেরা করেছে। তার বদ্ধ ধারণা, এই ষড়যন্ত্র অনেক দিনের আর এর মধ্যে আবু রব্বানীও আছে। কিন্তু রেশমার মুখ থেকে কোনো কথা বার করতে পারেনি। আপিসঘরে রেশমাকে প্রায় ঘণ্টাখানেক আটকে রেখেছিল চালিহা। চোখ দিয়েই 'সব্ব অঙ্গ' চেটেছে ওর। মেমসায়েব নাকি এখানকার কাজ থেকে ওকে ছাড়িয়ে দিতে হুকুম করে গেছে। এ হুকুমের আর নড়চড় হবে না। কিন্তু এতবড় ক্ষতি হোক ওর, চালিহা সেটা চায় না। রেশমার মতো সাহসী সুন্দরী আর বুদ্ধিমতী মেয়ে ইচ্ছে করলে ব্যবসার অন্য কাজে লাগতে পারে। এরকম কিছু মেয়ে দরকার সেটা মেমসায়েবও জানে। রেশমা এ-জায়গা ছেড়ে চলে যেতে রাজী হলে তার আপত্তি হবে না। ডিসেম্বরের গোড়ায় দু' মাসের জন্য চালিহা আসাম যাচ্ছে। সেখানেই কাজের মেয়ে দরকার আপাতত। রেশমা তার সঙ্গে যেতে রাজী হলে ওর সেখানে ভালো থাকার ব্যবস্থা সে-ই করে দেবে। এখানকার থেকে ঢের ভালো থাকতে খেতে পরতে পাবে। টাকা তো বেশি পাবেই। বিলকুল হালকা কাজ। চালিহার যে লোকেরা সেখানে কাজ করছে তাদের যোগসাজশে দোকান হোটেল-রেস্তোরা বা অন্য রইস খদ্দেরদের কাছে মাল পৌঁছে দেওয়া। তারপর হেসে হেসে বলেছে, মালকানের কোপে পড়ার ফলে আখেরে ওর লাভ হবে, দিন ফিরবে। ওর মতো মেয়ের জঙ্গলে পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না।

আবুর বলা শেষ। বাপী জিজ্ঞাসা করল, রেশমা কি বলেছে?

—কি আর বলবে। ও কম বজ্জাত? গেলে কাজ দেবে জানে, কিন্তু ও-শালার আসল মতলব কি আর জানে না? চোখের বাণে-বাণে ওই দিনে দুপুরেই ওকে যতটা পারে বিঁধেছে, আর বলেছে, এত বড় ম্যানেজার সায়েবের যে এত দয়া ওর ওপর জানত

না। তারপর আব্দার করেছে, শীতে ওর সাপ ধরার দিন গেল, আবু রব্বানীর সাগরেদি করে মাসে যে পঞ্চাশটি করে টাকা পায় ডিসেম্বর পর্যন্ত সে-টাকাও না পেলে খুব মুশকিলে পড়ে যাবে। দয়ার অবতার ম্যানেজারের পায়ের ওপর উপুড় হতে গেছল পর্যন্ত ওই পাজি মেয়ে। শালা তখন ওর দুকাঁধ খামচে ধরে মজা করে টেনে তুলেছে আর তার দু'চোখ দিয়ে গলগল করে লোভ ঠিকরেছে—

—থামো! হাসি চেপে দুলারি ধমকে উঠল।

—থামব কেন? রেশমা নিজের মুখে তোমাকে এসব কথা বলে যায় নি? ...আর ম্যানেজার লোভে গলে-গলে ওকে কথা দেয় নি, চেষ্টা করবে—তবু না যদি পারে দুটো মাস পঞ্চাশটা করে টাকা নিজের পকেট থেকেই দিয়ে দেবে?

সব বলার পর আবুর আর দুলারিরও বাপীভায়ের মন বোঝার ইচ্ছে ছিল। কিছু না বলে উঠে আসায় হয়তো একটু বেজারই হয়েছে। কিন্তু গায়ত্রী রাইয়ের সঙ্গে দেখা বা কথা না হওয়া পর্যন্ত বাপী কোন্ আশার কথা শোনাতে পারে ওদের? আবুর সম্পর্কে চালিহার মতলব শুনলে তো ওদের পিত্তি জ্বলবে আর অশান্তি বাড়বে।

## ষোল

রেশমার ডেরার বাইরে হারমা মাটিতে বসে। প্রভুভক্ত কুকুরের মতো সতর্ক চোখ। অবাঞ্ছিত কাউকে দেখলে ঘেউ ঘেউ করে ওঠার ইচ্ছেটা শুধু চোখে প্রকাশ পায়। তবে বাপীকে দেখে বসা থেকে উঠে দাঁড়াল বটে।

ওকে একলা দেখে বাপী ধরে নিল রেশমা ঘরে নেই। কেন এলো, কি দরকার ও নিজেও জানে না। আবুর ঘর থেকে বেরিয়ে পা দুটো অনেকটা আপনা থেকেই এই পথ ধরেছে।

—কোথায়?

জবাবে ভাবলেশশূন্য হারমা ঘরের দিকে ফিরে হাঁক দিল, হি রেশমা—!

খুপরি জানলায় রেশমার মুখ দেখে বোঝা গেল ওটার গায়েই শোবার চৌকি। উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে বাপীর দু' চোখ ঘা খেল একপ্রস্থ। গায়ে মোটা চাদর থাকা সত্ত্বেও উঠে বসার ফলে কয়েক পলকের জন্য সামনেটা অনাবৃত। গায়ে শুধু আঁট কাঁচুলি। বাপীকে দেখে শশব্যস্তে মাটিতে নেমে দু'তিন মিনিটের জন্য অদৃশ্য। বেরুলো যখন ঘাগরার ওপর চকচকে রঙিন আঁট জামা; ঠোঁটের ফাঁকে আর চোখের কোণে হাসির ছটা।—বাপীভাই যে! কি ভাগ্যি—কবে এলে?

—কাল বিকেলে। এই মেয়ে কাছে এসে দাঁড়ালে খুব স্বস্তি বোধ করে না বাপী। নিজেকে সজাগ শাসনে রাখার একটু বাড়তি ধকল পোহাতে হয়।

বাসি সুর্মার দাগ লাগা রেশমার কালো চোখ তার মুখের ওপর উৎসুক।—আবু সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—সেখানে থেকেই আসছি।

কি বলতে গিয়ে হারমার দিকে চোখ গেল রেশমার। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝালো বিরক্তি। —তুই সেই থেকে বসে আছিস কেন—ঘরে যা না!

বাপীর মনে হল ভক্ত অথচ গোঁয়ার কুকুরের মতোই লোকটা নিঃশব্দ রাগে গরগর করতে করতে সামনে পা বাড়াল। রেশমার দিকে ফিরে বাপী হালকা সুরে জিজ্ঞেস করল, তুমি ভিতরে থাকলে ওর বাইরে ডিউটি নাকি?

অস্ফুট শব্দ করে হেসে উঠল। গতরখাটা মেয়ে ডিউটির অর্থ বোঝে। জবাব দিল, ঘরেই ডিউটি দেবার ইচ্ছে, এখন পর্যন্ত অতটা আস্কারা পায়নি।

ওকে দুষবে কি, এই চটুল প্রসঙ্গের জন্য বাপী নিজেকেই দায়ী করল আর চোখ রাঙালো।

উৎফুল্ল মুখে রেশমা বলল, এমন মান্যিগণ্যি মানুষ এলো, কোথায় বা বসাই, ঘরে আসবে?

—না। বাপী গম্ভীর। মেয়েটা তার কাজের ভাবনায় তেমন উতলা মনে হল না। —আবুর মুখে হাতির পিঠে চড়ে তোমাদের বানারহাট বেড়ানোর খবর সব শুনলাম।

—আর বলো কেন। ওই বনমায়াকে সব্বাই দিল-এর রাণী ভাবে, মানুষের বেলায় যে ওটা এত অপয়া কে জানত। মেমদিদির বরাতটাই খারাপ—

—তোমার বরাতের খবর কি?

রেশমার এবারের হাসি ধারালো মনে হল বাপীর। জবাব দিল, আমার তো বরাত ফিরে গেল! ওই জবরদস্ত ম্যানেজার সাহেব নিজে সঙ্গে করে আমাকে আসামে নিয়ে গিয়ে বেশি টাকার নির্ঝঞ্ঝাট কাজে বসিয়ে দিচ্ছে, ভাল থাকা খাওয়া পরার ব্যবস্থা করে দেবে বলেছে—আবু সাহেবের মুখে শোনোনি?

—শুনেছি। তাহলে তুমি যাচ্ছ?

—কেন যাব না? মুখের হাসি মিলিয়েছে, চোখের কালোয় আক্রোশ ঠিকরে পড়ছে। —এখানে উপোস করে মরব? মেমসায়েবের মেয়েই শুধু মেয়ে—আমরা কে? তবে—

বাপীর মনে হল কিছু বদলার কথা বলতে গিয়ে সামলে নিল। আরো মনে হল উপোস আর অপমানের যন্ত্রণা ও ভালো জানে। তাই সাপ-ধরা মেয়ের চকিতে অমন ছোবল বসানো মূর্তি। তারপরেই আবার সেই ধার-ধার হাসি। বলল, তুমি অবশ্য ইচ্ছে করলেই ম্যানেজারের মুখে ছাই দিয়ে আমার এই বরাতও বরবাদ করে দিতে পারো—

মুখে নয় বাপীর চোখে প্রশ্ন।

—বুঝলে না? আমি তো ওদের কাছে জোর গলায় বলেছি কিছু জানি না, মেমদিদি আদর করে বেড়াতে নিয়ে গেছে তাই গেছি। হাতির পিঠে যেমন বসিয়ে রেখে গেছল তেমনি বসেছিলাম—মেমদিদিও নিশ্চয় গলা ফাটিয়ে বলেছে আমার কোনো দোষ নেই। তবু ওই ম্যানেজারের কথায় মেমসায়েব শুধু সন্দেহের ওপর আমাকে সরাতে চাইছে। আর তুমি তো আমাকে হাতে-নাতে ধরেছ মেমদিদির মনের মানুষের সঙ্গে কথা কইতে দেখেছ, আমার মারফৎ মেমদিদিকে চিঠি চালান দিতে দেখেছ—এ-সব শুনলে ওই মেমসায়েব আমাকে আসামে পাঠিয়ে পয়সা দিয়ে পোষার বদলে দা দিয়ে কেটে মাটিতে পুঁতে রাখতে চাইবে।

দু'হাত কোমরে তুলে বাপীর মনের খবর আঁচ করার চেষ্টা। সুর্মার দাগ লাগা চোখে

সত্যিকারের কৌতুক উছলে উঠল এবার। মুখ কপট-গম্ভীর।—আর মেমসায়েবকে বলে তুমিও যদি আমাকে আর কোথাও নিয়ে গিয়ে ভালো থাকা-খাওয়া-পরার মতো কাজ জুটিয়ে দেবে বলো, তাহলেও ম্যানেজারকে বাতিল করে তোমার দিকেই যেতে হবে।

হাসছে না। কিন্তু ঠোঁটে হাসি টসটস করছে। মুখের কথার সাদা অর্থ, মেমসায়েবকে বলে দেবার ভয়ে তার দিকে না গেলে নয়। কিন্তু রসের অর্থটুকু কান গরম হবার মতো। হচ্ছেও। নিজেকে সজাগ শাসনে রাখার তাড়নায় বাপী দু'চোখে বিরক্তির উষ্ণ ঝাপটা মেরে সোজা ফিরে চলল। মেয়েটা তাইতেই হকচকিয়ে গেছে একটু। দাঁড়িয়ে পিছন থেকে দেখছে আঁচ করেই বাপী আর ফিরে তাকালো না।

ঠাণ্ডা মাথায় এবারে কিছু চিন্তা করার আছে। কর্ত্রীর সম্পূর্ণ সায় ভিন্ন রণজিৎ চালিহা কোমর বেঁধে এই ফয়সালায় নামত না। আজ হোক বা দু'মাস পরে হোক, আবুকে ছেঁটে দিলে বাপীর বুকের খানিকটা খালি হয়ে যাবে তাই নয়, জোরের দিকটায়ও টান পড়বেই। এই বিশ্বস্ত লোকটাকে সরালে রণজিৎ চালিহার হাত আরো জোরদার হবে, গায়ত্রী রাইয়ের সেটা বোঝার মন নয় এখন। ...তার মেয়েই বা শেষ পর্যন্ত কি করবে! আবু বা রেশমাকে সরিয়ে দিয়ে তার মা মেয়েকে ঠেকাতে পারবে? কেউ কখনো পেরেছে? বাবার চাবুকে চাবুকে পিঠের চামড়া ফেটে চৌচির হয়েছিল, ক্ষতবিক্ষত মুখের সেই গা ঘুলনো রক্তের স্বাদ আজও জিভে লেগে আছে। কিন্তু এক মেয়েকে মন থেকে সরানো গেছে না এতটুকু নড়ানো গেছে?

ঊর্মিলার মতি-গতি বোঝা গেছে। তার মা-ই তাকে আরো বেপরোয়া করে তুলেছে। বাপীর ওই পাঞ্জাবী ছেলেটাকে জানতে বুঝতে বাকি। হতে পারে প্রেমে হাবুডুবু দশা তারও। আবার রাজকন্যার থেকে রাজত্বের লোভটাও বড় হওয়া বিচিত্র নয়। যাই-ই হোক, ওদের বিয়েটা হয়ে গেলে গায়ত্রী রাই রেশমা বা আবুর মতো একমাত্র মেয়ে আর জামাইকেও ছেঁটে দেবে? তা হতে পারে না। কখনো হয় না। বরং অর্থের জোরে সামর্থ্যের জোরে আর সব থেকে বেশি নিজের ব্যক্তিত্বের জোরে মহিলা তাদের আরো কাছেই টেনে নেবে।...তারপর?

সদ্য বিপাকের ধোঁয়ার কুণ্ডলী থেকে তার পরের চিত্রটাই আগে স্পষ্ট করে দেখে নেওয়া বা বুঝে নেওয়া দরকার মনে হল বাপীর।

—আগে বাঢ়। মিল যায়গা!

নাঙ্গা ফকির-টকির নয়, আশ্বাসের গমগমে স্বরটা অনিবার্য ঘোষণার মতো নিজের ভিতর থেকে যখন-তখন ঠেলে ওঠে। যা-ই হোক যা-ই ঘটুক বাপী আর বিচলিত নয়। বৃত্ত-বদল আবারও হতে পারে, কিন্তু তাকে আর পুরনো বৃত্তে ফিরতে হবে না। এগোতে হবে। খুঁজতে হবে। পেতে হবে। এটুকুই স্বতঃসিদ্ধ।

মিরিক খুব দূরের পথ নয়। পরদিন বাপী বেলাবেলি সেখানকার চা-বাগানের কারখানায় পৌঁছুলো। বিজয় মেহেরার হদিস পেতে সময় লাগল না। বেয়ারার হাতে স্লিপ পাঠালো। শুধু লিখল, বাপী তরফদার, ফ্রম বানারজুলি।

স্লিপটা হাতে করে লোকটা নিজেই হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বিস্মিত। কিছুটা সন্দিগ্ধ। জঙ্গলে খানিকটা দূর থেকে দেখেছিল। সামনাসামনি আরো সুশ্রী মনে হল। সপ্রতিভ গাম্ভীর্যে তাকালো।—ইয়েস?

অনর্থক দুটো শব্দ খরচ করল বাপী।—বিজয় মেহেরা?

মাথা নেড়ে সায় দিল। .

ওর ঘরে আরো দুটো টেবিলে দু'জন অফিসার বসে আছে বাপী আগেই লক্ষ্য করেছে। স্লিপের নাম দেখেই হয়তো ভিতরে না ডেকে নিজে বাইরে চলে এসেছে। ইংরেজিতেই বলল, কিছু কথা ছিল শোনার সময় হবে?

মুখের দিকে আর এক পলক তাকিয়ে সামনে পা বাড়ালো। বাইরে শেডের নিচে একটা নিরিবিলি বসার জায়গায় নিয়ে এলো।—সীট ডাউন প্লীজ। নিজেও মুখোমুখি বসল।

বাপীর মতো অতটা লম্বা না হলেও সমবয়সীই হবে। কিন্তু বাপীর নির্লিপ্ত মুখের হাব-ভাব বয়স্ক জনের মতো। প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, বাংলা বোঝো?

—থোড়াসে। স্পিক ইন ইংলিশ অর হিন্দী।

সঙ্গে সঙ্গে বাপীর মনে সংশয়ের আঁচড় পড়ল একটু। উর্মিলা পাঞ্জাবী ভাষা শিখে ফেলে নি নিশ্চয়। বাংলাই মাতৃভাষার মতো। ইংরেজি বা হিন্দী গড়গড় করে বলতে পারলেও ওতে প্রেম কতটা জমাট বাঁধতে পারে, ধারণা নেই।

হিন্দী বাপী ভালো বলে। লোকটাকে কিছুটা অন্তরঙ্গ আলোচনায় টেনে আনার মতলবে হিন্দীতেই শুরু করল, আমাকে চেনো?

সতর্ক চাউনি। মাথা নাড়ল। চেনে।

কি করে চেনো?

—ডলি বলেছে। জঙ্গলেও দেখেছি।

একটু স্বস্তি বোধ করল। এই লোকের কাছেও উর্মিলা তাহলে ডলি।—কি বলেছে, ঘাবড়াবার মতো কিছু?

চোখে চোখ। না বুঝে কোনো ফাঁদে পা দিতে রাজি নয়।—আমি ঘাবড়াবার ছেলে না। আমার সঙ্গে কি দরকার?

ভাবালু প্রেমিকের মতো লাগছে না বাপীর। রয়ে-সয়ে বলল, এর মধ্যে কিছু অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটে গেছে, তুমি খবর রাখো?

—সো হোয়াট? গলার স্বরে স্পষ্ট ঝাঁঝ।

বানারহাটের দুঃসংবাদ এখানে পৌঁছে গেছে বোঝা গেল। বাপী জবাব দিল, এমন কিছু নয়, দুটো নির্দোষ লোকের কাজ চলে যাচ্ছে, একজন আবু রব্বানী আর একজন রেশমা। চেনো?

ভুরু কুঁচকে থমকে রইল একটু।—ডোন্ট গেট দি ম্যান। সে কি করেছে?

—উর্মিলার বানারহাটে বেড়াতে যাওয়ার হদিস ঠিক করে দিয়েছিল।

ফর্সা মুখ রাগে লাল হতে লাগল।—কিন্তু এই করে কি হবে? ডলির মা বরাবর তাকে আগলে রাখতে পারবেন না আমাকে ঠেকাতে পারবেন? ক্যান শী স্টপ ইট?

—পারবেনই না বলছ...?

—*সারটেনলি নট!* বলে উঠেই থমকালো। ঝাঁঝালো সতর্ক চাউনি।—মিসেস রাই তোমাকে এ-কথা বলার জন্য পাঠিয়েছেন?

—আমি এখানে এসেছি মিসেস রাই জানেন না। আমি তোমাদের অ্যাফেয়ার জানি বলেও তাঁর ধারণা নেই।

এবারে ক্ষোভের মুখেই বিজয় মেহেরা উৎসুক একটু।—ডলি পাঠিয়েছে?

—তোমাদের এই বিভ্রাটের সময় আমি বানারজুলিতে ছিলাম না। এখন পর্যন্ত মা-মেয়ে কারো সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তবে ডলি জানলে খুশি হবে। এই গোলযোগে না পড়লে সে-ই তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি মনে হয়। এতদিন মুখে সে আমাকে ফ্রেন্ড বলত, ইদানীং ফ্রেন্ড ভাবছে।

বিজয় মেহেরা অনেকটা ঠাণ্ডা। বুকপকেটে দামী সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই উঁচিয়ে ছিল। সে দুটো বার করে প্যাকেট আধখানা খুলে সামনে ধরল। বাপী মাথা নাড়তে একটা সিগারেট বার করে ধরালো। ডান হাতের তিনটে ফর্সা আঙুল সিগারেটের ধোঁয়ায় আর কষে বাদামী হয়ে গেছে। মদ ছেড়ে ওই আঙুল দেখলেও গায়ত্রী রাইয়ের মেজাজ বিগড়বে সন্দেহ নেই।

ধোঁয়া ছেড়ে বিজয় মেহেরা বলল, বানারহাটে ডলি এবারে বিশেষ করে তোমার কথা বলেছিল। বাট আই কুডন্ট বি ভেরি শিওর। ক্যান ইউ রিয়েলি হেল্প আস?

—কি রকম?

—বাইরে চলে যাওয়ার আগে আমি বিয়েটা করে যেতে চাই। ডলি রাজি হচ্ছে না। ও খুব ভালো কিন্তু এ ব্যাপারে বড় নার্ভাস।

সঙ্গে সঙ্গে বাপীর দু' কান খাড়া। এ আবার বলে কি!—বাইরে কোথায় যাচ্ছ?

—ডলি বলেনি?

—প্রায় এক মাস আমি বানারজুলিতে ছিলাম না বললাম তো।

এরপর যা শুনল, অপ্রত্যাশিত বটে। সামনের জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে দু'আড়াই ...দের জন্যে সে লণ্ডন চলে যাচ্ছে। অনেক বড় আশা আকাঙ্ক্ষা তার। এখানে এই চা-বাগানে পড়ে থাকার ইচ্ছে কোনওদিন ছিল না। ডলির কাছে বাধা না পড়লে এখান থেকে অন্তত কবেই চলে যেত। এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার আগে থেকেই বাইরের ট্রেনিং আর বাইরের ডিগ্রির স্বপ্ন দেখে এসেছে। অনেক চেষ্টা আর তদ্বির-তদারকের পরে সুযোগ মিলেছে। বাইরের এক ফার্মে মোটামুটি কাজের ব্যবস্থা হয়েছে। পড়ার ব্যবস্থাও। এখন সমস্যা ডলি আর তার মা। ওই মাকে জব্দ করার জন্যেই বিয়েটা চুকিয়ে ফেলে রওনা হবার ইচ্ছে তার। টের পেলে কি করবে? তাড়িয়ে দেবে? মেহেরা পরোয়া করে না। তার বাবা মা এ বিয়েতে সানন্দে রাজি। ছেলে তার পছন্দের মেয়েকে বিয়ে করবে তাতে আপত্তির কি থাকতে পারে? ডলির ফোটো দেখেই কত খুশি তারা। তাড়িয়ে দিলে ডলিকে বড় জোর অমৃতসরে তাদের কাছে গিয়ে থাকতে হবে। তারা আদর করে রাখবে। ব্যবস্থা যা করার মেহেরা করেই যাবে। কিন্তু ডলির অত সাহস নেই। বানারহাটে এবারে সে এ নিয়ে কম বকাঝকি করেনি, দু'জনার দস্তুরমতো মনকষাকষি পর্যন্ত হয়ে গেছে! ডলির এত ভয় পাবার কি আছে মেহেরা ভেবে পায় না।

বাপী চুপচাপ শুনছিল। আর সোজা মুখের দিকে চেয়েছিল। এখন কিছুটা ছেলেমানুষের মতো লাগছে ওকে। বাপীর বুকের তলার ঝড় কেউ কখনো টের পায়নি। এ-ছেলের থেকে সে অনেক বেশি পোড়-খাওয়া মানুষ।

আবার একটা সিগারেট ধরালো বিজয় মেহেরা। কিছু অনুকূল মতামত বা মন্তব্য শোনার আশায় উন্মুখ। এরই ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে যেন।

বাপী আশার কথা শোনাতে আসেনি। আশ্বাস দিতেও না। নিজে সে কোন ভবিষ্যতের দিকে পা ফেলবে স্থির করার তাগিদে আসা। যতটুকু শুনল, আশাপ্রদ বটে। তবু এটুকুই সব নয়। কোনরকম ভনিতা না করে বলল, এত সব আমি জানতাম না, কিন্তু বড় ভালো লাগল। ডলিও ভাবছে আমি হয়তো সাহায্য করতে পারব, কিন্তু তার মাকে তার থেকে ভালো আর কে জানে। সে যাক, এ বিয়ের নামে মিসেস রাই এমন ক্ষিপ্ত কেন ভেবে না পেয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চলে এসেছিলাম।

—ক্ষিপ্ত হবেন না! বিজয় মেহেরা ঝাঁঝিয়ে উঠল, তাঁর এত টাকা, এতবড় ব্যবসা, এত ক্ষমতা—তিনি শুধু মেয়ের জন্য ঘরে একটি স্বামী পুষতে চান। তাঁর মেয়ে এত ঠুনকো হলে আমার দিকে ঘেঁষত না এ তিনি বুঝতেও চান না, বরদাস্তও করতে চান না!

ছেলের মেজাজ আছে! বাপী অখুশী নয়। নিরীহ মুখে একটু অপ্রিয় উক্তিই করল এবার।—তিনি হয়তো ভাবছেন অত টাকা আর বড় ব্যবসা দেখেই তুমি তাঁর সরল মেয়েটাকে কলে ফেলেছ।

কি! সন্দেহের কথাগুলো গুঁড়িয়ে দেবার মতো করে প্রায় আস্ত সিগারেটটাকে জুতোর তলায় ফেলে পিষল।—ভাববেন না কেন? টাকা ছাড়া আর কি দেখছেন তিনি? কটা মানুষ দেখেছেন? বিলেত থেকে হায়ার ডিগ্রি আর ট্রেনিং নিয়ে ফিরে আসার পর তাঁর এই কাঁচকলার ব্যবসা নিয়ে পড়ে থাকব আমি—না তার টাকার পরোয়া করার দরকার হবে? এ ব্যাপারে তাঁর মেয়ের সঙ্গেই আমার সাফসুফ কথা হয়ে গেছে, তুমি জেনে নিতে পারো। মেয়ের বিয়ে দিয়ে টাকা আর ব্যবসা আগলে তিনি বসে থাকুন—

বাপী অবিশ্বাস করছে না। মেয়েকেও জিগেস করার দরকার নেই। বাংলোর সেই একদিনের কথা মনে আছে। মেয়ে ঠেস দিয়ে বলেছিল মা তাকে চটপট শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর মতলবে আছে, আর মা হালকা মেজাজে জবাব দিয়েছিল, সে-চিন্তা তাকে করতে হবে না, বিয়ে যে করবে তাকেই এসে শ্বশুরবাড়ি থাকতে হবে। শোনামাত্র মেয়ে ফোঁস করে উঠেছিল, আই উইল নেভার এগ্রি—দ্যাট পারসন মাস্ট বি এ ভেড়ামার্কা সামবডি!

বড় করে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাপী উঠে দাঁড়াল।—আচ্ছা মেহেরা, তোমার অনেকটা সময় নিয়ে ফেললাম, কিন্তু আলাপ করে খুব ভালো লাগল। কি করতে পারব জানি না, আই অ্যাম অলমোস্ট এ নো-বডি—শুধু বলতে পারি, ডলি ডিজারভস কংগ্র্যাচুলেশনস, তার যাচাই বাছাইয়ের চোখ আছে।

—থ্যাঙ্কস। খুশি হলেও সমস্যার দরিয়ায় ডাঙা খোঁজার মুখ।—কিন্তু তোমার কি মনে হয়, যাবার আগে বিয়েটা হতেই পারে না?

বাপীর আলতো চাউনি তার মুখের ওপর পড়ে থাকল একটু।—ডলিকে তুমি অবিশ্বাস করো?

—কক্ষনো না! বাইরে থেকে ঘুরে এলেই বিয়েটা হবে আগে ঠিক ছিল। কিন্তু ওর মায়ের এমন গোঁ দেখে আমারও গোঁ চেপেছে।

—কিন্তু বিয়েটা গোঁয়ের ব্যাপার নয়। এক্ষুনি এ চেষ্টা করতে গেলে ডলিকেই তুমি সব থেকে অসুবিধের মধ্যে ফেলবে। চুপচাপ চলে যাও, বড় হয়ে এসো—মেয়ের মন বুঝে ওই মা-ই তখন এগিয়ে আসবে হয়তো।

নীরস স্বরে বিজয় মেহেরা মন্তব্য করল, ওই মাকে তোমার এখনো চিনতে বাকি আছে।

পা বাড়িয়েও বাপী আর একটু সুড়সুড়ি দেবার লোভ সামলাতে পারল না।—বাই দি বাই, সিগারেটের ধোঁয়ায় আর কষে হাতের আঙুলগুলো তো বেশ লাল করে ফেলেছ-—ড্রিঙ্কস কেমন চলে? ফ্রাঙ্কলি জিগ্যেস করলাম, কারণ জিনিসটা মিসেস রাইয়ের কাছে প্রায় ট্যাবু গোছের...

পিত্তি জ্বলার মতো বিরক্ত মুখ।—আমার নামে এ নালিশও গেছে ডলি আমাকে বলেছে। ট্যাবুর চোরাই কারবার চালাচ্ছে সে-বেলায় লজ্জা করে না?

ছেলেমানুষি রাগ দেখেই যেন হাসি পাচ্ছে বাপীর।—তা বলে সব ময়রা কি আর মিষ্টি পছন্দ করে?

তার পছন্দ-অপছন্দের আমি ধার ধারি না। ইট ইজন্ট এনি গুড ফর হেলথ আই নো,—দ্যাটস অল। ইচ্ছে হলে খাই, ইচ্ছে না হলে খাই না। তার জন্যে কারো কাছে আমি দাসখত লিখে দিতে যাব না।

ভবিষ্যতের চিত্র অনেকটাই আঁচ করা যাচ্ছে। পায়ের নিচের মাটি আরো শক্তপোক্ত ঠেকছে। গায়ত্রী রাই এই ছেলেকে ঘরজামাই করে আটকে রাখতে পারবে না। যেমন চায়, টাকার গরমে তেমন বশেও রাখতে পারবে না। ছেলেটার মনের জোর আছে। পুরুষের গোঁ-ও কম নয়। বাপী এমনটা দেখবে আদৌ ভাবেনি।

তবু বুকের তলায় কোথায় একটু চিনচিন যন্ত্রণার মতো। টের পাওয়া মাত্র নিজেকেই চাবুক কষাবার আক্রোশ। ভালবাসার নিখাদ ছবি দেখে ভিতরে কেউ যদি মাথা খোঁড়ে, তবে সেই মাথাটা বুঝি একেবারে গুঁড়িয়েই দেবে বাপী। দেউলেপনা বরদাস্ত করবে না।

একে একে পাঁচ-ছ'দিন কেটে গেল। নভেম্বরের শুরু এটা। শীত এসে গেল। জঙ্গলের সবুজে শুকনো টান ধরেছে। ধূসর গৈরিকের পলেস্তারা পড়ছে। ছেলেবেলায়ও শীতের এই ক'টা মাস বাপীর ভালো লাগত না। চেঁচিয়ে বলত, শীত বুড়া থুত্থুড়ি, যা না—পালা না। শীত মানেই ঠাণ্ডার গহ্বরে সেঁধিয়ে থেমে যাওয়া। সেই ছোটবেলার মতোই ভেতরটা অসহিষ্ণু বাপীর। কেউ যেন জোর করে থামিয়ে দিয়েছে তাকে। সামনে এগোনোর পথ আগলে একটা অদৃশ্য দেয়াল গজিয়ে উঠেছে। সকলকে ছেড়ে শুধু সে-ই যেন এক অস্বস্তিকর অনিশ্চয়তার মুখোমুখি বসে আছে।

চুপচাপ আপিসে যায়। চুপচাপ ফিরে আসে। পারলে চালিহার সামনেও পড়তে চায় না। দেখা হলেই নতুন টিম-ওয়ার্কের প্ল্যান কদ্দূর জিগেস করে। কোন কোন আইটেম এ-দিকের জঙ্গলে ফলানো যায় তার একটা খসড়া করে রেঞ্জ অফিসারের সঙ্গে দেখা করার তাগিদ দেয়। ফলে সে আসার আগেই বাপী এখন অ্যাকাউনটেন্টকে জানান দিয়ে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কাছাকাছির পার্টিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। চালিহা বেরিয়ে পড়ার পর ফেরে।

পাশের শূন্য বাংলোর দিকে তাকালে চোখ দুটো কটকট করে। মেয়ে নিয়ে ঠিক কোথায় গা-ঢাকা দিয়ে আছে মহিলা জানতে পারলে কপাল ঠুকে চলেই যেত। অসুবিধে তো হচ্ছেই। দূরের পার্টিদের সঙ্গে যোগাযোগের বরাদ্দ ভ্যানের চালান বন্ধ। পাহাড়ের

বাংলোয় বেরুনোর আগে গোটা মাসের চালান দিয়ে গেছল। মাস শেষ, ভ্যান নেই —এখন কি করবে? কিন্তু কপাল ঠুকে গিয়ে উপস্থিত হওয়ার তাগিদ ভিন্ন কারণে। তার ধারণা, মুখোমুখি হলে বাধার অদৃশ্য পাঁচিলটা ভেঙে দিতে পারবে আর ওই মা-মেয়েকেও ফিরিয়ে আনতে পারবে।

কর্ত্রী এখানে নেই জেনেও আবু রব্বানী একটিবার এদিকে আসেনি। বিনা দোষে অপরাধের বোঝা কাঁধে চাপানো হয়েছে, ক্ষুণ্ণ হবারই কথা। কিন্তু বাপীর কাছেও না আসার বোধ হয় ভিন্ন কারণ। ম্যানেজারের মেজাজ তার ওপরেই বেশী গরম শুনেছে কিন্তু ম্যানেজারের মতলব কি বাপী বলেনি। ওদের মেমসায়েবের রাগ তো বোঝাই যাচ্ছে। আজ হোক, দু'দিন বাদে হোক হেস্তনেস্ত কিছু হবেই। চাকরির দায়ে বাপীও তখন ম্যানেজার আর মেমসায়েবের সঙ্গে হাত মেলাবে ধরে নিয়েছে। ওকেও তাই এখন আর বুকের কাছের একজন ভাবতে পারছে না।

সকাল তখন সাতটাও নয়। চা-টা খেয়ে বাপী একটা বই নিয়ে বারান্দায় বসেছিল। গায়ত্রী রাইয়ের ভ্যান তার ফটকের সামনে এসে থামল। বই ফেলে বাপী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

ভ্যান থেকে নামল আধবয়সী পাহাড়ী ড্রাইভার বাদশা। আর কেউ নেই।

সেলাম ঠুকে ড্রাইভার জানালো, মেমসায়েব পাঠিয়েছে। যেতে হবে। কোথায় যেতে হবে বাপী জেনে নিল। পাহাড়ের বাংলোয়। মেমসায়েব সেখানে আছে।

পাজামা-পাঞ্জাবির ওপর নতুন কেনা বুকখোলা স্লিপওভারটা চড়িয়ে দশ মিনিটের মধ্যে বাপী বেরিয়ে পড়ল। কোটপ্যান্টের টাকা হাতে পেয়েছে কিন্তু শিলিগুড়ি বা দার্জিলিং গিয়ে এখন পর্যন্ত সে সব করানোর ফুরসত হয়নি। রাতের ঠাণ্ডায় এই পোশাকে কুলোবে না। কিন্তু আন্দাজে কত আর গায়ে চড়াবে।

সকাল আটটার মধ্যেই বাংলোর পাহাড়ের গোড়ায় এসে গেল। কিন্তু চড়াইয়ের রাস্তা ধরার আগেই বাদশা ভ্যান থামালো। গজ বিশ-বাইশ দূরে উর্মিলা রাই। পাশে ঝগড়ু। তারা পাহাড় থেকে নেমে আসছে। উর্মিলাই হাত তুলে ড্রাইভারকে থামতে ইশারা করেছে।

কাছে এলো। বাপীকে দেখে ঝগড়ুর একমুখ হাসি। এত শীগগির আবার বাবুটির সঙ্গে দেখা হবে ভাবেনি। উর্মিলার পরনে পাহাড়ী মেয়েদের মতো চকমকে ঘাগরা, গায়ে আধাগরম আঁটা জামা। শীতের ছোঁয়ায় লালচে গাল, ছোট মেয়ের মতোই ফোলা ফোলা রাগ-রাগ মুখ। কিন্তু বাপীর মনে হল ওকে দেখে ভিতরে ভিতরে খুশিও একটু।

ড্রাইভার বাদশা ভেবেছে মিসিসায়েব আর ঝগড়ু ভ্যানে উঠবে। বাপীও সেই অপেক্ষায় বসেই আছে। তার দিকে চেয়ে উর্মিলা ধমকের সুরে বলে উঠল, কি হল —নামো?

বাপী বলল, আমি নামব না তুমি উঠবে?

—তুমি নামবে। ঝগড়ু উঠবে।

—এ উর্মি! ঝগড়ুর তখনি আপত্তি। মালকান গোসা হোবেন।

তার দিকে ফিরে উর্মিলা অসহিষ্ণু ভেঙচি কেটে উঠল।—মালকান গোসা হোবেন তো তুমি ওপরে গিয়ে মূর্ছো যাও! বাপীর দিকে ফিরল, নেমে এসো বলছি।

অগত্যা বাপী নেমেই এলো। চোখ পিটপিট করে ঝগড়ু বলল, মালকানের মেজাজ গরম আছে বাপীভাই, খবরদার দেরি কোরো না—

উর্মিলা তেড়ে যেতে সে চটপট ভ্যানে উঠে পড়ল।

পায়ে হেঁটে লাল কাঁকরের চড়াইয়ের পথ ভাঙতে কম করে পাঁচিশ মিনিট লাগে। আস্তে হাঁটলে আরো বেশি। উর্মিলার এতটুকু তাড়া আছে মনে হল না। ঢিমেতালে পা বাড়ালো।

বাপী বলল, ভ্যানে উঠে গিয়ে আগে তোমার মায়ের সঙ্গে দেখাটা করে নিলেই হত, এরপর আমাকেও হয়তো আবু আর রেশমার দলে ফেলবেন তিনি।

উর্মিলা থমকে দাঁড়িয়ে চোখ পাকালো।—মায়ের সঙ্গে আগে দেখা করার জন্যে তোমার আসার সময় ধরে আমি নেমে এসেছি?

—ও...! বাপী হেসে ফেলল, ঠিক আছে, চলো—

—যাব না, এইখানে দাঁড়িয়ে কথা বলে তোমাকে আরো দেরি করাবো।

বাপীর ভালো লাগছে। এই ক'টা দিন যেন মরু-বাসে ছিল। মা ছেড়ে মেয়েরও মেজাজ গরম, কিন্তু এই পোশাকে আগের থেকেও তরতাজা লাগছে বাপীর। হাতজোড় করে বলল, ঘাট হয়েছে দেবী, আর বিপাকে ফেলো না—চলো।

হাসতে-মানা মুখ করে উর্মিলা আবার সামনে পা বাড়ালো। আজ কেন যেন বন্ধুর মতোই অনায়াসে একটা হাত ওর কাঁধের ওপর রাখতে পারল বাপী। এটুকু অন্তরঙ্গ হতে উর্মিলার দিক থেকেও আপত্তির লেশমাত্র নেই। কিন্তু আপাতত মন পড়ে আছে অন্যদিকে।

—আবু আর রেশমার কি শাস্তির ব্যবস্থা হল?

—হয়নি এখনো। তোড়জোড় চলছে।

রাগে মুখ লাল।—ওদের কোনো দোষ নেই, আমার জন্য শুধুমুদু ওদের শাস্তি হবে কেন? আর তুমিই বা তা বরদাস্ত করবে কেন?

—আমি কারো দণ্ডমুণ্ডের মালিক নই।...তাছাড়া একেবারে দোষ নেই বলতে পারো না—চক্রান্তকারীর সঙ্গে থাকাটাই দোষের।

—দেখো, রাগিও না বলছি! এই করে কেউ আমাকে রুখতে পারবে ভেবেছ!

...এমনি তেতে উঠে বিজয় মেহেরাও একই কথা বলেছিল মনে আছে। তেমনি ঝাঁঝের মুখে উর্মিলা আবার জানান দিল, রেশমাকে আমি বলে এসেছি, শাস্তি যদি হয় তো তার খেসারত আমি দেব। কিন্তু কেন হবে শাস্তি? তোমার বাধা দিতে এত কি ভয়? মনে পড়ল কিছু।—তোমার কিচ্ছু ভয় নেই, বুঝলে? এতদিন একলা এই পাহাড়ের বাংলোয় কাটিয়ে মায়ের মন তুমি আরো কত কেড়ে ফেলেছ জানো না—ঝগড়ু বার বার করে মাকে শুনিয়েছে, ঠিক আমার বাবার মতোই কাজের ঝোঁক আর বই পড়ে শেখার ঝোঁক তোমার—নাওয়া-খাওয়া জ্ঞান থাকে না। মন মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে না থাকলে শুধু এই জন্যেই তোমার আর এক দফা মাইনে বেড়ে যেত—

বিরস মুখ করে বাপী বলল, তুমি তাহলে শুধু আবু আর রেশমার ক্ষতি করোনি, আমারও করেছ—

—বাজে বোকো না! সত্যি কারো ক্ষতি হলে মাকে আরো বেশি পস্তাতে হবে জেনে

রেখো!

—বুঝলাম। তোমরা কবে এসেছ এখানে?

—পরশু।

—তোমার মা আমাকে হঠাৎ ডেকে পাঠালেন কেন?

—জানি না। সেই থেকে মায়ের সঙ্গে আমার কথা বন্ধ। মা বন্ধ করেনি, আমি করেছি।

বাপী মন্তব্য করল, বড় ঠাণ্ডা মেয়ে।

তেমন ঝাঁঝের মুখে এরপর এ ক'দিনের সমাচার শোনালো ঊর্মিলা।...ওকে আর কোয়েলাকে নিয়ে শিলিগুড়ির এক বড় হোটেলে গিয়ে ওঠা হয়েছিল। সেখানে গিয়ে মা বড় বড় দুটো ইংরেজি কাগজের এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। আঙ্কল চালিহাও তখন মায়ের সঙ্গে ছিল। দু'জনে শলাপরামর্শ করে উত্তর ভারতের সেই দুটো নামী কাগজে এই এজেন্টদের মারফৎ ঊর্মিলার জন্য পাত্রের খোজে চটকদার বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছে। পাঁচ ছ'দিনের মধ্যে দুটো কাগজে সেই বিজ্ঞাপন ছেপে বেরিয়েছে। তিন-চারখানা করে সেই দুটো কাগজ কেনা হতে ঊর্মিলার সন্দেহ হয়েছিল, মা তাকে বলে নি। সেই দু' কাগজের বিজ্ঞাপন নিজেই বার করে পড়েছে। ভেঙচে ভেঙচে বিজ্ঞাপনের সার জানালো ঊর্মিলা।...মস্ত বিজনেস অধীশ্বরীর একমাত্র মেয়ে। মেয়ে রূপসী বিদুষী গুণবতী কলাবতী। (ব্যঙ্গোক্তি একেবারে যেন আকাশের চাঁদ খসে নেমে এসেছে) চব্বিশ-পঁচিশের মধ্যে ভালো ঘরের সুশ্রী উচ্চশিক্ষিত সুস্বাস্থ্য পাত্র চাই। জাত-বিচার নেই তবে নেপাল বা ভুটানের ছেলে হলে ভালো হয়। ছেলের ব্যবসার অভিজ্ঞতা বা ব্যবসার দিকে ঝোঁক থাকা চাই। বিয়ের পর ছ'মাস এক বছরের জন্য বিদেশে বেড়ানোর যাবতীয় খরচ মেয়ের মায়ের। বিয়ের প্রধান শর্ত, ব্যবসায় সাহায্যের প্রয়োজনে ছেলেকে বরাবর মেয়ের ঘরে এসে থাকতে হবে।...এদিকে ছেলেগুলো যে এত হ্যাংলা ঊর্মিলার ধারণা ছিল না। তিনদিন না যেতে সেই এজেন্টদের মারফৎ হোটেলে গাদা গাদা চিঠি! সবাই বিয়ে করতে চায়। সবাই ঘরজামাই হয়ে থাকতে চায়। অবশ্য তার আগে একবার চোখের দেখা হিসেবে মেয়েও সবাই দেখতে চায়। এ রকম বিনপাঁজা চিঠি নিয়ে ওর মা আরো চিঠির প্রত্যাশায় ওই এজেন্টদের এই পাহাড়ের বাংলোর ঠিকানা দিয়ে এখানে এসে বসেছে।

ঊর্মিলা সাফ জানিয়ে দিয়েছিল আসবে না। পাহাড়ের শীত তার ভালো লাগে না। বানারজুলিতে থাকবে। জবাবে মা জানিয়েছে, বেশি শীতে পাহাড় থেকে নেমে আসা হবে। এখন তার শরীর অসুস্থ স্বাস্থ্যের জন্যেই কিছুদিন পাহাড়ের নিরিবিলিতে থাকা দরকার। অসুস্থ না ছাই। ঊর্মিলার বুঝতে বাকি নেই তাকে ভোলানোর জন্যেই শিলিগুড়ির বড় হার্ট স্পেশালিস্ট ডেকে নিজেকে দেখানো হয়েছে। মায়ের যা হার্ট! স্পেশালিস্ট তা খুঁজে পেয়েছে কিনা মেয়ের সন্দেহ। এখন মায়ের শুধু কাজ নাকে চশমা এঁটে ওই হ্যাংলা হবু জামাইয়ের চিঠি যাচাই-বাছাই করা আর খাওয়া আর শুয়ে থাকা। ওকে দেখিয়ে ওষুধ খাচ্ছে। ওষুধ খাচ্ছে কি জল খাচ্ছে কে জানে। তবে ঊর্মিলার একটু ভরসা, অত চিঠির গাদা থেকে এখন পর্যন্ত তিনটে চিঠি মাত্র আলাদা করে রাখা হয়েছে, তাও খুব পছন্দ হয়েছে বলে মনে হয় না—হলে ঊর্মিলা পরোয়া করে না। সব চিঠির গাদা উনুনে দেবার ফাঁক খুঁজছে।

—তুমি বুঝলে কি হবে, তোমার কাজ করছে ওরা?

এই প্রসঙ্গের ফয়সলাই বাপীর কাছে সব থেকে বড় ব্যাপার। তবু হালকা করেই জবাব দিল, আপনাকে মেয়েকে বলেছি যে আমি ওদের দণ্ড-মুণ্ডের মালিক নই।

চুপচাপ একটু। তারপর আবার প্রশ্ন।

—শুধু এইজন্যেই নেমে গেছল, না আরো কিছু আছে?

—ওর বিয়ের জন্য পাত্রের খোঁজে আপনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, কিরকম পাত্রের খোঁজ করছেন—এইসব বলছিল।...এইজন্যেই খুব রাগ মনে হল।

—রাগ করে কি করবে। বিয়ে ঠিক হলে বিয়ে করবে না?

—আমাকে বলতে বলেছে, আপনি এই চেষ্টায় এগোলে তাকে আর ঘরে রাখতে পারবেন না।

বাপী লক্ষ্য করল, রাগে সাদাটে মুখ আরো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। এবারে ওর দিকে চোখ।—তোমাকে বলতে বলেছে? কেন বলেছে তুমি তাহলে জানো?

বাপী মাথা নেড়ে স্বীকার করল জানে। ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত। মিথ্যের মধ্যে যেতে চায় না, কিন্তু কেমন করে জানে জিজ্ঞেস করলে আবুর নাম মুখেও আনা চলবে না। জিজ্ঞেস করল না। বানারহাটের ঘটনাটা জানাজানি হয়ে গেছে ধরে নিল হয়তো। হয়তো বা ভাবল মেয়ে নিজেই বলেছে।

সিঁড়িতে পা রেখে থামল।—বেশ, তুমিও তাহলে ওকে জানিয়ে দিও আমি বলেছি, আমার অবাধ্য হলে বা আমার অমতে বিয়ে করলেও ওকে ঘরে রাখতে পারব না। মা নেই ধরে নিয়ে যা করতে চায় করুক।

দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠে গেল। বাপী পিছনে। ভাবছে, রণজিৎ চালিহার কান বিষনোর কলা-কর্ম এমনি নিখুঁত যে অবাধ্য হলে একমাত্র মেয়েকেও মহিলা ত্যাগ করতে রাজি। খেলার মোড় হঠাৎ এভাবে ঘুরবে জানলে ভদ্রলোক নিশ্চয় কান-বিষনোর ব্যাপারে এতটা তৎপর হত না।

গায়ত্রী রাই বারান্দার চেয়ারে বসল। একটু যেন হাঁপাচ্ছে মনে হল। রাগ বা অসহিষ্ণুতার কারণেও হতে পাবে। ইশারায় সামনের চেয়ারটায় বাপীকে বসতে বলল।

বাপী জিজ্ঞাসা করল, আপনার শরীর তেমন সুস্থ নেই শুনলাম।

সঙ্গে সঙ্গে একটু টান হয়ে বসল গায়ত্রী রাই। গলার স্বরও চড়ল।—কে বলেছে আমার শরীর সুস্থ নেই?

বাপীর ভেবাচেকা মুখ।

—আমি অসুস্থ হলে কার কি আসে যায়? আমি মরে গেলেও কারো ক্ষতি বেশি না লাভ বেশি?

সামনের দরজা দিয়ে পিছনের ঘরের কাউকে দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু বাপীর নিশ্চিত ধারণা তাদের চোখের আড়ালে ও-ঘরে কারো পদার্পণ ঘটেছে। আর, মহিলাও সেটা জানে।

মিনিট খানেক বাদে গায়ত্রী রাই সংযমে বাঁধল নিজেকে।—ওদিকের কাজকর্মের খবর কি?

—চলছে।...তবে আমার একটু অসুবিধে হচ্ছে। আমি যেদিকটা অর্গ্যানাইজ করেছি,

ভ্যান না থাকাতে সেসব জায়গায় মালের চালান এখনও যায়নি।

মুখের দিকে চেয়ে ভুরু কুঁচকে ভাবল একটু।—তুমি ড্রাইভিং জানো?

বাপী বুদ্ধিমানের মতোই জবাব দিল, না...আপনি বললে শিখে নিতে সময় লাগবে না।

—বাদশা ভালো ড্রাইভার। সবরকম গাড়ি চালাতে জানে। আমরা ফিরে গেলে সে শেখানোর ব্যবস্থা করে দেবে।

বাপী মাথা নাড়ল শুধু। তেমন উৎফুল্ল হবার কারণ নেই। বরাত এখনো অনিশ্চয়তার গহ্বরে। সেই ফয়সলার দিকেই এবারে এগোলো গায়ত্রী রাই। বলল, রেশমাকে এখানকার কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে শুনেছ?

মুখ দেখলে বোঝা যাবে না...কিন্তু ভিতরে ভিতরে বাপী প্রস্তুত হয়েই এসেছে।

—শুনেছি।...তবে আমার বিশ্বাস ব্যাপারটা আপনি আর একবাব বিবেচনা করবেন।

ঠাণ্ডা সাদাটে মুখে মেজাজের আঁচড় পড়ল।—কেন? ওর কোনো দোষ নেই ডলি বলেছে বলে? আর একবারও ওই রকম ধরা পড়েছিল বলে মিস্টার চালিহার মুখ বন্ধ করার জন্য ও মদের বোতল ভেট নিয়ে গেছল—সে-খবর রাখো?

...খুব নরম গলায় বাপী বলল, রাখি। ও যায়নি, ওকে পাঠানো হয়েছিল।...এতে ওর নিজের তো কোনো স্বার্থ নেই, আদর দিয়ে আপনার মেয়েই ওকে বাধ্য করেছে।

মুখের ওপর অসহিষ্ণু ঝাপ্টা মারার মতো করে গায়ত্রী রাই বলে উঠল, আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। এত বাধ্য হবার সুযোগ আমি কাউকে দিতে চাই না। আমি ওকে তাড়িয়েই দিতে চেয়েছিলাম, চালিহা বলল আসামে কাজের মেয়ের দরকার আছে—আমি আপত্তি করিনি। সেখানে গেলে টাকাও বেশি পাবে। তোমার আপত্তি কেন?

প্রায় আবেদনের সুরে বাপী জবাব দিল, আপনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হচ্ছেন বুঝতে পারছি...আসামে মেয়ের অভাব নেই, তবু এত দূর থেকে রেশমার অজানা-অচেনা একটা জায়গায় উনি কেন তাকে নিয়ে যেতে চাইছেন, আপনাকে সেটা বলার দরকার হবে ভাবিনি।

রাগের মুখেই ভদ্রমহিলা থতমত খেল একপ্রস্থ। একটা অনাবৃত সত্য তার মুখের ওপর ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। তবু ঝাঁঝালো গলায় বলল, ডলির কাছ থেকে ওকে সরিয়ে দেবার জন্যেই এই ব্যবস্থা হয়েছে।

—এভাবে সরাতে চাইলে ও সরবে কিনা জানি না, তার আপনার জনেরা ভাবছে, নিজের মেয়েকে সামলাতে না পেরে নিজের স্বার্থে মিস্টার চালিহাকে খুশি করার জন্য একটা অসহায় জঙ্গলের মেয়েকে আপনি বলি দিতে যাচ্ছেন।

গায়ত্রী রাইয়ের মুখে কথা নেই। গুম হয়ে বসে রইল। তেমনি নরম আবেদনের সুরে বাপী আবার বলল, মেয়েদের কাজ বলতে এতদিনে আমি যতটুকু বুঝেছি, এই পাহাড়ী এলাকাতেই তার স্কোপ বেশি—এদিকে রেখেই ওকে দূরে সরানো যেতে পারে।

প্রস্তাব অনুমোদন করল কিনা মুখ দেখে বোঝা গেল না। দো-টানায় একটু পড়েছে বোঝা গেল। নইলে অন্য মূর্তি দেখা যেত।

খানিক চুপ করে থেকে হঠাৎ রুক্ষস্বরেই জিজ্ঞাসা করল, বানারজুলির রেঞ্জ অফিসারের সঙ্গে দেখা করেছ?

এইটেই ফয়সলার প্রসঙ্গ। শান্ত মুখে বাপী জবাব দিল না। তার আগে এই ব্যাপারে আমার কিছু কথা ছিল।

শোনামাত্র আগের মতো উগ্র মূর্তি।—কোনো কথা আমার শোনার দরকার নেই—মিস্টার চালিহা তোমাকে যা বলেছেন সেটাই আমার কথা—আমার ডিসিশন। কেন দেখা করোনি?

এখনো বাপী বিনীত, কিন্তু জবাবে কোনো জড়তা বা দ্বিধা নেই।—তাহলে আমাকে আপনার ছেড়ে দিতে আপত্তি নেই বুঝতে হবে।

হঠাৎ যেন বড়রকমের একটা ধাক্কা খেল মহিলা। প্রথমে চোখ, পরে গলা দিয়ে আগুন ঠিকরলো।—তার মানে সবকিছুর কন্ট্রোল নিয়ে আবু রব্বানীকে সরাতে চাইলে তুমি আমার সঙ্গে থাকবে না।

—থাকব না নয়, মিস্টার চালিহা আমাকে থাকতে দেবেন না, তাই সময় থাকতে নিজের ব্যবস্থার তাগিদে আমাকে আগেই সরে যেতে হবে। তার লক্ষ্য আবু রব্বানী নয়, তার টারগেট আমি।

অপলক গোল দু'-চোখ ওর মুখের ওপর স্থির খানিকক্ষণ।—কি বলতে চাও খোলাখুলি বলো।

চাউনি আর গলার স্বর দুইই অকরুণ।

—আপনার মন-মেজাজ ভালো থাকলে কিছু বলার দরকার হত না। মিস্টার চালিহা সেই সুযোগই নিচ্ছেন। আবু রব্বানী আমার ডান হাতের মতো কাজ করছে, গোড়াতেই তাই তাকে ছেঁটে দেওয়া দরকার তাঁর। বিজয় মেহেরা সম্পর্কে আপনাকে তিনি বিষিয়ে রেখেছেন, ওদের মেলামেশা দু'দুবার হাতে-নাতে ধরেছেন, কিন্তু এখন তিনি দেখছেন আপনার বিজ্ঞাপন অনুযায়ী কোনো ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হলে তার আরো ক্ষতি—এঞ্জিনিয়ার ছেলে আর যাই হোক এই ব্যবসা নিয়ে জঙ্গলে পড়ে থাকবে না। তাই বিজয় মেহেরাকে এখন আর তাঁর অত অপছন্দ নয়। তাই আপনার মেয়েকে তিনি চুপিচুপি ভরসা দিয়েছেন, একটু ঠাণ্ডা হলে সাধ্যমতো আপনাকে বোঝাতে চেষ্টা করবেন। সত্যি কি মিথ্যে আপনার মেয়েকে ডেকে জিগ্যেস করুন—

মহিলার স্তব্ধ রুক্ষ মুখের দিকে চেয়ে বাপী আবার বলে গেল, মিস্টার চালিহা জানেন, মেয়ে যদি ওখানে বিয়ে করেই, ওদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলাই ভালো, আপনি তাদের শেষ পর্যন্ত ফেলে দেবেন না—আর দিলেও তার লাভ ছেড়ে লোকসান কিছু নেই। তাই সবার আগে আমার জোর কাড়ার ব্যাপারে তিনি উঠে পড়ে লেগেছেন।...আপনার মনের এই অবস্থায় এত সব আমি বলতাম না—কিন্তু তিনি এই সুযোগটাই বেছে নিয়েছেন। ...এখন আপনি বিবেচনা করুন।

গায়ত্রী রাই পাথরের মূর্তির মতো বসে। মিনিট দুই চুপচাপ। চেয়ে আছে। তারপর গলার স্বর তেমনি ঠাণ্ডা তেমনি অকরুণ। বললে, বিবেচনা করব। যা বললে, সবই আমার অভ্রান্ত বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে তোমারও এমন ভাবার কোনো দরকার নেই। তুমি বরং মনে রেখো, এক বছরও হয়নি তুমি আমার কাছে এসেছ—তার আগে পর্যন্ত তোমাকে ছাড়াই আমার চলেছে—তাই ছেড়ে যাবারও কোনো হুমকি দেবার দরকার নেই—সে-জন্যে আমার বিবেচনার হেরফের হবে না।

কথাগুলো কানের পর্দায় ঘা দিয়ে গেল, ভিতর থেকে একটা অসহিষ্ণু ক্ষোভ ঠেলে উঠল। কথা শেষ। মহিলা এবার চেয়ার ছেড়ে উঠবে মনে হচ্ছে।

ফয়সলা চেয়েছিল। নিষ্পত্তি যা হবার হোক। বাপী চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করে বলল, আমাকে যদি আপনাদের শুভার্থী মনে করেন তো সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপারে দুই-একটা কথা বলব।

মুখের দিকে চেয়ে থেকে তেমনি কঠিন সুরে গায়ত্রী রাই জবাব দিল, বাজে কথা ছেড়ে যা বলবার বলো।

অর্থাৎ শুভার্থী ভাবাটা বাজে কথা। এটুকুও হজম করে ঠাণ্ডা মুখে বাপী বলল, সামনের জানুয়ারির শেষ থেকে প্রায় তিন বছরের মতো মেয়ের জন্য আপনার খুব দুশ্চিন্তা করার দরকার হবে না, তার মধ্যে উর্মিলা আপনার কাছে ঘরেই থাকবে, তার ওপর নজর রাখতেও হবে না—হায়ার স্টাডিজএর জন্য বিজয় মেহেরা লণ্ডন চলে যাচ্ছে—সেখানকার একটা ফার্মে কাজও পেয়েছে।

এই প্রসঙ্গে কথা হবে গায়ত্রী রাই কল্পনা করেনি। কঠিন মুখে বিস্ময়ের আঁচড় পড়েছে। নড়েচড়ে বসল। সত্যি হলে অনেকখানি স্বস্তি, তাই উৎসুকও একটু।—তুমি জানলে কি করে, ডলি বলেছে?

—না। আমার সঙ্গেই সামনাসামনি কথা হয়েছে।

—কোথায়?

—মিরিকে।

—আরো অবাক।—তুমি সেখানে গেছলে?

—হ্যাঁ।

—কবে?

—দিন-সাতেক আগে।

—কেন গেছলে? এবারে সন্দিগ্ধ।

—যাকে নিয়ে এত ব্যাপার তাকে একটু ভালো করে জানা বা চেনা দরকার ভেবেছিলাম। তার সম্পর্কে আপনার ধারণার সঙ্গে আমার ধারণা মিললে তাকে হটানোর রাস্তা বার করা যায় কিনা সে চিন্তাও মাথায় ছিল।

মহিলার আগ্রহ আরো স্পষ্ট এবার।—কি বুঝলে?

—বোঝাবুঝির কথা থাক, প্রায় তিন বছরের জন্য সে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে এটাই বড় কথা। যাওয়ার আগে ওর বিয়ে করে যাবার ইচ্ছে ছিল, আপনার মেয়ে রাজি হয়নি। বিজয় মেহেরা আমাকেও জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি বলেছি সে-চেষ্টা করতে গেলে ডলিরই সব থেকে ক্ষতি করা হবে।

—স্কাউনড্রেল!

—আমি?

থতমত খেল। কিন্তু তেমনি উষ্ণ।—তোমাকে কে বলেছে? তিন বছরের জন্য তার যাওয়া একেবারে ঠিক?

ঠিক।

মুখের দিকে চেয়ে বাপী অনুভব করতে পারে মহিলার অনেক দিনের টানধরা

স্নায়ুগুলো আস্তে আস্তে শিথিল হচ্ছে। মুখের সাদাটে ভাবও এরই মধ্যে একটু কম।

—বুঝলাম। তোমার কি বক্তব্য?

নিরুত্তাপ গলায় বাপী জবাব দিল, শুভার্থীও ভাবেন না যখন, বলে কি লাভ হবে জানি না। তবু নিজেকে আমি শুভার্থী ভাবি বলেই বলছি।...তিনটে বছর অনেক সময়। ছেলে-মেয়ে দু'দিকেরই মত বা মন বদলানোর পক্ষে যথেষ্ট সময়। যেখানে যাচ্ছে ছেলের পক্ষে তো বটেই। এর মধ্যে মেয়ের মনের দিকে না তাকিয়ে আর যথেষ্ট সময় হাতে পেয়েও সে সুযোগ না নিয়ে আপনি যদি এমনি ঝোঁকের মাথায় ওর বিয়ের তোড়জোড় করেন—আমার ধারণা সব থেকে বড় ভুলটা সেইখানে হবে। শুধু এই ব্যাপারই নয়, সব দিকেই যেমন চলছে চলতে দিতে আপনার খুব অশান্তির কারণ থাকবে না।

গায়ত্রী রাই বেশ মন দিয়েই শুনল কথাগুলো। আর রুক্ষ নয়, উগ্র নয়। অশান্তি অনেকটা কমেই গেছে বোঝা যায়। এখন শুধু গম্ভীর।—ঠিক আছে, ভাবব। আর দেরি না করে তুমি ভ্যান নিয়ে চলে যাও। আজ আর কালকের মধ্যে যেখানে যেখানে মাল চালান দেওয়া দরকার কালকের মধ্যে দিয়ে পরশু গাড়িটা পাঠিয়ে দিও।

বাপী উঠে দাঁড়াতে গায়ত্রী রাই ঈষৎ নীরস সুরে আবার বলল, আর একটা কথা, এক্সপ্যানসনের জন্যও ফরেস্ট রেঞ্জ-অফিসারের সঙ্গে আমাদের ডাইরেক্ট যোগাযোগ করা দরকার!

নিরুত্তাপ গলায় বাপী জবাব দিল, আপনার বিবেচনা শেষ হলে বলবেন...করব।

অদূরে ভ্যানটা দাড়িয়েই আছে। আর অপেক্ষা না করে সিঁড়ির দিকে এগলো।

—বাপী। হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাধা দিল ঊর্মিলা।—ওয়েট, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

বাপী ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল তাকে। এই মুখে খুশী যেমন রাগও তেমনি। বাপী বলল, তোমার মায়ের বিশ্বাস বা বিবেচনা বোঝা গেলে তখন কথা। এখন থাক।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজা ভ্যানে।

জঙ্গলের পাশ-ঘেঁষা পাহাড়ী রাস্তা ধরে ভ্যান ছুটছে! বাপী প্রথমে গুম খানিকক্ষণ। আগে বাড়ল, কি আপাতত কিছুটা পিছে হটল জানে না। এতক্ষণের সব কথা আবার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। মন বলছে, পিছনে নয়, সামনেই পা ফেলেছে। দেখা যাক। হাসিই পেল হঠাৎ। বেলা সাড়ে ন'টা এখন। নিজে রান্না করে খায়। এরপর বাড়ি পৌঁছে সে পাটের সময় থাকবে না। কিন্তু এমনি মেজাজের হাল এখন ভদ্রমহিলার, যে মনেই পড়ল না। বাপীর ছেলেমানুষের মতো ভাবতে ভালো লাগছে নিজে যখন লাঞ্চে বসবে তখন মনে পড়বে আর খারাপ লাগবে।

সমস্ত দিন ব্যস্ত ছিল। বিকেলের দিকে আবুর খোঁজে জঙ্গলের পথ ধরল। এবারে ওর সঙ্গে কথা বলা বা পরামর্শ করা দরকার হয়েছে। গায়ত্রী রাইয়ের বিবেচনার মোড় কোন্ দিকে ফেরে বলা যায় না। রণজিৎ চালিহা অপরিহার্য ব্যাধির মতো তার স্নায়ুর ওপর চেপে আছে—থাকতে চাইবেও।

এ সময় চন্দ্রার বেডের কাছেই আবুকে পাবে ভেবেছিল। নেই। কেউ নেই। অনিশ্চয়তার দরুন উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে হয়তো। ওর ডেরার দিকে চলল। সেখানে

পেল। সামনের দাওয়ায় বসে বিড়ি টানছে। আশপাশ দিয়ে ছেলে দুটো ছোটাছুটি করছে।

ওকে আসতে দেখে আবু হাসল বটে, কিন্তু হাসিটা বুক ছুঁয়ে যাবার মতো নয়। ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে দুলারিকে ডাকল।

কাছে এসে বাপী আবুর পাশে দাওয়ার ওপরেই বসে পড়ল।—কি খবর?

বিড়িটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে নির্লিপ্ত গলায় আবু বলল, তোমার কাছে খবর পাব বলে তো দিন গুনছি।

দুলারি এসে ছেলে দুটোকে ঘরে পাঠিয়ে পাশের থাম ধরে দাঁড়িয়ে রইল। আবু ওর মাথায়ও অবাঞ্ছিত কিছু ঢুকিয়েছে মনে হয়।

—চন্দ্রার বেড়ে কাজ হচ্ছে না কেন?

আর একটা বিড়ি ধরিয়ে আবু জবাব দিল, তোমাদের বিচার শেষ হোক।

—ওটা যে তোমাদের মেমসায়েবের কাজেই লাগবে তোমাকে কে বলল? নষ্ট কোরো না, যেমন বাড়িয়ে যাচ্ছ বাড়িয়ে যাও।

আবু ঠিক বুঝল না। চেয়ে আছে।

বাপী বলল, মেমসায়েব এখন পাহাড়ের বাংলোয়। আজ সকালে গাড়ি পাঠিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে গেছলেন।

আবুর ছোট চোখ জোড়া চিকচিক করে উঠল।—আমার ওপর হুকুম হয়েছে কিছু?

—ম্যানেজার আর মেমসায়েবের হুকুম, জঙ্গলের বড়সাহেবের সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তা বলে তোমাদের বাদ দিয়ে নতুন টিম-ওয়ার্ক করতে হবে।

—সব দোষ তাহলে আমার আর রেশমার?

মোলায়েম গাম্ভীর্যে বাপী জবাব দিল, রেশমার কথা ছাড়ো।...সত্যি কথা বলো দেখি। আগে থাকতে বলে রেখে ছুটির দিনে লম্বা সময়ের জন্য তোমার মেমসায়েবের মেয়ে বনমায়াকে নিয়ে গেল—তোমার এতটুকু সন্দেহ পর্যন্ত হয়নি?

আবুর ছোট চোখের রাগ ঠিকরে বেরুচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে জবাব দিল, সন্দেহ হয়েছিল। আর সে-কথা রেশমাকে বলেও ছিলাম।...এবার তোমার কর্তব্য করতে সুবিধে হবে?

হাসি মুখে বাপী এবার দুলারির দিকে তাকালো। বলল, আবুর কর্তব্যজ্ঞান সাংঘাতিক। নতুন বীটম্যান হবার পর জঙ্গলের বড়সাহেবের হুকুমে আমাকে জঙ্গল থেকে ধরে নিয়ে গেছল। ওর চোখের সামনে তারপর কি হয়েছিল ওর মুখেই শুনো।

দুলারির শোনা আছে বোধহয়। দু'জনেই হতচকিত হঠাৎ। আবুর দিকে ফিরে ঠাণ্ডামুখে এবার বাপী বলল, আমার কর্তব্যজ্ঞান-টানগুলো একটু অন্য রকমের। ...মেমসায়েবকে বলে এসেছি, তোমাকে ছেড়ে দিলে আমাকেও ছেঁটে দেবার কথা ভাবতে হবে। কেন ভাবতে হবে তাও বলেছি। আমি আশা করছি অতদূর গড়াবে না, যেমন চলছে তেমনি চলবে। তা যদি না হয়, আমার বিশ্বাস আমি তুমি দুলারি আর রেশমা একত্র হয়ে ওষুধ আর সাপের ব্যবসা গোড়াতেই অত বড় না করে হোক ছোট করে অন্তত চালাতে পারব। টাকারও অভাব হবে না, বাড়ি বিক্রি করতে চাইলে মিসেস রাই কিনতে বাধ্য। কিন্তু আমার ওপর তোমার বিশ্বাসের এত উন্নতি দেখে ঘাবড়ে যাচ্ছি—

বিড়ি ফেলে আবু তার মুখটা বাপীর কোলে গুঁজে দিল—বাপী—বাপীভাই, তুমি

ধরে মারো—আমার মুখটা মাটিতে থেঁতলে দাও। না বাপীভাই, আমার জন্য তোমার কাজ ছাড়তে হবে না—আল্লার দিব্যি বলছি, মেমসায়েব আমাকে ঝাঁটা মেরে তাড়ালেও আর আমি তোমাকে অবিশ্বাস করব না।

বাপী ওকে ঠেলে তুলল। ওর চোখে সত্যি জল। দুলারি হাসছে। বাপীর সঙ্গে চোখাচোখি হতে বলল, আর অবিশ্বাস করলে আমি চ্যালা-কাঠ নিয়ে কুকুর তাড়া করব।

বেশ কপট গাম্ভীর্যে বাপী উঠে দাঁড়াল।—আমি চলে গেলে এই বুড়ো খোকাকে একটু আদর-টাদর কোরো? আবুকে বলল, আমার বিশ্বাস আর গণ্ডগোল কিছু হবে না। কিন্তু যাই হোক, আপাতত তুমি বা রেশমা ওই ম্যানেজারকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা কোরো!

পরের পনেরটা দিনের মধ্যেও পাহাড় থেকে কোনরকম নির্দেশ এলো না। এলো না বলেই বাপীর ধারণা বিবেচনার ফল অনুকূল। নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ এটা। ডিসেম্বরের শীতের কামড়ে পাহাড়ে থাকা সম্ভব হবে না। মেয়েসহ এই নভেম্বরের শেষেই মিসেস রাই নেমে আসবে আশা করছে। শুধু আশা করছে না, তাদের আসার অপেক্ষায় ভিতরে ভিতরে উদগ্রীব হয়ে আছে।

এখনো বাপী রণজিৎ চালিহাকে পাশ কাটিয়ে চলেছে। কাজের অছিলায় কাছাকাছির মধ্যে বাইরে বাইরে ঘুরছে দিন-কতক। এখানে থাকলে চালিহা আপিস থেকে যাবার পরে আসে। পরপর দুদিন তাকে অ্যাকাউনটেন্ট খবর দিল, চিফ একজিকিউটিভের মেজাজ গরম। আপিসে এসেই বাপীর খোঁজ করেছে। না পেয়ে রেগেই গেছে।

সেই দিনই সন্ধ্যার পর রণজিৎ চালিহার জিপ তার বাংলোয় হাজির। ড্রাইভার জানালো সাহেব এক্ষুনি যেতে বলেছেন।

গেল। বাংলোর ভিতরের ঘরে ডাক পড়ল। সামনের টেবিলে মদের গেলাস, মদের বোতল। লাল মুখ আর ঘোলাটে চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে জঠর ইতিমধ্যে অনেকটাই রসস্থ হয়েছে। ওকে দেখামাত্র গর্জন করে উঠল, হোয়াট দা হেল আর ইউ ডুইং অল টাইম? অ্যান্ড হাউ ডেয়ার ইউ ডিসওবে মি?

একটু দূরে চেয়ার টেনে বসল বাপী।—কি হয়েছে বলুন।

—রেঞ্জ-অফিসারের সঙ্গে দেখা করেছ?

—না।

—ফ্রেশ স্কিম করার কথা বলেছিলাম—করেছ?

—না।

ফেটে পড়ল।—কেন করোনি? আমি তোমাকে স্পেয়ার করব ভেবেছ? সাবমিট ইওর রিটন এক্সপ্লানেশন টুমরো।

ধীর গম্ভীর গলায় বাপী জবাব দিল, মিসেস রাই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এ-ব্যাপারে যা বলার তিনি ভেবে বলবেন জানিয়েছেন।

—হু ইজ শী? আই অ্যাম ইওর বস। ইউ ইনসাবরডিনেট লাউজি ফুল!

চেয়ার ঠেলে উঠে বাপী সোজা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। যে-রকম মত্ত অবস্থা, কিছুই এখন মাথায় ঢুকবে না।

পরের সন্ধ্যায় ফটকের সামনে আবার চালিহার জিপ। একই খবর। সাহেব ডাকছে। বাপী ড্রাইভারকে বলল, আজ যেতে পারছি না। কাল আপিসে দেখা করব বলোগে।

কিন্তু ড্রাইভার এবারে নিজে থেকেই জানান দিল, মেমসায়েবের ভ্যান এসেছে পাহাড় থেকে, বোধ হয় জরুরি দরকারেই সাহেব ডাকছেন।

অগত্যা। জিপে উঠতে হল। ভ্যানটা সত্যি চালিহার বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে। ভিতরে ঘরে আজ সবুজ আলো জ্বলছে। ভিতরে পা দিয়েই বাপীর মনে হল আজ আরো মত্ত অবস্থা। গেলাস ভরতি। বোতল প্রায় খালি। ওকে দেখেই জড়ানো গলায় হাঁক দিল, কাম্ অন্ ইউ চিনির বলদ—একবস্তা চিনি তোমাকে এক্ষুনি পাহাড়ে টেনে নিয়ে যেতে হবে! ফ্যাক-ফ্যাক করে হাসতে লাগল।—নিজেকে একটি মহারানী ভেবে বসে আছেন তোমাদের লেডি, বাট আই অ্যাম নট দ্যাট ব্লাডি সোয়াইন অফ এ সারভেন্ট—আই হ্যাভ নো টাইম, আই অ্যাম ওয়েটিং ফর এ গেস্ট। গো অ্যান্ড টেল হার দ্যাট অ্যান্ড ডাম্প অল দি মানি অন হার ল্যাপ। আবার হাসি।—বুঝতে পারছ না? আজ সন্ধ্যার মধ্যেই টাকা যাবার কথা ছিল, দেরি দেখে লোক পাঠিয়েছে। এবারে হাসি আরো তির্যক, আই ওয়ান্ডার হোয়াট শী উইল ডু উইথ ইট অ্যাট দিস আওয়ার অফ দি নাইট!

গেলাসের অর্ধেক এক চুমুকে সাবাড় করে দিল। তারপর উঠে টলতে টলতে খাটের ওপর ধুপ করে বসে পড়ল। একটানে বালিশটা সরাতেই বাপীর চক্ষু স্থির।

মস্ত দুই বাণ্ডিল একশ টাকার নোট। নম্বর করা নতুন নোটের বাণ্ডিল নয়। তার থেকে ঢের বড়। গাদা করে ফিতেয় বাঁধা।

বাণ্ডিল দুটো টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিল।—দেখে নাও একুশ হাজার সাতশ টাকা আছে এখানে। হার হাইনেসকে দিয়ে এসো অ্যান্ড দেন গো টু হেল!

বাপী নির্বাক দাঁড়িয়ে।

এক চুমুকে গেলাসের বাকিটুকু শেষ করে রণজিৎ চালিহা গজরে উঠল, ডোন্ট্ ওয়েস্ট্ মাই টাইম—হারি আপ্।

বাপী এগিয়ে এসে চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। নোটের বাণ্ডিল দুটো সামনে টেনে নিল।

রণজিৎ চালিহাও উঠল। ইংরেজি গান ধরে বোতলের বাকি মদ গেলাসে ঢেলে জল মেশালো। তারপর খোশমেজাজে দুলে দুলে ঘরের মধ্যে হাঁটতে লাগল। বাপী টাকা গুনছে তো গুনছেই। আর যত এগোচ্ছে মুখে ততো বিস্ময়ের আঁচড় পড়ছে।

রণজিৎ চালিহা টলতে টলতে বেরিয়ে গেছল। চাকরের সঙ্গে তার চেঁচামেচি কানে আসছে। ডিনার সার্ভ করতে দেরি হলে তার গর্দান নেবে বলে ধমকাচ্ছে। এদিকে বাপীর কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। প্রথম বাণ্ডিলেই চৌদ্দ হাজার সাতশ টাকা! এখন দ্বিতীয় বাণ্ডিলের মাঝামাঝি এসেছে।

ফিরে এসেই রণজিৎ চালিহা হুঙ্কার দিয়ে উঠল, আর বেশি দেরি করলে আমি তোমাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দেব বলে দিলাম!

গেলাসটা তুলে নিয়ে থলথলে মুখ করে হাসছে। ঘড়ি দেখছে। বাঞ্ছিত কারো আসার প্রতীক্ষায় সময় দেখছে হয়তো।

দ্বিতীয় বাণ্ডিল গোনা হল। এতে পনের হাজার একশ! দুটো মিলিয়ে উনত্রিশ হাজার আটশ। চালিহা মুখে বলেছে, একুশ হাজার সাতশ।

—ফিনিসড্?

বাপী মাথা নাড়ল।

কোণের ছোট টেবিলটার সামনে বসে প্যাড টেনে রণজিৎ চালিহা খসখস করে লিখল কি। তারপর নাম সই করে সেটা সামনে ছুঁড়ে মারল। ইংরেজিতে লেখা আছে, শরীর অসুস্থ। এই ঠাণ্ডায় যেতে পারছি না। বাপী তরফদারের হাত দিয়ে একুশ হাজার আটশ' টাকা পাঠানো হল।

এবার নেশার ঝোঁকে দুই বাণ্ডিলের শেষের সাতশ' আর একশ' জুড়ে আটশ' লিখেছে। বাপীর হাতে এখনো কড়কড়ে আট হাজার বেশি। এরই মধ্যে দ্রুত চিন্তা সারা তার। গর হিসেবের এই আট হাজার টাকা হয়তো তার নিজের গায়েব করার সংকল্প ছিল। নেশার ঝোঁকে সেটা আর মনে নেই।

টলতে টলতে এগিয়ে এসে চালিহা একটা কালো থলে ছুঁড়ে দিল। অর্থাৎ টাকাগুলো ওতে ভরে নিতে হবে।

—হার হাইনেসকে বলবে, সতের জায়গায় ঘুরে যা জোটানো গেছে সব দিয়ে দিলাম —শী এক্সপেকটেড মোর। কোথা থেকে কত পাওয়া গেছে আই ডোন্ট রিমেম্বার নাও —অ্যান্ড আই ডোন্ট কেয়ার টু। পরে দেখা যাবে। এ কোনো হিসেবের টাকা নয়, স্টিল অ্যাম আই এ থিফ? একটা রাত এ-টাকা আমার কাছে থাকলে আমি মেরে দিতাম? নাও গেট আউট!

বাইরের অন্ধকার ফুঁড়ে ভ্যান ছুটছে। ঠাণ্ডা বেশ। গায়ে গরম জামা যা আছে খুব যথেষ্ট নয়। তবু বাপীর খুব একটা শীত করছে না। স্থাণুর মতো বসে আছে। টাকার থলে কোলের ওপর শক্ত মুঠোয় ধরা। আবার নতুন করে ভাবছে কিছু।

পাহাড়ের কাছে পৌঁছুল। বাংলোর জোরালো আলোগুলো দেখা যাচ্ছে। নিচের থেকে সুন্দর লাগছে। পাহাড় পেঁচিয়ে ভ্যানটা উঠতে লাগল। আধাআধি ওঠার পর পাশের জানলা দিয়ে বাপী নিচের দিকে তাকালো। শুধু জমাটবাঁধা অন্ধকার। আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। কেন যেন উর্মিলার বাবা বীরেশ্বর রাইয়ের কথা মনে পড়ল বাপীর। মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাতে গিয়ে নিচে পড়ে সব শেষ। ওই খোলা দিকটায় তখন কাঁটাতারের বেড়া ছিল না। গায়ত্রী রাই সবটা জুড়ে পরে লাগিয়েছে।

ভ্যান গেট দিয়ে ঢুকল। সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

টাকার থলে হাতে বাপী সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। ভ্যান থামিয়ে ড্রাইভার বাদশা দু'বার হর্ন বাজিয়েছে। সেই কারণেই হয়তো বারান্দার পিছনের কাঁচের দরজা দুটো খুলে গেল। গায়ত্রী রাই দাঁড়িয়ে। মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত গরম চাদরে মোড়া। বাইরের বারান্দায় হ্যাসাক জ্বলছে। ভিতরেও জোরালো আরো।

স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্যে গায়ত্রী রাই ওকে ভালো করে দেখে নিল এক দফা। তারপর ডাকল।—ভিতরে এসো।

বাপী সামনের ঘরে ঢুকল। ভিতরের অন্য দরজা দিয়ে উর্মিলা গলা বাড়ালো। তারপরেই খুশিতে আর বিস্ময়ে উদ্ভাসিত।—বাপী! তুমি এ সময়ে, কি ব্যাপার?

মুখ দেখে মনে হল মায়ের সঙ্গে কিছু বোঝাপড়া হয়েছে। বাপী জবাব দিল না। গায়ত্রী রাইয়ের মুখোমুখি একটা সোফায় বসল। অবাক মুখে উর্মিলা মায়ের পাশের সোফাটা দখল করল।

গায়ত্রী রাই হাতের কালো থলেটা একবার দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ওতে টাকা?

—হ্যাঁ।

—মিস্টার চালিহা কি করছেন?

—ঘরে সবুজ আলো জ্বেলে ড্রিঙ্ক করছেন। একজন গেস্ট-এর জন্য অপেক্ষাও করছেন।

বলার ধরনে সাদাটে ভুরুজোড়া একটু কোঁচকাতে দেখা গেল।—ইজ হি ড্রাঙ্ক?

—ঠিক বলতে পারব না। দেখলে তাই মনে হবে। উঠে টাকার থলে আর চিঠি তার সামনে সেন্টার টেবিলে রেখে আবার ফিরে এলো।

চিঠিটা তুলে নিতে নিতে গায়ত্রী রাই জিজ্ঞাসা করল, কত টাকা পাঠিয়েছে?

—উনি মুখে বলেছেন একুশ হাজার সাতশ' টাকা। চিঠিতে লিখেছেন একুশ হাজার আটশ' টাকা।

—এখানে কত আছে তুমি গুনে আনোনি?

—এনেছি। আছে ঊনত্রিশ হাজার আটশ' টাকা।

ঊর্মিলা লাফিয়ে উঠল।—মাই গড! হি ওয়জ ডেড ড্রাঙ্ক দেন!

ওর দিকে না তাকিয়ে বাপী বলল, টাকাটা গুনে নিন। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে--এরপর আরো ঠাণ্ডা পড়বে।

ঊর্মিলা উদ্বিগ্ন মুখে মায়ের দিকে তাকালো। গায়ত্রী রাইও এ-বকম শুনবে আশা করেনি। বলল, এই ঠাণ্ডায় আর তোমাকে যেতে হবে না। কাল সকালে যাবে।

সোজা মুখের দিকে চেয়ে বাপী বলল, কিন্তু আমার ফিরতে পারলে ভালো হয়...কিছু চিন্তা আমার আছে।

শুধু মেয়ে নয়, মায়ের মুখেও বিস্ময়ের আঁচড় পড়েছে।—কি চিন্তা?

—আপনার কাছে আর আমার থাকা নিরাপদ হবে কিনা সেই চিন্তা।

মেয়ের ভেবাচাকা মূর্তি। মায়ের সাদাটে ভুরুতে ভাঁজ পড়ল আবার।—হোয়াট ডু ইউ মিন?

বাপীর মুখে কোন রকম আবেগের লেশমাত্র নেই। জবাব দিল, একটু পিছন থেকে বলতে হবে তাহলে।...সাত মাস আগে আপনি আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে শিলিগুড়ি আর মালদহের দু'জন বড় পাইকিরি খদ্দেরের সঙ্গে রিজিওন্যাল ম্যানেজার হিসেবে আমার পরিচয় করে দিয়েছিলেন। ওই দু'জনেই আপনার অনেক দিনেব ক্লায়েন্ট, আপনার বিশেষ শ্রদ্ধা করে দেখেছি।

গায়ত্রী রাই অসহিষ্ণু ঈষৎ—সো হোয়াট, তাদের কথা কেন?

—তার কারণ দ্বিতীয়বার তাঁদের কাছে যেতেই দু'জনেই তাঁরা ব্যক্তিগত লাভের টোপ ফেলে কিছু প্রস্তাব দিয়েছিলেন।...আমার ধারণা, আমার সততা পরীক্ষা করার জন্য আপনি এই টোপ ফেলতে তাঁদের বলে দিয়েছিলেন।

ঊর্মিলার দু' চোখ বিস্ফারিত। একবার মা-কে দেখছে একবার বাপীকে। এই প্রথম বোধ হয় বিড়ম্বনার ছায়া দেখা যাচ্ছে গায়ত্রী রাইয়ের মুখে।

স্পষ্ট ঠাণ্ডা গলায় বাপী বলে গেল, কিন্তু মিস্টার চালিহার মতো মানুষকে দলে টেনে আবার সেই পরীক্ষার টোপ ফেলে আপনি আমাকে তার দশগুণ রিস্কএর মধ্যে

ফেলেছিলেন। আমার ধারণা, আপনি জানতেন টাকা নিয়ে মিস্টার চালিহা আসবেন না, আমি আসব। আমার ধারণা, কত টাকা আমি পাব—আপনি আর মিস্টার চালিহা দু'জনেই তা জানতেন। দেদার মাতাল হয়ে মিস্টার চালিহা আপনাকে গালাগালি পর্যন্ত করছিলেন। ...আমার ধারণা, করবেন যে তাও তিনি আপনাকে বলেই রেখেছিলেন। কাউকেই বিশ্বাস করা আপনার ধাতে নেই, তাই এত বড় রিস্ক-এর মধ্যে আপনি আমাকে ঠেলে দিতে পেরেছেন।

গায়ত্রী রাইয়ের চোখে মুখে ঠোঁটে হাসি ছড়াচ্ছে। এমন একটা ব্যতিক্রম দেখে ঊর্মিলা আরো হতভম্ব।

গায়ত্রী রাই দেখছে। হাসছে। দু' চোখে প্রশংসা উপচে পড়ছে।—রিস্ক কেন?

—অত মদ না খেলে আর আরো একটু মাথা খাটালে মিস্টার চালিহা আট হাজার টাকা কম দিয়েই আমাকে আপনার কাছে পাঠাতেন। তখন আপনি কি করতেন? কাকে বিশ্বাস করতেন? তিনি তো জোর দিয়ে বলতেন, প্ল্যান-মতো ঊনত্রিশ হাজার আটশ' টাকাই আপনাকে পাঠিয়েছেন!

সাদা মুখ বিস্ময় আর উদ্বেগে ভরাট হতে লাগল। অস্ফুট স্বরে বলল, আমি অতটা ভাবিনি...সত্যি তো সর্বনাশ হত তাহলে!

বাপীর গলার স্বর এবারে শুধু ঠাণ্ডা নয়, কঠিনও। আপনার কিছু হত না, আমার হত। চোর নাম নিয়ে আমাকে এখান থেকে যেতে হত। মুখের ওপর দু' চোখ বিঁধিয়ে থামল একটু। অনেক দিনের মোক্ষম গোপন অস্ত্রটা ছুঁড়ে দেবার এই বুঝি সময়। গলার স্বর আরো নির্দয়।—এবারে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করি?

গায়ত্রী রাই চেয়ে আছে। ভালো লাগছে। অবাক লাগছে। নিজের অগোচরে সামান্য মাথা নেড়েছে।

আঙুল তুলে ঊর্মিলাকে দেখিয়ে বাপী বলল, চার বছর আগে ওর বাবার সেই অ্যাকসিডেন্টের রাত থেকে যে লোককে আপনি সব থেকে বেশি সন্দেহ করেন আর ঘৃণা করেন—সব দিক বজায় রাখার তাগিদে আপনি তাকে আরো কত প্রশ্রয় দেবেন?

মুখের ওপর কেউ যেন আচমকা আঘাত করল। গায়ত্রী রাই নির্বাক নিস্পন্দ বিমূঢ় খানিকক্ষণ। একটা যন্ত্রণার স্মৃতি ভেতর থেকে ঠেলে উঠতে লাগল। বিড়বিড় করে বলল, অ্যাকসিডেন্টের সেই রাত থেকে আমি সব থেকে বেশি সন্দেহ করি ঘৃণা করি...কাকে?

—আপনার চিফ একজিকিউটিভ রণজিৎ চালিহাকে।

—তোমাকে কে বলল?

—কেউ বলেনি। আমার এই রকমই ধারণা...বড় কাজ শেষ করার আনন্দে দু'জনে প্রচুর ড্রিঙ্ক করে বৃষ্টির রাতে বন্ধুকে পাশে নিয়ে মিস্টার রাই জিপ ড্রাইভ করে ফিরছিলেন...বন্ধুরও সেই রাতে আপনার এখানেই থাকা খাওয়ার কথা...কিন্তু পাহাড়ে ওঠার আগেই কিছু কাজ সেরে আসার জন্য তিনি নেমে গেলেন আর দু' ঘণ্টা বাদে অ্যাকসিডেন্টের খবর শুনলেন। অ্যাকসিডেন্ট যে কারণেই হোক, তাঁর প্রত্যাশিত ছিল কিনা আর সেই জন্যেই কাজের অজুহাতে তিনি নেমে গেছলেন কিনা—সেই সন্দেহ আপনার মনে আসা স্বাভাবিক...আর মিস্টার চালিহা তাঁর কাজ সেরে ফিরে আসার পর সত্যি কতটা মত্ত অবস্থায় তাঁকে দেখা গেছে তা-ও আপনিই সব থেকে ভালো জানেন।

ঘরের বাতাসও বুঝি স্তব্ধ হয়ে থেমে আছে। গায়ত্রী রাইয়ের মুখ কাগজের মতো সাদা। স্মৃতির নিঃশব্দ যন্ত্রণার নিঃশ্বাস নিতে ফেলতেও কষ্ট হচ্ছে মনে হয়।

ঊর্মিলা পুতুলের মতো বসে।

## সতেরো

খুব সকালে ঘুম ভেঙে গেল। গায়ের পুরু কম্বল সরে গেছল। সেটা টেনে নিয়ে বাপী আবার ঘুমোতে চেষ্টা করল। এত শীতে গায়ত্রী রাইয়ের সাড়ে সাতটার আগে ঘুম ভাঙে না। মেয়ে আরো দেরিতে ওঠে। কিন্তু কি মনে পড়তে গরম আরামের তলায় ঘুমের চটকা ভেঙে গেল। কম্বলটা মুখ থেকে গলা পর্যন্ত নামিয়ে চোখ মেলে তাকালো।

পাহাড়ের বাংলোয় নয়, বানারজুলিতে বাপী নিজের বাংলোয় নিজের বিছানায় শুয়ে। পাঁচ দিন বাদে গত সন্ধ্যায় সকলকে নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে এসেছে! নভেম্বরের শেষ দিন গেছে সেটা। আজ ডিসেম্বরের পয়লা। ওই পাঁচ দিনে প্রত্যাশার বাইরে মহিলার অনেক পরিবর্তন দেখেছে বাপী।

ওই পাঁচটা দিন ছবির মতো চোখে ভাসছে।

...সেই রাতে মা ছেড়ে মেয়ের মধ্যেও এমন কিছু নাড়াচাড়া পড়েছিল যে কারো মুখে একটি কথা সরেনি। নিঃশব্দে ডিনারের পাট শেষ হয়েছে। আগের বার যে কোণের ঘরটায় থাকত সেই ঘরেই বাপীর শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। বাড়ির হাওয়া দেখেই হয়তো ঝগড়ুর মুখ সেলাই। সঙ্গে করে শোবার ঘরে নিয়ে আসার পর ফিসফিস করে না জিজ্ঞাসা করে পারেনি।—কি হয়েছে বাপীভাই? ভয়ের কিছু?

সেই রাতে আর কথা বলার মেজাজ বাপীরও ছিল না। টান-ধরা স্নায়ুগুলো সব শিথিল হয়ে গেছল। ক্লান্ত লাগছিল। মাথা নেড়েছিল শুধু ভয়ের কিছু না।

ঘরের কাঁচের জানলাগুলো সব বন্ধ। তবু বেশ শীত। বিছানায় পায়ের কাছে গায়ের কম্বল ভাঁজ করা। তবু গায়ের সোয়েটারটা খুলবে না সবসুদ্ধুই কম্বলের নীচে ঢুকে পড়বে ভাবছিল।

ঝগড়ুর চকিত মুখ দেখেই বাপী ঘুরে তাকিয়েছিল। ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে গায়ত্রী রাই। সেই রকমই ফ্যাকাশে সাদা মুখ। তেমনি নির্বাক। চোখোচোখি হতে এগিয়ে এলো। ঘুরে চারদিকে চেয়ে দেখল একবার। বিছানা দেখল। কম্বলটাও। তারপর ঝগড়ুর তটস্থ মূর্তির দিকে একবার তাকিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ওই তাকানোর অর্থ সঙ্গে আসার ইশারা বুঝে ঝগড়ুও পিছনে চলল। বাপী খোলা দরজার দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর বিছানায় বসল। মিনিট পাঁচ-সাতেকের মধ্যেই ঝগড়ু ফিরে এলো আবার। তার হাতে ভাঁজ-করা একটা মোটা সাদাটে কম্বল। মুখে চাপা উত্তেজনা। প্রায় অসম্ভব কিছু ব্যাপার ঘটেছে যেন। হাতের কম্বল বিছানায় ফেলে আগের কম্বলটা তুলে নিল।

এই কম্বলে হাত দিয়েই বাপী বুঝল খুব দামী জিনিস। ওপরের দিকটা খড়খড়ে। নিজের দিকটা পশমের মতো নরম। আর তেমনি গরম যে বোঝাই যায়। বাপী বলেছিল, যেটা ছিল তাতেই তো হয়ে যেত...

জবাবে ঝগড়ুর চাপা বিস্ময় আর চাপা খুশি।—মালকান যে নিজে হাতে এটা বার করে তোমাকে দিয়ে যেতে হুকুম করল! এটা সাহেবের কম্বল ছিল বাপীভাই, সাহেব চলে যেতে মালকান এটা যত্ন করে তুলে রেখেছিল—এই প্রথম নামানো হল!

বাপী আজ নিজের ঘরে নিজের বিছানায় শুয়ে। কিন্তু গায়ে সেই কম্বল। গায়ত্রী রাই এটাও সঙ্গে নিয়ে এসেছে জানত না। কাল সন্ধ্যার পরেই পাঠিয়ে দিয়েছে।

শুধু এটাই নয়। বিগত বীরেশ্বর রাইয়ের আরো কিছু সযত্নে তোলা দামী জিনিস এখন বাপীর দখলে। ওই দেয়ালের হ্যাঙ্গারে ঝুলছে। গলা থেকে পা পর্যন্ত পশমের ড্রেসিং গাউন। তাতে কাশ্মীরী কাজ করা। চোখে পড়ার মতো জিনিস। কোথায় কি-ভাবে যত্নে রাখবে ওটা বাপীর এখন সেই সমস্যা।

পাহাড়ের বাংলোয় পরদিন সকালে চায়ের পাট শেষ হতে বানারজুলি ফেরার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। গায়ত্রী রাই নিজের মনে ভাবছিল কিছু। মেয়ে ফস করে বলে উঠল, বাপীর সঙ্গে আমরাও নেমে যাই চলো না মা, এ ছাইয়ের জায়গা আরো ভালো লাগে না—আর কত শীতের জন্য অপেক্ষা করবে?

গায়ত্রী রাই মেয়ের দিকে চেয়ে রইল একটু। তারপর বাপীর দিকে। বলল, তোমার এখন যাওয়ার দরকার নেই, দিন কয়েক বাদে একসঙ্গেই যাওয়া যাবে।

ঊর্মিলা মায়ের সুবিবেচনা দেখে খুশি। কর্ত্রী এরকম হুকুম করতে পারে বাপীর কল্পনার মধ্যে ছিল না। মেয়েকে সঙ্গ দেবার জন্য এই নির্দেশ, একবারও মনে হয়নি। দ্বিধাগ্রস্ত মুখে বাপী বলেছিল, জামা-কাপড় কিছু সঙ্গে আনা হয় নি।

পাছে মা আবার ওকে যেতে বলে, ঊর্মিলা আগ বাড়িয়ে বাধা দিল, তোমার অমন রাজ-সজ্জা ভুটান শহরে পাওয়া যাবে না নাকি! সঙ্গে সঙ্গে হাসি।—আর না পাওয়া গেলেই বা, আমার আর মায়ের শাড়ি পরেই ক'টা দিন কাটিয়ে দিও।

মেয়ের বাচালতায় মা হালকা ভ্রূকুটি করে একবার তার দিকে তাকালো শুধু। তারপর বাপীর দিকে। সোয়েটারের ওপর আলোয়ান চড়িয়েও সকালের শীত মানছে না, বুঝল। কিছু না বলে উঠে চলে গেল। একটু বাদে ফিরল যখন হাতে ওই কাশ্মীরী কাজ-করা পশমের ড্রেসিং গাউন।

—এটা পরে দেখো তো।

জিনিসটা কার আর কত যত্নে ছিল বাপী দেখেই বুঝেছে। মায়ের বদান্যতায় মেয়ে অবাক যেমন খুশিও তেমনি। বাবার এসব জিনিস মা হাতে ধরে কাউকে তুলে দিতে পারে ভাবা শক্ত। গত রাতে বাবার কম্বল বার করে দেবার কথাও ঝগড়ুর মারফৎ ওর কানে গেছে, বাপী সেটা পরে বুঝেছে। ফাঁপরে পড়ার দাখিল। বলেছিল, না, না, এর কিছু দরকার নেই—আমার কষ্ট হচ্ছে না।

কোনো কিছুতে বাধা পড়লেই বিকৃত মুখ।—আঃ! পরে দেখতে বলছি না!

মেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে এসে মায়ের হাত থেকে গাউনটা নিল। আলোয়ান খুলিয়ে নিজের হাতে ওটা পরালো তাকে। অস্বস্তির একশেষ। সামনে এসে নিজের হাতে কর্ডের বেল্টও লাগিয়ে দিল। তারপর সকৌতুকে আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বলে উঠল, ফার্স্ট ক্লাস।

বড় আয়নাটার সামনে টেনে নিয়ে গেল ওকে। কিন্তু আয়নায় বাপী নিজেকে দেখবে

কি। আয়নায় গায়ত্রী রাইয়ের দিকে চোখ পড়তে সে যেন অভাবনীয় কিছুই দেখল। রুক্ষমুখে কমনীয়তার অমন ঢল নামতে পারে স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। দেখেই বুকের তলায় আর একখানা মুখ আঁতিপাতি করে খুঁজতে ইচ্ছে করেছিল। তার অদেখা মায়ের মুখ। ওর দিকেই চেয়ে আছে। আয়নার ভিতর দিয়ে চোখাচোখি হতে বাপী সরে এসেছিল।

বেড়ানোর অছিলায় উর্মিলা তারপর ওকে বাগানে টেনে এনেছে। ছদ্ম গাম্ভীর্যে টেনে টেনে বলেছে, কাল বাবার কম্বল পেয়েছ, আজ গরম গাউন পেলে, আরো কত কি পাবে ঠিক নেই—আমারই কপাল মন্দ।

—কেন?

—কেন আবার কি, এসব কি তোমার পাবার কথা নাকি?

—বিজয় মেহেরার পাবার কথা?

—না তো কি?

—তা হলে শেষ পর্যন্ত এসব তার কাছেই যাবে।

—আর গেছে। মা-কে তুমি যা করে ফেলেছ...

ফোঁস করে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল।—তোমার বয়েস আর দশটা বছরও বেশী হলে বা মায়ের কম হলে কি যে হত বোঝাই যাচ্ছে।

ঘাড় ফিরিয়ে বাপী বাংলোর দিকে তাকিয়েছে একবার। মহিলা বারান্দায় বসে। দূর থেকে মনে হয়েছে ওদেরই দেখছে। মেজাজে থাকলে মেয়েটার জিভে লাগাম নেই। মা-কে নিয়ে এরকম রসিকতা একবার বানারজুলিতেও করেছিল, বাপী ভোলেনি।

উর্মিলা হাসিমুখেই আবার বলেছে, বাবাকে আমি কত ভালবাসতাম জানো না —আজ তার এসব জিনিস মা তোমাকে নামিয়ে দিল দেখে কি-যে ভালো লাগছে।

বাপীর মুখে দুটো আবেগের কথাই এসে গেছল এরপর। নিজের মা কবে চলে গেছে মনেও নেই, আজ তোমার মাকে দেখে মনে হচ্ছিল আমার মায়ের মুখখানাও বুঝি ওই রকমই ছিল। এমন আর ওঁকে আগে দেখিনি!

খুশি মুখে মাথা ঝাঁকিয়ে উর্মিলা বলেছে, বাবার তুলনায় মা বরাবরই গম্ভীর ছিল একটু কিন্তু ভারী মিষ্টি ছিল। অনেকদিন বাদে আজ আমিও আগের মতো দেখলাম। বাবা চলে যাবার পর থেকে একেবারে যাচ্ছেতাই ভাবে বদলে গেল। কাল রাতে তোমার কথা শোনার পর বুঝলাম এতটা কেন হল। আশ্চর্য, বড় হবার পরেও আমাকে কিচ্ছু বলেনি।

পাঁচটা দিন বড় ভালো কেটেছে বাপীর। তার স্বাদ এখনো ভিতরে লেগে আছে। সর্বদা মনে হয়েছে বাইরে গুরুগম্ভীর কিন্তু ভিতরে স্নেহের আধার নিজের মাকেই যেন সামনে দেখছে। মহিলার অগোচরে তাকে দেখার জন্য থেকে থেকে দু'চোখ লালায়িত হয়ে উঠেছে। আর মেয়েটারও বুদ্ধি খুব, অথচ সরল বটে। এই বন্ধুর কাছে আর যেন রেখে-ঢেকে চলার কিছু নেই। তাকে সব বলা চলে, সর্বরকমে বিশ্বাস করা চলে। মায়ের কথায় সায় দিয়ে রাগিয়ে দিলে গলা ছেড়ে ঝগড়া করেছে, মহিলার সামনেই তাকে তেল দেওয়ার খোঁটা দিয়েছে, আর বেশি রাগলে উঠে চুলের ঝুঁটি ধরে ঝাঁকাতে এসেছে। কিন্তু ফাঁক পেলেই বাপীকে নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে এসেছে, নয়তো নিরিবিলি কোথাও

গিয়ে বসেছে।

উর্মিলার শোনা বা বলার প্রসঙ্গ একটাই। বিজয় মেহেরা। তার চিঠি পেয়েছে। চিঠির লেনদেন এখনো কি করে চলছে ও আর সেটা প্রকাশ করতে রাজি নয়। না, একবার ধরা পড়ে ঝগড়ুকে আর এর মধ্যে টানে নি। তার থেকে ঢের পাকা ব্যবস্থা করেছে। একখানা চিঠি পেতে বিজয়ের দশ-বারো টাকা খরচ হয়ে যায় শুনেই পাকা ব্যবস্থাটা কি বাপীর আঁচ করতে অসুবিধে হয়নি। কবে কখন চিঠি পাবে জেনে ও পাহাড় থেকে নেমে আসে, বিজয় মেহেরা লোক মারফৎ মিরিক থেকে চিঠি পাঠায়। উর্মিলার দিক থেকে কোন অসুবিধে থাকার কথা নয়, ডাকে চিঠি দিলেই হল। বিজয়ের চিঠির জন্য কবে কখন পাহাড় থেকে নামবে সেটা নিশ্চয়ই উর্মিলাই জানিয়ে দেয়।

বিজয় লিখেছে, ডলির বন্ধু বাপী তরফদার তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল—আলাপ হয়েছে আর ভালোই লেগেছ। ঘুরেফিরে উর্মিলার উদ্‌গ্রীব জিজ্ঞাসা, বিজয়কে বাপীর কেমন লেগেছে—তার সঙ্গে কথা বলে কি মনে হয়েছে। নাকমুখ কুঁচকে বাপী প্রথমে জবাব দিয়েছিল, থার্ড ক্লাস।

সঙ্গে সঙ্গে গাঁট্টা উচিয়ে উর্মিলা চোখ পাকিয়েছে।—এই, খবরদার! তারপরেই আবেগে উন্মুখ। ওর মতো ছেলেকে ভালো না লেগে পারে—খুব ভালো লেগেছে—তাই না?

—তুমি জোর করে বলালে, তাই।

—আঃ, বলো না!

বাপী স্বীকার করেছে ভালো লেগেছে।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ আগ্রহ।—মাকে বলবে তাহলে?

—সর্বনাশ! আমার এ-কূল ও-কূল দু-কূল যাবে।

—এখন কে বলতে বলেছে, ও বিলেত থেকে ফিরে এলে মওকা বুঝে বলবে। বেশি আনন্দ হলে ওর হাত দুটো বাপীর মাথার ওপর চড়াও হয়। চুলের ঝুঁটি ধরে মাথাটা সামনে-পিছনে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলেছিল, তুমি দলে আছ যখন আমাদের বিয়ে আর কেউ ঠেকাতে পারবে না—এ আমি খুব ভালো করে বুঝে নিয়েছি—বুঝলে বন্ধু? মা-ও না—

বোকা মুখ করে বাপী বলেছিল, আমাদের বিয়ে মানে তোমার আর কার?

জবাবে মাথায় ঠাস করে একটা থাপ্পড়।

পিকনিকে গিয়ে কি করে ওদের প্রথম দেখা হল আর সেয়ানা ছেলে কি করে গুটি গুটি এতটা এগিয়ে এলো মনের আনন্দে গলগল করে মেয়ে সেই গল্পও করেছে। —গোড়ায় গোড়ায় আমি ওকে বিশ্বাস করেছি না কাছে ঘেঁষতে দিতে চেয়েছি! নিজের মাকে কি আমি চিনি না? কিন্তু এমন নাছোড়বান্দা কি বলব—লেগেই থাকল। আর কি সুন্দর চিঠি—কোনো এঞ্জিনিয়ার ছেলে এত ভালো চিঠি লিখতে পারে তুমি ভাবতে পারবে না। অসভ্যের ধাড়ী, কিন্তু চিঠিতে একটা যদি খারাপ কথা থাকত।

বাপীর মনে হয়েছিল দেখতে চাইলে সে-সব চিঠি অনায়াসে এই মেয়ে সামনে ফেলে দিতে পারে। কারণ আরো যা বলেছে তা বোধ হয় এই বেপরোয়া মেয়ের দ্বারাই সম্ভব। গেলবারে বানারহাটে দু'জনের ঝগড়ার কথা। ও ছেলে যেমন গোঁয়ার তেমনি

অবুঝ। চুপচাপ বিয়েটা করে রেখে তারপর বিলেত যাবে। তা যে হয় না ওকে কিছুতেই বোঝানো যায় না। ফলে সত্যি সত্যি ঝগড়া দু'জনের।—কি পাজী আর কত অসভ্য জানো? যদিবা বোঝানো গেল, পাঁচ-পাঁচটা ভালো করে চুমু খাবার আগে কিছুতেই ঠাণ্ডা হবে না।

মুখ লাল করে মেয়ে হেসে গড়াগড়ি।

বাপীর কান গরম। বুকের তলায় মোচড়। ওকে বুঝতে না দিয়ে নিঃশব্দে সে নিজের ভিতরে ভিখিরিটাকে চাবুকের মুখে রেখেছে। বেপরোয়া মেয়ের এমন সরল বিশ্বাসের মর্যাদা দেবার জন্য ওর মায়ের মন সত্যি ফেরাতে পারবে কিনা কে জানে। কিন্তু চেষ্টা যে করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ওই পাঁচ দিনের মধ্যে দু'দিন সকালে ভ্যান নিয়ে গায়ত্রী রাই বানারজুলি থেকে ঘুরে এসেছে। কেন বা কি দরকারে যাওয়া কিছুই বলে যায়নি। সকাল আটটায় বেরিয়ে এগারোটার মধ্যে ফিরে এসেছে। স্নেহবশত দিন কয়েক আরামে কাটিয়ে যাবার জন্য মহিলা বাপীকে এখানে বসিয়ে রেখেছে, এ একবারও মনে হয়নি। বাপীর ধারণা তার অনুপস্থিতিতে ওকে এখন চিফ একজিকিউটিভের মুখোমুখি হতে দিতে চায় না। তার সঙ্গে কথা বলার জন্যেই নিজে দু'দুবার গেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু কি কথা হতে পারে বাপী মাথা ঘামিয়ে অনুমান করতে পারেনি।

বিছানা আর ভালো লাগল না। উঠে মুখ হাত ধুয়ে এলো। বাইরে পাহাড়ের দিকটা ধূসর কুয়াশায় ছাওয়া। ঘড়িতে সাড়ে ছ'টা। পশমের ড্রেসিং গাউনটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে এলো। সামনে দিকটায় কুয়াশার সঙ্গে কাঁচা রোদের বোঝাবুঝি চলেছে। কুয়াশার চাদর ফুঁড়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা। বাপী বাংলো থেকে নেমে এলো। ঘাসের মাথায় আর মেহেদীর পার্টিশনে শিশিরের ফোঁটাগুলো রোদের ছোঁয়া পেয়ে মুক্তোর মতো ঝলমল করছে। শীত পছন্দ নয় বাপীর, কিন্তু আজ অন্তত অদ্ভুত ভালো লাগছে।

গেট খুলে এগলো। পাশের গেটে এসে দাঁড়ালো। এই বাংলো নিঝুম এখনো। ঘুম ভাঙিয়ে ঊর্মিলাকে যদি হিড়হিড় করে টেনে বার করে আনা যেত, বেশ হত। কিন্তু বাপী জানে এই ভালো-লাগা-সকালে যে-মুখখানা এক্ষুনি দেখার লোভ সে-মুখ উর্মিলার নয়। তার মায়ের। ওর ভিতরে যে আর এক কাঙাল সেঁধিয়ে আছে সে ক'দিন আগেও জানত না। স্নেহের কাঙাল। বাপীকে আরও সাবধান হতে হবে। মহিলা বুঝে ফেললে কোন মূর্তি ধরবে কে জানে। ভালোর কানাকড়িও ভালো। যেটুকু আপনি আসবে সেটুকুই ভালো।

গেট ছেড়ে বেশ অনেকটা পথ এগিয়ে গেল। তারপর রাস্তার পাশে এসে জঙ্গল দেখতে লাগল। থেকে থেকে পাতার ফাঁক দিয়ে জঙ্গলের বাতাস ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাসের মতো বেরিয়ে আসছে। সামনের গাছগুলোর বিবর্ণ পাতা থেকে টপটিপ শিশির পড়ছে। একটা নীলকণ্ঠ-পাখি অদূরের বাবলার ডালে তপস্বীর মতো বসে। একজোড়া ফিঙে সকালের আলোয় হাবুডুবু খেয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। বাপী চেয়ে চেয়ে দেখছে। ভালো-লাগার স্বাদটুকু যেন চোখের ভিতর দিয়ে আরো গভীরে ছড়াচ্ছে।

জঙ্গলেই ঢুকে পড়ত হয়তো। অদূরে জিপের শব্দ কানে আসতে ফিরে তাকালো। তারপরই সচকিত। রণজিৎ চালিহার জিপ। নিজেই চালিয়ে আসছে। বাপীকে দেখেছে।

কিন্তু লোকটার হঠাৎ অমন হাঁ হয়ে যাওয়ার কারণ কি বাপী চট করে ঠাওর করে উঠতে পারল না। জিপটা সামনে দাঁড়িয়ে গেল। বিস্ময়ের ধাক্কা লোকটার দু'চোখে লেগে আছে এখনো।

তক্ষুনি বাপীর খেয়াল হল, কি দেখে এত অবাক। গায়ের গরম ড্রেসিং গাউনটা। খুবই চেনা নিশ্চয়। এটা শেষ পর্যন্ত এই গায়ে এসে উঠতে পারে ভাবাও শক্ত বোধ হয়। সামলে নিতে সময় লাগল না তা বলে।

—হ্যালো! গলার স্বরও অন্তরঙ্গ।—জঙ্গলের শোভা দেখছ? আমি তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম আর ঘুম থেকে উঠেছ কিনা ভাবছিলাম।

এ বলে কি! গায়ত্রী রাই এরই মধ্যে এমন কি দাওয়াই দিয়ে গেল যে এই লোকের হাসি-হাসি মুখে এমন কথা!

—কাম অন বয়। দরাজ আহ্বান—তোমার সঙ্গে কথা শেষ করেই আবার আমাকে ছোটাছুটির মধ্যে পড়তে হবে।

চুপচাপ জিপে উঠে বাপী তার পাশে বসল, স্টার্ট দিয়ে রণজিৎ চালিহা ঘাড় ফিরিয়ে আবার একবার দেখে নিল ওকে। বিশ-তিরিশ গজ এগিয়ে সামনের দিকে চোখ রেখে হালকা গলায় জিজ্ঞাসা করল, এই পোশাক তোমাকে মিসেস রাই প্রেজেন্ট করেছেন নিশ্চয়?

সকালের ভালো লাগার সুর তাল মান সব একসঙ্গে কেটে গেল। বাপী ছোট্ট জবাব দিল, হ্যাঁ।

—আই অ্যাম সো গ্ল্যাড। ইউ ডিজারভড ইট। ওটা যে পরত সে আমার কত কাছের মানুষ ছিল তুমি জানো না বোধ হয়।

ঘাড় ফিরিয়ে ভালো করে মুখখানা দেখতে ইচ্ছে করছিল বাপীর। তিন চার মিনিটের মধ্যে জিপ তার গেটের সামনে। তার আগে চালিহা আর সেই সঙ্গে বাপীও আগের বাংলোর দিকে চোখ ফিরিয়েছে, সকাল তখন সাতটা বেজে মিনিট কতক। বারান্দামুখো দরজাই খোলা হয়নি এখনো।

বাপী আগে, চালিহা পেছনে। বারান্দায় উঠে চেয়ার এগিয়ে দিতে তেমনি সপ্রতিভ অন্তরঙ্গ সুরে চালিহা বলল, দাঁড়াও তোমার কোয়ার্টারস দেখি আগে, এখন পর্যন্ত দেখাই হয়নি।

বাপীর সঙ্গে ভিতরটা দেখে বাইরে এসে বসল—ফর সিঙ্গল ইটস ফাইন। বোসো—

—একটু চা খাবেন?

—চা খাই না। তোমার খাওয়া হয়েছে?

—পরে হবে। চেয়ারটা একটু টেনে বাপী মুখোমুখি বসল।

রণজিৎ চালিহা এবারে ঘটা করে চেয়ে রইল একটু। চোখে কৌতুক, ঠোঁটে হাসি। মজার কিছু ঘটে যাবার পর রসিয়ে দেখার মতো। বলল, মিসেস রাইয়ের সঙ্গে দু'দিন আমার অনেক কথা হয়েছে, সবটাই তোমার কথা বলতে পারো। তুমি অত্যন্ত হার্ট হয়ে কাজ ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছ তা শুনেছি, বাট নাও উই আর রিয়েলি প্রাউড অফ ইউ। এরকম যাচাইয়ের কেন দরকার হয়েছিল, হাতেকলমে এবার থেকে যে কাজ তুমি

করবে, তাই থেকে নিজেই বুঝে নিতে পারবে।...তাছাড়া বেইট্-এর সেই আট হাজার টাকা ব্যাঙ্কে তোমার অ্যাকাউন্টেই জমা পড়েছে যখন বুঝতেই পারছ যাচাইয়ের ব্যাপারে ক্রুয়েল হলেও হাউ জেনারাস্ আওয়ার লেডি ক্যান্ বি।

বাপী হতভম্ব। আট হাজার টাকা ব্যাঙ্কে তার নামে জমা পড়েছে! সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক। ও কিছুই জানে না বুঝলে এই লোক আবার অবাক হবে। দেখছে। ফর্সা মুখে মোলায়েম হাসি। ভদ্র, অন্তরঙ্গ। তবু ভিতরের মানুষটাকে বুঝতে বাপীর খুব অসুবিধে হচ্ছে না। সুন্দর আর নরম খাপের ভিতরের তীক্ষ্ণ ছোরা চোখে দেখা না গেলেই বা। অত মদ না খেয়ে আর একটু মাথা খাটাতে পারলেই যে গায়ত্রী রাইয়ের জীবনের খাতা থেকে বাপী তরফদারের নামটা বরাবরকার মতো মুছে দেওয়া যেত—সেই খেদ ভদ্রলোকের হাসিমাখা চোখের তারার ভিতর দিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে।

—সো? বাপী, নো হার্ড ফিলিং—ফ্রম নাও অন্ উই আর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ইকোয়ালস —আই অ্যাম্ জাস্ট সিনিয়ার—গেট্ মি?

বাপী এবার হেসে মাথা নাড়তে রণজিৎ চালিহা দরাজ হাত বাড়িয়ে ওর হাত ঝাঁকালো। তারপর চটপট কিছু কাজের কথা। আগামী পরশু সে আসাম চলে যাচ্ছে। এবারে মাস তিনেকের আগে হয়তো ফেরা সম্ভব হবে না। এবারকার এক্সপ্যানশান প্রোগ্রাম সব ওদিকে। শিলঙে নতুন ঘাঁটি করার ইচ্ছে আছে। মণিপুরেরও বাজারে ভালো খবর আছে, কিন্তু একলা আর কত দিক সামলানো সম্ভব? এবারে এদিকের সব দায়িত্ব কাঁধে নেবার মতো একজন তাদের সঙ্গে এসে গেছে যখন—চালিহার এবারে সমস্ত আসামের ফিল্ড দেখে শুনে বুঝে আসার ইচ্ছে। তার বিশ্বাস ওটাই একদিন এই ব্যবসায় মেইন সেন্টার হবে। এদিকের কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে মিসেস রাই সবই জানেন। তবু আজ আর কাল বাপী তার সঙ্গে ঘণ্টা দু'তিন করে বসে সব বুঝে নিতে পারে।

হাতঘড়ি দেখল। আটটা বাজে। এবারে ওঠার তাড়া। বাপী জিজ্ঞাসা করল, মিসেস রাইয়ের সঙ্গে দেখা করে যাবেন না?

মুখের দিকে না চেয়ে শব্দ না করে হাসল। যার অর্থ, তোমার অনেক কিছু এখনো জানতে বুঝতে বাকি বাছা। কিন্তু জবাব অমায়িক।—এ দু'দিন আমাকে কম করে চার-পাঁচ ঘণ্টা করে বসতে হবে তাঁর সঙ্গে—আমার লাঞ্চ আর ডিনারও এ দু'দিন তাঁর সঙ্গেই।

বাপীকে সঙ্গে আসার ফুরসৎ না দিয়ে নেমে গিয়ে জিপে উঠল। ওর উদ্দেশ্যে হাতটা নেড়ে দিয়ে জিপ ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল।

বাপী বারান্দায় এসে বসল আবার। পাহাড়ে গিয়ে এক দুপুরে উর্মিলার চোখে ধুলো দিয়ে এবারেও বাপী সেই জঙ্গলে গিয়ে ঢুকেছিল আর সেই গাছটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল...যেখানে বসে এক ন্যাঙটো সাধু তাকে আগে বাড়তে বলেছিল, আর বলেছিল পেয়ে যাবে। ফের তার দেখা পাবে আশা করেনি। পায়ওনি। তবু গেছল।

...এগিয়েই চলেছে বটে। এমন দুড়দাড় এগনোর ভুইফোঁড় বরাত নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য।

মনে মনে যা আঁচ করেছিল তাই। ড্রাইভার বাদশা এসে খবর দিল, ব্রেকফাস্ট রেডি, মেমসায়েব ডাকছেন। ঘরে এসে বাপী গায়ের গাউনটা খুলে ফেলল। তার এগনোটা বাইরে চট করে বেশি প্রকট না হওয়াই ভালো। একটা সোয়েটারের ওপর

আলোয়ান চড়িয়ে নেমে এলো।

তখন পর্যন্ত বারান্দায় গায়ত্রী রাই একাই বসে। নাকে সোনালি ফ্রেমের চশমা এঁটে খবরের কাগজ পড়ছে। পাশে আরো গোটা-কতক পুরনো খবরের কাগজ। এ ক'দিন কাগজের সঙ্গে যোগ ছিল না, তাই আট-দশ দিনের কাগজ একসঙ্গে নিয়ে বসেছে। টেবিলে তিনজনের তৈরি ব্রেকফাস্ট কোয়েলা সাজিয়ে দিয়ে গিয়ে থাকবে।

—বোসো। চালিহা এসেছিল? খবরের কাগজে চোখ।

এমন একখানা খবর কি-ভাবে পেশ করবে ভাবছিল বাপী। প্রশ্ন শুনেই বোঝা গেল চিফ একজিকিউটিভের সাতসকালে নিজে ড্রাইভ করে আসার পিছনেও মহিলার কেরামতি কিছু আছেই। আসবে যে সেটা তার জানাই ছিল। আরো একটু ব্যতিক্রম বাপীর কান এড়ালো না। এযাবৎ ওর কাছে চিফ একজিকিউটিভের নামের সঙ্গে 'মিস্টার' জুড়ে তার মর্যাদা উঁচিয়ে রাখা হত সর্বদা। এই প্রথম তার মুখে শুধু চালিহা শোনা গেল।

—এসেছিলেন।...আপনি তাঁকে আসতে বলেছিলেন?

এখনো খবরের কাগজের ওপরেই চোখ।—আসতে বলিনি। যা বলেছি, বোকা না হলে আসার কথা। বোকা নয় জানোই তো। পাতলা ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস স্পষ্ট হল।—তোমার বেশ সকালে ওঠার অভ্যাস তাও তাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম। খবর পেয়ে কাল রাত ন'টায় এসেছিল, তখন আর তোমাকে ডাকিনি।

বাপী চুপচাপ চেয়ে রইল তার দিকে। খবরের কাগজ থেকে মুখ না তুললে ওই মুখের দিকে চেয়ে এমনি ঠায় বসে থাকতে পারে।...পাহাড়ে বাংলোর বাগানে বেড়াতে বেড়াতে ঊর্মিলা বলেছিল, তার মা বরাবরই গম্ভীর ছিল, কিন্তু ভারী মিষ্টি ছিল। হালকা গাম্ভীর্যের আড়ালের এই মিষ্টি দিকটাই দেখার চেষ্টা বাপীর। লোভও।

খবরের কাগজ সরিয়ে রাখল। টেবিলে কি দেওয়া হয়েছে একবার দেখে নিয়ে নিজের দুধ আর কর্নফ্লেকস-এর বাটি সামনে টেনে নিয়ে বলল, আরম্ভ করো, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

—ডলি কোথায়? খুব সহজে আজ এই নামটাই মুখে এসে গেল, বন্ধুত্বের যে ভিতের ওপর ওরা দাঁড়িয়ে তাতে কোনো দুর্বলতার ফাটল আর যেন ধরতেই পারে না।

—ঠেলে তোলা হয়েছে। মুখহাত ধুয়ে আসছে। এই মেয়ের গরম খাওয়া কপালে নেই, তুমি শুরু করো। আরো শীত চড়লে নটার আগে ঘুম ভাঙবে না দেখবে।

এখানে নয়, পাহড়ের বাংলোতেও ঊর্মিলা ব্রেকফাস্টের মাঝখানে এসে হাজির হত। তারপর তার সকলের সঙ্গ ধরার তাড়া।

চামচে করে বাটির খাবার নাড়তে নাড়তে নিস্পৃহ মুখে গায়ত্রী রাই আবার জিজ্ঞাসা করল, চালিহা কি বলল?

—বললেন নো হার্ড ফিলিং এখন থেকে—দু'জনেই বন্ধু আমরা—আর সমান সমান, তবে তার মধ্যে উনি সিনিয়র।...আমার অ্যাকাউন্টে ব্যাঙ্কে আপনি আট হাজার টাকা জমা করে দিয়েছেন?

গায়ত্রী রাইয়ের ঠোঁটে আবার একটু হাসি ঝুলছিল। টাকার কথা শুনেই পিছন ঘুরে দেখলেন একবার। স-স-স!—কিপ ইট, মেয়ের কানে গেলে ঠাট্টা শুরু করে দেবে

—এমনিতেই খুব ইয়ারকি দিচ্ছে এখন।

—কিন্তু আমার খারাপ লাগছে খুব—

আরো কিছু বলার ইচ্ছে ছিল। বাধা পড়ল।

গুড মর্নিং মা। ঊর্মিলার লম্বা ঘুমের দরুন ফোলা-ফোলা মুখ মুছে আসা সত্ত্বেও ভেজা-ভেজা লাগছে। শুকনো ঝাঁকড়া চুলে মুক্তোর মতো কটা জলের ফোঁটা বসে আছে। গায়ে পা পর্যন্ত ঢাকা গরম হাউস কোট। বাপীর কাছে এসে দু'হাত কোমরে তুলে দাঁড়ালো।—ঠিক জানি তুমি এসে জুটবে। আসকারা পেয়ে একেবারে মাথায় ওঠার মতলব—কেমন?

নিরীহ মুখে বাপী ফিরে জিজ্ঞেস করল, কার মাথায়?

—কি? আমার মাথার দিকে এগোলে তোমার মাথা আস্ত থাকবে? চেয়ার টেনে নিয়ে একটা টোস্টের আধখানা কামড় দিয়ে ছোট মেয়ের মতোই চিবুতে বসল।

বাপী বলল, মায়ের তো মাথার দিকে এগনো যায় না, পায়ের দিকে ঝুঁকতে হয়।

সঙ্গে সঙ্গে ওর দিকে একটা আঙুল তুলে আর মায়ের দিকে তাকিয়ে জোরালো প্রতিবাদের চেষ্টা। কিন্তু রুটির সঙ্গে মুখে আধখানা ওমলেট গুঁজে দেবার ফলে কথার বদলে গলা দিয়ে গোঁ-গোঁ শব্দ বেরুলো শুধু। গায়ত্রী রাই ধমকে উঠল, এই মেয়ে—গলায় আটকাবে।

মুখের জিনিস গোগ্রাসে তল করে চেঁচিয়ে বলে উঠল, ফ্ল্যাটারি মা, স্রেফ ফ্ল্যাটারি—এই করেই তোমাকে ঘায়েল করেছে।

—মা অত সহজে ঘায়েল হয় না, তুই তাড়াতাড়ি খেয়ে চা-টা ঢাল, জুড়িয়েই গেল।

কিন্তু মেয়ের কোনো তাড়া নেই। এই সকালে বাপীকে দাপটে রাখার মেজাজ যেন। আর এক দফা ডিম রুটি তল করে ঝাঁঝালো গলায় বলল—এই ছেলে, কাল রাতে কোয়েলা তোমার ডিনার নিয়ে গেছল?

—গেছল।

—আজ আর কাল রাতেও যাবে, পরশু থেকে রাতে তুমি এখানে খেতে আসবে। তোমার সকালে আপিস বলে কোয়েলা শুধু রোজ লাঞ্চটা দিয়ে আসবে। কাল রাতেই কোয়েলার ওপর মায়ের এই হুকুম হয়ে গেছে।...আর মনে হয় তোমাকে খরচ টরচও কিছু ধরে দিতে হবে না।

এই গোছের প্রস্তাব আগেও এসেছে। বাপী নাকচ করেছে। শোনার পর এখনো বিব্রত বোধ করছে না এমন নয়। কিন্তু আর আপত্তি করাটা আরো বেশি বেমানান।

গম্ভীর টিপ্পনীর সুরে গায়ত্রী রাই বলল, আর ওর রেঁধে খাওয়া নিয়ে তুই কি বলেছিলি?

—বলবই তো। বাপী রান্নায় বসেছে দেখলে আমার মেয়েছেলের মতো লাগে। তারপরই খিলখিল হাসি। হাসির দমকে টেবিলের ডিশ ওলটানোর দাখিল।—সত্যি মা, সবই হল, একটু কেবল বাকি, বেচারী কোয়েলা...

মেয়ের দিকে চেয়ে অল্প অল্প হাসছে তার মা-ও। কাকে ছেড়ে কাকে দেখবে বাপী। গায়ত্রী রাইয়ের মুখের ওপরেই হঠাৎ দু' চোখ হোঁচট খেল একপ্রস্থ। মেয়েকে জব্দ করার মতোই কিছু যেন বলতে পারে, কিন্তু বলছে না। কি কি কি? বাপীর মন অনেক সময়

অনেক কিছু তাকে আগাম বলে দেয়। সেই মনের দিকে তাকাবে?

না। এমন প্রশ্রয় দেবে না। তাছাড়া গায়ত্রী রাইয়ের মুখের দিকে বা চোখের দিকে চেয়ে চকিতে যা মনে হয়েছে তা সত্যি হোক মিথ্যে হোক, বাপীর কাছে তার কানাকাড়িও দাম নেই। যত সব আজগুবি কল্পনা।

কোয়েলা খাবারের ডিশগুলো নিতে আসতে গায়ত্রী রাই চিরাচরিত গাম্ভীর্যের খোলসে ঢুকে গেল। বাপীকে জিজ্ঞাসা করল, চালিহা আর কি বলল?

জবাব দেবার আগেই ঊর্মিলার আর এক দফা খাবি খাওয়ার দাখিল।—এর মধ্যে আঙ্কল-এর সঙ্গে কখন দেখা হল আবার?

গায়ত্রী রাইয়ের পাতলা ঠোঁটে হাসির দাগ পড়ল আবার। কোয়েলা চলে যেতে জবাব দিল, আজ ভোরেই বাপীর বাংলোয় এসে ওর সঙ্গে দেখা করে গেছে।

ঊর্মিলা একবার বাপীর দিকে তাকালো, তারপর বড় বড় চোখ করে মায়ের দিকে। —সত্যি মা, তুমি একখানা মেয়ে বটে!

বাপী জানালো, আজ আর কাল এদিকের সব কাজ বুঝিয়ে দেবেন বললেন। আর আসামের এক্সপ্যানশন প্রোগ্রামের আভাস দিলেন...তাঁর ধারণা, কালে দিনে আসামই আমাদের বিজনেসের মেইন সেন্টার হবে।

খুব ধীর ঠাণ্ডা গলায় গায়ত্রী রাই বলল, কালে দিনে আমরা আসামকে সারেন্ডার করব ধরে নিয়ে তুমি এদিকের অর্গানিজেশন কতটা মবিলাইজ করতে পারো দেখো! তাকে মুখে কিছু বলার দরকার নেই। একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, মাস তিনেকের আগে সে ফিরছে না, এ সময় পর্যন্ত জিপটা তুমি ব্যবহার করতে পারো। এর মধ্যে ড্রাইভিংটাও শিখে নাও।

গায়ত্রী রাই খবরের কাগজ টেনে নিল। ঊর্মিলার মুখে চাপা আনন্দের ছটা, চোখে চকিত চপল ইশারা। বাপী জিপের দখল পেলে আর ড্রাইভিং শিখলে ওরই যেন মস্ত সুবিধে।

উঠে পড়ল।—মা তুমি তো এখন বেরুচ্ছ না, আপাতত আমি তোমার ভ্যানটা একটু ব্যবহার করছি—একটু ঘুরে আসব, বেশি দেরি করব না।

অনুমতির অপেক্ষা না রেখে ভেতরে চলে গেল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফ্রকের ওপর গরম জামা চাপিয়ে বেরিয়ে এলো। ভালো মাথা আঁচড়ানোরও সময় নেই। বাপীর উদ্দেশে একটু হাত নেড়ে দিয়ে মায়ের চোখ এড়িয়ে টক-টক করে নেমে গেল।

ভ্যানটা চোখের আড়াল হতে গায়ত্রী রাইয়ের ঠাণ্ডা দু' চোখ বাপীব মুখের ওপর। —কোথায় গেল বুঝতে পারছ?

বাপীরই ফ্যাসাদ। ঢোঁক গিলে জবাব দিল, বোধ হয় রেশমার ওখানে...

রাগ না বিরক্তি না, আরো একটু গম্ভীর শুধু।—ও নেই ভালোই হল। তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।...মিরিকে বিজয় মেহেরার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে বলেছিলে, তার সম্পর্কে তোমার নিজের কি ধারণা?

বিপাকে পড়লেও বাপী সত্যি জবাবই দিল।—ধারণা ভালই।

—ডলির মুখ চেয়ে কিছু বলার দরকার নেই, তুমি আমার সঙ্গে কথা কইছ। এই মুখ সদয় নয় একটুও।—কতটা সময় দেখেছ তাকে যে এক কথায় সার্টিফিকেট দিয়ে দিলে?

আবারও আমতা আমতা করে বাপী জবাব দিল, আমি তো ধারণার কথা বললাম...কথাও অবশ্য বেশ খানিকক্ষণ হয়েছে।

—কি কথা?

—নিজের প্ল্যান-প্রোগ্রামের কথা বলছিল।

—কি প্ল্যান-প্রোগ্রাম, আরো ডিগ্রি পকেটে নিয়ে এলেও আমি চাইলে এই ব্যবসায় ভিড়বে?

—ভিড়বে না বলল।

গায়ত্রী রাইয়ের চাউনি স্থির, তীক্ষ্ণ। এবারে এই জবাবই আশা করেছিল। একটু চুপ করে থেকে আবার জিগ্যেস করল, দেখে কি মনে হল, ড্রিঙ্ক ট্রিঙ্ক বেশি করে?

—সিগারেট একটু বেশি খায় দেখলাম। ড্রিঙ্ক-এর কথা আমিই তুলেছিলাম। মাত্রা ছাড়িয়ে খায় না বলল।

ওই মুখের যে কঠিন রেখাগুলো খুব চেনা বাপীর সেগুলোই দাগ কেটে বসতে লাগল।—গোড়ায় কারো মাত্রা ছাড়ায় না, শেষে কেউ মাত্রার মধ্যে থাকেও না। শোনো, তোমার কথায় আপাতত আমি চুপ করে আছি—ট্রাই টু গেট হার অফ দ্যা হুক এনিহাউ, যে নেশা আমার স্বামীকে কেড়ে নিয়েছে সে নেশা যে ছোঁবে তাকে আমি আমার মেয়ের ধারে কাছে ঘেঁষতে দেব না! পাহাড়ে তুমি আমাকে বলেছিলে, সেই ছেলেকে হটানোর রাস্তা বার করা যায় কিনা তার সঙ্গে দেখা করার পিছনে সে চিন্তাও তোমার মাথায় ছিল। ...তিন বছরে আপনি যদি সব মিটে যায়, ভালো—নয়তো মাথায় রেখো।

মহিলার মুখখানা আবারও খুব ভালো করে দেখে নেবে বাপী? যা বলল তার পিছনে তার কোনো ইঙ্গিত খুঁজবে?

চিন্তাটা মন থেকে ঝেঁটিয়ে সরালো বাপী।

ঘণ্টা দুই কাজ বোঝালো রণজিৎ চালিহা। সবই যে সুড়ঙ্গ পথের কারবার এমন নয়। অনেক রকম মাদক জিনিস লেনদেনের বৈধ পরোয়ানাও আছে। সব বড় পাইকারি খদ্দেরেরই লাইসেন্স আছে। হোলসেল ডিলার হিসাবে তাদের প্রাপ্য মাল সরবরাহের ব্যাপারে কোনো বাধা নেই। আবার কারচুপির বড় ফাঁকটাও সেইখানেই। প্রাপ্যর দ্বিগুণ নিচ্ছে কেউ, কেউ তিন গুণ, কেউ পাঁচ গুণ। বাড়তি সাপ্লাইয়ের এই বিশাল ব্যাপারটা চলছে মুখের কথায়। কাগজ-কলমের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। ফলে টাকা গুনে নিলে মাল দেবার পরে রাই অ্যান্ড রাই ডিলারের দায় শেষ। পাইকিরি খদ্দেররা এই বাড়তি মাল কোন পথে কিভাবে পাচার করছে তা নিয়ে রাই অ্যান্ড রাইয়ের মাথাব্যথা নেই। এই বাড়তি মাল বাঁধা দামের কিছু কমে ছেড়ে কড়কড়ে নগদ টাকা গুনে নিয়ে আসতে হবে। নেপাল, সিকিম, ভুটান, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, কুচবিহার আর বিহারের দ্বারভাঙ্গায় সমস্ত রকম মাল চালানের বড় ঘাঁটি। ব্যবসায়ের তারাই আসল পাইকিরি খদ্দের, সব লেনদেন এখন থেকে রিজিয়ন্যাল চিঠিও চলে গেছে।

সেই সব অফিসিয়াল চিঠির কপি দেখাবার সময় বাপীর মনে হল ক্রূর খেদে রণজিৎ চালিহার দু' চোখ ছুরির ফলার মতো চিকচিক করছে। আশ্চর্য কিছু নয়। এই বাঁকা পথে

যে পরিমাণ টাকা আমদানির আভাস পেল, বাপীরই কান-মাথা গরম হবার দাখিল।

সাড়ে বারোটার একটু আগে রণজিৎ চালিহা বেরিয়ে গেল। মিসেস রাইয়ের ওখানে লাঞ্চ আর আলোচনা। বাপীও সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পকেটে চেকবই আর পাশবই। মানুষ বশ করার একটাই তুরুপের তাসের ওপর তার বিশ্বাস। চা-বাগান এলাকায় ব্যাঙ্ক। খোঁজ নিয়ে দেখল, ক'দিন আগে তার সেভিংস অ্যাকাউন্টে আট হাজার টাকা জমা পড়েছে। চেক কেটে নগদ এক হাজার টাকা তুলল তার থেকে।

বিকেলে আপিস-ফেরতা সোজা রব্বানীর ডেরায়। এই ক'টা দিন বাপীর অপেক্ষায় ওরা বোধ হয় উন্মুখ হয়ে ছিল। আবুর আর তর সয় না।—কি ফয়সলা হল—ভালো কি মন্দ?

দুলারিও শোনার আশায় উদগ্রীব। বাপী জবাব দিল, আমি তো বলেই গেছলাম, যে ফয়সলা হোক ভালো হবে।' পকেট থেকে হাজার টাকার গুলিটা বার করে দুলারির হাতে ধরিয়ে দিল।—এ টাকা সাবধানে তুলে রাখো, হাজার টাকা আছে এখানে।

টাকার ধাক্কা দেখার জিনিসই বটে। দু'জনেই ওরা হাঁ। আবুরই প্রথম বিস্ময়ের বাঁধ ভাঙল।—এ কিসের টাকা? কার টাকা?

—তোমাদের আর রেশমার। এর থেকেই বুঝতে পারছ ফয়সলাটা কেমন হল। ফয়সলার পর ম্যানেজারকে জব্দ করার জন্যেই বোধ হয় আমাকে কিছু থোক টাকা দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের সকলের ওপর দিয়েই চিন্তা-ভাবনার দুর্ভোগ গেছে, তাই সব আর একলা ভোগ করি কেন, তোমাদেরও কিছু ভাগ দিলাম। এরপর মেজাজ সাফ রেখে আমরা কোমর বেঁধে কাজে না নামলে অন্যায় হবে।...এর থেকে শ'আড়াই টাকা রেশমাকে দিও আর তাকেও এই কথা বোলো। কিন্তু মেমসায়েবের মেয়েকে যেন এসব কিছু না বলে সাবধান করে দিও, সেই মেয়ে তাহলে মওকা বুঝে আবার ওকে নিয়ে কোন রাস্তায় হাঁটবে ঠিক নেই—কক্ষনো যেন না বলে। আমি বারণ করেছি জানিয়ে দিও।

আবু হঠাৎ কোমর বেড়িয়ে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে বাপীকে শূন্যে তুলে দু'-তিনটে পাক খেয়ে নিল। আনন্দ আর খুশি ধরে না—তোমার দিল বটে একখানা বাপীভাই। বাপীভাই তুমি কি জাদু জানো আমাকে বলো—শীগগির বলো।

দুলারির হাসি-উপচনো মুখখানা বেশ সুন্দর দেখছে বাপী।

ঘরের কাছে পৌঁছুতে শীতের সন্ধ্যা পার। গায়ত্রী রাইয়ের বাংলোর সব আলো জ্বলছে। রাস্তার অন্ধকার দিকটা ঘেঁষে পাশ কাটানোর ফাঁকে বাপী একবার দেখে নিল। গায়ত্রী রাই আর রণজিৎ চালিহা খুশী মেজাজে কথা কইছে। ঊর্মিলা হয়তো ভিতরে।

নিজের বারান্দা আর ঘরের আরো জ্বেলে গায়ের গরম জামাটা খুলে বাপী সোজা কম্বলের নিচে ঢুকে গেল। রাতে রান্নার তাড়া নেই। ওবাড়ি থেকে ডিনার আসবে। পরশু চালিহা চলে যাবে, রাতে তখন ওকেই যেতে হবে।

বাপীর ধারণা এই রাতে শুধু ডিনার নয়, সেই সঙ্গে হয়তো ঊর্মিলাও আসবে। হাসিই পেল। মেয়ে ওকে একজনের কাছে এগিয়ে দেবার মানুষ ভাবছে। আর তার মা ওকে সেই একজনকে দূরে হটাবার মানুষ ভাবছে।

ডিনারের সঙ্গে নয়, বারান্দা আর ঘরের আলো দেখে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দুপদাপ পা ফেলে ঊর্মিলা এসে হাজির।

—মিষ্টি মিষ্টি মিষ্টি—মিষ্টি কেমন মিষ্টি? কত মিষ্টি?

আচমকা প্রচণ্ড একটা ঘা খেয়েই যেন আস্তে আস্তে উঠে বসল বাপী। ঊর্মিলার মুখে দুষ্টুহাসি চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে।

—কি ব্যাপার?

—কি ব্যাপার? তেড়ে সামনে এগিয়ে এলো ঊর্মিলা।—সেই বাচ্চা বয়েস থেকে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ, এখন ধরা পড়ে কি ব্যাপার?

বাতাস টানতেও বুকে লাগছে বাপীর।—তোমাকে কে বলল?

—রেশমা। অনেক দিন আগে আবুর মুখে জঙ্গলসাহেবের মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলেবেলার জমাটি প্রেমের কাণ্ড-মাণ্ড শুনেছিল। আবুটাকে ধরতে পারলে বেশ হত, তার নাকি ধারণা তুমি সেই মেয়ের প্রেমে মজে আছ। সেটা যে সত্যি আমিও হলপ করে বলতে পারি—নইলে তিনকূলে তোমার কেউ নেই বলো অথচ আমাদের বাংলোয় এসে কাগজে কলকাতার প্লেগের খবর পড়ে মূর্ছা যেতে বসেছিলে কার ভাবনায় মশাই? আমাকে সব বলবে কি বলবে না, জানতে চাই—না বললে মাকে দিয়ে জিগ্যেস করাবো।

আবুর দোষ নেই, ছেলেবেলার গল্প করতেই পারে। তবু মনে মনে বিষম বিরক্ত বাপী।—কি বলব যদি শোনো এ ক'বছরের ফাঁকে সেই মেয়ের কাছে আর কেউ এসে গেছে, আর আমি দূরে সরে গেছি—তাহলে?

বাপীর মুখ দেখে হোক বা কথা শুনে হোক ঊর্মিলা ভেবাচাকা খেল একটু তারপরেই ঝলসে উঠল।—মরদ হলে সেই ছেলে বা মেয়ের একটাকে তুমি গলা টিপে মারবে।

—তুমি তাই করবে ঠিক করেছ?

থতমতো খেল।—তার মানে?

—মানে ঘরে গিয়ে ভাবোগে যাও। আমি বেজায় ক্লান্ত এখন।

আবার শুয়ে পড়ার ফাঁকে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে ঘরের আলো নিভিয়ে দিল। বারান্দার আলো জ্বলছে। বেগতিক ঊর্মিলা পায়ে পায়ে প্রস্থান করল।

সঙ্গোপনের ক্ষতটা কেউ সজোরে আঁচড়ে দিয়ে গেল। বুঝে দিক বা না বুঝে দিক, রক্ত ঝরবেই। দিনের শুরু থেকে আজ খুশির পথে পাড়ি জমিয়েছিল বাপী। শেষটুকু এমন হবে ভাবেনি।

## আঠারো

জিপ থেকে নেমে বাপী বাংলোটার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল খানিক। বানারজুলি জঙ্গলের বড়সাহেবের বাংলো। বারো বছরের এক ছেলের চোখে যেটা রূপকথার দেশের কোনো নিষেধের বাড়ির মতো।—রূপকথার সব নিষেধই শুধু ভাঙার জন্য। সেই ছেলেও ভেঙেছিল। তারপর দু'বছর ধরে ভেঙেই চলেছিল। তারপর পিঠের চামড়া ফালা-ফালা। জিভে রক্তের স্বাদ।

এখন নিষেধ নেই। কোনো বড়সাহেব বা মহারানীর রক্তচক্ষু নেই। তাদের কাপুরুষ

ছেলের দামাল শাসন নেই। সবার মধ্যমণি যে, এই পুরীতে সেই মেয়েও নেই।...আষ্টে-পৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরা স্মৃতির তবু লয়-ক্ষয় নেই।

একজন বেয়ারা ছুটে এলো। সেলাম ঠুকে গেট খুলে দিল। দেবেই। ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল। তার ওপর জিপে এ সেছে। পরনে দামী গরম প্যান্ট কোট শার্ট, গলায় ঝকঝকে টাই, পায়ে চকচকে শু। ওদের বড় সাহেবের কাছে ছোট কেউ আসেনি।

বেয়ারার হাতে কার্ড দিয়ে বাপী ড্রাইভারকে বলল, ফাইল আর সঙ্গের প্যাকেটটা পৌঁছে দিয়ে আসতে। ফাইলে কিছু প্ল্যান, জঙ্গলের নকসা, আর একটা দরখাস্ত। প্যাকেটে দুটো দামী হুইস্কির বোতল। আবুর কাছ থেকে জেনে নিয়েছিল তার বড় সাহেবও রসিক মানুষ।

বড় সাহেব মধ্যপ্রদেশের মানুষ। মাঝবয়সী। কার্ড হাতে বেরিয়ে এলো। জিপ, রিজিয়ন্যাল ম্যানেজারের বেশবাস আর চেহারাপত্র দেখে হেলাফেলার লোক ভাবা গেল না। তার ওপর গায়ত্রী রাইয়ের নাম ভালোই জানে, আর রসের দোসর হিসেবে রণজিৎ চালিহাকেও খুব চেনে। উপহারের প্যাকেট দেখে মুখে বিড়ম্বনা। এ-সবের কি দরকাব ছিল ইত্যাদি। দশ মিনিটের মধ্যে বাপীর কথা শেষ। সদয় বিবেচনার প্রতিশ্রুতি লাভও। রাই অ্যান্ড রাইয়ের আর্জি সামান্য। এত বড় জঙ্গলের কত জায়গা অকেজো পড়ে আছে। সেখানে কোন কোন হার্বের চাষ হতে পারে আর কত রকমের প্রয়োজনে সে-সব দরকার ইত্যাদি। ব্যবসা হলেও জনসেবারই কাজ। সুবিধে দরে লীজ পেলে আপাতত কোথায় কতটা পড়ো জংলা জমি নিজেরা সাফ করিয়ে নিয়ে টেস্ট-কেস হিসেবে কাজে নামা যেতে পারে তার ফিরিস্তি। এতে জঙ্গলও কিছুটা পরিচ্ছন্ন হবে।

দরখাস্ত রেখে বড় সাহেব আশ্বাস দিল, যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, ডি-এফ-ওর এতে আপত্তি হবে বলে মনে হয় না।

এই লোক তুষ্ট যখন, আপত্তি হবে না জানা কথাই। হুকুম আসার আগেই বাপীর প্ল্যানমতো আবু লোক যোগাড় করে কোমর বেঁধে কাজে লেগে গেল। তার উৎসাহ এখন দেখার মতো। জঙ্গলের বহু মেহনতী মানুষ তার হাতে মজুত। বড় সাহেবের সায় আছে যখন, বাড়তি কিছু পেলে উপরি কাজ তারা সানন্দে করবে।

জঙ্গলের চার-পাঁচ জায়গায় এমন তড়িঘড়ি কাজ শুরু হয়ে যেতে দেখে গাম্ভীর্যের তলায় গায়ত্রী রাইয়ের পরিতুষ্ট মুখ। কিন্তু সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ফ্রেন্ডএর এমন কাজ নিয়ে ডুবে থাকা তার মেয়ের পছন্দ নয়। ফাঁক পেলেই তাড়া দেয়, মা তোমাকে ড্রাইভিং শিখে নিতে বলেছে, সেটা কবে হবে? না কি ভয় ধরেছে।

জিপ এখন বাপীর জিম্মায়। কিন্তু ড্রাইভার নিয়ে ঊর্মিলার মিরিকে যাবার সাহস নেই। মা সক্কলের থেকে কথা বার করে নিতে ওস্তাদ। বিশ্বাস কেবল ফ্রেন্ডকে।

জিপ হাতে আসার পরদিন থেকেই খুব ভোরে বাদশাকে নিয়ে ড্রাইভিং শেখা শুরু হয়ে গেছে, ঊর্মিলার তা জানার কথা নয়। কারণ ওর দিন শুরু তারও তিন ঘণ্টা বাদে। সকালের আলো পরিষ্কার হবার সঙ্গে সঙ্গে বাদশা জিপ নিয়ে আসে। ঘণ্টা দুই মহড়ার পরে চলে যায়। ফাঁকা রাস্তা, এরই মধ্যে হাত বেশ পাকা হয়েছে বাপীর। শুধু জিপ নয়, এক এক দিন ভ্যান নিয়েও বেরোয়। বাদশা বলেছে এই ভ্যানের গীয়ার আর মোটর

গাড়ির গীয়ারে কোনো তফাৎ নেই। তাই ভ্যানে হাত পাকা হলে মোটরও চালাতে পারবে।

ঊর্মিলার ড্রাইভিং শেখার তাগিদে একটা আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছিল বাপী।—দেখাশোনার ব্যাপার তো দিব্যি চলছে, ড্রাইভিং শেখার পর দলে টেনে মাঝখান থেকে আমাকে ফাঁসাতে চাও কেন?

জলের মাছ খপ করে ডাঙায় তোলা হয়েছে।—তুমি জানলে কি করে?

বাপীর স্বীকার করেছে, জানত না, এইবার জানল।

চালাকির ফাঁদে পড়ে ঊর্মিলা শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছে, ডিসেম্বরের এই ছাব্বিশ-সাতাশ দিনের মধ্যে দু'দিন মাত্র দেখা হয়েছে। ওর চিঠি পেয়ে বিজয় এসেছিল। সামনের সপ্তাহে আবার আসার কথা আছে।

রেশমা তার ঘর ছেড়ে দেয়?

—ধেৎ! চিঠিতে আমিই এক-একদিন এক-এক জায়গায় ওকে আসতে বলে দিই।

সামনের মাসের শেষে কত দূরে চলে যাচ্ছে, দু'জনেরই ওদের নাকি ভয়ঙ্কর মন খারাপ।

—তোমার সঙ্গে এখন তাহলে ঝগড়া করছে না?

—না। আর ঝগড়া করে কি করবে।

- ছেলেটা বোকা দেখছি। বাপীর গম্ভীর মন্তব্য।

—কেন?

—ঝগড়া করলে তো ওর বেশি লাভ হয়।

ইঙ্গিত বুঝে মুখ লাল করে ঊর্মিলা তেড়ে এসেছে।

জানুয়ারির গোড়ায় শিলিগুড়িতে ড্রাইভিং টেস্ট দিয়ে লাইসেন্স পকেটে করে বাপী নিজেই জিপ ড্রাইভ করে গায়ত্রী রাইয়ের বাংলোয় এসে ঢুকেছে। মা মেয়ে অবাক যেমন, খুশিও তেমনি। বাপী ঊর্মিলাকে প্রস্তাব দিল, চলো তোমাকে ঘুরিয়ে আনি একটু। স্বচক্ষে লাইসেন্স দেখেও ঊর্মিলার ভয়।—নিয়ে গিয়ে শেষে মারবে না তো!

খানিক বাদে ডবল আনন্দ।—দিব্যি পাকা হাত হয়ে গেছে দেখি যে—অ্যাঁ?

এরপর রোজই প্রায় মিরিকে নিয়ে যাবার বায়না ওর। এই বিপাকে পড়তে হবে বাপী জানত। কাজের অজুহাতে আজ নয় কাল নয় করে ক'টা দিন কাটিয়ে দিয়েছে। ঊর্মিলা শেষে রেগেই গেল। দু'দিন বাদে কোথায় কত দূরে চলে যাচ্ছে ছেলেটা অথচ ফ্রেন্ডের এতটুকু গা নেই।

শেষে নিয়ে গেল একদিন। মেয়ে তার সঙ্গে বেরুলে গায়ত্রী রাই কিছু বলে না, কোথায় যাচ্ছে তাও খোঁজ করে না। তাইতেই তলায় তলায় বাপীর আরো অস্বস্তি। মহিলার হাবভাব স্পষ্ট, দায় তোমার, তুমি বোঝো। ওদিকে ঊর্মিলার কথাতেই বিজয় মেহেরারও ওর ওপর অগাধ বিশ্বাস, সেও তাকে সত্যিকারের ফ্রেন্ড ভাবে। তার সামনেই ওদের বোঝাপড়া শুনল। মাঝে একদিন বিজয় বানাবজুলি আসবে। আর তার কলকাতায় রওনা হবার আগের দিন ঊর্মিলা আবার মিরিকে আসবে বাপীকে নিয়ে। কলকাতা থেকে লন্ডন রওনা হবার আগে এ-যাত্রায় সেটাই শেষ দেখা। বাপীর সায় না দিয়ে উপায় নেই। কথা দিল নিয়ে আসবে।

কথার খেলাপ করল না। বাপীর আপিসের সময়—ঊর্মিলাও খেয়েদেয়ে প্রস্তুত।

মাকে জানিয়েছে বাপীর সঙ্গে এক জায়গায় যাচ্ছে, ফিরতে দেরি হতে..পারে। গায়ত্রী রাই এবারও কিছু জিগ্যেস করেনি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে একসঙ্গে দু'জনকে রওনা হতে দেখেছে।

বাপী ওকে মিরিকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসেছে। আবার কথামতো বিকেলে গিয়ে নিয়ে এসেছে। মেয়ের মুখ শুকনো, চোখ লাল। কান্নাকাটিও করেছে বোধ হয়। বিজয় মেহেরার বিষণ্ণ মুখ। বাপীকেই জিজ্ঞাসা করল, বিলেত থেকে চিঠি পাঠালে কোন্ ঠিকানায় পাঠাবে। বাপীর ভেতরটা সত্যি সদয়। ভেবে-চিন্তে বলেছে, লন্ডনের ঠিকানা দিয়ে প্রথম চিঠি আমার নামে পাঠাও। পিছনে তোমার নাম দেখলে ওকে দিয়ে দেব। তারপর কোন ঠিকানায় লিখবে ঠিক করে ডলিই তোমাকে জানাবে।

সেই সন্ধ্যাতেই গায়ত্রী রাই ওর বাংলোয় এলো। যেমন গম্ভীর তেমনি ঠাণ্ডা।—মিরিকে গেছলে?

সাদা মুখ করে বাপী জবাব দিল হ্যাঁ।

এতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ওদের সঙ্গে ছিলে?

এবারেও বাপী সত্যি জবাব দিল।—না, ডলিকে ছেড়ে এসে আবার বিকেলে গিয়ে নিয়ে এসেছি।

গলার স্বর ঈষৎ কঠিন।—কাজটা ভালো করলে?

—তা না হলে অশান্তি হত। তিন বছর ধরেই আক্রোশ পুষত।

যুক্তি অগ্রাহ্য করতে পারল না। আবার ঠাণ্ডা।—সেই ছেলে কবে রওনা হচ্ছে?

—কাল ভোরে।

ঠিক আছে। এবার থেকে তোমার চেষ্টা তুমি করো।

চলে গেল। একরাশ অস্বস্তি যেন সঙ্গে সঙ্গে ছেঁকে ধরল বাপীকে। যা বলল তার সাদা অর্থ, মেয়ের মন থেকে এবারে আস্তে আস্তে ওই ছেলেকে হটাতে চেষ্টা করো। অস্বস্তি। ভিতরে অনাগত কোনো আশঙ্কার ছায়া।

কিন্তু এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর ফুরসৎ বাপীর সত্যি নেই। সমস্ত ফেব্রুয়ারি মাসটা জলপাইগুড়ি পশ্চিম দিনাজপুর মালদহ কুচবিহার আর দ্বারভাঙার বড় ঘাঁটিগুলিতে ঘুরেছে। আগে রণজিৎ চালিহা আসাম সফলে বেরুলে গায়ত্রী রাই দু'পাঁচ দিনের জন্য বেরিয়ে কিছুটা ঠেকা কাজ চালিয়ে দিত। কিন্তু নগদ বিনিময়ে কালো মাল অর্থাৎ বাড়তি মাল লেন-দেনের ব্যাপারে তাকে প্রকাশ্যে দেখা যেত না। চালিহার অনুপস্থিতিতে মাল ঠিক-ঠিকই যেত, লেন-দেনের ফয়সলা সে ফিরে এলে হত। কাজে নামার পর বাপী এই দায়িত্ব হাতছাড়া হবার দরুন রণজিৎ চালিহার খেদের কারণ বুঝেছে। কেউ যদি মাথা খাটিয়ে এই লাভের ওপর বড়সড় থাবা বসাতে চায় এমন মওকা আর হয় না। গায়ত্রী রাইয়ের বিশেষ নির্দেশে সর্বত্র সব থেকে বড় হোটেলে থেকেছে, শাঁসালো মক্কেলদের ডিনার-লাঞ্চে ডেকেছে, মাটিতে পা ফেলেনি, ট্যাক্সি বা মক্কেলের গাড়িতে ঘুরেছে। ফার্মের সুনাম তো বটেই, কিছুটা নিরাপত্তার কারণেও এই চালে থাকার রীতি। যদিও দেশভাগের এই দু' বছরের মধ্যে কড়াকড়ির রক্তচক্ষু কোথাও তেমন দেখা যেত না।

একটা মাস নানা ঘাঁটিতে ঘুরে দফায় দফায় সর্বসাকুল্যে তেরো হাজার হিসেবের

আর চৌত্রিশ হাজার হিসেবের বাইরের টাকা গায়ত্রী রাইয়ের হাতে তুলে দিয়েছে। মহিলা মুখে কিছু বলেনি, কিন্তু বাপী অনায়াসে আঁচ করতে পেরেছে, সুড়ঙ্গপথের টাকার অঙ্কটা এবারে বেশি। এদিকের সফর শেষে সেই চৌত্রিশ হাজার টাকা থেকে গায়ত্রী রাই হিসেব করে পাঁচ হাজার একশ টাকাটা বাপীর হাতে তুলে দিল। এ নাকি তার প্রাপ্য। এ-টাকার পনের পারসেন্ট চালিহা পেত। বাপীও তাই পাচ্ছে। ঠাণ্ডা মুখে সতর্কও করে দিল, বোকার মতো এর সব টাকা আবার এখানকার ব্যাঙ্কে রাখতে যেও না।

ভাগ-বাঁটোয়ারার এদিকটা বাপীর জানা ছিল না। মাথায় হিসেব ঢুকলে তার নিষ্পত্তির দিকে ঝুঁকবেই। সব খরচ-খরচা বাদ দিলে ওই চৌত্রিশ হাজারের অর্ধেক অন্তত ছাঁকা লাভ। সতের হাজার টাকার মধ্যে পাঁচ হাজার একশ এলো বাপীর ভাগে। মহিলার ছাঁকা লাভের ভাগ তাহলে এগারো হাজার ন'শ টাকা? শুধু এই নয়, ব্যবসার আরো তো কত দিক আছে। এতদিন ধরে মোটামুটি এই হারে টাকা পেয়ে এসে থাকলে তার কত টাকা? ওকে সতর্ক করা হল, কিন্তু নিজে এত টাকা রাখছে কোথায়? দেশের বাইরে অর্থাৎ নেপাল ভুটান বা সিকিমে অবশ্যই তার পক্ষে মোটা টাকা সরিয়ে রাখা সম্ভব। আর এদিকেও হয়তো নানা জায়গার ব্যাঙ্কে টাকা ছড়ানো আছে। তবু আনুমানিক হিসেবের মধ্যে ঢোকার ফলে বাপীর ধারণা, ব্যাঙ্কে ঠাঁই হয়নি এমন বহু টাকাও মহিলার কাছে মজুত আছে।

পরের মাসের সফর ভুটান সিকিম নেপাল। ফাঁক পেলে এসব জায়গায় গায়ত্রী রাই নিজেই গিয়ে থাকে। কাজকর্মের ব্যাপারে এসব এলাকায় ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের প্রতিপত্তি বেশি। কাজের সুবিধের জন্য এর প্রতিটি জায়গায় একজন দু'জন করে মেয়ে এজেন্টও আছে। তাছাড়া এসব এলাকায় তেমন বড় ঘাঁটি বলতে কিছু নেই, খুচরো কারবারের টান প্রচুর। ছেলেদের থেকে এ-ব্যাপারে মেয়েরাই বেশি নির্ভরযোগ্য। গায়ত্রী রাই এবারে এলো না। শরীরটা খুব ভালো নেই বলল। বানারজুলির চা-বাগানের ডাক্তারের আনাগোনাও দেখেছে এক-আধবার। ঊর্মিলার মুখে শুনেছে মায়ের মাঝে মাঝে কেমন শ্বাসকষ্ট হয়। তবে ডাক্তার বলেছে বিশেষ কিছু না।

কিন্তু মহিলার প্ল্যান সাফ। যে কারণ দেখিয়ে রণজিৎ চালিহা রেশমাকে আসামে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, সেই কারণেই ওকে এবারে বাপীর সঙ্গে পাঠিয়ে দিল। আবার সাপ ধরার সময় এসেছে। অনেক লোক আছে এজন্যে, দু'চার মাস ও না থাকলে সত্যি এমন আর কি অসুবিধে হবে। রোজগার যখন ডবলের বেশি, রেশমাও নতুন কাজে ভিড়তে এক পায়ে তৈরি। বাপী আর রেশমার সঙ্গে সেখানকার এজেন্টদের যোগাযোগের ব্যবস্থা ঝগড়ু করে দেবে। পাহাড়ের বাংলো থেকে তাদের কাছে খুচরো মাল চালান রেশমার মারফৎ ভালো হবে। আর ওসব জায়গা থেকে বাছাই মদ রেশমাই বাংলোয় এনে তুলবে। ঝগড়ু তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে। জিপে হোক ভ্যানে হোক দরকার মতো রেশমাই সে-সব বানারজুলিতে নিয়ে আসবে। আবু রব্বানীর মারফৎ সেসব চা-বাগানের ক্লাবে বা অন্যত্র চালান দেওয়া হবে। বাপীর শুধু তদারকের ভার।

রেশমা সঙ্গে চলল দেখে ঊর্মিলার জিভ সুড়সুড় করে উঠেছে। কপট উদ্বেগে মুখ মচকে ছুবলোতে ছাড়েনি।—ওই পাজী মেয়ের তো তোমার ওপর এত ভক্তি এখন যে সুযোগ পেলে জিভে করে পা চাটে—মা যে কি ফ্যাসাদের দিকে ঠেলে দিল তোমাকে

কে জানে। ওদিকে দুলারির মতো গম্ভীর মেয়ে পর্যন্ত মুখ টিপে হেসেছে। বলেছে, যাবার আনন্দে রেশমা হাত-পা তুলে নাচছে—আমি অবশ্য সাবধান করে দিয়েছি বেশি নাচানাচি করলে বাপীভাই ঠ্যাঙ ভেঙে দেবে।

ঠাট্টা ঠাট্টাই। বাপী তবু অস্বস্তিই বোধ করেছে। নিজেকেই সব থেকে কম বিশ্বাস করে, তাই অবস্তি। তাছাড়া ঊর্মিলা বাড়িয়ে বলেনি খুব। সমস্ত দুর্যোগ কাটিয়ে উঠে ভাগ্যের এই মুখ দেখার ফলে ওই সাপ-ধরা মেয়ের চোখে বাপীভাই সত্যিকারের দিলের মানুষ। আর অবাক মানুষ এখন। কিন্তু তা বলে জঙ্গলের বেপরোয়া মেয়ের স্বভাবসুলভ উচ্ছলতা যাবে কোথায়? আর, চালিহার মতো ভদ্রসমাজের দাপটের পুরুষেরও দুর্বলতার খবর রাখে যে মেয়ে, তার বুকের পাটাই বা কম হবে কেন? ভক্তিশ্রদ্ধা করতে পারে কিন্তু শাসনের পরোয়া করা ওর ধাতে নেই।

পাহাড়ে পৌঁছুনোর আগেই শাসন নাকচ শুরু। বাপী জিপ চালাচ্ছে। রেশমা পিছনে। হঠাৎ ডেকে বলল, বাপীভাই, গাড়িটা থামাও তো একটু—

ব্রেক কষে বাপী ঘুরে তাকালো।—কেন?

না বুঝে বাপী জীপ থামাতে চোখের পলকে নেমে সামনে দরজা খুলে পাশে বসল। —চলো। তুমি দিব্যি সব দেখতে দেখতে যাবে আর আমি খুপরির মধ্যে বসে থাকব!

বাপী সত্যি বিরক্ত।—এটা ভালো দেখাবে না, নেমে যাও।

রেশমার অবাক মুখ।—তুমি তো ওই উঁচু পাহাড়ের মতো মাথা-উঁচু মুরুব্বী আমাদের—কে কি ভাববে? তারপরেই চোখের কোণে হাসির ছুবি।—আচ্ছা পাহাড়ের কাছে এসে নেমে যাব'খন, চলো।

পাহাড়ের নিচে পৌঁছে বাপী আবার জিপ থামিয়েছে। মুখে কিছু না বলে তাকিয়েছে শুধু। গোমড়া মুখ করে রেশমা নেমে পিছনে গিয়ে বসেছে। তারপর কথা শুনিয়েছে। আবু সাহেব একবার হিসেব করেছিল বয়সে আমি তোমার থেকে প্রায় দু' বছরের বড়, বুঝলে? কেউ কিছু ভাববে না হাতি, আসলে এত বড় মুরুব্বী হয়ে তোমার মান বেড়েছে।

নতুন কাজে উৎসাহের অন্ত নেই রেশমার। এ-বেলায় কোনরকম চপলতা ছিটেফোঁটাও নেই। মুখ বুজে উপদেশ শুনেছে, নির্দেশ মেনেছে। কোন মাল কোথায় কিভাবে দিয়ে আসতে হবে, আর কোন জিনিস ঘরে এনে তুলতে হবে—ঝগড়ু আর মেয়ে এজেন্টদের কাছ থেকে তাও বুঝে নিতে সময় লাগেনি। পনের দিনের মধ্যে ঝগড়ু বা বাপীকে আর সঙ্গেও যেতে হয়নি। এজেন্টদের কাছ থেকে বাপী টাকার হিসেব আর মালের চাহিদা বুঝে নিয়েই খালাস। ভালো মদের বোতলও রেশমা সংগ্রহ করতে শিখেছে।

খুশির পরব ঝগড়ুর। দিলদার বাপীভাইয়ের কল্যাণে সাহেবসুবোদের ভোগের সেরা মাল পেটে পড়ছে। তাছাড়া ওর চোখে রেশমার মতো মেয়ে হয় না। একদিন একঘণ্টা সাপের বিষ বার করতে দেখেই, খপ করে একটা বিষাক্ত সাপের টুঁটি টিপে ধরে এনে নির্ভয়ে ওর মতো করেই গলগল করে বিষ বার করে এনেছে। সাহস দেখে ঝগড়ু যেমন তাজ্জব, তেমনি খুশি। বার বার বলেছে, তোর কথা আবুর মুখে শুনেছি, কিন্তু এমন ডাকাত মেয়ে তুই ভাবিনি। চাকর-বাকরদের আউট-হাউসে ওকে থাকতে দেয়নি, বাংলোর ভিতরেই একটা স্টোর-রুম খালি করে দিয়েছে। পাশাপাশি ওইরকম আর একটা

ঘরে নিজে থাকে। বয়েস সত্তর ছাড়িয়েছে, সঙ্কোচের বালাই নেই। বেশি বয়সে পাওয়া নিজের আদরের ছোট মেয়ের সঙ্গে খুশি-উপচনো সম্পর্কের মতো।

বাংলোয় অনেক রকমের লোক আসে। কাজ করে। আউট-হাউসে থাকেও কেউ কেউ। এই মেয়ের দিকে চোখ পড়বে জানা কথাই। কিন্তু বাপী নিশ্চিন্ত ঝগড়ুর ভয়ে কেউ কখনো ধারে কাছে ঘেঁষবে না।

কিন্তু অস্বস্তি নিজেকে নিয়েই। অবসর সময় পাহাড়ে জঙ্গলে ঘোরাটা নেশার মতো। রেশমাও তখন সঙ্গ নেবেই। হাসবে, হৈ-চৈ করবে। জঙ্গল ওরও কম প্রিয় নয়। এদিকে বসন্তকাল। বনের সর্বত্র রূপেব ঢেউ। রসের ঢেউ। অশোক পলাশে রঙের বাহার। শিমুল কৃষ্ণচূড়ার মাথা লালে লাল। বাপী বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। পালিয়ে আসে। নিজেকেই ভয়। মেয়েটা তাও বুঝতে পারে কি না কে জানে। রাতে ঝগড়ুর হাত ধরে বাগানে বেড়ায়। ফুলের গন্ধ আর বাতাসের ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যায়। পাহাড়ের কোন্ গাছে কোকিলের গলা চড়ে। স্বর নকল করে থেকে থেকে রেশমাও ভেঙচে ওঠে। হাসে খিলখিল করে। বাপী নিঃশব্দে বারান্দা থেকেও সরে আসে।

তিন সপ্তাহ বাদে বাপী একলা ফিরতে পেরে হাঁফ ফেলে বেঁচেছে। ভ্যান পাঠিয়ে মালপত্রসহ রেশমাকে আনানো হয়েছে আরো পনের দিন পরে। প্রথম বারেই কর্ত্রীর চোখে কাজের মেয়ে হয়ে উঠতে পেরেছে এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি আছেই। এখানে থাকলে সাপ ধরার কাজ, আর পাহাড়ে গেলে চারগুণ পয়সার কাজ। ভাগ্যের এমন টইটম্বুর দশায় কে না খোশমেজাজে থাকে। কিন্তু আবুর ডেরায় বাপীভাইকে দেখে ত্রাসের মুখ তার। আবুকে ছেড়ে দুলাবিব দিকে চেয়ে বলেছে, কর্তা-মানুষ সঙ্গে থাকলে কত মুশকিল জানো না ভাবী—ভয়ে সর্ব্বোক্ষণ বুক ঢিপ-ঢিপ। পাহাড়গুলোকেও ঢের নরম মনে হয়েছে সে-সময়।

আবু মুখ টিপে হেসেছে। আর পলকা ধমকের সুরে দুলারি বলছে, তুই যেমন পাজী, তোকে টিট করতে বাপীভাই-ই ঠিক লোক।

রেশমা ভালো মুখ করে চোখের কোণে তাকিয়েছে। এই পরিবেশেও অতটা সহজ হওয়া গেল না বলে মনে মনে বাপী নিজের ওপরেই বিরক্ত।

রণজিৎ চালিহা ফিরল চার মাস বাদে। দেরি হবে গায়ত্রী রাই বলেছিল। বাপীর অনুমান, এত দেরি হবার পিছনে মহিলাব কারসাজি আছে। চিঠি তো হামেশাই লিখেছে। বাড়তি কাজে আটকে রাখা কঠিন কিছু নয়। সে ফেরার পরেও গায়ত্রী রাইয়েব সতর্ক পদক্ষেপ। বুঝতে অসুবিধে হয়নি বাপীর। শরীর ভালো যাচ্ছে না বলে চালিহার সামনেই ওকে নিজের বাংলোর আপিস ঘরটা ব্যবহার করতে হুকুম করেছে। কারণ, মিস্টার চালিহার ঘর তো এখন তাকে ছেড়ে দিতেই হবে।

চালিহা ফিরে এলে তার কাজ তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে কিনা বাপী ভেবে পাচ্ছিল না। কিন্তু সে আসার পর দেখা গেল দায়িত্বের কাজ ভালোভাবে চালিয়ে যাবার জন্য একলাফে দেড়শ টাকা মাইনে বেড়েছে বাপীর। মালিকের ইচ্ছেয় চিফ একজিকিউটিভকে এখন আরো বড় দায়িত্ব নিতে হবে। বিহার আর মধ্যপ্রদেশের বাজার দখলে আনতে হবে এবার। বাপী তরফদারের তদারকের আগের তৈরি ঘাঁটিগুলো থেকে যে টাকা আসবে

তার থেকে পাঁচ পারসেন্ট কমিশন চালিহাকে দেওয়া হবে। আর মধ্যপ্রদেশ বা বিহারে যে-সব ঘাঁটি হবে তার থেকে পাবে কুড়ি পারসেন্ট। তার আসামের প্রাপ্যও পনের থেকে কুড়ি পারসেন্ট তুলে দিল গায়ত্রী রাই। এক কথায় আরো বড় দায়িত্ব, আরো বেশি স্বীকৃতি। কিন্তু লোকটা নির্বোধ নয় আদৌ। বাপী তরফদার সে ভাবে সামনে এগিয়ে আসার আগেই সে সতর্ক হতে চেয়েছিল। বাপী নিঃসংশয়, এখন এই পরিস্থিতি দেখে সে আরো সন্দিগ্ধ, আরো সতর্ক। তার বাইরের আচরণ স্নেহভাজন সতীর্থের মতো। কিন্তু দেখতে জানলে মানুষের চোখের আয়নার ভেতর দেখা যায়। অমায়িক হাসির ফাঁকে ওই দুটো চোখে ক্রূর আক্রোশের ঝিলিক দেখেছে।

এরই মধ্যে দিন দশেকের জন্য আর এক দফা পাহাড়ের বাংলোয় পাঠানো হল রেশমাকে। আগের বারে বাপীর সঙ্গে গিয়ে ও কত ভালো কাজ করেছে, গায়ত্রী রাই চালিহার কাছে সেই গল্পও করেছে। খুশিমুখে চালিহা বলেছে, মেয়েটা যে চালাকচতুর খুব এ তো সে-ই সবার আগে বুঝেছিল। কিন্তু এই খুশীর বিপরীত কিছু আঁচ করতে বাপীর অসুবিধে হয়নি। গায়ত্রী রাইয়ের সামনেই তেমনি হাসিমুখে অন্তরঙ্গ ঠাট্টা করেছে। বাপীকে বলেছে, কিন্তু তুমি ইয়ংম্যান একটু সাবধান, সাপ-ধরা মেয়ের জালে পড়ো না যেন। নিজের রসিকতায় নিজেই বেশি হেসেছে।

গায়ত্রী রাই কিছু বলেনি বাপীকে, কিন্তু রেশমা ফিরে আসার পর আবু চুপি চুপি তাকে জানিয়েছে, ম্যানেজার এর মধ্যে একদিন পাহাড়ের বাংলোয় গেছল, রাতে ছিলও। মেমসায়েবকে নাকি জানিয়েই গেছে। ভালো মদ চেনানো আর তার ঘাঁটির সন্ধান দেবার ব্যাপারে রণজিৎ চালিহা যে এক্সপার্ট একজন এ কেউ অস্বীকার করবে না। তা ছাড়া এ-সব জিনিস সরবরাহ করার মতো চেনা-জানা লোকও আছে। রেশমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। রাতে নিজে মদের বোতল খুলে বসে গল্প করার জন্য রেশমার খোঁজও করেছিল নাকি। তাকে ডাকতে গিয়ে ফিরে এসে ঝগড়ুই খবর দিয়েছে, সমস্ত দিনের পরিশ্রমে মেয়েটা এরই মধ্যে ঘুমিয়ে কাদা।

এই একজনের সঙ্গে চূড়ান্ত ফয়সলার দিন আসবেই। কিন্তু সেটা কোন ভবিষ্যতে হবে বা কেমন করে হবে, বাপী ভেবে পায় না। তার ধারণা, গায়ত্রী রাইও এখন পর্যন্ত অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছে। পাচ্ছে না বলেই আপাতত যতটা সম্ভব তাকে দূরে রাখার চেষ্টা।

মহিলা হঠাৎ বেশ অসুস্থই হয়ে পড়ল। একই ব্যাপার। নিঃশ্বাস নিতে ফেলতে অসুবিধে। অসুবিধেটা বেড়ে গেল হঠাৎ। সাদা মুখ বেশি ফ্যাকাশে। কাউকে কিছু না বলে বাপী নিজেই ভ্যান হাঁকিয়ে শিলিগুড়ি চলে গেল। তিনগুণ ফি কবুল করে সেখানকার সব থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে এলো। তার রায়, হার্টের একটা ভালব ড্যামেজ হয়েছে। তেমন সাংঘাতিক না হলেও ব্যাপারটা ভালো না। বিশ্রামের ওপর থাকতে হবে, কোনো ভারী জিনিস টানা চলবে না। নিঃসংশয় হবার জন্য এক্সরে আর ই. সি. জি. করানো হল। চা-বাগানের হাসপাতালে এসবের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বাপী বিছানা ছেড়ে গায়ত্রী রাইকে নড়তে দিল না। চারগুণ খরচ করে বাড়িতে এনে সেসব করানো হল।

এত ঘটা আর টাকার শ্রাদ্ধ দেখে গায়ত্রী রাই রেগেই গেল বাপীর ওপর।—সামান্য ব্যাপারে এত হৈ-চৈ করার দরকার কি? টাকা কি খোলামকুচি নাকি?

মুখের ওপর বাপীর সাদাসাপ্টা জবাব, আপনার কিছু হলে খোলামকুচি।

একটু সুস্থ হতে কত খরচ হয়েছে জিগ্যেস করতে বাপী বলেছে, খরচ আবার কি—

—আঃ! বিরক্ত।—তোমার টাকায় আমার চিকিৎসা হবে?

—তাই যদি মনে করেন তাহলে আজ থেকে আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও আমি নিজেই করে নেব, আমি কার জন্যে কি করেছি বললে ডলি এরপর তেলের ঠেস দেবে।

খুশি মুখে ঊর্মিলা বলল, কেমন সেয়ানা দেখো মা, আগে থাকতে আমার মুখ মেরে দিলে।

মহিলার মুখে আবার সেই কমনীয় শ্রী দেখল বাপী যা খুব বেশি দেখা যায় না। চেয়ে রইল খানিক। ওর দিকে। মেয়ের দিকেও। সঙ্গে সঙ্গে বাপীর বুকের তলায় সেই অজানা আশঙ্কার ছায়া।

ঊর্মিলা পড়াশুনা শুরু করেছে বটে, কিন্তু তেমন মন বসেনি। ওর বিলেতের চিঠি এখন চা-বাগানের ক্লাবের ঠিকানায় আসছে। ভেবে-চিন্তে বাপী এর থেকে ভালো ব্যবস্থা কিছু করতে পারেনি। আপিসে ওর ঠিকানায় এলে রণজিৎ চালিহার হাতে পড়তে পারেই। ডাটাবাবু বাপীর হাতের মুঠোর লোক এখন। খামের ওপর লেখা থাকে, ডলি। ডলি কে, ডাটাবাবুর জানার কথা নয়। চিঠির খবর কেউ জানবে না এও সে ডাটাবাবুকে বেশ স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছে। গোপন থাকবে বলেই বিশ্বাস। কারণ ডাটাবাবু সর্বদা খাশ লোকের দাস। খাশ লোক যে এখন কে আবু রব্বানী ডাটাবাবুকে সেটা ভালো করেই জানিয়ে দিয়েছে।

সেই দিনই সকালে বাপী ঊর্মিলার হাতে বিজয় মেহেরার চিঠি দিয়েছিল। সন্ধ্যের দিকে আনন্দে ডগমগ মুখে সে হাজির হতে বাপী নির্লিপ্ত মুখে জিগ্যেস করল, খুব সুখবর।

—দারুণ! তুমি শোনোনি?

—কি শুনব? বাপী অবাক একটু।

—বনমায়া পালিয়েছে! রেশমার মুখে শুনেছি একটা বুনো হাতির ডাকে ও ফি বছর একবার করে পালায়—আবার নিজেই ফিরে আসে। তুমি তো সব জানো, বলো না!

বাপী হেসে জবাব দিল, এটা কোনো খবর না এখন। সবাই জানে ও পালাবে। ফিরেও আসবে।

ঊর্মিলার তবু বনমায়ার গল্প শোনার লোভ। এমন দুর্বার প্রেমিকা যেন ওর কাছের কেউ। কিন্তু বাপীর ততো আগ্রহ নেই।...একজনকে ঘটা করে বনমায়ার গল্প শোনাতো মনে আছে। আট বছর বাদেও সেই একজন ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, বনমায়ার খবর কি?

এর দিন দশেক বাদে কাউকে কিছু না জানিয়ে বাপী সকালে ভ্যান নিয়ে শিলিগুড়ি চলে এসেছিল। ভ্যান এখন ওর হেপাজতে। আসল কারণ, আগের দিনের কাগজে খবর দেখেছে বি-এ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। বানারজুলিতে গেজেট পাবে কোথায়? তাই শিলিগুড়িতে বি-এর ইতিহাসের রেজাল্ট দেখে গেজেটটাকেই আছড়ে ফেলতে ইচ্ছে

করল বাপীর। ফার্স্ট ক্লাস তিনজন পেয়েছে তার মধ্যে মালবিকা নন্দীর নাম নেই। ও সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে। মিষ্টির ওপর আর সেই সঙ্গে আর একজনের ওপরেও রাগ বাপীর। সাতাশি নম্বরের উল্টো দিকের বাড়ির সেই সোনার চশমা রাঙামুখো ছেলেটার ওপর। যার নাম অসিতদা। পরীক্ষার এই রেজাল্ট হবে না তো কি, আরো প্রেম করোগে যাও!

পরে অবশ্য অত খারাপ লাগেনি। মেয়ের গুমোর কিছু কমবে।...এরই মধ্যে প্রায় দেড়টা বছর কেটে গেল। ওর সঙ্গে দেখা হবার পরের প্রতিটি খুঁটিনাটি চোখে ভাসছে। যেন সেদিনের কথা।

ফেরার সময় অন্যমনস্ক ছিল। চা-বাগানের এলাকা পেরিয়ে লছমন মাহুতের ডেরার কাছে আসতে বিষম চমকে উঠল। যে গাছের গুঁড়িতে বনমায়া বাঁধা থাকত সেখানে অনেক মেয়েপুরুষের ভিড়। গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছে তারা!

বিপদের গন্ধ বাতাসে ছোটে। একটা অশুভ চিন্তা বুকে হাতুড়ির ঘা বসালো। ভ্যান থামিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এলো।

...এত লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে বনমায়াকে দেখছে কেন?

বনমায়া মাটিতে শুয়ে আছে কাত হয়ে। অত বড় শরীরের দু'তিন জায়গায় দগদগে ঘা। দুর্গন্ধ নাকে আসছে। পাহাড়ের মতো শরীরটা নিথর। যত বড় করে সম্ভব চোখ চেয়ে আছে। জল গড়াচ্ছে। মৃত্যু ওর চোখের দিকে এগিয়ে আসছে।

বাপীর বুকের ভেতরটা পাথর হঠাৎ! আবু কাঁদছে। আরো বেশি কাঁদছে লছমন। রেশমারও চোখ ছলছল। ঘিরে যারা দাঁড়িয়ে আছে, সকলের মুখ বিষাদে কালো।

কি ঘটেছে, সঠিক কেউ জানে না। কিন্তু অনুমান করা আদৌ কঠিন নয়। দলছুট বুনো পাগলা হাতি মারা নিষেধ নয়। কারণ একটা পাগলা মরদ হাতি একটা বিশাল এলাকার সর্বনাশের কারণ হতে পারে। কিন্তু অতি দামী দাঁতের লোভে পাগল না হলেও বুনো মরদ হাতি সময় সময় শয়তানের শিকার হয়ে বসে। দৈবাৎ দল-ছুট এরকম হাতি মারা হয়ে গেলে সেটাই ঢ্যাড়া অনুযায়ী পাগলা ছিল কিনা কে বলবে। তখন পাগল বললেই পাগল। এবারেও বনমায়ার সঙ্গী মরদ হাতিটাকে কেউ কেউ দেখেছে। তার অতিকায় দুটো দাঁত। লোভী শিকারীর ওটাই লক্ষ্য ছিল তাতে কারো সন্দেহ নেই। নিঃশব্দে এই শিকারের সব থেকে সহজ উপায় দলে তীর-ধনুক-অলা জংলি জুটিয়ে নেওয়া। তীরের ফলায় 'নিং-দিউদ' আর গন-চং নামে গাছের শিকড়ের অমোঘ মারাত্মক বিষ মেশানো থাকে। বিষক্রিয়ার ফলে যত বিশাল দেহ হোক পচন ধরতে সময় লাগে না। তীর-ধনু-অলা লোককে বুনো হাতিরাও যমের মতো ভয় করে। বনমায়ার দেহে তিনটে বিষাক্ত তীরের ক্ষত।

মানুষের কাছে ছিল। দেহটাকে টেনেহিঁচড়ে মানুষের কাছেই নিয়ে এসেছে।

আবুর বদ্ধ ধারণা, লোভী শিকারীর হাত থেকে দাঁতাল মরদের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে বনমায়ার এই হাল। ও তাকে না আগলালে নিশানার এক বড় ভুল হতে পারে না। পারেই না। বনমায়ার গায়ে আঁচড় পড়ারও কথা নয়।

বাপী আস্তে আস্তে বনমায়ার মুখের সামনে এসে দাঁড়াল। ও চোখ টান করে দেখল। চিনল। জল গড়াচ্ছে। কাত হয়ে শোয়া অবস্থাতেই শুঁড়টা মাটি ঘষটে মাথার কাছে

বেঁকিয়ে নিয়ে এলো। সেলাম করল।

বাপী পালিয়ে এলো।

সন্ধ্যার মধ্যে খবর পেল সব শেষ। বনমায়া ছিল। বানারজুলির বাতাসে প্রেম ছিল। বনমায়া নেই। প্রেম শরবিদ্ধ। নিহত। আবু কেঁদেছে। লছমন কেঁদেছে। রেশমা কেঁদেছে। বনমায়াকে যারা জানে তারাই কেঁদেছে। বাপী কাঁদতে পারে না। এও এক অভিশাপ। একটা শুকনো যন্ত্রণা শুধু ভিতরটাকে কুরে খাচ্ছে।

দু'দিন বাদে কলকাতায় একটা টেলিগ্রাম পাঠালো। ওটা পাবে মালবিকা নন্দী। মিষ্টি নন্দী লিখেও কেটে মালবিকা নন্দী করেছে। ওতে এক শব্দে পাশের অভিনন্দন। আর, দু'শব্দের একটা খবর।—'কনগ্র্যাচুলেশনস। বনমায়া কিল্‌ড।'

মাঝে একদিন বাদ দিয়ে টেলিগ্রামেই তিন শব্দের জবাব এসেছে। 'থ্যাঙ্কস। সরি। —মিষ্টি।'

জবাব আশা করেনি। আরো অপ্রত্যাশিত আর কিছু। মালবিকা বাতিল। লিখেছে, মিষ্টি। বাপীর জগতে মালবিকা নামের কোনো অস্তিত্ব নেই জেনেও লিখেছে?

এর থেকে বাপী কি ভাববে? কি বুঝবে? প্রেম শরবিদ্ধ নয়? নিহত নয়?

**সোনার হরিণ নেই প্রথম ভাগ সমাপ্ত**

# এ-কাল ও-কাল

শ্রীমতী কুসুমলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

চেয়ে চেয়ে ত্রিদিবনারায়ণ রায়ের শান্তির ঘুম দেখছিলাম। পঁচাশি বছরের এক বিরাট অধ্যায় শেষ, আর সেই সঙ্গে গোটা একটা যুগের নির্ভেজাল বিশ্বাস আর নিঃশর্ত সমর্পণেরও শেষ। পরের এই শেষটাকেই শেষ বলে মেনে নিতে প্রবল আপত্তি ছিল তাঁর। এখন ওই ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কেন জানি না নিজের ভেতরেও সেই আপত্তি অনুভব করছি। অথচ কাল রাত পর্যন্তও একবারও এরকম মনে হয় নি।

তবে কাল মনে মনে একটু ধাক্কা খেয়েছিলাম অন্য কারণে। গত রাতে ত্রিদিববাবুর সঙ্গে প্রতি সন্ধ্যার আড্ডা সেরে বাড়ি ফেরার জন্য উঠতে বয়সে আমার চেয়ে পনের বছরেরও বড় মানুষটি এত কালেব পরিচয়ের মধ্যে এই প্রথম আমাকে দু' হাত জোড় করে নমস্কার করেছিলেন। আমি অবাক যেমন হয়েছিলাম, ভেতরে ভেতরে হোঁচট খেয়েছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের এই দীর্ঘ দিনের পরিচয়ে এমন তো কখনো ঘটেনি! ত্রিদিবনারায়ণ দুহাত জুড়ে কপালে ঠেকিয়ে বলেছিলেন, "ভাল থেকো"। এই ছোট্ট দুটি কথায় আমার বুকের ভেতরটা কেন যে হঠাৎ ধড়ফড় করে উঠেছিল তা এখন বুঝতে পারছি। আমার ভেতব থেকে কেউ যেন বলে উঠেছিল, ওটা ওনার মহাযাত্রার বিদায় সম্ভাষণ। কিন্তু যুক্তি-তর্কের মোহে আচ্ছন্ন আধুনিক মন তখন সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি, বা মেনে নিতে পারেনি।

পঁচাশি বছরের বৃদ্ধের মৃত্যুতে শোকের উচ্ছ্বাস না থাকাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে একমাত্র নাতনী ছাড়া যাব জন্য আর কেউ কাঁদার নেই। তবু সেই নাতনীর এত ঠাণ্ডা আচরণ কেমন যেন ধাক্কা দিচ্ছিল। উত্তরার সাদা পাথবের মত মুখে কোনোরকম কষ্টেরও আঁচড় নেই। অদ্ভুত যান্ত্রিক। খুব স্বাভাবিক ভাবে এ-ঘর ও-ঘর থেকে ত্রিদিববাবুর সব জিনিসপত্র নিয়ে এসে গোছগাছ করে দিচ্ছে। যেন দাদুর বেড়াতে যাবার আয়োজন ঠিকঠাক করছে। ত্রিদিবনারায়ণের মতো মানুষের জন্য এমন শুকনো বিদায় আমার ভেতরে কাঁটার মতো বিঁধছিল।—অবশ্য নিজের ভয়াবহ শোকের জ্বালায় অনেক জ্বলেছে উত্তরা। এখনো প্রতিমুহূর্তে জ্বলছে। আর সেই জ্বলুনিতে ভেতরের কোমল দিকগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। জ্বলে জ্বলে একমাত্র আপনার জন এই দাদুর ওপরেই সবচেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত। তিনি ডাকলে নিঃশব্দে কাছে এসে দাঁড়াত, কিন্তু কঠিন মূর্তি। সবচেয়ে কাছের আব সবথেকে ভালবাসার এই মানুষটিই যেন তার সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। প্রয়োজনের বাইরে একটি কথাও শুনতে চাইত না। তাদের পরিবারের যে অদ্ভুত কাহিনী সেই ছোট্টবেলা থেকে এতখানি বয়েস পর্যন্ত দাদুর মুখে গল্পের মত শুনে এসেছে, বিশ্বাস করুক না করুক শুনতে ভাল লেগেছে, ইদানীং তার এতটুকু ইঙ্গিতে দাদুর মুখের ওপর রাগ বিদ্বেষের ঝাপটা মেরে ছিটকে চলে যেত। ত্রিদিবনারায়ণ হাসতেন। আর তাই দেখে উত্তরার আরো রাগ, আরো জ্বলুনি।

তবু এই শেষ যাত্রা যে এরকম শুকনো সাদামাঠা হবে ভাবতে পারিনি। ঘুরেফিরে বারবার দাদুর দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন দেখছে উত্তরা। তার মোমের মতো ধবধবে মুখ আরো কঠিন হয়ে উঠছে। কিন্তু মহাযাত্রীর আধ বোজা চোখে হাসি, ঠোঁটে হাসি।

এখনো বড় মজার কিছু দেখার অপেক্ষায় আছেন যেন।

—"তিনি আসবেন। বিশ্বাস আর সমর্পণের সেতুপথে তিনি আসবেন। খাঁটি বিশ্বাস আর নিঃশর্ত সমর্পণের চরম পরীক্ষায় পার হলে তবেই তিনি আসবেন—" বিষম চমকে বসা থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। কে? কে এই কথাগুলো বলল?...না কেউই কিছু বলে নি। বহুবার শোনা ত্রিদিবনারায়ণ চৌধুরীর মুখের ঐ কথাগুলোই শব্দ হয়ে আমারই ভেতরে বেজে উঠেছে। যিনি বলতেন তিনি তো সেই বিশ্বাস আর সমর্পণেই ভরপুর হয়ে বড় তৃপ্তিতে ঘুমচ্ছেন।

ত্রিদিবনারায়ণের সঙ্গে আলাপ বহুকালের। সে আলাপ একটু গাঢ় হতেই তাঁর মুখে এই বিশ্বাস আর সমর্পণের কথা নানাভাবে শুনে এসেছি। যে কোনো ব্যাপার নিয়ে কথা শুরু হোক না কেন, সব আলোচনা শেষ পর্যন্ত ঘুরে ফিরে ওই এক জায়গায় আসবেই। মিষ্টি গম্ভীর গলায় কোনো বিষয় নিয়ে যখন কথা বলতেন তখন নিজের মতামত ভুলে কান পেতে শুনতে হোত। বিতর্কের চিন্তা তখন মাথায় আসত না। পরে অনেকবার ভেবেছি, এটা উনি ঠিক বলেননি বা ওটার অন্যরকম ব্যাখ্যা হতে পারত। কিন্তু ওই ভাবাই সার। কথা একবার শুরু হবার পর বলার জাদুতে কখন যে তন্ময় হয়ে পড়তাম নিজেই জানি না। মানুষটি সে যুগের এম. এ., মস্ত স্কলার, বাইরের পড়াশুনার ভাণ্ডারটিও বিশাল। কিন্তু কোনোরকম পাণ্ডিত্য ফলানোর বিন্দুমাত্র চেষ্টার আভাসও কোনোদিন পাইনি। বরং বারবার লক্ষ্য করেছি বিদ্যে-বুদ্ধি-যুক্তি-তর্কের ওপরে নিটোল বিশ্বাস আর উপলব্ধির যে নিজস্ব জগৎ, তার মধ্যেই তাঁর বিচরণ। আর খুব সহজ গল্পের ছলে অন্তরঙ্গজনের কাছে এই জগতের খবর জানিয়ে দেওয়া তাঁর একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এতখানি বয়সেও ত্রিদিবনারায়ণের মতো সুপুরুষ খুব কমই চোখে পড়ত। কথা বলতে বলতে যখন নিজের মধ্যে তলিয়ে যেতেন তখন ভেতরের রূপ আর বাইরের রূপের মিশেলটুকুই দেখার জিনিস ছিল। চেষ্টা করেও চোখ ফেরান যেত না। বয়সের ভারে একটু হলদেটে হয়ে আসা হাতির দাঁতের মতো গায়ের রঙে জেল্লা লাগত। ছ'ফুটের ওপর চওড়া হাড়ের কাঠামো টানটান হয়ে উঠত। বিস্তৃত ললাটের টীকা চিহ্ন জ্বলজ্বল করত। কপাল থেকে নেমে আসা তীক্ষ্ণ নাকের পাটা, দৃঢ় চোয়াল আর রক্তাভ ঠোঁট আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠত। আর, টানা মিশকালো দু'চোখের তারায় এক অদ্ভুত আলো ঝলসাতো। মুগ্ধ হতাম, অভিভূত হতাম। কিন্তু পরে ভেবেছি এটাই তাঁর ক্ষমতা। মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করতে পারার ক্ষমতা। আমি তাঁর এই ক্ষমতারই গুণগ্রাহী ছিলাম, তাঁর ভাবের জগৎ বিশ্বাসের জগৎ নিয়ে মাথা ঘামাইনি। কতজনেরই তো কতরকম অন্ধ আবেগ থাকে। তা নিয়ে নাড়াচাড়া করে লাভ কি।

কিন্তু নাড়াচাড়াটা বড় অদ্ভুতভাবে আমিই খেয়েছিলাম।

ত্রিদিবনারায়ণের সঙ্গে পরিচয় তখন ঘনিষ্ঠতায় গড়িয়েছে। প্রায়ই তাঁর বাড়ি যাই। গল্পে গল্পে লেখার অনেক রসদ এই বৃদ্ধের কাছ থেকে জুটত। সেটা আমার উপরি লাভ। তাঁর বাড়িতে আমার যাওয়ার সময় সাধারণত ছিল সন্ধ্যের মুখে।

সেদিনও সন্ধ্যেবেলা গল্প করতেই গিয়েছিলাম, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। অর্ধেক সিঁড়ি উঠে চওড়া ল্যান্ডিং-এর ডান দিকে শ্বেত পাথরের ঠাকুরঘর। কিন্তু ভেতরে কি বিগ্রহ আছে জানতাম না, বা কোনোরকম পুজোটুজো কখনো দেখিনি। যাতায়াতের পথে যতবার চোখে পড়েছে বাইরে থেকে দরজা বন্ধই দেখতাম।

কিন্তু সেদিন দরজা খোলা ছিল। একটা পাটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল উত্তরা। আমি কিছু বলার আগেই নিজের ঠোঁটে একটা আঙুল ঠেকিয়ে চুপ করে থাকতে ইশারা করল। চটিটা বাইরে রেখে পায়ে পায়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঘরে কোনো বিগ্রহ নেই, এমন কি কোনো ঠাকুর-দেবতার ছবিও না। শুধু একটা মঙ্গল ঘট জবা ফুল দিয়ে সাজানো। আর তার সামনে রুপোর ছোট পরাতের ওপর বিঘত প্রমাণ ধবধবে সাদা একটা পঞ্চমুখী শাঁখ। এত সাদা, যেন জেল্লা ঠিকরোচ্ছে। সেদিকে ফিরে টকটকে লাল আসনে মূর্তির মতো বসে আছেন ত্রিদিবনারায়ণ। দু'হাত বুকের কাছে জোড় করা। দু'চোখ সামনে স্থির, পলক পর্যন্ত পড়ছে না। পরনে রক্তাম্বর। খালি গায়ে মোটা দুধ সাদা পৈতে গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে আছে। রক্তলাল বস্ত্রের লালিমায় শরীরের সাদা রঙে আগুনের আঁচ। দেহ নয়, যেন স্থির নিস্পন্দ একখানি শিখা। আমি অভিভূত। ভক্তি বা আবেগে নয়, কিসের একটা ঘোর আমাকে বেঁধে ফেলেছিল। নড়তে চড়তেও ভয়, পাছে নৈঃশব্দ্যের এই পুজোয় ব্যাঘাত ঘটে! পরে, কতক্ষণ পরে জানি না, পাথর-মূর্তিতে একটু একটু করে প্রাণের সাড়া জাগল। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হলো, চোখের পলক পড়ল। নিস্পন্দ শরীর কিসের আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠল। জোড়া করপুটের অদ্ভুত মুদ্রায় রুপোর পরাত থেকে পঞ্চমুখী শাখ তুলে নিলেন। নিজের মাথায় কপালে বুকে ছোঁয়ালেন, তারপর শুরু হলো আরতি। ঘট ঘিরে নানা মুদ্রায় শুধু শঙ্খের অদ্ভুত আরতি। সেই বিচিত্র আরতির মধ্যে দিয়ে ভদ্রলোকের প্রাণের কোনো অজানা আবেগ মূর্ত হয়ে উঠতে লাগল। পায়ের আঙুল থেকে পাতা থেকে যেন আবির গোলা স্রোত ওপর দিকে বেয়ে উঠতে লাগল। দেখতে দেখতে কোমর, বুক, পিঠ, গলা, বাহু, মুখ ও কপালের প্রান্তসীমা পর্যন্ত টকটকে লাল। শ্বাস-প্রশ্বাস অস্বাভাবিক দ্রুত। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় দুটো হাত বিদ্যুতের মতো উঠছে-নামছে ঘুরছে-ফিরছে। একসময় হঠাৎই থামলেন। শঙ্খধরা দু হাত মাথার ওপর রাখলেন। চোখ বোজা। সমস্ত শরীর নিংড়ে গলা দিয়ে নিটোল আবৃত্তি করতে লাগলেন—

এসো এসো এসো—
শত্রুরূপে এসো মিত্ররূপে এসো
দণ্ডরূপে এসো ত্রাতারূপে এসো
শাসনে এসো ক্ষমায় এসো
দহনে এসো দয়ায় এসো
মরণে এসো জীবনে এসো
শোকে এসো শরণে এসো
তাপে এসো তপে এসো

পাপে এসো পুণ্যে এসো

আঁধার রূপে আলোক রূপে প্রলয় রূপে প্রজ্ঞা রূপে

রুদ্র অনলে সঘন-সজলে এসো এসো এসো

কোনো মন্ত্র নয় স্তোত্র নয়, শুধুই আর্তি, শু' ই ডাক। সেই ডাকে প্রতিটি শব্দ স্তব হয়ে বেজে উঠছিল। টনটনে ধাতব স্বরের আকৃ৷৩তে ঘর গুমরে গুমরে উঠছিল। এক না-জানা আবেগে গুমরে উঠছিল আমার বুকের ভেতরটাও।

এমন পুজো কখনো দেখিনি, এমন ডাকও কখনো শুনিনি।

উত্তরার চোখে জল, আমার দু'চোখ জুড়ে অদ্ভুত শিরশিরানি, আর ত্রিদিবনারায়ণের বন্ধ চোখের কোল ছেপে দরদর ধারা। তাঁর টানটান শরীর বারবার কেঁপে উঠতে লাগল। দু'হাতে ধরা শঙ্খ মাথা থেকে নামিয়ে বুকের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে থাকলেন। তারপর আসনের ওপরেই লুটিয়ে পড়লেন।

তাড়াতাড়ি তাঁর দিকে নিজের অজান্তেই এগুতে গেতেই বাধা পেলাম। উত্তরা আমাকে চলে আসতে ইশারা করে নিজেও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সিঁড়ি বেয়ে উঠে রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তাকে অনুসরণ করে আমিও। খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপ। উত্তরাই প্রথম কথা বলল। আমার নীরব জিজ্ঞাসা বুঝে আস্তে আস্তে বলল, আজ অমাবস্যা, কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি, প্রতি অমাবস্যার পঞ্চমী তিথিতে দাদু এভাবে পুজোয় বসেন।

আমি উৎকর্ণ—'কেন?'

উত্তরার কালো চোখ বড় বেশি চকচক করে উঠেছিল। বলল, বংশ বংশ ধরে আমাদের পরিবারে এই তিথিতে বিরাট অঘটন ঘটে আসছে। শেষবার আমার বাবা-মা আর দুই দাদা একসঙ্গে গেছে। তাদের মেরে ফেলা হয়েছে।

আমি আঁতকে উঠেছিলাম। এই নাতনী ছাড়া ত্রিদিবনারায়ণের দুনিয়ায় কেউ নেই জানতাম। বিরাট অ্যাকসিডেন্টে ছেলে সপরিবারে মারা গেছে এরকম একটা কথা ভাসাভাসা শুনেছিলাম। কিন্তু সেই অ্যাকসিডেন্ট যে এমন মর্মান্তিক কল্পনাও করিনি। ত্রিদিবনারায়ণ নিজে থেকে কখনো এ-প্রসঙ্গ তোলেননি, আর আমিও ইচ্ছে করেই কিছু জিজ্ঞেস করিনি। কিন্তু সেদিন উত্তরার কথা শুনে অবাক হয়েছিলাম অন্য কারণে। বংশ বংশ ধরে একই তিথিতে যে অঘটন ঘটার কথা উত্তরা বলেছিল, তা নিয়ে নিছক কৌতূহল ছাড়া আর কিছু হয় নি। কিন্তু মনে আঁচড় পড়েছিল অন্য ব্যাপারে। যে দিন একমাত্র ছেলে, বউ আর দুই নাতির এমন মর্মান্তিক মৃত্যু, ঠিক সেই তিথিতেই এরকম পুজো? ঠিক পুজোও কি? কোনো ঠাকুর নেই, বিগ্রহ নেই, উপচার নেই, মন্ত্র নেই, নিয়ম নেই, চাহিদা নেই, আছে শুধু সত্তা নিংড়ানো ডাক। বেছে বেছে সব খোয়ানোর তিথিতেই কাউকে পাবার আকুতি, নাড়ি ছেঁড়া প্রার্থনায় কারুর আসার প্রতীক্ষা। তবে কি যে বিশ্বাস আর সমর্পণের জগৎ নিয়ে তিনি বিভোর তার সঙ্গেই এর আসল যোগসূত্র বাঁধা? আমার মন বলছিল, লেখার নতুন কোনো রসদ মিলবে। সে রাতে ত্রিদিববাবুর সঙ্গে দেখা না করেই চুপচাপ ফিরে গিয়েছিলাম।

রসদ মিলেছিল। পর দিন তাঁর বাড়ি গিয়ে আবার সেই চেনা ত্রিদিবনারায়ণকেই দেখেছি। তুষ্টিতে ভরপুর, সদা প্রসন্ন। আগের সন্ধ্যায় কি এই লোককেই দেখেছিলাম? এ-কথা সে-কথার পর আমার উসখুসুনি টের পেয়ে কুশাগ্রবুদ্ধি মানুষটি মিটিমিটি হেসে জিগেস করেছিলেন, লেখকের কলম বেশ ভালমতই সুড়সুড় করছে তাহলে?

আমিও হেসেই জবাব দিয়েছি, তা তো করছেই, তবে আমিও বোধহয় এবার কিছু মেলাতে পেরেছি। চরম আঘাত সইয়ে নিতে এক একজন এক এক পথ ধরে...যে বিশ্বাস আর সমর্পণের কথা আপনি দিন-রাত বলেন, তা আসলে ঐ আঘাত সওয়ানোর একটা পথ। ঐ পথ ধরে আসলে আপনিও সে চেষ্টাই করে চলেছেন...।

ত্রিদিবনারায়ণের মুখের হাসি নিভে গেল। আমার দিকে খানিক চেয়ে আস্তে মাথা নাড়লেন। বললেন, আঘাত সইতে নয়, বরং সব থেকে বড় আর সর্বশেষ আঘাতের জন্যেই বুক পেতে অপেক্ষা করছি। কারণ, চরম মার মারার পর তিনি আসবেন। পুড়িয়ে পুড়িয়ে খাক করে তবে তিনি আসবেন। বিশ্বাস আর সমর্পণের পরীক্ষায় শুচিশুদ্ধ করে তবেই আসবেন।...নয়তো তাঁরও যে মুক্তি নেই।

হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে অমোঘ ঘোষণার মতো কথাগুলো বেরিয়ে এলো। আমি চুপ। আবার তাঁর ঠোঁট নড়ল। তারপর সময়ের এক দীর্ঘ পথ তাঁর হাত ধরে পাড়ি দিয়েছি।

## দুই

ত্রিদিবনারায়ণ রায়ের দাদামশাই গাজনপুরের জমিদার বিক্রমদেব আচার্যচৌধুরী তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রবাদপুরুষ হয়ে উঠেছিলেন। দয়া-নিষ্ঠুরতা বিলাস-ব্যসন ধর্ম-কর্ম সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য পুরুষ ছিলেন। আশ্চর্য আর প্রবল পুরুষ। সামান্য কারণে বহুজনের মাথায় তাঁর কোপের খাঁড়া সাক্ষাৎ মৃত্যু হয়ে নেমেছে, আবার শরণাগতকে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে রক্ষা করেছেন। তিনি বিলাসী ছিলেন, কিন্তু ব্যভিচারী ছিলেন না। তাঁর কামনার হাত কখনো গৃহস্থের অন্দরমহলে ঢোকেনি। বিলাসের সামগ্রী হয়ে যারা বিকোতে আসত তাদের নিয়েই তাঁর আমোদ-ফূর্তি। প্রজার ঘরের মেয়েবউরা তাঁর কাছে নির্ভয় ছিল। বাপের মতো তারা তাঁর ওপর নির্ভর করত।

শোনা যায়, পণ্ডিত ব্রাহ্মণবংশের জ্যেষ্ঠ সন্তান তিনি। জন্ম থেকে নিজের মাকে খুইয়ে ভেতরে ভেতরে মায়ের স্নেহের কাঙাল ছিলেন। বাপের একাধিক সংসারের যে কোনো মহিলা সেই খেদ পূরণ করতে পারত, কিন্তু কেউ করেনি। মা-হারা ছেলের দিকে বাবারও তেমন নজর ছিল না। একদিন তুচ্ছ কারণে বিমাতাদের নালিশের ফলে বাবা এই ছেলের গায়ে হাত তুলতে গেছল। কিন্তু পেরে ওঠেনি। পনের বছরের ছেলের আগুনমূর্তি আর চাউনি দেখে ওঠা হাত আপনি নেমে এসেছিল। নিরূপায় ক্রোধে ছেলেকে সামনে থেকে দূর হয়ে যেতে বলে নিজেই সরে গেছল। বিপুল অভিমানে বিক্রমদেব একেবারে তাঁর পারিবারিক জীবন থেকেই দূর হয়ে গেছলেন। সেই রাতেই ঘর ছেড়েছিলেন কিন্তু একেবারে একা আসেননি, সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর একান্ত

নিজস্ব মা-টিকে। তাঁর সেই মা বংশের প্রতিষ্ঠিত দেড়শো বছরের পুরনো শ্যামাকালী-বিগ্রহ, অর্ধ অঙ্গ ঘন নীল, অর্ধ অঙ্গ কষ্টিকালো। দেড়হাত প্রমাণ ছোট্ট মূর্তি, অপরূপ তাঁর শ্রী। আচার্যবংশের এই ইষ্টদেবীকে বুকে নিয়ে মাত্র পনের বছর বয়সে পথে বের হয়েছিলেন বিক্রমদেব। লোকে বলত সিদ্ধপুরুষ ছিলেন তিনি। দেবীর আদেশেই তাঁকে তুলে এনেছিলেন। তারপর থেকে তাঁরই নিদেশমতো চলেছেন। নবাবকে তুষ্ট করে ঐ দেবীর আশীর্বাদেই গাজনপুরের জমিদারি পেয়েছিলেন। তারপর আস্তে আস্তে গাজনপুরের সচল কিংবদন্তী হয়ে উঠেছেন।

জমিদার বাড়ির চত্বরের মধ্যেই বিশাল দীঘি খুঁড়ে তার পাড়ে মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিক্রমদেব। দীঘি খননের সময় এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিল। সকলাকে সরিয়ে প্রথম শাবলের ঘা তিনি নিজের হাতে মেরেছিলেন। সেই মাটির সঙ্গে উঠে এসেছিল একটা অদ্ভুত সুন্দর শঙ্খ। আকারে এক বিঘতের বেশী হবে না, পাঁচটা মুখ, ধবধবে সাদা। এত সাদা যে আলোর মধ্যেও চোখ ধাঁধিয়ে ওঠে। সেই শঙ্খ মাথায় ঠেকিয়ে বিক্রমদেব বিগ্রহের সামনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তারপর থেকে প্রতি সন্ধ্যেয় নিজের হাতে আরতি করতেন তিনি। তাঁর সেই আরতি, বিশেষ করে শঙ্খ-আরতি দেখার জন্যে সমস্ত গাজনপুর মন্দিরের সামনে ভেঙে পড়ত। ব্রাহ্মণ হলেও এ ব্যাপারে তাঁর কোনোরকম বর্ণবিচার ছিল না। তাঁর মায়ের পুজোয় সবাই নির্দ্বিধায় আসতে পারত, জল-অচল অন্ত্যজ শ্রেণী পর্যন্ত। ধূপধুনোয় আচ্ছন্ন ঘরে হাজার প্রদীপের আলোয় টকটকে রক্তাম্বর পরা বিক্রমদেবকে তখন এ-জগতের রক্তমাংসের মানুষ বলে মনে হতো না। রক্তবস্ত্রের লালিমা রক্তচন্দন গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে জ্বলতে থাকত। দীর্ঘ ঋজু দেহ কখনো নিস্পন্দ, কখনো আবেশে থরথর। আজানুলম্বিত দুই বাহু আরতির বিভিন্ন উপচার নিয়ে অদ্ভুত ছন্দে উঠত নামত। একে একে পুষ্প, প্রদীপ, চামর আরতি শেষ করে পঞ্চমুখী শঙ্খ হাতে তুলে নিতেন। সমস্ত গাজনপুর তখন প্রতীক্ষায় রুদ্ধশ্বাস, মন্দির-ঘরের বাতাসও নিশ্চল হয়ে থাকত। দু-হাতের দশ আঙুলের বিচিত্র মুদ্রায় শঙ্খ তুলে শুরু হতো আরতি। কতক্ষণ ধরে যে সে আরতি চলত কারুর হুঁশ থাকত না। রক্তবর্ণ এক দীর্ঘকায় পুরুষের রক্তপদ্মের মতো দুই করপুট নানা মুদ্রায় নানা ভঙ্গিমায় ঐ শ্বেতশঙ্খে প্রাণের সঞ্চার করত। আরতি করতে করতে হঠাৎ একসময় দেবীর দিকে দু হাত প্রসারিত করে স্থির হতেন বিক্রমদেব। শয়ে শয়ে লোকের চোখের সামনে সেই শঙ্খ নাকি তাঁর তালু ছেড়ে সবেগে শূন্যে উঠে পাক খেয়ে উত্তরমুখী হয়ে আবার তাঁর হাতে ফিরে আসত। শঙ্খের পাঁচমুখ বেয়ে শান্তির জল পঞ্চধারে গড়িয়ে পড়ত।

এতক্ষণে রুদ্ধ প্রতীক্ষার অবসান। দেবীর আর সেই সঙ্গে বিক্রমদেবের তুমুল জয়ধ্বনিতে সারা গাজনপুর ফেটে পড়ত। নিজের হাতে বিক্রমদেব সেই শান্তির জল সবার গায়ে ছিটিয়ে সবশেষে নিজের মাথায় ছোঁয়াতেন।

অথচ এই মানুষেরই অন্য সময় অন্য মূর্তি, অন্য চেহারা। রাজার মূর্তি আর রাজার চেহারা। যে রাজা দারুণ খেয়ালী আর দারুণ মেজাজী। যে রাজার খেয়ালের পালে খুশির বাতাস লাগলে অতি বড় অপরাধও মাফ, আবার মেজাজ খারাপ হলে

তুচ্ছ কারণেও প্রলয়। সামান্য গলতি তখন যে কারুর শেষ ডেকে আনতে পারে। একদিন এই মেজাজের পথ ধরেই তাঁর জীবনে এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটে গেল।

ওপরওলার খেয়ালেই বিক্রমদেবের মেজাজের হাওয়া সেদিন অনুকূল ছিল না। দুপুরবেলা কাছারি ঘরে বকেয়া খাজনা নিয়ে কিছু প্রজার তলব হয়েছিল। আর তলব হয়েছিল গাঁয়ের পূজারী বামুন শশধর চক্রবর্তীর। খাজনার জন্যে নয়, মন্দিরের কোনো ব্যাপারে কথা বলার জন্যে জমিদারের নাম করে দেওয়ানজীই তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বিক্রমদেব ফরাসে আড় হয়ে গড়গড়া টানছিলেন। প্রজাদের সঙ্গে কথাবার্তা দেওয়ানজীই বলছিলেন। আসলে তাঁরই তলব, বিক্রমদেব শুধু উপস্থিত ছিলেন। কাকে কেন ডাকা হয়েছে বা কে কী বলছে তিনি কানেও নেননি। একে একে সবাই এসেছে, শুধু শশধর চক্রবর্তী বাদ। পেয়াদা এসে খবর দিল জমিদারের তলব শুনেও তার মেয়ে নাকি বলেছে, বাড়ি-বাড়ি পুজো সেরে এই সবে ফিরে বাবা চানে গেছে। চান সেরে ঘরে বেণুগোপালের ভোগ না দিয়ে তো এখুনি কোথাও যেতে পারবে না...

বিরক্ত অন্যমনস্ক বিক্রমদেবের কানে নিয়তির খেয়ালে শুধু শেষের পাঁচটা শব্দ ঢুকল, 'এখুনি কোথাও যেতে পারবে না'। ক্রোধে গৌরবর্ণ মুখ রক্তিম হয়ে উঠল। জমিদারের তলব সত্ত্বেও এখুনি যেতে পারবে না? এত সাহস? গর্জে উঠলেন, 'বেঁধে নিয়ে এসো, এখুনি!'

হুকুম শুনে দেওয়ানজী তটস্থ, পাইক-পেয়াদাদের অবস্থা আরো সঙ্গিন। শশধর চক্রবর্তী নিষ্ঠাবান পূজারী। সে সবার শ্রদ্ধার মানুষ আর তার ঘরের প্রতিষ্ঠিত বেণুগোপাল গাঁয়ের সবার আদরের আর ভালবাসার ঠাকুর। প্রতিদিন কাকডাকা ভোরে উঠে স্নান সেরে গোপাল তোলে সে। তারপর যেদিন যার বাড়ি ডাক পড়ে পুজো সেরে ঘরে ফিরে আবার পুকুরে ডুব দিয়ে বেণুগোপালের মধ্যাহ্ন ভোগ সাজিয়ে বেলা শেষে দুটি প্রসাদ নেয়। বেণুগোপালের অন্নভোগ না দেওয়া পর্যন্ত আর কোথাও যেতে পারে না। গাঁয়ের সবাই তা জানে, বিক্রমদেবও জানেন। নির্লোভ এই গরীব পূজারীকে তিনি মনে মনে স্নেহই করতেন। এ যাবৎ তাকে অনেক অনুগ্রহও করেছেন। কিন্তু সেই দুর্জয় ক্রোধের মুহূর্তে কাকে কোন অপরাধের জন্যে বেঁধে আনতে হুকুম দিলেন তা নিজেও ভাল করে জানতেন না। শুধু কানে ঢুকেছিল তাঁর তলব সত্ত্বেও কোনো একজন প্রজা এখুনি আসতে পারবে না বলেছে। তাঁর মতো পুরুষের রক্তে আগুন ধরানোর জন্যে এ-ই যথেষ্ট।

শশধর চক্রবর্তীকে ধরে আনা হলো। বেঁধে আনার দরকার হয়নি, রাজরোষের আভাস পেয়ে নিজেই কাঁপতে কাঁপতে এসেছে। ভয়ে সাদা। দু' হাত জোড় করে মাটিতে প্রায় মিশে গিয়ে অভিবাদন সারল, তারপর তেমনিভাবেই শাস্তির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। বিক্রমদেব শশধর চক্রবর্তীকে দেখবেন ভাবেননি। কিন্তু দেখার পর অনুগ্রহভাজনের স্পর্ধার কথা স্মরণ করে দ্বিগুণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বিশাল চোখের সাদা ভাগেও রক্তের ছোপ ধরল। আধশোয়া থেকে আস্তে আস্তে উঠে বসলেন। কাছারি ঘরের সবাই কাঠ। ক্রুদ্ধ কেশরীর অব্যর্থ নাগালের মধ্যে শিকার, আর তার রক্ষা নেই।

কিন্তু রোষের থাবা নেমে আসার আগেই কি যেন ঘটে গেল। রুদ্ধশ্বাস ঘরের মধ্যে দুর্যোগের আকাশ চেরা নীল বিদ্যুৎ খেলে গেল বুঝি। শিকার আড়াল করে সেই বিদ্যুৎশিখা শিকারীর সামনে স্থির হলো।...বিক্রমদেবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তের-চোদ্দ বছরের এক কিশোরী। অপরাজিতার মতো ঘন নীল গায়ের রং, সাপের ফণার মতো কুচকুচে কোঁকড়া চুলের রাশ সুডৌল মুখ বেড়িয়ে কোমর ছেপে দুলছে। কান পর্যন্ত টানা ঘন কালো ভুরু, কৃষ্ণপক্ষ্ম বিশাল আয়ত চোখ বিস্ফারিত, ছোটর ওপর দৃঢ় নাকের পাটায় তিরতির কাঁপন আর রক্তাভ ঠোঁট রোষে ঈষৎ বঙ্কিম। তাব বুকের কাছে বাঁ হাতে ধরা ছোট্ট বেণুগোপাল, আর ডানহাতে চন্দন পরানোর তামার কাঠি। ডান পা একটু এগিয়ে গ্রীবা উঁচিয়ে বিক্রমদেবের চোখে চোখ রেখে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে সেই আশ্চর্য মেয়ে। তার কালো চোখের তারায় আগুন, শ্যাম অঙ্গে নীলাভ আগুনের আঁচ, অব্যর্থ শিকারীর হাত থেকে শাবককে রক্ষার অমোঘ সংকল্পে জ্বলছে যেন এক কিশোরী-বাঘিনী। ভয়ঙ্কর রোষদৃপ্ত, কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর।

চোখের পাতাটুকু ফেলতেও সবাই ভুলেছিল। বিক্রমদেবও চেয়েই ছিলেন, নির্নিমেষে দেখছিলেন। চোখের জমাট বাঁধা রক্তকণা সরে গিয়ে সাদার ভাগ স্পষ্ট হলো, দৃষ্টিতে আবেশ ঘনাল, সেই পনের বছর বয়সে যে বিগ্রহ বুকে করে ঘর ছেড়েছিলেন সে আর সামনে দাঁড়ানো এই ক্রোধদীপ্ত শ্যামশ্রী মিলে মিশে এক হয়ে গেল।

তারপর কটা দিন এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে কেটেছিল বিক্রমদেবের। কে এলো? তাঁরই রোষের পথ ধরে রুদ্রাণীরূপে কে তাঁর ঘরে পা রাখল? মন্দিরেব বিগ্রহের দিকে যতবার তাকান নীল শিখার মতো এক মেয়ের দৃপ্ত মুখ তাঁর মস্তিষ্কের কোষে কোষে ঝলসে ওঠে। কেন? কেন কেন কেন? তারপর হঠাৎই একদিন সব ভাবনার অবসান। কারুর কোনো কথা কানে তুললেন না, কারুর সঙ্গে একটি পরামর্শ করলেন না, স্ত্রীব চোখের জল, ছেলের গোমড়া মুখ অগ্রাহ্য করে সেই মেয়েকে বরাবরের মতো ঘরে নিয়ে এলেন। গাঁয়ের পূজারী বামুন শশধর চক্রবর্তীর মেয়ে সুচারু প্রবল জমিদাব বিক্রমদেবের একমাত্র ছেলে অনলদেবের বউ হয়ে রাজ-অন্তঃপুবে ঢুকল।

ছেলে অনলদেবকে নিয়ে শান্তি ছিল না বিক্রমদেবের তার ছেলেবেলা থেকেই। ছেলের আচার-আচরণে বড় চিন্তিত ছিলেন। সে চিন্তা দিনে দিনে বেড়ে উঠেছিল। বাবার সামনে মুখ তুলে কখনো কথা বলত না বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে যেমন দুর্বিনীত, তেমনি রাগী। কিন্তু সে রাগে পুরুষের তেজ নেই, শৌর্য নেই, বীর্য নেই, কেবল দম্ভ আর অকারণ অত্যাচারে ভরা। নিরাপত্তার বেষ্টনীর মধ্যে বসে বন্ধুবান্ধব নিয়ে তার নিষ্ঠুর আমোদের ঝোঁক দিন দিন বেড়েই চলেছিল। তার ওপর হিংস্র রকমের প্রতিশোধপরায়ণ। একমাত্র ছেলের ব্যাপারে বিক্রমদেবের প্রতিটি ইন্দ্রিয় সজাগ ছিল, তার সব খবরই তিনি রাখতেন। ছেলেবেলায় একবার নিজেরই এক সঙ্গীকে নিশ্চুপে প্রায় শেষ করে এনেছিল অনলদেব। ছেলেটির অপরাধ, কুস্তির মহড়ায় সে জমিদারের ছেলের মন বুঝে না চলে নিজের জোরের ওপর চলত। অন্য ছেলেদের মতো ইচ্ছে করে কখনো হার স্বীকার করত না। গায়ের জোরে আর কুস্তির প্যাঁচে জব্দ

করতে পারবে না বুঝে মিষ্টির সঙ্গে ধুতরোর বীজ মিশিয়ে অনলদেব আদর করে তাকে খাইয়েছিল। সময়ে ধরা না পড়লে আর বিক্রমদেবের নিজস্ব বৈদ্য এসে হাল না ধরলে সে যাত্রা ছেলেটাকে রক্ষা করা কঠিন হতো। সে সুস্থ হবার পর অনলদেব কোনোদিন আর কুস্তির আখড়া মাড়ায়নি।

আর একবার, তখন অনলদেব একটু বড়, বছর পনের বয়স। নিষিদ্ধ মাংসের জন্যে মুসলমান পাড়ায় দলবল সহ গিয়ে বসির মিঞার কাছে মুরগী চেয়েছিল। বসির মিঞা দেয়নি, বিক্রমদেবের মতো সিদ্ধপুরুষের একমাত্র বংশধরকে ওই মাংস খাওয়ানোর নিমিত্তের ভাগী হতে চায়নি। সেই রাগে অনলদেব তার মুরগীর খোঁয়াড়ে সাপ ছেড়ে দিয়েছিল। বিষের জ্বালায় ছটফটিয়ে এক রাতের মধ্যে সব কটা মুরগী শেষ। তারপর সবচেয়ে বড় অপরাধ সতের বছরে। সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে তখন আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তু তার একটাই, মেয়েছেলে। বাবার ভয়ে তখনো পর্যন্ত এ ব্যাপারে হাতে খড়ি দিয়ে উঠতে পারেনি, চোখে দেখে আর জল্পনা কল্পনা করেই ভেতরের তেষ্টা মেটাত।

এক দুপুরে গাঁয়ের শেষ মাথায় পুকুর পাড়ের গাছগাছালির আড়ালে বসে সঙ্গীদের সঙ্গে এইসব গল্পই চলছিল। আক্ষেপ করছিল, কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে তার বয়সী ছেলের এতদিনে একটা ছেড়ে তিনটে বিয়ে হতে পারত। অথচ বাবার এ নিয়ে কোনোরকম মাথাব্যথা নেই। অবশ্য বাবাও নাকি দিনকালের তুলনায় একটু বেশি বয়সেই বিয়ে করেছিল। আর যেখানে হেঁজিপেঁজি সব লোক গণ্ডায়-গণ্ডায় বিয়ে করছে সেখানে তার বাবার মতো মানুষ যে একটা মাত্র বিয়ে করেই সন্তুষ্ট এ-জন্য সেও খুশী। অন্দরমহলে মা ছাড়া মায়ের মতো আরো কেউ আছে চিন্তা করলেও তার মেজাজ চড়ে। তা বলে একমাত্র ছেলের ব্যাপারে বাপের এমন উদাসীনতা!

মায়ের কাছে আকারে ইঙ্গিতে ইচ্ছেটা জানিয়ে দিতে মা সেটা বাবার কানে তুলেছিল। কিন্তু আড়ালে দাঁড়িয়ে বাবার গর্জন শুনে নিরুপায় ক্ষোভে ভেতর ভেতর জ্বলেছে। বাবা তাকে অকালকুষ্মাণ্ড বলেছে, অপদার্থ বলেছে, অমানুষ বলেছে। মাকে বলেছে, ছেলেকে জানাতে ও-সব বিয়েটিয়ের কথা ভুলে গিয়ে সে যেন পড়াশুনো খেলাধুলো আর শরীরচর্চা ছাড়া অন্য কোনোদিকে আপাতত মন না দেয়। সময় হলে তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন। রাগে অনলদেবের হাত নিশপিশ করে উঠেছিল। কিন্তু এখানে তো আর বিষ দেওয়া যায় না বা ঘরে সাপ ছেড়ে দেওয়া চলে না! মনে মনে শুধু ভেঙচে আর কটূক্তি করেই ঠাণ্ডা হতে হয়েছে। এঃ, সময় হলে নিজেই সব ব্যবস্থা করবে! একটা বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়েছে বলেই ছেলে অকালকুষ্মাণ্ড, অমানুষ, অপদার্থ! বাবা নিজে বিয়ে একটা করলে কি হবে তার চরিত্রখানা কেমন তা ছেলে এখন ভালই বুঝতে পারে। মাঝে মাঝেই কোথায় যায়, কাদের আনিয়ে নাচগান চলে, কাদের নিয়ে তার বজরা ভাসে, জানতে তার বাকি আছে? শুধু নিজের ছেলের বেলাতেই যত উপদেশ।

একদিন বন্ধুবান্ধব নিয়ে এমন খেদের মুখে হঠাৎ কি দেখে অনলদেব চুপ। ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে সাঙ্গোপাঙ্গদের কাছে সরে আসতে ইশারা করে গলা উঁচিয়ে দেখতে লাগল। জেলেপাড়ার যণ্ডামার্কা গগন পাড়ুইয়ের বালবিধবা দিদি লক্ষ্মীমণি

তখন পুকুরে নেমেছে। টলটলে পুকুরে একখানা স্থির যৌবন ভাসছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে পরনের খাটো কাপড়টাও ঘাটের শেষ ধাপে ছুঁড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে স্নান করছিল লক্ষ্মীমণি। হাতে শুধু ছোট্ট একটা গামছা। তা দিয়ে মুখ-গলা-হাত-বুক যত ঘষছে, অনলদেব আর তার সঙ্গীসাথীরা হাঁ করে ততো যৌবনের ঢেউয়ের ওঠানামা দেখছে। শেষে বড় একটা ডুব দিয়ে অনেকটা দূরে গিয়ে ভেসে উঠল লক্ষ্মীমণি। তখন অনলদেবের ইশারায় তার এক সঙ্গী লম্বা একটা লকড়ি দিয়ে সিঁড়ি থেকে সেই ভেজা কাপড়টা তুলে নিল। এরপর চলল মজা দেখার পালা।

শরীরটাকে উল্টে পাল্টে অনেকক্ষণ মনের সাধে চান করে ফিরে এসে লক্ষ্মীমণি দিশেহারা। কাপড় নেই। যৌবনের তাপ আর দেহের জ্বালা জুড়োতে দুপুরের নিরিবিলিতে প্রায়ই এমন চান সারে। কিন্তু এমন অঘটন কখনো ঘটেনি। পাগলের মতো এদিক ওদিক চেয়ে শেষে অনলদেব আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের দেখতে পেয়েছিল। বয়সে অনলদেবের থেকে সে অন্তত পাঁচ বছরের বড়। প্রথমে নিজের চোখ দুটোকেই বিশ্বাস করে উঠতে পারে নি। পরে অনুনয়-বিনয় তর্জন-গর্জন সব ব্যর্থ হয়েছে। ছেলেবেলায় যে খোকারাজাকে কোলে নিয়ে কত আদর করে ঘুম পাড়িয়েছে, ভুলিয়ে ভালিয়ে কত খাইয়েছে, কত গল্প বলেছে, তার এই মতি? এরপর অনলদেবের প্ররোচনায় তার সাথীরা অশ্লীল ইঙ্গিত করে তাকে জল থেকে উঠে আসতে হুকুম করেছে। দাঁত বের করে বলেছে, খোকারাজা এখনো তার কোলে উঠে ঘুমোতে চায়, তবে ছোটবেলার খাবারে এখন অরুচি, এখন তাকে অন্য খাবার দিয়ে ভোলাতে হবে।

কোনোভাবেই টলাতে না পেরে ভর দুপুর গড়িয়ে বিকেল অবধি মাঝপুকুরে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে ভেসে থাকতে হয়েছিল লক্ষ্মীমণিকে। অমন স্বাস্থ্য বলেই অতক্ষণ ও-ভাবে থাকতে পেরেছিল। বিকেলবেলা লোক চলাচল শুরু হতে অনলদেব দলবল নিয়ে সরেছে। কিন্তু যাবার আগে কাপড়টা কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে গেছে। পুকুরে জল নিতে আসা মেয়েবউদের কাছে নিজের দুর্দশার কথা বলতে বলতে ক্ষোভে লজ্জায় কেঁদে ফেলেছিল লক্ষ্মীমণি। শেষে তাদেরই একজনের দেওয়া কাপড় গায়ে জড়িয়ে কোনোরকমে বাড়ি ফিরেছে। কল্পনাও করতে পারেনি সব শুনে ছোটভাই গগন কি বিষম রাগে ফুঁসেছে আর কোন সুযোগের অপেক্ষায় থেকেছে।

বেশ কয়েকদিন ধরেই তাকে তাকে ছিল সে। শেষে অমন এক ভরা দুপুরেই সুযোগ মিলেছে। গগন পাড়ুইয়ের জমিদারের ছেলের গায়ে সরাসরি হাত দেবার সাহস হয়নি। কিন্তু হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে তারই সামনে থেকে তারই দুজন অনুচরকে টিকটিকি যেমন আরশোলা ধরে সেভাবে টেনে নিয়ে পুকুরে ফেলেছে। এক ডুবে মাঝখানে নিয়ে গিয়ে চুবিয়ে চুবিয়ে তাদের আধমরা করে শেষে আবার পাড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। অনলদেব নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে সব দেখেছে কিন্তু সঙ্গীদের অবস্থা বুঝেও ভয়ে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেনি। গগন চলে যেতে তার সাহস ফিরেছে। বাবার কাছে নালিশ করলে সব ধরা পড়বে তাই সঙ্গীদের কাছে আস্ফালন করেছে নিজেরাই জেলের পোকে জন্মের শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে। কিন্তু গগন পাড়ুইয়ের শরীরে অসুরের শক্তি। সে শক্তির সাক্ষী অনলদেব নিজে। অতএব কৌশলে মারতে হবে। এমন মার মারবে যে

ছোটলোকেরা এরপর জমিদারের ছেলের মুখের দিকে তাকাতেও সাহস করবে না।

সেদিন হাটবার। সওদা সেরে জঙ্গলের পথ ধরে ফিরছিল গগন। তাড়াতাড়ি ফেরার জন্যে ওই রাস্তাই ধরে। হঠাৎ ছুঁড়ে দেওয়া দড়ির ফাঁসে পা জড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মুখে মাথায় গলায় হাতে পায়ে আরো পরপর ফাঁসে জড়িয়ে গেল। সেই অবস্থাতেই কারা তাকে টেনে নিয়ে চলল। অতর্কিত আক্রমণে গগন কেমন দিশেহারা হয়ে গেছল, প্রথমে ভাবল ডাকাতের হাতে পড়েছে। কিন্তু বিক্রমদেবের জমিদারিতে এমন ডাকাতি সচরাচর ঘটে না। কিছু ঠাওর করার আগেই তার পরনের কাপড়টা একটানে খুলে নিয়ে জনা দশবারো লোক একটা উঁচু ঢিবির ওপর চিৎ করে ফেলে তাকে প্রাণপণে চেপে ধরল। ধরেই থাকল। পরমুহূর্তে মর্মান্তিক আর্তনাদ করে উঠল গগন। সমস্ত শরীরে হাজার বিছের মরণ কামড়। চামড়া মাংস ভেদ করে সেই কামড় অস্থিমজ্জা পর্যন্ত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিতে থাকল। তারপর আর কিছু মনে নেই। কবে কখন জ্ঞান ফিরেছে জানে না। চোখ চেয়ে দেখে নিজের ঘরেই শুয়ে আছে। পরে শুনেছে বুনো পিঁপড়ের ঢিবির ওপর জ্ঞান হারিয়ে পড়েছিল। ভাগ্যক্রমে হাট-ফেরতা কয়েকজনের চোখে পড়ে যেতে তারা তুলে এনেছে।

গগন বুঝেছে আসলে কি ঘটেছিল। তার মুখে শুনে পরে সবাই সব বুঝেছে। যদিই বা পা ফসকে পিঁপড়ের ঢিবির ওপর পড়ে যায় তো সারা গায়ে দড়ির ফাঁসের আঁটো দাগ কোত্থেকে এল, বা পরনের কাপড়ই বা গেল কোথায়? বুঝলেও ভয়ে কেউ মুখ খোলেনি। কিন্তু একমাত্র ভাইয়ের অবস্থা দেখে লক্ষ্মীমণি চুপ করে থাকেনি। বিক্রমদেবের কাছে গিয়ে আছড়ে পড়ে বিচার চেয়েছিল। তাঁকে সব খুলে বলেছিল। জানত, দুর্দান্ত এই জমিদার প্রজার ঘরের মেয়ে বউয়েদের সন্তানের চোখে দেখেন। তাঁর কাছে কোনো লজ্জা করেনি। কোন অপরাধে ভাইয়ের এই দশা তা বলতে এতটুকু দ্বিধা করেনি।

সব শুনে বিক্রমদেবের মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল। প্রথমে একটি কথাও বলেননি। নিঃশব্দে খোঁজ-খবর নিয়ে তারপর নিজে লক্ষ্মীমণির ঘরে গিয়ে গগনের অবস্থা দেখে এসেছেন, তারপর নিজের বৈদ্য পাঠিয়েছেন।

সে যাত্রায় অনেক কষ্টে গগন বেঁচে উঠেছিল। কিন্তু কেউ জানে না মরতে মরতে সে যাত্রা বেঁচে উঠেছিল আর একজনও। সে অনলদেব। চোরা-কুঠরিতে হাত-পা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে সতের বছরের ছেলেকে অমানুষিক মার মেরেছিলেন বিক্রমদেব। তারপর একসময় অচৈতন্য দেহটাকে পাঁজাকোলা করে স্ত্রীর ঘরে ছুঁড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই মূর্তি দেখে ভয়ে ত্রাসে স্ত্রী কাঠ। পরে নিঃশব্দে চোখের জল মুছেছেন আর ছেলের সেবা করেছেন। এবার বাইরে থেকে বৈদ্য এসেছে। সবাই জেনেছে আসল বসন্তে অমলদেব মরমর। সেরে ওঠার পরেও সর্বাঙ্গ বহুদিন কালিবর্ণ আর সমস্ত শরীরে চাকা চাকা শুকনো দাগ দেখেছে সকলে। এর পর দুতিনটে বছর সেরকম বেচাল আর শোনা যায়নি। কিন্তু সেই থেকে বাবার প্রতি ভয়ের সঙ্গে রাগ আর ঘৃণার বিষে অনলদেবের ভেতর নীল।

## তিন

অনলদেবের কুড়ি বছরে চোদ্দ বছরের সুচারুর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বউ ঘরে আনলেন বিক্রমদেব। কাছারি ঘরে পুরুত শশধর চক্রবর্তীর বিচারের পথ ধরে বড় আশ্চর্যভাবে বিক্রমদেবেরই নিজের ঘরের একটা মস্ত ব্যাপারের ফয়েসলা আপনা-আপনি হয়ে গেল। তাঁরই কোপ থেকে অসহায় বাপকে বাঁচাতে যে নীলবর্ণা কিশোরী সবার চোখ ধাঁধিয়ে বিদ্যুৎশিখার মতো তাঁর মুখোমুখি রুখে দাঁড়িয়েছিল, তার মধ্যে সাক্ষাৎ শক্তির তেজ আর শ্রী দেখতে পেয়েছিলেন বিক্রমদেব। বড় আশ্চর্যভাবে মা তাঁর দুর্ভাবনা মিটিয়েছেন। ছেলেকে ঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্যে ঘরে ঠিক এরকমই শক্তি প্রতিষ্ঠার দরকার ছিল। ইষ্টদেবী দয়া করেছেন। বিক্রমদেবেরই রোষের পথ ধরে বড় বিচিত্রভাবে সেই শক্তির আধার তাঁরই ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ছেলের জন্যে আর দুশ্চিন্তা করবেন না তিনি।

অনলদেবের সঙ্গে সুচারুর বিয়েতে অসন্তুষ্ট শুধু দু'জন—অনলদেব নিজে আর তার মা স্বর্ণময়ী দেবী। জমিদার গিন্নীর খেদের কারণ সুচারুর গায়ের রং, তার বাপের দৈন্যদশা আর বংশপরিচয়। তাঁর অমন রাজপুত্র ছেলের জন্যে কিনা হা-ঘরে বামুন পুরুতের এমন কালো মেয়ে! ভেতরের বিদ্বেষে সুচারুকে শুধু কালোই দেখেছেন তিনি। তার অপূর্ব শ্যামশ্রী চোখে ধরলেও মুখে কখনো স্বীকার করেন নি। সুচারুকে বিষ-নজরে দেখার আরো বড় কারণ যে সে তাঁর বড় আশায় ছাই দিয়ে এ বাড়ির বউ হয়ে বসেছে। একমাত্র ছেলের বিয়ে নিয়ে স্বর্ণময়ীর অনেক সাধ ছিল। কিন্তু তাঁর ওজর-আপত্তি অনুনয়-বিনয় চোখের জল সব ব্যর্থ হয়েছে। বিক্রমদেব তার কোনো কথাই কানে তোলেন নি। কাছারি বাড়িতে এক দঙ্গল লোকের সামনে কালীর নাচ নেচে অমন বাঘা জমিদারকে ঘায়েল করে যে মেয়ে সরাসরি অন্তঃপুরে নিজের জায়গা করে নিয়েছে তাকে যে ঘাড় ধরে নিজের ইচ্ছেমতো চালাতে পারবেন না এ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। আর সে জন্যেই আরো রাগ, আরো জ্বালা। বউ এমনিতে বেশ সোজা-সরল, হাসিখুশি। কিন্তু অন্যায় কিছু দেখলে বা শুনলে তার কালো চোখের তারায় যে আগুন ঝলসে ওঠে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। সে আগুনের আঁচের মুখে স্বর্ণময়ীও কয়েকবার পড়েছেন। ঝাঁঝ দেখিয়ে নানা ছুতোনাতা দেখিয়ে বউয়ের সামনে থেকে তখনকার মতো সরে গেছেন। পরে নিজের মনকে বুঝিয়েছেন স্বামীর জন্যেই ভয়, নয়তো এ বউকে তিনি দুদিনে ঢিট করে ছাড়তেন। কিন্তু নিজের ভেতরে আসল সত্যিটা ঠিকই বুঝতেন তিনি। স্বামীকে নয়, আসলে চোদ্দ বছরের ঐ বউকেই তিনি মনে মনে ভয় করেন। বউয়ের ভেতরের কোন এক অজানা জোরকে ভয় করেন। এই সহজ সাধারণ মেয়ের ভেতরে কিসের যেন একটা বিরাট শক্তি লুকিয়ে আছে।

অনলদেবের সুচারুকে অপছন্দের কারণ আলাদা। সতের বছর বয়স থেকে যে বাবাকে শুধু বিষম ভয় আর ঘৃণা করে এসেছে, সেই বাবার চোখের মণি হয়ে এই মেয়ে তার ঘর করতে এসেছে। ফলে এই বউ তার শত্রুপক্ষ। তার ওপর কি ভাবে

তেজ দেখিয়ে বাবাকে বশ করেছে শুনেছে। শুনে সেই তেজ ভাঙার নিষ্ঠুর উল্লাসে হাতদুটো নিশপিশ করে উঠেছিল। এই বউকে জব্দ করতে পারা মানে বাবাকে জব্দ করা, এর তেজ ভাঙা মানে বাবাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো যে অনলদেবও কম মরদ নয়। কিন্তু অনলদেব শেষ পর্যন্ত না পেরেছে বউকে জব্দ করতে, না পেরেছে তার তেজ ভাঙতে। কখনো সোহাগের ছলে কখনো বা শুধুই ত্রাস সৃষ্টি করার জন্যে সুচারুর দেহমনের ওপর দিয়ে ঝড় বইয়ে দিয়েছে দিনের পর দিন। সুচারু মুখ বুজে সহ্য করেছে, কিন্তু এতটুকু ভয় পায়নি। সব কিছুর পর উল্টে যে-ভাবে ফিরে চেয়ে থাকত তাতে অনলদেবেরই কেমন অস্বস্তি হতো। আস্তে আস্তে নিজের ভেতর থেকেই কেউ যেন বলে দিয়েছে, ইচ্ছে করলেই এ মেয়েকে নিয়ে যা খুশী করা চলে না, এই মেয়ে আলাদা।

নিজের দুর্বলতা ঢাকা দেবার জন্যেই অনলদেব বউয়ের সঙ্গে খোঁটা না দিয়ে কথা বলত না। রঙের খোঁটা, বাপের দারিদ্র্যের খোঁটা, তিলককাটা পুরুতের মেয়ের তেজের খোঁটা, তাদের ঘরের বিগ্রহ বেণুগোপালের খোঁটা, বউয়ের ভালবাসার যা কিছু সব নিয়ে খোঁটা। নিজেকে নিয়ে হাজার বিদ্রূপেও সুচারু এতটুকু রাগত না। বরং যে খোঁটা দিচ্ছে তার দুর্বলতা ধরে ফেলেই যেন মুক্তোর মতো দাঁতে লাল পাথর চেরা ঠোঁটের কোণ কামড়ে একটু একটু হাসত, কৌতুকে চোখের কালো মণি ঝকমকিয়ে উঠত। তখন অনলদেবও তার কালো বউয়ের এই রূপের তল খুঁজে পেত না। লোভে প্রত্যাশায় সে-সময়ের মতো আপোসের রাস্তা ধরত। কিন্তু গরীব বাপের সম্বন্ধে বা বেণুগোপাল সম্পর্কে বা যে কোনো প্রিয়জনের ব্যাপারে এতটুকু ঠেসের আভাসেও সুচারুর অন্য মূর্তি। যেন সজল মেঘের ভেতর থেকে বিদ্যুতের লাল শিখা ঝলসে উঠত, বেশীক্ষণ সওয়া যেত না।

জমিদার বাড়িতে এই করে ধীরে ধীরে দুটো প্রতিপক্ষ তৈরি হচ্ছিল। একদিকে বিক্রমদেব-সুচারু, অন্যদিকে অনলদেব আর তার মা। বউ ঘরে আনার পর থেকেই দ্রুত পাল্টাচ্ছিলেন বিক্রমদেব। তাঁর মেজাজ গেছে, খেয়াল গেছে আর বিলাস-ব্যসন তো একেবারে গেছে। আশ্চর্য প্রশান্তিতে তিনি সব সময় আত্মমগ্ন। জমিদারির ভার পুরোপুরি দেওয়ানজীর ওপর ছেড়ে দিয়ে অনলদেবকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। দিনের বেশীর ভাগই এখন মায়ের মন্দিরে পড়ে থাকেন। সেখানে ছেলের বউ তাঁর প্রায় সারাক্ষণের সঙ্গী। সুচারুও এই মন্দির আর শ্বশুরকে আঁকড়ে ধরেছে।

শ্বশুর যেমন একদিকে পালটেছেন তার ঘরের লোকেরও আরেক ভাবে খুব দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল, চরিত্র বদলাচ্ছিল। বাবা যত অন্তর্মুখী তার ততো বারমুখো হবার সুবিধা। নারীদেহের সব রহস্য জেনে ফেলার পরে তখন ঘরের আকর্ষণ দিনে দিনে কমছে। বিক্রমদেব মন্দির নিয়ে পড়ে থাকার ফলে পুরোপুরি লায়েক হয়ে উঠতে কোনো বাধা নেই। আর সর্ব ব্যাপারে সহায় তার মা। বউয়ের ওপর প্রবল আক্রোশে ছেলের মতিগতিতে কোনোরকম বাধা দেওয়া দূরে থাক বরং পরোক্ষে ইন্ধন যুগিয়ে চলছিলেন সমানে। এই মা-ছেলের প্রতি ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় ভেতরটা রি-রি করে উঠত সুচারুর। আবর্জনার মতো যতটা পারে এদের এড়িয়ে চলত। তার একমাত্র ভাললাগার

জায়গা মন্দির। মন্দিরে শ্বশুরের সঙ্গে যতক্ষণ থাকে সব ভুলে থাকে। শ্বশুরকে সে ইষ্টবিগ্রহের থেকে কম ভক্তি করত না, আবার সেই সঙ্গে প্রাণ দিয়ে ভালও বাসত। প্রতিদিন বিক্রমদেবের আরতি দেখার অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকত। তাঁর আশ্চর্য শঙ্খ-আরতি রোজ দেখেও আশ মিটত না। আরতি শেষে শ্বশুর যখন নিজের হাতে তার মাথায় কপালে সেই পুণ্য জল ছোঁয়াতেন, অদ্ভুত আনন্দে আর শান্তিতে সমস্ত শরীর এলিয়ে আসত, মনে হত সেখানেই ঘুমিয়ে পড়বে। গাজনপুরের মানুষ সন্ধ্যারতির সময় মুগ্ধ বিস্ময়ে বিক্রমদেবের টকটকে মূর্তির পাশে একখানি নীল শিখার মতো মেয়েকে দুচোখ ভরে দেখত। আপন মহিমায় সেই নীলিমা পাথর-প্রতিমার কৃষ্ণনীলে মিলে মিশে এক হয়ে যেত। শুধু সুচারুই কিছু বুঝত না।

সতের বছর বয়সে সুচারুর প্রথম সন্তান এসেছিল, মেয়ে। শাশুড়ীর মুখ ভার, অনলদেবও খুশী নয়। প্রথম সন্তান, সবাই বংশধর আশা করেছিল। কিন্তু বিক্রমদেব ভারী খুশী। হুবহু সুচারুর মুখ, শুধু গায়ের রং পিতৃধারার। আঙুল ছোঁয়ালে যেন রক্ত ফেটে পড়বে এমন টুকটুকে ফরসা। কালে-দিনে এই মেয়ে যে অপূর্ব রূপসী হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিক্রমদেব নাতনীর নাম রাখলেন শুভলক্ষ্মী। প্রথম সন্তান মেয়ে হলে নাকি বাপের শুভ হয়।

কিন্তু অনলদেবের অশুভ রাস্তায় পা ফেলার ঝোঁক দিন দিন বেড়েই চলেছিল। স্ত্রীর অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার সময় থেকে প্রকাশ্যেই অন্যত্র রাত কাটানো শুরু হয়েছিল। অত বড় জমিদারির সবটাই তখন তার হাতের মুঠোয়। বাবা ইষ্টদেবী নিয়ে বিভোর আর অন্দরমহলে মা সহায়। পরোয়া আর কাউকে করত না। তবু বাইরে রাত কাটিয়ে ফিরে আসার পর যেটুকু অস্বস্তি তা কেবল নিজের স্ত্রীটির কাছে। একটি কথাও বলে না কিন্তু মুখের দিয়ে এক নজর তাকিয়েই সুচারু স্পষ্ট বুঝতে পারে কোথা থেকে ফিরল। অথচ বন্ধুবান্ধব নিয়ে অনেক সময় বার-বাড়িতেও রাত কাটায়। তখন বউয়ের চোখমুখের চেহারা অন্যরকম। তার মুখের দিকে তাকিয়ে তখন সুচারুর চোখ থেকে গলগলে ঘৃণা ঠিকরোয় না বা ছোঁওয়া বাঁচানর জন্যে শরীর কুঁকড়ে ওঠে না। অনলদেব বুঝে উঠতে পারে না ভেতর বাড়ির অন্দরমহলে বসে বউ তার সব কিছু কি করে ঠিকঠিক টের পায়।

নেশার মাথায় আর ইয়ারবন্ধুদের উসকানিতে অনলদেব সেবার একটা মজার খেলা বার করল। বউকে জব্দ করতে ভোগের আসর থেকে উঠে এসে হঠাৎ হঠাৎ মাঝরাতে ঘরে হানা দেওয়া শুরু করল। প্রথম প্রথম ঠিক বুঝে উঠত না সুচারু। পরে বোঝার পর মেয়ে নিয়ে শোবার ঘর আলাদা করে দরজায় হুড়কো এঁটেছে। কটা দিন হামলা না করে চোখ কুঁচকে মজা দেখেছে অনলদেব। খেলা জমে উঠেছে। আরও জমুক। সে চাইলে ওই হুড়কো ভাঙতে কতক্ষণ। আপাতত বাইরে থেকে ভোগের যে নতুন পুতুলটিকে আনিয়েছে তাকেই ভাল করে নেড়েচেড়ে দেখার ইচ্ছে। ততদিন ঘরের খেলা মুলতুবি থাকলে রগড় বরং আরো বাড়বে।

কিন্তু সে রগড়ের শুরুতেই দুহাতে মুখ ঢেকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল অনলদেবকে। বাইরের মোহ ফিকে হয়ে আসতে হঠাৎই এক রাতে পুরনো মজার

ঝোঁক চাপল। কিন্তু সুচারুর ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। প্রবল দুটো ধাক্কা দেবার পর আর দরকার হলো না, ভেতর থেকেই দরজা খুলল। টলতে টলতে অনলদেব ঘরে ঢুকল। মেয়ে ঘুমচ্ছে আর খাটের বাজু ধরে সুচারু দাঁড়িয়ে। সেখানে আয়েস করে বসতে যেতেই চাপা তীক্ষ্ণস্বরে বাধা এল, 'ওখানে নয়, এত রাতে বাচ্চাটাকে চান করানো যাবে না!'

অনলদেব থমকালো কিন্তু পরক্ষণেই ব্যাপার বুঝে আরো মজা। তার ছোঁওয়া লাগলে এখন বাচ্চাটাকেও চান করাতে হবে? এতই অশুচি সে? মজা বাড়ছে অনলদেবের। খাটে না বসে স্ত্রীর দিকেই এগুলো। কাঁধে একটা হাত রাখতে যেতেই মুখের ওপর গলানো ঘৃণার ঝাপটা মেরে ছিটকে সরে যেতে গেল সুচারু। কিন্তু অনলদেব তৈরীই ছিল, তার আগেই শক্ত দু হাতের থাবায় ধরে ফেলেছে। তেমনি ধরে থেকেই নিজের কাছে টেনে আনল, বলল, 'এত ঘেন্না? আমার ছোঁওয়া লাগলে এখন বাচ্চাটাকে পর্যন্ত জল ঢেলে শুদ্ধ করতে হবে? বলি ওটা এলো কোত্থেকে? এই নোংরা লোকটাই ওর ঠিকঠিক বাপ তো?'

দুবা মুঠোর মধ্যে সুচারুর নরম শরীর ধনুকের ছিলার মতো টানটান হয়ে উঠছে টের পেয়ে অনলদেবের আরো মজা। আপন জনের কাছে খুব গোপন কথা ফাঁস করার মতো সুচারুর মুখের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'যে শ্বশুরকে নিয়ে রাতদিন মন্দিরে পড়ে থাক, তুমি আসার আগে পর্যন্ত সে শর্মাও এমন বহু রাত বাইরে কাটিয়েছে। এখন ঘরের মধ্যেই এমন কচি সাধন-সঙ্গিনী জোটাতে পেরে নিশ্চিন্তে ধার্মিক হয়ে উঠেছে।' হাসতে হাসতে গলায় কপট খেদ ঝরালো, 'তা বেশ তা বেশ, কিন্তু যত দোষ আর ছোঁওয়াছুঁয়ি কেবল এ অভাগার বেলায়?'

সুচারুর মাথার মধ্যে নিমেষে কি ঘটে গেল নিজেও জানে না। অনলদেব কিছু বুঝে ওঠার আগেই চোখ মুখ বেড়িয়ে প্রচণ্ড আঘাতে দুহাত তফাতে ছিটকে পড়ল। ছুঁচলো ভারী কঙ্কণের এক আঘাতেই মাটি নিতে হয়েছে। কতক্ষণ পরে জানে না, দুহাতে মুখ ঢেকে আস্তে আস্তে উঠে বসেছিল। মাথাটা তখনো প্রচণ্ড ঝিমঝিম করছে, রক্তের ফোঁটা মাটিতে পড়ে মেঝে লাল হয়ে উঠেছে। তাকিয়ে দেখে, যেন একখানা জ্বলন্ত আগুনের গোলা তার দিকে চেয়ে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। অনলদেব সভয়ে দেখল সেই আগুনের গোলা আবার তার দিকে এগুচ্ছে, তাকে গ্রাস করতে আসছে। চেয়ে থাকতে না পেরে দু'চোখ বুজে ফেলল। দুটো আগুনের হাত তাকে চৌকাঠের বাইরে বার করে দিল, তারপর শব্দ করে দরজাদুটো বন্ধ হয়ে গেল।

চোরের মতো সে রাতে মায়ের ঘরে সেঁধিয়েছিল অনলদেব। কাপুরুষের অনেক ছল। রক্তমাখা মুখে মার কাছে গিয়ে বউয়ের কীর্তি দেখিয়েছে। দেখে স্বর্ণময়ী আঁতকে উঠেছেন। চোখের জল ফেলে অনলদেব বলেছে, বউ তাকে কি চোখে দেখে জেনেও ওই বউয়ের কাছেই না গিয়ে পারে না। আজ জোর করে দরজা খুলিয়েছে বলে এই অবস্থা করে ছেড়েছে। বাবার আস্কারাতেই এতখানি বাড়তে পেরেছে। এর পরেও যদি মা বাবার সঙ্গে বোঝাপড়া করে কোনো ব্যবস্থা না করে তো সে আত্মঘাতী হবে, কেউ ঠেকাতে পারবে না।

শিউরে উঠে জমিদারগিন্নী ছেলের মুখে হাত চাপা দিয়েছেন।—বালাই ষাট! ছেলের শত্তুর মরুক, যে তার ছেলের রক্ত ঝরিয়েছে সে গলায় রক্ত উঠে মরুক, ছেলে আত্মঘাতী হতে যাবে কোন দুঃখে! শুধু সকাল হবার অপেক্ষা, বোঝাপড়া এবার তিনি খুব ভালভাবেই করবেন। ছেলেকে নিজের বিছানায় শুইয়ে এক হাতে তার ক্ষত পরিষ্কার করেছেন আর অন্য হাতে নিজের কপাল চাপড়েছেন।

পরদিন বিচারে বসেছেন বিক্রমদেব। সুচারুকে ডাকিয়ে আনানো হয়েছিল। আগেই চোখের জলে ভেসে স্ত্রী তাঁকে সমাচার জানিয়েছেন, ছেলের মুখের ক্ষত দেখিয়েছেন, কারণ হিসেবে ছেলে তাঁকে যা জানিয়েছিল স্বামীকে তাই বলেছেন। এত তেজ বউয়ের যে কারুর অনুমতি না নিয়ে শোবার ঘর আলাদা করেছে। তার ইচ্ছে না হলে ছেলে তার ঘরে ঢুকতে পর্যন্ত পারবে না। তবু ওই বউয়ের কাছেই যেতে চাওয়ার ফলে ছেলের এই হাল। লজ্জায়-দুঃখে আত্মঘাতী হতে বসেছিল ছেলে, তিনি অতি কষ্টে সামলেছেন। এর পরেও যদি ওই সব্বনেশে বউ নিয়ে ঘর করতে হয় তাহলে ছেলেকেও খোয়াতে হবে। তাকে বাঁচাতে হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেখেশুনে একটি শান্ত আর লক্ষ্মীমন্ত বউ আনা দরকার।

ছেলের ক্ষত দেখে আর স্ত্রীর অভিযোগ শুনে বিক্রমদেবের মুখ থমথমে হয়ে উঠেছিল, কিন্তু শেষের আর্জি শুনে এমন ভ্রূকুটি করে তাকিয়েছেন যে স্ত্রী চুপ। বউ এসে দাঁড়ানোর পর লক্ষ্য করলেন ছেলে তার দিকে ভাল করে তাকাতেও পারছে না। উল্টে তারই অপরাধীর মুখ, বউয়ের মুখে ভয়ডরের কোনোরকম লেশমাত্র নেই। বিক্রমদেব দেখলেন, বউয়ের স্নিগ্ধ শ্যাম মুখ ছুরির ফলার মতো ধারালো হয়ে উঠল, সর্ব অঙ্গ ঠিকরে নীল আগুন দু চোখের তারায় এসে জমাট বাঁধতে লাগল, তারপর তা গলগল করে ছেলের গায়েমুখে ঝাপটে পড়ল, পড়তেই থাকল। বিক্রমদেব স্পষ্ট দেখলেন ছেলে কুঁকড়ে যাচ্ছে, আর তার মা-ও নিজের অজান্তেই অন্য দিকে চোখ সরিয়ে নিয়েছেন।

আর দরকার নেই বুঝেও বিক্রমদেব বউয়েব কাছে কৈফিয়ত চেয়েছিলেন। এবার তাঁর চোখে চোখ রেখে অনুচ্চ হিসহিসে গলায় সুচারু একটি একটি করে বলেছিল, অশুচি হয়ে এসেছিল। নিষেধ করা সত্ত্বেও সে অবস্থায় ছুঁয়েছিল। আর, আরো অশুচি কথা বলেছিল।

অনলদেব আর দাঁড়ায়নি, চোরের মতোই পালিয়ে বেঁচেছে। বিক্রমদেব স্তব্ধ খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ স্ত্রীর দিকে ফিরে আগের দিনের মেজাজে গর্জে উঠেছিলেন, 'ফের বিয়ের কথা তুললে ছেলেকেই দূর করে দেব, আর বউয়ের অনুমতি ছাড়া সে তার ঘরে ঢুকবে না! আমার হুকুম। ছেলে যেন ভুলে না যায় আমি এখনো বেঁচে আছি।'

বাবার হুকুম শুনে অনলদেব বিষম আক্রোশে ফুঁসেছে আর মনে মনে দাঁতে-নখে বউয়ের শ্যামতনু ফালাফালা করেছে। যাতে সুচারুব আপত্তি এবার থেকে সেগুলোই করার ভীষণ রোখ চাপল। ছোটখাট ঘটনার মধ্য দিয়ে দানা বাঁধতে বাঁধতে এই বিরোধ একদিন চরম আকার নিল। স্ত্রীর নীরব প্রতিরোধের দেওয়াল কিছুতেই ভাঙতে না পেরে তার আসল জায়গায় ঘা বসালো অনলদেব। সদম্ভে ঘোষণা করল, আগামী কৃষ্ণা

পঞ্চমীতে আবার বলি চালু হবে। শ্যামাকালীর মন্দিরে বলি বন্ধ হবার কারণ সুচারু। সে ঘরে আসার পরেই এক অদ্ভুত ঘটনার মধ্য দিয়ে বংশের কুলপ্রথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অমাবস্যার পঞ্চমী তিথিতে শুভযোগে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিক্রমদেব। তারপর থেকে প্রতি কৃষ্ণা পঞ্চমীতে বিশেষ ভাবে মায়ের পুজো হয়ে আসছিল আর ছাগবলি সে-পুজোর একটা বিশেষ অঙ্গ ছিল। ছেলের বিয়ে দিয়ে সেবারের পুজোতে একটু বেশী ঘটার আয়োজন করেছিলেন বিক্রমদেব। চারিদিকে লোক পাঠিয়ে অজস্র কালো কুচকুচে নিখুঁত ছাগশিশু জড় করা হয়েছিল। সেগুলোর দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা মুচড়ে মুচড়ে উঠেছিল চোদ্দ বছরের সুচারুর।

পুজোর আগের সারাটা দিন দমবন্ধ যাতনায় ছটফট করেছে সুচারু। শেষে আর থাকতে না পেরে সরাসরি শ্বশুরের কাছেই আর্জি রেখেছে, বলি না দিলে কি হয়? বিক্রমদেব সুচারুর যন্ত্রণা বুঝতে পারেননি। ভেবেছিলেন ছেলেমানুষ বউ বলির নামে ভয় পেয়েছে। বলেছিলেন তাঁদের বংশে বলি মায়ের পুজোর অঙ্গ। সুচারুকে তবু নিশ্চুপে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হেসে বুঝিয়েছিলেন, 'যার যেমন পুজো।...নাড়ু বা ক্ষীরের তক্তি ছাড়া তোমার বেণুগোপালের পুজো কি ঠিকমতো হবে, না তাঁর মন ভরবে?' সুচারু আর কিছু না বলে চুপচাপ চলে গেছল। তার প্রতিমার মতো মুখে বিষাদের ছায়া পড়ে আরো নীলচে দেখাচ্ছিল। ঘুরে ফিরে সমস্ত দিন সেই মুখ বুকের ভেতর খচখচিয়ে উঠছিল বিক্রমদেবের, নিজের ভেতরটাও বিষণ্ন হয়ে উঠেছিল। সে রাতেই তিনি এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন তাঁর ইষ্টদেবী শ্যামাকালীর কোলে বেণুগোপাল, তাঁর হাতে ক্ষীরের তক্তি আর নাড়ু। মা বেণুগোপালের হাত থেকে নাড়ু-তক্তি খাচ্ছেন আর হাসছেন, হাসছেন আর খাচ্ছেন। বিক্রমদেব স্পষ্ট শুনলেন কেউ যেন বলে দিল, মা আজ থেকে মহাবৈষ্ণবী রূপে তাঁর ঘরে রইলেন। তাঁর পুজোয় একফোঁটা রক্তও যেন কোনোদিন আর না পড়ে। বিক্রমদেব আবারও দেখলেন মা হাসছেন। অপরূপ প্রসন্ন সেই হাসি।

রোমে রোমে কাঁটা দিয়ে জেগে উঠেছিলেন বিক্রমদেব। ভেতরটা এক অনাস্বাদিত আনন্দে ভরপুর। মায়ের স্বপ্নাদেশের কথা সংসারে জানিয়ে বংশের বলিপ্রথা রদ করেছেন। সুচারুর বুকে আনন্দের বান। শ্বশুরের হুকুম নিয়ে ছুটে গিয়ে নিজের হাতে ছাগশিশুগুলিকে মুক্তি দিয়েছে। কিশোরী বউয়ের সেই আলো-মাখা মুখ দেখে বিক্রমদেবের বারবার মনে হয়েছিল তাঁদের সকলের পুণ্যে এই মেয়েকে ঘরে আনতে পেরেছেন।

ইদানীং অনলদেবের সেই পুরনো প্রথা চালু করার ঝোঁক। বাবার বিচারের রায় শুনে নানাভাবে সুচারুকে জব্দ করার চেষ্টা চলছিল, কিন্তু তার কঠিন নীরবতার বর্মে সব চেষ্টাই ঘা খেয়ে অনলদেবের নিজের গায়েই ফিরে লাগছিল। রীতিমতো মাথা খাটিয়ে বউকে জব্দ করতে অনলদেব শেষে এই পথ বের করেছে। মার কাছে জানিয়েছে, ইদানীং প্রায়ই নানা দুঃস্বপ্ন দেখছে সে। জমিদারিতেও নানা ঝামেলা জট পাকাচ্ছে, তাই নানা চিন্তায় এক মস্ত তান্ত্রিকের কাছে গিয়েছিল। সব শুনে তিনি নাকি বলেছেন, বংশের এতকালের নিয়ম বন্ধ করার ফলেই এমন হচ্ছে। শক্তিপূজায় শোণিত অর্ঘ্য বন্ধ করা

মহাপাপ। তাঁর এবং অনলদেবেরও ধারণা, বউয়ের প্রতি অত্যধিক স্নেহবশত তার আর্জি শুনে সারাদিন তা নিয়ে চিন্তা করেছিলেন বিক্রমদেব আর সে জন্যেই না কি স্বপ্ন দেখেছেন। শ্যামাকালীর বিগ্রহের বর্ণনা শুনে সেই মহাতান্ত্রিক নাকি শিউরে উঠে অনলদেবকে বলেছেন, পঞ্চ 'ম' কার ছাড়া এ দেবীর পুজো কখনো সিদ্ধ হয় না। এতদিন যা হয়েছে হয়েছে, শোণিত-সুরার অর্ঘ্য দিয়ে এখুনি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। শুনে জমিদার-গৃহিণীর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। একফোঁটা মেয়ের জন্যে কর্তার এতদিনের কুলপ্রথা তুলে দেওয়াটা তাঁর একটুও ভাল লাগেনি। ছেলের কথা শোনামাত্র পড়িমরি করে তিনি বিক্রমদেবের কানে সব তুললেন। শুনে বিক্রমদেব স্ত্রীকে একটি কথাও না বলে তাঁর সামনেই ছেলেকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এই বাপের সামনে ছেলের এখনো মাথা নিচু। তার দিকে চেয়ে কঠিন গলায় বলেছেন, ইদানীং কোন্ তান্ত্রিকের কাছে তোমার এত যাতায়াত তা খুব ভাল করেই জানি। আর পঞ্চ 'ম'-কারে পুজোর এত ঝোঁক কেন তাও জানি। কিন্তু পঞ্চ 'ম'-কারের পুজোর আসল তাৎপর্য বোঝার ক্ষমতা তোমার বা তোমার ওই তান্ত্রিক কারুরই নেই, জানো এর আসল অর্থ?

অনলদেব চুপ, মাথা তেমনি নিচু। বিক্রমদেব এবার ভীষণ গলায় বলেছেন, 'খুব ভাল করে জেনে রাখ পুজোর নামে ব্যভিচার মা সইবেন না। এখনো সংযত হও, নয়তো এরপর মা একেবারে মহাবলিই নেবেন।'

মহাবলি অর্থাৎ নরবলি। জমিদার-গৃহিণী শিউরে উঠেছিলেন, আর অনলদেবও তখনকার মতো চুপচাপ বাবার সামনে থেকে সরে গিয়েছিল। কিন্তু সারাক্ষণ মনে মনে ফুঁসেছে আর বউকে শুনিয়ে মাকে বলেছে, 'বাবার ভীমরতি ধরেছে। নয়তো হা-ভাতে বোষ্টম ঘরের মেয়ের কথায় এমন কাজ করে? এর ফল ভাল হবে না।'

সুচারুর বাপের বাড়ির ইষ্ট বেণুগোপাল, তার বাবা গরীব সুতরাং সে বোষ্টম হা-ভাতে ঘরের মেয়ে। যে সুচারু পারতে অনলদেবের সঙ্গে নিজের থেকে একটা কথা বলে না, এই খোঁচা শুনে সেদিন হঠাৎ বলে বসল, 'বোষ্টম ঘরের এই হা-ঘরের মেয়ের কথাতেই এবার থেকে সব কিছু হবে। তোমার সাধ্য থাকে তো আটকিও।'

কথাটা বলে ফেলেই নিজেও কম অবাক হয়নি সুচারু। এমন কথা সে তো কখনো বলতে চায়নি। তবে কেন বলল, কে বলাল? কিন্তু যা হবার ততক্ষণে তা হয়েই গেছে। অনলদেবের পৌরুষে ঘা পড়েছে। ক্ষিপ্ত হয়ে সে ঘোষণা করেছে, সামনের কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে সে-ও একটা পুজো করবে, শ্যামাকালীর বিকল্পে ঘট পেতে তাঁকে উদ্দেশ্য করেই বলি দিয়ে পঞ্চ 'ম' কারের সাধনা করবে। দেখা যাক বোষ্টমের মেয়ের দৌড় কত!

এই প্রথম ভেতরে এক অজানা ভয়ের ছায়া পড়েছে সুচারুর। মনে সব সময় একটা চাপা শঙ্কা, মন্দিরে গিয়েও স্থির হতে পারে না। একবার ভেবেছে শ্বশুরকে সব জানাবে। কিন্তু বারবার ভেতর থেকে বাধা এসেছে। মন বলেছে, এ লড়াইয়ে মা-ই তাকে নামিয়েছে, মা-ই তার মুখ দিয়ে এমন স্পর্ধার কথা বলিয়েছে, এখন সব দায় মায়ের। সে কাউকে কিছু বলবে না, যা করার মা-ই করবে। বিক্রমদেবের দিকে চেয়েও আজকাল কিরকম অস্বস্তি হয় সুচারুর। তাঁর গৌরবর্ণে সর্বদা যেন আগুনের আঁচ, বড়

বড় চোখে দূরের তন্ময়তা। রাতেও ইদানীং বাড়িতে ঢোকেন না, মন্দিরেই পড়ে থাকেন। যেটুকু কথাবার্তা শুধু তার সঙ্গে, তাও খুব কম। বুক দুরদুর করে সুচারুর। প্রথম বয়সের মতো সব ছেড়েছুড়ে শ্যামাকালীকে নিয়ে আবার উধাও হবেন না তো? তাঁর দিকে চেয়ে কেন যেন দূরের ছায়া দেখে সুচারু। এতটাই নিশ্চিন্তি, পঞ্চমুখী শঙ্খ তার নিয়মে রোজ ঘুরছে, জল পঞ্চধারায় রোজ পড়ছে, সুতরাং কোনোরকম অমঙ্গল ঘটতে পারে না।

সেদিন অমাবস্যার পঞ্চমী তিথি। পুজোর আয়োজনে সুচারু বাইরে ব্যস্ত কিন্তু ভেতরে ভেতরে ঝড় বয়ে চলেছে। ক'দিন আগেই জেনেছে, অনলদেব গোপনে তার নিজস্ব পুজোর আয়োজন করেছে। ঐ একই তিথিতে শ্যামাকালীর বিকল্প ঘটের সামনে শোণিত-সুরার অর্ঘ্য দিয়ে পঞ্চ 'ম' কারে পুজো করবে। অর্থাৎ মৎস্য-মাংস-মদ-মৈথুন ও মুদ্রা দিয়ে বৈষ্ণবী মায়ের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য দেবে। বলির যোগাড়ও সারা। শুধু কোথায় পুজো হবে জানে না। কদিন ধরে সমস্ত রাত দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি সুচারু। মা তাকে এ কি পরীক্ষায় ফেলল? সে কি করবে? এখনো কি শ্বশুরকে সব জানাবে?

বহু রাতে মন্দিরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। বিক্রমদেব তখন মায়ের দিকে মুখ করে বসেছিলেন। সেই তন্ময় মূর্তির দিকে তাকিয়ে সুচারুর মুখে কথা সরেনি। সেখানে দাঁড়িয়েই নিজের সঙ্গে শেষ যোঝা যুঝেছে। বিগ্রহের চোখে চোখ রেখে বলেছে, যদি তুমি সত্যের হও, তোমার নামে কেউ এক ফোঁটা রক্তও মাটিতে ফেলতে পারবে না। দেখি তুমি আমাকে রক্ষা করো, না শেষ করো।

কৃষ্ণা পঞ্চমীর সন্ধ্যা। কলের পুতুলের মতো সুচারু বিক্রমদেবের সন্ধ্যারতির যোগাড় দিচ্ছিল আর মাঝেমাঝেই ইষ্টদেবীর দিকে চেয়ে দেখছিল। আজ তার চরম পরীক্ষা।

আরতি শুরু হলো। বিক্রমদেব আস্তে আস্তে পুজোয় তন্ময় হয়ে গেলেন। পুষ্প-প্রদীপ-চামর তারপর সবশেষে পঞ্চমুখী শঙ্খ তুলে নিলেন। সুচারুর বুকের মধ্যে অসহ্য দাপাদাপি। বহুক্ষণ ধরে আরতি চলতে থাকল। নানা মুদ্রায় বিক্রমদেব শঙ্খ-আরতির মধ্য দিয়েই যেন মায়ের পায়ে নিজেকে উজাড় করে দিতে লাগলেন। তারপর একসময় হঠাৎ নিশ্চল, দুহাত সামনে প্রসারিত, শঙ্খ সবেগে শূন্যে উঠে আবার তাঁর করপুটে ফিরে এল। বুকের ওপর থেকে যেন পাষাণ নেমে যাচ্ছে সুচারুর। ঠিক আছে, সব ঠিক আছে। কিন্তু পরক্ষণেই বিষম ঝাঁকুনি খেয়ে থরথরিয়ে উঠল। শঙ্খের পাঁচমুখ বেয়ে শান্তির জল গড়ানোর আগেই বিক্রমদেব আসনের ওপর লুটিয়ে পড়েছেন, শক্তমুঠিতে শঙ্খ তেমনি ধরা।

সে রাতে আর কোনো বলি হয়নি। বিদ্যুতের মতো সমস্ত গাজনপুরে খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। নিজের পুজোর সব আয়োজন ফেলে অনলদেব ছুটেই এসেছিল। কিন্তু মন্দিরের ভেতরে ঢুকতে পারেনি। সেখানে বিক্রমদেবের মাথা কোলে নিয়ে অব্যক্ত রোষে যে নারীর শাশ্বত সত্তা ধকধক জ্বলছিল তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেনি। সবাই দেখেছে জমিদারবাড়ির বউরানীর চোখে একফোঁটা জল নেই, শুধু আগুন, ধকধকে আগুন। সব পুড়িয়ে ছাই করে দেবার নির্মম বাসনায় সেই আগুন সন্ধার আগে

বিগ্রহের দিকে ছুটেছিল। কেউ সেই আগুনের সামনে আসতে পারেনি। শাশুড়ীও না। তারপর একসময় নিজেই কোল থেকে শ্বশুরের মাথা নামিয়ে তাঁর পায়ের দিকে হাঁটু মুড়ে বসেছে, দু পা বুকে জড়িয়ে তাতে মাথা গুঁজেছে, বহুক্ষণ সে ভাবে পড়ে থেকেছে, তারপর কোনো দিকে না চেয়ে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করেছে।

শ্বশুরের মৃত্যুর ঘোরে বহুদিন আচ্ছন্ন হয়ে ছিল সুচারু। কবে কি ভাবে সেই ঘোর কেটেছে নিজেও জানত না। আচ্ছন্নতা ভাঙতে দেখে যে তাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে ঠকালো, তারই পায়ের কাছে সে পড়ে আছে। শ্যামাকালীর মন্দিরে দেবীর পায়ের তলায় নিজেকে প্রথম খুঁজে পেয়েছিল সুচারু। মা তখনো তার দিকে চেয়ে আগের মতোই হাসছিল। চেয়ে চেয়ে সেই হাসি দেখতে দেখতে বহুদিন বাদে মাথার ভেতরে রক্ত ছলকে উঠেছিল। দিতে হবে, এবার সে যা চাইবে তা ওই পাষাণীকে দিতেই হবে। নয়তো ওই মায়াবিনীরও নিস্তার নেই, মুক্তি নেই। শেষদিন পর্যন্ত সুচারু সেই সিদ্ধির সাধনা করে যাবে।

কঠিন সংকল্পে সুচারু এবার চাবুক মেরে নিজেকে টেনে তুলেছে। বিক্রমদেবের মৃত্যুর পর মন্দিরের জন্যে পূজারী ঠিক করা হয়েছিল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বসে বসে তার পুজো দেখেছে সুচারু। সে মন দিয়েই তার কাজ করেছে কিন্তু পঞ্চমুখী শঙ্খ নাড়াতে পারেনি। প্রচুর দক্ষিণা আর দান-সামগ্রী দিয়ে তাকে বিদেয় করেছে তারপর পুজোর সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। এ পুজোর সব কিছু তার নখদর্পণে। ঠিক বিক্রমদেবের মতো করেই পুজো করে চলেছে। সে পুজোও দুচোখ ভরে দেখার মতো। কৃষ্ণশ্যাম পাথর প্রতিমার অর্চনায় নীলাঙ্গী সচল প্রতিমা। কঠিন তপে সেই জীবন্ত প্রতিমার চোখেমুখে, সর্ব অবয়ব ঘিরে এক স্থির জ্যোতি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। প্রত্যেকদিন আরতির সময় তা আরো স্পষ্ট হতো। রক্তবস্ত্রের আর রক্তচন্দনের লালিমায় শ্যামতনু আগুনের নীল শিখার মতো জ্বলজ্বল করত। পুষ্প-প্রদীপ-চামর আরতি শেষে স্থির সংকল্পে শঙ্খ হাতে নিত। তারপর শুরু হতো সেই বিচিত্র মুদ্রার শঙ্খ-আরতি। সুচারুর প্রাণটুকু যেন তখন তার দশ আঙুলের ডগায় উঠে আসত। মাটিতে না লুটিয়ে পড়া পর্যন্ত নিজেকে নিঃশেষ করা সেই আরতি থামত না। দিনের পর দিন ধরে একই ব্যাপার।

কিন্তু সুচারুর হাতেও শঙ্খ ঘুরল না। নিজের প্রাণপণ করেও তাতে প্রাণ সঞ্চার হলো না। বিক্রমদেবের মৃত্যুর দিন সেই যে স্থির হয়েছিল, তেমনি অনড় হয়েই রইল কিন্তু সুচারু, থামেনি। কঠিন সংকল্পে বুক বেঁধে প্রতিদিন শঙ্খ তুলেছে, অসহ্য আশায় প্রতিদিন থরথর করেছে, ব্যর্থতায় প্রতিদিন মাটিতে লুটিয়েছে, অবিচল একাগ্রতায় পরদিন আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। পরদিন, প্রতিদিন, দিনের পর দিন।

বিক্রমদেবের অমন মৃত্যুও নিজের নিয়মেই আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে উঠছিল। জমিদার গৃহিণী স্বর্ণময়ী দেবী সামলে নিয়েছেন। আর অনলদেব তো তার পুরনো নিয়মে কবেই ফিরে গেছে। দুনিয়া তার নিজস্ব নিয়মে ঘুরছে। কেবল সুচারুর দুনিয়াই

একেবারে ওলোট-পালট হয়ে গেছে। শ্বশুরের মৃত্যুর জন্যে স্বামী আর শাশুড়ী তাকেই দুষেছে। আচমকা এরকম একটা ধাক্কায় প্রথমটা হতচকিত হয়ে গিয়েছিল অনলদেব। ভেতরে ভেতরে বেশ ভয়ও পেয়েছিল। তারপর সেই ধাক্কার রেশ যেতে ভয়ও কেটেছে। মাকে আর নিজেকেও বুঝিয়েছে, মহাতান্ত্রিক বলেছিল, এই বিগ্রহের পুজোয় শোণিত-সুরার অর্ঘ্য না দিলে সর্বনাশ ঘটবে। সেই সর্বনাশ এড়াতেই সে নিজে গোপনে সেভাবে পুজোর আয়োজন করেছিল। কিন্তু বহুদিনের উপোসী দেবী ক্ষমা করল না, সব থেকে বড় বলি নিয়ে তবে ছাড়ল। ওই বউই এর জন্যে দায়ী, তার জন্যেই দেবী এত দিন উপোসী থেকেছে। স্বর্ণময়ী দেবী ছেলের কথা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করেছেন। তিনি এই বিশ্বাস করতেই চেয়েছিলেন। নিজেকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে অনলদেবেরও এই বিশ্বাস পুষ্ট হয়েছে। আর তার তান্ত্রিক গুরু আর সাঙ্গোপাঙ্গরা তাতে আরো মদত জুগিয়েছে।

কিন্তু এর এক বর্ণও বিশ্বাস করেনি সারা গাজনপুরের মানুষ। তারা সভয়ে কানে আঙুল দিয়েছে, অমন কথা শোনাও পাপ।

কিন্তু সুচারুর কানে সবই গেছে। শাশুড়ী আর স্বামীই সরাসরি তাকে দোষারোপ করেছে আর গালাগাল দিয়ে চলেছে সমানে। কিন্তু তাতে সুচারুর এতটুকু যায় আসেনি। সে শুধু ভাবে আর ভাবে, নিজের ভাবনাই তাকে কুরে কুরে খায়। বিক্রমদেব ছেলেকে বলেছিলেন সংযত না হলে মা একেবারে মহাবলি নেবে। তাই নিয়েছে। অনলদেব সংযত হয়নি। হয়তো হতো কিন্তু সুচারুই তাকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়েছিল। কারণ, 'হা-ঘরে বোষ্টমের মেয়ের' কথায় বিক্রমদেব বলি বন্ধ করেছেন বলে অনলদেব কটূক্তি করাতে সুচারু তাকে ক্ষমতার লড়াইয়ে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছিল, 'হা-ঘরে বোষ্টমের মেয়ের' কথাতেই এবার থেকে সব কিছু হবে তোমার সাধ্য থাকে তো আটকিও।

সেই ক্ষমতা দেখানোর নেশাতেই অনলদেবের অমন সর্বনাশা মতি। বৈষ্ণবী মাকে রক্ত খাওয়ানোর মতি। তখনো সুচারু শ্বশুরকে সব জানিয়ে স্বামীকে সংযত করতে পারত। কিন্তু তাও করেনি। নিজের ওপর অগাধ আস্থা তার, সেই আস্থায় ওই সর্বনাশের খেলায় উল্টে মাকে পরীক্ষা করতে গেছে। বিশ্বাস করেছে, সে যা করছে নিজে কিছু করছে না, সব মা করাচ্ছে। স্পর্ধা করে মাকে শাসিয়েছে, যদি তুমি সত্যি হও, একফোঁটা রক্তও কেউ তোমার নামে ফেলতে পারবে না। দেখি তুমি আমায় রক্ষা কর, না আমায় শেষ কর।

মা তার স্পর্ধার জবাব খুব ভাল করেই দিয়েছে। তার কথামতো একফোঁটা রক্তও কেউ তোমার নামে ফেলতে পারবে না। দেখি তুমি আমায় রক্ষা কর, না আমায় শেষ কর।

মা তার স্পর্ধার জবাব খুব ভাল করেই দিয়েছে। তার কথামতো একফোঁটা রক্তও পড়তে দেয়নি, অনলদেবের সঙ্গে রেষারেষির খেলায় তাকে জিতিয়েওছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেনি। বড় নিষ্ঠুর কৌতুকে তার একমাত্র আশ্রয় কেড়ে নিয়ে তাকে একেবারে নিঃস্ব করেছে।

অনলদেব বা শাশুড়ীর দোষারোপে সুচারুর কিচ্ছু যায় আসে নি। কারণ সে যে নিজেই নিজেকে দায়ী করে বসে আছে আর ভেতরে ভেতরে ছিড়েখুঁড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। তার বিশ্বাস স্বামীকে পিতৃহত্যার মহাপাপের পথে পরোক্ষে সে-ই ঠেলে দিয়েছে। ওই মহাবলির দায় যতটা না অনলদেবের, তার চতুর্গুণ তার নিজের। এর প্রায়শ্চিত্ত কিসে? এর থেকে মুক্তি কবে? এর কি কোনো ক্ষমা নেই? বিক্রমদেবের মৃত্যুর দিন থেকে চেতনে অবচেতনে এই এক জিজ্ঞাসা তাকে ক্ষতবিক্ষত করে চলেছে। ঘোর কাটতে মন্দিরে বিগ্রহের পায়ের নিচে যে দিন নিজেকে খুঁজে পেয়েছিল, ইষ্টদেবীর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একটা সম্ভাবনা সেদিন তার মাথায় ঝিলিক দিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে সেটাই এখন বদ্ধ বিশ্বাসে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে ভেবেছিল, পাপ শরীরটা ওখানেই শেষ করে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভেতর থেকে নিষেধ এসেছিল। এত সহজে নয়, অনেক পরীক্ষা দিয়ে, অনেক সয়ে তবেই উত্তরণ। প্রায়শ্চিত্তের তপে যেদিন শুচিশুদ্ধ হবে, সেদিন মঙ্গল শঙ্খ আবার নড়বে, তার পবিত্র জলের ধারা সব পাপ মুছে নেবে, সেদিন মুক্তি, সেদিন সিদ্ধি।

এরপর নিজের জীবন পণ করে সুচারু সেই মুক্তির আর সিদ্ধির সাধনায় বসেছে। শ্বাসে-প্রশ্বাসে বীজমন্ত্রের মতো বারবার একই কথা জপ করে, শঙ্খ একদিন ঘুরবেই, তার জলে পাপ মুছবেই, এ হবে, হবেই, হতেই হবে। চেতনে-অবচেতনে ওই এক জপ, সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে ওই এক তপের সাধনা। স্থির বিশ্বাস আর নিঃশেষে সমর্পণের সাধনা। এর জোরেই প্রাণটুকু জিইয়ে রেখেছে। নয়তো যা খায় আর যেটুকু ঘুমোয় তাতে কোনো মানুষ বাঁচতে পারে না। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে এক অলৌকিক শ্রী তার শ[illegible] অঙ্গ ঘিরে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। কেবল সাত বছরের মেয়ে শুভলক্ষ্মী ছাড়া তার কাছ পারতে কেউ ঘেঁষে না। টুকটুকে মেয়েটা যেন বয়সের তুলনায় অনেকটাই বেশী বোঝে। চেয়ে চেয়ে মাকে দেখে, চুপচাপ তার সঙ্গে মন্দিরে বসে থাকে, এই মাকে বড় আশ্চর্য লাগে শুভলক্ষ্মীর।

## চার

শ্বশুরের মৃত্যুর পর এই একমাত্র মেয়েকে কেন্দ্র করে ভেতরে আবার একটা বিরাট ধাক্কা পড়ল সুচারুর। মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে তান্ত্রিকের নির্দেশে আট বছরে শুভলক্ষ্মীর বিয়ে দিয়ে গৌরীদানের পুণ্য করল অনলদেব। কেউ যেমন সুচারুর মতামতের অপেক্ষায় থাকেনি, সে-ও তেমনি এ ব্যাপারে একটি কথাও বলেনি। বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে হয়নি। সদ্বংশের গরীবের ছেলে জমিদারের জামাই হয়ে শ্বশুরঘর করতে এসেছে। মেয়ের বিয়ের পর থেকেই সুচারুর মধ্যে আবার নতুন করে টানাপোড়েন শুরু হল। একমাত্র সন্তান গোত্রান্তরিত হয়ে গেল। এরপর সুচারুর জীবদ্দশায় যদি তার এই সাধনা সফল না হয় তো তারপরে কে? কে এই প্রায়শ্চিত্তের ভার নেবে? মুক্তির তপে বসবে? কার ছোঁয়ায় মঙ্গলশঙ্খ নড়বে? সব পাপ মুছবে? কার, কার, কার? হঠাৎই বিদ্যুৎঝলকের মত একটা চিন্তা মাথায় আসতেই

সমস্ত শরীর থরথর করে উঠল, দেহের প্রতিটি রক্তকণা শামলা মুখে জমাট বাঁধল। এরপর ক'দিন শুধু মায়ের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে পড়ে থেকেছে। তারপর এক অমোঘ সংকল্প নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বহুদিন পর দৃঢ় পায়ে অনলদেবের শোবার ঘরে গেছে।

এক বছর পর জমিদার বাড়িতে বংশধর এসেছে। ঘর আলো করা নাতি দেখে মনের খেদ ঘুচিয়ে সে বছরেই জমিদারগিন্নী চোখ বুজেছেন। ছেলে হবার পর থেকে জীবনে এই প্রথম যেন স্বাভাবিক হয়েছে সুচারু। শুভলক্ষ্মীও সেটা বুঝতে পারে। কাছে থাকলেও এই মা এতকাল যেন তার ধরাছোঁয়ার মধ্যে ছিল না। ভাই হবার পর তার বরের দিকেও মা এই প্রথম নজর দিয়েছে। বুড়ো দেওয়ানদাদাকে ডেকে পাঠিয়ে তার লেখাপড়া শেখা, খেলাধূলা আর ব্যায়ামচর্চার সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা করতে হুকুম দিয়েছে। ভাই আর ওকে নিয়ে মা এখন এক ঘরে শোয়। পাশের ঘরে জামাইয়ের থাকার ব্যবস্থা করে জামাইকে বার-কোঠা থেকে নিয়ে এসেছে। তারা তিন জন আর মন্দিরের শ্যামাকালী এই নিয়ে এখন মায়ের নতুন জীবন, নতুন সংসার। প্রথম প্রথম শুভলক্ষ্মী ভাবত ভাই হবার জন্যেই মা এতটা বদলেছে। কিন্তু পরে মনে হয়েছে, সেটা আসল কারণ নয়, ভাই আসার সঙ্গে মার এই পালটানোর যোগটা যেন অন্যরকমের। সেটা যে কি তা বোঝার চেষ্টা করেও শুভলক্ষ্মীর ছোট্ট মাথায় কুলিয়ে উঠত না। পুতুলের মতো ভাইয়ের সঙ্গে কত সময় নিজের মনেই মা কত কথা বলে, মাঝেমাঝেই বহুক্ষণ ধরে তার দিকে অপলক চেয়ে থাকে। অবশ্য চেয়ে থাকার মতোই সুন্দর ছেলে, চোখ ফেরানো যায় না। তা বলে মা মুগ্ধ হয়ে শুধুই ছেলের রাঙা রূপ দেখে তা শুভলক্ষ্মীর মনে হয় না। তাদের বংশে সবাই অমন টকটকে সুন্দর। শুভলক্ষ্মীর মনে হয়, ছেলের দিকে তাকিয়ে মা যেন অন্য কিছু দেখে, অনেক কিছু দেখে, আর মায়ের চোখেমুখে এক অদ্ভুত আশার আলো জ্বলজ্বল করে ওঠে।

## পাঁচ

এক এক করে বারোটা বছর কাটল। সুচারুর নিজস্ব জগৎ একই নিয়মে চলেছে। শুধু তার বয়েস যেন নিয়ম ভেঙে উল্টো দিকে হাঁটছে। ভাদ্রের ভরা নদীর মতো যৌবন শ্যামতনু ঘিরে স্থির, ভরপুর। সর্বাঙ্গে সোনা মেশানো কাঁচা সবুজ আভা। একমাত্র শুভলক্ষ্মী ছাড়া কেউ জানে না কোন্ স্থির লক্ষ্যে তার প্রতিদিনের বাঁচা। সারাদিনে দেবীর চরণামৃত ছাড়া পেটে কিছু পড়ে না। গভীর রাতে সামান্য ভোগ-প্রসাদ নিয়ে এক দেড়ঘণ্টার বিশ্রাম। তারপর আবার মন্দির। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে সেই একই প্রার্থনা, জীবন পাত করে সেই একই সিদ্ধির তপ। প্রতিদিন আরতির সময় একাগ্র তন্ময়তায় সুচারু তার সমস্ত শক্তি উজাড় করে দশ আঙুলে নিয়ে আসে, আর আরতির শেষে দ্বিগুণ অবসাদে দেবীমূর্তির পায়ে তলায় ঢলে পড়ে। কিন্তু আগের মতো হতাশার আগুনে ভেতর পোড়ে না, সেই আঁচে শ্যাম অঙ্গ আর দপদপ করে না, তার ভেতর-বার সবকিছুই এখন স্নিগ্ধ সজল।

সবসময় কাছে না থাকলেও শুভলক্ষ্মীই সুচারুর একমাত্র সাথী। তার বয়েস তখন কুড়ি, দু ছেলের মা, স্বামী শঙ্করনারায়ণকে নিয়ে কামালপুরে থাকে। জামাইয়ের লেখাপড়া শেষ হতেই সুচারুকে শ্বশুর বিক্রমদেবের দেওয়া কামালপুরের বাড়ি-জমি সে মেয়ে-জামাইকে দানপত্র করে তাদের সেখানেই স্থিতি করিয়েছিল। বুড়ো দেওয়ানজীকে দিয়ে সব ব্যবস্থা করিয়ে মেয়ে আর জামাইকে সেখানে পাঠিয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত। কেন মা অমন তড়িঘড়ি জামাইকে গাজনপুর থেকে সরিয়েছিল শুভলক্ষ্মী খুব ভাল করেই জানত। বাবার ছোঁয়া থেকে বাঁচাতে, তার ভোগলালসার লোলুপ হাতছানি থেকে রক্ষা করতেই তার তুখোড় বুদ্ধিমতী মা এই ব্যবস্থা করেছিল। দুনিয়ারও কোনো অদলবদল হয়নি, সে তার একই নিয়মে চলছিল।

এদিকে অনলদেবের ভোগবিলাসের স্পৃহা বরং দিনদিন আরো বেড়েছে, কিন্তু চরম উচ্ছৃঙ্খলতায় শরীরের ভেতরে যে ক্ষয়ের বীজ বাসা বেঁধেছিল, তা ক্রমশ ভাঙনের ডালপালা ছড়িয়েছে। সাধের তুলনায় সাধ্য নেই, ফলে আরো ক্ষিপ্ত। সেই ক্ষিপ্ততা দিনে দিনে চূড়ান্ত অত্যাচার আর বিকৃতির মধ্যে বিস্মৃতি খুঁজেছে। যাগযজ্ঞ আর তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যৌবন ধরে রাখার ব্যর্থ চেষ্টায় অকাতরে খরচ হচ্ছে, বিশাল জমিদারির অনেকটাই গেছে, কিন্তু অনলদেবের কোনো কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই।

লজ্জায় ঘৃণায় শুভলক্ষ্মীর গাজনপুরে আসতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু আসতে হয়। মায়ের জন্যে আসতে হয়। ক'দিন কাটলেই কে যেন টেনে মায়ের কাছে নিয়ে আসে। যে মা সব জেনেও আশ্চর্য রকমের ঠাণ্ডা, বিষে বিষে নীল হয়েও অদ্ভুত স্থির, যে মা স্বামীর সব পাপের দায় নিজের মাথায় নিয়ে কঠিন সাধনায় বসেছে, আর যে মায়ের নিখাদ বিশ্বাস আর নিঃশর্ত সমর্পণের কোনো নড়চড় নেই, সেই মায়ের কাছে ছুটে না এসে পারে না। সুচারুর বিশ্বাসের বীজ একটু একটু করে তার মধ্যেও শেকড় গেড়েছে। তারও বদ্ধ ধারণা, মায়ের এই তপ মিথ্যে হবে না, মিথ্যে হতে পারে না। বংশের মঙ্গল শঙ্খ আবার নড়বে, তার পবিত্র জলের ধারায় সব পাপ ধুয়ে যাবে। বড় আশা নিয়ে মায়ের মতো সেও আজকাল বারো বছরের নির্মাল্যদেবের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে।

ধীর স্থির সুচারু কেবল ছেলে নির্মাল্যদেবের সর্ব ব্যাপারে বাঘিনীর মতো সতর্ক। নির্মাল্যদেবের সবকিছু তার চোখকানের আওতায়। এতটুকু বুঝতে না দিয়ে জন্ম থেকে তাকে স্বামীর কাছ থেকে আগলে রেখেছিল। কিন্তু অনলদেবকে নিয়েই এই ছেলে একদিন ঝড় তুলল। আর সেই ঝড়ে স্থির বিশ্বাসে আর নিটোল সমর্পণে সুচারুর এতদিনের শান্ত সংহতি হঠাৎই তছনছ হয়ে গেল।

সবে ভোর হয়েছিল সেদিন। সুচারু রোজকার মতো মন্দিরে। হঠাৎই নির্মাল্য ছুটতে ছুটতে এলো, চোখমুখ গনগনে। পেছনে তার সারাক্ষণের সাথী রতন পাড়ুই, সে হাউহাউ করে কাঁদছে। রতনকে ছেলের মতো ভালবাসে সুচারু। জেলেপাড়ার সেই গগন পাড়ুইয়ের ছেলে। যে গগন পাড়ুই নাকি ছেলেবেলায় অনলদেবের সঙ্গীদের সঙ্গে কি নিয়ে গণ্ডগোলের ফলে প্রায় মরতে বসেছিল। শেষে বিক্রমদেবের দয়ায় কোনোরকমে সে যাত্রা বেঁচে উঠেছিল। এসব কথা ভাসাভাসা অনলদেবের মুখেই শুনেছিল সুচারু। বিয়ের পরপর ছেলেমানুষ বউয়ের কাছে নিজের বীরত্বের অনেক গল্পই করেছিল,

অবশ্য সবটাই নিজের সুবিধে মতো রেখেঢেকে। কিন্তু সেই গগন পাড়ুই আর তার বউ বাহারী সুচারুর বড় অনুগত। বিক্রমদেবের মৃত্যুর পর থেকে অনলদেবের ভয়ে সোজাসুজি আর মন্দিরে আসত না। বহুদিন পরে স্বামী-স্ত্রীতে এক গভীর রাতে সুচারুর কাছে এসে লুটিয়ে পড়েছিল। এতদিনেও তাদের কোনো সন্তান হয়নি, তাবিজ-কবচ কোনো কিছুতেই ফল হয়নি, আশা ছেড়েই দিয়েছিল তারা। হঠাৎ কদিন আগে বাহারী এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে গগনকে ঠেলে তুলেছে। সে দেখেছে, মন্দিরে শ্যামাকালীর আরতি হচ্ছে, আর তাদেব এই মা (সুচারু) ওই দেবী-মায়ের আরতি করতে করতে প্রদীপের নীল শিখার তাপ বাহারীর মাথায়-কপালে ছুঁইয়ে দিতে লাগল। সমস্ত শরীর এক অদ্ভুত অনুভূতিতে যেন অবশ হয়ে গেল বাহারীর। জঠর জুড়ে তোলপাড় উঠল, বুকে দুধ উপচে পড়ল, তারপর সেখানেই লুটিয়ে পড়ল। এই স্বপ্ন দেখার পর থেকেই বাহারী মায়ের কাছে তাকে নিয়ে আসার জন্যে গগনকে পাগল করে মারছে। শেষে সুযোগ পেয়ে সেই রাতে সুচারুর কাছে এসে আছড়ে পড়েছে।

সে রাত্রে তখনো দেবীর শয়ন দেয় নি সুচারু। মন্দির বন্ধ করে গগন আর বাহারীকে ভেতরে নিয়ে দেবীর শয়ন আরতি করেছিল। প্রদীপের শিখা বাহারীর মাথায় কপালে মুখে বুকে জঠরে সর্বাঙ্গে ছুঁইয়েছিল। আশায় আনন্দে গগন আর বাহারীর কালো মুখ চকচক করে উঠেছিল। দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে তারপর সুচারুর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে পরম নিশ্চিন্তে তারা ঘরে ফিরে গিয়েছিল। নির্মাল্য যেদিন জন্মালো সে দিনই গভীর রাতে বাহারীরও ছেলে হলো। সেই ছেলেই এই রতন। একটু বড় হতেই রতনকে তার বাপ-মা সুচারুর পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে গেছিল। সারাদিন ছেলেটা নির্মাল্যর সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থাকত, শুধু রাতে নিজের ঘরে ফিরত। অনলদেবের কানে কথাটা উঠেছিল, তার কোনো মোসাহেব তুলে দিয়েছিল। গগন পাড়ুইয়ের ছেলে শুনেই মাথায় রক্ত চড়েছিল। তার ছেলের সঙ্গে ছোটলোকের ছেলের মেলামেশা বরদাস্ত করবে না বলে সুচারুকে বার বার হুমকি দিয়েছে, কিন্তু কিছু করতে পারেনি। সেই রতন এখন বারো বছরের হয়েছে।

সেই ছেলের দু চোখ বেয়ে এখন দরদর ধারা। নিজের অগোচরেই মনের মধ্যে অশুভ ছায়া পড়েছিল। সুচারু তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে জিগেস করেছিল, কি রে? কি হয়েছে?

জবাব দিল নিজের ছেলে। ক্ষোভে সাতখানা হয়ে ফেটে পড়েছিল নির্মাল্য।—মা! বাবার লোক কাল রাতে রতনের মাকে ধরে নিয়ে গেছে, ওরা কিছু দোষ করেনি তবু জোর করে বেঁধে নিয়ে গেছে। তুমি ওর মাকে এনে দাও!

ঝলকে ঝলকে গলানো সীসে সুচারুর দু কানে ঢেলে দিল কেউ। স্বামীর ব্যভিচারের বিরুদ্ধে তারই কাছে এমন সরাসরি অভিযোগ এই প্রথম, আর সে অভিযোগকারী নিজের ছেলে। বাপের লালসার প্রতিকারের দাবি নিয়ে মায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সুচারু কি করবে, কি করবে সে এখন? মা তাকে দিয়ে কি করার করাতে চায়? সুচারু রতনের দিকে তাকাল। এই দুধের ছেলের মা-কে কেড়ে নিয়েছে তারই ঘরের লোক, আর দু চোখে আশার সমুদ্র নিয়ে সেই অবোধ তারই মুখের দিকে

চেয়ে আছে। চেয়ে আছে নিজের ছেলেও।

ভেতরের ঝড় চাপা দিয়ে বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে সুচারু গগন পাড়ুইকে ডাকিয়ে আনিয়েছিল। তাকে মন্দিরের ভেতরে নিয়ে দরজা বন্ধ করেছিল। গগনের বিশাল চেহারা এক রাতের মধ্যেই ভেঙে খানখান। মা ডেকেছে শুনে বড় আশা নিয়ে ছুটে এসেছে। তার মুখের দিকে চেয়ে সুচারুর বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠেছিল। তারপর জেরা করে শুনেছে কি হয়েছে। এই মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে গগনের কথা আটকে যাচ্ছিল। শেষে মাটির দিকে চেয়ে একবারও মুখ না তুলে সুচারুর জেরার জবাব দিয়ে গেছে। সুচারু যদিও এরকম কিছুই শুনবে বুঝেছিল, তবু সব জানার পর স্তব্ধ একেবারে।

বাহারীর বয়স ধরা যেত না আর তার কালো শরীরে যৌবন আঁটত না। নড়তে-চড়তে দেহের আগল ভেঙে নিটোল স্বাস্থ্য উপচে উঠত। এক নিরালা দুপুরে চান করার সময় জমিদারের ক'জন সাঙ্গোপাঙ্গর চোখে পড়ে গেছল। বহুদিন আগে ওই সর্বনাশা পুকুরে অমন এক দুপুরবেলা চান সারতে গিয়ে তার ননদ লক্ষ্মীমণিও একবার বিপাকে পড়েছিল বলে শুনেছিল, কিন্তু অতদিন আগের ব্যাপার, সে অত গা করেনি। কিন্তু এবার বাহারীর কথা কানে ওঠার পর থেকেই জমিদারবাবুর লোক আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল, কোনো সাড়া না পেয়ে শেষে সরাসরি লোভের টোপ ফেলেছে, টাকা-গয়নায় গা মুড়ে দেবে বলেছে। বাহারী কিছু না বলে চুপচাপ খানিক চেয়ে থেকে ঘরে ঢুকে মস্ত আঁশবঁটিটা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। চলে যেতে যেতে লোকগুলো শাসিয়ে গেছে এর ফল ভাল হবে না। তারপর বেশ কিছুদিন সজাগ ছিল তারা। গগন তখন রাতে আর বড় গাঙে মাছ ধরতে যেত না। আর কোনো উপদ্রব না ঘটতে আস্তে আস্তে ধরেই নিয়েছিল বাহারীর ওপর থেকে জমিদারবাবুর নজর সরেছে।

মাছ এসেছে খবর পেয়ে অনেকদিন পর গত রাতে ঘরের বার হয়েছিল গগন। ভোর ভোর ফিরে দেখে বাহারী নেই, ঘরের মধ্যে জিনিসপত্র এ-দিক ও-দিক ছেটান, রতন হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাঁদছে। গগন বেরুনোর পরই রতন ঘাটে গিয়েছিল, বাহারীও তখন জেগে। ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখে দুজন লোক তার মায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আরো দু জন হাতে লাঠি নিয়ে সে দিকে মুখ করে দরজায় দাঁড়িয়ে। বাহারী অনেক যোঝার চেষ্টা করেছে, দাঁতেনখে লোক দুটোর মাংস খুবলে নিয়েছে। শেষে আর পারেনি। আঘাতে আঘাতে নিস্তেজ করে হাত পা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে তাকে লোকগুলো তুলে নিয়ে গেছে। ভয়ে রতন কাঠ হয়ে গিয়েছিল। টুঁ শব্দটি না করে লুকিয়ে সব দেখেছে, একজনকে চিনেওছে, রাজাবাবুদেরই লেঠেল।

বলতে বলতে হঠাৎই সুচারুর পায়ের নিচে ভেঙে পড়েছিল গগন। বিগ্রহের দিকে আঙুল তুলে ডুকরে উঠেছিল, 'আমরা ওনারে জানি না, কিন্তু তোমারে জানি। তুমি ইচ্ছা করলে সব হয় মা, সব হয়—বাহারীকে তুমি ফিরায়ে দাও মা—ওই কচি ছেলের মা-টারে ফিরায়ে দাও। ফিরায়ে দাও মা ফিরায়ে দাও—

গগনকে ঘরে পাঠিয়ে দেবীর দিকে অপলক তাকিয়ে বহুক্ষণ বসেছিল সুচারু। ভেতরের অব্যক্ত ক্রোধে তার শ্যাম অঙ্গ বহুকাল পর আস্তে আস্তে গনগনে হয়ে

উঠেছিল। একসময় দরজা খুলে কোনো দিকে না চেয়ে সোজা অনলদেবের মহলে গেছে। তার চলার পথে যে পড়েছে সভয়ে সরে গেছে। কাছে গেলেই আগুনের আঁচে ঝলসে যাবে যেন। অনেক দিন বাদে স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়াল সুচারু। চোখের আগুনের এক ঝাপটায় তার সাঙ্গোপাঙ্গরা যে যেদিকে পারল ছিটকে সরে গেল। অনলদেব তখন নেশায় চুর, নয়তো এই চেহারা দেখে সেও থমকাত। নেশার ঘোরে উল্টে অশ্লীল রসিকতা করে উঠল, 'তুমি! আমার ঘরে? তা আবার একটা ছেলে চাই নাকি?'

নির্মাল্য হবার আগে সুচারু একদিন নিজে থেকে যে তার ঘরে এসেছিল, সেই নিয়ে এই কদর্য ইঙ্গিত। শরীরের সবটুকু রক্ত মুখে এসে জমল সুচারুর। নিজেকে কঠিন সংযমে বেঁধে স্থির গলায় জিগেস করল, 'গগনের বউ কোথায়? তাকে কোথায় রাখা হয়েছে?'

ঠিক এই প্রশ্ন আশা করেনি অনলদেব। চোখ কুঁচকে দেখল খানিক। তারপর ভারী মজা পেয়েই যেন খলখলিয়ে হেসে উঠল।—'খুব ভাল জায়গাতেই আছে, এমন জায়গায় সে জীবনে থাকেনি।' তারপর কপট আগ্রহে সামনে একটু ঝুঁকে ফিরে জিগেস করল, 'কিন্তু তুমি তো এসবের অনেক ঊর্ধ্বে, তোমার এ খোঁজে কি দরকার?'

সুচারু কাঁপছে অল্প অল্প। বলল, 'অনেক ঊর্ধ্বে বলেই দরকার, ওকে এখুনি ছেড়ে দাও।'

অনলদেব বেশ অনেক কাল বাদে মনের মতো খেলা পেয়েছে যেন। টেনে টেনে বলল, 'তাই তো, তোমারও যে আবার ওকে দরকার হয়ে পড়ল।' কপট চিন্তায় মুখ গম্ভীর একটু, 'কিন্তু আমার দরকারটা যে এখনো মেটেনি, এখন কি যে করি!' এবার গলায় খেদ ঝরাল, 'নিজের বউ দেবীটেবি হয়ে গেলে ওই সব গগন-টগনের বউ ছাড়া এ অভাগাদের আর গতি কি বল?'

সর্বাঙ্গের আগুন গলগল করে সুচারুর দু চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছিল। দুর্জয় ক্রোধে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত হল্কা খেলতে লাগল। নেশার ঘোরে না থাকলে অনলদেবও এ মূর্তি সইতে পারত না। সুচারু একটি একটি করে বলেছিল, 'বাহারীকে তুমি ফিরিয়ে দেবে, গগন মায়ের মন্দিরে এসেছিল, মায়ের সামনে সব কথা বলে গেছে, এত বড় পাপ মা সইবেন না।'

এখানেই সব থেকে বড় ভুলটা করে বসল সুচারু। এতক্ষণ খেলার মেজাজে ছিল অনলদেব। কিন্তু গগন মন্দিরে গিয়েছিল শুনে সেই মেজাজ অন্য বিশ্লেষণে বাঁক নিল। গগনের কাছ থেকেই তাহলে সব শুনেছে! গগনই সরাসরি মন্দিরে গিয়ে সব জানিয়েছে! এত সাহস গগনের? জমিদারের নামে নালিশ? তারই বাড়িতে গিয়ে তারই স্ত্রীর কাছে? বহুদিন আগে আরও একবার না তার সঙ্গে লাগতে এসেছিল গগন? তার জন্যেই না আজও অনলদেবের গোটা পিঠ জুড়ে বীভৎস মারের দাগ?

একটা অমানুষিক ক্রোধের দাহ এতদিন বাদে আবার মাথার দিকে উঠতে লাগল। ফর্সা শরীর লাল হয়ে উঠল। দেবে, এবার চরম শিক্ষাই দেবে। এমন ভাবে দেবে যে ভবিষ্যতে আর কেউ জমিদারের সঙ্গে লাগার কথা ভাবতে গেলেও শিউরে উঠবে। সে ব্যবস্থা পরে, আপাতত স্ত্রীর সঙ্গে আরও একটু কথা কওয়ার শখ। সুচারুর আগের

কথার জের ধরে মুখে হাসি টেনে জিগ্যেস করল, 'আর যদি না ফিরিয়ে দিই? কি করবে তোমার মা?'

আগুনের ফুলকির মতো সুচারুর মুখ থেকে ছিটকে বেরুল, 'সর্বনাশ হবে, নির্বংশ হবে তুমি, সব সুদ্ধু তুমি শেষ হবে, পাপের চারাও মা আর রাখবেন না।'

অনলদেব সোজা হয়ে বসল। গলায় শাণিত ব্যঙ্গ, 'তাই নাকি? তবে তো বড় ভাবনার কথা!' টকটকে দু চোখ সুচারুর মুখে বিঁধিয়ে নিঃশব্দে হাসতে লাগল। তারপর খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'ঠিক আছে, ফিরিয়েই দেব তাহলে।'

শেষ কথা কটা বলে ফেলেই ভেতরে কাঁপুনি শুরু হয়েছিল সুচারুর। এ কি বলল সে? কে বলাল? নিজের থেকে এমন কথা তো কখনও বলতে চায়নি! নির্মাল্যকে ঘিরে যে তার অনেক আশা অনেক স্বপ্ন! অনলদেবের এই হাসি আর চাউনি তার অস্তিত্বসুদ্ধু নাড়িয়ে দিল। ফিরিয়ে দেবে শুনেও বিষম আতঙ্ক। মন্দিরে ফেরার পর ডান দিক থেকে থেকে কেঁপে উঠেছে, আর নিঃশব্দে প্রার্থনায় দু ঠোঁট ক্রমাগত নড়েছে, রক্ষা কর মা, সব রক্ষা কর, ফিরিয়ে তো দেবে বলেছে।

অনলদেব কথা রেখেছিল। বাহারীকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। প্রেতে খাওয়া ছেঁড়াখোঁড়া মরা শরীরটা সে রাতেই গগনের কাছে ফিরেছে। আর যারা ফেরত দিতে এসেছিল আঘাতে আঘাতে গগনের মাথাটা তারা দু ফাঁক করে দিয়ে গেছে। রতন কোথায় কেউ জানে না। তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

সুচারুর দিকে কেউ চোখ তুলে তাকাতে পারে না। জ্বলন্ত আগুনের গোলা যেন একখানা। তার মাথায় আগুন, চোখে আগুন, বুকে আগুন, নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে আগুন। ধকধকে সেই আগুনে সবকিছু ছারখার হয়ে যাবার অমোঘ সংকেত। পুজো এখনো করে চলেছে, শুধু মঙ্গলশঙ্খ আর স্পর্শ করে না। বিগ্রহের দিকে রক্তচক্ষু মেলে নির্নিমেষে চেয়ে থাকে আর চরম সর্বনাশের অপেক্ষায় স্থির শিখার মতো জ্বলে জ্বলে আর জ্বলে।

প্রলয় ঘনাল। এত আকস্মিকভাবে ঘনাল যে সবাই দিশেহারা। এই প্রথম দিশেহারা অনলদেবও। হঠাৎই একদিন ঝলকে ঝলকে মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল নির্মাল্যর। বৈদ্য-কবিরাজ আর নানাধরনের চিকিৎসকের ভিড়ে বাড়ি ছেয়ে গেল। সবারই এক রায়—রাজরোগ, যক্ষ্মা। কিন্তু কেউই বুঝে উঠতে পারছে না ভেতরে এই কালব্যাধি নিয়ে ছেলে দুদিন আগেও এমন সুস্থভাবে চলাফেরা করেছে কি করে! এক ফোঁটা জ্বরজারি না, কোনোরকম শরীর খারাপ না, কোনোরকম উপসর্গ না, হঠাৎই একেবারে চরম অবস্থায় এলো কি করে? চিকিৎসা শাস্ত্রে এ এক চরম বিস্ময়। সবাই অবাক, শুধু সুচারু ছাড়া। মা তো তার মুখ দিয়ে এই রায়ই দিয়েছিল। এখন শুধু চরম শাস্তির অপেক্ষা। সুচারু নিঃশব্দে সে শাস্তির জন্যে তৈরি হল।

নির্মাল্য দিন দিন বিছানার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। চোখেমুখে শেষের ছাপ স্পষ্ট। বংশের বাতি নিভতে চলেছে। হতাশায় ক্ষোভে অনলদেব ক্ষিপ্ত। কিন্তু স্ত্রীর দিকে তাকালেই সে রাগে উন্মাদ হয়ে ওঠে অন্য কারণে। স্ত্রীর সেই অভিশাপ তার কানে

বাজে—সর্বনাশ হবে, নির্বংশ হবে তুমি, সবসুদ্ধ তুমি শেষ হবে, পাপের চারাও মা আর রাখবেন না—। আরও ক্ষিপ্ত হয় সুচারুর স্থির পাষাণ মূর্তি দেখে। চোখে এক ফোঁটা জল নেই, এতটুকু আকুলি-বিকুলি নেই, কলের পুতুলের মতো ঠাকুর সেবা করার মতো ছেলের সেবা করে চলেছে। কেবল অনলদেব সামনে এলেই পাষাণ-প্রতিমায় একটু একটু করে প্রাণের সাড়া জাগে। দু চোখ ধকধকিয়ে ওঠে, শরীর অল্প অল্প কাঁপতে থাকে, নিঃশ্বাসে আগুনের হল্কা ছোটে, বলেছিলাম না সর্বনাশ হবে? সবসুদ্ধু নিয়ে তুমি শেষ হবে? এরপর তোমার পালা। তোমার, তোমার তোমার—।

না, সুচারু মুখে একটি কথাও বলে না। কিন্তু অনলদেব যেন স্পষ্ট শোনে। শোনে আর দুর্বার রাগে উন্মাদ হয়। এই স্ত্রীটিকে সে কোনোদিন দেবী-টেবি কিছু ভাবেনি বা তার কোনোরকম শক্তি আছে বলেও মনে করত না। একটু বেশী তেজী এই যা। কিন্তু অনলদেব আজও মনে করে বিক্রমদেবের অমন মৃত্যুর কারণ আসলে সুচারু। তার আবদারে বলিপ্রথা বন্ধ করার জন্যেই বাবাকে অমনভাবে প্রাণ দিতে হয়েছে। আর তারপর থেকে আজ পর্যন্ত সবরকম অঘটনের জন্যে সেই দায়ী। কারণ, তেজ দেখাতে গিয়ে সে-ই তো গগন আর বাহারীর মরণ ডেকে আনল। কোনোরকম ক্ষমতা থাক আর না থাক, তার অভিশাপের পরেই ছেলের আজ এত বড় সর্বনাশ ঘটতে চলেছে। রাক্ষুসী, দয়ামায়াহীন নিষ্ঠুর রাক্ষুসী। পরপর সব সর্বনাশের নিমিত্তের ভাগী হয়েও মিথ্যে শক্তির মোহে এত অন্ধ যে ইষ্টদেবীর নাম করে অভিশাপ দিয়ে স্বামী আর সন্তানকেও বলি চড়াতে পারে! অনলদেবও এবার শেষ দেখে ছাড়বে। যে দৈবী শক্তির মোহে এত দাপট সেই শক্তি দিয়েই ছেলেকে বাঁচিয়ে তুলবে। তারপর চরম ফয়সলা।

সেই তান্ত্রিক গুরুর কাছে ধর্ণা দিল অনলদেব। সব শুনে সে বিরাট যজ্ঞের বিধান দিল। শ্যামাকালীর মন্দিরেই মাসাধিককাল ধরে যজ্ঞ চলবে, ততদিন সেও জমিদারবাড়িতেই থাকবে। কিন্তু বারবার সাবধান করে দিয়েছে যে যজ্ঞ চলাকালীন যেন কোনোরকম ত্রুটি না ঘটে। নিয়মকানুনে কোনোরকম খুঁত হলে সর্বনাশ কেউ ঠেকাতে পারবে না। এ মহাপুজোয় এতটুকু অনাচারের উল্টো ফল।

বিষম কড়াকড়ির মধ্যে মহাপুজো শুরু হলো। তান্ত্রিক, অনলদেব আর সুচারু ছাড়া কারুর মন্দিরে যাবার হুকুম নেই। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণের লোকের মন্দিরের চত্বর মাড়ানোও নিষিদ্ধ হলো। স্নান করে শুদ্ধ কাপড়ে প্রতিদিনের উপচার যারা চাতালে রেখে যায়, তারাও বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। অনলদেব নিজে আর তার তান্ত্রিক গুরু সে-সব মন্দিরে তোলে। সুচারু নিজের নিয়মে নিঃশব্দে মন্দিরে যায়, নিঃশব্দে চেয়ে চেয়ে সব দেখে। ঐ পুজোর আয়োজনে আঙুলটুকু পর্যন্ত ছোঁয়ায় না। আজকাল তার নিজের পুজো শুধু দু চোখ দিয়ে নির্নিমেষে বহুক্ষণ ধরে বিগ্রহের দিকে চেয়ে বসে থাকে, তারপর কোনোদিকে না তাকিয়ে ছেলের কাছে চলে যায়। যে মহাযজ্ঞ চলছে সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। তান্ত্রিকের চোখে এ-ও একধরনের অনাচার। অনাচার অনলদেবের চোখেও। শুধু ছেলের কথা ভেবে এখন চুপ করে ধৈর্য ধরে আছে। এ সময় কোনো বিঘ্ন চায় না, কারণ ছেলে আগের থেকে একটু ভাল।

দেবীর দিকে চেয়ে বসেছিল সুচারু। সেদিন যজ্ঞের আগুনে প্রথম শোণিত-সুরার আহুতি পড়বে। বহুদিন পর বৈষ্ণবী মায়ের পুজোয় রক্ত ঝরবে। নিজের বাহু কেটে মদের পাত্রে সুরা মিশিয়ে অর্ঘ্য দেবে অনলদেব, তারপর ছাগ বলি হবে। আত্মধ্বংসী জ্বালা নিয়ে সেই পুজো দেখতে এসেছিল সুচারু। আর তার কোনো প্রার্থনা নেই, কোনো আকুতি নেই, কোনো ভিক্ষে নেই, শুধুই শেষ পর্যন্ত দেখে যাবার পাথুরে ধৈর্য।

নিরুপায় ক্ষোভে সেই রক্ত-পূজায় সামিল হতে সে-ও সেদিন পুজোর সাজেই এসেছিল। সত্যি যদি রক্ত চায় ওই রাক্ষুসী তো অতটুকুতে কি হবে? সুচারুর শরীরে যে এখনো অনেক রক্ত! সেদিন তার পরনে আধহাত চওড়া লাল পেড়ে দুধ গরদ, সিঁথি জুড়ে জ্বলজ্বলে সিঁদুর, কপালে সিকি প্রমাণ টকটকে লাল টিপ, পায়ের পাতা ঘিরে গাঢ় আলতা। অপরাজিতা রঙে চুনীর আভা ঠিকরোচ্ছিল যেন। চোখ ফেরানো যাচ্ছিল না। যজ্ঞে বসা তান্ত্রিকের দৃষ্টিও বারবার সে দিকেই ফিরছিল। সুরার পাত্রে শোণিত ঢালার জন্য হাতে ছুরি নিয়েও হঠাৎই কেমন বিমনা হয়ে পড়েছিল অনলদেব। সব ভুলে স্ত্রীর এই রূপের দিকে বহুকাল পরে নির্নিমেষে চেয়ে ছিল।

কেউ টের পায়নি যে নির্নিমেষে চেয়ে ছিল আরো একজন, রতন! কড়া পাহারা এড়িয়ে কখন কোন ফাঁকে মন্দিরে ঢুকে পড়েছে কেউ জানে না। মন্দিরের ভেতরে এক পা রেখে বিহ্বল চোখে সুচারুকে দেখছে তো দেখছেই। এতগুলো দৃষ্টির ঘায়েই বুঝি চমক ভাঙল সুচারুর। ঘুরে তাকাতেই প্রথম রতনকে দেখতে পেল। বিষম আঁতকে উঠল, কিন্তু রতনের কোনোদিকে হুঁশ নেই। খোকারাজার দেবীর মতো মাকে সে দুচোখ ভরে দেখছে। সংবিৎ ফিরে পেয়ে সুচারু আসন ছেড়ে দৌড়ে উঠে এল, কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। সে আগলাবার আগেই বড় কঠিন হাতে ধরা পড়ল রতন। অনলদেব দৃঢ় মুঠিতে রতনের চুল ধরে টেনে নিয়ে এল, তার পিছনে তান্ত্রিক। মুহূর্তের মধ্যে পিছমোড়া করে বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে রতনকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হলো সুচারু জানে না। বিগ্রহের আর অসম্পূর্ণ যজ্ঞের সামনে বসে সে শুধু থরথর করে কাঁপছিল।

মহাপূজা শুরু হবার পর থেকে নির্মাল্যর গলা দিয়ে আর রক্ত ওঠেনি। সবাই আশা করেছিল এ-যাত্রা ফাঁড়া কাটল। কিন্তু প্রথম শোণিত-সুরার আহুতি পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে এই বিপত্তি! তান্ত্রিক, অনলদেব আর সুচারু ছাড়া কেউ কিছু জানল না। অনলদেব তাকে রক্তচক্ষু মেলে শাসিয়ে গেছে, এ নিয়ে টুঁ শব্দটি করলে গগন পাড়ুইয়ের ছেলেটাকে জ্যান্ত পোঁতা হবে। সুচারু বোবা হয়ে থেকেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হবে তা-ও সে রাতেই জানতে পেরেছে। অনলদেবের চোখে হত্যার নির্ভুল ছায়া দেখেছিল। তাই গভীর রাতে পিছু নিয়ে তান্ত্রিকের সঙ্গে তার কথাবার্তা নিজের কানে শুনেছে। এ অনাচারের একটাই প্রতিকার দিয়েছে অনলদেবের তান্ত্রিকগুরু। তিন দিন ফলাহারে রেখে তৃতীয় রাত্রির মধ্যযামে স্নানান্তে দেবীর নামে অনাচারীকে উৎসর্গ করতে হবে। তার সেই রক্তেই প্রথম শোণিত-সুরার অর্ঘ্য পড়বে। এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

সুচারু কি সত্যিই উন্মাদ হয়ে গেছে? নয়তো এর পরেও পাগলের মতো সে ওই পাষাণী মাকেই শুধু ডাকছে, ডাকছে আর ডাকছে?

একটা দিন কাটল। মেয়েকে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করল সুচারু। নির্মাল্যর অসুখের খবর পেয়েই শুভলক্ষ্মী ছেলেদের নিয়ে চলে এসেছিল। কানাঘুষোয় গগন আর বাহারীর নির্মম মৃত্যুর কথা শুনেছিল, কিন্তু আসল কারণ জানত না। মাকেও কিছু জিগেস করতে পারেনি। কারণ এবার আসার পর থেকে মায়ের কাছে ঘেঁষতেই পারেনি। এক অদ্ভুত কাঠিন্যের আর আগুনের বেড়াজাল যেন মাকে ঘিরে রেখেছিল।

সুচারু একটি একটি করে শুভলক্ষ্মীকে সব খুলে বলল, গগন-বাহারীর মৃত্যুর কারণ থেকে শুরু করে আগের দিন পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, সব। তারপর তান্ত্রিকের বিচারে রতনের কি রায় হয়েছে তা-ও। শুনে শুভলক্ষ্মী আর্তনাদ করে ওঠার আগেই সুচারু শক্ত হাতে তার মুখ চাপা দিয়েছে। তারপর তাকে কি করতে হবে বুঝিয়েছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস মাটির নিচের কোনো এক চোরকুঠুরিতে ছেলেটাকে ফেলে রাখা হয়েছে। অনলদেবের চাবির গোছা আগলানো দেখে সে আরো নিঃসন্দেহ। আজ রাতের মধ্যেই যে করে হোক সেই চাবি শুভলক্ষ্মীকে তার হাতে এনে দিতে হবে। তার বাবা আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা নেশায় চুর হয়ে এলিয়ে পড়ার পরেই চাবি সরাতে হবে। শুনে ত্রাসে শুভলক্ষ্মীর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল। কিন্তু মায়ের দিকে চেয়ে মুখে কথা সরেনি। সে রাজী না হলে মা নিজে যাবে তা পরিষ্কার বুঝেছে। আর সেই চেষ্টা করতে গেলে যে কি পরিণাম ঘটবে তা কল্পনা করেই শিউরে উঠেছে।

আবার গিয়ে ছেলের কাছে বসেছিল সুচারু। নির্মাল্য আগের মতোই আছে, আর রক্ত পড়েনি। অনলদেব বারবার এসে দেখে গেছে। আঁতিপাঁতি খুঁজেও স্ত্রীর পাথরের মতো মুখে কোনোরকম অবাধ্যতা বা বিদ্রোহের আভাস পায়নি। বরং ছেলের মুখ চেয়ে সেদিন থেকে একেবারে চুপ করেই আছে। তার কাছেও একবারের জন্যেও রতনের নাম তোলেনি, তার কি হল জানতে চায় নি, এমনকি মন্দিরেও আর যায়নি। মনপ্রাণ ঢেলে শুধু ছেলের সেবাই করে চলেছে। নির্মাল্যর কথা ভেবেই বোধহয় তেজের আগুন নিভে অনেকটাই নরম আর ঠাণ্ডা হয়েছে এখন। স্ত্রী আর কোনো ঝামেলা করবে বলে মনে করছে না অনলদেব। তার ভাবনা বরং অন্য দিকে ঘুরেছে। মন্দিরে সেই রক্তিম সাজে দেখার পর থেকে ভেতরটা লালায়িত হয়ে রয়েছে। ছেলের ফাঁড়া কাটিলে সব বিবাদ মিটিয়ে এবার একটা আপোসের রাস্তাতেই চলার ইচ্ছে। দেখা যাক, আগে নির্মাল্য ভাল হয়ে উঠুক।

ছেলের মাথার কাছে বসে সারাটা দিন এক অসহনীয় প্রতীক্ষার মধ্যে কাটিয়েছে সুচারু। মনে মনে মায়ের কাছে এমন চাওয়া আর জীবনে চায়নি। সন্ধ্যে পেরিয়ে যাবারও অনেকটাই পরে বেশী রাতে হাতে চাবির গোছা এসেছে। ভয়ে শুভলক্ষ্মীর মুখ নীল, সারা শরীর ঘামে ভিজে। সুচারু ছেলেদের নিয়ে তাকে সোজা নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে থাকতে হুকুম দিয়েছে। বলেছে, সে নিজে না ডাকলে শুভলক্ষ্মী যেন না বের হয়। বলবে, কিছু জানে না, রতনের ব্যাপারে কোনো কথাই শোনেনি, পরদিন বিকেল থেকে শরীরটা খারাপ লাগতে ছেলেদের খাইয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিল। সুচারু এরপর নিজের অতি বিশ্বস্ত খাস-ঝিকে কিছু নির্দেশ দিয়ে গোপনে জেলেপাড়ায় পাঠিয়ে অপেক্ষা করেছে। সুযোগের অপেক্ষা।

গভীর রাতে সুযোগ এলো। ঘুমন্ত ছেলের কপালে চুমু খেয়ে তার মুখখানা শেষবারের মতো দুচোখ ভরে দেখল খানিক, তারপর বাইরে বেরিয়ে এলো। কোনোদিকে না তাকিয়ে এগিয়ে চলল, পিছনে সেই খাস-ঝি। মেয়ের ঘরের দরজায় মৃদু টোকা দিয়ে তার নাম ধরে ডাকতেই শুভলক্ষ্মী ধড়ফড় করে বেরিয়ে এলো। জেগেই ছিল, আতঙ্কে হিম। সুচারু তার হাতে একটা মুখবন্ধ খাম দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কামালপুরে জামাইয়ের কাছে ফিরে যেতে বলল। আরো বলল, নিজের বাড়ি গিয়ে তবে যেন এ খাম খোলে, আর সকাল হবার আগে যেন কোনো অবস্থাতেই দরজা না খোলে। এ তার মায়ের দিব্যি।

মায়ের ঠাণ্ডা মুখের দিকে চেয়ে আর তার কথা শুনে শুভলক্ষ্মী মার বুকে মুখ গুঁজে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। মেয়ের মাথাটা বুকের মধ্যে চেপে ক'মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়েছিল সুচারু, তারপর জোর করে তার মুখ তুলে ধরে বলেছিল, 'যা করছি এ বংশের মঙ্গলের জন্যে করছি, ঠাকুরের (শ্বশুর বিক্রমদেব) বংশে এতবড় অনাচার ঘটতে পারে না। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তিনি আমার আগে আগে চলেছেন, তিনিই রক্ষা করবেন।' শুভলক্ষ্মী আবারও শিউরে উঠেছিল। এবার প্রায় জবরদস্তি তাকে ঘরে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করিয়ে সুচারু অন্য পথে ঘুরল।

তিনটে দরজা খোলার পর মাটির নিচের চতুর্থ চোরকুঠুরিতে রতনকে পাওয়া গেল। সাবধানের মার নেই বলে ওখানেও ছেলেটার হাত পা বাঁধা, মুখে কাপড় গোঁজা। ঝিকে এবার মোম জ্বালাতে হুকুম করে সুচারু নিজের হাতে বাঁধন খুলে রতনকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে মাটির নিচের চোরা পথে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলো। ছেলেটা হাঁটতে পারছিল না, তার বুকের মধ্যে থরথর করে কাঁপছিল। একরকম কোলে করেই রতনকে নিয়ে দীঘির পাড়ে এসে দাঁড়ালো সুচারু। জেলেপাড়ার কয়েকজন ডিঙি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। এই দীঘির সঙ্গে বড়গাঙের যোগ, গাঙের জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে সঙ্গে দীঘির বুকেও সাড়া জাগে। তখন জোয়ারের টান, সুচারু রতনকে তাদের দিকে এগিয়ে দিল, 'এদের সঙ্গে চলে যা, আর ভয় নেই।'

রতন তখনো কাঁপছিল, এই মুক্তি বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না। ছুটে চলে যেতে গিয়েও ফিরে এসে আবার সুচারুকেই জড়িয়ে ধরল। যাবে না, তাকে না নিয়ে যাবে না। তার ভেতর থেকে কেউ যেন বলে দিয়েছে নিজের জীবনের বিনিময়ে মা তাকে এই মুক্তি দিল। নিজের মাকে খুইয়েছে। কিন্তু আরেক মা, যে-মা নিজের মরণ জেনেও তার প্রাণ ফিরিয়ে দিতে এসেছে তাকে কিছুতেই আর খোয়াতে পারবে না রতন। শক্ত দু'হাতে সুচারুকে টানল 'তুমিও চলো, তোমারে না নিয়ে আমি কুথাও যাব না।'

সেদিন মন্দিরে বসা যে মায়ের সর্ব অঙ্গে চুনীর আভা ঠিকরোচ্ছিল, দু চোখ দিয়ে আগুনের আঁচ ঝলসাচ্ছিল, আজ সেখানে অমৃত ঝরতে দেখল রতন। সামনের দীঘির মতোই অতল কালো দু চোখে দুটো মুক্তো ফুটে উঠল। কেমন অদ্ভুত হেসে এই বিচিত্র মা তাকে সামনে ঠেলে দিয়ে বলল, 'আমাকে এখানেই থাকতে হবে রে রতন, আমি এখানেই থাকব, বড় হয়ে এসে আমাকে নিয়ে যাস।' বাধা দেবার আগেই মায়ের ইশারায় সেই ঝি আর জেলেরা জোর করে তাকে নিয়ে ডিঙি নৌকোয় উঠল।

তারপরের দিন। আচায্যি বংশের কালান্তক দিন। নির্মাল্যর অবস্থা হঠাৎই খারাপের দিকে গড়িয়েছে। সুচারু সেই আগের রাত থেকে ওই চোরাকুঠুরিতেই বসা। অনলদেব বারবার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। ভীষণ মূর্তি। তার অনুনয়েই তান্ত্রিক এখনো শেষ চেষ্টা করে চলেছে। সেজন্যই এখুনি চূড়ান্ত ফয়সালা করতে পারছে না, অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছে সুচারুও। দুজনের দুরকম অপেক্ষা।

সেদিনের পুজো শেষ হবার আগেই নির্মাল্য চলে গেল। শান্তমুখে এখানে বসেই সুচারু শুনেছে। ওঠে নি, নড়ে নি, চোখের পাতাটুকু পর্যন্ত কাঁপে নি।

দাহ শেষে অনলদেব তৈরী হয়েই এসেছিল। সুচারুও স্বামীর জন্যেই সেই চোরাকুঠুরিতে শুয়ে অপেক্ষা করছিল। তার কৃষ্ণকলি নিথর তনু তখন ঘন নীল। মৃত্যুর গাঢ় নীল রঙে সেজে সে অনলদেবের প্রতীক্ষা করছিল।

সুচারু বিষ খেয়েছিল।

## ছয়

চার দিনের দিন মায়ের কাজ শেষ করে শুভলক্ষ্মী সেই রাতেই স্বামী আর ছেলেদের নিয়ে নিজের বাড়ি কামালপুর ফিরে গেছে। এই সর্বনাশের খবর পেয়েই শুভলক্ষ্মীর স্বামী শঙ্করনারায়ণ ছুটে এসেছিল। প্রয়োজন ছাড়া তার সঙ্গেও শুভলক্ষ্মী একটি কথা বলেনি। শান্ত ঠাণ্ডা স্ত্রীর এমন পাথর-মূর্তি আগে কখনো দেখেনি শঙ্করনারায়ণ। একমাত্র ভাইয়ের মৃত্যুতে আর মায়ের অমন সাঙঘাতিক ভাবে চলে যাওয়াতেও এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেনি। শোকের ব্যথা নয়, শোকের দাহ তার ভেতরটা পুড়িয়ে একেবারে খাক করে দিয়েছে। মায়ের একটাই হুকুম শুধু রাখেনি। তার সৎকারের পরে ঘরের দরজা বন্ধ করে আগের রাতে দেওয়া সেই মুখবন্ধ খাম এখানেই খুলে পড়েছিল। সুচারু লিখেছিল ঃ

'আমার লক্ষ্মী,

এ চিঠি যখন পড়বে তখন বিশ্বাস কোর আমি সব আশা নিয়ে তোমার দিকেই চেয়ে রয়েছি। আমার শেষ সম্বল তুমি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ সম্বল বৃথা হবে না। হতে পারে না।

পূর্বপুরুষের পাপ উত্তরপুরুষে বর্তায়। সেই পাপের ফলেই নিজে নির্দোষ হয়েও নির্মাল্য বাঁচবে না। এমন যে ঘটবে সে কথা আমার মুখ দিয়ে মা-ই বলিয়েছিলেন। তবু আমি আশা করেছিলাম। প্রাণপণে আশা করেছিলাম তোমার বাবার মতি ফিরবে, এ বংশ রক্ষা পাবে। কিন্তু তা হলো না। এর সমস্ত দায় আমার। কারণ, স্ত্রী হয়েও তোমার বাবাকে পাপের পথ থেকে সরিয়ে আনতে পারিনি। এ দায় স্ত্রী হয়ে স্বামীকে অধর্ম থেকে রক্ষা করতে না পারার দায়। সে দায়ের সমস্ত বোঝা নিজের মাথায় নিয়ে নিঃশব্দে শুধু প্রায়শ্চিত্তই করে চলছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারছি এবার আমারও সময় ফুরিয়েছে। মায়ের পুজোর নামে পরের সন্তান হত্যা করে আবারো যে মহাপাপ সে করতে চলেছে নিজের এই প্রাণটা দিয়েই তা থেকে এবার তাকে রক্ষা করব, ছেলেটাকে

বাঁচাব। এতে যে পুণ্য, সেই পুণ্যের জোরেই এমন কেউ আসবে যার ছোঁয়ায় মঙ্গলশঙ্খ আবার নড়বে, পুণ্যধারায় সব পাপ ধুয়ে যাবে। তোমার ঠাকুর্দা সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তাঁর এতবড় বলিদান ব্যর্থ হবে না।

কাল সেই তিথি। অমাবস্যা। কৃষ্ণাপঞ্চমী। মন বলছে, কালই আমারও শেষ দিন। রতনকে না পেয়ে তোমার বাবা আমার সঙ্গে শেষ বোঝাপড়াই করবে। তার চোখে খুনের নির্ভুল ছায়া দেখেছি। সে আমাকে মারবেই। আমার দিন শেষ, আমি তৈরী। কিন্তু এভাবে নয়। আর তাকে কোনো পাপের ভাগী হতে দেব না, নিজেই তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাব। ভয়ে নয়, স্ত্রী-হত্যার মহাপাপ থেকে তাকেই বাঁচাতে এ পথ বেছে নিচ্ছি। নয়তো তার হাতে মরতে আমার এতটুকু আপত্তি ছিল না। তোমার বাবার ওপর কোনো ক্ষোভ রেখো না, ঘেন্না রেখো না। মনে রেখো আমিই তাকে রক্ষা করতে পারিনি, আমার অক্ষমতার জন্যেই সে অমন অমানুষ হয়ে উঠতে পেরেছে। কখনো কাছে না টেনে পাল্টা আঘাত করে কেবলই তাকে দূরে ঠেলেছি। সে যাক, কিন্তু সে জিজ্ঞাসায় আমি ভেতরে ভেতরে পাগল হতে বসেছিলাম তার জবাব পেয়েছি।

এ বংশ না থাকলেও এর রক্তধারায় কেউ আসবে। কবে আসবে জানি না, কিন্তু কোনো একদিন আসবে। তুমিই সেই আধার। একমাত্র তোমারই ভেতর দিয়ে ঠাকুর বিক্রমদেবের রক্তধারায় আচার্য্যি বংশের বীজ বেয়ে সে আসবে। তার স্পর্শে আবার মঙ্গলশঙ্খ ঘুরবে। জল পড়বে। তবেই মুক্তি, তবেই সিদ্ধি।

শুচি থেকো শুদ্ধ থেকো স্থির থেকো আর বিশ্বাস রেখো। নিশ্চয় জেনো তিনি আসবেন। চরম মার মেরে তিনি আসবেন। পুড়িয়ে পুড়িয়ে সোনা করে তিনি আসবেন। বিশ্বাস আর সমর্পণের সেতুপথে তিনি আসবেন। খাঁটি বিশ্বাস আর নিঃশর্ত সমর্পণের কঠিন পরীক্ষায় পার হলে তবেই তিনি আসবেন।

নয়তো আমার ইষ্টদেবীরও মুক্তি নেই।

—তোমার মা'

চিঠি পড়ে শুভলক্ষ্মী বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। মায়ের কাজ শেষ করে চলে যাবার আগের রাতে অনলদেবের মহলে গিয়েছিল। প্রচণ্ড অস্বস্তিতে স্বামী শঙ্করনারায়ণ তার পিছু নিয়েছিল। তখন অনলদেব ঘরেই ছিল। কিন্তু সে যে আগের ঠিক সেই অনলদেবই নয় তা কেউই বুঝতে পারেনি। ছেলের মৃত্যুতে সে স্ত্রীর প্রতি প্রতিহিংসার তাড়নায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। শোকে নয়, ক্রোধে উন্মাদ। সেই ক্রোধে স্ত্রীকে মারার জন্য তৈরী হয়েই ছুটে এসেছিল। কিন্তু সেই স্ত্রীই ও-ভাবে চলে যাবার পর থেকেই ভেতরে ভেতরে কি যেন শুরু হয়েছিল অনলদেবের। জীবনে কখনো এরকম বোধ করেনি। কাউকে সহ্য করতে পারছিল না, সাঙ্গোপাঙ্গরা দরজা থেকেই ফিরে গেছে। সেই থেকে নিজের মধ্যেই সেঁধিয়ে ছিল। অজান্তেই মগজের মধ্যে এক হিসেবের অঙ্ক শুরু হয়েছিল। জীবনের হিসেব। হিসেব যত এগুচ্ছিল ততো গণ্ডগোল বাড়ছিল। এ যাবৎ কামক্রোধ লোভলালসায় অনেকবার উন্মাদ হয়েছে, কিন্তু এই প্রথম হতাশায় ভেতরটা উন্মাদ পাগল।

শুভলক্ষ্মীকে ঘরে ঢুকতে দেখল। আগে হলে অবাক হতো। কারণ, পারতে

শুভলক্ষ্মী বাবার ঘরে ঢুকত না। কিন্তু তখন কোনো অনুভূতিই আর ছিল না। সেই ভাবলেশহীন মুখ দেখে মেয়ের ভেতরের জ্বালা কত গুণ বেড়ে গিয়েছিল অনলদেব বুঝতেও পারেনি। শুভলক্ষ্মী তার দিকে চিঠি বাড়িয়ে ধরে আগুন-ঝরা গলায় হিসহিসিয়ে উঠেছিল, 'পড়ুন, আমাকে লেখা মায়ের চিঠি। কিন্তু আপনার পড়া দরকার। খুব ভাল করে পড়ুন। তারপর ভাবুন এর পর বাকি দিনগুলো কি ভাবে কাটাবেন।'

যে ঠাণ্ডা শান্ত মেয়ে ভয়ে কোনোদিন বাপের চোখের দিকে চোখ তুলে চায়নি পর্যন্ত, তার এমন কথা আর এই স্বর শুনে বাইরে থেকে শঙ্করনারায়ণ প্রমাদ গুনল। কিন্তু এর পরেও টুঁ শব্দটি শোনা গেল না অনলদেবের। ফ্যালফ্যাল করে মেয়ের মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে হাত বাড়িয়ে চিঠি নিল। পড়তে লাগল। পড়া শেষ হবার পর সমস্ত সত্তার মূলে ঘায়ের পর ঘা, অস্তিত্বের গোড়ায় গোড়ায় নির্মম টান, চেতনার কোষে কোষে আত্মঘাতী যন্ত্রণা। কিন্তু বাইরে থেকে কিচ্ছু বোঝা গেল না। শুভলক্ষ্মী চিঠি নিয়ে দুচোখের আগুনে তার মুখ ঝলসে দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল। তাই দেখে অনলদেবের মাথায় এবার অন্য এক চিন্তার কাটা-ছেঁড়া শুরু হলো। এই মুখ সে আর কোথায় দেখেছে যেন? অনেক অ-নে-ক বার দেখেছে? এই সেদিনও দেখেছে? এ-রকম সাদা নয়, বরং ঘন নীল মেঘের বরণে ঠিক এমনই এক মুখ তার বড় চেনা ছিল। সে মুখেও ঠিক এমন টানা কালো চোখ ছিল। আর সেই চোখেও মাঝে মাঝে এমনই আগুন ঝলসাত। কিন্তু সে কার মুখ? কোথায় দেখেছে? কোথায় তাকে পাওয়া যাবে? তাকে যে এখন বড় দরকার! মাথাটা দ্রুত ফাঁকা হয়ে আসতে লাগল, আর চিন্তা করতে না পেরে চোখ বুজল অনলদেব।

## সাত

কামালপুরে বসেই অনলদেবের মাথা খারাপ হবার খবর পেয়েছিল শুভলক্ষ্মী। শঙ্করনারায়ণকে পাঠিয়ে যা ব্যবস্থা দরকার করিয়েছে, নিজে আসেনি। মায়ের একটা কথা রাখতে পারেনি, এই বাপকে ক্ষমা করতে পারেনি। পাগল হবার খবর শুনেও এতটুকু মায়া হয়নি। বরং ভেবেছে এ ভাবেই পাপের মাশুল গুনে প্রায়শ্চিত্ত করে যাক, তবে যদি উদ্ধার পায়। শুনেছে, বিড়বিড় করে অনলদেব শুধু একটা কথাই বারবার বলে, 'অমাবস্যা, কৃষ্ণা পঞ্চমী, কৃষ্ণা পঞ্চমী, অমাবস্যা—'

এরপর আবার হঠাৎ একদিন সারা গাজনপুর তোলপাড়, জমিদার বাড়ির মন্দির থেকে দেবীমূর্তি উধাও, শুধু পঞ্চমুখী শঙ্খ পড়ে রয়েছে। শ্যামাকালীর সারা গায়ে বহুমূল্য অলঙ্কার ছিল। সেই লোভে তার বিশৃঙ্খলার সুযোগে অরক্ষিত পুরী থেকে মূর্তি চুরি কোনো অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। কিন্তু কেউ তা ভাবল না। সারা গাজনপুরের মানুষের বিশ্বাস তাদের জীবন্ত প্রতিমার বিসর্জন হয়েছে বলেই পাষাণপ্রতিমাও সচল হয়ে নিজে থেকেই চলে গেছেন। আঁতিপাঁতি খুঁজেও দেবীমূর্তির কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। অজ্ঞাত আশঙ্কায় সারা গাজনপুর থমথমে, নির্বিকার শুধু অনলদেব। সে কিছু বুঝতেই পারে নি।

আবার ঘুরে এল সেই দিন, অমাবস্যার পঞ্চমী তিথি। সারা দিন উপোস করে রাত্রিবেলা কামালপুরের বাড়িতেই দেবীর উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছিল শুভলক্ষ্মী। এমন সময় খবর এলো।

ঠিক সন্ধ্যের পরেই চারদিকে রক্তলাল আলোয় চমকে উঠেছিল গাজনপুরের মানুষ। জমিদার বাড়ি থেকে আগুনের লকলকে শিখায় সমস্ত আকাশ লালে লাল। মন্দির পুড়েছে, গোটা বাড়ি পুড়েছে, আর সেই সঙ্গে পুড়ে খাক হয়েছে অনলদেবও। তাকে বের করে আনা যায়নি। যে চোরকুঠুরিতে সুচারু বিষ খেয়েছিল ঠিক সেই চোরকুঠুরিতে ঢুকে দরজা এঁটে দিয়েছিল। প্রাণের ভয়ে কাজের লোকেরা যারা ছুটোছুটি করে পালাবার পথ খুঁজছিল, তাদেরই কারুর চোখে পড়ে যেতে তাকে বের করার চেষ্টা করেছিল। ভেঙে পড়া জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে তাকেই যমের বাড়ি পাঠাতে চলেছিল অনলদেব, সে আর দাঁড়ায়নি।

শঙ্করনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে সেই শেষবার গাজনপুরে এসেছিল শুভলক্ষ্মী। পোড়া ঝলসানো বাড়িতেই উঠেছিল। চোরকুঠুরি থেকে অনলদেবের দেহের যেটুকু পাওয়া গেল তার সৎকার করে চতুর্থীর কাজ শেষে সেদিনই কামালপুর ফিরে গিয়েছিল। আসার পর থেকে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ থেকে পঞ্চমুখী শঙ্খ মেলেনি। কিন্তু শুভলক্ষ্মী জানে, ও জিনিস নষ্ট হবার নয়, নষ্ট হতে পারে না, ঠিক সময়ে ঠিক লোকেব হাত দিয়ে ঠিক ফিরে আসবে।

## আট

মায়ের চিঠি বীজমন্ত্র করে এবার শুভলক্ষ্মীর জীবনের নতুন অধ্যায়। যে নিখাদ বিশ্বাস আর নিঃশর্ত সমর্পণের বীজমন্ত্র আশ্রয় করে এতদিন বেঁচে ছিল সুচারু, নিজের জীবন দিয়ে সেই বীজ বড় সার্থকভাবে পুঁতে দিয়ে গেল একমাত্র সন্তান শুভলক্ষ্মীর মধ্যে। স্ত্রীর নতুন এই জীবনের বাঁকে স্বামী শঙ্করনারায়ণ তার দরদী সাথী। শঙ্করনারায়ণ রায় বরাবরই ধীরস্থির ঠাণ্ডা মানুষ। রূপসী স্ত্রীটিকে সে প্রাণ ভরে ভালবাসে। এই স্ত্রীটি তার মাকে কি চোখে দেখত বা মা তার কতখানি জুড়ে ছিল তা খুব ভালই জানত। সেই মায়ের কাছে সে নিজেও কানায় কানায় ঋণী। তার পড়াশুনো, চরিত্রগঠন, বিত্তবৈভব যা কিছু সব ওই মায়ের জন্যে। শ্বশুরবাড়ির অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে শঙ্করনারায়ণ কখনো মাথা ঘামায়নি। দাদাশ্বশুর বিক্রমদেবের আশ্চর্য ক্ষমতার কথা সে স্ত্রীর মুখে শুনেইছে শুধু, চোখে দেখেনি। শুভলক্ষ্মীও শোনা কথাই গল্প করেছে, স্মৃতি থেকে বলেনি। কারণ, বিক্রমদেব যখন মারা যান তখন সে নেহাতই ছোট। তবে এসব কথা নিয়ে কখনো কোনোরকম বিতর্কের মধ্যে যায়নি শঙ্করনারায়ণ। শ্বশুরবাড়ির একটা ব্যাপারই তার কাছে বিচিত্র অনুভবের বস্তু ছিল। শ্বশুর অনলদেবের ব্যভিচারী জীবনযাপনের পাশাপাশি শাশুড়ীর আশ্চর্য তপের মূর্তিটি। নীল প্রতিমার মতো সেই অপরূপ নারী আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে তার মনের মণিকোঠায় ছিল। সুচারু, আত্মিক শক্তি আর সত্তার জোরটুকুই শঙ্করনারায়ণের মস্ত বিস্ময়। শাশুড়ীর সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-ও

সেই ছেলেবেলা থেকে কোন্ বিশ্বাসে মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছে শঙ্করনারায়ণ জানত। শাশুড়ীর মৃত্যুর পর থেকে শুভলক্ষ্মীর সেই বিশ্বাস আরও বদ্ধমূল হয়েছে। মায়ের শেষ চিঠি নিজে যে কতবার পড়েছে আর তাকেও পড়িয়েছে তার কোনো হিসেব নেই। পড়ে পড়ে প্রতিটি শব্দ শঙ্করনারায়ণের মগজে বসে গেছে। শুভলক্ষ্মীর কাছে সে চিঠি বীজমন্ত্র। নিঃশব্দে তার দুঠোঁট নড়ে, চিঠির বয়ান জপ করে। একের পর এক যে বিরাট ধাক্কা খেয়েছে তাতে পাগল হয়ে যাবার কথা। ওই চিঠি সার মেনে যদি স্থির থাকতে পারে তো শঙ্করনারায়ণ আর কিছু চায় না।

দিন মাস বছর কাটছিল। শুভলক্ষ্মী শঙ্করনারায়ণ আর দু ছেলে নিয়ে তাদের শান্ত জীবন হঠাৎই একদিন এক অকল্পনীয় আঘাতে তছনছ হয়ে গেল। বাজ পড়ে দুছেলেই একসঙ্গে শেষ। এক ঝড়ের বিকেলে বাড়ির আমবাগানে দুভাই ছুটোছুটি করে আম কুড়োচ্ছিল। তখনই এই সর্বনাশ। আচমকা বাজের ঘায়ে কচি প্রাণ কখন দেহ ছেড়ে বেরিয়ে গেছে নিজেরাও টের পায়নি। পোড়া কাঠ ছোট্ট দুটো শরীর তখনো হাত ধরাধরি করে, মুখের কাছে আধখাওয়া কাঁচা আম তেমনি ধরা। শঙ্করনারায়ণ শোকে পাগল হতে বসেছিল, কিন্তু শুভলক্ষ্মী পাথর। তরতাজা দু দুটো ছেলে একসঙ্গে এমনভাবে চলে গেল কিন্তু তার চোখে জল নেই, ভাবলেশশূন্য অনুভূতিশূন্য বোবা পুতুল একখানা। শঙ্করনারায়ণ শোকের আবর্ত থেকে একসময় নিজেকে টেনে তুলেছে, কিন্তু প্রাণপাত চেষ্টা করেও স্ত্রীকে সেই নিঃসীম নীরবতার কবর থেকে বের করে আনতে পারেনি। একটি কথা বলে না, মুখে একটি আওয়াজ নেই, বোবা চাউনি মেলে শুধু চেয়ে থাকে। শঙ্করনারায়ণের বুকের ভেতরটা মুচড়ে মুচড়ে ভাঙে। তার এত বড় শোকের দোসর নেই, এত বড় ব্যথার বোঝা ভাগ করে নেবার সাথী নেই, কারণ শুভলক্ষ্মী থেকেও নেই।

বোবা দুচোখ মেলে সেদিনও চুপচাপ শুয়ে ছিল শুভলক্ষ্মী। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ধীর ঠাণ্ডা মানুষটা ভেতরে ভেতরে হঠাৎই ক্ষেপে উঠল। শঙ্করনারায়ণ শক্ত দু'হাতে স্ত্রীর দুটো কাঁধ ধরে টেনে তুলে বিষম ঝাঁকুনি দিল। চোখে চোখ গেঁথে মুখের সঙ্গে প্রায় মুখ ঠেকিয়ে রুদ্ধ যাতনায় অস্ফুটে বলে উঠল, 'এরকম কিছু যে ঘটবে তুমি জানতে না? জানতে না?...তাহলে মায়ের ওই চিঠি তুমি আসলে এক বর্ণও বিশ্বাস করনি...কি লেখা ছিল তাতে? লেখা ছিল, চরম মার মেরে তিনি আসবেন, পুড়িয়ে পুড়িয়ে সোনা করে তিনি আসবেন, বিশ্বাস আর সমর্পণের সেতুপথে তিনি আসবেন, খাঁটি বিশ্বাস আর নিঃশর্ত সমর্পণের কঠিন পরীক্ষায় পার হলে তবেই তিনি আসবেন।...মনে পড়ছে? পড়ছে মনে?'

ছেলেদের মৃত্যুর পর এই প্রথম শুভলক্ষ্মীর চোখের তারায় দৃষ্টি ফুটতে দেখল শঙ্করনারায়ণ। তখনো স্বাভাবিক নয়, তবে আগের মতো একেবারে শূন্যও নয়। বোবা শোকের বিবর থেকে যন্ত্রণা দিয়েই তাকে নিজের কাছে ছিনিয়ে আনতে চাইল শঙ্করনারায়ণ। দু হাতের দশ আঙুল লোহার মতো নরম কাঁধের মাংস কেটে বসল। আবারও প্রবল ঝাঁকুনি, 'কিন্তু তোমার মধ্যে সেই বিশ্বাস কোথায়? সমর্পণ কোথায়? পরীক্ষা পার হওয়ার সাধনা কোথায়?'

খুব আস্তে আস্তে একটা ঘোর ভাঙছিল যেন। পাথরমূর্তিতে খুব ধীরে প্রাণের সাড়া জাগল। একটা তিরতিরে কাঁপনের ঢেউ মাথা থেকে পা পর্যন্ত ছলকে গেল। দুচোখ অস্বাভাবিক চকচকে। প্রত্যাশায় শঙ্করনারায়ণ উদ্‌গ্রীব, এবার তার গলা দিয়ে ব্যগ্র আকৃতি ঝরল, 'ছেলেদের এই চলে যাওয়া বিফল হবে না। কবে তারা গেছে জানো? সেই এক তিথি, অমাবস্যা, কৃষ্ণা-পঞ্চমী।'

শেষ কটা কথায় শুভলক্ষ্মীর ভেতরে আচমকা ভূমিকম্প ঘটে গেল বুঝি। একটা স্পন্দন স্পষ্ট হয়ে অবিশ্বাস্য গতিতে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল, কদম-কাঁটার মতো সর্বাঙ্গের রোম দাঁড়িয়ে উঠল, কাগজের মতো সাদা মুখ-গলা-বাহুতে দেখতে দেখতে আবিরের টকটকে রং ধরল, এত দিনের রুদ্ধ যাতনা মুক্তির তাড়নায় সর্বাঙ্গ তোলপাড় করে দু'চোখ ফেটে ছুটে বেরুতে চাইল। দুহাতে প্রাণপণে শঙ্করনারায়ণকে আঁকড়ে ধরে এই প্রথম কান্নায় ভেঙে পড়ল শুভলক্ষ্মী।

## নয়

এক বছর পর আবার সন্তান এসেছে। এবারও ছেলে। সেই ছেলেই ত্রিদিবনারায়ণ। ছেলের সাড়ে সাত বছর বয়সে হঠাৎই শঙ্করনারায়ণ চোখ বুজেছে। জীবনের সবচেয়ে বড় দিকটা খালি হয়ে গেলেও এবার আর শুভলক্ষ্মী নিজেকে তলিয়ে যেতে দেয়নি। ছেলের মুখ চেয়ে নিজের পিঠে চাবুক মেরে শোকের ঘোর থেকে নিজেকে টেনে তুলেছে। নিজেকে স্থির রাখার চাবুক, বিশ্বাস আর সমর্পণের কঠিন পরীক্ষা উত্তরণের চাবুক, শুচিতা আর শুদ্ধতার চাবুক।

এই মায়ের দিকে চেয়ে শ্বেত পাথরের আশ্চর্য সুন্দর এক জীবন্ত প্রতিমা দেখত ত্রিদিবনারায়ণ। দুধ সাদা গায়ের সঙ্গে ধবধবে থান মিশে থাকত। নিরাভরণ সর্বাঙ্গ আশ্চর্য সাদা। রং শুধু মাথার নিবিড় কালো চুলে, আয়তপক্ষ্ম বিশাল দু চোখের ঘনকৃষ্ণ তারায়, আর টুকটুকে লাল চুনীর মতো ঠোঁটে। মায়ের বুকের ভেতরে শুয়ে রাতের পর রাত মামাবাড়ির গল্প শুনত ত্রিদিবনারায়ণ। রক্তবর্ণ বিশাল পুরুষ মায়ের সেই ঠাকুর্দা যার হাতের ছোঁয়ায় পঞ্চমুখী শঙ্খ প্রাণ পেয়ে শূন্যে উঠে ঘুরত, নিজে থেকে পাঁচমুখ বেয়ে পুণ্য জল পড়ত, আর মায়ের সেই আশ্চর্য নীল রূপের মা যাকে লোকে শ্যামাকালীর অংশ ভাবত। তাদের সক্কলের কথা শুভলক্ষ্মী একটু একটু করে নিপুণভাবে তার ছেলের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ছোট্ট ত্রিদিবনারায়ণ মুগ্ধ হয়ে সেই জগতে ঘুরে বেড়াত। কল্পনায় দেখত পঞ্চমুখী শাঁখ আর শ্যামাকালীর মূর্তি সে খুঁজে এনেছে, আর তাই দিয়ে দেবীর আরতি করছে। তার হাতের ছোঁয়ায় প্রাণ পেয়ে সেই শঙ্খ শূন্যে উঠে ঘুরছে, পাঁচ মুখ বেয়ে জল হাত উপচে গড়িয়ে পড়ছে। আর মা দুচোখ ভরে দেখছে আর হাসছে, হাসছে আর দেখছে।

দশ বছর বয়সে ত্রিদিবনারায়ণ তার এই ঠাণ্ডা শান্ত মায়ের মধ্যে এক বিপুল তোলপাড় দেখল। শ্বেত পাথরের মতো শরীরে যেন কেউ আবির গুলে দিয়েছে।

সর্বাঙ্গ টকটকে লাল, সাদা কাপড়ের নিচে পায়ের আঙুলগুলোতে পর্যন্ত সেই লাল ছড়িয়েছে। সবসময় কিছু ভাবছে আর ভাবছে।

লোকের মুখে মুখে তাদের সবার কানেই ভাণ্ডারহাটির এক আশ্চর্য পূজারীর আশ্চর্য পুজোর খবর এসেছিল। সে কথা শোনার পর থেকেই শুভলক্ষ্মীর এই অবস্থা। সেই পূজারী কোথা থেকে এসেছে বা তার পরিচয় কেউ জানে না। কষ্টিপাথর কোঁদা নিকষ কালো বিশাল চেহারা নাকি তার। অর্ধেক নীল আর অর্ধেক কালো ছোট্ট একটি আশ্চর্য কালীমূর্তির সামনে সাদা ধবধবে শঙ্খ নিয়ে আরতি করে, শুধুই শঙ্খ-আরতি। আরতি করতে করতে তার আর বাহ্যজ্ঞান থাকে না। তার হাতে সেই শঙ্খ একসময় নাকি প্রাণ পেয়ে নড়ে ওঠে। আরতি শেষ হবার ঠিক আগের মুহূর্তে তালু ছেড়ে শূন্যে উঠে পাক খেয়ে আবার ফিরে আসে, শাঁখের পাঁচমুখ দিয়ে তখন অঝোরে জল পড়তে থাকে। লোকটার নাম রতন, তার ইষ্টদেবীকে সবাই রতনেকালী বলে। এ কথা শোনামাত্র লাফিয়ে উঠে মায়ের কাছে দৌড়েছিল ত্রিদিবনারায়ণ। কিন্তু মা তার আগেই সব শুনেছে। কঠিন গলায় তাকে এ ব্যাপারে কোনো কথা বলতে নিষেধ করেছে, কাউকে না, কারুর সঙ্গে না।

কাউকে কিছু না জানিয়ে শুধু দুটি অতি বিশ্বস্ত লোক নিয়ে শুভলক্ষ্মী ভাণ্ডারহাটি চলে গেলো। পুজো দেখতে পায়নি, যখন তারা পৌঁছেছে তখন আরতি সারা। কিন্তু বিগ্রহ দেখেছে, শঙ্খ দেখেছে, আর পূজারীকে দেখেছে। হ্যাঁ, সেই শ্যামাকালী সেই পঞ্চমুখী শঙ্খ আর সেই রতনই। চেহারা বিশাল হয়েছে কিন্তু মায়াভরা ডাগর দুটো চোখ ঠিক আগের মতোই আছে। সুচারুর মুখ কেটে বসানো শুভলক্ষ্মীকে রতনও দেখামাত্র চিনেছে। তার বৈধব্যের রিক্ত চেহারা দেখে প্রথমে আঁতকে উঠে দুহাতে মুখ ঢেকেছিল, তারপর ছুটে এসে দিদিরানীর পায়ে লুটিয়ে পড়েছে। রতনের চোখের জলে দু-পা ভিজে যাচ্ছিল শুভলক্ষ্মীর। আর শুভলক্ষ্মীর চোখের জলে মাথা ভিজছিল রতনের। শুভলক্ষ্মীর চোখ ছাপানো দরদর ধারা রতনের মাথায় পিঠে বৃষ্টির মতো ঝরছিল, আর রতনের অশ্রুর ফুল শুভলক্ষ্মীর পায়ে নৈবেদ্য হয়ে ফুটছিল। একসময়ে দুজনেই স্থির হয়েছে। তারপর রতনের মুখে এক আশ্চর্য কাহিনী শুনেছে শুভলক্ষ্মী।

## দশ

অনলদেবের কোপে পড়ে রতনের মা বাপ ওভাবে মরার পর দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে সে নিজেও মরণ ছোটা ছুটেছিল। কটা দিন কোনোকিছুর খেয়াল ছিল না। সেই সময় কারা খেতে দিত, জোর করে ঘরে বন্ধ করে লুকিয়ে রাখত, কিচ্ছু মনে নেই। শুধু মনে পড়ে একদিন হঠাৎ ভেতরটা উন্মাদ হয়ে উঠেছিল, মা-কে পাবার জন্যে উন্মাদ। নিজের মায়ের জন্যে নয়, সে তো মরেই গেছে জানে, আরেক মায়ের কাছে যাবার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিল। ঘরের দরজা ভেঙে সেই মায়ের কাছেই ছুটেছিল। সেই মা সুচারু। মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে নীলবরণ মায়ের আগুনপানা রূপ দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে গেছল। তারপরেই অঘটন। মা ছুটে তার দিকে আসতে আসতেই রতনকে

জমিদার রাজা ধরে ফেলল। তার অপরাধ কি সে জানত না। কিন্তু পিছমোড়া করে বেঁধে চোরকুঠুরিতে মুখে কাপড় গুঁজে যখন তাকে ছুঁড়ে ফেলা হলো, তখনই বুঝেছিল এই তার শেষ। তবু আকুল হয়ে মনে মনে মন্দিরের ওই শ্যামাকালীকেই ডেকে চলেছিল। কিন্তু যত বার তার পায়ে মাথা খুঁড়ছিল, চোখের সামনে ভেসে উঠছিল টকটকে লাল পেড়ে দুধ সাদা শাড়ির নিচে আলতা পরা দুটি রাতুল চরণ। দেবীর মুখের বদলে কপালে জ্বলজ্বলে সিঁদুরের বিশাল টিপ আঁকা জীবন্ত মায়ের শ্যামলা মুখ বারবার সামনে এগিয়ে আসছিল। তখন মনে মনে ওই মায়ের পায়েই মাথা গুঁজে পড়ে ছিল রতন। তারপর সেই অদ্ভুত মুক্তি। কিন্তু যেতে গিয়েও সে ফিরে এসেছিল। বুঝেছিল এখন ছেড়ে গেলে এই মাকে আর পাবে না। আকুল হয়ে তাকে দুহাতে টেনে আনতে চেয়েছিল। কিন্তু মা আসেনি। কেমন অদ্ভুত হেসে বলেছিল, সে ওখানেই থাকবে, তাকে ওখানেই থাকতে হবে, রতন যেন বড় হয়ে এসে তাকে নিয়ে যায়।

তারপর থেকে যেখানেই যাক যেখানেই থাকুক মায়ের ওই মুখ আর ওই কথা রতনকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। বড় হবার পরেও। কোথাও স্থির হয়ে বসতে পারেনি। লোকের মুখে গাজনপুরের সব খবর পেয়েছে। মায়ের মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা জেনে কদিন পাগলের মতো কেটেছিল। কিন্তু সব জানার পরেও কিছুতেই মানতে পারেনি যে মা নেই। বরং মাকে নিয়ে আসার জন্যে কেউ যেন বারবার তাকে গাজনপুরের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছে। যত দিন গেছে তার সেই তাড়না ততো বেড়েছে। শেষে ভেতরের তাগিদে অস্থির হয়ে একদিন গাজনপুরেই ফিরে গেছিল। কানে শুধু বাজছিল মায়ের সেই কথা—'আমাকে এখানেই থাকতে হবে রে রতন, আমি এখানেই থাকব, বড় হয়ে এসে আমাকে নিয়ে যাস...'

'বড় হয়ে এসে আমাকে নিয়ে যাস...আমাকে নিয়ে যাস...নিয়ে যাস...নিয়ে যাস...।' অহরহ শুনতে শুনতে রতন পাগল হয়ে গিয়েছিল। পোড়া, ধ্বসে পড়া জমিদারবাড়ির আর মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের কোণে কোণে মাকে মরণ খোঁজা খুঁজত আর চিৎকার করে উঠত, 'আমি এসেছি মা, আমি এসেছি। আমি তোমার রতন, তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি।' লোকে বলত রতন পাগলা। দয়া করে কেউ না কেউ দু'মুঠো খেতে দিত। কোনোদিন কিছু মুখে তুলত, কোনোদিন আবার তাও পারত না। অব্যক্ত যাতনায় যখন নিজেকে শেষ করে দেবার কথা ভাবছিল, হঠাৎই একদিন দেখে সেই মা মাথার কাছে দাঁড়িয়ে। বলল, 'আয়! আমায় তোল! সেই কবে থেকে তোর জন্যে বসে আছি, নিয়ে যাবি না আমায়?'

রতন চোখ মেলে দেখে তখন ভোর ভোর, আবছা আলোয় জমিদারবাড়ির বিশাল দীঘি চকচক করছে। কেউ যেন সেদিকে ঠেলে দিল তাকে। মোহাবিষ্টের মতো পায়ে পায়ে পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, তারপর ডুব দিয়ে তুলে এনেছিল ওই শ্যামাকালীর মূর্তি আর পঞ্চমুখী শঙ্খ। পাথরের বিগ্রহে সে স্পষ্ট দেখেছিল তার সেই মায়ের জীবন্ত মুখ। আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়ায়নি রতন, মাকে নিয়ে সেই মুহূর্তে গাজনপুর ছেড়ে চলে গেছে। তারপর থেকেই ওই বিগ্রহ আর পঞ্চমুখী শঙ্খ নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে চলেছে। নিত্য মায়ের আরতি করেছে নিজের মতো করে। সে নিজেও জানে না

সত্যি তার হাত ছেড়ে শঙ্খ শূন্যে ওঠে কি না। তার যে তখন কোনো হুঁশই থাকে না। লোকে যা বলে তাই শোনে। এক এক জায়গায় লোকের ভিড়ে যখন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তখন সেখান থেকে বিগ্রহ বুকে করে উধাও হয়। শেষমেশ এই ভাণ্ডারহাটির জঙ্গলে মাকে নিয়ে ডেরা বেঁধেছিল। আর এখানেই এমন অদ্ভুত যোগাযোগ।

## এগারো

রতনকে একেবারে সঙ্গে নিয়ে শুভলক্ষ্মী কামালপুর ফিরেছিল। রতন দোনামোনা করছিল। তখন শুভলক্ষ্মী রতনকে তার জন্মের গল্প শুনিয়েছে। কি স্বপ্ন দেখে তার বাবা-মা গগন আর বাহারী গভীর রাতে শ্যামাকালীর মন্দিরে গিয়ে সুচারুর কাছে আছড়ে পড়েছিল, তারপর সুচারু নিজের হাতে প্রদীপের শিখার তাপ তার মায়ের সর্বাঙ্গে ছোঁয়াবার পর সে পেটে আসে, আর এদিকে নির্মাল্যদেব হবার একই দিনে তারও জন্ম, সব বলেছিল শুভলক্ষ্মী। শুনে হতবাক হয়ে বসেছিল রতন। শুভলক্ষ্মী আরও বলেছিল, 'জেলের ঘরে জন্মালেও আমাদের সঙ্গে তোর জন্ম-জন্মান্তরের যোগ রতন, মা-ই তোকে পাঠিয়েছে। মায়ের ইচ্ছেতেই আবার এই যোগাযোগ। রতন, তোর হাত দিয়েই মা যে আবার ঘরে ফিরতে চান!

আর কোনো আপত্তি করেনি রতন। বিগ্রহ বুকে নিয়ে আর পঞ্চমুখী শাঁখ মাথায় করে শুভলক্ষ্মীর সঙ্গে কামালপুর ফিরেছিল। শুভলক্ষ্মী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে সেই গাজনপুরে যেমন দেখেছিল, তেমনি ভাবে ইষ্টদেবীর আসনের সামনে ছোট্ট একটা রূপোর পরাতে শঙ্খ বসিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, বাড়িতে প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই শঙ্খ আবার অনড়। প্রতিদিন সন্ধ্যা আরতির সময় অসহ্য উৎকণ্ঠায় শুভলক্ষ্মীর ভেতরটা ফেটে পড়ত, কিন্তু শঙ্খ নড়েনি। আরতির সময় রতনের বাহ্যজ্ঞান থাকে না, সে তখন কিচ্ছু জানতে পারে না। কিন্তু দিন দিন দিদিরানীর পাথরপানা মুখ দেখে তার বুক কেঁপে ওঠে, বুঝতে পারে, সেদিনও তার হাতে শাঁখ ঘোরেনি। আর পুজো শেষে ঘোর কাটার পর সে তো নিজেই দেখে শঙ্খের জল তেমনি ভরা আছে, এতটুকু ছলকায়নি, এতটুকু পড়েনি।

অমঙ্গলের ভয়ে রতন বিগ্রহ আর শঙ্খ নিয়ে আবার চলে যেতে চেয়েছিল। শুভলক্ষ্মী বাধা দেয়নি, কেবল মায়ের লেখা সেই চিঠি তাকে পড়ে শুনিয়েছিল, মায়ের বিশ্বাসের কথা বলেছিল, আর সে নিজেও কিভাবে দু'দুটি সন্তান ও স্বামীকে হারিয়েও এখন কোন্ বিশ্বাসে শেষ সম্বল ছোট ছেলেটাকে বুকে আঁকড়ে চরম পরীক্ষায় পার হবার ব্রত নিয়েছে, তাও বলেছে। তারপর আবার বলেছে, এর পরেও যদি চলে যেতে চায় রতন, তো সে আর আটকাবে না। কিন্তু যতক্ষণ প্রাণটুকু এ শরীরের মধ্যে আছে সে টলবে না, এর শেষ দেখে তবে ছাড়বে। তার মায়ের এতবড় বিশ্বাস মিথ্যে হতে দেবে না। শুধু পঞ্চমুখী শঙ্খটি সে রতনের কাছে ভিক্ষে চায়। ওই শাঁখকে তারই ঘরে নড়তে হবে, জল পড়তে হবে ; তবেই যে তার পিতৃবংশের পাপমুক্তি আর মায়ের জীবন পণ করা তপের সিদ্ধি!

সব শুনে রতনের দু'চোখ অস্বাভাবিক চকচক করে উঠেছিল। দিদিকে দিয়ে বারবার মায়ের সেই চিঠি পড়িয়েছে, আর তন্ময় হয়ে শুনেছে। শেষে বলেছে, 'দিদিরানী, মায়ের দয়াতেই এ জেবন ধরেছি, তার জন্যিই এ প্রাণটা রক্ষে পেয়েছে, তার ও শাঁখেরে নড়ানোর তরে এবার এটারেই বাজি রাখলুম।...ওরে তোমার ঘরেই নড়তে হবে, এবার আমিও দেখি মা আমারে লিয়ে কি খেলা খেলে।'

এরপর একই সঙ্গে শুরু হল শুভলক্ষ্মী আর রতনের সাধনার লড়াই। নিত্য পুজো-আরতিতে শুভলক্ষ্মীর নিরলস প্রার্থনার সঙ্গে যোগ হল রতনের নিরবচ্ছিন্ন সাধনা। এমন সময় আবার হঠাৎই দুর্যোগ ঘনালো। ত্রিদিবনারায়ণ জ্বরে বেহুঁশ। চিকিৎসকরা বলে গেল, টাইফয়েড। রোগ দেখতে দেখতে বিপজ্জনক মোড় নিল। সেদিনের টাইফয়েডে বেঁচে ওঠাটাই আশ্চর্যের। দশ বছরের ছেলেটার কচি শরীরে মৃত্যুর থাবা দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

শুভলক্ষ্মী পাথর, সেই সাদা পাথরের মূর্তির দুটো চোখে সাদা আগুন খালি ধকধক জ্বলে আর জ্বলে। রতন ঠাকুরঘর ছেড়ে এক পা নড়ে না। এখন আর সময়ের বিচার নেই, সকাল দুপুর বিকেল সন্ধ্যে শঙ্খ হাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উন্মাদ আরতিতে তার শরীরের রক্ত ঘাম হয়ে মাটি ভিজিয়ে দেয়, কিন্তু শঙ্খ নড়ে না, একফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ে না।

সেদিন চিকিৎসকরা সবাই জবাব দিয়ে চলে গেল। নাড়ি আর পাওয়া যাচ্ছে না, প্রাণের অন্তিম ধুকধুকুনিটুকু কণ্ঠার কাছে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে, এবার যে কোন সময় একেবারে থেমে যাবে। হঠাৎ বিষম চমকে উঠলো রতন। ছেলের অচৈতন্য দেহ দুহাতে নিয়ে শুভলক্ষ্মী ঠাকুরঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। দেবীর পায়ের নিচে কঠিন মাটিতে জ্বরতপ্ত ছেলেকে শুইয়ে রতনের দিকে ফিরল, দু চোখ টকটকে লাল। বলল, 'এ ছেলে চলে গেলে সব শেষ, বিক্রমদেবের রক্তধারা আচায্যি বংশের বীজ বেয়ে আর কেউ আসবে না। তাহলে সব মিথ্যে হয়ে যাবে। তোর আমার মা, এই শ্যামাকালী, এই পঞ্চমুখী শঙ্খ—সব।'

রতন বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে। তার ধীর ঠাণ্ডা দিদিরানীর এমন মূর্তি আর কখনো দেখেনি। শুভলক্ষ্মীর নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল, দুধসাদা চামড়ার নিচে রক্তকণার দাপাদাপি রতনের চোখেও স্পষ্ট হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণ গলায় শুভলক্ষ্মী আবার বলল, 'কিন্তু তা হতে পারে না। হতে পারে না বলেই তুই এ ভাবে জন্মেছিস, এ ভাবে বেঁচেছিস, এ ভাবে এসেছিস। তোর হাত ধরেই বংশের ঠাকুর-শাঁখ সব ফিরেছে। এবার তুই কি করবি ভাব্।'

রতন ফ্যালফ্যাল করে চেয়েই আছে। নিজেকে আত্মস্থ করে শুভলক্ষ্মী এবার খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আমি কাল আসব। তোর ডাকেও যদি মা সাড়া না দেয় তো জানব আমারই কোনো ভুলে সব নষ্ট হয়ে গেল। ছেলের সঙ্গে এ শরীরটাও তাহলে এখানেই শেষ করে দেব। দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবীমূর্তির পায়ের তলায় রাখা ছেলের দিকে শেষবারের মতো তাকিয়ে বেরিয়ে গেল। রতন দেখল অনেক কাল আগের দেখা ঠিক সেই মায়ের

মতো একখানা বিদ্যুৎশিখা জ্বলতে জ্বলতে চলে গেল। তবে এ শিখার রং নীল নয়, আবিরগোলা লাল।

চরম ফয়েসলার সংকল্প নিয়ে পরদিন ভোর না হতেই ঠাকুরঘরে ঢুকেছিল শুভলক্ষ্মী। তারপরেই সর্ব শরীরে বিষম ঝাঁকুনি। না, ছেলে বেঁচে আছে, নাড়ি সচল, কণ্ঠার ধুকধুকুনি আর নিঃশ্বাসও অনেক স্বাভাবিক। অসাড়ে ঘুমুচ্ছে। কিন্তু তার ঠিক পাশটিতে তাকে বুকে জড়িয়ে দেবীর পায়ের নীচে ঘুমুচ্ছে রতনও। রতনের মাথা ফেটে চাপ চাপ রক্ত জমাট হয়ে শ্বেতপাথরের মেঝেতে লালপদ্ম ফুটেছে। সেই নৈবেদ্যর ডালি সাজিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে রতন।

শুভলক্ষ্মীর আর্ত চীৎকারে খানখান হয়ে গেল ভোরের স্তব্ধতা। 'একি করলি রতন, তুই এ কি করলি?'...পাথরের বিগ্রহে ঠুকে ঠুকে মাথা-কপাল-নাক-মুখ একেবারে ছেঁচে ফেলেছে রতন। মূর্তিরও সারা গায়ে অদ্ভুত ফাটা দাগ আর শুকনো রক্তের ছোপ। শুভলক্ষ্মীর আর্তনাদে রতন চোখ মেলে তাকিয়েছিল। সেই ফাটা মুখে আশ্চর্য সুন্দর হাসি হেসে বলেছিল, 'আর কোনো ভয় নাই দিদিরানী, ছেলে তোমার ভাল হয়ে যাবে।' তারপর আঙুল তুলে দেবীমূর্তিকে দেখিয়ে বলেছে, 'মা হয়ে সন্তানেরে খালি সারা জীবন ধরে পরখই করে যাবে? তার ব্যথা বুঝবে না? এবার ওনারও খুব আক্কেল হয়েছে।' এরপর অতিকষ্টে শেষ কথাকটি বলেছিল।—'তোমাদের পুণ্যের ঘরে মায়েপোয়ে আবার আমরা ফিরে আসব দিদিরানী। এখন এই ফাটা শরীরটার সঙ্গে ওই ফাটা মায়েরেও বিসজ্জন দিয়ে তার নামে ঘরে ঘট পেতে রাখবে, আমি ঠিক তারে লয়ে ফিরে এসে একদিন ওই শাঁখ ওঠাব।'

শুভলক্ষ্মীর কোলে মাথা রেখে রতন এবার একেবারে ঘুমিয়েছে।

সেই থেকে রায়বাড়িতে কোন বিগ্রহ নেই, ঠাকুর নেই--শুধু সেই ঘট আর পঞ্চমুখী শঙ্খ। শুভলক্ষ্মী ওই দুটি জিনিস অবলম্বন করে বাকি জীবনটা কাটিয়েছিল। ছেলেকে ঠাকুরঘরে বসিয়ে সব কথা খুলে বলেছে। বারবার বলেছে, 'বিশ্বাস রেখো। ঠিক জেনো তিনি আসবেন। চরম মার মেরে তিনি আসবেন, পুড়িয়ে পুড়িয়ে সোনা করে তিনি আসবেন, বিশ্বাস আর সমর্পণের সেতুপথে তিনি আসবেন, খাঁটি বিশ্বাস আর নিঃশর্ত সমর্পণের কঠিন পরীক্ষায় পার হলে তবেই তিনি আসবেন। নয়তো তাঁরও মুক্তি নেই।'

## বারো

বড় হবার পর আধুনিক যুগের মাটিতে শক্ত দুটো পা রেখে দাঁড়ানো ত্রিদিবনারায়ণ রায়ের মন থেকে তার ছেলেবেলার রূপকথার সেই জগৎ সরে গিয়েছিল। কিন্তু মায়ের ধ্যান-ধারণায় কোনোদিন এতটুকু আঘাত করেন নি। যে বিশ্বাস আর সমর্পণের বীজমন্ত্র মা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছেলের সত্তার গভীরে গেঁথে দিতে চেষ্টা করেছে, তা কতটা সম্ভব হয়েছে ত্রিদিবনারায়ণ নিজেও জানতেন না, আর জানবার চেষ্টাও করেন নি। কিন্তু

মায়ের দিকে চেয়ে চেয়ে স্থির বিশ্বাস আর নিখাদ সমর্পণের এক আশ্চর্য রূপ দেখতেন, এক আশ্চর্য যুগের আশ্চর্য বিশ্বাস আর আশ্চর্য সমর্পণের জোর দেখতেন, জ্যোতি দেখতেন। ত্রিদিবনারায়ণের মতে আজকের জগতে সেটাই অলৌকিক।

ছেলেবেলা থেকেই ত্রিদিবনারায়ণ তীক্ষ্ণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে রেকর্ড নম্বর নিয়ে ফিলসফিতে এম. এ. পাশ করে অনায়াসে তখনকার নামী কলেজে শিক্ষক হিসেবে চাকরি পেয়েছিলেন। ইতিমধ্যে মায়ের পছন্দমতো সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করে সংসারও পেতেছিলেন। সেই সুখের সংসারে ছেলে আসার পর শুভলক্ষ্মী নিশ্চিন্তে চোখ বুজেছে। নাতির নাম রেখে গেছিল দেবনারায়ণ। কোনো লক্ষ্য আর বিশ্বাস নিয়ে তার পিতৃকুলের 'দেব' আর শ্বশুরবাড়ির 'নারায়ণ' শব্দদুটো যুক্ত হয়েছিল, ত্রিদিবনারায়ণ তা ভালই বুঝেছিলেন। বুঝেছিল স্ত্রী সুমতিও। শাশুড়ির মুখে সব গল্প দিনরাত শুনে-শুনে তারই বরং বিশ্বাস জন্মেছিল যে সত্যিই রতন পাড়ুই জন্মান্তরে আবার ফিরে আসবে। পঞ্চমুখী শঙ্খ আবার প্রাণ পেয়ে নড়বে। তার পবিত্র জলের ধারায় বংশেব অভিশাপ ধুয়ে-মুছে যাবে। শাশুড়ির মৃত্যুর পর কলকাতায় বাড়ি করার সময় সুমতির নির্দেশে ঠিক কামালপুরের বাড়ির মতো শ্বেতপাথরের ঠাকুরঘর হয়েছে, আর ঠিক সেভাবে সেই ঘট প্রতিষ্ঠা করে তার সামনে রূপোর পরাতে পঞ্চমুখী শঙ্খ বসানো হয়েছে।

ডক্টরেট করার পর পোস্ট ডক্টরাল করে খুব কম বয়সেই প্রিন্সিপাল হয়েছিলেন ত্রিদিবনারায়ণ। শিক্ষকতার জগতে এক ডাকে তাঁকে সবাই চিনত। নিজের পড়াশুনা, লেখালেখি আর ছাত্রদের নিয়েই ডুবে থাকতেন। তাঁর সেই নিজস্ব জগতে স্ত্রী সুমতির সেরকম কোনো অস্তিত্ব ছিল না। সে থাকত তার ঘরকন্না নিয়ে। কিন্তু একমাত্র সন্তান দেবনারায়ণকেও সে তেমন ভাবে পায় নি। তাকে পুরোপুরি দখল করে নিয়েছিলেন ত্রিদিবনারায়ণ। একেবারে বাচ্চাবেলা থেকেই ছেলে তার বাবার নিজস্ব পৃথিবীর বাসিন্দা। তার নাওয়া-খাওয়া-ঘুম সবকিছু বাপের সঙ্গে। ত্রিদিবনারায়ণ ছেলেকে তার পড়াশুনার প্রথম দিনটি থেকে একেবারে শেষ দিন পর্যন্ত নিজে দেখাশুনা করেছেন। ছোট্টবেলা থেকে নানান গল্পের মধ্য দিয়ে জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার ছেলের কাছে উজাড় করে ধরেছেন। যেখানে যখন গেছেন দেবনারায়ণ তাঁর সঙ্গী। বেড়ানোর ছলে বাইরের পৃথিবী, বিজ্ঞান আর প্রকৃতির বৈচিত্র্য ছেলের চোখ কান আর বোধের আওতায় খুব সহজভাবে ধরে দিতেন। ফলও সেরকমই মিলেছিল। পড়াশুনোয় দেবনারায়ণ জীবনে কোনোদিন দ্বিতীয় হয় নি, আর খুব অনায়াসেই অন্য সব দিকেও তুখোড় হয়ে উঠেছিল। ত্রিদিবনারায়ণের সবচেয়ে বড় পাওনা, ছেলে তাঁর সত্যিকারের বন্ধু হয়েছিল আর ছেলেরও সব থেকে কাছের জন তার বাবা। সে আমলে ছেলেরা যখন বাপের চোখে চোখ রেখে কথা বলত না, আপনি-আজ্ঞে করত, তখন দেবনারায়ণ অনায়াসে বাবাকে বকাঝকা করত, সব রকম বিষয় নিয়ে আলোচনা করত, তর্ক জুড়ত। নিজে হারলে হাসত আর জিতলে বাবার জন্যেই মন খারাপ হত। সেই দিনে বাবাকে তুমি করে বলত দেবনারায়ণ। ত্রিদিবনারায়ণ রায় ঘরে বাইরে সত্যিকারের সফল আর তৃপ্ত মানুষ ছিলেন।

কম্‌পিটিটিভ পরীক্ষায় প্রথম হয়ে অল্প বয়সে মস্ত চাকরি পেল দেবনারায়ণ। নিজের পছন্দেই বিয়ে করেছিল। তার বউও সুন্দরী। কথায় বলে সুখের ঘরে রূপের বাসা। সত্যিই ত্রিদিবনারায়ণ রায়ের সুখের ঘর রূপের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠেছিল। তাঁর মতো দৃপ্ত সৌন্দর্য সহজে চোখে পড়ে না, স্ত্রী সুমতির রূপ দেখেই মা তাকে ঘরে এনেছিলেন। ছেলে দেবনারায়ণও বাপের মত সুপুরুষ, তার ওপর বউও এ বাড়ির সবার পাশে দাঁড়ানোর মতই সুন্দরী। এরপর যমজ যে নাতিজোড়া এল তারাও দেবশিশুর মতো। ত্রিদিবনারায়ণের সুখের ঘরে রূপের আনন্দের হাট তখন।

স্ত্রী সুমতির মৃত্যুতে বাড়িতে প্রথম শোক ঢুকল। ক্যানসারে মাস চারেক ভোগার পর সুমতি চলে গেল। স্ত্রীর মৃত্যু ত্রিদিবনারায়ণ শান্তভাবে মেনে নিয়েছিলেন, একে কোনো অঘটন বা অস্বাভাবিক বলে ভাবেন নি। মাঝবয়সে ক্যানসারে ভুগে মৃত্যু তো ঘরে ঘরে ঘটছে। সুমতির চলে যাওয়া তাঁকে ব্যথা দিয়েছিল কিন্তু সেরকম ধাক্কা দিতে পারেনি। এই সঙ্গিনীটি তাঁর জীবনে বরাবরই বড় প্রচ্ছন্ন ছিল। সে জায়গা তো পুরোপুরি দখল করে নিয়েছিল ছেলে।

মা চলে যাবার পর দেবনারায়ণ বাবাকে প্রায় বুকে আগলে রাখত। বউয়েরও তাঁর সব ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজর। আর নাতি দুটো তো বুকের দুখানা পাঁজর হয়ে উঠেছিল। এরপর ছেলের তৃতীয় সন্তান আসাতে সুমতির মৃত্যুর ফাঁক অনেকটাই বুজে গেল। প্রায় পুরোটাই ঠাকুমার রূপের আদল নিয়ে এবার টুকটুকে নাতনী হয়েছে।

ত্রিদিবনারায়ণের এই ভরভরতি সংসারে বড় আচমকা বিয়োগ অঙ্কের পালা নামল।

## তেরো

দেবনারায়ণের বরাবর একটাই নেশা, বেড়ানোর নেশা। ফাঁক পেলেই সবাইকে নিয়ে দুদিনের জন্যে হলেও হুড়মুড় করে কতবার বেরিয়ে পড়েছে। বেড়ানোর সুবিধের জন্যেই বড় বিদেশী জিপটা কিনেছিল। ট্রেনে কমই চড়ত, ওই জিপেই লম্বা পাড়ি দিতে তার বেশী আনন্দ। ত্রিদিবনারায়ণও জিপে করে ছেলের সঙ্গে প্রায় সর্বত্র ঘুরেছেন, কিন্তু সেবার গেলেন না। তাঁর নিয়তিই তাঁকে আটকাল। রাজগীর যাবার পথে বিহারের জঙ্গলে জিপের মধ্যেই ছেলেবউ সবসুদ্ধ দেবনারায়ণ খুন হলো। নৃশংস খুন, সবাইকে কুপিয়ে মারা হয়েছে, শুধু অদ্ভুতভাবে বেঁচে গিয়েছিল কয়েক মাসের ছোট্ট মেয়েটা, কাছেই একটা ঘন ঝোপের ভেতর পড়েছিল।

জীবনের সিংহভাগ শান্তিতে কাটিয়ে পড়ন্ত বেলায় এই অকল্পনীয় আঘাতের জন্যে একেবারেই তৈরী ছিলেন না ত্রিদিবনারায়ণ। শোকে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। নানা জনে নানা রকম বলেছিল। কেউ বলেছে নিছক ডাকাতি, লুট করে সরে পড়ার আগে সাক্ষী-প্রমাণ লোপাট করার জন্যেই ও ভাবে সবসুদ্ধ মেরে রেখে গেছে। মেয়েটাকেও নিশ্চয়ই আছড়ে মারার জন্যেই ছুঁড়ে দিয়েছিল। কারুর বক্তব্য, ডাকাতি-লুট সবটাই সাজানো, আসল উদ্দেশ্য খুন। কারণ দেবনারায়ণ নাকি তার চাকরির

সবচেয়ে ওপরমহলের অনেক বিপজ্জনক তথ্য জেনে গেছিল, চেষ্টা করেও তাকে বাগে আনা যাচ্ছিল না। তাই সুযোগ বুঝে জঙ্গলের পথে সবসুদ্ধু শেষ করে দিয়েছে। মেয়েটা একেবারে শিশু বলেই হয়ত হাতে করে মারেনি। আবার কারুর ধারণা নিজেদের মৃত্যু নিশ্চিত জেনে বাচ্চাটারই বাবা কিংবা মা তাকে ঝোপের ওপর ছুঁড়ে দিয়েছিল, যদি কোনোরকমে বেঁচে যায়!

ত্রিদিবনারায়ণের কানে কিচ্ছু ঢোকেনি। যে সর্বনাশ ঘটে গেল তার কারণ জানার বা বিশ্লেষণ করার অবস্থা তাঁর ছিল না। পাথর হয়ে ছেলে, ছেলের বউ, আর নাতিদুটোর সৎকার করেছেন। সে কাজ করতে গিয়ে যন্ত্রণায় বুকের ভেতরটা দুমড়ে গুঁড়িয়ে গেছে কিন্তু বাইরেটা অনুভূতিহীন সচল যন্ত্র একখানা। নাতনীকে বুকে তুলে ঘরে ফিরেছিলেন ত্রিদিবনারায়ণ। কোথা দিয়ে কেমন ভাবে কটা দিন কেটেছিল জানেন না। শ্রাদ্ধের দিন আসনে চুপচাপ এসে বসলেন। তিনি ছাড়া এ কাজ করার কেউ নেই।

পুরুতঠাকুর মন্ত্র পড়াচ্ছিল। কিন্তু তিনি কিছুই শুনছিলেন না, কোন মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন না, শুধু মূর্তির মতো চুপ করে বসেছিলেন।...হঠাৎই যেন এক ঝলক গলানো সীসে কেউ কানে ঢেলে দিল। কি বলছে পুরুত? মন্ত্রের মধ্য দিয়ে কি বলছে? ত্রিদিবনারায়ণ সংস্কৃত খুব ভালই জানেন। প্রতিটি শব্দ তাঁর মগজের কোষে কোষে বিদ্যুৎ ছড়াতে লাগল। পুরোহিত মন্ত্রে কোন্ দিনের কথা বলছে? কোন্ দিন? কোন্ দিন তাঁর এতবড় সর্বনাশ ঘটল? কোন্ দিন তাঁর ছেলে-বউ-নাতি সব চলে গেল? সেই অমাবস্যা পঞ্চমী তিথি? সেই কালান্তক কৃষ্ণা-পঞ্চমী?

ত্রিদিবনারায়ণের মাথার মধ্যে সব কেমন ওলোট-পালোট হয়ে যেতে লাগল। একটা কথাই শুধু বারবার ধাক্কা মারছে—অমাবস্যা, পঞ্চমী তিথি, কৃষ্ণা-পঞ্চমী, অমাবস্যা। সমস্ত শরীর ভারি হয়ে আসতে লাগল ত্রিদিবনারায়ণের। কি অদ্ভুত যোগ! এ কি নিছক কাকতালীয় যোগাযোগ, না বংশানুক্রমে ঘটে আসা অমোঘ নিয়তি?...প্রাণপণে নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করলেন। এবার শ্রাদ্ধের প্রতিটি মন্ত্র উচ্চারণ করে উত্তরপুরুষের শ্রেষ্ঠ গতির জন্যে প্রার্থনা করলেন। তারপর টলতে টলতে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন।

এর পর থেকে প্রতিটি দিনের প্রত্যেকটা মুহূর্ত ভেতরে ভেতরে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিলেন তিনি। শুধু একটাই জিজ্ঞাসা, সেই একই তিথিতে বংশ বংশ ধরে মৃত্যুর অভিশাপ? আজকের দিনেও এ জিনিস ঘটে? তাই যদি হয় তো তাঁর কি করণীয়? দিনের পর দিন মাথা খুঁড়েও এ প্রশ্নের কোনো জবাব পান নি। এর ওপর শোকের দুঃসহ বোঝা তাঁকে প্রায় অথর্ব করে দিয়েছে। দেহ নয়, পঙ্গু হয়ে পড়েছে তাঁর মন। নিঃসীম শূন্যতার যাতনায় দম বন্ধ হয়ে আসে। এর থেকে বোধহয় একেবারে পাগল হয়ে যাওয়া ভাল ছিল। নাতনীকে বুকে নিয়ে সারা বাড়ি প্রেতের মতো ঘুরে বেড়ান। নৈঃশব্দের হাহাকার তাঁকে তাড়া করে ফেরে। একটু শান্তির জন্যে বারবার ঠাকুরঘরে গেছেন, কিন্তু শান্তি মেলেনি। ছেলে-বউয়ের শখ-আহ্লাদ আর নাতিদুটোর দুরন্তপনার ছোঁয়া বাড়িটার সর্বত্র লেগে আছে, শুধু তারাই নেই। আর টিকতে না পেরে শেষপর্যন্ত বাড়ি

বিক্রি করাই স্থির করলেন। নাতনীকে নিয়ে আর কোথাও গিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। পণ্ডিতের বিধান নিয়ে পঞ্চমুখী-শঙ্খ আর ঘট গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া ঠিক হলো।

বুক-জলে দাঁড়িয়ে শাঁখ আর ঘট হাতে ত্রিদিবনারায়ণ আরো গভীরে এগুচ্ছিলেন। হঠাৎ বিস্ময়ে স্তম্ভিত তিনি। শঙ্খ নেই, ঘট নেই, তাঁর দুহাতে ধরা শুভ্রবসনা মা! ঠিক ছেলেবেলায় যেমনটি ছিল তেমনি শ্বেতপাথরের প্রতিমার মতো রূপ! মায়ের চোখের জলে ত্রিদিবনারায়ণের মুখ বুক ভিজে যাচ্ছে, মায়ের নিবিড় কালো চোখের তারায় আর্ত আকূতি, বাঁচার আকূতি, আকুল আকূতি নিয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

সবে ভোর হয়েছে, ত্রিদিবনারায়ণ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে উঠে বসলেন, দু-হাতে তখনো বুকের কাছে যেন কিছু আগলে আছেন। না, তিনি কোথাও যাননি, নিজের ঘরে নিজের বিছানাতেই আছেন। স্বপ্ন দেখেছেন। তখনো কানে স্পষ্ট বাজছে কবেকার বিস্মৃতির অতল থেকে উঠে আসা সেই অতি পরিচিত মিষ্টি স্বর---নিশ্চয় জেনো তিনি আসবেন। চরম মার মেরে তিনি আসবেন, পুড়িয়ে পুড়িয়ে সোনা করে তিনি আসবেন, বিশ্বাস আর সমর্পণের সেতুপথে তিনি আসবেন, খাঁটি বিশ্বাস আর নিঃশর্ত সমর্পণের কঠিন পরীক্ষায় পার হলে তবেই তিনি আসবেন—নয়তো তাঁরও মুক্তি নেই।

মায়ের নয়, নিজের চোখের জলেই ত্রিদিবনারায়ণের মুখ-বুক ভাসছে, জাগার পরেও ভাসছে, শোকের বিরাট পাথরটা গলে গলে দুচোখ বেয়ে নামছে তো নামছেই। বহু দিন পরে কাঁদছেন ত্রিদিবনারায়ণ, বড় শান্তিতে কাঁদছেন।

তারপর থেকে প্রতিদিন একটু একটু করে ওই বিশ্বাস আর সমর্পণের কাছে বাঁধা পড়েছেন। নিজের ভেতরে ক্রমশ এক আশ্চর্য জোর অনুভব করেছেন, বিশ্বাসের সমর্পণের জোর। অদ্ভুত শান্তিও পেয়েছেন, বিশ্বাসের আর সমর্পণের শান্তি। একফোঁটা নাতনীকে নিয়ে জীবনের অপরাহ্ন বেলায় আবার নতুন সংসার। কিন্তু আর কোনো খেদ নেই, কোনো অভিযোগ নেই, শুধু যেন কাউকে তার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিতেই বংশ বংশ ধরে সব খোয়ানোর দিনটিতেই তাকে ডাকেন। ডেকে ডেকে নিজেকেই ভরাট করেন।

## চোদ্দ

সত্তা নিংড়ানো সেই ডাকই আমি দেখেছিলাম। শুনেছিলাম। তারপর ত্রিদিবনারায়ণের সঙ্গে এক আশ্চর্য জগতে চলে গিয়েছিলাম। অভিভূত হয়ে শুনেছি, কিন্তু ওই পর্যন্তই। বিশ শতকের শেষে দাঁড়িয়ে অত যুগ আগের সব কথা মেনে নেওয়া বেশ কঠিন। শাঁখ নিজে থেকে শূন্যে পাক খেয়ে আবার হাতে ফিরে আসে, নিজে নিজে কাত হয়ে তার থেকে পঞ্চধারায় জল পড়ে—এ আমার বুদ্ধির অগম্য। এমন কি ত্রিদিবনারায়ণের মায়ের স্মৃতিতেও ওই ঘটনা ছিল না। সবটাই তিনি তাঁর মায়ের মুখে শুনেছিলেন। রতন পাড়ুইয়ের হাতেও কোনোদিন তিনি নিজের চোখে শঙ্খ ঘুরতে দেখেননি বা রতন নিজেও জানত না সত্যিই কখনো তার হাতে শঙ্খ নড়েছিল কি না। ত্রিদিবনারায়ণের দিদিমা সুচারু বিচিত্র আর তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু ছোট্টবেলা থেকেই ঠাকুর নিয়ে বিভোর হয়ে থাকতেন তিনি। সেই ভাবের ঘোরে কি দেখতে কি

দেখেছেন, বা যা দেখতে চাইতেন তা-ই সত্যি দেখছেন বলে নিজেও ভাবতেন কিনা কে জানে! রতন পাড়ুইয়ের ব্যাপারেও ওই একই কথা। সে অদ্ভুত মানুষ, তারও সবটাই অন্ধ আনুগত্য আর ভক্তির ফসল।

আর আয়ুর জোরে সেকালের টাইফয়েড থেকেও সুস্থ হয়ে ওঠা দু'চারজনকে আমি নিজেই জানি। সংখ্যায় খুবই কম অবশ্য, তবু ব্যতিক্রম কিছু আছে। ত্রিদিবনারায়ণও সেই ব্যতিক্রমের দলে। তাছাড়া একই তিথিতে বহু দিন পর পর দুর্ঘটনা ঘটাও কো-ইনসিডেন্স ছাড়া কিছু নয়। তিথি তো ভিন্ন সময়ে পড়ে। একই দিন তারিখ বা নিদেনপক্ষে মাস হলেও অবাক হতাম। আসলে বহুদিনের পুরানো নামী বংশের কোনো ঘটনা রটনার মিশেলে, অন্ধ-বিশ্বাসে, আর ভয়ে-ভক্তিতে কিংবদন্তী হয়ে ওঠে। এ-ও হয়তো তারই নজির। এর মধ্যে অলৌকিক কিছু পাইনি। বলার মতোই বলতে পারেন ত্রিদিবনারায়ণ, সেই গুণেই মুগ্ধ হয়ে শুনেছি। কিন্তু সব শুনে অবাক হয়েছিলাম অন্য কারণে। ত্রিদিবনারায়ণের মা বা তারও মায়ের কথা আলাদা, কিন্তু অসাধারণ মেধাবী এই মানুষটা এত বড় আঘাত সয়ে কি করে কেবল এক অজানা বিশ্বাস আর সমর্পণের ওপর ভিত্তি করে এমন প্রশান্তিতে জীবনটা কাটাচ্ছেন? সত্যিই কি তিনি বিশ্বাস করেন তাঁর বংশে এমন কেউ আসবে যার ছোঁয়ায় ওই শাঁখ নিজে নিজে ঘুরবে আর জল পড়বে? তাঁকে জিগেস করতে হেসে বলেছিলেন, 'যুগ অনুযায়ী সব কিছুরই রীতি পালটায়, ধরন বদলায়। কিন্তু যা শাশ্বত তা শাশ্বতই। তাই এ যুগের নিয়ম ধরে সেভাবেই কেউ আসবে আর সেভাবেই শঙ্খও নড়বে জলও পড়বে।'

বড় সহজ আর সুন্দর করে বলেছিলেন। শাশ্বত বিশ্বাসের মহিমায় বৃদ্ধের মুখখানা জ্বলজ্বল করছিল। আজকের দিনে এই বিশ্বাস আর সমর্পণের জোরটুকুই বড় লোভনীয়, এর শান্তিটুকুই বড় দুর্লভ।

## পনেরো

এবার ত্রিদিবনারায়ণ রায়ের উত্তরজীবন। তাঁর এই জীবনের সঙ্গেই আমার সরাসরি যোগ। এই সময়েই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়, হৃদ্যতা তারপর ঘনিষ্ঠতা। তাঁর উত্তরজীবন জুড়ে কেবল 'উত্তরাপর্ব'। বংশের শেষ সলতে তাঁর ঐ নাতনীর নাম রেখেছিলেন উত্তরা। এই নামকরণ কেন, তাও আমাকে কথায় কথায় একদিন বলেছিলেন।...মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডবদের সমস্ত উত্তরসূরী বিনষ্ট হলে বংশ রক্ষার একমাত্র ভরসা ছিল অর্জুন-পুত্র অভিমন্যুর স্ত্রী উত্তরা। কারণ তারই গর্ভে ছিল পাণ্ডববংশের শেষ অঙ্কুর। কিন্তু দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র সেই গর্ভস্থ ভ্রূণকেও নষ্ট করে গেল। বংশলোপের আশঙ্কায় আকুল পঞ্চপাণ্ডব শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিলে তাঁর কৃপায় মৃত ভ্রূণ প্রাণ পেয়ে নড়ে উঠল। উত্তরার সেই সন্তান পরীক্ষিৎ, পাণ্ডববংশের ধারক।...ত্রিদিবনারায়ণ রায়ের স্থির বিশ্বাস যতবড় অঘটনই ঘটুক না কেন, শেষ পর্যন্ত মহাভারতের উত্তরার মতো তাঁর এই উত্তরার মধ্য দিয়েই তাঁরও বংশের ধারাপথ নিশ্চিত হবে।

আমার ভেতরটা কেমন খচখচিয়ে উঠেছিল। মানি আর নাই মানি, তাঁদের

বংশানুক্রমিক দুর্ঘটনার জের-এর সঙ্গে এই ফুটফুটে মেয়েটাকে জড়ানো আমার খুব খারাপ লেগেছিল। সে কথা ত্রিদিবনারায়ণকে বলতে তিনি দূরমনস্কের মতো বলেছিলেন, 'আমিও কি জড়াতে চাই? মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে চেষ্টা করি আমার ওপর দিয়েই সব কেটে গেল। কিন্তু কি জানি। শুনেছি চরম মারের পর রক্ত ধারায় যখন তাঁরই পা ভিজবে, বিশ্বাস আর সমর্পণের সেই রক্তরাঙা পথে তাঁর রাতুল চরণ পড়বে। এখন উত্তরা ছাড়া আমার জীবনে চরম মার আর কি ভাবে আসতে পারে?'

মনটা বিষাদে ছেয়ে গিয়েছিল। কবে থেকে মেয়েটাকে জানি। সুন্দর সপ্রতিভ স্মার্ট মেয়ে। নামকরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকে ভাল রেজাল্ট করে মেয়েদের সব থেকে নামী কলেজে পড়ছে তখন। ত্রিদিবনারায়ণের নিজস্ব বিচরণের জগতে সে একেবারে বেমানান। তার ওপর ছোট থেকেই বেশ জেদী আর ব্যক্তিত্বময়ী। কলেজে পড়তেই নিজের অমত জানিয়ে দাদুর পছন্দের পাত্রটিকে সরাসরি খারিজ করে দিয়েছিল। ওই ছেলেটিকে আমি চিনতাম, মাঝেমাঝেই ত্রিদিবনারায়ণের কাছে আসতে দেখেছি। লম্বা দোহারা গড়ন, অন্তত দু ইঞ্চি পুরু ঘন একমাথা চুল ব্যাকব্রাশ করা। তীক্ষ্ণ নাক, একটু ছোটর ওপর ভাবি স্বচ্ছ দুটো চোখ, ঈষৎ পুরু ঠোঁট, দৃঢ় চোয়াল, গায়ের রং কালো। আর কালো রঙেই ছেলেটার যেন আসল আকর্ষণ, ফরসা হলেই বরং বেমানান লাগত। ছেলেটার সমস্ত চেহারায় একটা অদ্ভুত পুরুষালি রূপ। নাম সঞ্জীব গাঙ্গুলী, এক সময়ে তার বাবা ত্রিদিবনারায়ণের ছাত্র ছিল, পরে সে নিজেও। ছেলেটির দিকে ত্রিদিবনারায়ণ রায়ের নজর ছিল। তিনি অনুভব করতেন এ ছেলে তাঁদের, বিশেষ করে উত্তরার জীবনে আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। কিন্তু উত্তরা সে কথা মানতে পারে নি। দাদুর প্রস্তাব সে সরাসরি নাকচ করে দিয়েছিল। কিন্তু সঞ্জীব গাঙ্গুলীর সঙ্গে ত্রিদিবনারায়ণের সম্পর্ক কোনো দিন নষ্ট হয় নি। দু'জনেই দুজনকে বড় ভালবাসত। এদের যোগাযোগও বড় অদ্ভুতভাবে।

রিটায়ার করার বেশ কিছুকাল পর আবার এক নামী বেসরকারী কলেজে প্রিন্সিপাল হিসাবে ত্রিদিবনারায়ণকে প্রায় জোর করেই ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সঞ্জীব গাঙ্গুলীর সঙ্গে ছাত্র হিসেবে সেখানেই পরিচয়। পরিচয়ের পটভূমিও বিচিত্র। নিজে ক্লাস তখন কমই নেন, কিন্তু সেদিন নিচ্ছিলেন। ঘুরে ঘুরে রাউণ্ড দেবার সময় একটা ক্লাসরুম থেকে হৈ চৈ আওয়াজ শুনে ঢুকেছিলেন। প্রফেসর আসেননি শুনে কি বিষয়ের ক্লাস জেনে নিয়ে নিজেই পড়ানো শুরু করেছিলেন। তাঁরই বিষয়, ফিলসফি, কিন্তু পাস কোর্সের ক্লাস। ফলে ক্লাসরুম ঠাসা। কারণ, পাস কোর্সে যাদের ফিলসফি আছে তারা, আবার প্রতিটি অনার্স কোর্সের ছাত্র যারা পাসে ফিলসফি নিয়েছে সবাই মিলে এক সঙ্গে বসে। এসব ক্লাসে এমনিতেই গোলমাল হয়, কিন্তু ত্রিদিবনারায়ণের কথা আলাদা। তাঁর সহজ ব্যক্তিত্বের মাধুর্যই অন্যরকম। কখনো মাস্টারির ছড়ি উঁচোন না, ছাত্রদের সঙ্গে খোলাখুলি মেশেন, অপূর্ব পড়ান, যখন পড়ান তখন কোনোদিকে জ্ঞান থাকে না আর যারা শোনে তাদেরও অন্য কোনোদিকে মন থাকে না। চুম্বকের মতো প্রতিটি ছাত্রকে টেনে রাখতে পারেন। ছাত্রদের কাছে সারা জীবন ধরে তিনি যা

সম্মান আর শ্রদ্ধা পেয়েছেন, তা যে কোনো শিক্ষকের কামনার ধন। বরাবর এমনটাতেই অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু সেদিন প্রথম ব্যতিক্রম ঘটল।

পড়াচ্ছিলেন ত্রিদিবনারায়ণ কিন্তু সে পড়ানোর সুর বারবার নষ্ট হচ্ছিল, বারবার ছেদ পড়ছিল, একেবারে শেষের সারি থেকে ক্রমাগত গুনগুন আওয়াজে সবার মনোযোগ নষ্ট হচ্ছিল। ত্রিদিবনারায়ণ কখনো গলা তোলেন না, সেদিনও তুললেন না। পড়ানো থামিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'লাস্ট বেঞ্চ, গেট আউট-প্লিজ—'

সমস্ত ক্লাস নিস্তব্ধ। শেষের বেঞ্চ থেকে ঢ্যাঙা ময়লা একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে সঙ্গীদের কী বলতে তারা উঠল, এক পাশে সরে গেল। এবার সেই ঢ্যাঙা ছেলেটা লাস্ট বেঞ্চটার এক মাথা ধরে হিড়হিড় করে বাইরে বার করে দিয়ে আবার ক্লাসে ঢুকে নিজের জায়গায় এসে দাঁড়াল। অর্থাৎ ত্রিদিবনারায়ণের আদেশ অনুযায়ী লাস্ট বেঞ্চটাকে বার করে দেওয়া হলো। নিরীহ মুখে এবার পরের হুকুমের অপেক্ষায় তাঁর দিকে চেয়ে রইল।

ক্লাসে টুঁ শব্দটি নেই। ত্রিদিবনারায়ণের এত বছরের অধ্যাপনার জীবনে এরকম ঘটনা এই প্রথম, তাও সদ্য সেকেন্ড ইয়ারে ওঠা ছেলের কাছ থেকে। চেষ্টা করেই নিজেকে সংযমে বাঁধলেন। ছাত্রদের ব্যাপারে তাঁর ধৈর্য বরাবরই অসীম। সেদিন যেন সেই ধৈর্যেরই পরীক্ষা তাঁর। দৌড় যাচাই করার মন নিয়েই কাছে ডাকলেন ছেলেটিকে, এই প্রথম নজর করে দেখলেন। সব ছাপিয়ে প্রথমেই ছেলেটার চোখদুটোয় নজর পড়ল। অদ্ভুত ঝকঝকে দুটো চোখ, যার দিকে তাকায় তার ভেতরে বিঁধে যায় যেন। কিন্তু তাতে ভয়ডর, অসভ্যতা, বা ঔদ্ধত্য, কোনোকিছুই নেই। যা করতে বলা হয়েছিল করেছে, ডাকা হয়েছিল এসেছে, পরের হুকুমের অপেক্ষা করছে। ত্রিদিবনারায়ণ সারা জীবন ধরে ছেলে চরিয়েছেন, কিন্তু এর বেলা কেন যেন মনে হলো এই ছেলে আর পাঁচটা ছেলের মতো নয়। জিগেস করলেন, 'কি নাম?'

বিনীত উত্তর, 'সঞ্জীব গাঙ্গুলী।'

—এতক্ষণ কি পড়াচ্ছিলাম বলতে পারবে?

ঘাড় কাত করে সায় দিয়ে টপিকের নাম বলল।

—বোঝাতে পারবে?

সেরকমই ভদ্র জবাব—চেষ্টা করতে পারি স্যার।

—দেন স্টার্ট।

একটুও ইতস্তত না করে তাঁর দিকে তেমনি ঝকঝকে চোখ তুলে বলতে শুরু করল। আস্তে আস্তে ত্রিদিবনারায়ণই অবাক হচ্ছিলেন। এতক্ষণ ধরে যা পড়িয়েছেন ছোটর ওপর চমৎকার ইংরেজিতে বলে গেল, এমনকি তাঁর দেওয়া শেষ উদাহরণটুকুও। তিনি লক্ষ্য করেছেন সারাক্ষণ এই ছেলে বিড়বিড় করে পাশের ছেলেদের কি সব বলছিল, তাহলে পড়ানো শুনল কখন? আর এত সুন্দর বাচনভঙ্গি!

বলা শেষ, জোরাল দুটো আলো তাঁর মুখের ওপর স্থির, ছেলেটা তাঁর দিকেই চেয়ে আছে।

ত্রিদিবনারায়ণ নড়েচড়ে বসলেন, 'ক্লাসে ডিসটার্ব করছিলে কেন?'

ভারি অবাক যেন সঞ্জীব গাঙ্গুলি, 'ডিস্টার্ব করিনি তো স্যার! একদিকে যেমন

আপনার পড়ানো শুনছিলাম আবার তেমনি নেক্সট অনার্স ক্লাসের টেস্টের পড়াটা ওদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম।'

ত্রিদিবনারায়ণ চেয়ে আছেন। অর্থাৎ কানের কাজ কান করছিল আর মুখের কাজ মুখ। এই অসম্ভব কাজই যে করছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছেন। তিনি যা পড়াচ্ছিলেন হুবহু বলে গেছে অথচ সারাক্ষণ গুনগুন করে সঙ্গীদের কি বলছিল।

জিগেস করলেন, 'কিসে অনার্স?'

যা আন্দাজ করেছিলেন তাই শুনলেন, 'ইংরিজি'—

'—নেক্সট ক্লাসে তোমাদের টেস্ট?'

এবার একটু অপরাধী মুখ,—'হ্যাঁ স্যার, ওরা ঠিক বুঝতে পারেনি, তাই একটু বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম।'

ত্রিদিবনারায়ণের ঠোঁটের কোণায় খুব সূক্ষ্ম হাসির আঁচড়, বললেন, 'পড়ানোর কাজটা তুমিই নিয়েছ জানলে আমিই অযথা ক্লাসে ঢুকে ডিসটার্ব করতাম না। বরং এ জায়গাটা তোমাকেই ছেড়ে দিতাম।' ইঙ্গিতে নিজের চেয়ারটা দেখালেন।

ক্লাসময় খুক খুক হাসি চাপার শব্দ। ত্রিদিবনারায়ণও হাসছেন মৃদু মৃদু। কিন্তু সঞ্জীব গাঙ্গুলী এতটুকু অপ্রতিভ হলো না। বরং সত্যি কথা শুনেও যেন মানী জনের মান রাখার জন্যেই সবিনয়ে বলল, 'এখনই কি তা হয় স্যার? যোগ্যতা অর্জন করে সময়মতো ও জায়গাটা একদিন ঠিক দখল করব।'

জবাব শুনে ছেলেরা যখন হতভম্ব, তখন সবাইকে আশ্বস্ত করে ত্রিদিবনারায়ণই হেসে উঠলেন। সঞ্জীব গাঙ্গুলীর কাঁধে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'ভেরি ওয়েল, উইশ ইউ এভরি সাকসেস দেন—'

এবার ছেলেটার ব্যবহারে অবাকই হয়েছিলেন তিনি। শুধু তিনি নন, অন্য ছেলেরাও। সঞ্জীব কোনো উত্তর না দিয়ে ক্লাসের মধ্যেই তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিল।

নিজের রুমে ফিরে ত্রিদিবনারায়ণ খোঁজ নিয়েছিলেন। স্ট্যান্ড করা বা স্কলারশিপ পাওয়া ছেলে তাঁর জীবনে নতুন কিছু না। বরাবর এক নম্বর কলেজে পড়িয়েছেন, এখনো সেরা কলেজগুলোর একটাতেই পড়াচ্ছেন। লেখাপড়ায় ভাল ছেলে এ যাবৎ অনেক দেখেছেন। তিনি অবাক হয়েছিলেন অন্য কারণে। এ ছেলের যে রেজাল্ট আশা করেছিলেন তা তো নয়ই, বরং একেবারে টায়েটোয়ে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়ে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেছে। তাও সায়েন্সে। সেই নম্বরে তাঁর কলেজে ভর্তি হতে পারার কথা নয়। ছেলেটার সম্পর্কে ভাল করে খোঁজ-খবর নেবার জন্যে ভর্তির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকদের ডাকিয়ে আনালেন। তাঁরাই মনে করিয়ে দিলেন, দু বছর আগে তাঁরই একটি প্রাক্তন ছাত্র তার ছেলের রেজাল্ট নিয়ে তাঁর কাছে আবেদন জানাতে এসেছিল। এবার মনে পড়ল ত্রিদিবনারায়ণের নিজের পরিচয় দিয়ে প্রণাম করে সেই পুরনো ছাত্র সমরেন্দ্র গাঙ্গুলী বলেছিল, পারিবারিক দুর্ঘটনায় ছেলের রেজাল্ট খুবই খারাপ হয়েছে, নয়তো এরকম হবার কথা নয়, শুধু তাকে এ কলেজের অ্যাডমিশন টেস্টে একবার বসার সুযোগ যদি দেন ত্রিদিবনারায়ণ...।

ত্রিদিবনারায়ণ সমরেন্দ্র গাঙ্গুলীকে চিনতে পেরেছিলেন। অধ্যাপনার একেবারে

গোড়ার দিকে যে কটি মনে রাখার মতো ছাত্র পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে সমরেন্দ্র গাঙ্গুলী একজন। কিন্তু সেই স্নেহভাজন ছাত্রটিকে বিমুখ করতে হয়েছিল। তাঁর কলেজে অ্যাডমিশন টেস্টে বসার যে ন্যূনতম নম্বর বেঁধে দিয়েছিলেন, সমরেন্দ্র গাঙ্গুলীর ছেলে তা পায়নি। তাঁর অক্ষমতার কথা তিনি জানিয়েছিলেন। কিন্তু সে কথা বলার পরেও সেই দিনই সন্ধ্যায় সে সোজাসুজি তাঁর বাড়ি এসে হাজির। তিনি বিরক্ত হয়েছেন বুঝে হাত জোড় করে কয়েকটা কথা শুধু তাঁকে দয়া করে শুনতে অনুরোধ করে ছিল। তার বলার মধ্যে এমন একটা অসহায়তা ছিল যা ত্রিদিবনারায়ণের ভেতর ছুঁয়ে গিয়েছিল। তিনি ধৈর্য নিয়েই শুনেছেন।

সমরেন্দ্র গাঙ্গুলীর ছেলে সঞ্জীব নামী স্কুলের বরাবর এক নম্বর ছাত্র ছিল। হায়ার সেকেন্ডারীর ঠিক আগের বছর থেকে সে একেবারে বিগড়ে গেল, পড়া যার প্রাণ ছিল সে বই-পত্র ছোঁওয়া বন্ধ করল। মা মারা যাবার পর থেকেই গোঁ চাপল মা যা চাইত বা আশা করত তার ঠিক উল্টোটা করবে। এই মা তার নিজের মা নয়, কিন্তু নিজের মা-ছেলেরও বোধহয় এত টান থাকে না। সেই মা সমরেন্দ্র গাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, সঞ্জীবের পরীক্ষার আগের বছর আত্মহত্যা করে বসল। তার নিজের একমাত্র ছেলে অর্থাৎ সঞ্জীবের বৈমাত্রেয়-ভাইয়ের জলে ডুবে মৃত্যুর কদিন পরেই ছাদ থেকে লাফ দিল। ভাইকে যথেষ্ট ভালবাসত সঞ্জীব, তার মৃত্যুতে ভেঙেও পড়েছিল, কিন্তু মায়ের এই মৃত্যুতে সে যেন ভেতরে ভেতরে ক্ষেপে গেল। ও নিজের ছেলে হলে মা কি এ ভাবে চলে যেতে পারত? ওকেই কি বুকে আঁকড়ে শোক ভোলার চেষ্টা করত না? একমাত্র ভাই এভাবে চলে যেতে ওরও কি বুকটা গুঁড়িয়ে যায় নি? ওই মায়ের বুকেই তো তখন মুখ গুঁজেছিল আর তাকে জড়িয়ে ধরে বারবার শুধু একটা কথাই বলেছিল, 'আমি আছি, মা, আমি আছি। কিন্তু মা শুনল না।'

তখন থেকেই এক অদ্ভুত মানসিক ক্ষোভের শিকার সঞ্জীব। তার বদ্ধ ধারণা হয়েছিল মা ওকে চিরকাল ফাঁকি দিয়েছে, কোনোদিনও সত্যিকারের ছেলে বলে ভাবে নি। ভালবাসত শুধু নিজের ছেলেকে, যে ছেলে যাবার পরে ওর কথা একবারও ভাবল না। নিজেও ইচ্ছে করে অমনভাবে চলে গেল। যেতে পারল। ওই মা তার সঙ্গে এতকাল ভালবাসার ভান করেছে কেবল। সে তার সব থেকে বড় শত্রু। এক অন্ধ আক্রোশে আর যন্ত্রণায় ওই শত্রু (মা) যা চাইত, তার ঠিক উল্টো পথে চলতে লাগল সঞ্জীব। সে চাইত সঞ্জীব দারুণ রেজাল্ট করবে, তাই স্কুলে যাওয়াই বন্ধ করে দিল আর পড়াশুনো তো একেবারে বাদ। স্ত্রী আর ছোট ছেলের অমন মৃত্যুর শোক ভুলে এই ছেলের চিন্তায় সমরেন্দ্র গাঙ্গুলীর তখন পাগল হবার অবস্থা। শেষ পর্যন্ত সাইকিয়াট্রিস্টের পরামর্শ নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে সব বলে তাদের সহযোগিতা চাইল। তার ছোট ছেলেও ওই স্কুলেই পড়ত, তার দুর্ভাগ্যের কথা সবাই জানত, আর সঞ্জীবের মতো ছাত্রের ওপর স্কুলের বিরাট আশাও ছিল।

সহযোগিতা মিলল, স্কুলে না গিয়েও মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়ে টেস্ট পরীক্ষায় বসতে পারল সঞ্জীব। একেবারে কিচ্ছু না পড়েও হাই ফার্স্ট ডিভিশন পেল টেস্টে। সেই রাগে ফাইনাল পরীক্ষায় কোনো পেপারই শেষ করল না। ফেল করার গোঁ নিয়ে

আধ-খ্যাঁচড়া লিখে যখন ইচ্ছে বেরিয়ে আসত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফাইনালে টায়েটোয়ে ফার্স্ট ডিভিশন। ক্ষেপে গিয়ে এবার বাবাকে সোজা বলে দিল, আর পড়বেই না, এখানেই পড়া শেষ। ডাক্তারের পরামর্শ মতো এবার তার আঁতে ঘা দিল সমরেন্দ্র, বলল, 'তোর পড়া এমনিতেই আর হবে না, সায়েন্সে এই নম্বরে কোথাও চান্স পাবি না।'

এ কথায় ম্যাজিকের মতো কাজ হল। সঞ্জীব নিজে থেকেই জয়েন্ট এনট্রান্স-এ বসার জন্যে তৈরি হল। রেজাল্ট?—ডাক্তারি এঞ্জিনিয়ারিং দুটোতেই একেবারে প্রথম পনের জনের মধ্যে। কিন্তু কোনোটাতেই ভর্তি হলো না। বাবা চ্যালেঞ্জ করেছিল কোথাও চান্স পাবে না, তাই দেখিয়ে দিল চান্স পায় কি না। দেখানো হয়ে গেছে, ব্যস।

এবারে ছেলের দুটো হাত ধরে চোখের জল ফেলেছিল সমরেন্দ্র। ছেলে তাই দেখে কটা দিন চুপ মেরে ছিল। তারপর হঠাৎ নিজে থেকেই এসে বলেছে, পড়তে রাজী আছে, কিন্তু ডাক্তারি এঞ্জিনিয়ারিং কোনোটাই নয়, কারণ ওই দুটোর ওপরেই তার শত্রু ওই মায়ের লোভ ছিল। সে আর্টস পড়বে, ইংরেজি, আর অমুক তিনটে কলেজের থেকে বাবা যেন ফর্ম নিয়ে আসে। আশায় বুক বেঁধে সমরেন্দ্র গাঙ্গুলী ছেলের কথামতো সেই তিনটি কলেজে গেছিল, আর গিয়েই বুঝেছে ছেলে কেন এই তিনটেরই নাম করেছিল। তার নম্বরে এর কোনোটাতেই ফর্ম পাবে না। তবু সমরেন্দ্র গাঙ্গুলী আশা ছাড়েনি। অন্য দুটো কলেজের প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করে বোঝানোর চেষ্টা করেছে, শুধু অ্যাডমিশন টেস্টে বসতে দেবার জন্যে একটা চান্স ভিক্ষে চেয়েছে, তাঁরা এক কথায় তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত ত্রিদিবনারায়ণকে ওই তিনটি কলেজের একটির প্রিন্সিপাল জেনে বড় আশা নিয়ে তাঁর কাছে ছুটে গেছিল, তিনি ফিরিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও আবারও এসেছে, কারণ ছাত্রদের জন্য স্যারের দরদের কথা তার মনে আছে।

ছেলের স্কুলের প্রতি বছরের আর জয়েন্ট এন্ট্রান্সের সমস্ত রেজাল্ট নিয়ে সমরেন্দ্র গাঙ্গুলীকে কলেজে আসতে বলেছিলেন ত্রিদিবনারায়ণ। সেগুলো ভর্তির দায়িত্বে থাকা প্রফেসরদের দেখিয়ে কিছু কথা বলেছিলেন, তারপর এই প্রথম নিজের নিয়ম নিজে ভেঙেছিলেন।

সঞ্জীব গাঙ্গুলী ফর্ম পেয়েছিল, অ্যাডমিশন টেস্টে বসেছিল, আর রেকর্ড নম্বর পেয়ে ফার্স্ট হয়েছিল। ছেলে ভর্তি হবার পর কৃতজ্ঞ সমরেন্দ্র গাঙ্গুলী বাড়ি এসে তাঁর পায়ে হাত রেখে প্রণাম করে গেছে, কিন্তু সঞ্জীব গাঙ্গুলী আসেনি। ত্রিদিবনারায়ণ তাকে আশা করেছিলেন, জিগেসও করেছিলেন। সমরেন্দ্র অপ্রতিভ মুখে বলেছিল, 'ওকে দিয়ে জোর করে কিছু করানো যায় না স্যার, সেই থেকে কিরকম হয়ে গেছে!'

ত্রিদিবনারায়ণ আর কিছু বলেননি আর সেই ছেলেও নিজে থেকে এত দিনের মধ্যে একটিবারের জন্যেও এগিয়ে আসেনি। ত্রিদিবনারায়ণ এই দুবছরে সেকথা ভুলেই গেছিলেন। সেদিনের ওই ক্লাসে তার সঙ্গে সেই প্রথম দেখা। তখনো নাম শুনেও কিছু মনে পড়েনি, সেদিনের ঘটনায় আকৃষ্ট হয়ে নিজেই সব খোঁজ নিয়ে বার করেছেন।

তারপর থেকে ওই অদ্ভুত ছেলেরও তাঁর ওপর কেমন টান পড়ল। কলেজে দূরত্ব রেখে চলে কিন্তু ফাঁক পেলেই বাড়ি চলে আসত। তাঁর লাইব্রেরী ঘরটাও ওই ছেলের

মস্ত লোভের জিনিস। আস্তে আস্তে তিনিও সঞ্জীব গাঙ্গুলীর জন্য এক অদ্ভুত টান অনুভব করেছেন। মেধাবী ছাত্র অনেক দেখেছেন, ঠিকমতো পড়াশুনো করলে যে কোনো বিষয় নিয়েই এই ছেলেও অনায়াসে সব থেকে ভাল ফল করে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু তার প্রতি ত্রিদিবনারায়ণের টান সে জন্যে নয়, এ ছেলে যেন আশ্চর্য একটা জোরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, ভারি সহজ সে জোর। যা মনে হয় সোজা বলে দেয়, সরাসরি যে কোনো কথা জিগেস করে বসে, অন্যদের বেলা যেটা অশোভন মনে হতো তার বেলায় সেটাই স্বাভাবিক।

উত্তরার ব্যাপারে তার আকর্ষণ একেবারে সরাসরি ত্রিদিবনারায়ণের কাছেই ব্যক্ত করেছিল সঞ্জীব। এ বাড়িতে সে যখন প্রথম আসে উত্তরা তখন স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্রী। এত সুন্দর হয়ে উঠেছিল যে চোখ ফেরানো যায় না। ফেরাতে চাইতও না কেউ। ছেলেছোকরা ছেড়ে বড়দেরও আড়চোখের চাউনি ত্রিদিবনারায়ণ লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু সঞ্জীব একেবারে সোজা চেয়ে থাকত। দেখার জিনিস, তাই দেখছে। নাতনী বিরক্ত হতো। কারুর এমন সাহস দেখে অভ্যস্ত নয়, তা-ও দাদুর সামনে! নিজেও বিব্রত হতেন ত্রিদিবনারায়ণ কিন্তু এ নিয়েই যে ও ছেলে তাঁকে এমন বিপদে ফেলতে পারে ভাবেননি। হঠাৎই একদিন সঞ্জীব জিগেস করল, 'আচ্ছা স্যার, সুন্দর কিছু দেখলেই লোকের চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে কেন?' এরকম প্রশ্ন শুনে ত্রিদিবনারায়ণ অবাক একটু, বললেন, 'দেখতে ভাল লাগে বলে।'

সঞ্জীব সোজা তাঁর চোখে চোখ রেখে বলল, 'উত্তরা আজ শাড়ি পরেছিল, একটা পদ্মফুলের মতো দেখাচ্ছিল। আমি দাঁড়িয়ে গিয়ে দেখছিলাম। আমাকে অমন চেয়ে থাকতে দেখে খুব রেগে গেল। তখন কেন দেখছিলাম বলাতে আরো চটে গিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। আমি অন্যায়টা কি করেছি স্যার?'

ত্রিদিবনারায়ণ অপ্রস্তুত। অথচ আঁতিপাঁতি চোখ চালিয়েও কোনোরকম অভব্যতা বা চালাকির লেশমাত্র দেখতে পাননি। তুখোড় বুদ্ধিমান ছেলে, ভাল স্কলার, তখন থেকেই সঞ্জীবের ব্যাপারে ত্রিদিবনারায়ণ ভেতরে ভেতরে সজাগ ছিলেন। কোনোরকম চালাকি করে বা গায়ে পড়ে উত্তরার সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা কোনোদিন করেনি, প্রয়োজন না হলে কথাও বলে না। কিন্তু টানা পরপর ক'দিন তাকে একবার চোখের দেখাও না দেখতে পেলে যে সঞ্জীবের পড়াশুনো বা আলাপ-আলোচনার মনোযোগে ছেদ পড়ে, ত্রিদিবনারায়ণ সেটা খুব ভাল করেই বুঝতে পারতেন। উত্তরা কোনো দরকারে দাদুর ঘরে একবার এলে বা সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেও নিশ্চিন্ত।

বি-এ অনার্সে রেকর্ড মার্কস পেয়ে এম. এ. পড়তে ঢুকল সঞ্জীব, আর উত্তরা তখন হায়ার সেকেন্ডারি দিয়েছে। ত্রিদিবনারায়ণ নাতনীর আবদারে তাকে নিয়ে দীঘা বেড়াতে গিয়েছিলেন। সঞ্জীব তাঁদের বাসে তুলে দিতে গেছিল আর বারবার উত্তরাকে জলে না নামতে দেবার জন্যে তাঁকে বলেছিল। উত্তরা বিরক্ত হওয়াতে তিনি একফাঁকে বলেছিলেন, 'ছেলেটার জলের ব্যাপারে বড় আতঙ্ক, ওর ছোটভাইটাও জলে ডুবেই গিয়েছিল'—একথা শুনে উত্তরা বিরক্তি দেখানোর জন্যে অপ্রতিভ হয়েছিল, কিন্তু

ত্রিদিবনারায়ণ সঞ্জীবের চোখে অন্য উদ্বেগ দেখেছিলেন। অতি প্রিয় কারুর বিপদের কথা চিন্তা করলেও যে উদ্বেগ হয়, সেই অস্থির উদ্বেগ। কিন্তু তা বলে সেও যে তাঁকে কিছু না জানিয়েই দীঘা রওনা দিতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবেননি। আর সে জন্যেই উত্তরা সেবার এক বিরাট বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

ত্রিদিবনারায়ণ সেদিন বের হননি, বাংলোতেই ছিলেন। ঝিনুক খোঁজার নেশায় শাড়ি গুটিয়ে উত্তরা অনেকটাই দূরে চলে গিয়েছিল। কখন জোয়ার এসেছে, জল ফুলে উঠেছে বুঝতেই পারেনি। হঠাৎ, বিশাল ঢেউয়ের ঝাপটায় একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ল, আবারও আচমকা প্রবল টান অনেকটাই ভেতরে নিয়ে গেল। দিশেহারা ত্রাসে আর্ত চিৎকার করতে গিয়ে নোনা জল গিলে দমবন্ধ হয়ে বুকটা ফেটে যাচ্ছিল, ক্রমাগত জল খেতে খেতে সমুদ্রের নিশ্চিত গ্রাসের আওতায় চলে যাচ্ছিল। ঘন ঝাউবনের পেছনে সাগরের সেদিকটা বেশ নির্জন। চিৎকার করতে করতে সে দিক থেকে মেইন বিচ্-এর দিকে একটা লম্বা ছেলেকে ছুটে আসতে দেখেছিল কিছু লোক। উর্ধ্বশ্বাসে তাদের কিছু বলেই আবার সেদিকেই দৌড়ে গিয়ে সোজা জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ছেলেটা।

এরপর জেলেদের আর স্থানীয় কিছু লোকের তৎপরতায় সমুদ্র থেকে শেষপর্যন্ত অচেতন দুটো দেহ তুলে আনতে পারা গেছে। সঞ্জীবকে ও ভাবে ঝাঁপ দিতে দেখে সবাই ধরে নিয়েছিল সে সাঁতার জানে। তার দিকে না চেয়ে ডুবন্ত মেয়েটার দিকেই তারা সাঁতরে যাচ্ছিল। পাড়ের লোকজনের চিৎকার আর হৈ-হৈ-তে ফিরে দেখে যে সব থেকে আগে ঝাঁপ দিয়েছিল সে-ই যেতে বসেছে। এক দল তখন আবার সেদিকে গেছে। সঞ্জীব গাঙ্গুলীর জলে বিষম ভয়, কোনোদিন হাঁটুজলেও নামেনি. কিন্তু উত্তরার জন্যে নির্দ্বিধায় সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পেরেছিল।

খবর পেয়ে ত্রিদিবনারায়ণ যখন ছুটে গেলেন তখন দুজনকে সবচেয়ে কাছের হোটেলটার লাউঞ্জে শুইয়ে রাখা হয়েছে, ডাক্তার দেখছে। উত্তরার পেটে প্রচুর জল ঢুকেছিল, তাছাড়া এই শক্-এর বিরাট ধাক্কা। তাকে পুরো দুটো দিন ঘুমের ওষুধ দিয়ে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। সে তুলনায় সঞ্জীব অনেক তাড়াতাড়ি সামলেছে। তারও ধকল কম যায়নি, কিন্তু তাকে দেখে সেটা বোঝার জো নেই। ত্রিদিবনারায়ণকে দেখে কোনোরকম সংকোচ দূরে থাক বরং অনুযোগের সুরে বলে উঠেছিল, 'আপনাকে বলেছিলাম না স্যার উত্তরাকে জলে নামতে দেবেন না!'

ত্রিদিবনারায়ণ কিছু না বলে চুপচাপ তার দিকে চেয়েছিলেন। তাঁর মাথায় তখন থেকেই অন্যরকম হিসেব শুরু হয়েছিল। কিচ্ছু না জানিয়ে সেই কলকাতা থেকে এ ভাবে এতদূর পর্যন্ত নাতনীর পিছু নেওয়ার জন্যে অন্য সময় হলে কি বলতেন বা করতেন জানেন না, কিন্তু সঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে সেই মুহূর্তে তাঁর মনে হয়েছিল উত্তরার চরম বিপদের সময় এই ছেলে ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো এসেছে, সে যে ভাবেই আসুক না কেন।

তাঁকে চুপচাপ চেয়ে থাকতে দেখে সঞ্জীব গাঙ্গুলীও যেন এই প্রথম নিজের অন্যায় সম্পর্কে সচেতন হলো। ঝকঝকে দুটো চোখে তাঁর দিকে খানিক চেয়ে থেকে

বলল, 'জানি স্যার, এ ভাবে আসাটা খুবই অশোভন। কিন্তু আপনারা চলে যাবার পর থেকেই আমার কেমন ছটফটানি শুরু হলো, কিছুতেই থাকতে পারলাম না। কে যেন আমাকে ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে এল।' একটু চুপ করে থেকে স্বীকার করার মতো মুখ করে আবারো বলল, 'আপনাদের জানতে না দিয়ে দুটো দিন উত্তরাকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রেখেছি, এই অঘটন না ঘটলে আপনারা টেরও পেতেন না আমি এসেছিলাম। আর কোনো উদ্দেশ্য আমার ছিল না স্যার—'

মুখে কিছু না বলে ত্রিদিবনারায়ণ তার মাথায় শুধু একখানা হাত রেখেছিলেন।

উত্তরা সুস্থ হতে দুজনকে নিয়েই একসঙ্গে কোলকাতায় ফিরেছেন। কিন্তু অবাক হয়েছেন নাতনীর ব্যবহারে। এত বড় উপকারের পরেও উত্তরা এই ছেলের ওপর দারুণ বিরক্ত। আগে সামনা-সামনি পড়লে যা-ও বা একটু মাথা নাড়ত বা কথার জবাবে দু একটা কথা বলত, এখন তা-ও না। ওই ঘটনার পর থেকে সঞ্জীবকে যেন সে চেনেই না। সঞ্জীব আছে জানলে দাদু ডাকলেও তাঁর ঘরে ঢুকতে চায় না, এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। ত্রিদিবনারায়ণ বুঝে উঠতে পারেন না হঠাৎ তার কি হল।

হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে উত্তরা জিওগ্রাফি অনার্স নিয়ে কলেজে ঢুকল আর সঞ্জীবের তখন এম. এ. ফাইনাল ইয়ার। প্রায়ই ত্রিদিবনারায়ণের লাইব্রেরীতে বসে অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশুনো করে। কিছুদিন ধরেই তাঁর ছটফটানি লক্ষ্য করছিলেন তিনি। এর কারণও জানেন। দেখছিলেন, ক'দিন ধরে এই ছেলে এলেই উত্তরা বেরিয়ে যায় যাতে দাদু ডাকলেও সামনে আসতে না হয়। সেদিন বইটা দুম করে বন্ধ করে হঠাৎই তাঁর দিকে ঘুরে বসল সঞ্জীব। সরাসরি জিজ্ঞাসা, 'উত্তরা আমার সঙ্গে এরকম করছে কেন স্যার?'

'—কেন? কি করেছে উত্তরা?'—সব জেনেও ত্রিদিবনারায়ণের না বোঝার চেষ্টা।

সঞ্জীব অসহিষ্ণু। '—কি করেছে আপনি জানেন না স্যার? সেই দীঘার ব্যাপারের পর থেকেই আমাকে যেন চেনেই না, সামনে পড়লেও অন্য দিকে চেয়ে পাশ কাটিয়ে যায়, একদিন কথা বলব বুঝতে পেরেই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।...একটু চুপ করে সঞ্জীব আবার বলল, উত্তরা নিশ্চয় ভেবে বসে আছে আমি কোনো খারাপ মতলব নিয়ে আপনাদের পিছু নিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি তো জানেন স্যার মনের মধ্যে হঠাৎ বিপদের ছায়া পড়েছিল বলেই অমন পাগলের মতো দৌড়ে গেছি,...কিন্তু উত্তরার এরকম ব্যবহারের ফলে আমি যে একবর্ণও পড়তে পারছি না—'

ত্রিদিবনারায়ণ কি বলবেন এই ছেলেকে? আর নাতনীকেই বা কি বলতে পারেন? চুপচাপ জ্বলজ্বলে দুটো চোখের আকুতি দেখেছেন। পরে উত্তরাকে কথার ছলে বলেছেন, এত বড় একটা বিপদ থেকে তোকে বাঁচাল, ছেলেটার সঙ্গে তো ভাল করে দুটো কথাও বললে পারিস—'

এ কথাতে উত্তরা হঠাৎ রেগে উঠে বলেছিল, 'বাঁচাবার জন্যে কি আমি তাকে ডেকেছিলাম? তাছাড়া আমার ভাল করে কথা বলাবলির কি আছে? সে তোমার কাছে আসে, না আমার কাছে?'

নাতনীর এই আচরণে ত্রিদিবনারায়ণ অবাকই হয়েছিলেন, আর কিছু বলেননি। কিন্তু লক্ষ্য করেছেন তারপর থেকে উত্তরা সঞ্জীবের ওপরে একটু সদয় হয়েছে। সে এলেই বাড়ি থেকে আগের মতো বেরিয়ে যায় না, না ডাকতেই মাঝে মাঝে ঘরেও আসে। সঞ্জীব গাঙ্গুলী তাতেই খুশী, তার পড়াও ঢের ভাল হয়। ত্রিদিবনারায়ণের মন বলছিল এম. এ. পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই ও-ছেলে তাঁকে উত্তরার ব্যাপারে সরাসরি প্রস্তাব দেবে। এতটুকু আপত্তি থাকা দূরে থাক, এ ছেলের হাতে উত্তরাকে দিতে পারলে তিনি নিজের ভাগ্য জানবেন। শেষ সম্বল এই নাতনীকে নিয়ে যে দুশ্চিন্তা তা যেন অনেকটাই কাটবে। কেন ওরকম মনে হতো নিজেও জানেন না, কিন্তু মনে হতো সঞ্জীব পাশে থাকলে উত্তরার কোনো বিপদ হবে না।

এম. এ. পরীক্ষার পরের লম্বা অবসরে নিয়মিত আসা শুরু করল সঞ্জীব। লাইব্রেরী থেকে নানারকম বই নিয়ে পড়ে, তাঁর সঙ্গে নানা আলোচনা করে, এখন বেশীর ভাগই নিজের ভবিষ্যৎ প্ল্যান নিয়ে কথা বলে। এর উদ্দেশ্য ত্রিদিবনারায়ণ ভালই বোঝেন। পরীক্ষার রেজাল্ট কি হবে তা নিয়ে দুজনের কেউই চিন্তা করেন না, শুধু কত নম্বর পেয়ে পুরনো রেকর্ড ভাঙতে পারে ত্রিদিবনারায়ণের সেটুকুই আগ্রহের বিষয়। এম. এ. পরীক্ষার আগে সঞ্জীব যেন তপস্যায় বসেছিল। কোনো সিদ্ধির জন্যে নিজেকে গড়ে তোলার অমন সাধনা সেটা তার চোখে-মুখেই লেখা ছিল। রেজাল্ট বের হলেই সে এবার কিছু বলবে। কিন্তু উত্তরা?...দেখা যাক।

অনেক কাল পর এ সময় ভেতরে ভেতরে আবার দারুণ উতলা হয়েছিলেন ত্রিদিবনারায়ণ। উত্তরাদের কলেজ থেকে এডুকেশনাল ট্যুরে এবার বিহার ঘোরা ঠিক হয়েছে। জিওগ্রাফি নিয়ে পড়ছে যখন এ ধরনের ট্যুর হবেই, আগেও একবার গেছে। তবে এবার সে-ই বিহার, যে বিহার অনেক দিন আগে তাঁর সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছিল। বিহার শুনেই বুকের সেই বিশাল ক্ষতের ওপর অনেক দিন পর খোঁচা পড়েছিল। সঞ্জীবের চোখ এড়াতে পারেননি, তার জোরাজুরিতে দুশ্চিন্তার কারণ বলেছিলেন, আর বলার পর অনেকটা হাল্কা লেগেছিল।

সঞ্জীব সব শুনে চুপচাপ বসেছিল খানিক। তারপর বলেছিল, 'আপনার এই দুশ্চিন্তার কথা উত্তরা জানে?' ত্রিদিবনারায়ণ মাথা নেড়েছিলেন জানে না, তিনিই জানাতে চান না। যে দুর্ঘটনার রেশ মনের গভীর আছে, তার কোনো ছায়া বাস্তব জীবনে তিনিই টেনে আনতে চান না। বরং সবখানেই ওর যাওয়া উচিত, শক্ত দুটো পায়ের ওপর দাঁড়ানো উচিত।

সঞ্জীব আর কিছু বলেনি। কিন্তু পরে কথায় কথায় উত্তরাদের কলেজ থেকে বিহারের কোন্ কোন্ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে, কবে কোনখানে কোথায় উঠছে, এসব জানার ঝোঁক দেখে ত্রিদিবনারায়ণ থমকেছিলেন। বলেছিলেন, 'তুমি কিন্তু সেবারের মতো কক্ষনো ওর পিছু ধাওয়া করবে না। কলেজ থেকে ফি বছর কত মেয়েই তো যাচ্ছে, ওই একটি মাত্র সম্বল বলেই আমার যত বাজে চিন্তা আসে। এবার কিন্তু তুমি কক্ষনো ওরকম কিছু করবে না।'

ধরা পড়ে সঞ্জীব হাসছিল। স্বচ্ছ দুটো চোখ তাঁর চোখে রেখে স্পষ্ট বলেছিল, 'কথা দিতে পারলাম না স্যার। উত্তরার যদি সত্যিই এতটুকু বিপদের চান্স থাকে তাহলে কেউ আমাকে ঠিক তাড়িয়ে নিয়ে যাবে—তবে নিশ্চিন্ত থাকুন, সেরকম প্রয়োজন না হলে আমি কক্ষনো ওর সামনে আসব না।'

কথাগুলো ত্রিদিবনারায়ণের বুকের ভেতর ছুঁয়ে গিয়েছিল। বুঝেছিলেন এরপর যদি যাবে ঠিক করে তো ওকে কেউ আটকাতে পারবে না!'

উত্তরা কলেজের গ্রুপের সঙ্গে রওনা হয়ে গিয়েছিল। পনের দিনের ট্যুরের মধ্যে কোনোরকম অঘটনের খবর পাননি। তবে দুদিন আগের শেষ চিঠিতে লিখেছে খুব আনন্দে কাটাচ্ছে। চিঠিতে উত্তরা জানিয়েছিল দেওঘর হয়ে অমুক তারিখে কোলকাতা ফিরছে। সে চিঠি যখন পেয়েছেন ত্রিদিবনারায়ণ তখন দেওঘর পৌঁছে গেছে তারা। কিন্তু তিনি নাড়াচাড়া খেয়েছেন অন্য কারণে। চিঠি আসার পর সেই সকালেই সঞ্জীব দেওঘর চলে গেছে।

নাতনীকে স্টেশনে আনতে গিয়ে তাকে দেখে আঁতকে উঠেছিলেন ত্রিদিবনারায়ণ। কপালের একটা দিক সাঙ্ঘাতিক ফুলে উঁচু হয়ে আছে, শরীরের সর্বত্র কাঁটা ছেঁড়া আর জমাট বাঁধা রক্তের কালশিটে, তার ওপর দিয়ে একটা বিরাট ঝড় বয়ে গেছে যেন।

মেয়েদের আর প্রফেসারদের মুখে শুনলেন একেবারে শেষ মুহূর্তে কি বিপাকে পড়েছিল। দেওঘরের ত্রিকূট পাহাড়ে অনেকটা উঠে গেছল সবাই। হঠাৎ পাথরে শাড়ি আটকে আছাড় খেয়ে পড়েছিল উত্তরা, তারপর ব্যালেন্স রাখতে না পেরে অত উঁচু থেকে পাথরে ধাক্কা খেতে খেতে উল্টেপাল্টে নিচের দিকে গড়াচ্ছিল। সবাই আতঙ্কে কাঠ হয়ে বোকার মতো দাঁড়িয়েছিল আর কেউ কেউ চিৎকার করছিল। এমন সময় হঠাৎই নিচের দিকের একটা বড় পাথরের খাঁজ থেকে একটি ছেলে ছুটে এসে নিজের শরীর দিয়ে কি ভাবে যে সেই গড়ানো ঠেকিয়েছে তা বলার নয়। তারপরেও আরো খানিকটা হড়কে শেষে একটা বড় পাথর ধরে ফেলতে রক্ষা। ছেলেটিরও চোট লেগেছে। সে-ও কলকাতার বাঙালী, সেদিনই ত্রিকূট পাহাড় দেখতে এসেছিল। ভাগ্যিস এসেছিল! নয়তো কি ঘটতে পারত মনে করে এখনো সকলের গায়ে কাঁটা। ফার্স্ট এইড, ডাক্তার আনা, যাবতীয় ব্যবস্থা, সে-ই করেছে। কিন্তু তারপর কোথায় যে গেল কেউ আর তার হদিস পেল না। ওই সময় কারুর মাথারও ঠিক ছিল না যে জিগেস করে রাখবে সে কোথায় উঠেছে। প্রফেসর দুজন দুঃখ করেছেন, এত বড় উপকার করল অথচ আসার আগে একবার দেখা পর্যন্ত হলো না।

উত্তরাকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে গাড়িতে স্তব্ধ হয়ে ভাবছিলেন ত্রিদিবনারায়ণ। সঞ্জীব তাঁকে বলেছিল, সত্যিই যদি উত্তরার এতটুকু বিপদের সম্ভাবনা থাকে তাহলে কেউ তাকে ঠিক সেখানে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। নাতনীর দিকে তাকালেন, সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আছে, থমথমে চেহারা, মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। বাড়িতে ফিরে আরেক প্রস্থ ডাক্তার দেখিয়ে ত্রিদিবনারায়ণ যা যা করণীয় নিঃশব্দে করে গেলেন, নিজে থেকে একটি কথাও জিগেস করলেন না। রাতে খাবার সময় উত্তরাই প্রথম মুখ খুলল, 'এবারও যে ও পিছু নিচ্ছে তুমি আগে থেকেই জানতে?'

ত্রিদিবনারায়ণ মাথা নেড়েছেন, জানতেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, তিন দিনের জন্যে ও কেবল দেওঘরেই গিয়েছিল, আর কোথাও না।

'—নিষেধ করনি কেন?' উত্তরার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল।

'—করেছিলাম।' এবার নাতনীর মুখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট জবাব দিয়েছিলেন, 'নিষেধ করাতে সঞ্জীব বলেছিল সত্যিই যদি তোর কোনো বিপদের ভয় থাকে তাহলে কেউ তাকে ঠিক সেখানে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে, চেষ্টা করলেও ঘরে বসে থাকতে পারবে না।' একটু চুপ করে থেকে ফের বলেছিলেন, 'সেই বিপদই ঘটতে চলেছিল। সে না গিয়ে পড়লে কি হত ভাবতে পারছিস? আর কোথাও না গিয়ে হুট করে সে কেবল দেওঘরেই বা গেল কেন?'

উত্তরার এসব ভেবে দেখার মেজাজ নেই। অসহিষ্ণু গলায় ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল, 'দ্যাখ দাদু, একটা কথা তুমি খুব ভাল করে জেনে রেখে দাও, আগ বাড়িয়ে যত উপকারই করুক না কেন, তোমার ওই আদরের সঞ্জীব গাঙ্গুলী কেবল তোমার ছাত্রই থাকবে। তাকে নিয়ে আমার ব্যাপারে তোমাদের কোনো মতলবই খাটবে না।'

দাদুর সঙ্গে নাতনীর এ ভাবে কথা বলা জীবনে এই প্রথম। রীতিমতো অপমানিত বোধ করলেও ত্রিদিবনারায়ণ বাইরে তেমনি স্থির। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'কোনোদিন কোনো ব্যাপারেই আমি মতলব নিয়ে কিছু করি নি। আজও করি না। কিন্তু একটা কথা লিখে দিতে পারি যে, এত বছরের মাস্টারির জীবনে ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র অনেকই দেখেছি, কিন্তু সঞ্জীবের মতো এমন অদ্ভুত ধরনের ভাল ছেলে কখনো পাইনি। একসেপশনালি রেয়ার, অ্যান্ড দি বেস্ট।—এরকমের ওপর সবারই লোভ থাকে।'

'—আমার নেই।' উত্তরার সাফ জবাব।

'—না থাকলেও নিয়তিই তাকে তোর দিকে ঠেলেছে। নয়তো ঠিক তোর বিপদের মুহূর্তেই সে তোর কাছে গিয়ে পড়ে কি করে? অবার্থ অঘটনের হাত থেকে তোকে বাঁচায় কি করে?'

খাওয়া ফেলে উত্তরা উঠে দাঁড়াল। রাগে মুখ লাল। একটি একটি করে বলল, 'নিয়তিই যদি মানো তো আমি বলব সে পিছু নিলেই আমার বিপদ ঘটে। সে যখনই যায় তখনই অঘটন ঘটে। সে-ই আমার দুর্ভোগের নিয়তি, সর্বনাশের নিয়তি।' উত্তেজনায় হাঁফাতে হাঁফাতে কোনোদিকে না তাকিয়ে ছিটকে বেরিয়ে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করল।

নাতনীর এরকম আচরণে ত্রিদিবনারায়ণ রীতিমতো অবাক হয়েছিলেন। পরদিন সোজা উত্তরার ঘরে গিয়ে তার মাথায় হাত রেখেছেন। খুব কোমল গলায় জিগেস করেছিলেন, 'সত্যি করে বল্ তো সঞ্জীবকে তোর এত অপছন্দ কেন?'

এ কথায় উত্তরাকে হঠাৎ যেন কেমন ধড়ফড়িয়ে উঠতে দেখেছিলেন। বার দুই কি যেন বলতে গিয়েও আটকেছিল। শেষে তাঁকেই দু হাতে জড়িয়ে ধরে অনুযোগ করে উঠেছিল, 'আমার জন্যে ও-রকম কালো ছেলে? এ তুমি ভাবতে পারলে কি করে দাদু?'

ত্রিদিবনারায়ণ সত্যিই অবাক হয়েছিলেন। শুধু এইজন্যে এত অপছন্দ! রং ময়লা বটে, কিন্তু সঞ্জীবের মতো এমন তাজা ঝকঝকে সুপুরুষ সহজে চোখে পড়ে না।

পুরুষালি অথচ মিষ্টি। 'টল ডার্ক অ্যান্ড হ্যান্ডসাম' কথাটা যেন ওর জন্যেই তৈরী হয়েছিল। তাছাড়া অল্প বয়েস থেকে ছেলেটার মধ্যে যে নির্ভীক জোরের আঁচ পেয়েছিলেন, তা ক্রমশ পুষ্ট হয়ে পূর্ণতার দিকে এগিয়েছে। এরও একটা আলাদা রূপ আছে। পুরুষ হয়ে তাঁর যা চোখে পড়ল, মেয়ে হয়েও উত্তরার তা পড়ল না। বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল, এ নিয়ে নাতনীকে আর একটি কথাও বলেননি। তিনি জানতেন না উত্তরা তাঁকে সত্যি কারণটা বলে নি। বলতে পারে নি যে সেই স্কুলে পড়ার সময় থেকেই সে তার জীবনের দোসর বেছে রেখেছে।

## ষোলো

এম. এ. তেও সঞ্জীবের প্রত্যাশিত রেজাল্টই হয়েছিল। ডক্টরেটের জন্যে ব্যবস্থা-পত্র রেডি করে সঞ্জীব ত্রিদিবনারায়ণের কাছে সরাসরি প্রস্তাব রেখেছিল। তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে উত্তরার সঙ্গে কথা বলে তার বাবাকে এনে বিয়ের কথা পাকা করে রাখার প্রস্তাব। উত্তরার বি. এ. পাস করার আগে এর বেশি কিছু সে-ও এখন চায় না, নিজেও এর মধ্যে একটা না একটা কলেজে ঠিক চাকরি পেয়ে যাবে, তারপর আরো উন্নতির পথ তো আছেই।

ত্রিদিবনারায়ণ এবার তাকে সব খোলাখুলিই বলেছিলেন। বলেছিলেন, সঞ্জীবের মতো রত্ন ছেলে যে অনেক উঁচুতে উঠবে সে বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই, এ বিয়ে হলে তিনিই সব থেকে বেশি নিশ্চিন্ত হতেন। কিন্তু উত্তরার মত নেই। অপছন্দের কারণ হিসেবে উত্তরা তাঁকে যা বলেছিল, কোনোরকম আঘাত না দিয়ে সঞ্জীবকে সেটাই জানিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। শুনে সঞ্জীব হেসেই বলেছিল, 'আপনি এত ইতস্তত করছেন কেন স্যার? সত্যিই তো আপনাদের পাশে গায়ের রংটা আমার বেখাপ্পা রকমের কালো। তবে চামড়াটা তো আর বদলাতে পারব না, কিন্তু এটাই যদি একমাত্র বাধা হয় তো চেষ্টা করে উত্তরার পছন্দটা একদিন না একদিন ঠিকই পালটাতে পারব। আপনি শুধু আশীর্বাদ রাখবেন।'

ত্রিদিবনারায়ণ সেটুকুই শুধু করতে পেরেছিলেন, প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছিলেন।

এরপর উত্তরার জীবনের তৃতীয় ফাঁড়া। আর সে অঘটনও এই ছেলের জন্যেই কাটল। এই যোগাযোগের এবার কোনো প্রস্তুতিই ছিল না। এমনই অদ্ভুত এই যোগ যে ত্রিদিবনারায়ণ নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করলেন নিয়তির নির্দেশেই ওই ছেলের সঙ্গে তাঁর ওভাবে পরিচয় থেকে শুরু করে এ যাবৎ সব কিছু ঘটেছে, উত্তরার জীবনে সে ঈশ্বরপ্রেরিত। কোষ্ঠী বিচারে জেনেছিলেন উত্তরার সাতাশ আটাশ বছর পর্যন্ত সময় খুব খারাপ, তার মধ্যে অন্তত দু-তিনবার প্রাণঘাতী ফাঁড়া। ত্রিদিবনারায়ণের ভয় ছিল সেটাই তাঁর জীবনের শেষ মার। এই শেষ সম্বলটুকু চলে যাবার মার ছাড়া তাঁর জীবনের চরম আঘাত আর কি ভাবে আসতে পারে! কিন্তু যিনি পরীক্ষায় ফেলছেন রক্ষাকবচও তিনিই পাঠিয়েছেন। দায় তো আসলে তাঁরই! শুধু উত্তরাই সেটা বুঝল না।

...সেদিন প্রবল বৃষ্টি। জলে কলকাতা ডুবে গিয়েছিল। দাদু-নাতনী তাড়াতাড়িই

রাতের খাওয়া সেরে নিয়েছিল। ত্রিদিবনারায়ণ শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলেন। বেশ রাত পর্যন্ত কিছু না কিছু পড়া তাঁর বহুকালের অভ্যেস। হঠাৎ কলিংবেলের আওয়াজে সচকিত। এত রাতে এই বৃষ্টিতে কে এল! একটু পরে কাজের লোকের পেছনে সঞ্জীবকে দেখে আরও অবাক। তার পায়ের জুতো জোড়া হাতে, কাকভেজা ভিজেছে, জলে ঘরের মেঝেটা পর্যন্ত মুহূর্তে জবজবে হয়ে গেল। দিন কতক আগে নর্থের দিকের একটা ভাল কলেজে চাকরি পেয়ে গেছিল সঞ্জীব, সেখান থেকেই আসছে। বৃষ্টি কমার জন্যে বহুক্ষণ অপেক্ষা করে শেষে সন্ধ্যে পেরিয়ে যেতে বেরিয়ে পড়েছিল। কিছু না পেয়ে হাঁটতে হাঁটতে এতখানি এসেছে, অনেক বার পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে। কিন্তু জল ক্রমশ বাড়ছে দেখে আর রাস্তার চারদিকে খোলা ম্যানহোলগুলো ঠিকমত বুঝতে না পেরে ভয়ই পেয়ে গেছিল। ওর মধ্যে পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু। শেষে মনে জোর এনে কোনোরকমে সাবধানে পা ফেলে ফেলে এতখানি পথ আসার পর তাঁর বাড়িতে চলে এসেছে। তাঁর বাড়ি থেকে সঞ্জীবের বাড়ি আরো প্রায় মাইল তিনেকের পথ।

কাজের লোকদের ডাকিয়ে তাড়াতাড়ি যা পারেন ব্যবস্থা করলেন। মাথায় ওই ছেলে তাঁর চেয়েও আধ ইঞ্চিটাক লম্বা। দিব্যি তাঁরই ধোপদুরস্ত পাজামা গেঞ্জি পরে আর গরম খিচুড়ি খেয়ে গেস্টরুমে নাক ডাকিয়ে ঘুম দিল। কিন্তু ত্রিদিবনারায়ণের কেন যেন ঘুম আসছিল না। এপাশ-ওপাশ করতে করতে অনেক রাতে হঠাৎ একটা গোঙানির আওয়াজে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন, শব্দ ধরে উত্তরার ঘরের দিকে এগুলেন। তাঁর ঘরের উল্টোদিকে উত্তরার ঘর, বরাবরই দরজা ভেজিয়ে শোয়, দুটো পাল্লার মাঝের ফাঁক দিয়ে গোঙানির আওয়াজ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। ত্রিদিবনারায়ণ তাড়াতাড়ি দরজা ঠেলে খুলতেই একটা দুর্গন্ধের ঝাপটায় মাথা ঘুরে উঠল। কোনোরকমে সামলে নিয়ে লাইট জ্বালতেই তাঁর চক্ষু স্থির। উত্তরা মেঝেতে পড়ে। দাস্ত আর বমিতে বিছানা মেঝে ভাসাভাসি। জ্ঞান নেই, কিন্তু থেকে থেকে অসহ্য যন্ত্রণায় ওই অবস্থাতেই গুঙিয়ে উঠছে।

দিশেহারার মতো ছুটে গিয়ে ত্রিদিবনারায়ণ সঞ্জীবকে ঠেলে তুললেন। ব্যাপার দেখে সেও প্রথম হতভম্ব। তারপর তারই সংবিৎ আগে ফিরল। ওই বীভৎস দুর্গন্ধের মধ্যে ঢুকে নোংরায় মাখামাখি উত্তরার একটা হাত তুলে নাড়ি দেখল, চট করে চোখের পাতা উল্টে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে হুকুম করল, 'কাজের মেয়েটাকে তুলে ঘরে জল আনিয়ে এক্ষুণি ওকে পরিষ্কার করে অন্য জায়গায় শুইয়ে দিন, আমি ডাক্তার নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারি আসছি।' ত্রিদিবনারায়ণকে তবু বিহ্বলের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁর হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি দিল, 'তাড়াতাড়ি যা বললাম করুন, নষ্ট করার মতো সময় এখন নেই।'

সেই ঝাঁকুনিতেই ত্রিদিবনারায়ণের দিশা ফিরল যেন। অবস্থা বুঝতে পেরে আকুল গলায় বলে উঠলেন, 'কিন্তু এই জলে তুমি যাবে কি করে? এত রাতে ডাক্তারই বা পাবে কোথায়? কাছাকাছির মধ্যে তো কেউ আছে বলে জানি না—'

সঞ্জীব গাঙ্গুলীর চোয়াল এঁটে বসতে লাগল। কোন দুর্যোগের ফলে এই রাতে সে এখানে এসেছে তা ভুলেই গেছল। বারান্দা থেকে রাস্তার অবস্থা দেখে নিয়ে কি যেন

চিন্তা করল একটু, তারপরেই নিচে নামতে নামতে বলল, 'আমি ঠিক চলে যাব, আর ডাক্তারও যে করে পারি আনবই। আপনি যেমন যেমন বললাম তাই করুন।'

প্রায় দেড়ঘণ্টা পরে একটা পুলিশের জিপ থেকে সঞ্জীব, ডাক্তার আর এক অফিসার নেমেছে। রুগী দেখে ডাক্তারের মুখ গম্ভীর। বারবার পরিষ্কার করা সত্ত্বেও দাস্তবমিতে মুহূর্তে আবার সব মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে, বীভৎস গন্ধে ঘরে ঢোকা যায় না। ব্যাগ থেকে ওষুধ বার করে ইনজেকশন দিয়ে রুগীকে আবার পরিষ্কার করাতে বলে ডাক্তার বাইরে এসে বসল। খানিক পরে উঠে আবার গোটা দুই ইনজেকশন দিল। ঘরের মধ্যেই সঞ্জীব দড়ি টাঙিয়ে ব্যবস্থা করে দিলে ডাক্তার স্যালাইন চালু করল। আপাতত অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

ভোর সাড়ে চারটে পর্যন্ত ত্রিদিবনারায়ণের ঘরে সবাই বসে। এতক্ষণে দাস্তবমি বন্ধ হয়ে উত্তরা ঘুমুচ্ছে। ক' বোতল ড্রিপ চলবে আর অন্যান্য ওষুধপত্র কি ভাবে দেওয়া হবে সে সব লিখে সঞ্জীবকে বুঝিয়ে দিয়ে ডাক্তার পুলিশের গাড়িতেই ফিরে গেল। যাবার আগে ত্রিদিবনারায়ণের সঙ্গে একটু রসিকতাও করে গেল, 'আপনি ভাগ্যবান মশাই, আজকের দিনে এমন ছাত্র পেয়েছেন যে দরকারে পুলিশ দিয়ে ডাক্তার ধরে আনে।'

তখন রসিকতার মন ছিল না ত্রিদিবনারায়ণের। বারবার একটা কথাই শুধু জানতে চেয়েছিলেন, 'এমন হঠাৎ কি করে হলো? আর ভয় নেই তো!'

শুনলেন কি হয়েছিল। কলেরার অ্যাটাক। অবস্থা ঘোরাল হয়েই উঠেছিল, স্যালাইন আর ঐসব ওষুধ-ইনজেকশনগুলো সময়মতো না পড়লে কি হত বলা যায় না। ত্রিদিবনারায়ণ তক্ষুনি বুঝেছেন কি হতো, কি হতে চলেছিল। কিন্তু কি ভাবে ঐ দুর্যোগের রাতে সঞ্জীব সব ব্যবস্থা করল তা ওকে পরে জিগেস করে জেনেছেন।

এক বুক জল ঠেলে সোজা আধমাইল দূরের থানায় গিয়ে হানা দিয়েছিল সঞ্জীব। ও. সি. তাঁদের দুজনেরই চেনা, কিছুদিন আগে ত্রিদিবনারায়ণেরই অনুরোধে ও. সি.-র ছেলেটিকে পড়িয়ে সঞ্জীব তাকে অব্যর্থ ফেলের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। এই বিপাকে পড়ে ওই ও. সি.-র কথাই সব থেকে আগে মনে হয়েছিল। থানার ওপরেই তার কোয়ার্টার। ঘুম থেকে তুলিয়ে তাকে বিপদের কথা বলেছে, তারপর তাকে দিয়ে জিপ বের করিয়ে ডিউটি অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে সোজা নিজেদের পাড়ার ডাক্তারটির বাড়ি গেছে। সে সহজে আসতে চায়নি। সঞ্জীব তাকে পুলিশের জিপ আর অফিসারকে দেখিয়ে একরকম শাসিয়েই তুলে এনেছে। আসার পথে রুগীর অবস্থা বলে কি কি ওষুধ-ইনজেকশন লাগতে পারে, আর কাছাকাছি কোন্ ওষুধের দোকানে ভেতরে লোক থাকে ডাক্তারের থেকেই জেনে নিয়ে সেই দোকানে হানা দিয়েছে। প্রায় মারামারি করে দরজা খুলিয়ে ওষুধ ইনজেকশন স্যালাইন তাছাড়া আরো যা যা লাগতে পারে নিয়েছে। দরজা ভাঙার যোগাড় হতে আর পুলিশ অফিসারটির শাসানিতে বাধ্য হয়ে ভেতরের লোকটি ওই রাতে দোকান খুলে যা যা দরকার সব বের করে দিয়েছে।

ত্রিদিবনারায়ণ এবার শুধু আশা করেছেন উত্তরার মতি ফিরবে। সঞ্জীবের মুখে সব শোনার পর কেন যেন হঠাৎই তাঁর রতন পাড়ুইয়ের কথা মনে পড়েছিল। মায়ের মুখে

শুনেছিলেন নিজের জীবন দিয়ে সে তার দিদিরানীর শেষ সম্বলটুকু অর্থাৎ ত্রিদিবনারায়ণকে রক্ষা করেছিল। আর, ওই দুর্যোগের রাতে ত্রিদিবনারায়ণ নিজের চোখে দেখেছেন আর এক কালো ছেলে চারপাশের খোলা ম্যানহোলের মরণফাঁদ তুচ্ছ করে কি ভাবে নিজের জীবন বাজী রেখে ছুটে গেছে। বুদ্ধি আর সাহসের জোরে তাঁরও শেষ সম্বলটুকু, অর্থাৎ উত্তরার জীবন তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছে। মনে মনে সেই বিশ্বাস আর সমর্পণের পায়েই মাথা রেখেছেন তিনি। উত্তরার মন কি এর পরেও বদলাবে না?

বদলেছে। সুস্থ হয়ে ওঠার পর সব শুনে আশ্চর্যরকম চুপচাপ হয়ে গেছে উত্তরা। সঞ্জীব এলে আগের মতো আর এড়িয়ে চলে না, বরং নিজে থেকেই এগিয়ে এসে কথা বলে। সঞ্জীব ভারি খুশী, ত্রিদিবনারায়ণও স্বস্তি বোধ করেছেন। এমন সময় হঠাৎই সঞ্জীব বেশ কিছুদিন একেবারে ডুব মেরে একদিন দুপুরের দিকে এসে হাজির হলো। এরকম সময়ে কখনো আসে না, এসময়ে উত্তরা কলেজে থাকে, তার নিজেরও চাকরি আছে। সঞ্জীব জানালো, একটা স্কলারশিপের ব্যবস্থা করতে পেরেছে। আপাতত বছর দুয়েকের মতো হায়ার স্টাডিজ-এর জন্যে বিদেশ যাচ্ছে। সে ব্যাপারে ঘোরাঘুরির জন্যেই এত দিন আসতে পারেনি।...

ত্রিদিবনারায়ণ চেয়ে ছিলেন। দেখলেন, ছেলেটা হাসতে চেষ্টা করেও পারছে না। সেই তাজাভাব নেই, মুখ শুকনো. চেহারা কালীবর্ণ, ভেতরটা যেন পুড়ছে। উঠে এসে সঞ্জীবের মাথায় একখানা হাত রাখলেন ত্রিদিবনারায়ণ, চোখে চোখ, '—কেন যাচ্ছ?'

সঞ্জীব হেসে কি বলতে গিয়েও তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেল। ত্রিদিবনারায়ণ আবার বললেন, 'আমার কাছে কখনো তুমি মিথ্যে বলনি,...কেন যাচ্ছ?'

সঞ্জীব অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে শেষে মুখ খুলল। চোখ দুটো অস্বাভাবিক চকচকে। বলল, 'কিন্তু তার আগে আপনাকে কথা দিতে হবে উত্তরা কিচ্ছু জানবে না।'

ত্রিদিবনারায়ণ ঠিক এরকম কিছুই আশঙ্কা করেছিলেন। কথা দিলেন। সঞ্জীব বলল কিছুদিন আগে এক দুপুরে হঠাৎই উত্তরা ফোন করে তাকে বাইরে দেখা করতে ডেকেছিল। হাওয়ায় সাঁতরে এসেছিল সঞ্জীব, কিন্তু সব শোনার পর নিঃশ্বাস নেবার বাতাসটুকুও যেন আর ছিল না। উত্তরা বলেছে, তার জীবনের জন্যে সে সঞ্জীবের কাছে বারবার ঋণী। কিন্তু ঋণের বোঝা আর ভালবাসার দাবি এক জিনিস নয়। চেষ্টা করে বা জোর করে ভালবাসা পাওয়া যায় না। সঞ্জীব যেন তাকে ক্ষমা করে।

অনেকক্ষণ বাদে সঞ্জীব শুধু জিগেস করেছিল তার কালো রঙটাই এ ব্যাপারে বাধা হওয়ার একমাত্র কারণ কি না। আকুল হয়ে উত্তরা বাধা দিয়ে উঠেছিল, ওটা কোনো ব্যাপারই নয়, দাদুকে কিছু একটা বলতে হবে বলেই ও কথা বলা। সঞ্জীবের প্রতি তার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই, আর সেই জন্যেই তার নিজেরও খুব খারাপ লাগছে।

একটু চুপ করে থেকে সঞ্জীব এবার তাকে অপছন্দের আসল কারণটা জানতে চেয়েছিল। উত্তরা বলেছিল, পছন্দ বা অপছন্দ কোনোটারই প্রশ্ন এ ব্যাপারে ওঠে না। কারণ এ নিয়ে কোনোদিন তার ভাবার সুযোগই হয়নি। সঞ্জীব আবারও জিগেস করেছিল, ভাবার সুযোগ হয়নি, না প্রয়োজন হয় নি? মাথা গোঁজ করে উত্তরা জবাব দিয়েছে, দুটোই। এ ব্যাপারে সে আর কিছু বলতে পারলে না।

আর কিছু বলেনি সঞ্জীবও। উঠে আসার আগে উত্তরা তার কাছ থেকে কথা আদায় করেছিল যে, ত্রিদিবনারায়ণকে সঞ্জীব কিছু বলবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথার খেলাপ হলো, চেষ্টা করেও তাঁর কাছে মিথ্যে বলা গেল না। ছোট ভাই আর বিশেষ করে মায়ের মৃত্যুর পর যে হাড়পাঁজর দুমড়নো যন্ত্রণায় গুঁড়িয়ে চৌচির হয়ে যেতে বসেছিল সঞ্জীব, এবারও ভেতরে ভেতরে সে ধরনের যাতনা শুরু হয়েছিল। কিন্তু এবার নিজেকেই নিজে টেনে তুলেছে। প্রচুর ঘোরাঘুরি করে স্কলারশিপ যোগাড় করে বহুদূরে পাড়ি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাতে ভেতরের কাঙালটা হাজার চেষ্টা করলেও এখানে ছুটে আসতে না পারে। ত্রিদিবনারায়ণ এবার স্থির বুঝেছেন উত্তরার জীবনে আর কেউ এসেছে। আর এও বুঝেছেন যে সঞ্জীবও সেটা স্পষ্ট বুঝেছে। সেই জন্যেই তার দূরে সরার সিদ্ধান্ত। নয়তো সে চেষ্টা করত, অপেক্ষা করত। কিন্তু তাঁরা কেউই এ নিয়ে একটি কথাও বলেননি। ত্রিদিবনারায়ণ কথা রেখেছেন, উত্তরাকে কিছু বুঝতে দেননি। সঞ্জীব বিদেশে পাড়ি দেবার আগে পর্যন্ত চাপা উৎকণ্ঠা নিয়ে নাতনী যে তাঁকে লক্ষ্য করে চলেছে তাও খেয়াল করেছেন। ত্রিদিবনারায়ণ কেবল সেই এক বিশ্বাস আর সমর্পণের মন্ত্র জপ করে চলেছেন।

## সতেরো

বি. এ. ফাইনাল পরীক্ষা দেবার পর উত্তরা নিজেই ত্রিদিবনারায়ণের কাছে সব ভাঙল। সঞ্জীব যাবার পর থেকে এ বাড়িতে আর একবারও তার নাম ওঠেনি, ইচ্ছে করেই তিনি তোলেননি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে উত্তরা ভেবেছিল, দাদুর মাথা থেকে ওই ব্যাপার চলে গেছে। দাদুকে এবার সব বলল উত্তরা। ত্রিদিবনারায়ণ শুনলেন সেই স্কুলে পড়ার সময় থেকেই ছেলেটির সঙ্গে উত্তরার জানাশোনা। ছেলেটি উত্তরার ক্লাসের একটি বন্ধুর পিসতুতো দাদা। তার পড়াশুনোর রেজাল্ট ভাল, কেরিয়ার তো খুবই ভাল। এই বয়সেই টেস্ট পাইলট হয়ে বসেছে, এয়ার ফোর্সে আছে। খুব দক্ষ না হলে এত অল্প সময়ে সহজে টেস্ট পাইলট হওয়া যায় না। মাইনেপত্র বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধে যা পায় লোভনীয় রকমের ভাল। শীগগিরই আর একটা ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে, আর তারপরেই বিয়েটা সেরে ফেলার ইচ্ছে, কারণ এরপরে অনেকদিন ছুটি পাবে না। শুধু একটাই যা খুঁত, ছেলে ব্রাহ্মণ নয়। নাম রজত বসু।

সব শুনে একেবারে চুপ মেরে গিয়েছিলেন ত্রিদিবনারায়ণ। তাঁকে ওরকম চুপ থাকতে দেখে জাতের অমিলের কথাটাই প্রথমে মনে হয়েছিল উত্তরার। কিন্তু দাদুকে যতটা জানে, ছেলে পছন্দ হলে তাঁর কাছে জাতের ব্যাপারটা কোনো সমস্যাই নয়। কারণ, ছেলেবেলা থেকেই দাদুর জাতপাত না মানার অনেক নজির সে দেখেছে। আর ছেলে যে পছন্দ হবেই সে ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত ছিল উত্তরা। নিজের চোখদুটো আর বিবেচনার ওপর তার বরাবরই যথেষ্ট আস্থা। কিন্তু ত্রিদিবনারায়ণকে এরকম চুপ মেরে যেতে দেখে ভেবেছিল অন্যের বেলায় যতই না মানুক নিজের ব্যাপারে জাতের সংস্কারের ব্যাপারটা তিনি কাটিয়ে উঠতে পারছেন না বলেই এমনভাবে রয়েছেন।

ত্রিদিবনারায়ণ আমার সামনেই একদিন নাতনীকে ঘরে ডাকলেন। উত্তরাও সেই আশাতেই ছিল। কারণ লেখক-দাদুর কাছে মনের কথা বলে তার নিজের দাদুটিকে একটু বোঝাতে অনুরোধ করেছিল। সে চেষ্টায় এগুতেই কুশাগ্র-বুদ্ধি মানুষটা আমার মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে নাতনীকে আনালেন। রজত বোসকে কবে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হবে জিগেস করলেন। উত্তরার সুন্দর মুখ ঝলমলিয়ে উঠেছিল, বলল, 'যে দিন দাদু বলবে সেই দিনই নিয়ে আসবো, ওই ছেলেও এই অপেক্ষাই করছে।'

ত্রিদিবনারায়ণ দিন বলেছেন। ঠিক হলো আমাকেও উপস্থিত থাকতে হবে। ত্রিদিবনারায়ণের মুখের চেহারা নির্লিপ্ত। যেন যা যা করণীয় তাই করছেন শুধু। সে মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর দ্বিধা ঝেড়ে ফেলার জন্যেই উত্তরা হঠাৎ বলে উঠল, 'ছেলে ব্রাহ্মণ নয় বলেই তো তোমার বেশি খুশি হওয়া উচিত দাদু।'

আমাদের দু'জনকেই এ কথায় অবাক হতে দেখেই যেন ত্রিদিবনারায়ণকে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা তোমাদের সেই রতন পাড়ুই, সে তো বামুন নয় বলেই মন্দিরে ঢোকার অপরাধে তোমার দাদামশাইয়ের বিচারে মরতে বসেছিল, তাই না?'

ত্রিদিবনারায়ণ অবাক।—'হ্যাঁ, তো তার সঙ্গে এ বিয়ের কি সম্পর্ক?'

—'অনেক সম্পর্ক।' উত্তরার চোখেমুখে টিপটিপ হাসি।—'সে তো তোমার মাকে কথা দিয়েছিল এ বংশেই আবার ফিরবে?'

—'হ্যাঁ, তাতে কি?'

—'অনেক কিছু।' উত্তরার মুখে কাঁচা লাল রং লাগল যেন।—'এ বংশ বলতে তো এখন শুধু আমি, কিন্তু আমি ব্রাহ্মণের ঘরে গেলে সে কি আর সহজে আসতে চাইবে? একবার বামুনের ঘরে পা দেবার ফলেই যা ফাঁড়া গেছল!'

উত্তরার চালাকি দেখে আমি হেসে উঠেছিলাম। দাদুর কাছে ছোট্টবেলা থেকেই সমস্ত গল্প এ পর্যন্ত বহুবার শোনা হয়ে গেছে। নিজে কতটা কি মানে জানি না কিন্তু দাদুর বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করে জানতাম। তা বলে সেটা পুঁজি করেই এমন জব্দ করবে ভাবিনি।

নাতনীর কথা শুনে এবার ত্রিদিবনারায়ণও হাসছিলেন অল্প অল্প। কিন্তু তারপরেই যা বললেন শুনে আমরা অবাক। বললেন, 'জাত নিয়ে আমার কোনোরকম সংস্কার নেই। জেলের ছেলের আয়ু নিয়ে বেঁচে উঠেছিলাম। তারই হাতে ইষ্টদেবী উঠে এসেছিলেন, বংশের মঙ্গল-শঙ্খ নড়েছিল, তাই জাতের বিচার এ বংশে নিষেধ।'

'তাহলে?'—উত্তরার অবাক প্রশ্ন।

ত্রিদিবনারায়ণ এখানে বসেই যেন অনেক দূরে চলে গেলেন। আস্তে আস্তে বললেন, 'আমার আপত্তি অন্য কারণে—কারণ, আমি অন্যরকম ভেবেছিলাম।'

উত্তরা জোরেই বলে উঠেছিল, 'কি কারণে আপত্তি? কি ভেবেছিলে তুমি?'

যেন বহু দূর থেকে ফিরে এলেন ত্রিদিবনারায়ণ। আত্মস্থ দু চোখ নাতনীর মুখের ওপরে রেখে স্পষ্ট বললেন, 'আপত্তির কারণ, প্রথম থেকেই এ ব্যাপারে আমার ভেতর থেকে সায় মেলেনি। অনেক দিন আগেই আমি এরকম কিছু সন্দেহ করেছিলাম। তখন থেকেই মন বলেছে তুই ঠিক করছিস না—'

মুখ সাদা উত্তরার, অস্ফুটে জিগেস করল, 'আর অন্যরকম কি ভেবেছিলে?'

—'ভেবেছিলাম, যে সত্যিই তোর, তাকে তুই চিনতে পারবি—ঈশ্বর যাকে বারবার তোর দিকে ঠেলে দিয়েছেন, নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে বারবার যে ছেলেটা তোকে রক্ষা করেছে, তাকে তুই ফেরাবি না। রতন পাড়ুই আমাদের ঘরে অনেক আগেই এসে গেছে, কিন্তু তাকে তুই চিনতে পারিস নি।'

উত্তরার সাদা মুখ আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে কঠিন গলায় একটি একটি করে বলল, 'কে তোমার রতন পাড়ুই? ওই সঞ্জীব গাঙ্গুলী? আজকের দিনে এ-ও তুমি বিশ্বাস কর?...আসলে তোমার ইচ্ছের সঙ্গে আমার ইচ্ছেটা মিলল না বলেই এ বিয়েতে তোমার ভেতর থেকে সায় নেই। এটাই একমাত্র কারণ, এ ছাড়া অন্য কোনো কারণ নেই। কিন্তু তুমিও একটা কথা জেনে রেখ, তোমার ভেতর যাই বলুক এ বিয়েতে আমি সুখী হবই...' রাগে ক্ষোভে চোখে জল এসে গেল। এক ঝটকায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বিষণ্ণ হাসিতে ত্রিদিবনারায়ণের মুখখানা কেমন যেন দেখাচ্ছিল। দু চোখ চিকচিক করে উঠছিল। বিড়বিড় করে বলেছিলেন, 'আমিও যে তাই-ই চাই রে, মনে প্রাণে তাইই চাই...'

নির্দিষ্ট দিনে রজত বোসের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সত্যিই ভাল লেগেছে। ঝকঝকে স্মার্ট আর তেমনি চেহারা। উত্তরার পাশে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়ানোর মতই রূপ। চওড়া মজবুত হাড়ের কাঠামোয় লম্বা টানটান শরীর, ত্রিদিবনারায়ণের থেকেও ফর্সা রং লালের দিক ঘেঁষা, ঈষৎ কটা ঠাসা একমাথা চুল আর গাঢ় বাদামী উজ্জ্বল চোখ। দৃঢ় নাক, সুগঠিত পুরু ঠোঁট, মুখের গড়ন, সব মিলিয়ে যেন গ্রীক ভাস্কর্য। তাকে দেখার পর বুঝেছি কেন উত্তরা সেই ক্লাস নাইন থেকে এ ছেলেতে মজে আছে। কথাবার্তাও বুদ্ধিদীপ্ত। এমন ঝকঝকে সুন্দর ছেলে, লেখাপড়ায় ভাল, চাকরিতে এত অল্প বয়সে এমন উন্নতি, অথচ কোনোরকম দেমাক বা ঠাটবাট নেই। প্রথম আলাপেই আমাদের মন কেড়ে নিয়েছিল। উত্তরার দোষ নেই, এমন ছেলেকে ভাল না লাগাটাই অস্বাভাবিক। ত্রিদিবনারায়ণেরও খুবই ভাল লেগেছে, নাতনীকে সে কথা বলেওছেন। তা সত্ত্বেও সেদিনের সেই কথাগুলো বলার জন্য উত্তরার মান ভাঙাতে তাঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

এবার সব দ্বিধা ঝেড়ে মন খুলেই আয়োজনে মেতেছিলেন ত্রিদিবনারায়ণ। বিরাট ধুমধাম করে বিয়ে দিয়েছেন। বিয়ের আসরে জামাই দেখে সবার চোখ জুড়িয়ে গেছিল। উত্তরাও রাজেন্দ্রাণীর মতো ঝলমল করছিল। লোকে কাকে ফেলে কাকে দেখে! বউভাতের পর হানিমুন সেরে শ্বশুরবাড়িতে কটা দিন কাটিয়ে উত্তরা আবার দাদুর কাছেই ফিরে এসেছিল। শ্বশুরবাড়ি উত্তরপাড়ায়, সেখানে শুধু বিধবা শাশুড়ী থাকে। রজতের গোয়ায় পোস্টিং, সে ছুটি শেষে কাজের জায়গায় ফিরে গেল। এদিকে উত্তরার এম. এ. পড়ার ইচ্ছে। কোলকাতায় দাদুর কাছে থেকে এম. এ.-টা শেষ করে তারপর একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করবে। আপাতত দাদুর কাছেই থাকবে। ত্রিদিবনারায়ণ

হেসে বলেছিলেন, 'আসলে এম. এ. পড়াটড়া সব বাহানা, এত দিন ধরে ও ছোঁড়ার সঙ্গে প্রেম করেও শেষ পর্যন্ত এ বুড়োটাকে ছাড়তে পারছে না।'

উত্তরা হেসে জিভ ভেঙচেছিল। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল কথাটা খুব মিথ্যে নয়। উত্তরা একটু বড় ছুটিছাটা হলেই গোয়া চলে যেত। রজতের কোয়ার্টারে হৈ হৈ করে কটা দিন কাটিয়ে ফিরে আসত। শেষ যেবার ঘুরে এলো ওর দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেছল। এমনিতেই ফুটফুটে সুন্দর, কিন্তু তখন সারা গা দিয়ে যেন আলো ঠিকরে পড়ছিল, সর্বাঙ্গে নতুন করে রূপের ঢল। ত্রিদিবনারায়ণের কাছে শুনেছিলাম, উত্তরার ছেলেপুলে হবে।

উত্তরা মা হতে চলেছে জানবার পর থেকেই উদ্বেগে উত্তেজনায় ত্রিদিবনারায়ণ একেবারে ছেলেমানুষের মতো করতে লাগলেন। নাতনীকে চোখে হারান, সবসময় চাপা উৎকণ্ঠা, এই বুঝি কোনো গণ্ডগোল হলো! সাতবার করে ডাক্তারকে ফোন করেন, বিনা কারণে যখন তখন বাড়িতে কল দিয়ে বারবার চেক আপ করিয়েও স্বস্তি নেই। তাঁর ভয়ের শেকড় কোথায় গাঁথা খুব ভাল করেই জানি। কিন্তু এ নিয়ে আমার সঙ্গেও একটি কথা বলেন না, পাছে তাঁর বলার জন্যেই কিছু ঘটে! নাতনীর সব কিছু এখন তাঁর দুচোখের সজাগ আওতায়। বিরক্ত হতে গিয়েও এক এক সময় হেসে ফেলে উত্তরা। এই ছেলেমানুষ বৃদ্ধের জন্য বুকের ভেতরটা মমতায় ভরে ওঠে।

## আঠারো

দিন কাটছিল। সেদিন মহালয়া। ত্রিদিবনারায়ণ প্রতি মহালয়ায় গঙ্গায় গিয়ে পিতৃপুরুষের প্রতি তর্পণ করেন। সেবারও গিয়েছিলেন। তর্পণ সেরে বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে বিমূঢ় আমরা। গেটের সামনে পাড়ার লোকের জটলা, ভেতরেও পাড়ার জনাকয়েক মহিলা! বুকটা কেঁপে উঠল। দুঘণ্টাও হয়নি আমরা গেছি আর ফিরেছি, এরই মধ্যে কি হলো? উত্তরার হঠাৎ শরীর খারাপ হয়নি তো? কিন্তু আজও সকালে ডাক্তার চেক আপ করে গেছে, ডেলিভারির এখনও বেশ দেরি। একরকম দৌড়েই ভেতরে ঢুকলাম আমরা।

উত্তরা মেঝেতে পড়ে, জ্ঞান নেই। পাড়ার ক'টি মহিলা তাকে ঘিরে বসে আছে। একজন মাথায় মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে, আর কাজের মেয়েটা হাউহাউ করে কাঁদছে।

বিহ্বলের মতো শুনলাম কি হয়েছে। খানিক আগে ট্রাঙ্ককলে খবর এসেছে টেস্টিং -এর লাস্ট রাউন্ডে একটা প্লেন ভেঙে সোজা আরব সাগরে পড়েছে। টেস্ট পাইলট রজত বোস ছাড়া আরও তিন জন সহকারী তাতে ছিল। পুরোদমে সার্চ চলছে কিন্তু আর কোনো খবর আসেনি।...উত্তরা খবর শুনেই জ্ঞান হারিয়েছে। সেই থেকে একইভাবে পড়ে আছে, এদিকে ত্রিদিবনারায়ণ থরথর করে কাঁপছেন, দুজনকে একই ঘরে শুইয়ে ডাক্তার আনানোর ব্যবস্থা করে আমি বোবার মতো বসে রইলাম।

একে একে আরো দশটা দিন কেটে গেল। প্লেনের ভাঙা অংশ, সহকারী তিনজনের নানা চিহ্ন, নাম খোদাই করা হেলমেটের টুকরো, আরো নানা টুকিটাকি

জলের তলা থেকে পাওয়া গেছে, কিন্তু কোনো হদিস মেলেনি খালি রজত বোসের। সে যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে। নিয়মমতো আরো কুড়িদিন সার্চ চলবে, তার মধ্যেও কোনো খোঁজ না পাওয়া গেলে ডেড ধরে নিয়ে তার যাবতীয় প্রাপ্য এবং ক্ষতিপূরণ উত্তরাধিকারীকে দেওয়া হবে।

উত্তরা সেই থেকে বিছানা নিয়েছে। বেশির ভাগ সময়েই ওষুধের ঘোরে আচ্ছন্ন থাকে। আর চোখ মেললেই পাগলের মতো চারদিকে তাকিয়ে কি যেন খোঁজে। না পেয়ে ছুটে বেরুতে চায়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ত্রিদিবনারায়ণ স্তব্ধ হয়ে তার মাথার কাছে বসে থাকেন।

মাস পার হলো, কিন্তু খবর মিলল না। তন্ন তন্ন করে সার্চ করেও রজত বোসের এতটুকু চিহ্ন পাওয়া গেল না। বাকি তিনজনের সম্বন্ধে অনেক আগেই নিশ্চিত হওয়া গেছে, কিন্তু এই একজন যেন বেমালুম মিলিয়ে গেল। কিন্তু যা-ই হোক বেঁচে থাকা যে অসম্ভব সেটা সবাই বুঝেছে। এবার আর্ফিসিয়ালি 'অ্যাসিউমড ডেড' ডিক্লেয়ার করে ওয়ারিশনের কাগজপত্র রেডি করা হবে। শুনে ত্রিদিবনারায়ণ হঠাৎ কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'হদিস পাওয়া গেল না বলেই ধরে নিতে হবে ডেড? ডেড বলে দেওয়াটা এতই সোজা?'

—'খুবই সোজা।' আগুনের ফুলকির মতো দুটো কথা কানের পর্দায় ঝাপটা মারল। চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখি উত্তরা। কখন বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে জানি না। দু চোখ অস্বাভাবিক জ্বলছে। ত্রিদিবনারায়ণের দিকে জ্বলন্ত সেই দৃষ্টি মেলে হিসহিসে গলায় আবারও বলল, 'তোমাদের ওই বংশগত কুসংস্কারে না ভুগলে তুমিও এই সোজা কথাটা বুঝতে পারতে। বুঝতে এত বড় সমুদ্রে একটা মানুষ হারিয়ে যাওয়ার অর্থ কি, তার কোনো হদিস না পাওয়ার মানে কি।' উত্তেজনায় হাঁফাতে লাগল। আবারো বলে চলল, 'বংশ বংশ ধরে একটা শাঁখ নিয়ে নিজেরা অন্ধ হয়ে আছ, আমাকেও করতে চেয়েছ, বারবার খালি বলেছ, মঙ্গল হবে, মঙ্গল হবে—এই তার নমুনা?' উন্মত্তের মতো ঠাকুরঘরের দিকে ছুটতে ছুটতে চিৎকার করে উঠল, 'আজ আমি সব ভাঙব, সব শেষ করে দেব।'

বারান্দার অর্ধেকও যেতে পারল না, হাঁটু ভেঙে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

একটা ঘা খেয়েই যেন ত্রিদিবনারায়ণ নিজের মধ্যে ফিরলেন। ডাক্তার এনে তার সঙ্গে পরামর্শ করে যা করণীয় নিঃশব্দে করে চললেন। কঠিন সংকল্পে নিজেকে বেঁধে নাতনীর যাবতীয় ব্যাপার, ওষুধপত্র, খাওয়া-দাওয়া সব নিজের হাতে তুলে নিলেন। সেদিন জ্ঞান ফেরার পর থেকে উত্তরার মুখ একেবারে বন্ধ। একটি কথাও বলে না কিন্তু ক্ষিপ্ত ক্রোধে দু চোখ দিয়ে আগুনের ঝাপটা মেরে ত্রিদিবনারায়ণকে যেন পুড়িয়ে ফেলতে চায়। তিনি দেখেও দেখেন না। ডাক্তারের কথামত ওষুধ, ফলের রস, খাবার রুটিন নিয়মে নাতনীর মুখের সামনে ধরেন। আশ্চর্য! এত রাগ-জ্বালা সত্ত্বেও উত্তরা এ ব্যাপারে দাদুকে অমান্য করতে পারে না। যেন বোঝে মানুষটা এই এক ব্যাপারে কোনো কিছুর সঙ্গে আপোস করবে না। কথা না শুনলে দরকার হলে নাকে নল ঢুকিয়ে খাওয়াবে।

আমি জানি ত্রিদিবনারায়ণ কোন আশায় আবার নতুন করে এ বয়সে তৈরি হয়েছেন। উত্তরার গর্ভের সন্তান আচার্য চৌধুরী আর রায় বংশের শেষ অঙ্কুর। তার আসার আশায় তিনি আবারও বুক বেঁধেছেন।

সন্তান এল। ছেলে। কিন্তু মরা ছেলে। একেবারে শেষ মুহূর্তে কি যে হয়ে গেল ডাক্তাররাও বুঝে উঠতে পারেনি। অনেক কষ্টে উত্তরাকে বাঁচানো গেছে, অপারেশন করে মৃত শিশু বের করেছে। জ্ঞান হবার পর সব শুনে উত্তরা বেদম হেসে উঠেছিল। দাদুর দিকে তাকিয়ে উন্মাদের মতো হাসছিল আর হাসছিল।

সেদিন সারাক্ষণ তাঁর সঙ্গে ছিলাম। সারাটা দিন পাথর মূর্তির মতো বসে রইলেন ত্রিদিবনারায়ণ। কিন্তু সন্ধ্যেবেলা তাঁকে রক্তবাস পরে ঠাকুরঘরে যেতে দেখে বিষম চমকে উঠেছিলাম। তবে কি আজ সেই দিন? আজই? মনের অনুচ্চারিত কথা ক'টা তাঁর কাছে গোপন রইল না। আমার দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন, আস্তে আস্তে বললেন 'আজ সেই তিথি, অমাবস্যা, কৃষ্ণা পঞ্চমী।'

আমার সারা গায়ে হঠাৎ কাঁটা দিয়ে উঠল। আজকের যুগে এও সম্ভব?

উর্ভরাকে বাড়ি নিয়ে আসার পর ত্রিদিবনারায়ণের দুর্ভোগ চরমে উঠল। হয় একেবারে পাথর, নয়তো ভীষণ রকমের উগ্র। তখন যা কিছু সামনে পায়, আছড়ে ভাঙতে চায়। সব থেকে রাগ দাদুর ওপর। এই দাদুই যেন তার সঙ্গে চরম বেইমানি করেছে। আমার চোখে ত্রিদিবনারায়ণ জীবনের একেবারে শেষ বেলায় আবারও পরীক্ষায় বসেছেন। চরম মার খাওয়ার পর মুখ বুজে যন্ত্রণা সহ্য করার পরীক্ষা।

## উনিশ

প্রায় আড়াই বছর পর এই চরম দুর্যোগের সময় সঞ্জীব গাঙ্গুলী দেশে ফিরল। ত্রিদিবনারায়ণের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, আমিও তখন সেখানেই ছিলাম। আমিই সব বলেছি, ত্রিদিবনারায়ণ স্তব্ধ মূর্তির মতো বসেছিলেন। শোনার পর সঞ্জীব বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসে থেকে একসময় উঠে চলে গেছে। এর পর থেকে সন্ধ্যের পর প্রায়ই আসত। একটি কথাও বলত না, ত্রিদিবনারায়ণের ঘরে চুপচাপ বসে থেকে একসময় চলে যেত। তিনি নিজে থেকে কিছু না বললে সে-ও কোনো কথা বলত না। একদিনও উত্তরার ঘরে যায়নি বা তার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেনি। কেমন আছে আমাদের কাছে প্রতিবার সে খবরটুকুই কেবল নিত। কিন্তু সে যে আসে উত্তরা কি করে ঠিক টের পেত জানি না। তার দুচোখে বিদ্বেষের সঙ্গে তখন ঘৃণা ঠিকরোত। সঞ্জীব চলে গেলেই প্রতিবার সে দাদুর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াত, চোখের আগুনে তার মুখখানা ঝলসে দিয়ে ঠিকরে চলে যেত। ত্রিদিবনারায়ণ স্তব্ধ, উত্তরা বোবা, সারা বাড়িতে কবরের নিস্তব্ধতা। নৈঃশব্দ্যের সেই ভারে আমারই দম বন্ধ হয়ে আসত।

এখনও নিয়ম করে ঠাকুর ঘরে যান ত্রিদিবনারায়ণ। আমি আর সঞ্জীব থাকলে দুজনেই তাঁর সঙ্গে গিয়ে বসি। এখন আর ডাক নেই, আবাহন নেই, শুধুই বোবা আর্তি,

বোবা সমর্পণ। সেই নিঃশব্দ যাতনা সওয়া দেখে মনে হতো এর থেকে মানুষটার চলে যাওয়াই ভাল ছিল।

সে দিন আবার সেই তিথি, অমাবস্যার পঞ্চমী। রক্তাম্বর পরে ত্রিদিবনারায়ণ চুপচাপ ঠাকুরঘরে এসে বসলেন, পিছনে আমি, সঞ্জীব দরজার সামনে দাঁড়ান। প্রথমে বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলেন। তারপর একসময় খুব আস্তে ঠোঁট নড়তে লাগল। একটু একটু করে সেই ডাক সমস্ত সত্তা নিঙড়ে গলা বেয়ে উঠে আসতে লাগল। আর্তিতে ঘরের বাতাস কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকল।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসেছিলাম, হঠাৎ বিষম চমকে উঠলাম। দরজার কাছে সঞ্জীবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উত্তরা। দুর্বার ক্রোধে জ্বলছে। একবার আসনে বসা ত্রিদিবনারায়ণের দিকে, আরেক বার সামনে দাঁড়ানো সঞ্জীবের দিকে পাগলের মতো তাকাচ্ছে। কার ওপর আগে ঝাঁপিয়ে পড়বে ঠিক করতে পারছে না যেন। সঞ্জীব বিমূঢ়। আমি তাড়াতাড়ি উত্তরাকে ধরতে গেলে এক ঝটকায় সরে গিয়ে সঞ্জীবের প্রায় গায়ের ওপর এসে দাঁড়াল। চোখের হলকায় তার মুখ পুড়িয়ে গলা দিয়ে হিসহিসে আগুন ঢালল, 'কেন আসেন? এখনও কিসের আশায় আসেন? শকুনের শাপে গরু মরেছে, সেই লোভে আসেন?'

আমি হতবাক, সঞ্জীবের মুখ ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে, ত্রিদিবনারায়ণের ডাক থেমে গেছে। আসনের ওপরেই তিনি এ দিক ফিরে ঘুরে বসেছেন। উত্তরা এবার তাঁর দিকে ফিরল, ভেতরের অসহনীয় জ্বালায় গলার স্বর বিকৃত। চীৎকার করে বলল, 'শেষ হিসেব মিলেছে তো তোমার? খুব ভাল করে মিলেছে তো? ...উত্তরা নাম দিয়ে অকালে বৈধব্য আনালে, কিন্তু মহাভারতের উত্তরার মত আমার মরা ছেলে বাঁচাতে পারলে কি? এর পরেও তুমি কাকে ডাক? কোন মুখে কোন আশায় ডাক? লজ্জা করে না তোমার? লজ্জা করে না?'

উত্তরার চোখে চোখ রেখে ত্রিদিবনারায়ণ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। সমস্ত শরীর আবির গোলা লাল, দু চোখে জমাট রক্ত অল্প অল্প টলছেন। গলা দিয়ে বাজের চাপা গুড়গুড়ে আওয়াজ বেরুল, আমার এ হিসেবও মিলবে, এবার সময় হয়েছে। হয় তিনি দয়া করবেন, নয় এই শরীরটার রক্তে ওই শাঁখ ভিজবে। কোনটা তিনি বেছে নিলেন সে নির্দেশও আমি পাব...' সমস্ত শরীর থরথরিয়ে উঠল, আসনের ওপরেই লুটিয়ে পড়লেন ত্রিদিবনারায়ণ।

পরের দুটো দিন দুটো রাত ধরে জীবন-মৃত্যুর টানাপোড়েন। আমি এ দুদিন অনেক রাত্রে বাড়ি গেছি। সঞ্জীব তাও যায়নি, এখানে তাঁর ঘরেই ঠায় বসে থেকেছে। ত্রিদিবনারায়ণকে হাসপাতালে সরানো যায়নি, বাড়িতেই সব ব্যবস্থা করতে হয়েছে। উত্তরা যেন সাদা পাথরের মূর্তি একখানা। সচল মূর্তি। নিঃশব্দ সেবায় সচল। মুখে একটি কথা নেই, শুধু অবিরাম সেবা করে চলেছে। তিন দিনের দিন বিকেলের দিকে ত্রিদিবনারায়ণ তাকালেন, ঠোঁটে স্পষ্ট হাসির আভাস, কি বলতে গিয়েও আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। আরো চারটে দিন কাটল। ত্রিদিবনারায়ণ কথা বলেছেন, একটু একটু উঠে বসেছেন, ডাক্তার আবার ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। আট দিনের দিন সন্ধ্যের মুখে হঠাৎই

খাট ছেড়ে নামতে গেলেন। সবাই বাধা দিতে শান্ত মানুষটা কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বললেন, 'তিনি আসছেন, আজ কদিন ধরেই টের পাচ্ছি তিনি আসছেন। সামনে দেখেছি আরতি হচ্ছে, শঙ্খ ঘুরছে, জলে মেঝে ভাসছে—তবু আমাকে আটকাবে তোমরা? তবু আটকাবে?' ধস্তাধস্তি করেও তাঁকে কিছুতেই ধরে রাখতে পারছিলাম না।

'ছাড়ুন!' তীক্ষ্ণ গলার আওয়াজে চমকে ফিরে তাকালাম। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে উত্তরা, এত দিনের মধ্যে তার মুখে এই প্রথম কথা। এবার আগের চেয়ে নরম গলায় বলল, 'এই উত্তেজনায় আরো বেশি ক্ষতি হতে পারে, আমি খুব আস্তে আস্তে ধরে নিয়ে যাচ্ছি...'

সেই ঠাণ্ডা মুখের দিকে চেয়ে আমরা কিছু বলতে পারলাম না। সঞ্জীব আর আমি দুদিক থেকে ত্রিদিবনারায়ণকে জড়িয়ে ধরলাম। তাই দেখে উত্তরা আর কিছু না বলে আগে আগে চলল। সিঁড়ির কটা ধাপ সঞ্জীব আর আমি ত্রিদিবনারায়ণকে প্রায় আলগোছে তুলে ঠাকুরঘরের সামনে নামিয়ে দিলাম। দেওয়ালের হুক থেকে ঝোলানো চাবি নিয়ে দরজা খুলে উত্তরা নিজের এক হাতে দাদুর একটা হাত জড়িয়ে ধরে ঘরে ঢুকে সুইচ্ টিপে আলো জ্বালল। আলো জ্বলতে এক মুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে ত্রিদিবনারায়ণ চিৎকার করে উঠলেন, 'এ কি দেখছি! এ আমি কি দেখছি! উত্তরা, উত্তরা, আমি কি ঠিক দেখছি? তুইও কি কিছু দেখছিস? দেখতে পাচ্ছিস?' ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন।

উত্তরা তাঁকে দুহাতে জড়িয়ে রেখেছে, তারও সারা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম, মাথা নেড়ে বলতে চাইছে সে-ও দেখতে পেয়েছে। সঞ্জীব আর আমি একই সঙ্গে ভেতরে মুখ বাড়িয়েছি, তারপরেই আমার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে উঠল। রূপোর পরাত খালি! মঙ্গল-ঘটের সামনে শ্বেতপাথরের মেঝের সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়ে পঞ্চমুখী শ্বেতশঙ্খ উত্তরমুখে কাত হয়ে রয়েছে! পঞ্চমুখ ছাপিয়ে জলের ধারা মাটি ভিজিয়ে ঘটের গায়ে গিয়ে জমেছে!...আমরা হতবাক। ত্রিদিবনারায়ণকে দুহাতের বেড়ায় আগলে উত্তরা চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে। ত্রিদিবনারায়ণ আনন্দে হাসছেন আনন্দে কাঁদছেন।

এরপর দেড়টা মাস বড় আনন্দের বাচা বেঁচেছেন ত্রিদিবনারায়ণ। রোগব্যাধি কোথায় পালিয়েছে, আশ্চর্য তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি সেরে ওঠার পর এই দেড়মাস সঞ্জীব আসা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল। শেষ যে দিন এসেছিল, এ নিয়ে জিজ্ঞেস করতে বলেছিল, 'নিজেকে চিনতে আমার বাকি ছিল স্যার, উত্তরার সেদিনের কথাটা খুব মিথ্যে নয়।' আমাদের অবাক চাউনির জবাবে আস্তে করে বলেছিল, 'কারুর ক্ষতির সুযোগ নিয়ে নিজের থলি ভর্তি করব এত নীচ আমি নই, আর উত্তরার ক্ষতি তো কোনোদিন কল্পনাও করিনি। কিন্তু ওর এত বড় সর্বনাশই আমার ভেতরের কাঙালটাকে আবার আশা দেখিয়েছিল।' যন্ত্রণায় ছেলেটার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল, চকচকে চোখ দুটো বাষ্পে ভরে গিয়েছিল, ত্রিদিবনারায়ণের দিকে সোজা তাকিয়ে আবার বলেছিল, 'এ আমি বুঝেও বুঝতে চাইনি, আসলে মানতে চাইনি। কিন্তু উত্তরা ঠিক ধরেছিল।...এর পরেও কি আপনি আমাকে মানুষ বলে ভাববেন? আসতে বলবেন?'

আমরা স্তব্ধ। উত্তরার সে দিনের প্রতিটি কথা কানে বাজছে, 'কেন আসেন? এখনও কিসের আশায় আসেন? শকুনের শাপে গরু মরেছে, সেই লোভে আসেন?'...অপরিসীম স্নেহে আর মমতায় ত্রিদিবনারায়ণের দুচোখে জল চিকিয়ে উঠেছিল। বলেছিলেন, 'ওরে, তুই যে কি মাপের মানুষ, কত বড় মাপের মানুষ, তা তুই নিজেও জানিস না। যে কটা দিন আছি শুধু আমার জন্যেই আসিস।' এই প্রথম তুই করে বলা। আবেগে সঞ্জীবেরও গলার কাছটায় ডেলা পাকিয়ে উঠেছিল। কিন্তু এর পরেও খুবই কম এসেছে।

দেড়টা মাস প্রতিদিন ঠাকুরঘরে বসেছেন ত্রিদিবনারায়ণ। প্রত্যেকদিনই রূপোর পরাত খালি। মেঝেতে শঙ্খ উত্তরমুখে কাত হয়ে থাকত, জলে মেঝে ভিজে যেত। সেই জল তিনি মাথায় বুকে ছোঁয়াতেন, নাতনীর মাথায় দিতেন, তারপর রূপোর পরাতে শঙ্খ তুলে সোজা করে বসাতেন। কিন্তু পরের দিন আবার যে-কে সেই। পরাত শূন্য, শঙ্খ মেঝেতে পড়ে। তাই দেখে আনন্দের জোয়ারে ভাসতেন ত্রিদিবনারায়ণ। আমিও এর কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

কিন্তু তাঁর সেরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরার পরিবর্তন দেখে আমি চিন্তিত। সে আবার স্তব্ধতার কবরে সেঁধিয়েছে। ডাকলে চুপচাপ এসে দাঁড়ায়। স্তব্ধ কঠিন পাথর-মূর্তি। ত্রিদিবনারায়ণ যখন শঙ্খের জল তার মাথায় ছোঁয়ান তখন দুচোখ দিয়ে তাঁকে ভস্ম করে। আগুনের শিখার মতো দুর্বার রোষে জ্বলতে থাকে। ত্রিদিবনারায়ণ দেখেও দেখেন না, তাঁর সব চিন্তাভাবনা শেষ। নাতনীকে কাছে টেনে কত কি বলেন, সে টুঁ শব্দটিও করে না। কিন্তু ঘুরেফিরে সব কথা শেষ পর্যন্ত সেই বিশ্বাস আর সমর্পণের মোহনায় যেই আসে, তখনই জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গের মতো ছিটকে চলে যায়। ত্রিদিবনারায়ণ তাই দেখে হাসেন। তিনি তাঁর ইমোশনের জগতে বড় নিশ্চিন্তে আছেন। কিন্তু আমি উত্তরার জ্বালা বুঝি, হতাশা বুঝি। ও ভাবে রোজ শঙ্খ নড়া আর জল পড়া আমার কাছেও এখন বিচিত্র বিস্ময়। কিন্তু এই অলৌকিক ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও উত্তরার জীবনে এতদিনেও কিছু ঘটল না, তার জগৎ সেই এক জায়গায় থেমে রইল, বজতের কোন খবর মিলল না। দেড় মাসের প্রতিটা দিন মেয়েটা কোন অলৌকিক খবরের আশায় ভেতরে ভেতরে উন্মুখ হয়েছে আর প্রত্যেক দিনই কোন আশাভঙ্গের জ্বালায় জ্বলছে অনুভব করতে পারি। এ বয়সের ভরভরতি এমন সুন্দর মেয়ে! তার জীবনে আর রইল কি?

কিন্তু আমি শুধু অবাক হয়ে ত্রিদিবনারায়ণের জোর দেখছি। তাঁর আনন্দের জোর, বিশ্বাসের জোর, শান্তির জোর আর সমর্পণের জোর। উত্তরার কথা তুললেই বলেন, 'কিচ্ছু ভেবো না, এবার সময় হয়েছে, সব ঠিক হয়ে যাবে।' তাঁকে দেখে আমারও বিশ্বাস করতে মন চাইছে সত্যিই সব ঠিক হয়ে যাবে। সত্যিই কেউ এসে এ বংশের অকালমৃত্যুর অভিশাপ ঘুচাবে। কিন্তু কেমন করে আসবে, কে আসবে? বা কি ভাবে আসবে? জানি না। ত্রিদিবনারায়ণকে জিগেস করতে বলেছিলেন, তিনিও জানেন না, আর জানতে চানও না। কারণ, নিখাদ বিশ্বাস আর নিঃশর্ত সমর্পণে কোনো কিছু জানতে চাওয়ার অধিকার নেই।

তারপর গত রাতে সেই আশ্চর্য বিদায়-সম্ভাষণ আর আজ ভোরে এই মহাযাত্রা।

দেহ নামিয়ে ঠাকুরঘরের সামনে রাখা হল। এখনো উত্তরার সেই স্তব্ধ কঠিন মূর্তি। ঠাকুরঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল, চোখ দিয়েই যেন আমাকে টেনে ভেতরে নিয়ে গেল। পঞ্চমুখী শঙ্খ আজও কাত হয়ে পড়ে, জলে মেঝে এখনো ভিজে। উত্তরা সোজা সেই শাঁখ তুলে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল, 'এটার আর দরকার নেই, দাদুর সঙ্গে দিয়ে দিন।'

আমি হতভম্বের মত বলে উঠলাম, 'উত্তরা, তোমার কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে? ওনার এত বিশ্বাসের, এত আশার জিনিস...'

আমাকে কথা শেষ করতে দিল না উত্তরা, ঝলসে উঠল, 'ওনার বিশ্বাসের আর আশার জিনিস ওনার সঙ্গেই যাক—আমার এতে কোন বিশ্বাস নেই কোনো আশা নেই কোনো প্রয়োজনও নেই—'

এই হতাশাই তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে জানি। এবার বোঝানোর মতো করে বললাম, 'উত্তরা, আমার কথা শোন, বংশের জিনিস এ ভাবে ফেলে দিতে নেই, শুধু একটু ধৈর্য রাখ, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ক্রোধের এমন জ্বলন্ত মূর্তি আমি আর কখনো দেখিনি। আমার কথা কটা শোনামাত্র উত্তরার কপাল থেকে পা পর্যন্ত তপতপে লাল হয়ে উঠল, চোখের সাদা ভাগে পর্যন্ত রক্ত জমাট বাঁধল। সাপের ছোবলের মতো হিসহিসে স্বরে উত্তরা বলে উঠল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে? কেন? এই শাঁখ নড়েছে আর জল পড়েছে বলে?' বিকারগ্রস্তের মতো হেসে উঠল, 'এ সব আমি করেছি, আমি। এই দেড় মাস ধরে প্রত্যেক দিন। কারণ, দাদুকে আমি দয়া করতে চেয়েছি, তাঁর বিশ্বাস আর সমর্পণ নিয়ে শেষ বয়সে তাকে শান্তিতে যেতে দিতে চেয়েছি, তাই দয়া করে তাকে ধোঁকা দিয়েছি—'

আমি স্তব্ধ। খানিক পরে খুব স্পষ্ট করে বললাম, 'জানি। তোমার দাদু কাল আমাকে সব বলেছেন। তিনি গোড়া থেকেই সবকিছু জানতেন।'

জ্বলন্ত আগুনে আচমকা জলের বিশাল ঝাপটা পড়ল যেন। আমার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে উত্তরা, হাতে শঙ্খ তেমনি ধরা। চরম আঘাত পাবে জেনেই বললাম, 'দয়া তাঁকে তুমি করনি উত্তরা, দয়া তিনি তোমাকে করে গেছেন। প্রথম দিনের পর থেকেই তিনি সব বুঝেছিলেন। তবু তাঁর বিশ্বাস আর সমর্পণ এতটুকু চিড় খায়নি। তিনি বলেছিলেন, এখন তোমার হাত দিয়ে এ ভাবেই শঙ্খ নড়ার কথা ছিল, এত কাল পরে তোমার হাত দিয়েই এ ভাবে মাটি ভেজার কথা ছিল, নয়তো এত দিন এভাবেই কেউ নাড়ায়নি কেন?' উত্তরা তেমনি ফ্যালফ্যাল করে চেয়েই আছে। আবারো বললাম, 'তোমার দাদুর বদ্ধ ধারণা, যুগযুগের অভিশাপ আর অমঙ্গল ঘুচিয়ে এবার কেউ আসবেন, সে সূচনা তিনিই এভাবে তোমার হাত দিয়ে করিয়েছেন। নিজের বিশ্বাস আর সমর্পণে ভরপুর হয়েই তিনি গেছেন, ধোঁকা তাঁকে তুমি কোনদিনই দিতে পার নি—'

যে রক্তকণার উন্মত্ত দাপাদাপিতে উত্তরার সমস্ত শরীর আবির গোলা লাল হয়ে

উঠেছিল, এ কথা শোনার পর সেই রক্তস্রোত ঝলকে ঝলকে সড়সড়িয়ে তার পায়ের দিকে নামতে লাগল। টকটকে মূর্তি নিমেষে অস্বাভাবিক সাদা। ফের বললাম, 'মরা মরা বলতে বলতে বাল্মীকির মুখে রামনাম এসেছিল না? তোমার দাদুর বিশ্বাস, এরকম করতে করতেই ঠিক সেভাবে তোমার ভেতরেও একদিন সেই নিখাদ বিশ্বাস আর নিঃশর্ত সমর্পণ আসবে। আর সেই পথ ধরেই কেউ আসবেন। নিশ্চয় আসবেন।'

ভাল করে দাঁড়াতেও পারছে না উত্তরা আর। টলছে অল্প অল্প। কিন্তু যা বলার এখনই বলতে হবে।

—'তোমার দাদু আরো একটা কথা বলে গেছেন। বলেছেন, রজত সত্যিই তোমার নয় বলেই এভাবে হারিয়ে গেল। কিন্তু এখনও কিছু ঘটার বাকি। তাঁর দৃঢ় ধারণা, এবার যা ঘটবে তা শুধু তোমারই মঙ্গলের জন্য। তিনিও সেই আশীর্বাদই করে গেছেন।'

এক অননুভূত আবেগের ঢেউ উত্তরার মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে গেল, শক্ত মুঠোয় ধরা শাঁখ বুকের মধ্যে চেপে ধরল, সারা শরীর তোলপাড় করে সেই ঢেউ আবার ওই দেহতটেই স্থির হলো। ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে পায়ে পায়ে দাদুর দিকে এগুতে গিয়েও থমকাল একটু। সঞ্জীব সেখানে দাঁড়িয়ে। তার দিকেই চেয়ে আছে। চেয়ে রইল উত্তরাও, আশ্চর্য নরম সে চাউনি। দেখতে দেখতে অতল কালো দুচোখে মেঘ ঘনিয়ে এল।

দাদুর দু পা বুকে আঁকড়ে উত্তরা অঝোরে কাঁদছে। এই প্রথম কাঁদছে। এতদিন তার চোখে শুধু আগুন দেখেছি, আজ প্রথম জল দেখলাম। আগুন-গলা তপ্ত চোখের জলে ত্রিদিবনারায়ণের দু পা ভিজতে লাগল।

কিন্তু এ আমি কি করলাম? ত্রিদিবনারায়ণের নাম করে ঠাকুরঘরে দাঁড়িয়ে উত্তরাকে যা যা বললাম তা কোনদিনও তিনি আমায় বলেননি। ওই ঘরে ঢোকার মুহূর্তেও জানতাম না আমার মুখ দিয়ে এ কথাগুলো বেরুবে। উত্তরার কথায় প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছিলাম, কিন্তু সব জানার পরেও আর এক অদ্ভুত বিশ্বাস সেই মুহূর্তে আমার ভেতরে দানা বেঁধে উঠেছিল। ভেতর থেকে কেউ বলে উঠেছিল, যে দুর্লভ বিশ্বাসে আর সমর্পণে ভরপুর হয়ে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন ত্রিদিবনারায়ণ, এ যুগে সেটাই অলৌকিক, এর শেষ এ ভাবে হবার নয়। আচার্য্যি-চৌধুরী আর রায় বংশের যুগযুগ আহুতির এমন নিষ্ফলা পরিণাম হতে পারে না। শেষ বীজটির থেকেই আবারও সব শুরু হবে। এই বিশ্বাসের জোরই আমাকে দিয়ে যা বলার বলিয়েছে।

কিন্তু আমার বিস্ময়ের কারণ অন্য—ওই বিশ্বাস আমার মধ্যে কেন এলো? কি করে এলো? ওই জোর আমি পেলাম কোথায়? এখনও কেন ভেতর থেকে কেউ বলছে, কোনো মিথ্যাচার হয়নি, এর একটি কথাও ভুল নয়!

দুচোখ শিরশির করে গলার কাছে ডেলা পাকিয়ে উঠতে লাগল। সামনে শয়ান মহাযাত্রীর দিকে তাকালাম। তাঁর অর্ধনিমীলিত চোখে হাসি, ঠোঁটে হাসি। যেন বলছেন, ঠিক ওই কথাগুলোই উত্তরাকে তাঁর বলা বাকি ছিল।

# তিনপুরুষ

রঞ্জন ও বুলবুলকে

গ্রামের নাম বাহারী।

কিন্তু গ্রাম বললে খুব কম বলা হবে। আবার শহর বললে তেমনি বেশি বলা হবে। বাহারী বেশ ধীর বিলম্বিত লয়ে শহরের দিকে এগোচ্ছে। আর সে তুলনায় আট ন' মাইল দূরের শহর আর একটু দ্রুত তালে বাহারীর দিকে আসছে। মাঝখানের জি টি রোড বেশ বড়সড় একটা দাগ টেনে এদের পৃথক সত্তা বজায় রেখেছে। ওই পর্যন্ত এসে বাহারীর গতি থেমে গেছে। শহরের ঢেউ আর নিজের স্বভাব-যৌবনে বাহারী আরো অসহিষ্ণু, আরো উচ্ছল। বাধা পেয়ে সে ওইখানে এসে আছড়ে পড়ছে। বাহারীর গায়ে ঝাপটা মারছে। তার ফলে বাহারীর কিছু কিছু সাজ-বদল হচ্ছে বটে, ছোট বড় দালান-কোঠা গজিয়েছে বেশ কয়েকটা। আরো কয়েকটার মাথা তুলে দাঁড়ানোর তোড়জোড় চলছে। ইলেকট্রিক এসে গেছে বহু ঘরেই। সেদিক থেকে দেখলে শহরের সাজে বাহারীর খুব অরুচি আছে এমন বলা যাবে না।

এদিক থেকে সোমেশ্বর চাটুজ্জের বিচার-বিবেচনা অন্যরকম। সমৃদ্ধি কে না চায়? সৌষ্ঠব, সুচারুতর হোক কে না চায়? কেবল প্রাণটুকু বিকিয়ে দিও না। তাহলেই হল। তাঁর মতে বাহারী বাহারীই আছে, বাহারীই থেকে যাচ্ছে। কম করে বিশ বছর যাবৎ তিনি দেখে যাচ্ছেন। শহরের ছোঁয়া পেয়ে বাহারীর নিভৃত যৌবনের রঙ্গতরঙ্গ উচ্ছল হচ্ছে, দোল খাচ্ছে। উজ্জ্বল হচ্ছে। তা বলে শহরের পায়ে বাহারীর প্রাণ বিকোয়নি। বাহারীর গা ছুঁয়ে জি টি রোড বড়সড় একটা চাদোয়া বাঁক নিয়ে শহরের সঙ্গে বাহারীর বিচ্ছেদ পাকাপোক্ত করে রেখেছে।

সোমেশ্বর চাটুজ্জের বাইরের চেহারা দেখে ভিতরের রসের দিকটা আঁচ করাও শক্ত। তাঁর ভিতর-বার আয়নার মতো স্বচ্ছ তকতকে ভাবে সকলে। ভুল ভাবে না। কিন্তু রসের উৎসটুকু প্রচ্ছন্ন। খুব কাছের দু'চারজন কেবল সে-খবর ভালো রাখে। একবার মানুষটার উপমার বহর দেখে তো দাদার সামনে এই বয়সেও বাসন্তী লজ্জায় টুকটুকে লাল হয়ে উঠেছিলেন! অথচ উপমার বিন্দুবিসর্গ তখন পর্যন্ত মাথায় ঢোকেনি। ..কলকাতা থেকে দাদাকে নিয়ে তিনজনে আসানসোলে নেমেছিলেন। সেখান থেকে আবার ট্রেনে আর পরে সাইকেল রিকশায় বাহারীতে আসা যেত। কিন্তু ঘরের লোকের তার থেকে বাস পছন্দ। ছাদে মাল বয় আর ভিতরে যাত্রী—এমন বাস এই জি টি রোড ধরে হামেশা যাতায়াত করে। জি টি রোডের চাঁদোয়া বাঁকের স্টপে নামলে উল্টো দিকে বাহারী। সেখান থেকে বাড়ি তিন-পো মাইল পথ। সঙ্গে নিজেদের একটা বড় আর দাদার একটা মাঝারি সুটকেস ছিল। সেই কারণে বাসন্তী দেবীর ট্রেনে আসার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সোমেশ্বর সে প্রস্তাব এক কথায় নাকচ করে দিয়েছিলেন।—দূর, ও-দুটো সুটকেস দু'হাতে তুলে জি টি রোড থেকে আমি একলাই গটগট করে বাড়ি চলে যেতে পারব। তাছাড়া রাস্তায় কত ছেলেছোকরা আছে, দেখলেই কেড়ে নিয়ে ঘরে পৌঁছে দেবে।

...সেই তখন। স্বামীর কথার আক্ষরিক অর্থ মাথায় না ঢুকলেও বাসন্তী দেবীর সমস্ত মুখ রাঙিয়ে উঠেছিল। চাঁদোয়া বাঁকে নেমে একটা সুটকেস হাতে সোমেশ্বর রাস্তাটা পার হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন! বাসন্তী দেবীর দাদা পিনাকী চক্রবর্তী নিজের সুটকেস আর

ভগ্নীপতির হাতে গছাননি। সুটকেস দাদাকে বইতে হচ্ছিল বলে বাসন্তী রাগ করতে করতে তাঁর পাশাপাশি রাস্তা পার হয়ে এসেছিলেন। সোমেশ্বরের দু'চোখ তখনো জি টি রোডের বাঁকের ওধারে অর্থাৎ শহরের দিকে। স্ত্রীর সঙ্গে বড় সম্বন্ধী এসে দাঁড়াতেই চোখ না ফিরিয়ে উদাত্ত গম্ভীর স্বরে বলে উঠেছিলেন, বোল্ড্ লাভার, নেভার নেভার ক্যানস্ট দাও কিস্ বাহারী...ফরএভার উইল্ট্ দাও লাভ, অ্যান্ড সী বি ফেয়ার!

দাদা কলকাতায় এক বে-সরকারী কলেজের ইংরেজির মাস্টার। তিনিও প্রথমে একটু থমকে পরে হা-হা শব্দে হেসে উঠে ভগ্নীপতির পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাসন্তীর কানে শুধু 'লাভার' আর 'কিস্' শব্দ দুটোই ধরা পড়েছিল, আর কিছুর তাৎপর্য বোঝেননি। তাইতেই বিষম লজ্জায় মুখের রঙ বদল হয়েছিল।

পরে নিরিবিলিতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, দাদার সামনে তখন ইংরেজিতে যাচ্ছেতাই ও-সব কি বলছিলে?

সোমেশ্বর তক্ষুণি বুঝেছেন। কিন্তু অবাক মুখ।—যাচ্ছেতাই আবার কখন কি বললাম?

—বাস থেকে নেমে জি টি রোডের এ-ধারে এসে তুমি ইংরেজিতে কি বললে না? দাদা হেসে উঠল—

কোন্ দুটো শব্দ স্ত্রীর কানে যাচ্ছেতাই তা-ও অনুমান করতে সময় লাগেনি। সোমেশ্বরের মুখখানা বরাবরকার মতোই হাসিছোঁয়া গম্ভীর। —কোনটা যাচ্ছেতাই কথা, লাভার না কিস্?

—যাও! বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে!

বুড়ো বয়েস বলতে কম করে আরো পাঁচ বছর আগের কথা। সোমেশ্বরের বয়স তখন পঞ্চাশ, বাসন্তীর একচল্লিশ। মুখের কপট গাম্ভীর্য আরো একটু আঁট করে নিতে চেষ্টা করে সোমেশ্বর জবাব দিয়েছেন, ও দুটোর বয়সের কোনো গাছ-পাথর নেই—ইংরেজি একটা অমর কবিতা থেকে দুটো লাইন তুলে আমাদের বাহারীর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলাম —আর তাই শুনে তোমার ইংরেজিনবীশ দাদা পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়েছেন।

—কি কবিতা আমি শুনব। এই স্বামীটির প্রতি বাসন্তীর যত শ্রদ্ধা, তাঁকে নিয়ে তত কৌতূহল। আর এই একজনের কাছেই তাঁর শিখতে বা জানতে লজ্জা নেই।

হাসি মুখেই সোমেশ্বর জবাব দিয়েছেন,—কবিতার নাম, ওড্ অন্ এ গ্রাসিয়ান আরন্ —কবির নাম জন্ কীট্স। গ্রীস দেশের একটা...কি বলবে, মাটির ভাস বলতে পারো...তাতে একটা নক্সা আঁকা ছিল, প্রেমিকা ছুটছে আর তাকে ধরার জন্য তার প্রেমিক পিছু ধাওয়া করেছে। তাই দেখে কবি বলছেন, চিরকাল ওমনি থাকতে হবে...প্রেমিক কোনদিন প্রেমিকাকে ধরতে ছুঁতে পারবে না। জি টি রোডের বাঁক পেরিয়ে আমিও তেমনি শহরকে বললাম, যতই ছোটাছুটি করো—আমাদের বাহারীকে কোনদিন ধরতে ছুঁতে পারবে না।

শোনার পরেও বাসন্তী লজ্জা কম পাচ্ছিলেন না। কিন্তু কথাগুলো কানে লেগে ছিল। তাঁর বরাবরই ধারণা বাহারীকে এত ভালো এই গ্রামে আর কেউ বাসে না। আকাশ বাতাস জল ইট মাটি পশু পাখি আর মানুষ নিয়ে যে বাহারী—সে এই মানুষের প্রাণ।

গ্রামের বাসিন্দাদের অবস্থা বা ভাগ্যবদলের সঙ্গে তাল রেখে বাহারীর বাইরের সাজবদল আর রংবদল যে কিছু কিছু ঘটেই যাচ্ছে সেটা সকলের চোখেই পড়ে। সোমেশ্বরের নিজের এই বাড়িঘরের কথাই ধরা যাক না। এখানকার জমিজমা সব বাবার আমলের। তার আগে এই বাহারীর সঙ্গে নাড়ির যোগও ছিল না সোমেশ্বরের। ছোট্ট একটু জায়গার মধ্যে চালা ঘর আর ছনের ঘর তুলে যখন এখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই করা হয়, তখন তার বয়েস মাত্র পনের। তার আগে বাস ছিল খয়রা গ্রামে। বাবা বলতেন খয়রা নয়, ক্ষয়রা। ক্ষয়ের রাহুতে পেয়ে বসেছে। সব নিশ্চিহ্ন হল বলে।

তাই হয়েছে। খয়রার আর চিহ্নও নেই। গোটা গ্রামখানা অজয়ের জঠরে চলে গেছে। সোমেশ্বরের বাবা সিদ্ধেশ্বর আগে থাকতে প্রস্তুত ছিলেন বলে বিপাকে পড়তে হয়নি। বাবার কথা মনে হলে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে ভিতরটা ভরে যায় সোমেশ্বরের। মনে তো রোজই হয়। এখনো দামোদরের বুক-জলে দাঁড়িয়ে স্নান-তর্পণের পরে বাবার উদ্দেশেও শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়াটা সোমেশ্বরের নৈমিত্তিক ব্যাপার।

হৃদয়ের অর্ঘ্য হৃদয় থেকেই দেন। তাঁর প্রতিদিনের প্রার্থনা, এমন কিছু যেন করি না যাতে আপনার মুখ উজ্জ্বল হবে না।

এত শ্রদ্ধাভক্তির মূলে বাবার পুরুষের তেজ। বাবা সিদ্ধেশ্বর চাটুজ্জে। দশখানা গাঁয়ের লোক তাঁকে তেজ-সিদ্ধ পুরুষ ভাবত। ঠাকুরদাও শুদ্ধচিত্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। ভালো সংস্কৃত জানতেন। কিন্তু বড় ঘরের সঙ্গে সম্পর্ক করার লোভ ছিল তাঁর। ছেলের জন্যে বড় ঘরের মেয়ে এনেছিলেন। ঠাকুরদার চারটে মেয়ের মাঝে ওই বাবাই একমাত্র ছেলে। মেয়েদের ভালো ঘরে বিয়ে দিতে গিয়ে ঠাকুরদা বলতে গেলে সর্বস্বান্ত। তাঁর একমাত্র ভরসা ছেলে। এই ছেলেকে দিয়েই আবাব সব হবে এমন আশা অনেক দিনের। কিন্তু সব হবার রাস্তাটাই ঠাকুরদা ঠিক বেছে নেননি।

আর ভুল হয়েছিল সোমেশ্বরের দাদামশায়েরও।

দাদামশাই গগন চৌধুরী।

নিজেকে কালিকাপুরের পুরুষসিংহ ভাবতেন ভদ্রলোক। বহু জমি-জমা। সেই দিনে চকমিলানো দালান-কোঠা তাঁর। আশেপাশের গাঁয়ের মানুষেরাও তাঁর বশ। দাদামশায়ের বদান্যতা যেমন, রোষও তেমনি। ঢেলে দিতে পারেন। সর্বস্ব কেড়ে নিতেও পারেন। দাদামশায়ের দুই বিয়ে ছিল। দু'পক্ষ মিলিয়ে ছেলে অনেকগুলি। মেয়ে একটি। সকলের চোখের মণি। তাঁকে সুরূপা ঠিক বলা যাবে না। সুলক্ষণা বটে। রূপ না থাক কমনীয় শ্রী ছিল সোমেশ্বরের মায়ের। সুখের ঘরে সেটুকুও রূপের সামিল।

এই একমাত্র মেয়ের সম্পর্কে দাদামশায়ের হিসেবটা অন্যরকম ছিল। সেই হিসেব মতোই তিনি এগিয়েছেন। ছেলের জন্য ঠাকুরদা বড় ঘরের মেয়ে চেয়েছিলেন। আর মেয়ের জন্য দাদামশায় তেমনি গরীব ঘরের শিক্ষিত সুপুরুষ ছেলে চেয়েছিলেন। দু'জনেরই চাওয়াটা মিলেছিল। অল্প বয়সেই বাবার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছোট্ট খয়রা গ্রাম ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়েছিল। টোলের নামী পণ্ডিতরা বাবাকে বলতেন রত্ন। এই রত্নের প্রতি দাদামশায়ের চোখ ছিল। ঠাকুরদাকে জানতেন। কালিকাপুরে তাঁর যজমানির পসারের মূলে দাদামশায়। কিন্তু এমন ঘরের একমাত্র মেয়েকে নিজের ঘরে আনার বাসনা কোনদিনই হয়তো মুখ ফুটে ঠাকুরদা ব্যক্ত করতে পারতেন না। মনে

রাখার মতো একটা ঘটনার পরে ব্যক্ত দাদামশাই-ই করেছিলেন। ঠাকুরদা হাতে চাঁদ পেয়েছিলেন।

এ-সবই সোমেশ্বরের ঠাকুরদার নিজের মুখে শোনা। তাঁর নিজের বয়স তখন বছর বারো। কিন্তু তখনই বাবার গর্বে সোমেশ্বরের বুকের ভেতরটা ফুলে উঠত। বাবা সিদ্ধেশ্বরকে তখন থেকেই তিনিও সিদ্ধপুরুষ ভাবতেন।

...ঘটনাটা এই রকম। অল্প বয়সে এত পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েও সিদ্ধেশ্বর চাটুজ্জে টোল খুলে বসেননি, কোনো স্কুলে চাকরিতে ঢোকেননি, দরিদ্র বাপের মুখ চেয়ে যজমানির দিকেও পা বাড়াননি। তাঁর একমাত্র নেশা জায়গায়-জায়গায় গিয়ে শাস্ত্র আলোচনা করা —গ্রাম-গ্রামান্তরে তর্কসভা আর বিচারসভায় যোগ দেওয়া। এই নেশা যেমন বাড়ছিল, তাঁর টহলদারির পরিধিও তেমনি বেড়ে চলেছিল। কখনো নবদ্বীপ, কখনো নদীয়া, কখনো বা মুর্শিদাবাদ চলে যান। যাতায়াতের গাড়িভাড়া বা রাহাখরচও সব সময় পকেটে থাকত না। এ-সব সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপও ছিল না। প্রয়োজনে দশ-বিশ মাইল অনায়াসে হেঁটে চলে যেতেন, চেনা-অচেনা লোকের গরুর গাড়িতে উঠে বসতেন, কোথায় আশ্রয় পাবেন না পাবেন তা নিয়েও মাথা ঘামাতেন না। কাঁধে চিঁড়ে গুড়ের ঝোলা থাকত, দুশ্চিন্তার কি আছে ?

একবার বাবা ডাকাতের খপ্পরে পড়েছিলেন। তারা শুধিয়েছিল, ঠাকুর যাচ্ছ না আসছ ?

এ-রকম প্রশ্নের তাৎপর্য আছে। অর্থাৎ যজমানি সেরে আসছে না যজমানি করতে যাচ্ছে। সেরে আসা মানেই পকেটে টাকাকড়ি থাকা। সিদ্ধেশ্বর জবাব দিয়েছিলেন—যাচ্ছিও, আসছিও।

এমন জবাবের একটাই অর্থ মাথায় এলো তাদের। অর্থাৎ এক জায়গায় যজমানি সেরে অন্য জায়গায় আরো প্রাপ্তির আশায় চলেছে। তারা হুমকি দিয়েছে, তা হলে যা আছে ঝেড়েঝুড়ে দিয়ে যাও!

সিদ্ধেশ্বর নির্লিপ্ত জবাব দিয়েছেন, আছে তো পৃথিবীর সব থেকে সেরা ধন—তোমাদের কাজে লাগে তো নিয়ে নাও।

এমন নিস্পৃহতা দেখে আর জবাব শুনে ডাকাতরাও অবাক একটু।—কি আছে?

নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে সিদ্ধেশ্বর জবাব দিয়েছেন, সেটা এখানে। প্রাণ।

কতই বা বয়েস তখন। বড় জোর বাইশ। ডাকাতরা হাতড়ে দেখল, চিঁড়ে গুড় আর দেড়টি টাকা ছাড়া আর কিছুই নেই বটে। কাঁচা বয়সের রসিকতা ভেবে ডাকাতদের একজনের উগ্র মূর্তি। সে হুমকি দিয়ে বলল, অমন সেরা ধন বুকের তলায় নিয়ে বেরিয়েছ—সেটা যদি এখন যায় ?

সিদ্ধেশ্বরের মুখে একগাল হাসি।—সেটা চিরকাল আগলে রাখতে পারি এমন সিন্দুকের খবর দিতে পারো দাদা ভাইরা ?

সেই রাতে জোর করে তাঁকে নিজেদের আশ্রয়ে রেখেছিল ডাকাতেরা। ফলার করিয়েছিল। ভোরে সসম্মানে বিদায় দিয়েছিল।

সেবারে সেই প্রথম নবদ্বীপের এক তর্কসভায় যোগ দেবার আমন্ত্রণ পেলেন সিদ্ধেশ্বর চাটুজ্জে। এর আগে পর্যন্ত যেখানে যেতেন নিজের তাগিদে যেতেন। শিখতে

যেতেন। বুঝতে যেতেন। কারো ব্যাখ্যা মনে না ধরলে নিঃসংকোচে প্রশ্ন তুলতেন। ছ'মাস আগে নবদ্বীপের এমনি এক তর্কসভায় উপস্থিত ছিলেন তিনি। সেখানকার এক স্থানীয় পণ্ডিতের আতিথ্য নিয়েছিলেন।...একদিনের বিচারের বিষয় ছিল, 'অভাব'। এই অভাব অর্থ অনুপলব্ধি। অর্থাৎ জীবের আসল উপলব্ধি বস্তুটি আছে কি নেই। ন্যায়দর্শন বলেন আছে, সাংখ্যদর্শন বলেন নেই। এই নিয়ে বিচার। তর্কে তর্কে বেশির ভাগ পণ্ডিতেরা সাংখ্যর দিকে ভিড়লেন। সিদ্ধেশ্বর একাগ্রচিত্ত হয়ে শুনছিলেন। নিষ্পত্তির মুখে তর্কের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন হঠাৎ। ঘোষণা করলেন জীব-মাত্রেরই পরম উপলব্ধি আছে। বহু দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি দেখালেন, যেটা নেই সেটা গোচরের উপলব্ধি। যা আছে সেটা অগোচরের উপলব্ধি। আত্মরক্ষার ভিতর দিয়ে জীব-মাত্রেরই সেই অগোচরের উপলব্ধি থেকে গোচরের উপলব্ধির দিকে যাত্রা। মানুষ তার জীবন-কাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে এই যাত্রার শেষ দেখতে পাচ্ছে না বলেই তার মনে প্রশ্ন। কিন্তু উপলব্ধি না থাকলে এই প্রশ্নই বা তার মনে আসে কি করে?

বিতর্কে অনুকূল নিষ্পত্তি কিছু হয়নি বটে, কিন্তু এ-সব সভার যা প্রাণ—সেটুকু জমে উঠেছিল। এই নবীন তার্কিকের দিকে অনেকের চোখ গেছল। ছ'মাস বাদে সেখান থেকেই আমন্ত্রণ। যে স্থানীয় পণ্ডিতের আতিথ্যে ছিলেন, তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, পথের খরচ পাঠিয়ে দিয়েছেন। নবদ্বীপে দেশ-বিদেশের পণ্ডিতদের বৃহৎ সমাবেশ ঘটতে চলেছে। মস্ত সভা বসবে। সেখানে এমন সম্মানের ডাক পড়তে পারে সিদ্ধেশ্বর ভাবেননি।

সেই আমন্ত্রণের সংবাদ বর্ধমানের সমস্ত পণ্ডিতমহলে ছড়িয়েছে। পরের ফলাফলের খবরও তেমনি চমকপ্রদ। বিতর্কসভায় যে বিষয়বস্তু তাঁকে দুর্লভ সম্মান এনে দিয়েছিল, তার বৈচিত্র্যও কম নয়। এর আগে অন্যান্য তর্কের বিষয়েও তিনি যোগ দিয়েছেন, কিন্তু তাতে তাঁর প্রতিভার স্ফুলিঙ্গই একটু-আধটু দেখা গেছল শুধু। এই বিতর্কে সামগ্রিক চমক দেখা গেল।

তর্কের বিষয়, 'বৈধহিংসায়া অনর্থঃ অস্তি ন বা?' বৈধ হিংসায় পাপ আছে কি নেই?

কর্মমীমাংসা দর্শনের প্রবক্তা মহর্ষি জৈমিনি বলেছেন, পাপ নেই। বিরুদ্ধবাদী সাংখ্য আর বেদান্ত। এই মতে পাপ আছে। তাই নিয়ে বিচার। আর বিচারে তর্কের ঝড়। এ-সব বিচারের রীতিই হল কেউ মাঝের রাস্তা দেখান না। সকলেই কোনো একটা স্থির অভ্রান্ত সন্ধানে পৌঁছতে চান। নানা উপমা আর দৃষ্টান্ত দিয়ে কেউ জৈমিনি ধরে আছেন, কেউ বা সাংখ্য, বেদান্ত।

এই তর্কঝড়ের মধ্যে এক বিপরীত ভূমিকায় দাঁড়ালেন সিদ্ধেশ্বর। তিনি বললেন, জৈমিনি ভ্রান্ত নন, অভ্রান্তও। নিষ্পাপ শিশুও আগুনে হাত বাড়ালে অগ্নি তার বিধিগত নিয়মে তাকে দগ্ধ করবে। এই বৈধহিংসার কারণে অগ্নিকে কেউ পাপের ভাগী করবে না। কিন্তু মানুষের গড়া বিধিপ্রকরণে জ্ঞান বা অজ্ঞতার যোগ থাকা স্বাভাবিক। একদিন মৃত স্বামীর চিতায় জীবন্ত সতীকে ঠেলে দেওয়া পুণ্যের কাজ ছিল। অথচ সেটাই পাপ এবং শাস্তিযোগ্য। একদিন যেটা পুণ্য আর একদিন সেটাই পাপ—এ কেমন করে হয়? এদিক থেকে জৈমিনিকে অভ্রান্ত বলা সম্ভব কি করে? বিধিগত করে নিলেই কি হিংসার ছাড়পত্র মিলতে পারে? আবার অন্যদিকে বেদান্ত বলছেন, মা হিংসাৎ সর্বা ভূতানি

—কাউকে হিংসা করবে না, বধ করবে না—করলে পাপ। কিন্তু সেই বেদান্তই আবার বলছেন, অগ্নিষোমীয়ং পশুম্ আলভেত—অগ্নি ও সোমদেবতার (চন্দ্রের) উদ্দেশ্যে যজ্ঞে পশুবলি বিধেয়। এই দুয়ের মধ্যে তাহলে সংগতি কোথায়? যজ্ঞ মানে যদি আত্মার ঊর্ধ্বগতি কামনা, সেই কামনা নিয়ে পশুবধ বিধেয় হয় কেমন করে?

এই বিতর্ক থেকে যে মাঝের সিদ্ধান্তে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি সেটুকুই অভিনব। বলেছিলেন, জন্মলগ্নেই মানুষ হিংসার দাস। তার শ্বাসপ্রশ্বাসে কত জীবাণুর ধ্বংস। বৎসবঞ্চিত গাভীর দুগ্ধামৃতে অতিবড় অহিংসকেরও জীবনধারণ। শাস্ত্রমতে প্রকৃতিজাত ফুল ফসলেরও প্রাণের দাবী স্বীকৃত—জীবনধারণের সঙ্গে সেই প্রাণ হননের যোগ। তাই একমাত্র যে হিংসায় প্রাণপুরুষের বিবেক আহত হবার কথা, কিন্তু লোভে বা স্বার্থে তা হয় না—সেটাই হিংসা আর তাইতেই পাপ। তা ভিন্ন হিংসা নেই। পাপ নেই।

জয়ের ডালি মাথায় করে ফিরেছিলেন সিদ্ধেশ্বর এমন নয়। সভায় এই নিয়ে তুমুল তর্কের ঝড় উঠেছিল। সিদ্ধেশ্বর তারও জবাব দিয়েছেন। আর তাইতে সংস্কারশূন্য চেতনার একটা বড় আলোড়ন তিনি আনতে পেরেছিলেন।

নিজের বসত গ্রাম বা আশপাশের গ্রামে নয়। সমস্ত বর্ধমান জেলায় এই তর্কসভার খবর পৌঁছে গেছল। দূরদূরান্ত থেকে ন্যায়াধীশ পণ্ডিতরা বাড়িতে এসে তাঁকে আশীর্বাদ করে গেছেন। এ সব ব্যাপারে স্বয়ং বর্ধমান মহারাজা দাক্ষিণ্য এবং পৃষ্ঠপোষকতায় বরাবরই উদার। সেখান থেকেও ডাক এসেছিল, প্রশংসা মিলেছিল।

কিন্তু তখনো সিদ্ধেশ্বর চাটুজ্জে বৈষয়িক উন্নতির ব্যাপারে উদাসীন। নইলে মহারাজার এত্তেলা পাওয়া মানেই তো ভাগ্যলক্ষ্মীর সেধে দোরগোড়ায় এগিয়ে আসা। এই কারণেই সিদ্ধেশ্বরের বাবা বিশ্বেশ্বরের উদ্বেগের অন্ত নেই। ছেলের বয়স চব্বিশ গড়াতে চলল। এত বয়েস পর্যন্ত কোন্ ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে অবিবাহিত থাকে? বিয়ে অবশ্য ঘাড় ধরে ছেলেকে তিনি যে-কোনো সময় দিতে পারেন। কালিকাপুরের বিশাল ভূ-সম্পত্তির মালিক গগন চৌধুরীর যে মেয়েটির দিকে তাঁর চোখ—সেই মেয়ের বিয়ে অন্যত্র হয়ে গেলে ছেলের বিয়ে তিনি দেবেনই। গগন চৌধুরীরা আসলে গাঙ্গুলি—চৌধুরী তাঁদের মর্যাদার পদবী।... মেয়ের তেরো বছর বয়স হয়ে গেল এখনো বিয়ের তোড়জোড় পর্যন্ত নেই—গগন চৌধুরীর মেয়ে না হয়ে অন্য কারো মেয়ে হলে পাড়াপড়শীরও ঘুম ছুটে যেত। আবার এই কারণেই বিশ্বেশ্বর চাটুজ্জের মনের তলায় ক্ষীণ আশা একটু।

ছেলে নবদ্বীপ থেকে যশের ডালি নিয়ে ফেরার পরেই বাপের প্রতীক্ষার শেষ। তাঁকে ডেকে গগন চৌধুরী সরাসরি প্রস্তাব দিলেন। নিজে ছেলে দেখতে গেলেন। তখনো ভয়ে ভয়েই ছিলেন বিশ্বেশ্বর চাটুজ্জে। কিন্তু অমন ছেলের বাপের দৈন্যদশাই যে কাম্য গগন চৌধুরীর, সেটা ভাবেননি। ছেলে দেখতে গিয়ে ভদ্রলোক একেবারে আশীর্বাদ করে ফিরলেন।

ঘটা করে বিয়ে হয়ে গেল। ছেলের বাপের পাওয়ার আশাও ষোল আনার ওপরে পূর্ণ করলেন মেয়ের বাবা। পাঁচ হাজার টাকা নগদ দিলেন। খয়রা গ্রামের মানুষদের মুগ্ধ করার মতো দান-সামগ্রী দিলেন। তখনো নিস্পৃহ শুধু সিদ্ধেশ্বর চাটুজ্জে। স্ত্রী অপছন্দের নয় তাইতেই খুশি, বাবা কি পেলেন না পেলেন খবরও রাখেন না।

গোলযোগের সূচনা তার পর থেকে। নানা ছলছুতোয় দাপটে শ্বশুর মেয়ে জামাইকে

কালিকাপুরেই আটকে রাখতে চান সেটা বুঝতে কারোরই বিশেষ সময় লাগল না। অমন মানী বৈবাহিক পাছে বিরূপ হন সেই আশংকায় বিশ্বেশ্বর চাটুজ্জেরও খুব আপত্তি ছিল না। উল্টে ছেলেকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, অত বড় ঘরের মেয়ে, মা-লক্ষ্মীর এখানে এসে থাকতে অসুবিধে হবে, কষ্টও হবে—তুই যেখানেই থাকিস আমাকে ফেলবি না জানি—তোর শ্বশুরের যেমন ইচ্ছে তেমনি থাক্ না।

সিদ্ধেশ্বর জবাব দেননি। মনে মনে ফুঁসেছেন।

গ্রামে বসেই কিছু রোজগারপাতির দিকে মন দিয়েছেন। পাঠশালা খুলে বসার সঙ্গে সঙ্গে অনেক ছেলেও পেয়েছেন। এত নামডাক তাঁর তখন, লোকে ছেলে পাঠাবে না কেন? ওদিকে গগন চৌধুরী আর তাঁর ছেলেদেরও গোঁ—স্ত্রীকে নিয়ে কালিকাপুরে এসেই তাঁকে থাকতে হবে। ঘর-জামাই হয়ে থাকতে না চান— জামাইকে তাঁরা পৃথক ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। কাছাকাছির মধ্যে একমাত্র স্কুলের সর্বেসর্বা গগন চৌধুরী—সেই স্কুলের প্রধান সংস্কৃত শিক্ষক হবার প্রস্তাবও জামাই নাকচ করে বসতে তিনি ক্রুদ্ধ। তাঁর ছেলেরাও। জামাইকে তাঁরা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন, চৌধুরী-বাড়ির একমাত্র মেয়ের অমন হা-ঘরে অবস্থার মধ্যে থাকা সম্ভব নয়।

সিদ্ধেশ্বর চাটুজ্জে তেমনি স্পষ্ট জবাব দিলেন, থাকা সম্ভব কি সম্ভব নয় সেটা তাঁদের মেয়ের এখনো বোঝার বয়স হয়নি। তাই আপাতত এখন এবং যতদিন খুশি তিনি বাপের বাড়িতে থাকতে পারেন। পরে স্ত্রী নিজের বিবেচনায় স্থির করবেন কোথায় থাকা সম্ভব আর কোথায় নয়।

ভাগ্যের এমন জটিল গতি দেখে বিশ্বেশ্বর চাটুজ্জে ভয়ে কেঁপেছেন। তিনিও ছেলেকে কম বোঝাতে চেষ্টা করেননি। কিন্তু ছেলে সংকল্পে অবিচল। শ্বশুরের কৃপার পাত্র হয়ে থাকা তাঁর কাছে মৃত্যুর সামিল। বাবাকে স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন, সব দায়িত্ব আমার, আপনি নির্ভাবনায় থাকুন।

পনের বছর বয়স পর্যন্ত স্ত্রী অর্থাৎ সোমেশ্বরের মা বেশির ভাগ সময় বাপের বাড়িতে থেকেছেন। তারপর স্বেচ্ছায় চলে এসেছেন। ওই মানুষটার প্রতি আকর্ষণ তার বিচারবুদ্ধির অগম্য ছিল। না গিয়ে পারেননি। স্বামীর দারিদ্র্য সত্ত্বেও ওই আকর্ষণ বেড়েছে বই কমেনি। সতের বছর বয়সে প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে আঁতুড়েই মারা গেছে। সেদিনে অমন মৃত্যু ঘরে ঘরে হত। কিন্তু শ্বশুর আর শ্যালকরা এই ঘটনায় আরো ক্রুদ্ধ। তাঁদের চোখে মেয়েও আধখানা হয়ে গেছে। তাঁদের বিবেচনায় এই সব কিছুই দারিদ্র্য-দম্ভের ফল। মেয়ে ভালো খেতে পায়নি, তার ভালো শুশ্রূষা হয়নি—সেই হেতু অঘটন, সেই হেতু স্বাস্থ্যহানি। মেয়েকে জোর করেই ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন তাঁরা, আর শাসিয়েছেন, জামাইয়ের শুভবুদ্ধি না হলে সম্পর্কের এখানেই শেষ এবং তার ফলও শুভ হবে না।

...যে শুভবুদ্ধি তাঁরা আশা করেছিলেন জামাইয়ের তা হয়নি। কিন্তু ছ'মাস না যেতে আবার তাঁদের অবাধ্য হয়েই মেয়ে ফিরে এসেছেন। এবারে শুধু জামাই নয়, মেয়ের ওপরেও বাপের বাড়ির সকলে ক্রুদ্ধ। ভাই আর বৈমাত্রেয় ভাইয়েদের ক্রোধের কারণ বোনের প্রতি প্রীতি-ভালবাসা নয়। তাঁদের বিবেচনায় এভাবে আবার সেধে ফিরে গিয়ে বোন বাপের অপমান করেছেন। ভাইদের অপমান করেছেন। নির্বোধ উদ্ধত জামাইয়ের কাছে সকলের মাথা হেঁট করে দেওয়া হয়েছে।

পরের সন্তান সোমেশ্বর পৃথিবীর আলো দেখেছেন আরো তিন বছর বাদে। তিনি আর কোনো ভাই বা বোনের মুখ দেখেননি।

খুব ছেলেবেলায় ঠাকুরদার মুখে মামাবাড়ির গল্প শুনতেন সোমেশ্বর। কাছেই কালিকাপুরে নাকি তার মস্ত দাদামশাই আর মস্ত মামাবাড়ি। কিন্তু সেই দাদু কেমন বা মামাবাড়ি কেমন কোনো ধারণা ছিল না। মাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি কিছুই বলতেন না। আবার বাবা তো ওই বয়েস থেকেই ছেলের চোখে অনেক দূরের মানুষ।

বছর সাতেক বয়স তখন সোমেশ্বরের। একদিন দেখলেন মা খুব কাঁদছেন। বাবা দারুণ গম্ভীর। ঠাকুরদারও শুকনো মুখ। পরে শুনলেন, কালিকাপুরের সেই মস্ত দাদামশায় অর্থাৎ মায়ের বাবা মারা গেছেন। নাতি বুঝুক না বুঝুক, ঠাকুরদা সখেদে অনেক কথাই বলেছিলেন।...সেই দাদামশায় নাকি অনেক দিন ধরেই ভুগছিলেন। কিন্তু ওঁদের এত রাগ যে মেয়েকে একটা খবর পর্যন্ত দেননি। একেবারে শেষ হয়ে যেতে খবরটা শুধু পাঠানো হয়েছে। রাগ কেন সেটা সাত বছরের ছেলের বুদ্ধির অগম্য। জিজ্ঞাসা করতে ঠাকুরদা বলেছিলেন, সে তুই বুঝবি না।

বাড়িতেই মা চতুর্থীর কাজ করেছেন। তারপর ছেলেকে নিয়ে সেই প্রথম মামাবাড়িতে রওনা হয়েছেন। বাবা যাননি। ঠাকুরদাই মাকে আর তাঁকে পৌঁছে দিতে গেছলেন। সেই চকমিলানো বিশাল মামাবাড়ি দেখে সোমেশ্বরের তাক লেগে গেছল।

কিন্তু সেই মামাবাড়িতে যাওয়ার খানিকক্ষণের মধ্যেই কিছু ঘটেছিল আর সেটা যে প্রীতিকর ব্যাপার নয় সোমেশ্বর সেটুকু শুধু বুঝেছিলেন। মামারা ঠাকুরদাকে ছেঁকে ধরে কিছু বলছিলেন আর ঠাকুরদা মুখ চুন করে বসেছিলেন। মা অবশ্য তখন কাছে ছিলেন না। সেই সময়েও মা কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। দাদামশায় মারা যাবার পর আরো অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। গোরুর গাড়িতে আসার ধকলেও খুব অবসন্ন ছিলেন। পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ঠাকুরদাকে আর মামাবাড়ির কোথাও দেখলেন না সোমেশ্বর। মাকে জিজ্ঞাসা করতে তিনিও অবাক। এটুকু শুধু বোঝা গেল তাঁদের পৌঁছে দিয়ে তিনি নিঃশব্দে চলে গেছেন। এর তিন-চারদিনের মধ্যে সাত বছরের সোমেশ্বরের বুকে আবার এক বিস্ময়ের ধাক্কা। আর দু'রাত পোহালে দাদামশায়ের বিরাট কাজ শুনেছেন। সেই কাজের বিশাল তোড়জোড়ও নিজের চোখেই দেখেছেন। কিন্তু বলা নেই কওয়া নেই মা দু'দিন আগের সেই সকালে তাঁর হাত ধরে গোরুর গাড়িতে উঠলেন। এ-ব্যাপারের কিছুক্ষণ আগে থেকেই সোমেশ্বর দস্তুরমতো হতভম্ব। মাকে ঘিরে মামারা আর মামীরা কি সব বলছেন। বলছেন না, সোমেশ্বরের মনে হয়েছিল, সকলে মিলে মাকে দস্তুরমতো শাসাচ্ছেন। আর মায়ের পাথরপানা মুখ।

গোরুর গাড়ি অনেকটা পথ ভাঙার পর সোমেশ্বর আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারেননি। জিজ্ঞাসা করেছেন, আমরা কোথায় যাচ্ছি মা?

মায়ের মুখখানা তেমনি পাথরের মতো। জবাব দিয়েছেন, বাড়ি।

—দাদামশায়ের কাজ দেখব না ?

মায়ের এক কথায় জবাব, না।

বাড়ি ফেরার পর থেকে বাবার মুখ দেখে তো ভয়ই ধরে গেছল সোমেশ্বরের।

মাকে তেমন ফর্সা বলা যায় না। কিন্তু বাবার গায়ের রং ঠাকুরদার থেকেও ফর্সা। সেই মুখে যেন আগুন ধরে আছে। ব্যাপারখানা কি কেবল একজনকেই জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। ঠাকুরদাকে। তাঁর কাছে ভয়ডরের বালাই নেই। কিন্তু তিনিও দু'কথায় জবাব সারতে চাইলেন। বললেন, তোর মামাবাড়ির লোকেরা অপমান করেছে।

—কাকে?

—তোর মাকে। তার আগে আমাকে।

—কি অপমান?

—সে তুই বুঝবি না।

এই এক বিস্ময় সোমেশ্বরের মাথায় থেকেই গেছল। মামাবাড়ির লোকেরা ঠাকুরদাকে আর মাকে কি অপমান করে থাকতে পারে তা নিয়ে সম্ভব-অসম্ভব কত রকম ভেবেছেন ঠিক নেই। বছর বারো-তেরো বয়সে ঠাকুরদার কাছ থেকে অনেকটা আঁচ পেয়েছেন। আর কলেজে পড়তে মায়ের মুখ থেকেই সমস্ত ব্যাপারটা টেনে বের করেছেন। কিন্তু সাত বছর বয়সে সেই দুর্বোধ্য অপমানকর ঘটনার পর থেকেই লক্ষ্য করেছেন, মাসের মধ্যে পনের-বিশ দিনের জন্যেও বাবা বাইরে বাইরে কোথায় চলে যান। টোল তুলে দেওয়া হয়েছে। অথচ খাওয়া-পরার ব্যাপারে আগের থেকে ভালোভাবে দিন চলছে। ঠাকুদার মুখের দুশ্চিন্তা সরে যাচ্ছে। আগের থেকে বেশি হাসিখুশি তিনি। প্রায়ই বলতেন, তোর বাবা যে কি জিনিস একখানা—আগে বড় হ, তখন বুঝবি।

বড় হতে হতে আর বড় হয়ে যা বুঝেছিলেন তা একদিকে দুঃখের বটে, অন্যদিকে তার চর্তুগুণ আনন্দের। দাদামশায়ের শ্রাদ্ধশান্তি উপলক্ষে মামাবাড়ি পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরদাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করে মামারা গায়ের ঝাল মিটিয়েছেন। তাঁদের ধারণা, দাদামশায় নেই, তিনি কিছু প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে গেছেন কিনা তাই বুঝতেই যথাবিধি আমন্ত্রণের অপেক্ষা না রেখেই এভাবে ছুটে আসা। তাঁরা জানিয়েছেন, জামাই যে অপমান দাদামশাইকে করেছে, তারপর আর এক কপর্দকের ব্যবস্থাও মেয়ের জন্যে তিনি করে যাবেন এমন আশা হয় কি করে? ছেলের বিয়ে দিয়ে বাপ যখন এককাঁড়ি টাকা পণ নিলেন তখন ছেলের এত দম্ভ ছিল কোথায়? এখন কোন লোভে বউ আর বুড়ো বাপকে ঠেলে পাঠানো হয়েছে?

...ঠাকুরদা নিঃশব্দে চলে এসেছেন। বাড়ি ফিরে ছেলেকে ঘরে না দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। অবশ্য নাতি আর বউকে পৌঁছে দিয়ে সেই সন্ধ্যায় ঠাকুরদার ফেরার কথা ছিল। ছেলের সঙ্গে ঠাকুরদার রাতে দেখা হয়েছে। ছেলে কিছু না জিজ্ঞাসা করাতে ঠাকুরদা তখনকার মতো বেঁচে গেছেন। ভয়ে নিজে থেকে তিনি একটা কথাও বলেননি।

...ওদিকে অন্দরে মায়ের ওপরেও গঞ্জনা কম হয়নি। মামারা মামীরা বাতাসে কথা ছুঁড়েছেন। একমাত্র মেয়ের জন্য কর্তার তো অনেক শিক্ষাই হয়েছে, এখন কি দেখতে আসা হয়েছে? কি উদ্দেশ্যে? শরীরের এই হাল কেন? অমন দাপটের মানুষের চিকিৎসা করানোরও মুরোদ নেই বুঝি? খাওয়া-পরাও তেমন জোটে বলে তো মনে হয় না। ...যতদিন ইচ্ছে ছেলে নিয়ে থেকে যেতে পারে, খেয়ে-পরে যেতে পারে—কিন্তু তার বেশি যেন এক তিল আশাও মনে না রাখে কেউ—মেয়ের হাতে বাড়ির কর্তার মতো এমন বিরাট মানুষের অপমান বরদাস্ত করতে কেউ রাজি নয়, ইত্যাদি।

মা ফিরে এসে বাবাকে সব বলেছেন। আর ঠাকুরকে অর্থাৎ ঠাকুরদাকেও অপমান করার কথা হয়েছে কিনা সেই খোঁজ নিতে বলেছেন। নইলে পৌঁছে দিয়েই মধ্যাহ্নের আহার পর্যন্ত না করে ঠাকুর চলে এসেছিলেন কেন?

বাবা খোঁজ নিয়েছিলেন। ঠাকুরদা ভয়ে ভয়ে সত্যি কথাই কবুল করেছেন। ছেলের সেই মুখের দিকে চেয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারেননি, কিছুই গোপন করতে পারেননি।

বাবা স্তব্ধ খানিকক্ষণ। তারপর ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করেছেন, বিয়ের সময় আপনি তাঁদের কাছে কত টাকা হাত পেতে নিয়েছিলেন?

ঠাকুরদা বলেছেন, পাঁচ হাজার।

বাবা বলেছেন, আমি খুব চেষ্টা করব, এই পাঁচ হাজার টাকা আপনি বেঁচে থাকতেই যেন তাঁদের ফেরত পাঠাতে পারি।

...সেই সস্তার দিনে বড়লোক দাদামশাই বিয়ের সময় মাকে প্রচুর গয়না দিয়েছিলেন। কিন্তু চোখ খোলা অর্থাৎ নজর করে দেখার বয়েস থেকে মায়ের হাতে শুধু শাঁখা আর লোহা-বাঁধানো ছাড়া আর কিছু দেখেননি সোমেশ্বর। সেই একরাশ গহনা কোথায় গেল পরে তা-ও শুনেছেন। দাদামশায়ের শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাবার কয়েকদিনের মধ্যে বাবার শ্বশুরবাড়িতে পদার্পণ ঘটেছিল। মামাদের আর মামীদের সামনে হাতের মস্ত পুঁটলি খুলে সেই সব গয়না ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলে এসেছিলেন, আরো কিছু তাঁদের পাওনা আছে, সেটা ফেরত দিতে দু-এক বছর সময় লাগবে।

না, স্বর্গত বাপের দ্বিগুণ অপমান করা হল বলে মামারা গর্জে উঠতে পারেননি। পরে তাঁদের অনেক তর্জন-গর্জন শোনা গেছে। কিন্তু তখন তাঁরা আগুন-বরণ পুরুষ দেখেছেন। কারো মুখে কথা সরেনি।

সেই থেকে ঐ পুরুষের স্বেচ্ছা-দারিদ্র্যবর্জন। এত যাঁর যশ খ্যাতি পাণ্ডিত্য তার জন্য দরজা সেদিন অন্তত সর্বত্র খোলা। গিয়ে দাঁড়াতে বর্ধমানের স্বয়ং মহারাজ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। বর্ধমানেই তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাবা সেটা চাননি। যা চেয়েছেন তাই পেয়েছেন। বহু জায়গায় মহারাজার দেবদেউল ছড়ানো। ক্রমে তার অনেকগুলোর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বাবার হাতে এসেছে। আর রাজা যাঁর প্রতি সদয় এবং শ্রদ্ধাবান অন্য পাঁচজন গণ্যমান্যরা তাঁর দিকে সহজে আকৃষ্ট হবেন এ-ও সহজ কথাই। বাবার সেই ব্যক্তিত্ব আর তাঁকে নিয়ে লোকের কাড়াকাড়ি সোমেশ্বর নিজেই অনেক দেখেছেন।

দু'বছরের আগেই দাদামশাইয়ের দেওয়া সেই পাঁচ হাজার টাকাও বাবা মামাদের কাছে ফেলে দিয়ে এসেছেন। ততদিনে মামাদের কানেও জল ঢুকেছে। এমন অনায়াসে রাজারাজড়ার দাক্ষিণ্য যাঁর অনুকূল তাঁর সঙ্গে শত্রুতা বাড়াতে আর কে চায়? মামারা বাবার হাত ধরে সব ভুল বোঝাবুঝির অবসান করতে চেয়েছিলেন। বাবা বলে এসেছিলেন, ভুল বোঝাবুঝির শেষ সমানে সমানে হয়। আপনারা যে স্তরের মানুষ, আপনাদের শুধু ক্ষমা করা চলে। ক্ষমাই করে গেলাম।

এ-সব কথা বলতে বলতে স্বল্পভাষিণী মায়ের মুখে এক অনির্বচনীয় দীপ্তি আর তৃপ্তি দেখতেন সোমেশ্বর। কিন্তু অপর্যাপ্ত স্বচ্ছলতার দিনেও সেই শাঁখা আর লোহা-বাঁধানো

ছাড়া মায়ের হাতে নতুন গয়না উঠতে দেখেননি তিনি। মাকে বলতেনও, এখন তো করাতে পারো, গড়াতে পারো মা?

মায়ের মুখের সেই হাসিও ভোলবার নয়। বার কয়েক ছেলের মুখে একই কথা শুনে একদিন বলেছিলেন, একে একে তিন-তিনটে পাশ দিয়ে বেরুতে চললি, এখনো কি বোকা রে তুই! আমার আর নতুন করে গয়নার কিছু দরকার আছে! আমার মতো গয়না-ভাগ্য ক'জনের হয়?

সোমেশ্বর বুঝেছিলেন। আর গয়নার কথা মুখে আনেননি।

## দুই

এর ঢের আগে, অর্থাৎ সোমেশ্বর ম্যাট্রিক পাস করে বেরুনোর বছর দেড়েক আগে ঠাকুরদা গত হয়ছেন। সেই সময় থেকেই বাবা মাঝে মাঝে বলতেন, অজয় সব খাবে। এখানে আর বেশিদিন নয়।

বাবার কথা শুনে দুঃখে আব দুশ্চিন্তায় সোমেশ্বরের ভিতরটা কেমন অস্থির হয়ে পড়ত। জন্ম থেকে যে অজয়ের সঙ্গে নাড়ির সম্পর্ক সেই অজয় এক-এক বছর এমন নিষ্ঠুর এত ভয়ংকর হয়ে ওঠে কেন? অজয়কে তিনি কোনদিন ছাড়তে চান না, চাননি —কিন্তু অজয় কি সত্যি ওদের তাড়াবে? উচ্ছেদ করবে?

অজয় তাই করল যখন, অভিমানে তার দিকে সোমেশ্বর অনেক দিন পর্যন্ত মুখ ফেরাননি। খয়রার ভিটেমাটি ছেড়ে আসার জন্যে বাবা সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন জানা ছিল না। জানলেন যখন, তখন বাহারীর সেই ছোট পরিসরে তাঁদের চালা ঘর আর ছনের ঘর প্রস্তুত। বাবার সমস্ত কাজই এমনি নিঃশব্দে।

আর বছর দু'য়েকেব মধ্যে, সোমেশ্বর সবে তখন কলেজে ঢুকেছেন, তাঁর মনে হয়েছিল, বাবা ইচ্ছে করলেই আরো ঢের বেশি জমিজমা নিয়ে আরো ভালো বসত ঘর তুলে বাহারীতে জাঁকিয়ে বসতে পারতেন। কিন্তু খুব বুদ্ধিমানের মতোই তিনি তা' করেননি। নতুন গ্রামে দশজনের একজনের মতোই এসেছেন। প্রথম থেকেই কোনো ফারাক রচনা করতে চাননি। গ্রামের মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তাদের যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ আত্মীয়ের মতোই সম্পন্ন করেছেন। ফারাক যেটুকু সে-শুধু ব্যক্তিত্বের। আর কিছুর নয়।

কিন্তু বাবা কি করবেন সেই ছকও সম্ভবত তাঁর মাথায় ছিলই। এখানে জমিজমা কেনার সময়েই জমির মালিকের সঙ্গে কেনো মৌখিক শর্ত করে নিয়েছিলেন কিনা সোমেশ্বরের জানা নেই। একজনেরই মস্ত জমি থেকে প্রথমে একখণ্ড কিনেছিলেন। ছ'মাস এক বছর পর পর আবাব প্রায় অতটা করেই সংলগ্ন জমি কিনে গেছেন। কিন্তু তখনো ঘর যেমন ছিল তেমনিই। একই সঙ্গে বাবা যে অন্যত্র চাষের জমিও কিনে চলেছেন সে খবরও সোমেশ্বর রাখতেন না। বাবার সঙ্গে চাক্ষুষ দেখাসাক্ষাৎই কম তাঁর। মাসের মধ্যে দিন পনের বাবার তখনো বাইরে বাইরে কাটে। এখানে থাকলে নিজের সামনে বসিয়ে ছেলেকে শুধু সংস্কৃত পড়ান। ছেলে যখন সংস্কৃত অনার্স নিয়ে বি.এ. পড়তেন তখন পর্যন্ত পড়াতেন। বাবার সঙ্গে ছেলেব এটুকুই যোগ।

কলেজপাঠ্য অন্যান্য বিষয়ে ছেলের মেধা কতটুকু বাবা সে-খবরও ভালো করে রাখতেন না। তবে পরীক্ষার ফলাফল দেখে বুঝতেন খারাপ নয়। তাঁর সবটুকু নজর ছিল সংস্কৃতর দিকে। ম্যাট্রিক আর আই.এ. পরীক্ষায় ছেলের থেকে বেশি নম্বর য়ুনিভার্সিটিতে আর কেউ পায়নি এ-ও তাঁর কাছে বেশি খুশি হবার ব্যাপার কিছু নয়। প্রথম ছেড়ে দ্বিতীয় হলে হয়তো অবাক হতেন।

ছেলে বি. এ. পাস করে বেরুনোর আগে তিনি তাঁর সঙ্গে পারিবারিক বা বৈষয়িক কোনো কথাই বলেননি। একমাত্র ছেলের চরিত্র কোন্ ধাতুতে গড়ে উঠছে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার অবকাশ কখনো হয়নি। আই. এ. পরীক্ষায় সোমেশ্বর চাটুজ্জে জেনারেল স্কলারশিপ পেয়ে মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে বাবার কাছে কলকাতার বড় কলেজে পড়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। শুনে চুপচাপ খানিকক্ষণ তিনি ভাবলেশশূন্য চোখে ছেলেকে দেখেছিলেন। তাইতেই সোমেশ্বরের ঘেমে ওঠার দাখিল।

পরে অনুচ্চ ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এখানকার ছোট কলেজ খারাপ হলে জেনারেল স্কলারশিপ পেলে কি করে?

এখানকার ছোট কলেজ বলতে ন'মাইল দূরেব আসানসোল কলেজ। বর্ষায় আর গরমে ট্রেনে বা বাসে যাতায়াতের ধকল। শীতে নিজের খুশিমাফিক বেশির ভাগ সাইকেলে যাতায়াত চলে। কিন্তু ওটুকু প্রশ্ন থেকেই বাবার মনোভাব বোঝা গেছে। সোমেশ্বর নিরুত্তর।

একটু বাদে বোঝা যায় কি যায় না এমনি প্রচ্ছন্ন একটু তিরস্কারের সুর।—আমাকে মাসের মধ্যে অনেকদিন বাইরে থাকতে হয়, তোমার মায়ের দেখাশুনোর ভার কার হাতে ছেড়ে দিয়ে যাবে—মানদার?

মানদা আশ্রিতা বয়স্কা পরিচারিকা। ছেলে ছেলের বউদের গঞ্জনা অসহ্য হয়ে উঠতে সাত বছর ধরে এখানে আছে আর বেশ সুখে আছে। সোমেশ্বর বলতে পারতেন মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করেই তিনি কলকাতার কলেজে পড়ার আর্জি পেশ করেছিলেন। তাছাড়া এ-ও ঠিক, শত্রুতা না থাকলে সচ্ছল সংসারে গাঁয়ের মানুষই একে অন্যকে দেখে। মায়ের অনুগত বলতে গেলে সব পড়শিনীরাই। কিন্তু এ-সব বলতে যাওয়া নিরর্থক। বাবার ইচ্ছের হদিস পেলে ছেলে কোনো সময় কথা বাড়ান না।

তাঁর শেষ কথা, যা ভালো বোঝো করো—তবে একটা কথা, তোমার যা বিষয় তাতে ফল ভালো করার জন্য বাইরে ছোটাছুটি করার দরকার হয় না—ভালো কলেজ নিজের ভিতরেই বসানো যায়।

বিষয় বলতে সংস্কৃত।

বাবার কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে সোমেশ্বর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। আর নিজের মনে হেসেছেন। একটুও দুঃখ বা অভিমান হয়নি। উল্টে মনে হয়েছে বাবা তাঁর একটা বাজে মোহ ভেঙে দিয়েছেন। পড়বেন সংস্কৃত অনার্স। এখানে বাবার কাছে যেটুকু সাহায্য পাবেন, সমস্ত কলকাতা চষেও তা পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। বাবার মতো সংস্কৃত তাঁর এ জন্মে শেখা হবে ভাবেন না।

এ-সময় থেকেই তাঁদের বসত বাড়ির ভোল বদলাচ্ছিল। তা-ও ধীরসুস্থে। বাবার প্ল্যানমাফিক। এঞ্জিনিয়ার দিয়ে সমস্ত প্ল্যানই আগে ছকে নিয়েছিলেন তিনি। সেই অনুযায়ী

ভিত করা হয়েছে। তারপর ছাড়া ছাড়া ভাবে কাজ শুরু হয়েছে। প্রথমে ঠাকুরদালান চণ্ডীমণ্ডপ উঠেছে। তারপর অতিথিদের থাকার মতো পরপর তিনটে বড় পাকা ঘর। বাবা এখানে থাকলে অতিথি সমাগম লেগেই থাকে। তাই নিয়ে এক-এক সময় অসুবিধেয় পড়তে হয়। দরকারে দুটো ঘরও ছেড়ে দিয়ে বাবা মায়ের সঙ্গে ছেলেকে এক-ঘরে রাত কাটাতে হয়। শেষ হতে দেখা গেল প্রশস্ত ঠাকুরদালানের সঙ্গে অতিথিদের তিনটে ঘর সমকোণে যুক্ত হয়েছে। পরের বছর নিজেদের পাকা বসত ঘর তিনটে উঠল যখন, দেখা গেল, ঠাকুরদালানের যেন দুই বাহু—একটি অতিথিদের জন্য, অন্যটি নিজেদের বাসের জন্য। মাঝখানের মস্ত উঠোনটাও বাঁধিয়ে ফেলা হয়েছে।

বাড়ির এই কাঠামো সোমেশ্বরের দারুণ ভালো লাগত। বাড়ির সামনে ফটক, বাকি তিন দিকে বিশেষ করে পিছনে অনেকটা ঘেরালো জমি। পাশে তকতকে পুকুর। তার চার দিকে আম জাম কাঁঠাল পেয়ারা লেবু গাছ। আর দু'পাশের সবটাই ফুলের বাগান। গাঁয়ের পথ-চলতি মানুষ ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে যায়। দেখে। ততদিনে সোমেশ্বর জেনেছেন কিছু দূরে দূরে তাঁদের পনের বিঘা চাষের জমিও আছে। চাষীরা আসে, বাবার সঙ্গে কথা বলে।

সোমেশ্বর বি.এ. পাস করলেন। ফলের কোনো তারতম্য হয়নি। যা আশা করা গেছল অনায়াসেই তা হয়েছে। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছেন। পরে জানা গেছে তিনি সেবারের ঈশান স্কলার। বি. এ. পাস করার পর বাবার মুখোমুখি এবারে একটু শক্ত হয়ে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত হলেন। কলকাতায় না গেলে এম. এ. পড়া হয় কি করে। তখন তো বর্ধমান য়ুনিভার্সিটির অস্তিত্ব নেই।

আগে মাকে বলেছিলেন, এম. এ. পড়তে হবে তো?

মা বলেছিলেন, নিশ্চয় পড়তে হবে।

—কিন্তু সে তো এখানে থেকে হয় না মা।

—যেখানে থেকে হয় সেখানে যাবি।

বাবাকে মা কিছু বলে রেখেছিলেন কিনা সোমেশ্বর জানেন না। এবারে মাকে কে দেখবে এ প্রশ্ন বাবা তুললেনই না। কিন্তু যা বললেন তার জন্যেও প্রস্তুত ছিলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, এম. এ. পড়ে কি হবে. গোলামি করতে হবে?

বাবার সঙ্গে কথাবার্তা এত দিনে আর একটু সহজ হয়ে এসেছে। সবিনয়ে জবাব দিলেন, আপাতত পড়ার জন্যেই পড়ার ইচ্ছে....কিন্তু গোলামি কাকে বলে বুঝিয়ে দিন।

—কাকে বলে তুমি বোঝো না?

—আমি একভাবে বুঝি।..টাকা রোজগারের জন্য যে যা করছে তাকেই গোলামি বলা যেতে পারে। টাকা ছাড়া কারো চলে না। কিন্তু সেটা যদি গোলামি না হয়, তাহলে গোলামি একটা মানসিক ব্যাপার ছাড়া আর কি—এ যার নেই সে গোলাম নয়।...আমাদের জমিতে যারা চাষ করছে, বাগানে যে মালি কাজ করছে, যে ঘরামি ঘর তুলছে, তাদের গোলাম বলতে পারি না বোধ হয়। তাদের কাজ দরকার, আমাদের কাজের লোক দরকার।

বাবার সামনে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে এতগুলো কথা আগে কখনো বলেননি। বাঁচোয়া, বাবার মুখে বিরক্তির লেশমাত্র নেই। উল্টে ঠোঁটের ফাঁকে একটু যেন হাসি ঝুলছে। আর ছেলেকে একটু নতুন করে দেখছেন তিনি। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি হতে চাও?

এই একটি প্রশ্নের সঙ্গে ছেলের টাটকা কিছু আনন্দস্মৃতি জড়িয়ে আছে বাবা জানেন না। মাস সাত-আট আগে কলেজের ইংরেজি প্রোফেসার ছেলেদের সাধারণ একটা রচনা লিখতে দিয়েছিলেন, 'ইওর অ্যামবিশন'। তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। সেই সাধারণ রচনা তাঁর কলমে অসাধারণ আর অসামান্য হয়ে উঠেছিল। প্রফেসার ছেলেদের ডেকে ডেকে সেই রচনা পড়িয়েছিলেন—আর সেবারের কলেজ ম্যাগাজিনে রচনাটি ছেপে দিয়েছিলেন।

রচনার সেই জবাবই সোমেশ্বরের মুখে এসে গেল। বললেন, আই ওয়ান্ট টু বি এ সিম্পল অনারেবল ম্যান।

এটুকু ইংরেজি বাবা জানেন না এমন নয়। কিন্তু সোমেশ্বর ভুল করলেন ইংরেজি বলে। বাবা সহজ অথচ একটু তেরছা চোখে চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, এর বাংলা হয় না?

লজ্জা পেয়ে সোমেশ্বর মাথা নিচু করলেন। শুধু বললেন, হয়। রচনা ইংরেজিতে লিখেছিলেন সে আর বলেন কি করে?

একটু ভেবে বাবা বললেন, পড়তে যাবে যাও, তবে আমি একটু অন্যরকম ভাবছিলাম।...তোমার মা চিরদিনই একলা কাটালেন, তাই এবার তোমার বিয়ের চিন্তা করছিলাম। আপত্তি আছে?

সোমেশ্বর মনে মনে আঁতকে উঠেছিলেন। সবে বি. এ. পাস করলেন, এরই মধ্যে বিয়ে কি! বাবা সেকেলে মানুষ, তাও তিনি চব্বিশ বছরে বিয়ে করেছেন জানে। কিন্তু এমন মনোভাব ব্যক্ত করা চলে না। সবিনয়ে জবাব দিলেন, আপনি আদেশ করলে কথা নেই, তবে আমার ইচ্ছে আর দু'বছরে পড়াশুনাটা শেষ করে নিই...।

এতক্ষণে বাবা হঠাৎ অসহিষ্ণু একটু।—দুটো বছর খুব কম হল, আর পড়াশুনার ইচ্ছে থাকলে দুটো বছরেই তা শেষ হয়ে যাবে? ঠিক আছে, যাও।

দুটো বছর কলকাতার ভালো হোস্টেলে থেকেই পড়াশুনা করে গেছেন। আর একসঙ্গে দুদিনের ছুটি পেলেও দেশে চলে গেছেন। কলকাতায় আসার একটা সুফল হয়েছে। বাহারীর আকাশ বাতাস মাটি জঙ্গল কত যে আপন সেটা সর্বদা অনুভব করেছেন। কলেজ-য়ুনিভার্সিটির ছুটি এমনিতেই বেশি—কিন্তু সোমেশ্বরের একটুও বেশি মনে হত না। ক্যালেণ্ডারে সামনের ছুটির দিনগুলো দাগ দিয়ে রাখতেন। আর উন্মুখ প্রতীক্ষায় থাকতেন। এ দু'বছরের মধ্যে একতলার দুই বাহু দোতলা হয়েছে।

এম.এ. পরীক্ষার ছ'মাস আগে আচমকা বজ্রাঘাত হয়ে গেল। মা চোখ বুজলেন। সে-রকম বড় কিছু অসুখ-বিসুখ কিছু না। মা বরাবরই রুগ্ন একটু। অল্প অল্প ভুগছিলেন। কবিরাজি ভিন্ন মা অন্য কোনো চিকিৎসায় রাজি নন। তাই চলছিল। হঠাৎ বাবার চিঠি পেলেন, তোমার মা অসুস্থ, চলে এসো। তিনি আসার পর মা দু'দিন ছিলেন। তখনো অঘটন ঘটার মতো কোনো ছায়াই মনে আসেনি তাঁর। ভেবেছিলেন, বাবা একটু বেশি চিন্তা করছেন বলেই তাঁকে আসতে বলেছেন। দ্বিতীয় দিন ভোর রাতে সব শেষ।

না, আড়ম্বরের শোক কিছু হয়নি। পড়শিনীদের কেউ কেউ ডাক ছেড়ে কান্নাকাটি করেছে, মানদা কেঁদে লুটোপুটি খেয়েছে। কিন্তু বাবার মুখের দিকে চেয়ে সোমেশ্বরের তাতেও মনে হয়েছে মৃত্যুর গম্ভীর শুচিতায় ব্যাঘাত ঘটছে। মায়ের মৃত্যুর পর বার বার মনে হয়েছে, বাবার মতো এমন স্থিরচিত্ত পুরুষ আর দেখেননি।

...কাজ-কর্ম চুকে যেতে বাবা বলেছিলেন, এ সময়টা তোমার মায়ের ভালো না আমি অনেক আগেই জানতাম। সে-জন্যেই তোমার বিয়ের কথা তুলেছিলাম।... একেবারে চলেই যাবেন তা অবশ্য ভাবিনি। যাক, এম. এ. পরীক্ষা হয়ে গেলে ঘরে এসে বসতে হবে ঠিক রেখো, সব দেখে শুনে বুঝে নিতে হবে...আমারও ছুটি নিতে হতে পারে।

এই ছুটির অর্থ সোমেশ্বর আদৌ তলিয়ে ভাবেননি। বাবার কাছে নিজেকে দারুণ অপরাধী মনে হচ্ছিল তাঁর।...ক্ষুব্ধ গলায় বাবা বলে উঠেছিলেন, দুটো বছর খুব কম হল! সেই কথা ক'টা এখন বড় বেশি কানে বাজছে। কিন্তু সোমেশ্বর যদি জানতেন, দুবছরের মধ্যে মা না-ও থাকতে পারেন ভেবে বাবা তাঁর বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন, তাহলে আজ আর এই খেদ থাকত না। তখনই বউ এসে আজ দেড় বছরের পুরনো হয়ে যেত।

ছ'মাস বাদে এম. এ. পরীক্ষা দিয়েই সোমেশ্বর দেশে চলে এলেন। মনে হল বাবা এই প্রতীক্ষাতেই ছিলেন। পরীক্ষা কেমন হল না হল জিজ্ঞেসও করলেন না। প্রথমেই ব্যাঙ্কে নগদ টাকাকড়ি যা ছিল তা দু'জনার নামে করিয়ে নিলেন। বাড়ি আর জমিজমা সব সোমেশ্বরের একলার নামে হাত বদল হয়ে গেল। এর জন্য বাবার কম খরচ হল না, বা শহরে উকিলবাড়ি আর রেজিস্ট্রি অফিসে কম ছোটাছুটি করতে হল না। বাবা তাকে ইনকাম ট্যাক্সের উকিল আর বাড়ির কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। জমিজমা চাষের ব্যবস্থা দেখালেন, বোঝালেন। চাষের জমি এখন পনেরোর জায়গায় বিশ বিঘে হয়েছে। বার বার করে বললেন, সব কাজই লোক দিয়ে করাতে হবে, কিন্তু নিজের চোখ রাখতে হবে।

...মা চলে যাবার পর বাবা একদিনও আর বাড়ি ছেড়ে থাকেননি। তার আগে মাসের মধ্যে পনের দিন তো বাইরেই কাটাতেন। তখন সর্বব্যাপারে নিজে চোখ কি করে রাখতেন সোমেশ্বর জানেন না বা ভেবে পান না। কিন্তু সব দেখে শুনে মনে হত, রাখতেন যে তাতে কোনো সংশয় নেই। এমন চোখ রাখতেন যে এখন সব কিছু প্রায় ছকে বাঁধা ব্যাপার।

ইতিমধ্যে এম. এ. পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। এতেও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছেন তিনি। বাবা কিছু জিজ্ঞেস করেননি। তাঁকেই বলতে হয়েছে। শোনার পর বলেছেন, পড়া ছেড়ো না, আমার কিছু ভালো-ভালো বই আর কিছু পুঁথি আছে।...কোনো কিছুতে ডুব দেবার সময় হল না। সুযোগ সুবিধে মতো সেগুলো উল্টেপাল্টে দেখো। আয়ুর্বেদেরও কিছু সংগ্রহ আছে, ঠিকমতো দেখে শুনে বুঝে নিতে পারলে অভাবী লোকের উপকার হবে। অনেক রকম রোগ সারানোর হদিস পাবে তাতে।

বাবা কুলপুরোহিত ছিলেন এমন কিছু কিছু পরিবার বা তাঁদের বংশধর এখন কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের সঙ্গে বাবার ইদানীং চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলেছে সোমেশ্বর লক্ষ্য করেছেন। কেন, তা-ও আঁচ করতে পারেন। তলায় তলায় তাঁর বিয়ের উদ্যোগ সেরে রাখা হচ্ছে। এক বছরের কালাশৌচ শেষ হলেই এ-পাটও চুকিয়ে ফেলার ইচ্ছে বোধ হয়। শেষে ছ'মাসের মধ্যে বাবা ছ'বার কলকাতায় গেছেন। তাঁকে বলেই গেছেন। কিন্তু এই যাওয়া-আসার কারণ কিছু বলেননি। সকালে গিয়ে রাতের মধ্যে ফিরে

এসেছেন। বাবার সাম্প্রতিক আচরণে মাঝে মাঝে খটকা লাগত সোমেশ্বরের। মনে হত, বাবার সবেতে এখন একটু বেশি তাড়া। তাঁর যেন হাতে খুব সময় নেই।

মায়ের মৃত্যুর এক বছর পার হল। বাৎসরিক কাজ শেষ হতেই বাবা একদিন ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন আর বিয়েতে আপত্তি নেই বোধ হয়?

আপত্তি যে করেছিলেন সে দুঃখ সোমেশ্বরের যাবার নয়। মাথা নাড়লেন নেই।

—কি-রকম মেয়ে পছন্দ, বেশ পাসটাস করা?

—আপনার যেমন পছন্দ।

এই জবাবই আসবে জানতেন। একটু ভেবে বললেন, কয়েকটি মেয়ে আমি দেখেছি। তার মধ্যে একটি মেয়েকে আমার বেশ লেগেছে। বাপ-মা নেই, কাকার সংসারে ভাইদের সঙ্গে আছে। তার মধ্যে বড় ভাই এক বছর হল পাশ করে কোন কলেজে ঢুকেছে...অবস্থা ভালো কিছুই না, তবে আমার চেনা-জানা লোকের মুখে তাদের খুব প্রশংসা শুনেছি। মেয়ের বছর পনের বয়স, স্কুলে পড়ছে, এ-জন্যে যদি আপত্তি না থাকে দেখে আসতে পারো।...আমার চোখে বেশ সুলক্ষণা মনে হল।

সোমেশ্বর জবাব দিলেন, আমার দেখার দরকার নেই, আপনি যেখানে ঠিক করবেন সেখানেই হবে।

পরের মাসেই চাটুজ্জে বাড়ির এই একমাত্র উৎসবে গাঁয়ের লোক কিছু সমারোহ আর কিছু ঘটা দেখল। সেই দিনে অমন যোগ্য পাত্রের বিয়েতে অকাতরে ঘরের কড়ি খরচ করার নজির গ্রামদেশের মানুষ আর দেখেনি। সামান্য অবস্থার পাত্রীপক্ষ সাদাসিধেভাবেই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। বাবা এত সোনার গহনা কবে কখন করে রেখেছিলেন সোমেশ্বরের সে-ও এক বিস্ময়। বউ আনার পর গ্রামের মানুষ তাঁর খরচের দরাজ হাত দেখেছে।

## তিন

পরের তিনটে মাস বাবাকে সর্বদা বেশ খুশি-খুশি দেখেছেন সোমেশ্বর। কাজকর্ম দেখা একেবারে ছেড়েছেন। কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলে বলেন, আবার আমাকে কেন, যা ভালো বোঝো করো না।

নিজের মনে বাবা ইদানীং অল্প অল্প হাসেন। দু'বেলা অনেকক্ষণ ধরে বাগানে বেড়ান। রাতেও অনেকদিন বাগানে ঘুরতে দেখা যায় তাঁকে। সোমেশ্বরের তাঁকে ঘরে ডেকে আনতে ইচ্ছে হয়, কারণ রাতে হিম লাগার ভয়। কিন্তু পারেন না। সেই ছেলেবেলা থেকে একটা দূরত্ব থেকেই গেছে। স্ত্রী বাসন্তীকে বলেন, ডেকে আনো না, ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে।

বাসন্তী তো একেবারেই ছেলেমানুষ তখন। তার পর ঘরের লোকের মুখেই এ ক'মাস শ্বশুরের সম্পর্কে এত শুনেছেন যে উনি সামনে এলেই ঘামতে থাকেন। শুনেই আঁতকে ওঠেন, আমি এখন অন্ধকারে বাগানে যাব তাঁকে ডাকতে—কি যে বলো!

চতুর্থ মাসে বাবার আনন্দ আর ফুর্তি আরো বেড়ে গেছে মনে হল। অথচ কথাবার্তা আরো কম বলেন। কোনো কাজের কথা নিয়ে তাঁর সামনে আর যাওয়াই যায় না। দেখলে

মনে হবে কিছু সুখবরের প্রত্যাশায় আছেন। মাঝে মাঝেই পাঁজি দেখেন। নিজের মনে অবিশ্রান্ত পায়চারি করেন। এক এক সময় হাসি ছেড়ে নিজের মনে কথাও বলতে দেখা গেছে। খুব সকালের আর রাতের আকাশ দেখেন। সেখানে যেন কিছু রহস্যের ব্যাপার আছে। এ-দিকে বাসন্তী ক'দিন ধরে বলছেন, বাবার খাওয়া কিন্তু বেশ কমে গেছে, এক দুধ ছাড়া আর কিছু খেতেই চান না।

শুনেই ভিতরটা ছাঁৎ করে ওঠে। বাবা ছুটির কথা বলেছিলেন ভোলেননি। সেটা কেমন ছুটি কি ছুটি সেদিনও ভেবে পাননি, আজও না। একটা অজানা আশংকা ভিতর থেকে ঠেলে ওঠে। তাঁরও কাজ বলতে তেমন কিছুই নেই। জমিজমা সম্পর্কে বাবার আগের ব্যবস্থাই পাকা আছে। বাবার খাওয়া কমে যাচ্ছে শোনার পর থেকে তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ চোখ রেখে চলেছেন। কিন্তু কিছুই তারতম্য বোঝেন না। উল্টে মনে হয়, বাবার শরীর সামান্য কৃশ হলেও আরো উজ্জ্বল হয়েছে। আর মুখ দেখলেই বোঝা যায় বেশ আনন্দে আছেন।

চতুর্থ মাসের মাঝামাঝি হঠাৎই একটু অসুস্থ হয়ে পড়লেন বটে। সোমেশ্বর যা ভেবেছিলেন তাই। সর্দি জ্বর। দু'বেলা অত বেশি হিম লাগালে হবে জানা কথাই। তবে সামান্যই। উতলা হবার মতো কিছু না। তবু সোমেশ্বর ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আসানসোল থেকে প্রথমেই বড় ডাক্তার আনতে ছুটেছিলেন। ডাক্তার দেখে রোগী অবাক। আর রোগী দেখে ডাক্তার অবাক। আসানসোল থেকে তিনগুণ ফি গুণে ডাক্তার ধরে আনা মানেই রোগ কঠিন ধরে নেওয়া স্বাভাবিক। মামুলি ওষুধ লিখে দিয়ে আর সম্পূর্ণ অভয় দিয়ে ডাক্তার চলে গেলেন।

বাবা গম্ভীর। কিন্তু চোখে যেন কৌতুক ঠাসা। ধমকের সুরে বললেন, ডাক্তার কি করবে, ছুটির কথা তো সেই কবেই বলে রেখেছিলাম—মনে নেই?

শোনামাত্র সোমেশ্বর আর বাসন্তী দু'জনের বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠেছে। এ কি-রকম রসিকতা ভেবে পাননি। সোমেশ্বর বিড়বিড় করে বললেন, উনি তো বলে গেলেন কিছুই হয়নি।

কিছু হয়নি সেটা কি আমার থেকে তোমার ডাক্তার বেশি জানেন? ডাক শুনতে পাওয়া কি অস্বাভাবিক কিছু হওয়া—চিত্ত স্থির রাখতে পারো না?

শুনে সোমেশ্বরের আরো বেশি কাঁপুনি ধরে গেছল। বাবার কথা বাবার চিন্তা সর্বদাই অভ্রান্ত জেনে এসেছেন তিনি। কিন্তু আজ সে-বিশ্বাস জোর করেই ঝেড়ে ফেলতে চাইলেন। বাবা কিছু একটা ধারণার বশে এ রকম বলছেন। নইলে অতবড় ডাক্তার তো বলেই গেলেন, ভাবার মতো কিছুই হয়নি।

পরের দিনের মধ্যেই সর্দি কম, জ্বরও সামান্যই। তফাতের মধ্যে বাবা একটু বেশি ঘুমোলেন। সোমেশ্বর যা সচরাচর দেখেন না। একটু বেশি ঘুম ডাক্তারের ওষুধের জন্যেও হতে পারে।

বাপ ছেলে দু'জনেই বরাবর রাত থাকতে ওঠেন। এই ক'মাসে বাসন্তীরও খুব ভোরে ওঠাটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তবে স্বামী বা শ্বশুরের মতো অত রাত থাকতে উঠতে পারেন না। পরের দিন কি-একটা অজানা অস্বস্তি নিয়ে ঘুম ভাঙল সোমেশ্বরের। বাইরে তাকিয়ে দেখলেন তখনো ভোর হতে ঘণ্টাখানেক বাকি। অস্বস্তির কোনো কারণ নেই

অথচ অস্বস্তি। উঠে পড়লেন। বারান্দায় এসেই চমকে উঠলেন। নিচের ঠাকুরদালানের পূজোর ঘরে আলো জ্বলছে। দরজা দুটো চার ছ' আঙুলের মতো ফাঁক—ভিতরের আলো বাইরের উঠোনে এসে পড়েছে।

ছুটে বাবার ঘরে এলেন। শয্যা খালি। এ দুদিন বাবা ঠাকুরঘরে নামেননি। কিন্তু তা বলে রাত থাকতে একলা নামলেন কেন? তাড়াতাড়ি ফিরে এসে বাসন্তীকে ঠেলে তুললেন। দু'জনে ঘর্মাক্ত অবস্থায় পা টিপে নিচে নামলেন। দরজার বাইরে বাবার খড়ম। অর্থাৎ তিনিই ঠাকুরঘরে। দরজার ফাঁক দিয়ে সোমেশ্বর আর বাসন্তী যা দেখলেন, চোখ জুড়িয়ে গেল।...বাঘ-ছালের বড় আসনে উনি পদ্মাসন করে বসে আছেন। শিরদাঁড়া ঋজু, খাড়া। সমস্ত দেহ পাথরের মতো নিশ্চল। সোমেশ্বরের চোখের ভ্রম কিনা জানেন না, ঠাকুরঘরের আলোয় মনে হল বাবার ধপধপে ফর্সা ও নিশ্চল দেহ থেকে জ্যোতি ঠিকরোচ্ছে।

অনেকক্ষণ পরে পরে একটু নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের আভাস না পেলে সোমেশ্বর স্থির থাকতে পারতেন না। মনে হত জ্যোতি ঠিকরোলেও বাবার ওই নিশ্চল দেহে প্রাণ নেই।

ঠিক একই ভাবে একটা ঘণ্টা কেটে গেল। ভোর হল। নিশ্চল দেহে একটু একটু করে প্রাণ সঞ্চার হতে দেখলেন তাঁরা। সোমেশ্বর শব্দ না করে আস্তে আস্তে দরজা দুটো খুলে দিলেন। তারপর ভোরের আলোয় বাবাকে দেখেই আবার সচকিত একটু। ধবধবে ফর্সা আদুড় গা অদ্ভুত লাল-লাল লাগছে। কেউ যেন সর্বাঙ্গে হালকা সিঁদুর গুলে আলগা করে বুলিয়ে দিয়েছে। এই কারণেই জ্যোতি ঠিকরোচ্ছে মনে হচ্ছিল।

বাবা খুব আস্তে আস্তে আসন ছেড়ে উঠলেন। ওঁদের দু'জনকে দেখলেন। অদ্ভুত সুন্দর হাসলেন। শুধু বললেন, তোমরা এসেছ...

বেরিয়ে এলেন। তাঁকে এত আস্তে কখনো পা ফেলতে দেখেন নি সোমেশ্বর। বাইরে এসে খড়ম পায়ে দিলেন। তারপর গভীর দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ ভিতরে মায়ের বিগ্রহের দিকে চেয়ে রইলেন। সোমেশ্বর জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন, গায়ের রঙ এমন অস্বাভাবিক লাল দেখাচ্ছে কেন। মুখ খুলেও থেমে গেলেন। ভাবলেন, অনেকক্ষণ যোগমগ্ন থাকার দরুন এমন হতে পারে।

তারপরেই আবার বাবার কথা শুনে চমকে উঠলেন। তিনি বললেন, তোমরা এসে ভালোই করেছ—আমাকে ওপরে নিয়ে চলো।

এমন কথা কি বাবা জীবনে কখনো বলেছেন! কখনোই না। তাড়াতাড়ি বাবাকে ধরলেন সোমেশ্বর। অন্য দিক থেকে বাসন্তীও। তিনি এত বিহ্বল যে মাথা থেকে ঘোমটা খসে গেছে তা-ও খেয়াল নেই। ধীরে খুব ধীরে একটি একটি করে সিঁড়ি পেবিয়ে ওপরে উঠলেন তাঁরা। সোমেশ্বর টের পাচ্ছেন বাবার শরীর একটু একটু দুলছে। যোগভঙ্গের পর এরকম হয় শুনেছিলেন। তবু তাঁকে ঘরের দিকে নিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন, শরীর খারাপ লাগছে না তো?

তিনি পরিষ্কার জবাব দিলেন, শরীরের কথা ছাড়ো, আমি খুব ভালো আছি।

ঘরে এনে শুইয়ে দেওয়া হল। উৎসুক চোখে তিনি একবার দরজার দিকে তাকালেন। যেন কেউ আসবে প্রত্যাশা। বাসন্তীকে বললেন, তুমি আমার মাথার কাছে বসো। সোমেশ্বরকে বললেন, আমাকে একটু জল দাও।

সোমেশ্বর জল এনে দিতে শুয়ে শুয়ে হাঁ করলেন। তিনি জল ঢেলে দিলেন। এও জীবনে এই প্রথম। সমস্ত ব্যাপারটাই দুর্বোধ্য লাগছে।

মস্ত খাটের পায়ের দিকটা দেখিয়ে বাবা বললেন, বোসো।

জলের গেলাস রেখে সোমেশ্বর তাড়াতাড়ি এসে বসলেন। কি করবেন তিনি? কি বলবেন? বাবার মুখখানা তো অদ্ভুত সুন্দর দেখছেন। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস দেখছেন। কেবল গায়ের রঙ তেমনি অস্বাভাবিক লাল।

বাবা আবার এমন উৎসুক চোখে দরজার দিকে তাকালেন যে সোমেশ্বর বা বাসন্তীও সেদিকে না তাকিয়ে পারলেন না। কিন্তু দরজায় কেউ নেই।...বাবা তাহলে কাকে আশা করছেন? এত ভোরে কে আসবে?

বাবার কথা কানে আসতে সচকিত আবার। এতটুকু জড়তা নেই। বরাবরকার মতোই স্পষ্ট। তাঁকেই বলছেন।—বি.এ. পাশ করে তুমি কলকাতায় এম. এ. পড়তে যেতে চাইলে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কি হতে চাও?...তোমার সেদিনের জবাব আমার খুব ভালো লেগেছিল। বলেছিলে সরল সম্মানের জীবন চাই। আসলে এটা বিরাট চাওয়া। ...পাওয়ার আনন্দ না পাওয়ার খেদ দুই-ই তাহলে ছাড়তে হয়। চাওয়ার ঝোঁকে পড়ে আমার কিছু হল না। তোমার যেন হয়। যা চাও তার মূল্য দিতে ভুলো না।

একটু মাথা উঁচিয়ে বাসন্তীকে দেখলেন। তেমনি সহজ স্পষ্ট স্বরে বললেন, ভালো রেখো, ভালো থেকো।

তারপর আবার ছেলের দিকে।—দোষের মধ্যে তোমার চিত্ত একটু অস্থির লক্ষ্য করেছি। স্থিরচিত্ত হতে চেষ্টা করো। স্থিরবুদ্ধি অসংমূঢ় থেকো। উতলা হয়ো না। একটা কথা মনে রেখো, পড়ে যে থাকবে তার নাম সিদ্ধেশ্বর চাটুজ্জে হতে পারে, কিন্তু সে আমি নই।

সঙ্গে সঙ্গে দরজার দিকে চেয়েই একমুখ হাসি। আনন্দে একটা হাত সেদিকে খানিকটা তুলে বললেন, ওই তোমার মা এলেন, আমি যাই।

সঙ্গে সঙ্গে মাথা একটু তুলেও আবার বালিশে রাখলেন। চোখ বুজলেন।

সোমেশ্বর আর বাসন্তীও এমনি বিমূঢ় যে তাঁরা বুঝলেনই না কিছু ঘটে গেল। প্রথমেই দরজার দিকে তাকিয়েছেন তাঁরা তারপর পরস্পরের মুখের দিকে। তারপর বাবার দিকে। তারপরেও বুঝছেন না কি হয়ে গেল।

সোমেশ্বর চাটার্জী জন্ম মৃত্যুর রহস্য নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাননি। জন্মের আগে কি বা মৃত্যুর পরে কি জানেন না। জানতে চানওনি। অনেক জন্ম দেখেছেন। মানুষের মুখে আনন্দ দেখেছেন। অনেক মৃত্যুও দেখেছেন। মানুষকে শোকাহত দেখেছেন। ...মায়ের মৃত্যুতে তিনিও কম শোকাহত হননি। কিন্তু বাবার এই যাওয়াটাকে মৃত্যু ভাবতে এমন অদ্ভুত লাগছে কেন তাঁর? মৃত্যুতে শোক হয়। কাঁদে। মায়ের বেলায় হয়েছিল। নিশ্চুপে কেঁদেছিলেন।...বাসন্তী খুব কাঁদছে। তিন দিন ধরেই কাঁদছে। কিন্তু তাঁকে ধরে নিঙড়োলেও এক বিন্দু কান্না ঝরবে না। বুকের হাড়পাঁজর দুমড়ে ভাঙছে। ভিতরে একটা খরখরে শূন্যতা খাঁ-খাঁ করছে। এরও নাম কি শোক?

সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রস্ত। বাবা কি দেখছেন তাঁকে? তাঁর অবস্থাটা টের পেয়েছেন? বাবা

বলেছিলেন, স্থিরবুদ্ধি অসংমূঢ় থেকো। বলেছিলেন, উতলা হ'য়ো না! এর নাম কি অস্থিরচিত্ততা? অসংমূঢ়তা? তিনি কি উতলা হয়ে বাবার শেষ উপদেশ এরই মধ্যে ভুলতে বসেছেন?...বাবা আপনি শুধু একবার বলে দিন, আমার এই অবস্থাটা কি, এই অবস্থা কেন—আমি শোক করতে চাই না, আপনার আদেশ অমান্য করতে চাই না—আমি শুধু আপনাকে আর একটু জানতে চাই, আর একটু বুঝতে চাই।

## চার

অজয় এখন অনেকটা দূরে। কম করে ন-দশ মাইল হবে। সে তুলনায় দামোদর ঢের কাছে। রেল লাইন পেরুলে জিটি রোডের ওধারে পৌনে দু'মাইলের মধ্যে। কিন্তু নিত্য অবগাহন স্নানের পক্ষে এই দূরত্বটা কম নয় আদৌ। রোজ এতটা পথ পায়ে হেঁটে নদীতে অবগাহন স্নান আজ বিশ-বাইশ বছরের অভ্যেস সোমেশ্বর চাটুজ্জের। তাঁর কাছে দূর বলে কোনো কথা নেই। সমবয়সীরা এমন কি পাঁচ দশ বছরের ছোট তাঁর থেকে, তাঁরাও মানুষটার ওই পা দুটোকে হিংসে করেন। আর মানুষটাকেই যাঁরা হিংসে করেন, তাঁরা কৃপণ ভাবেন। এত যাঁর বিত্ত, এই বয়সে এ-ভাবে তাঁর হেঁটে মরার দরকার কি? অনায়াসেই তো একটা সাইকেল রিকশ মাস-ভাড়ায় ঘরের দোরে সর্বদা মজুত রাখা যেতে পারে। তাঁর থেকে কম অবস্থার লোকের দোরেও মাস-ভাড়ার সাইকেল রিকশ বাঁধা।

বয়সের কথা তুলে যাঁরা মুখ মচকান তাঁরা অঙ্কের হিসেবটাই শুধু তুলে ধরেন। নইলে পুরুষের বয়স যে ঠিক কাকে বলে এই একজনকে দেখে অন্তত তাঁরা সঠিক হদিস পান না। সোমেশ্বর চাটুজ্জের বয়েস এখন পঞ্চান্ন। সমবয়সীরা তাঁকে তিরিশে যা দেখেছেন, চল্লিশেও তাই দেখেছেন, পঞ্চান্নতেও তাই দেখছেন—নিজেরা বেঁচে থাকলে হয়তো পঁচাত্তরেও তাই দেখবেন। একটু বাড়তি না, একটু কমতি না। রোগার ওপর ওই লম্বা শরীরে এক গ্রাম চর্বিরও ঠাঁই হয়েছে ভাবেন না কেউ। শুধু শরীর নয়, পঁচিশ বছরের মধ্যে চেহারা বা বেশভূষারও উনিশ-বিশ চোখে পড়ে না কারো। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, সেই চুলে এ-বয়েসেও পাক ধরার লক্ষণ নেই। কেবল একটু ধূসর হয়েছে। ছোট গোঁপে অবশ্য দু-চারটে সাদা চুল উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে এখন। পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি, পরনে ধুতি যত ভালোই হোক একটু তুলে বা খাটো করে পরার অভ্যাস। সামনেটা পাট করা। ক্ষেতে বা ক্রিয়াকর্মে বেরুলে গায়ে পরিষ্কার ফতুয়া— গলার কাছে বা ফতুয়ার তলা দিয়ে ধপধপে পৈতের জেল্লা ঠিকরোয়। কোন বিশেষ জায়গায় বেরুলে গায়ে মোটা কাপড়ের ঢোলাহাতা পাঞ্জাবি, কাঁধে মুগার চাদর। হাড় কাঁপানো শীতের সময়েও ফতুয়া বা পাঞ্জাবির ওপর একটা তুষের চাদর ছাড়া আর কিছু দরকার হয় না।

কারো ভালো কথায় বা মন্দ কথায় এই মানুষের প্রতিক্রিয়ার রকমফেরও বড় চোখে পড়ে না কারো। তোয়াজ তোষামোদে যে মুখ, কটু কথায়ও সেই মুখ। দুই ঠোঁটের ফাঁকে সর্বদা একটু হাসির মতো লেগে থাকে। ঝকঝকে কালো দুই চোখে সেই হাসির ছোঁয়া আরো একটু বেশি। আর কথা বললে বা সত্যিসত্যি হাসলে মনে হবে, খুব ছোট খাড়া-খাড়া গোঁপের ফাঁক দিয়েও একটু হাসি পিছলে পড়ছে।

সোমেশ্বর বলেন, সাইকেল রিকশ মজুত করে শক্তপোক্ত পা দুটোকে ঠুঁটো করে লাভ কি, আজ পর্যন্ত পেটের গণ্ডগোল কাকে বলে জানলাম না।

এ যে মিথ্যে বড়াই নয় এ-ও সকলেরই জানা। শুধু পেটের কেন, শরীরের কোন অঙ্গের কোন গণ্ডগোলের অভিজ্ঞতা কখনো হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে সরাসরি মুখ মচকানো বা কটু কথা বলার মতো লোকের সংখ্যাও খুবই কম। তাঁর থেকে বয়েস বেশি যাঁদের, অথবা দু'দশ বছরের ছোট যাঁরা—তাঁরা সকলেই এই মানুষের বাপকেও চোখের ওপরে দেখেছেন। না ডাকলে কেউ কাছে ঘেঁষতে সাহস করেননি, দূর থেকে সসম্ভ্রমে দেখেছেন। সামনাসামনি হলে শ্রদ্ধায় অবনত হয়েছেন। যে ব্যবধানের গণ্ডীর ও-ধারে সিদ্ধেশ্বর চাটুজ্জে থাকতেন সেটা যে দম্ভের গণ্ডী নয় তা-ও সকলেই জানতেন। তবু দুর্লঙ্ঘ্য ছিল সেটা। তাঁর মৃত্যুও তেমনি বিস্ময়কর, তেমনি রোমাঞ্চকর। কিন্তু বাপ আর ছেলের রাত দিনের তফাৎ। না ডাকলেও কাছে আসতে ইচ্ছে করে, বসতে ইচ্ছে করে, কথা কইতে ইচ্ছে করে, কথা শুনতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, অমন বাপের কিছুই পায়নি বটে, কিন্তু জীবনের কিছু একটা চাপা কৌতুকের উৎস এই মানুষটির জানা হয়ে গেছে। যার দরুণ সকল প্রতিকূলতার ঊর্ধ্বে অনায়াসে বিচরণ করতে পারেন। কিছুই গায়ে লাগে না, কিছুই আঁচড় কাটে না।

তাছাড়া ঠাট্টা তামাসা করবেন কি। রেষারেষি বা আড়াআড়ির ছলেও এই লোকের সংস্রবে এসে সু বই কু কারো হয়নি। বাজি ধরে ক্রনিক ডিসপেপসিয়ার রোগীকে তিনি স্রেফ হাঁটিয়ে ভালো করেছেন, বেতো রোগীকে মাস কয়েক সূর্যরশ্মির নানা প্রকরণের মধ্যে চালিয়ে বেচে থাকার নতুন স্বাদ এনে দিয়েছেন। রাত-বিরেতে কারো ভেদবমি শুরু হলে গ্রাম দেশে ডাক্তার কোথায় মেলে? তখন ছোটো ওই সখের ডাক্তারের কাছে। তাঁর হোমিওপ্যাথির ফোঁটায় বা আয়ুর্বেদের টোটকায় কাজ হয় কিনা আগে দেখো। বিদ্বান আর পণ্ডিত তো কম নয়, আশপাশের পাঁচ গ্রামে জাল ফেললেও অমন একজনকে ছেঁকে তোলা যাবে না—আর কিছু না হোক তার মধ্যে ভাওতাবাজির ব্যাপার তো কিছু নেই—আগে তাঁকে খবর দাও, দেখো কিছু হয় কিনা। ডাক্তার ডাকার দরকার হলে ভোর না হতে সকলের আগে ওই মানুষই ছুটে আসবেন।

...আপদে-বিপদে এই একজনকে ডাকার ব্যাপারে সময় অসময় বলে কিছু নেই। গিয়ে দাঁড়ালেই হল, চাটুজ্জে মশাই বলে হাঁক পাড়লেই হল। কাজ হয় না এমন নয়। অজ্ঞ অবুঝদের বেলায় কাজ বেশিই হয়। সেটা তাঁর ওষুধের গুণে, কি যে-বিশ্বাস তিনি রোগীর মনে অনায়াসে আরোপ করতে পারেন সেই গুণে—কে জানে। সমবয়সীদের মধ্যে অনেকে যাঁরা ঠাট্টা-তামাসা করেন, বিপাকে পড়লে চুপিচুপি তাঁরাই এসে সবার আগে তাঁকে ধরেন—এই এই মুশকিল হল, কি করা যায় বল তো ভায়া।

সোমেশ্বর তখন একবারও পুরনো ঠাট্টার কথা তোলেন না। নিজে যা পারেন করেন, নয় তো পরামর্শ দেন। তাঁর বিশাল দালান, ঠাকুরদালানের দু'পাশের দু'সারিতে ওপর নিচে ছয়-ছয় বারোখানা বড় ঘর। ছেলেমেয়েরা এখন ওপর তলার দু'দিকে যে-যার খুশি মতো ছড়িয়ে থাকে। নিচের তলায় সোমেশ্বরের বৈষয়িক অফিস ঘর, রোগী দেখার ঘর, সংস্কৃত সংগ্রহের লাইব্রেরী ঘর, আয়ুর্বেদ আর হোমিওপ্যাথি চর্চার ঘর, ফুল ফল বা অন্য কিছুর চারা ঘর। এ-ছাড়াও নিচের এক দিকের সামনে যে ঘরটা পড়ে থাকে

সেটা স্রেফ আড্ডার ঘর। বিকেলের দিকে তিনি বাড়ি আছেন টের পেলেই গুটিগুটি বয়স্কজনদের আগমন শুরু হয়। আড্ডা ছাড়া অন্য আকর্ষণও আছে। সাদাসিধের ওপর জলযোগের আপ্যায়নটুকু মন্দ হয় না। কিন্তু মুখে কেউ স্বীকার করুন বা না করুন —সব থেকে বড় আকর্ষণ এই বাড়ির মালিকটিই। এঁদের মধ্যে কাউকেও ছেড়ে কথা কন না এমন দুর্মুখও কেউ কেউ আছেন। কিন্তু পর পর তিন দিন এই মানুষের দেখা না পেলে বিষণ্ণ হয়ে পড়েন, অন্য সময় এসে খোঁজ নিয়ে যান কি নিয়ে এত ব্যস্ত।

অথচ যাঁর কাছে আসা তিনি তর্ক কোনো ব্যাপারে মোটেই করেন না। সোমেশ্বর চাটুজ্জে কথা বলার থেকে কথা শোনেন বেশি। আর শব্দ না করে হাসেন বেশি। মোট কথা মনে মনে এখন অনেকেরই ধারণা, বাপের আশীর্বাদে হোক বা যে কারণেই হোক লোকটা মানুষ বশ করার জাদু জানেন। কত বিরূপ মানুষকে মাথা নুইয়ে আবার এঁর কাছে আসতে দেখা গেছে। এখনো যাচ্ছে। তারণ ভটচাযের ব্যাপারখানা তো হালের। দু'বছরও হয়নি। সকলেই ধরে নিয়েছিলেন, চিরকালের মতো এঁদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল। তারণ ভটচায গরীব, কিন্তু একরোখা খিটখিটে মেজাজের মানুষ। যজমানি করে দিন চলে, আর সামান্য কিছু পৈতৃক জমি আছে। সকলেরই ধারণা একে একে পাঁচটি কন্যা পার করতে হয়েছে বলেই ভদ্রলোকের মেজাজের এই হাল—এখনো একটি সোমত্ত বয়সের মেয়ে কাঁধে ঝুলছে।

এই শেষের মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে তুমুল হয়ে গেল। তুমুল বলতে অবশ্য একতরফাই। সোমেশ্বর কখনো গলা তোলেননি। কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক তিন হাজার টাকার জন্য বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। মেজাজ ভুলে তখন সোমেশ্বরের কাছেই এসে প্রথম কেঁদেকেটে পড়েছিলেন। একা আসেননি, সোমেশ্বরের অনুগত আরো দু'তিনজনকে সঙ্গে এনেছিলেন। বিয়ের দিন স্থির। এখন টাকা না পেলেই নয়। কিন্তু সকলকে অবাক করে সোমেশ্বর সবিনয়ে মাথা নেড়েছেন। ধার তিনি জীবনে কাউকে দেননি, দেবেন না। দিশেহারা তারণ ভটচায তখন তাঁর ছোট জমিটুকু বন্ধক রেখে টাকা দেবার জন্য অনুনয় করেছিলেন। সোমেশ্বর আবার বলেছেন, এ-কাজও তিনি করেননি, করতে পারবেন না।

সোমেশ্বরের ছেলে ধ্রুবও তখন এখানে। দিন কয়েকের জন্য এসেছিল। বাইরের এক ভদ্রলোকের উঁচু গলা শুনে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল। তারণ ভটচায তখন ক্ষিপ্ত হয়ে বাবাকে যা-তা বলছেন। নীচ বলছেন. ভণ্ড বলছেন, টাকার পিশাচ বলছেন। অভিশাপ দিচ্ছেন, দিক দিক, ভগবান আরো ঢেলে দিক —তার পর ওই টাকা চাপা পড়েই দম বন্ধ হোক।

ব্যাপার বুঝতে ছেলেরও সময় লাগেনি। তারণ কাকা মেয়ের বিয়ের সমস্যায় পড়েছে এসেই শুনেছিল। ছেলেরও প্রচণ্ড খারাপ লেগেছে। বাবাকে সে-ও কৃপণই ভাবে, আর টাকা হাতে পেলে ছাড়েন না জানে। কিন্তু লোকের জন্য যাঁর বাইরে এত দরদ, সেই মানুষ এমন নির্মম হতে পারেন—চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছিল না। এক ঝটকায় বেরিয়ে গিয়ে দোতলায় এসে মাকে কথা শুনিয়েছিল সে।

—তারণ কাকা বাবাকে কি যাচ্ছেতাই গালাগাল করছে শুনেছ?

বাসন্তী হাঁ।—তোর বাবাকে গালাগাল করছেন। কেন?

—কেন আর। তিন হাজার টাকার জন্য তাঁর মেয়ের বিয়ে পণ্ড হতে চলেছে। ভদ্রলোক কত কাকুতি-মিনতি করল, নিজের জমি বন্ধক দিয়ে তিন হাজার টাকার জন্য বাবার হাতে-পায়ে ধরতে গেল—বাবার সাফ কথা, টাকা কাউকে ধার দেয় না বা ও-সব কাজ করে না—হবে না। বিরক্তিতে ছেলের মুখ লাল।—আমার টাকা থাকলে বাবার সামনেই আমি ওই তিন হাজার টাকা ফেলে দিতাম।

বাসন্তী চুপচাপ ছেলের রাগত মুখের দিকে চেয়েছিলেন। বাড়ি বয়ে এসে বাপকে কেউ গালমন্দ করে গেলে ছেলের আঁতে লাগারই কথা। শুধু তাই হলে খুশি হতেন। কিন্তু এ ব্যাপারে ছেলে তার বাপের টাকার মমতাটাই বড় করে দেখছে আর সেই কারণে ওই বাপ ছেলের চোখে ছোট হয়ে যাচ্ছে এটুকুই বেশি স্পষ্ট। শেষের ওই দম্ভের কথা ক'টাও খুব পছন্দ হল না। বললেন, তাহলে তোর নাম করে তিন হাজার টাকা চেয়ে নিয়ে তোকে দেবো?

ওই বিপন্ন ভদ্রলোকের জন্য ধ্রুব চ্যাটার্জি মায়ের সহানুভূতিই আশা করেছিল। তা না, মায়ের এই কথাগুলোর মধ্যে যেন একটু বিদ্রূপের ছোঁয়া আছে। ছেলে আরো তেতে উঠল।—থাক টাকার ব্যাপারে বাবা আমারও বদান্য হওয়া বরদাস্ত করবে না তক্ষুণি বলে দেবে নিজের রোজগারের টাকা বার করতে কেমন লাগে আগে সে অভিজ্ঞতা হোক।

মায়ের তেমনি মোলায়েম জবাব।—সে-ও তো ঠিক কথাই।...তাছাড়া চাইলেই ঘরে তিন হাজার টাকা মজুত থাকবে এ-ই বা তোকে কে বলল?

মায়ের জন্য রাগ হবে কি দুঃখ হবে ছেলে ভেবে পায়নি। তিন হাজারের দশ-বিশ গুণ যে-কোন সময় বাবা ঘর থেকেই বার করে দিতে পারে বলে ধারণা। কিন্তু টাকা-পয়সার ব্যাপারে বাবার মুখ এমন সেলাই যে এই ভালোমানুষ মা-টি পর্যন্ত কোন কিছুর হদিস পায় না। তার ধারণা, বাবার প্রতি মায়ের শুধু অন্ধ ভক্তি আর অন্ধ বিশ্বাসই নয়—এ-এক ধরনের ব্রেন-ওয়াশ। বাবার কোন ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দূরে থাক, কানে শুনতেও রাজি নয়। ধ্রুব বাবার টাকার হিসেবের মধ্যে না গিয়ে ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠেছিল, টাকা যদি ঘরে না-ই থাকবে তো বাবা তারণকাকাকে সে-কথা বলে দিল না কেন—এই বিপদের সময় উল্টে তাকে নীতিকথা শোনাতে গেল কেন? মানুষের জন্য তো বাবার কত দরদ, এই বেলায় এত নীতি আঁকড়ে থাকার মানে কি? বিপাকে পড়লে টাকা শুধু মানুষেরই দরকার হয় আর তখন সে মানুষের কাছেই ছুটে আসে—এ তুমিও জানো না বা বোঝো না?

এত কথার পরেও মাকে প্রায় নির্বিকারই দেখেছিল ধ্রুব। আর কথাগুলোও একটু তির্যক মনে হয়েছিল। বাসন্তী বলেছিলেন, তুই আমাদের থেকে ঢের বেশি জানিস বুঝিস দেখছি—যা, আর মাথা গরম করতে হবে না।

তারণ ভটচায ওদিকে চোখের জল মুছতে মুছতে চলে গেছেন। যাক, শেষ পর্যন্ত মেয়ের বিয়ে আটকায়নি। কি করে ভদ্রলোক টাকা সংগ্রহ করেছেন তিনিই জানেন। বিয়েতে লোকও একেবারে মন্দ খাওয়াননি। সোমেশ্বরকে যে সপরিবারে নেমন্তন্ন করেছিলেন সেটা সকলে ছেড়ে ছেলেও বুঝেছিল। কিন্তু ছেলে হতভম্ব হয়ে গেছল, মাকে নিয়ে বাবা দিব্যি হৃষ্টচিত্তে সেই নেমন্তন্ন রাখতে গেলেন দেখে। শুধু তাই নয় ওকেও জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি রে, ভটচাযের বাড়ি নেমন্তন্নে যাবি না?

এম. এ পড়া ছেলে আর্তনাদ করে উঠেছিল, তুমি সেই বিয়েতে যাচ্ছ বাবা?

বাবা আরো অবাক।—নেমন্তন্ন করেছেন, না গেলে তো সেটা অভব্যতা!

ধ্রুব এ-কথার জবাব না দিয়ে সামনে থেকে চলে গেছল। শুধু বাবা নয়, মায়ের ওপরেও সে বিষম ক্রুদ্ধ।

প্রতিবেশীদের মধ্যে যাঁরা সোমেশ্বরকে । য়েবাড়িতে দেখেছেন সকলেই অবাক। আড়চোখে তারণ ভট্চাযকে লক্ষ্য করেছেন তাঁরা। সে ভদ্রলোকের মুখে যেন কুলুপ আঁটা। যেমন গম্ভীর তেমনি চুপচাপ। কিন্তু আসল অবাক সকলে দিন পনের বাদে। এক বিকেলে মুখ আমসি করে সোমেশ্বরের একতলা ঘরের বৈঠকে তাঁকেও এসে বসতে দেখা গেল। সেই মেজাজ নেই, আবার মুখে কথাবার্তাও নেই। জীবনে আর তারণ ভট্চায এ-বাড়ির মাটি মাড়াবেন কেউ ভাবেননি।

আর এখন তো এই লোকের সঙ্গে সদ্ভাবের অন্ত নেই তারণ ভটচাযের। স্বভাবখানাই যেন অর্ধেক পালটে গেছে। সোমেশ্বরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রায়ই তাঁকে হাঁটতে দেখা যায়। গল্প করতে দেখা যায়। রুক্ষ মুখে একটু চেকনাইয়ের আভাসও মেলে। এর পরেও সোমেশ্বর চাটুজ্জে মানুষ বশ করার জাদু জানেন না ভাবা যায় কি করে? এ-রকম তাঁরা একে একে খুব কম দেখলেন না। আজ শত্রু, কাল বন্ধু।

রাত থাকতে রোজ যেমন বেরোন, তেমনি বেরিয়েছিলেন। হাতের ঝোলায় শুকনো কাপড়, গামছা। শিশিতে তেল। হাঁটা দেখলে মনে হবে বাতাসে হাঁটেন। বাড়ি থেকে দু'মাইল হেঁটে এই ভোর রাতে দামোদরে পৌঁছুতে পনের মিনিটও লাগে না তাঁর। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করেন। এখনো একটু আধটু সাঁতার কাটেন। কোমরজলে দাঁড়িয়ে আহ্নিক করেন সব সেরে যখন ঘরে ফেরেন তখনো ভালো করে ভোরের আলো জাগে না।

জি. টি. রোড না পেরুতেই বাধা পড়ল। অন্ধকারে কে একজন হনহন করে এদিকেই আসছে। সোমেশ্বর দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকটা আরো এগোতে চিনলেন। গণেশ দলুইয়ের ভাই কার্তিক দোলুই। দু'জনেই কোলিয়ারিতে কাজ করে। খনিতে নামে, কয়লা কাটে। কোলিয়ারির কুলি বস্তিতে থাকে। হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স আর কবিরাজি ওষুধের পুঁটলি নিয়ে সপ্তাহে দু-একদিন করে টহল দেন সোমেশ্বর চাটুজ্জে। সেখানকার মেয়ে পুরুষ সক্কলের তিনি দাদাঠাকুর। আর তাঁর বাড়িটা ওদের ঠাকুরবাড়ি। শুধু ওদের কেন, ওই এলাকায় অন্ত্যজ শ্রেণীর যত ঘর আছে সকলেরই।

বছর কুড়ি আগে বস্তির কোন্ এক মাতব্বরকে যমের মুখ থেকে তিনি ফিরিয়ে এনেছিলেন, সেই থেকে এই এক বড় ঝামেলা জুটেছে তাঁর। সত্যি সেই মরণাপন্ন লোকটা যমের দোর থেকে ফিরে এসেছিল কি করে তিনিও ভালো জানেন না। আত্মীয় পরিজনেরা লোকটাকে তাঁর বাড়ি এনে ফেলেছিল, হাতে পায়ে ধরেছিল। মরণাপন্ন লোকটাকে ওষুধপত্র দিয়ে বাড়িতে ফেরানোও সম্ভব হয়নি। সে-ও যাবে না, সক্কলের জবাব হয়ে গেছে যখন, মরতে হয় এই ঠাকুরবাড়িতেই মরবে। সে তার বাপের কাছে শুনেছে, দাদাঠাকুরের বাপ ছিলেন সাক্ষাৎ দেবতা, যে-দেবতা 'ইচ্ছামিত্যু' ডেকে এনে 'শরীল' ছেড়ে চলে গেছেন। তাই ধারণা, যমকে যারা ইচ্ছেমতো ধরে আনতে পারে তারা তাকে ইচ্ছেমতো ফেরাতেও পারে।

নিচে বাইরের একটা ঘরে রেখেই তার চিকিৎসা করতে হয়েছিল। সেই থেকে ওই এলাকায় খাতির কদর দাদাঠাকুরের। যত দিন গেছে তত রোগী বেড়েছে। এখনো বেড়েই চলেছে। মেয়েছেলেদের আর বুড়োবুড়ীদের এত পথ ভেঙে আসার অসুবিধে। ওদের ডাকের তাগিদে নাজেহাল হয়ে শেষে তিনিই জবান দিয়েছেন, কাউকে আসতে হবে না, সপ্তাহে একদিন দু'দিন আমিই যাব— তোদের দেখে আসব।

কলেজের চাকরিটা যতদিন ছিল ততদিন প্রত্যেক রবিবার ওই এলাকায় যেতেন। দরকার পড়লে এখন দু'দিন তিনদিনও যেতে হয়। এ ছাড়াও যারা পারে তারা বাড়ি এসে হত্যা দেয়। ওদের ওই মহলে বিশ্বাসটা একটা সংক্রামক ব্যাধির মতোই। ডাক্তার বদ্যির ব্যবস্থা এখন আগের থেকে অন্তত ভালো। কিন্তু দাদাঠাকুরের কদর তাতে একটুও কমেনি। ওষুধপত্র এক জিনিস, দিলে খেতে আপত্তি নেই—কিন্তু দাদাঠাকুরের হাতের জল তো একটু খেতেই হবে।

চারদিন আগে গণেশ দোলুইকে দেখে একটুও ভালো মনে হয়নি সোমেশ্বরের। মদ খেয়ে খেয়ে লোকটার লিভার পচে গেছে। যা ওষুধ দেবার দিয়ে নিজেই কোলিয়ারির ডাক্তারকে খবর দিয়ে গেছলেন। কোলিয়ারির নয়া ছোকরা ডাক্তার তাঁকে বা তাঁর চিকিৎসা দেখে ঠোঁট বাঁকিয়ে মনে মনে হাসে। মস্ত অবস্থার মানুষ জানে, তার ওপর কোলিয়ারির ম্যানেজারও ভদ্রলোককে খাতির করে দেখেছে। অতএব তারও মাননীয় ব্যক্তি। ম্যানেজার জীবন ঘোষাল অবশ্য এঞ্জিনিয়ার ম্যানেজার-ট্যানেজার নয়। আসলে কেতাদুরস্ত বড়বাবু। মালিকের খাস লোক। তাঁর দাপট খোদ এঞ্জিনিয়ারের থেকেও বেশি।

কার্তিক দোলুই কাঁদতে কাঁদতে জানালো, গণেশ চললো। শ্বাস উঠেছে। খুব কাঁদছে। আর কেবল বলছে, দাদাঠাকুরকে ডাকো, যাবার আগে তাঁর চন্নামেত্তা মুখে দাও।

সোমেশ্বর গম্ভীর মুখে তার দিকে একটু চেয়ে থেকে বললেন, এর পরেও তোর শিক্ষা হবে না আরো দেখবি?

মদ কার্তিক দোলুইও কম খায় না। আগে তো দু ভাই-ই অঢেল খেত, শনিবারের 'হপ্তা' পেলে সোমবারেও কোলিয়ারিতে যাবার অবস্থা থাকত না। কার্তিক এখনো মদ খায় কিন্তু আগের তুলনায় অনেক কম। শোকাচ্ছন্ন কার্তিক তাড়াতাড়ি তাঁর পা ছুঁতে গেল। সোমেশ্বর সরে দাঁড়ালেন।—এসো।

ফিরে চললেন। হাতের ঝোলা রেখে জামা পরে নিতে হবে। ওষুধের বাক্সটাও নিতে হবে। কোলিয়ারির কুলি এলাকা তিন মাইল পথ এখান থেকে। পথের কথা ভাবেন না, গিয়ে দেখতে পাবেন কিনা ভাবনা।

কার্তিককে ঠাকুরদালানের বাঁধানো উঠোনে দাঁড় করিয়ে ওপরে উঠে এলেন।

...বেশি দিনের কথা নয়। পাঁচ বছর আগে এই উঠোনেই ওদের মদ খাওয়া নিয়ে কি কাণ্ডই না হয়ে গেছল। ওরা চলে যেতে হাসাহাসির ধুম পড়েছিল। ছেলে আর দুই মেয়েও তখন এখানেই। বাবার কাণ্ড দেখে সকলেই হাঁ।

কোলিয়ারির কুলি এলাকার মানুষগুলোকে মদ ছাড়ানোর চিন্তাও হাস্যকর। কিন্তু ওদের মদ খাওয়ার হিড়িক আর তার ফলাফল দেখে দেখে সোমেশ্বরের অসহ্য লাগত এক এক সময়। ডাকসাইটে মরদগুলোকে ডেকে ডেকে তিনি বকাবকি করতেন, গলা ফাটিয়ে গালাগাল করতেন। দাদাঠাকুরের এমন বুকের পাটা দেখে ওদের বউ-ঝিউড়ীরা

অবাক হত—তখন মাথায় ধুলোপড়া মুখ সব। তারা কিছু বললে বা বাধা দিতে গেলে তো দমাদ্দম মার ছাড়া আর কথাই নেই। দাদাঠাকুর সব থেকে বেশি বকতেন ওই গণেশ আর কার্তিক দোলুইকে। বস্তির মধ্যে গণেশ যদি মাতব্বর, কার্তিক তার যোগ্য সহোদর। মদ খেয়ে বউ ঠেঙানো তাদের নৈমিত্তিক কাজ। গণেশ দোলুইয়ের বউটা আবার তেমনি দজ্জাল। মরদকে দা বঁটি নিয়ে তাড়া করে. ফলে মারও বেদম জোটে কপালে। দাদাঠাকুরের কথায় সাহস পেয়ে সে এক-একদিন রণরঙ্গিনী মূর্তিতে এসে দাঁড়ায়, পিঠের কাপড় সরিয়ে মারের দাগড়া দাগড়া দাগ দেখায়। তার দেখাদেখি কার্তিকের বউ আর আরো কারো কারো বউও এসে নালিশ করে, হাতের পায়ের কালশিটে দেখায়।

সোমেশ্বর গণেশের দিকে চেয়ে হুমকি দিয়ে ওঠেন, এই পালের গোদা, তুই মদ ছাড়বি কি ছাড়বি না?

গণেশের তখন কাঁদ-কাঁদ। হাত কচলায়। কান মোলে।—অমন আদ্যেশটি কোরো না গো ঠাকুর—এই দিব্যি কাটলাম আর কোখুনি পরিবারের গায়ে আঁচড়টি কাটবনি।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা যে করে আর মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যে বউকে ঠেঙায় তারা এক মানুষ নয়। একই প্রহসনের পুনরাবৃত্তি ঘটেই চলছিল। কিন্তু দাদাঠাকুরের কাছ থেকে সাহস পেয়ে ওদের রমণীকুলও বেশ বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। একটু কিছু হলেই দাদাঠাকুরের কাছে নালিশ। শেষে একদিন তারা মরদদের সামনেই সোমেশ্বরকে ঘেরাও করে বসল। মদ খেয়ে মরদগুলো সব ছারেখারে দিচ্ছে, হপ্তার টাকার অর্ধেক খুইয়ে মদ গিলে আসে, ঘরে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে, ঘর-দোর নোংরা করে—আর কিছু বলতে গেলেই ধরে ঠ্যাঙানি—এ রকম চলতে পারে না—দাদাঠাকুরকে একটা বিহিত করে দিতেই হবে।

মেয়েদের তরফে সর্দারণী গণেশের বউ। দাদাঠাকুর যতক্ষণ সামনে ততক্ষণ তারা কাউকে পরোয়া করে না।

মাথা ঘামিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা মতলব বার করলেন সোমেশ্বর। অতি মাত্রায় গম্ভীর। তাই দেখে গণেশ কার্তিকের দলের বুক দুরু দুরু।

সোমেশ্বর ঘোষণা করলেন, বিহিত হবে। কিন্তু এখানে নয়, আমার ঠাকুরদালানে। পুণ্যির কাজ পুণ্যস্থানেই করতে হয়। বাড়িতে আমার স্ত্রী ছাড়া এখন মেয়েরাও আছে, কাজেই মেয়েদের কোনো অসুবিধে হবে না। সামনের গুরুবারের সন্ধ্যায় তোমরা মেয়েরা দশজন আমার ওখানে যাবে। গণেশকে বললেন, আর তোমরা ছেলেরা দশজন যাবে। সেখানে খোলা মনে সবকিছুর ফয়সালা হবে। কিন্তু খবরদার ঠাকুরদালানে বা ঠাকুরদালানের বাইরে এসেও তোমাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হলে আমি তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করব। তোমরা যদি শুদ্ধ চিত্তে যাও, মা নিশ্চয় তোমাদের দু'তরফেরই ভালো ব্যবস্থা করবেন।

সেই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওদের মেয়ে পুরুষ দু'দলই ঠাকুরদালানে হাজির। দাদাঠাকুরের হুকুম, না এসে করে কি। পুরুষদের বেশি মুখ শুকনো। কেবল ভরসা, মা দু'পক্ষেরই ভালো করবেন। সোমেশ্বর পাড়ার আরো গণ্যমান্য পাঁচজনকে ডেকেছিলেন। তাঁরাও যথাসাধ্য গম্ভীর মুখ করে হাজির হয়েছেন। তার আগে সোমেশ্বরকে বলেছেন, ওদের মদ ছাড়তে বলা জল ছাড়তে বলার সামিল—কি লাভ?

এদিকে বাড়ির ছেলে-মেয়েরাও দাওয়ায় কোন্ বিচারের সভা বসতে যাচ্ছে শুনে তাজ্জব।

সোমেশ্বর নেমে এলেন। পরনে গরদ। আদুড় গায়ে গরদের চাদর। শুদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রতিমূর্তি। আর তেমনি গম্ভীর। দেখেই পুরুষদের মুখ শুকনো। তিনি নেমে আসা মাত্র পুরুষ আর মেয়ের দঙ্গল সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। দোতলা থেকে বাসন্তী আর ছেলেমেয়েরা মজা দেখছেন।

সোমেশ্বর জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, মাকে আগে সকলে প্রণাম করে এসো। আগে মেয়েরা যাও।

মায়ের এই মন্দিরে জাতের বিচার নেই সকলেই জানে। এর থেকে ঢের বড় রকমের জাতের পরীক্ষা সোমেশ্বরের হয়ে গেছে—সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। মেয়েরা ছুটল। প্রণাম করে যে যা পারে থালায় পয়সা ফেলল।

শুকনো মুখে গণেশ সাহস করে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, পেন্নাম করে মায়ের কাছে কিছু পিতিজ্ঞে-টিতিজ্ঞে করতে হবে?

সোমেশ্বর মাথা নাড়লেন।—কিছু করতে হবে না, শুধু ভক্তিভরে প্রণাম করতে হবে।

খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে পুরুষেরাও প্রণাম করে এলো। মায়ের থালায় তারাই বেশি পয়সা ছুঁড়ল। গণেশ ফের এসে তাঁকে সকাতরে বলল, আমাদের দারু খেতে নিষেধ করে পাপের ভাগ্নী করব্যান না হুজুর।

সোমেশ্বরেব গাম্ভীর্যে এতটুকু ফাটল ধরল না। হুকুম করলেন, চুপ করে বোসো, তোমার বলার সময় বলবে।

মেয়েরা সার বেঁধে বাঁধানো দাওয়ার একদিকে বসল। পুরুষেরা ওদের মুখোমুখি উল্টোদিকে। তাদের সামনের উঁচু চাতালে সোমেশ্বর আর গণ্যমান্য অভ্যাগতরা। সোমেশ্বর প্রথমে মেয়েদের হুকুম করলেন, তোমাদের কি বলার আছে বলো।

ততক্ষণে মেয়েদের আড়ষ্টতা কেটেছে। গণেশের বউই তাদের প্রধান। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলে যেতে লাগল, মদ খেয়ে মরদগুলো তাদের কি হেনস্থা করে, কতভাবে কত সর্বনাশ ডেকে আনে। তার সমর্থনে হাত মুখ নেড়ে আরো দু'চারজন একই কথা বলে গেল।

মানী অভ্যাগতরা ঘনঘন মাথা নেড়ে সায় দিলেন, খুব খারাপ, মদ খাওয়া খুব খারাপ। তাই শুনে আর দেখে এদিকের পুরুষদলের মুখ চুন।

এরপর পুরুষদের ডাক পড়তে গণেশই উঠে দাঁড়ালো। কোলিয়ারিতে তাদের মিত্যু'র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কি হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয় বলল। একটু-আধটু দারু না খেলে তারা প্রাণেই বাঁচবে না। দারু খেয়ে পরিবার ঠ্যাঙানো খুব অন্যায় সেটা স্বীকার করল। এ-জন্যে যারা অল্প-স্বল্প দারু খায়, মার ঠেকানোর ভার তারা নিতে পারে এমন পরামর্শও দিল।—কিন্তু দোঃহাই দাদাঠাকুর, দারু বন্ধ করার হুকুম দিয়ে আমাদেরকে পেরাণে বধ করব্যান না!

সভা স্তব্ধ কয়েক মিনিট। এবারে সোমেশ্বর উঠে দাঁড়ালেন। যেমন গম্ভীর তেমনি জলদ কণ্ঠ।

—শোনো মেয়েরা আর শোন্‌ তোমরাও—সকলে খুব মন দিয়ে শোনো। আমার কথা নয়, শাস্ত্রের কথা শোনো।

সকলে উৎকর্ণ।

সোমেশ্বরের গলার স্বর আরো একটু উদাত্ত ঃ

'পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা, পতিত্বা ধরণীতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা, পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।'

মেয়ে-পুরুষদের কেউ এক বর্ণও না বুঝে হাঁ, আর উপস্থিত মান্যজনদের মধ্যে দু-একজন যাঁরা বুঝলেন তাঁরা আরো বেশি হাঁ। সোমেশ্বরের পূর্ণ দৃষ্টি পুরুষদের দিকে।

—শাস্ত্র কি বলছেন? শাস্ত্র বলছেন, মদ খাও—খেয়ে যাও—আবার খাও— খেয়ে মাটিতে গড়াগড়ি করো—তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আবার খাও—তাহলে পুনর্জন্ম হবে না —অর্থাৎ তুমি পাপমুক্ত হবে।

শুনে মেয়ের দল হতচকিত। আর পুরুষের দলও কম হতভম্ব নয়। তারা কানে যা শুনল, বিশ্বাস করবে কি করবে না ভেবে পাচ্ছে না। শাস্ত্র যে এ ব্যাপারে এত উদার, ভাববে কি করে? কিন্তু দাদাঠাকুর স্বয়ং শাস্ত্রের কথা বলেছেন—অবিশ্বাসের কি আছে? পুরুষদলের কালো মুখে হাসি ফুটতে লাগল।

গমগমে অথচ চাপা ধমকের সুরে এবারে সোমেশ্বর বললেন, খুব মজা, খুব হাসি —কেমন? ব্যাপারখানা আগে বোঝো ভালো করে, পরে হেসো। শাস্ত্রে মদ খেতে নিষেধ নেই—খেয়ে ফুর্তি করে একটু মাটিতে গড়াতেও নিষেধ নেই—কিন্তু শেষে কি বলেছেন শাস্ত্র? বলেছেন শেষে উঠে দাঁড়াতে হবে—সেভাবে দাঁড়িয়ে আবারও খেতে পারো —কিন্তু আর শুতে বা গড়াগড়ি খেতে বলেছেন কি? তাহলে তো নরক বুঝতে পারছ না? এই উঠে দাঁড়ানো মানে কি, শরীর মন তাজা রাখার জন্য কিছু ফুর্তি চলতে পারে —কিন্তু বদ্ধ মাতাল হওয়া নয়। শেষ মদটি খেয়ে দাঁড়ানোর শক্তি রাখতে হবে, আর শুয়ে অচেতন হওয়া চলবে না।

পুরুষের দল এবারে প্রমাদ গুণল। দারু গেলার পর মাটিতে ঢলে পড়াই তো একমাত্র সুখের আশ্রয়! কিন্তু তাতে নরকে পচতে হবে এ কেমন কথা! তাহলে তারা কি করবে?

সোমেশ্বরের দৃষ্টি এবার মেয়েদের দিকে। শাস্ত্রে যখন বলছে, তোমরা একেবারে মদ খেতে দেবে না এ তাহলে হয় কি করে? কিন্তু তোমাদের কর্তব্য ওদের থেকে বেশি—মদ খাওয়ার শেষে মাটিতে পড়ে ওদের অজ্ঞান হতে দিয়ে নরকে যেতে দেবে কি? না টেনে দাঁড় করিয়ে পাপমুক্ত করবে?

গণেশ দোলুইয়ের বউ সদর্পে উঠে দাঁড়াল।—দাদাঠাকুর যখন বুঝ্যে দিল্যান আর ছাড়ি! চুলের ঝুঁটি ধর‍্যা টেইন্যা তুলব—ঝ্যাটা মাইর‍্যে খাড়া করাব।

সোমেশ্বর সায় দিলেন।—ঠিক। তখন যদি কেউ তোদের গায়ে হাত তোলে আমাকে বলিস, আমি তাকে আস্ত রাখব না—শাস্ত্র অমান্য করলে কেউ ক্ষমা করবে না। পুরুষদের দিকে ফিরলেন।—তোরা অমন গালে হাত দিয়ে বসলি কেন—আরে বোকারা, শাস্ত্র ফাঁকি দেবার রাস্তাটাও দেখলি না? যা খাস তার থেকে কম খাবি, তাহলে ফুর্তি করে একটু মাটিতে গড়াগড়ি করে উঠে দাঁড়াতে অসুবিধে কি? তারপরে যখন খাবি আবার না পড়তে

হয় সেই মাপে খাবি। খেয়ে ছেলে মেয়ে বউয়ের ভালো কি করে হয় ভাববি, আনন্দ করে খানিক গল্প করে শেষে সুখে ঘুম লাগাবি—মাথায় ঢুকেছে?

অকূলে কূল পেল তারা। ঘন ঘন মাথা নেড়ে সায় দিল। মেয়ের দলও অখুশি নয় আর। দাদাঠাকুর শাস্ত্রের পথ বাতলে দিয়েছেন আর ভাবনা কি।

ওরা চলে যেতে সোমেশ্বরের দুই মেয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসেছে। ছেলে হাসি চেপে গম্ভীর মুখে বাবার মুখোমুখি হয়েছে।—মদ খাওয়ার ওই শ্লোকটা তোমার নিজের তৈরি না কোথাও পেয়েছ?

মুচকি হেসে সোমেশ্বর জবাব দিয়েছেন, কোথাও পেয়েছি। কিন্তু ও শ্লোক তোর বা তোদের মতো কারো জন্যে নয়।

কাজ কিছু হয়েছিল সন্দেহ নেই। মাত্রা ছাড়িয়ে কেউ মাটি নিতে গেলে ওদের বউরা সত্যি চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টেনে তেলে। দাদাঠাকুরের পরোয়ানা পেয়ে তাদের মেজাজ অন্যরকম। মরদকে তো আর নরকে পচতে দিতে পারে না তারা। টেনে তোলার সময় চিৎকার করে দাদাঠাকুরের নাম করে শাসায়—তাতেই তাদের চটক ভেঙে যায়। ফলে মাত্রার একটা হিসেব সকলেই মনে মনে করে নেয়। এই করে ওদের অঢেল মদ গেলা কিছু কমানো গেছে। অবশ্য পরেও সোমেশ্বরকে কম খাটতে হয়নি। ফাঁক পেলে তিনি এক-একজনকে ধরে বোঝান, মদ খেলে কি ক্ষতি হয়, কত রকমের সর্বনাশ হয়। এরকম শুনতে শুনতেও অনেকে খাওয়া কমিয়েছে।

পারা গেল না শুধু গণেশ দোলুইকে নিয়ে। তার মদের মাত্রা বাড়তেই থাকল। বাড়বে না কেন, তার হিম্মত কম নাকি? মদ টেনে সে আর মাটিতে গড়াত না, যতক্ষণ পাবে টলতে টলতে দুলতে দুলতে হেঁটে বেড়াত। মাটিতে শেষে গড়াগড়ি খেয়ে অজ্ঞান না হলে তাকে নরকে পাঠায় কে? বউয়ের সঙ্গে মারপিটও লেগেই থাকত। শাস্ত্রবচন অমান্য না করে দারু খাচ্ছে যখন বউ বাধা দিতে আসে কেন?

সোমেশ্বর পৌঁছনোর ঘন্টা খানেকের মধ্যে গণেশ দোলুই চোখ বুজল। শেষে বার বার সে করুণ চোখে থেকে থেকে দাদাঠাকুরের দিকে এমন করে তাকাচ্ছিল যে তার কানে মুখ ঠেকিয়ে সোমেশ্বরকে চিৎকার করে বলতে হয়েছিল, তার কেনো ভাবনা নেই, সে স্বর্গেই যাচ্ছে। শেষ জলটুকুও তাঁর হাত থেকেই খেয়ে গেল।

গণেশ দোলুইয়ের বউটা মাটিতে আছড়ে আছড়ে কাঁদছে।

কার্তিকের হাতে কয়েকটা টাকা গুঁজে দিয়ে দাওয়া থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেলেন সোমেশ্বর। আশপাশের অনেক মেয়েই ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের একপাশে শিউলি—শেফালিকা। তাঁর দিকেই চেয়ে আছে। বড় বড় চোখ দুটো চকচক করছে। এতজনের মধ্যে একমাত্র এই একজনের চোখে মুখে শোকের ছায়া নেই। আগে সোমেশ্বর তাকে কন্যাসদৃশা ভাবতেন। এখন নানা কারণে একটু ব্যবধান সৃষ্টি করে চলেন।

## পাঁচ

রাস্তায় নামলেই সোমেশ্বরের দ্রুত পা চলে। কিন্তু বিশ তিরিশ গজ এগোবার আগেই বাধা পড়ল।

—দাদাঠাকুর!

দাঁড়ালেন। ফিরে তাকালেন। শিউলি। না শেফালিকা। এক পিঠ ছড়ানো লালচে চুল। পরনে লালপেড়ে কোরা শাড়ি। কপালে ঘষা-মোছা একটু সিঁদুরের দাগ। সিঁথির সিঁদুর চোখেও পড়ে না। ওই শাড়িটার জন্য কিনা বলা যায় না, সোমেশ্বরের মনে হল গায়ের ফর্সা রং এই বয়সে আরো খোলতাই হয়েছে। সোজা তাকালেন সোমেশ্বর।...কত হবে এখন? বছর তেত্রিশের কম না, তাঁর বড় মেয়ের থেকে চার বছরের বড়।... যৌবন-শাসন না জানুক, যৌবন ধরে রাখতে জানে। খুব বেশি হলে চব্বিশ পঁচিশ মনে হয় শেফালিকাকে। ঝড়ে জলে আপদে বিপদে একরকমই।...আশ্চর্য।

শেফালিকা হনহন করে নিঃসঙ্কোচে কাছে আসতে সোমেশ্বরই প্রথম বললেন, এ আবার কি ডাক!

শিউলি হেসে উঠল। আগেও এমনি হাসত। সবেতে এই হাসি রোগের মতো। সোমেশ্বর আগে ঠাট্টা করে বলতেন, শিউলি-ঝরা হাসি।

—দাদাঠাকুর ছাড়া কি বলব—আগের মতো মেসোমশাই? আবার হাসি।

—আমার বুকের পাটা কত যে আগের সম্পর্ক রাখব—আপনি তো ছেঁটেই দিয়েছেন।

সোমেশ্বর গম্ভীর—আমি কাউকে ছাঁটি না। কি বলবি বল।

ঠোঁটকাটা মেয়ের মতো পলকা অভিযোগের সুরে শিউলি বলল,—গণেশ দোলুইকেও তো দেখি দিব্যি সগ্‌গে পাঠালেন। আমার কি গতি?

—তুই একটা হাড়-বজ্জাত মেয়ে, তোর গতি তুই-ই জানিস।

সামনে পা বাড়ালেন। শেফালিকা অসংকোচে সঙ্গ নিল। হাসছে। বয়েস বা সম্পর্ক যা-ই হোক, আর কেউ হলে এই মেয়ের পাশাপাশি পথ চলতে ইতস্তত করত। গাঁ-সুদ্ধ কুৎসায় ঢি-ঢি। সোমেশ্বর বলেই নির্লিপ্ত আর নির্বিকার। মেয়েটার চালচলন আর হাসি যেমন উচ্ছল, কথাবার্তাও তেমনি। হাসি থামিয়ে দু'চোখ বড় করে বলল, সে কি দাদাঠাকুর—রাগ করবেন না, ওদের মতো দাদাঠাকুর বলতেই আমার ভালো লাগে—আপনাকে ধরে পার হয়ে এলাম—শেষেও আপনাকে ধরেই উতরে যাব আমি তো এই আশা নিয়েই বসে আছি! গণেশ দোলুই মরতে চলেছে শুনে ছুটে এলাম, ঠিক জানি আপনি আসবেনই—অনেক দিন দেখি না, একবারটি দেখতে পাব।

...তাঁকে ধরে পার হয়ে এলো বলার মধ্যে তাৎপর্য কিছু আছে। গ্রামের মার্কামারা মেয়ে ছিল শিউলি। চোদ্দ বছর বয়েস থেকে অনেক ছেলের চোখ গেছল তার দিকে। দেখতে যেমন ভালো, বয়স্কদের চোখে তার চালচলন তেমনি মন্দ। কথায় কথায় হাসি আর ফষ্টি-নষ্টি। বখাটে ছেলেগুলোর সঙ্গে মেলা দেখতে যাওয়া মিছিল দেখতে যাওয়া। বাপ ছিল কোলিয়ারির ছা'পোষা কেরাণী। মা'টা আগেই মরেছে, বাপটা যক্ষ্মায় ভুগছিল। চোখ না বোজা পর্যন্ত পুরো মাইনের চাকরিটা বজায় ছিল ম্যানেজার জীবন ঘোষালের

কৃপায়। সম্পর্ক না ধরলে কিছু না, আর ধরলে শাখায়প্রশাখায় শিউলির বাপ মেসো ছিল জীবন ঘোষালের। জীবন ঘোষালের মায়ের অনেক ছোট পিসতুতো বোনের স্বামী রতন গাঙ্গুলি। শিউলি তার মেয়ে। জীবন ঘোষালের থেকে সম্পর্কে মেসো রতন গাঙ্গুলি মাত্র বছর সাতেকের বড় ছিল। সেই সুবাদে শিউলি জীবন ঘোষালের মাসতুতো বোন। দাদাটি ওর থেকে সতের বছরের বড়। সম্পর্ক যতই দূরের হোক দরাজ মনিব জীবন ঘোষাল সেটা বাতিল করেননি। রতন গাঙ্গুলি এই জন্য শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে পর্যন্ত তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন।

রতন গাঙ্গুলি তখন চাটুজ্জে বাড়ির আধ-ক্রোশের মধ্যে মেয়ে নিয়ে টালির ঘরে থাকতেন। গাঁয়ের মানুষ, চেনা জানা ছিলই। বয়সে বছর দুই ছোট হলেও সোমেশ্বরকে শ্রদ্ধা করতেন খুব। সোমেশ্বরের বড় মেয়ে অবন্তীর তখন বছর তেরো বয়স। তাকে তিনি স্কুলের পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী বাড়িতে পড়াচ্ছেন রতন গাঙ্গুলি জানতেন। সময়ে প্রাইভেটে হায়ারসেকেন্ডারি দেওয়াবেন। নিজের মেয়ের বেলায়ও রতন গাঙ্গুলির সেই লক্ষ্যই ছিল। কিন্তু আপিসে হাড়ভাঙা খাটুনি নিয়ে পেরে উঠতেন না। পড়াশুনায় তখন তেরো বছরের অবন্তী সতের বছরের শিউলির থেকে এগিয়ে আছে। তবু বাপের আশা, সোমেশ্বরকে ধরে পড়েছিলেন নিজের মেয়ের সঙ্গে তাঁর মেয়েকেও পড়াতে হবে। সোমেশ্বর নির্দ্বিধায় রাজি। ব্যবস্থাটা মনঃপূত ছিল না শুধু বাসন্তীর। মেয়েটাকে জানেন, দেখেছেন। অমন একটা চুলবুলে মেয়ে অবন্তীর সঙ্গে ঘন হয়ে মিশবে এটা চাননি। সোমেশ্বর হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন।—কিচ্ছু ভেবো না, সুন্দর হলেই ভাববে তার প্রতি ওপরওলার কিছু দাক্ষিণ্য আছে।

শিউলি নিয়ম করে বাড়িতে পড়তে আসত। ছেলেমেয়েরাও ওকে পছন্দ করত। পড়া শেষ হবার পরেও ওকে ঠেলে বাড়ি পাঠানো যেত না। শিউলিদিকে সব থেকে বেশি পছন্দ করত ধ্রুব। বয়সে ওর থেকে বছর সাতেকের বড়। কিন্তু সমান তালে ওর সঙ্গে হুটোপুটি করত। বোনেরা শিউলিদির সঙ্গে পেরে উঠত না। বাসন্তী যখন-তখন ডাক দিতেন, এই ধিঙ্গি মেয়ে, কি করিস—বড় হলি একটু সভ্যভব্য হতে পারিস না?

এ-রকম বকুনির মধ্যেও শিউলি মজার খোরাক পেত। হাসত হি-হি করে। ওর একদিনের জবাব সোমেশ্বরের এখনো মনে আছে। বাড়িতে সেদিন কি একটা পুজো-পার্বণের দিন ছিল। যে-কোনো উৎসব বা ছোটোখাটো ব্যাপারে শিউলি নিজেই সেধে নেমন্তন্ন নিত। সময়ে জানতে না পারলে গাল ফুলিয়ে কৈফিয়ত তলব করার মত করে বাসন্তীকে বলত কাল তোমাদের ঘরে ওমুক ব্যাপার শুনলাম, আমাকে বলোনি যে বড়?

...উৎসব বা পুজোটুজোর দিনে সকালেই এসে উপস্থিত হত। বড় মেয়ে অবন্তীর থেকেও বাসন্তীকে বেশি ছাড়া কম সাহায্য করত না। কিন্তু হাতের কাজ শেষ হলেই মেয়েদুটোকে আর ছেলেটাকে নিয়ে পুকুরে নেমে এক ঘণ্টা ধরে হুটোপুটি করা চাই-ই। জলে নেমে ওদের নাকানিচোবানি খাওয়াতো। মায়ের শাসনের গলা পেলে ছেলেমেয়েরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে আসত। কিন্তু ও মেয়েকে সহজে জল থেকে তোলা যেত না। সোমেশ্বর ডাকলে অবশ্য না উঠে পারত না। বাসন্তীর এটা আদৌ পছন্দ

হত না। গ্রামে সতের বছর বয়সের বিয়ে না হওয়া মেয়ে বলতে গেলে অরক্ষণীয়া। তার পর ঠাকুরের ইচ্ছেয় শুধু দেখতে সুন্দর নয়, গায়ে-গতরেও দিব্যি বাড়ন্ত। শুধু এই বাড়ি বলেই ছেলে-ছোকরারা ভিতরে ঢুকে ছোঁক ছোঁক করে না—কাজের লোক আর মালিটালিগুলো তো যাওয়া আসা করে। আর এই গরিব ঘরের মেয়ে বাইরে বেরুলে দু'চারটে পাজী ছেলে পিছনে ঘুরঘুর করেই তা-ও জানেন। তাই মেয়েটা একলা হুটহুট করে এসে হাজির হলেও একলা যেতে দেন না। সঙ্গে বিহারীকে দেন। বিহারী বাবা মায়ের আমলের সেই বয়স্কা পরিচারিকা মানদার ছেলে। বাচ্চা বয়স থেকে এ-বাড়িতেই আছে। আর বয়েসকালে যখন তেলে-চুপসানো লাঠিখানা হাতে নিয়ে বেরুত, ইতরমো দূরে থাক, ওর ভয়ে কেউ ধারে কাছেও ঘেঁষত না। মেয়েটা এমন বজ্জাত যে হি হি করে হেসে বাসন্তীকেই নাকি বলেছিল, ওই পিঁপড়েগুলোর ভয়ে বিহারীকে তুমি সঙ্গে যেতে বলো কেন গো মাসি—আমার হাতের একখানা চড় খেলেই ওরা বাপের নাম ভুলে যাবে।

যাক, শিউলির ওই পুকুরে ডুবনো নিয়েই বাসন্তীর মেজাজ চড়েছিল সেদিন। মিনিট কুড়ি ডাকাডাকি করেও ওকে জল থেকে তুলতে না পেরে রাগ করে ফিরে আসছিলেন। পিছনে ভয়ে ভয়ে ছেলে আর মেয়ে দুটো। সেই সময়ে সোমেশ্বরকে ওদিক দিয়ে যেতে দেখেই বাসন্তী দাঁড়িয়ে গিয়ে হাতের ইশারায় তাঁকে ডাকলেন। তিনি কাছে আসতেই শিউলি আঁট-শাড়ির ওপর দিয়ে বুকে পিঠে গামছা জড়িয়ে সুড়সুড় করে জল থেকে উঠে এলো। সঙ্গে সঙ্গে বাসন্তীর ঝাঁঝালো বকুনি, এই শেষ আর যদি কখনো কোনো ব্যাপারে তোকে বাড়িতে ডেকেছি—সকলের চোখের ওপর এ-রকম ধিঙ্গিপনা করতে লজ্জা করে না তোর?

ঝুঁকে শাড়ির হাঁটুর দিকে জল নিঙড়োতে নিঙড়োতে ফসফস করে জবাব দিল, সব সময় ধিঙ্গি-ধিঙ্গি কোরো না তো মাসি—আমার থেকে চার বছরের ছোট অবুটা পর্যন্ত পাল্লা দিতে গিয়ে হেদিয়ে পড়ে সেটা খুব ভালো? ওদের মতো অসুখ করতে দেখো আমাকে? তারপর সোজা হয়ে একই সুরে যা বলল সেটুকুই সোমেশ্বরের কানে লেগে আছে। বলল, আমি কি তোমার ওই মেয়েদের মতো রাজকন্যে হয়ে কারো ঘরে ঢুকব, না পাঁচটা দাসদাসী থাকবে— হাতে গায়ে খামতা না রাখলে আমার মতো মেয়ের চলবে?

তারপরেই হি-হি হাসি আর ছুট। বাসন্তী হাঁ। সোমেশ্বরের মেয়েটাকে সেদিন কত ভালো লেগেছিল তিনিই জানেন। মনে হয়েছিল, এই মেয়ে যার ঘরে যাবে সে-ছোঁড়াকে ভাগ্যবানই বলতে হবে। হাসি গোপন করে তিনিও প্রস্থান করেছিলেন।

...শিউলি বছরখানেক ধরে তাঁর বাড়িতে এসে নিয়মিত পড়াশুনা করেছিল। দুষ্টু মেয়েটার মাথা যত ছিল পড়ায় অবশ্য তেমন মন ছিল না। এক বছর বাদে ওর বাপ মারা গেল। যক্ষ্মা তখন কালব্যাধি। চিকিৎসা শেষের দিকে সোমেশ্বরই করছিলেন। আর যতটা সম্ভব যুঝেওছিলেন। কিন্তু রাখা যাবে না জানতেন।

তারপর সমস্যা শিউলিকে নিয়ে। সমস্যা ওর বয়েস। সমস্যা ওর চেহারাপত্র, স্বভাব—সবই। কোথায় আর যাবে, অনন্যোপায় সতের বছরের বড় দূরসম্পর্কের ওই মাসতুতো দাদা জীবন ঘোষাল ওকে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে গেলেন। পড়ায় ছেদ পড়ে গেল। তিন মাইল পথ পেরিয়ে ওর বয়সের মেয়ের পড়তে আসাও সম্ভব নয়। কিন্তু মাসতুতো দাদার

কাছে যাবার নামে শিউলি বেঁকে বসেছিল। সোজা বাসন্তীর কাছে এসে হাজির। সোমেশ্বরও বাড়িতেই ছিলেন। শিউলির প্রস্তাব, সে মাসিমার কাছে থাকবে, কোথাও যাবে না।

সোমেশ্বর অনেক করে বোঝালেন ওকে। বললেন, তোর দাদা না থাকলেও না হয় ভেবে দেখা যেত—

শিউলির সাফ জবাব, আমার দাদা-টাদা কেউ নেই ধরে নিন তাহলে— কেন, আমাকে আপনারা বড় মেয়ে ভাবতে পারেন না? ও সম্পর্কটা তার থেকে বেশি হল?

বাধ্য হয়ে বকুনির সুরেই সোমেশ্বরকে বলতে হয়েছে, পাগলামি করিস না। অতবড় কোলিয়ারির ম্যানেজার তোর দাদা, তিনি নিতে চাইছেন, আমার এখানে থাকলে তাঁর একটা মান-সম্মানের প্রশ্ন আছে—তোর একটা ভালো বিয়ের চেষ্টা আমরাও করব তিনিও করবেন—তাঁর টাকার অভাব নেই, দেখিস ভালোই হবে তোর।

শিউলি থাকবে বলে যেমন গোঁ ধরে এসেছিল, এ কথার পর উঠে তেমনি গোঁ ধরেই চলে গেছে।

এর কিছুদিন পর থেকেই মেয়েটার নামে নানারকম দুর্নাম শোনা যেত লাগল। শোনা কেন, স্বচক্ষে অনেকে দেখেছে। বলাই কুশারি নামে একটা অতি বখাটে ছেলের সঙ্গে নিরিবিলি দুপুরে যত্রতত্র দেখা যাচ্ছিল শিউলিকে। রসের কথা গ্রামে পাঁচগুণ হয়ে রটে ভেবে সোমেশ্বর প্রথমে বিশ্বাস করেননি। থমথমে মুখ করে একদিন বিহারী এসে দাঁড়ালো সামনে। জিজ্ঞেস করল, বলাইবাবুর মাথাটা সে দু'ফাঁক করে দিয়ে আসবে কিনা।

সোমেশ্বর প্রথমে অবাক। পরমুহূর্তে বুঝলেন। শিউলিকে বাড়ির সকলেই ভালোবাসে। বিহারীও তার ব্যতিক্রম নয়। সোমেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, সে কি করেছে?

বিহারী জবাব দিল না। দেওয়া যে তার পক্ষে শক্ত এ সোমেশ্বরও বুঝলেন। বললেন, তোকে সর্দারি করতে হবে না—আমরা কারো গার্জেন না।

মেয়েটার সত্যি এমন মতি হবে সোমেশ্বর ভাবেননি। বলাই কুশারিকে চেনে সকলেই। ঘাড় পর্যন্ত বাবরি চুল, শখের নাটকের হীরো। এই বয়েসই গাঁজা ভাঙ টানার সুনাম বেশ। রাশভারী জীবন ঘোষাল কড়া শাসনে রেখেও দূর সম্পর্কের এই উচ্ছল স্বভাবের মাসতুতো বোনটাকে সামলাতে পারছেন না এ খবরও সোমেশ্বরের কানে এসেছিল। রাগে এক এক সময় ভদ্রলোক নাকি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। সোমেশ্বর এরপর ভেবেছেন হবারই কথা।

এ-রকম একটা মেয়েকে প্রশ্রয় দেবার অপবাদও তাঁকে শুনতে হয়েছে। যে মেয়ের কাছে এখন গাঁয়ের সব বাড়ির দরজা বন্ধ, তার কিনা ওই এক বাড়িতে এখনো অবারিত দ্বার! শিউলি যে দুপুরের নিরিবিলিতে কুল পেয়ারা কামরাঙা নিয়ে এক-একদিন তাঁর বাড়িতে আসে, অবন্তী হৈমন্তীর সঙ্গে দেড় দু'ঘণ্টা কাটিয়ে আবার নিঃশব্দে চলে যায়, সোমেশ্বর এ-খবর জানতেনই না। এমন কি বাসন্তীও না। বাগান পুকুরসুদ্ধ এত বড় বাড়িতে দুপুরের নিরিবিলিতে আড্ডার জায়গা বেছে নেওয়া কঠিন কিছু নয়। কিন্তু ছেলেমেয়েরা তাদের মায়ের কাছে পর্যন্ত শিউলির আসার খবর গোপন করেছে জেনে সোমেশ্বর বেশ অবাক। এ-বাড়িতে এমন হবার কথা নয়।

...শিউলির এ-বাড়িতে আসার ব্যাপারে আপত্তিটা কোথায় সেটা ছেলেমেয়েদের বোঝার বয়েস নয় তখনো। বড় মেয়ে অবন্তীর বয়েস তখন চোদ্দ, ধ্রুবর এগারো আর হৈমন্তীর আট। তবু ওদের মা সুদ্ধু জানে না, গোপন না করলে তা হয় কি করে। অবন্তীকেই ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, শিউলি মাঝে মাঝে আসে কিনা। সোমেশ্বর ধমকের সুরেও জিজ্ঞেস করেননি, কিন্তু শোনামাত্র চোদ্দ বছরের মেয়ের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল লক্ষ্য করেছেন। মেয়ে ভয়ে ভয়ে মাথা নেড়েছে, অর্থাৎ আসে।

সোমেশ্বর একটু অবাক হবার ভান করে বলেছেন, আসে সে-কথা তোর মাকেও বলিসনি কেন?

অবন্তী তেমনি আড়ষ্ট মুখে জানিয়েছে শিউলিদি বলতে বারণ করে দিয়েছিল, বলেছিল তাকে আজকাল আর কেউ দেখতে পারে না, ও এ-বাড়িতে আসে জানলে এখন মেসোমশাই মাসিমা পর্যন্ত রাগ করবে, তখন আর আসাই হবে না।

এর পরেও বকা-ঝকা করে মেয়ের মাথায় অস্বাভাবিক কোনো চিন্তা ঢোকানোর মানুষ নন সোমেশ্বর, হেসেই বলেছেন শিউলিটা দিন-দিন দুষ্টু হচ্ছে আর তুই তেমনি বোকা হচ্ছিস। দুষ্টুমি করলে মা কত সময় তোদেরও বকে না—তার জন্য তাকে লুকোতে হবে?

একটু ভরসা পেয়ে অবন্তী জিজ্ঞেস করেছে, এরপর শিউলিদি এলে তাকে কিছু বলব?

—তুই আবার কি বলবি। এলে আসবে—

এর পরে যেদিন শিউলি এসেছে, নির্দেশমত বিহারী তাকে খবর দিয়েছে। ধ্রুব আর হৈমন্তী স্কুলে, অবন্তীকে নিয়ে শিউলি ঠাকুরদালানের পিছনের বাগানে বসেছিল। একটু বাদে সোমেশ্বর নিঃশব্দে বাগানে এলেন। গাছ-গাছড়া দেখতে দেখতে হঠাৎই যেন ওদের আবিষ্কার করলেন। মুখে সাদামাটা বিস্ময়।—কি রে, তোরা দুপুরে এখানে কি করছিস?

শিউলির মুখের হাসিতে টান ধরল। আমতা আমতা করে বলল, এখানে বেশ ঠাণ্ডা ছায়া—

সোমেশ্বর সামনের দিকে পা বাড়ালেন। তারপর একটু থেমে বললেন, যাবার আগে আমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাস তো—

সেদিন আর ওদের গল্প জমবে না জানতেন। আধঘণ্টার মধ্যেই শিউলি এলো। সোমেশ্বর তখন নিচের লাইব্রেরি ঘরে। হাতের বইটা নামিয়ে সোজা জিজ্ঞেস করলেন, এ-বাড়িতে তোর চুরি করে আসার দরকার হল কেন?

থতমত খেয়েও শিউলি বলল, চুরি করে আসতে যাব কেন? সদর দরজা দিয়েই তো এলাম।

ঈষৎ কঠিন গলায় সোমেশ্বর বললেন, চুরি করে না হলে তোর মাসির সঙ্গে দেখা করিস না কেন? আসিস সে-কথা অবুকে কারো কাছে বলতে বারণ করেছিস কেন?

শিউলি অধোবদন। বিপাকে পড়ে ওর রাগই হচ্ছিল বোঝা গেছে।

গলা না চড়িয়েও সোমেশ্বর ধমকেই উঠেছিলেন, গাঁ-সুদ্ধু লোকে যা-তা বলে বেড়াচ্ছে তোর লজ্জা করে না? সভ্য-ভব্য হয়ে থাকতে পারলে আসবি, নয়তো আসবি না। যাঁর আশ্রয়ে আছিস তাঁর পর্যন্ত মাথা হেঁট হয়েছে এই কাণ্ডজ্ঞানও নেই?

...মেয়েটার ফর্সা মুখে রক্ত জমাট বাঁধতে দেখেছিলেন সোমেশ্বর। মুখ তুলে সোজা চোখে চোখ তুলে তাকিয়েছিল। তারপর হনহন করে চলে গেছল।

তারপর প্রায় এক বছর আসেনি। গাঁয়ের লোকের কানাকানি টিকা-টিপ্পনী আরো বেড়েই চলেছিল। হঠাৎ একদিন শোনা গেল, শিউলি তার মাসতুতো দাদা জীবন ঘোষালের বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছে। ওর বয়স তখন উনিশ পেরুতে চলেছে। একই সঙ্গে নিপাত্তা বলাই কুশারিও। চার দিকে টি টি পড়ে গেল। লজ্জায় অপমানে ম্যানেজার জীবন ঘোষাল মুখ দেখাতে পারেন না। হাতের নাগালে ওদের পেলে মাটিতে জ্যান্ত পুঁতবেন।

...কিন্তু একটি খবর সোমেশ্বর চাটুজ্জের বাড়ির বাইরে কেবল শিউলি আর ওই বখাটে বলাই কুশারি ছাড়া আজও কেউ জানে না। সতের বছরের বড় দূর সম্পর্কের মাসতুতো দাদা জীবন ঘোষালের বাড়ি থেকে পালিয়ে শিউলি কোথাও যায়নি—সোমেশ্বরের বাড়িতেই তিন-তিনটে দিন লুকিয়েছিল। ওর সেই মূর্তি দেখে বাসন্তী শুধু নয়, সোমেশ্বরও অবাক।

...রাতের অন্ধকারে সকলের অলক্ষ্যে বাড়ি ঢুকেছে। সোজা দোতলায় তাঁদের কাছে চলে এসেছে। ঘরে তখন বাসন্তী ছাড়া অবুও ছিল। সোমেশ্বর তাকে পড়াচ্ছিলেন। ঘরে ঢুকেই শাসিয়েছে, ও এখানে আছে কাকপক্ষীতেও টের পেলে আত্মহত্যা করবে—আত্মঘাতিনী হলে তার সব পাপ সব দায় মেসোমশায় অর্থাৎ সোমেশ্বরকে নিতে হবে। বলেছে, আমার সব কথা শুনেও যদি আমাকে তাড়াতে চান তো তাড়ান—তখন আমি কিছু বলব না।

মেয়েটা তখন একটুও কাঁদছিল না। তার সমস্ত মুখ জ্বলজ্বল করছিল আর দু'চোখ ধক-ধক করে জ্বলছিল। সেই মুখ আর চোখ দেখে সোমেশ্বর কি বুঝেছিলেন তিনিই জানেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন, সকাল থেকে এই রাত পর্যন্ত ছিলি কোথায়?

—শালবনে।

শুনে শিউরে উঠেছিলেন সোমেশ্বর। সেটা ফাল্গুন মাস। শালবনে যেমন সাপের উপদ্রব, তেমনি ভালুকের। মহুয়ার গন্ধে ভালুক মাতাল হয়ে ছোটাছুটি করে।

অবন্তীরও দু'চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছিল। সোমেশ্বর জিজ্ঞাসা করেছেন, সঙ্গে আর কে ছিল?

সমান তেজে জবাব দিল, ওই ভাঙখোর গাঁজাখোর ছাড়া আর কাকে পাব —কে থাকবে?

ভাঙখোর গাঁজাখোর বলতে বলাই কুশারি। মায়ের চোখের ইশারায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও অবন্তীকে বই খাতা নিয়ে উঠে যেতে হল।

সোমেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন, সে কোথায় এখন?

শিউলি বলেছে, আপনার কি বিবেচনা জানার জন্য তাকে বেশি রাতে এখানে আসতে বলেছি—তার আগে কেউ তাকে খুঁজে পাবে না।

সোমেশ্বরের ইঙ্গিত বুঝে বাসন্তী ওকে একটা কোণের ঘরে এনে দরজা বন্ধ করেছেন। তারপর দু'জনেই ওর কথা শুনেছেন। যা শুনেছেন বাসন্তী বিশ্বাস করবেন কি করবেন না ভেবে পাননি। সোমেশ্বর নির্বাক গম্ভীর অনেকক্ষণ। তারপরে বলেছেন,

তোকে আত্মহত্যা করতে হবে না, নিজের মাসিমার কাছেই আছিস জেনে রাখিস। কিন্তু যতদিন না ব্যবস্থা হয়, বাইরের লোক ছেড়ে এ-বাড়ির ঝি-চাকরও যেন তোকে দেখতে না পায়, টের না পায়।

মাঝ রাত পর্যন্ত দোতলার বারান্দায় পায়চারি করেছেন সোমেশ্বর। তারপর নিচের ফটকের সামনে মানুষের ছায়া দেখেছেন। নিঃশব্দে নেমে এসেছেন। মিনিট কুড়ি বাদে আবার তেমনি উঠে এসেছেন।

...তিন-তিনটে দিন আর রাত শিউলি চাটুজ্জে বাড়িতেই লুকিয়ে ছিল এ আজও সকলের কল্পনার বাইরে। ঝি-চাকর পর্যন্ত টের পায়নি। ছেলে-মেয়ে তিনটে জেনেছিল। কিন্তু নিজেরাই তারা ভয়ে সিঁটকে ছিল। আর মায়ের শেখান মতোই মুখ সেলাই করে ছিল।

মা তাদের বুঝিয়েছেন, কেউ জানতে পারলে বাড়ির লোকেরা এসে শিউলিদিকে ধরে নিয়ে যাবে তারপর মেরে ফেলবে। শিউলিদি এক ঘরে দরজা বন্ধ করে কাটিয়েছে, আর ওরা সেই তিনটে দিন নিচে পর্যন্ত নামেনি।

চার দিনের দিন বিকেলে সোমেশ্বর নিজে গিয়ে জীবন ঘোষালের সঙ্গে দেখা করেছেন। বলেছেন, শিউলি আর বলাই কুশারি দু'জনেই এখন আমার বাড়িতে। আপনার ভয়ে আর কোথাও যেতে সাহস করেনি। তিন তিনটে দিন কেটে যাওয়ার পর এ-ভাবে আর ছেড়ে দেওয়া উচিৎ নয়—পরশু বিয়ের লগ্ন আছে, সেদিনই ওদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া উচিত। সেই জন্যেই আপনার কাছে আসা।

জীবন ঘোষাল সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্ত।—দূর করে দিন, দূর দূর করে তাড়িয়ে দিন! এর পর আমার বাড়িতে এনে ঘটা করে ওদের বিয়ে দেব! ওই বলাই কুশারিকে আমি পুলিসে দেব, আর শিউলিকে মাথা মুড়িয়ে গ্রাম থেকে বার করে দেব।

—তাতে কলঙ্ক আরো বাড়বে ছাড়া কমবে না। শিউলি ছোট মেয়ে নয় যে ফুসলে বার করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে বলাইকে আপনি পুলিশে দিতে পারবেন। সে উল্টে আপনার বা আপনাদের অত্যাচারের কথা বলবে—

জীবন ঘোষাল ফুঁসে উঠেছেন।—এত আদরে যত্নে রেখেছি আর ও বলবে অত্যাচার?

—বললে আপনি ঠেকাবেন কি করে? ক্ষিপ্ত মেয়েরা বে-কায়দায় পড়লে উল্টে আপনাকে বিপাকে ফেলার জন্য এর থেকেও ঢের বেশি গণ্ডগোলের কথা বলতে পারে। স্ত্রী চরিত্র আপনি জানেন না।

হঠাৎ সাপের মাথায় ধুলো পড়ার মতো হয়ে গেছলো জীবন ঘোষালের মুখ। সোমেশ্বরের নির্লিপ্ত মুখ। প্রস্তাব দিয়েছেন, আপনার বাড়িতে বিয়ে দিতে আপত্তি থাকলে সেটা আমার বাড়িতে হতে পারে। শিউলি আমার কন্যাসদৃশ, আপনি মত দিলে সম্প্রদানও আমিই করতে পারি।

অন্নপ্রাশন বিয়ে পৈতে শ্রাদ্ধ যাগযজ্ঞ সবই তিনি করে থাকেন সকলেই জানে। এ-সবের যে-কোনো উপলক্ষে তাঁকে কাজে বা কাছে পাওয়া গাঁয়ের লোক ভাগ্যের কথা ভাবে। তিনি বাঁধা-ধরা নিয়মে কিছু করেন না, কান পেতে শোনার মতো করে সব অনুষ্ঠানের তাৎপর্য বোঝান, ব্যাখ্যা বলেন।

আবারও তিরিক্ষি মেজাজে জীবন ঘোষাল বলে উঠেছিলেন, আপনি এমন অনাচারের বিয়ের দায় ঘাড়ে নিতে যাবেন কেন—সোজা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিন।

খুব ঠাণ্ডা গলায় সোমেশ্বর জবাব দিয়েছেন, তাতে ওদের আরো অধোগতি হবে। কাউকে অধোগতির দিকে ঠেলে দেওয়া অপরাধ। তাছাড়া বললাম তো, ওকে আমি নিজের একটা মেয়ে বলেই ভাবি। যাকগে ব্যবস্থা আমি করছি, আপনি দয়া করে একবার গিয়ে দাঁড়াবেন।

বলা বাহুল্য জীবন ঘোষাল আসবেন না জেনেও সোমেশ্বর এই প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁকে বিদায় দিয়ে ঘোষাল রাগে ফুঁসেছেন। আর পাঁচ পণ্ডিত জনকে ধরে ধরে বলেছেন, এত বড় শাস্ত্রজ্ঞের এ-কাজ কি উচিত হল? কুলটার শাস্ত্রমতে বিয়ে হওয়ার সঙ্গে এর তফাৎ কোথায়!

শুনে সোমেশ্বর হেসেছেন। তাঁর উক্তিও বিরুদ্ধবাদীদের কানে গেছে। তিনি বলেছেন, কুলটার শাস্ত্রমতে বিয়ে হতে পারে না এমন বিধি কোথায় আছে জানা নেই। কেউ যদি এ ব্যাপারে আমার অজ্ঞতা দূর করেন, কৃতার্থ হব।

সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। অন্যায় অন্যায় রব উঠেছিল। রুষ্ট পণ্ডিতেরা মাথা ঝাঁকিয়ে টিকি নেড়ে মিলিত প্রতিবাদ করতে চেয়েছেন। মস্ত লোকের ছেলে বলে শাস্ত্র নিয়ে এমন অনাচারের খেলা সোমেশ্বর চাটুজ্জে অনেক খেলেছেন—পয়সার দেমাকে অনেক শাস্ত্রীয় সংস্কার নস্যাৎ করে চলেছেন। পণ্ডিতদের সঙ্গে রেষারেষি করে ওই লোক গত তিন বছরের মধ্যে একঘরে অস্পৃশ্য অন্ত্যজের বিয়ে দিয়েছেন, শবও বহন করেছেন—এবারে তাঁকে ভালো মতো শিক্ষা দেওয়া উচিত—বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, গ্রামে বাস করে এ-সব চলবে না—চলতে দেওয়া যেতে পারে না!

কিন্তু সোমেশ্বরের কানে তুলো পিঠে কুলো। ব্যাপারটা নিয়ে অন্তরঙ্গ কয়েকজন আলোচনা করে গেছেন—কিন্তু উচিত কাজ বুঝিয়ে দিতে বা বোঝাপড়া করতে শেষ পর্যন্ত কেউ আসেননি।

অন্তরঙ্গজনদের মধ্যে যারা এসেছিলেন তাঁরাও যে খুশি মনে সায় দিতে পেরেছিলেন এমন নয়। শিউলির বাপ রতন গাঙ্গুলি ভালো মানুষ ছিলেন আর নিষ্ঠাবান ছিলেন। তাঁর একমাত্র মেয়ের সঙ্গে এ-রকম ছেলের বিয়ে চাটুজ্জে কোন আক্কেলে দিতে যাচ্ছেন। একে তো ছোঁড়াটা বারেন্দ্র তার ওপর গাঁজাখোর মাতাল। মেয়েটা নিজের কত বড় সর্বনাশ ডেকে আনছে এ কি চাটুজ্জে জানেন না, বোঝেন না?

সোমেশ্বর চাটুজ্জে অম্লান বদনে মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছেন। বিপাকে পড়া মুখ করে বলেছেন, জানিও, বুঝিও। কিন্তু তিন-তিনটে দিন যে ওরা একসঙ্গে নিখোঁজ হয়ে ছিল তার হিসেব মেলানো যাবে কেমন করে। ভগবান না করুন, আমাদের কারো মেয়ের এমন মতিগতি হলে কি করতাম।

যাঁরা আলোচনায় বসেছিলেন তাঁদের কেউ কেউ ফুঁসে উঠেছেন। বলেছেন, এমন মতি হলে গলা টিপে মেরে দামোদরে ভাসিয়ে দিতাম।

সোমেশ্বর মাথা নেড়ে সায় দিয়েছেন। বলেছেন, উত্তম কথা, কিন্তু আমার তো এ কাজ করার মতো বুকের পাটা নেই, আপনাদের মধ্যে কে রাজি আছেন?

জবাব কেউ দিতে পারেননি, কিন্তু তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এটুকু স্পষ্ট। এই মানুষকে তাঁরা ভালবাসেন শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু এমন কাজে এগোলে সমর্থন করেন কি করে? একজন বলেই ফেলেছিলেন, পরের অমন একটা দুশ্চরিত্র মেয়ের ব্যাপারে এ-ভাবে জড়িয়ে পড়ারই বা দরকার কি?

সোমেশ্বরের তখনো বিনীত অথচ সহজ প্রশ্ন।—তাহলে কি করব পরামর্শ দিন, দুশ্চরিত্র মেয়েকে আরো দুশ্চরিত্র হবার রাস্তায় ঠেলে দেব? বিয়ে দিয়ে দেবার থেকেও সেটা ভালো কাজ হবে?

কিন্তু জল ঘোলা করার ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হয়নি। পরদিনই ওই অন্তরঙ্গদের একজন জীবন ঘোষালের আর্জি নিয়ে এসেছেন। গতদিনের আলোচনায় যাঁরা ছিলেন তাঁরাও হাজির। ঘোষাল একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। বলেছেন নাকি, মেয়েটা যেমনই হোক তাঁর আশ্রয়ে ছিল, ওকে তিনি সেভাবে আগলে রাখতে পারেননি বা রক্ষা করতে পারেননি এ অপরাধ তাঁরও। কিন্তু অমন একটা ছেলের সঙ্গে শিউলির বিয়ে হলে অপরাধ চতুর্গুণ হবে। তাই তিনি স্থির করেছেন, যত খরচই হোক, শিউলিকে কলকাতায় রেখে অন্যভাবে মানুষ করবেন তিনি। গ্রামের ব্যাপার কাকপক্ষীও জানবে না। কলকাতায় কোনো ভালো সেবাশ্রমের সঙ্গে যুক্ত করে দেবেন ওকে। সেই সঙ্গে ফিরে আবার লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থাও হবে। তারপর শিউলি যেমন খুশি জীবন বেছে নেবে। এ-ভাবে কিছুকাল ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকলে শিউলি আর বলাই কুশারি দু'জনেই দু'জনকে ভুলে যাবে—বলাই কুশারির মতো ছেলে ভুলে তো যাবেই।

জীবন ঘোষালের প্রস্তাব অতি সঙ্গত মনে হয়েছিল সকলেরই। শুধু সঙ্গত কেন, উদারও তো বটেই।

জবাবে সোমেশ্বর চাটুজ্জে মিটিমিটি হেসেছেন। তারপর বলেছেন, আপনারা শাস্ত্র বচন যদি মানেন তো ওই ভোলাভুলিটা অত সহজ হবে না।

চাটুজ্জের মুখে শাস্ত্রের নামে উৎকর্ণ সকলেই। এ দিক থেকে কেউ এ লোকের সামনে বসারও যোগ্য নন মনে মনেও কেউ অস্বীকার করেন না।

—কি শাস্ত্র? কি শাস্ত্র বচন?

তেমনি মিটিমিটি হেসে সোমেশ্বর টেনে টেনে মিষ্টি করে একটা শ্লোক আওড়ে গেলেন।

"ইন্দুঃ কুত্র চ সাগরঃ, ক্ব চ রবিঃ, পদ্মাকরঃ স্থিতঃ,
ক্বাভ্রা বা ক্ব ময়ূরপংক্তিরমলা, ক্বলিঃ ক্ব বা মালতী।
মন্দাধ্বক্রমরাজহংসনিচয়ঃ ক্বাসৌ ক্ব বা মানসং
যো যস্যাভিমতঃ স তস্য নিকটে দূরেহপি বা বল্লভঃ।"

ভদ্রলোকদের কেউ কেউ মোটামুটি সংস্কৃত জানেন। যাঁরা জানেন না তাঁরাও রসের গন্ধ অন্তত পেলেন। তাঁদের তরফ থেকেই প্রশ্ন, ব্যাপারখানা কি হল খোলাখুলি শুনি চাটুজ্জে মশাই—নইলে বিবেচনা করি কি করে?

বড় নিঃশ্বাস ফেলে সোমেশ্বর ব্যাপারখানা বোঝালেন—চাঁদ কোথায় কোথায় বা সাগর, কোথায় সূর্য কোথায় বা রয়েছে পদ্মসরোবর, কোথায় বা মেঘ আর কোথায় নির্মল ময়ূরপুচ্ছ, মৌমাছি কোথায় আর কোথায় বা মালতী, কোথায় ধীরগতি রাজহংস আর

কোথায় বা মানসসরোবর। যাকে যার পছন্দ, যে যার প্রিয়, সে কাছে থাক বা দূরে থাক—প্রিয়ই থাকে।

এরপর আর কিছু না হোক, সকলে এটুকু অন্তত বুঝেছেন, এই মানুষকে সংকল্পচ্যুত করা যাবে না।

চলতে চলতে সোমেশ্বর হেসেই শিউলিকে জিজ্ঞেস করলেন, গণেশ দোলুই মরতে চলেছে বলে আমি আসব আর সেই জন্যে তুই এলি—তার মানে আমাকে কিছু বলবি?

একটু ঝংকার দিয়ে শিউলি বলল, বলবই তো! সক্কলের ওপর আপনার এত দয়া, আর আমি কি দোষ করলাম—বেঁচে আছি কি মরেছি, একবার খবরটি নেন না!

সোমেশ্বর হেসে জবাব দিলেন, লোকে গোলে পড়লে আমার খবর নেয়, তুই নিস না দেখে ভাবি ভালোই আছিস। কি বলবি বল।

—দাঁড়ান একটু। ওই বাঁক ঘুরলেই তো দাদাব বাংলো—দেখলে চিত্তির। সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠে মুখে আঁচল চাপা দিল, গলা খাটো করে বলে উঠল, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই বেন না আমরা?

সামনেই দাদার বাড়ি বলতে জীবন ঘোষালের বাড়ি।

সোমেশ্বর গম্ভীর একটু।—তুই কি ফাজলামো করার জন্যে আমাকে এখানে দাঁড় করালি? কি বলবি বল?

—মাসিমা কেমন আছেন?

—ভালো।

—আর অবন্তী হৈমন্তী?

—খুব ভালো।

—এখানে না শ্বশুরবাড়িতে।

শিউলির গলায় সত্যিকারের খেদ ঝরল একটু—সব্বাইকে বিশেষ করে মাসিমাকে এত দেখতে ইচ্ছে করে...।

—দেখতে ইচ্ছে করে তো দেখতে গেলেই পারিস।

শুনেই দু'চোখ বড় বড়।—আমি গেলে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না—মাসিমা রাগ করবে না? ছেঁটেই তো দিয়েছেন আমাকে—

এমন অভিমান শিউলি করতে পারে, এমন কথা বলতেও পারে। আপনার জনের মতো ও অবন্তী হৈমন্তীর খবর জিজ্ঞেস করতে একটু অস্বস্তিও বোধ করছিল।...বলাই কুশারির সঙ্গে শিউলির বিয়ের এক বছর তিন মাসের মধ্যে সোমেশ্বর বড় মেয়ে অবন্তীর ঘটা করে বিয়ে দিয়েছিলেন। সেই বিয়েতে নেমন্তন্ন হয়নি বাহারীতে এমন চেনা মুখ কমই ছিল। নেমন্তন্ন হয়নি কেবল শিউলি আর বলাই কুশারির।

...সোমেশ্বর অনেক ভেবেচিন্তেই ওই দু'জনকে বাদ দিয়েছিলেন। টাকার মানে মানী কোলিয়ারির ম্যানেজার জীবন ঘোষাল অনেককেই বোঝাতে পেরেছিলেন চাটুজ্জে বংশের ছেলে হয়ে সোমেশ্বর ওই দু'জনের বিয়ে দিয়ে কাজটা ভালো করেননি। এ-ও বলতে গেলে নাকি ব্যভিচারেরই সামাজিক প্রশ্রয়। শিউলি আর বলাই কুশারিকে নিয়ে বিরূপ আলোচনা ওই এক বছর তিন মাসের মধ্যেও ধামাচাপা পড়েনি। পড়েনি ওদেরই দোষে।

কারণ বলাই কুশারির নেশার মাত্রা বাড়ছিল বই কমেনি, আর শিউলিরও চালচলনে তখন পর্যন্ত অনেকের চোখে কাঁটার মতো বিঁধত। সেই কারণে ওদের না ডাকাই স্থির করেছিলেন। বাহারীর নাড়ীর খবর জানেন। সামাজিক নিমন্ত্রণে জীবন ঘোষালও না এসে পারবেন না। যে যেমনই হোক চাটুজ্জে-বাড়িকে হেলাফেলা কেউ করে না। কিন্তু আমন্ত্রিতদের মধ্যে ওদের দেখলে আর কেউ না হোক,ওই জীবন ঘোষালই বিয়েবাড়িতে একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে অপমানের শোধ নিতে ছাড়বেন না। সদলে হয়তো উৎসব বাড়ি থেকে চলেই যাবেন।

সোমেশ্বর চাটুজ্জে তবু পরোয়া করতেন না যদি ওই শিউলির চালচলন সম্পর্কে বক্রোক্তি কানে না আসত। তাছাড়া যেটুকুও দ্বিধা ছিল স্ত্রীর কথায় গেছে। বাসন্তীও বলেছিলেন, দরকার নেই বাপু, মেয়েরা যাঁরা আসবেন তাঁদেরও বেশিরভাগ দু'চক্ষে শিউলিকে দেখতে পারেন না, ওকে দেখলে অনেকে হয়তো না খেয়েই চলে যাবেন —তাঁদের সংস্কারের দেমাক পুরুষদের থেকে বেশি ছাড়া কম কিছু নয়।

এরপর ওই দু'জনকে ডাকার চিন্তা সোমেশ্বর একেবারেই বাতিল করেছিলেন। কিন্তু তাঁর হিসেবে একটু ভুল হয়েছিল। জীবন ঘোষাল নেমন্তন্ন রক্ষা করতে আসেননি। না আসার অজুহাতও হাতের কাছে মজুত। কোলিয়ারির মালিকের ডাকে হামেশাই কলকাতা যেতে হয়। বিয়ের দু'দিন আগে চলে গেছলেন, দিন তিনেক বাদে ফিরেছেন।

সোমেশ্বরের ভিতরটা একটু খচখচ করেছিল অন্য কারণে। অবন্তীর বিয়ে থাওয়া চুকে যাবার দিন কয়েক বাদে বাসন্তী খবরটা দিয়েছিলেন। বাসন্তীকে বলেছিল বিহারী। দুঃসাহসী হলেও বিহারীর ভিতরটা সরলই। ছোট থেকে শিউলিকে দেখছে, কথায় কথায় শিউলিদিদির খিলখিল হাসি ওর ভারী পছন্দ। অবন্তীকে বলত শিউলিদিদির মতো হাসতে তোমরা কেউ পারো না।...বিহারীর সঙ্গে শিউলির হামেশাই দেখা হয়, অবন্তীর বিয়ের দিন কয়েক বাদেও দেখা হয়েছিল। দেখা হতে সেই প্রথম শিউলিদিদিকে ও কাঁদতে দেখেছিল। কেঁদে শিউলিদিদি নাকি ওকে বলেছিল, নেশাখোর জামাইকে মেসোমশাই না-হয় ডাকে নি, তা বলে মেয়েকেও বাদ দিল!

শুনে খারাপই লেগেছিল সোমেশ্বরের। ঠিক করেছিলেন, এর পরের কোনো সামাজিক ব্যাপার উপস্থিত হলে ওকে ডাকবেন। বরং জীবন ঘোষালকেই আর নেমন্তন্ন করবেন কিনা তা-ই বিবেচনার বিষয়।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তও টেঁকেনি। পরের উৎসবে, অর্থাৎ হৈমন্তীর বিয়েতেও সোমেশ্বর এই মেয়েটাকে ডাকতে পারেননি। হিমুর বিয়ে দিয়েছিলেন আরো সাত বছর বাদে। অবন্তীর বিয়ে হয়েছিল ষোল বছর বয়সে। ছেলে ধ্রুব তখন মাত্র তেরো বছরের। হিমুর বিয়ের সময় ধ্রুবর বয়স কুড়ি। বি. এ. পাস করেছে। কলকাতায় এম. এ. পড়তে যাবে। তখন হিমুর বিয়ে। নিমন্ত্রণের লিস্ট সোমেশ্বরই করেছিলেন। তাতে শিউলি আর বলাই কুশারির নামও ছিল। অবশ্য এবারেও ওদের ডাকার ব্যাপারে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন তিনি। কারণ এ সাত বছরে বলাই কুশারির নেশার যেমন উন্নতি হয়েছে, শিউলির সেই বাঁকা-চলনের উন্নতির খবরও তাঁর কানে কম আসেনি। সোমেশ্বর সে-সব অবশ্য কানে না তুলতেই চেষ্টা করেছেন আর গোটাগুটি বিশ্বাসও করেননি। তবু শুভ কাজে ডাকবেন

কি ডাকবেন না ভেবেছিলেন। পরে পাছে আবার পস্তাতে হয় তাই ভেবে শেষ পর্যন্ত ডাকাই স্থির করেছিলেন।

...শিউলি যে আসেনি বিয়ের হট্টগোলের মধ্যে সেটা আর খেয়াল ছিল না। খেয়াল হয়েছিল দিন পনের বাদে। হিমু তখন কলকাতায় তার শ্বশুরবাড়িতে। তাঁর ছেলে ধ্রুবও কলকাতায় তার হোস্টেলে। শিউলির কথা হঠাৎ কি-ভাবে মনে হয়েছিল এখন আর সোমেশ্বরের মনে নেই। যাক, বাসন্তীকে বলেছিলেন, হিমুর বিয়েতে শিউলি তো এল না—অবুর বিয়েতে ডাকা হয়নি সেই রাগে বোধহয়।

স্বামীর কাছে কিছু গোপন করার কথা কল্পনাও করতে পারেন না বলে বাসন্তীর বিপাকে-পড়া মুখ একটু। তারপরে গম্ভীরও। ছোট জবাব দিয়েছিলেন, শিউলিকে নেমন্তন্ন করা হয়নি।

শুনে সোমেশ্বর যথার্থ অবাক। স্পষ্ট মনে আছে শিউলির নাম নেমন্তন্নের লিস্টে ছিল। কাছাকাছির মধ্যে যারা থাকে না তাদের নেমন্তন্ন করার ভার এবারে ধ্রুবর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। নেমন্তন্ন হয়নি মানে ছেলে নেমন্তন্ন করেনি।

কৈফিয়তের সুরে এরপর বাসন্তী বলেছিলেন, তুমি তো সতের কাজে ব্যস্ত থাকো, ভিতরের খবর আর কার কতটুকু রাখো—ধ্রুবর কানে নিশ্চয় এমন কিছু গেছে যার জন্য ও আমাকে বলেছিল ওদের নেমন্তন্ন করে কাজ নেই—আমি বাপু আর ঘাঁটাঘাঁটি করিনি।

শুনে সোমেশ্বরের রাগ হয়েছিল এমন নয়, শিউলিকে উৎসব বাড়িতে ডাকার ব্যাপারে তাঁর নিজেরও দ্বিধা ছিল। তবু হাসিমুখেই স্ত্রীকে তিনি টিপ্পনীর সুরে কিছু বলেছিলেন। বলেছিলেন, তা না-হয় করেনি, কিন্তু ভেবে দেখো, আমার বাবা আমাকে নেমন্তন্নের লিস্ট দিয়েছেন আর আমি তাঁকে না জানিয়েই তার থেকে কাউকে বাতিল করেছি—তোমার ভাবতে কেমন লাগে?

সে যে ভাবাও যায় না বাসন্তীর মুখ দেখেই বোঝা গেছল। তবু ধ্রুবর হয়ে একটু সুপারিশ করেছিলেন—আহা, তুমি কি ঠাকুরের সঙ্গে সে-ভাবে মিশতে না নিজেব দায়িত্ব নিয়ে কখনো কিছু করতে—ছেলেকে তো নিজেই সে-অধিকার দিয়েছ...ও তো আর তোমাকে অমান্য করেনি, যা ভালো মনে হয়েছে, তাই করেছে।

আজ শিউলি সম্পর্ক ছেঁটে দেওয়ার অনুযোগ করতেই পারে। নিজের ত্রুটি স্বীকার সোমেশ্বর অনায়াসে করতে পারেন। কিন্তু সহজভাবে তাও পারলেন না। এই মেয়েটার সম্পর্কে এখনো দুর্নাম কানে আসে। তেত্রিশ বছর বয়েস অনুযায়ী দেহ ভাঙলে বা মুটোলে কেউ হয়তো ওকে নিয়ে আর মাথা ঘামাতো না। কিন্তু একেবারে তার উল্টো হলে লোকে মুখে আগল দেবে কেন?

—দিন-রাত নেশা করে বলাই কুশারি চব্বিশ ঘণ্টার বেশির ভাগ সময় ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয়—তাহলে রঙিলার চলে কি করে গো চাটুজ্জে মশাই? আপনি নিজের হাতে সম্প্রদান করে যজ্ঞ করে বিয়ে দিয়েছিলেন বলেই কথাটা তোলা।

ওদিকের এক আধ-বুড়ো পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হতে দিন কয়েক আগেই এ-কথা শুনিয়েছিলেন। সোমেশ্বর আরো শুনেছেন। ওদের ডেরা এখন নাকি নেশার আখড়া হয়ে উঠেছে একটা, হরেক রকমের মানুষের উদয় হয়। এমন কি বাজে মেয়েমানুষও নাকি চুপি চুপি শিউলির কাছে আসে—ওদের নাকি বিশ্বাস, শিউলি রমণী অঙ্গ থেকে

বয়সের দাগ ঝেঁটিয়ে বিদেয় করার তুক-তাক টোটকা টুটকি জানে। জানে বলেই এই বয়সেও নিজের গতরখানা অমন তরতাজা রাখতে পেরেছে।

সোমেশ্বর দ্বিধা ঝেড়ে ফেললেন। এ-সব কথায় তিনি কান দেন না বা দিতে চান না। মনে অতখানি পাপ থাকলে এই মেয়ে এত সহজভাবে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতে পারত না। নিজের বিবেকের ওপর কারো নীতির ছড়ি ঘোরাতে দেন না। আগের কথার জবাবে বললেন, তুই বাড়ি এলে আমি অসন্তুষ্ট হব কেন আর মাসিমাই বা রাগ করবেন কেন? তোর নিজের যাবার অধিকার আছে ভাবলে যাবি।

অধিকার শব্দটার ওপর ইচ্ছে করেই একটু জোর দিলেন সোমেশ্বর। অর্থাৎ বলতে চাইলেন, তোর বিবেকে না বাধলে যাবি। কিন্তু অনুমতি পেয়েই শিউলি বেজায় খুশি। ঘাড় কাত করে বলল, ঠিক যাব এবারে একদিন। তার পরেই আবার ভয়—আপনার ছেলে এখানে নেই তো? ধ্রুব?

সোমেশ্বর থমকালেন একটু।—কেন, তাকে তোর ভয় কিসের, কত ছোট তোর থেকে...তোকে তো দিদি বলে ডাকত?

সুন্দর মুখখানা একটু কুঁচকে হাসি মুখেই শিউলি বলল, যখন ডাকত তখন ডাকত—এখন আর ও আমার মুখ দেখতেও রাজি নয়—তিন ব-চ্ছর আগে এম.এ পাস দিয়ে যেবারে এলো সেবারেই শেষ দেখেছিলাম...বা-ব্বা, আপনার ছেলে বোধহয় তার ঠাকুরদার মেজাজ পেয়েছে। শিউলি হাসছে। তার ক'দিন আগেই বিহারীর মুখে শুনেছিলাম ধ্রুব এম. এ পাস করেছে—

সোমেশ্বরের মুখ দেখে বোঝা গেল না, কিন্তু মনে দু-একটা তির্যক আঁচড় পড়ছেই। তিন বছর আগে ধ্রুবর এম. এ. পাস করার পর কি হয়েছে জানেন না, কিন্তু তারও দু'বছর আগে ধ্রুব বি. এ. পাশ করার পরও ছেলে হিমুর বিয়েতে ওকে নেমন্তন্ন করেনি সেটুকু জানেন। এখন বাড়ির মধ্যে শিউলির সঙ্গে যোগাযোগ বোধহয় শুধু বিহারীর সঙ্গেই। বিহারী সাদা মনের মানুষ, অত প্যাঁচ-ঘোঁচের ধার ধারে না। আগেও এই মেয়েটাকে পছন্দ করত, এখনো করে জানেন। এমন প্রভুভক্ত আর বিশ্বাসী মানুষ বেশি মেলে না। বিহারীরও বয়েস এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। নিজের ঘর-সংসার আছে। কিন্তু সেদিকে টান নেই একটুও। কর্তার বাড়িতেই থাকে। আর কর্তার মতো দিনে আট-দশ মাইল হেঁটে না বেড়ালে ওরও পেটের ভাত হজম হয় না। সেই সঙ্গে আড্ডারও ভক্ত। ফাঁক পেলে শিউলিদিদির সঙ্গেও গল্প করতে আসে এ-ও বাসন্তী বলেছিলেন বটে।

...বলাই কুশারি চব্বিশ ঘণ্টার বেশির ভাগ সময় নেশা করে পড়ে থাকে, কিন্তু এই মেয়েটাকে দেখলে সত্যিই মনে হয় না খুব অনটনের মধ্যে আছে। বিহারীকে জিজ্ঞেস করলে ও হয়তো ঠিক-ঠিক বলতে পারত কি-ভাবে দিন চলে। কিন্তু এ-সব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে প্রবৃত্তি হয়নি। তাছাড়া বিহারীর সাদা মনেই বা আঁচড় ফেলে দরকার কি? তিনি কিছু জিজ্ঞেস করলেই বিহারী হয়তো খোঁজখবর করতে লেগে যাবে।

কিন্তু এখন ধ্রুবর সম্পর্কে শিউলির ও-রকম মন্তব্য শুনে সোমেশ্বর ভিতরে ভিতরে উৎসুক একটু। ধ্রুব ঠাকুরদার মেজাজ পেয়েছে এ অবশ্য তিনি আদৌ ভাবেন না। জিজ্ঞেস করলেন, তা তিন বছর আগে ধ্রুবর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাতে কি—তোকে কিছু বলেছিল নাকি?

—বলবে? ছদ্ম ভয়ে হাসি উপচনো দু'চোখ শিউলির কপালে ওঠার দাখিল।—আমার ছায়াও মাড়াতে চায়নি—আমি হঠাৎ আগে বুঝিওনি! বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে এদিকে চলে এসেছিল, দেখে আনন্দে আমিই ওকে জানলা দিয়ে ডাকলাম—সেদিনের ওইটুকু ছেলে এম. এ. পাস দিয়ে বেরুলো আনন্দ হবে না!

সোমেশ্বর সাদা মুখ করে মাথা নেড়ে সায় দিলেন, অর্থাৎ আনন্দ তো হবেই।

শিউলি হাসিমুখেই বলে গেল, ডাক শুনে আমাকে একবার ফিরে দেখে ধ্রুব চিনতেও চাইল না, মনে হল নাক সিঁটকে চলে গেল। আমি তো থ...এখানে থেকে ও যখন বি. এ. পড়ত তখনো হঠাৎ এক-আধ সময় হাটেবাজারে কোথাও দেখা হয়ে গেলে আপনার ছেলে ওইরকম করত—ডাকলেও ফিরে তাকাতো না। আমার ওপর ওর এত রাগ কেন গো মেসোমশাই? আমি ওর কোন্ পাকা ধানে মই দিলাম—অ্যাঁ?

জবাব দিতে পারলেন না। নিজের দুটো চোখের ওপর গভীর আস্থা। বিবেচনার ওপর গভীর আস্থা। আবারও মনে হল রটনার সবটা সত্যি হলে মেয়েটা এত সহজভাবে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতে পারত না। সোমেশ্বর গম্ভীর একটু। কারো সঙ্গে এই গোছের আচরণও তাঁর পছন্দ নয়। শিক্ষা তো নয়ই। ছেলেকে বরাবর বলতেন, নিজে পরিষ্কার থাকলেই হল—বলতেন, বিনীত হবি, সহিষ্ণু হবি। কেউ বিচারের দায়িত্ব ঘাড়ে না চাপালে বিচার করতে যাবি না। কারণ, ওপর-ওপর দেখে বিচার হয় না।...তাঁর কানেই যখন শিউলির সম্পর্কে নানা অপ্রিয় কথা আসে, ওই বয়সের ছেলের কানে আরো বেশি যেত বোধ হয়। সেই কারণেই ও অত বিরূপ, তাছাড়া আর কি হতে পারে?

বললেন, বাড়িটা আমার, আর তুই যাবি তোর মাসিমার কাছে। আর কে আছে না আছে তা নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। তাছাড়া ধ্রুব এখানে নেই।

আর না দাঁড়িয়ে ফিরলেন। দ্রুত পা চালালেন। একটু বাদেই বাঁকের আড়ালে।

## ছয়

সামনেই জীবন ঘোষালের বাংলো। জীবন ঘোষাল বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে বটে। সোমেশ্বরকে দেখেই এক গাল হেসে দু'হাত কপালে ঠেকালেন। পরনে পরিষ্কার পা-জামা, গায়ে ধবধবে জালি গেঞ্জি।

সোমেশ্বর প্রতিনমস্কার করতেই জীবন ঘোষাল অন্তরঙ্গ হাসিমুখে হাত তুলে একটু থামতে ইশারা করলেন। তারপর দ্রুত নেমে এসে ফটক ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। বললেন, সকালেই আপনার মতো একজনের দেখা পেলাম, আজ সুদিন বলতে হবে—এসময় এ-দিকে কোথায়?

সোমেশ্বর তেমনি সবিনয়ে জবাব দিলেন, আপনাদেরই কুলি বস্তিতে...গণেশ দোলুই মারা গেল।

শোকের খবরে মুখ যেটুকু বেজার হতে পারে হল। বললেন, লোকটা মদ খেয়েই শেষ হয়ে গেল।...তা ওদের ওই সমস্ত এলাকাসুদ্ধ লোক আপনাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে বটে। করবে নাই-বা কেন...ওদের জন্যেই বা এত কে ভাবে, কে করে—আপনার কি তুলনা আছে!

সোমেশ্বর মৃদু হেসে বললেন, লজ্জা পাচ্ছি।

হাসলেন জীবন ঘোষালও।—এমন কথা আপনার মুখেই শোভা পায়। কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত আছি, কুলিরা গণ্ডগোল পাকিয়ে বসলে আমি আপনার কাছে গিয়ে ধন্না দেব। যাক, এ-পথ দিয়ে যাচ্ছেন, একটু পায়ের ধুলো দেবেন না?

ইদানীং জীবন ঘোষালের এমন অমায়িক আচরণ কুলিরা তাঁকে অত ভক্তিশ্রদ্ধা করে বলে নয়। কারণটা সোমেশ্বর আঁচ করতে পারেন। সবিনয়ে জবাব দিলেন, ওই সব নাড়াচাড়া করে এলাম, এ অবস্থায় স্নানের আগে আর কোথাও নয়।

—তা-ও তো বটে, তাহলে আর জোর করব না।...তা ছেলে কোথায়—কলকাতাতেই পোস্টেড তো?

দিন দুই-তিন হল ছেলের সম্পর্কে কিছু নতুন খবর পাবেন আশা করছেন সোমেশ্বর। তা না ভেঙে জানালেন, হ্যাঁ।

ঈষৎ খেদে জীবন ঘোষাল বললেন, অমন হীরের টুকরো ছেলে আপনার—এম. এ. পাশ করে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে এই তিন বছরে যা মাইনে পাচ্ছে তার থেকেও অনেক বেশি মাইনেয় বসিয়ে দিতে পারতাম—কিন্তু ছেলেটা কেন যে রাজি হল না—

সোমেশ্বর জবাব দিলেন, আজকালকার ছেলেদের যেমন মতি, কি করি বলুন—আপনি যা করতে চেয়েছিলেন তাইতেই আমি কৃতজ্ঞ।

জীবন ঘোষাল ব্যস্ত হয়ে বললেন, সে কি কথা, পরীক্ষা দিয়ে ব্যাঙ্কে একেবারে অফিসার হয়ে বসেছে—খারাপ কি! মুখের হাসি আরো অমায়িক।—আমি যাব একদিন আপনার বাড়িতে...ভিক্ষে চাইতে পারি কিন্তু!

একটু জোরেই হেসে উঠলেন। সোমেশ্বর বললেন, আমি অত নগণ্য মানুষ, আপনি এলে সৌভাগ্য জানব।

চলে এলেন। শিউলির বিয়ে দেবার পর এক যুগ ধরে যে লোক সামনাসামনি হলে রাগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, বছব তিনেক ধরে তার এই পরিবর্তনও কিছু মাত্র অস্বাভাবিক ভাবেন না সোমেশ্বর।...নিজের ছেলেমেয়ের ভালো পৃথিবীতে কে না চায়। জীবন ঘোষালের মেয়েটি কলকাতায় থেকে কলেজে পড়ে জানেন। এবারে খুব সম্ভব বি. এ. পরীক্ষা দেবে। মেয়েটিকে ছোট দেখেছেন, বড় হবার পরেও দেখেছেন। বড়লোকের মেয়ের মতোই চালচলন, চেহারাও মোটামুটি ভলোই। তার বাপের লক্ষ্যও অসাধু কিছু নয়; মেয়ে আছে যখন ধ্রুবর দিকে চোখ পড়াই স্বাভাবিক। এমনিতেই কত অপরিচিতের কাছ থেকে তাঁর ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব আসছে। হদিস পেয়ে কেনো কোনো মেয়ের বাপ বাড়ি এসে হাজির হয় পর্যন্ত। সোমেশ্বর তখন বড় অস্বস্তি বোধ করেন।

কিন্তু সব থেকে বেশি অস্বস্তি বোধ করেছিলেন জীবন ঘোষালের উদ্দেশ্য আঁচ করার পর। ধ্রুব এম. এ. পরীক্ষা দেবার পর থেকেই দেখা হলে তাঁর ঘনিষ্ঠ আচরণ। অন্তরঙ্গজনের মতো খোঁজ নিতেন ছেলে কেমন পরীক্ষা দিল, পাস করে বেরুনোর পর তা কি করার ইচ্ছে, ইত্যাদি। সোমেশ্বরের তখনো মনে হয়েছিল, ছেলের সূত্র ধরে অনেকদিনের মনোমালিন্য কাটিয়ে ওঠার জন্যই তাঁর এই অন্তরঙ্গ আচরণ। কোলিয়ারির

শ্রমিক বস্তিতে দাদাঠাকুরের প্রতিপত্তি দেখেই পুরনো বিবাদ ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা ভেবেছিলেন। কারণ, দিনের হাওয়া সামান্য হলেও বদলাচ্ছে, শ্রমিকদের দাবির গলাও একটু-আধটু শোনা যায়।

কিন্তু ভদ্রলোকের চোখ কোন্ দিকে ধ্রুবর এম. এ-র রেজাল্ট বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল। কার কাছ থেকে কিভাবে খবর পেলেন সোমেশ্বর জানেন না। আপনার জনের মতো জীবন ঘোষাল একেবারে বাড়ি এসে হাজির। এমন খুশি যেন তাঁরই ছেলে অমন ভালো রেজাল্ট করেছে। বললেন, খবরটা পেয়ে না এসে থাকতে পারলাম না—আপনার ছেলে বাহারীর মুখ উজ্জ্বল করেছে—ইকনমিক্সে ফার্স্ট ক্লাস সোজা কথা নাকি!

জবাবে সোমেশ্বরের মুখে অমায়িক হাসি। নিজেও তিনি বাহারীরই ছেলে, আর শুধু ফার্স্ট ক্লাস নয়, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট—ধ্রুব ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড এ মনে এলেও মুখে বলার নয়। কিন্তু বিচক্ষণ বুদ্ধির মানুষ জীবন ঘোষালেরই মনে পড়ল বোধ হয়। তাড়াতাড়ি সামাল দিলেন, হবে না কেন, কার ছেলে দেখতে হবে তো—এ গাঁয়ে আপনারই কি আর তুলনা হয়!

অপ্রতিভ মুখ করে সোমেশ্বর জবাব দিয়েছিলেন, আমার তো সংস্কৃতর বিদ্যে, তার আর কি ধার...।

জীবন ঘোষাল বলেছিলেন, বিদ্যে—বিদ্যেই। তবে চাকরির বাজারে আপনার ছেলের সাবজেক্টের কদর বেশি এই যা—যাক, বাবাজীবন কোথায়?

সোমেশ্বর জবাব দিলেন, খানিক আগে তো বেরুলো দেখলাম।

গলায় মধু ঢেলে জীবন ঘোষাল বললেন, আনন্দ করবারই তো দিন এটা—আমি যে-জন্য ছুটে এলাম শুনুন, আপনার ছেলের এমন কেরামতির কথা শুনে মিনুর মা-ও বেজায় খুশি—বলল, গাঁয়ের এমন ছেলে...দেখতে ইচ্ছে করে, একবারটি বাড়িতে ডাকো না, তা ছাড়া আপনার জনের মধ্যে এমনটি হয়েছে—তোমার তো ওকে খাওয়ানো উচিত। তাই আমি মশাই উচিত কাজ করতে এলাম, বিকেলের দিকে বাবাজীবনকে যদি একবার পাঠিয়ে দেন বড় খুশি হব।

ভদ্রলোকের তিন-তিনটে ছেলে, কিন্তু পরিবারের বেজায় খুশির কথা বলতে গিয়ে তাদের কারো নাম না করে মেয়ের নাম করলেন, বললেন মিনুর মা! আর এমনি অন্তরঙ্গ হৃদ্যতা যে কে মিনু আর কে মিনুর মা তা যেন সোমেশ্বরের জানাই আছে। বুঝতে কিছু অসুবিধে হল না তো বটেই, জীবন ঘোষালের অভিলাষও জলের মতো স্পষ্ট হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সোমেশ্বরের ভিতরটা বিমুখ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সংযমে চিড় খেতে দিলেন না। ঠোঁটের হাসি বজায় রেখেই জবাব দিলেন, ধ্রুব এলে বলব—

—বলবেন কি, আপনি দয়া করে পাঠিয়ে দেবেন--আমি নিজে এসেছিলাম জানাবেন।

সোমেশ্বর মাথা নাড়লেন। তার অর্থ ছেলেকে পাঠিয়ে দেবেন হতে পারে, উনি নিজে এসেছিলেন জানাবেনও হতে পারে। নিজের স্নায়ু সম্পূর্ণ বশে রাখার আরো একটু পরীক্ষাও দিলেন সোমেশ্বর। বিনীত সৌজন্যের পরীক্ষা। জীবন ঘোষালকে জলযোগে আপ্যায়ন না করে ছাড়লেন না।

ভদ্রলোক চলে যাবার পর নিজেকে নিয়ে একটু বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেছলেন সোমেশ্বর। এই লোকের সংস্রব তিনি একটুও পছন্দ করেন না। কিন্তু নিজের অপছন্দটা ছেলের ঘাড়েও চাপাতে যাবেন কেন? ঘোষালের মেয়ের সেবারেই মোটামুটি ভালোভাবে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করার খবর শুনেছিলেন। কলকাতার কলেজে পড়বে তা-ও কানে এসেছিল। বাহারীতে ঘরের খবর আপনি ভেসে আসে। ওই মেয়ে ঘরে আনার প্রসঙ্গে যদি তার বাপের কথা বিবেচনা করতে হয় তাহলে তক্ষুনি সে-সম্ভাবনা বাতিল করতেই হয়। কেউ মতামত চাইলে সোমেশ্বরের তা স্পষ্ট বলে দিতেও আপত্তি নেই। এই বয়েস পর্যন্ত তিনি হৃদয়শূন্যতা অনেক দেখেছেন, কিন্তু হৃদয়ও তো কম দেখেননি। ভদ্রলোক যেমনই হোক, তাঁর মেয়েও ভালো হবেই না ধরে নিলে নিজের মনের প্রসারে টান ধরে। ছেলে বড় হয়েছে, বুদ্ধি বিবেচনা আছে—সেখানে তাঁর কর্তা সাজতে যাওয়া নীতিগতভাবে উচিত মনে হল না।

ধ্রুব ফিরে না আসা পর্যন্ত বাসন্তীকেও কিছু বললেন না। দুপুরে খেতে বসে ধীরে সুস্থে ঘোষালের আসার গৌণ কারণটুকু শুধু ব্যক্ত করলেন। শুনে মা ছেলে দুজনেই অবাক। কারণ শেফালিকার বিয়ের পর থেকে ওই লোকের বিরূপ আচরণের খবরই শুধু তাদের জানা। শেফালিকার বিয়ের হুজ্জোতে বাসন্তী অবশ্য আর একটু বেশিই জানেন। যা-ই হোক, অমন দেমাকী মানুষ বাড়ি বয়ে খুশির অভিনন্দন জানিয়ে যাবেন আর অমন আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাবেন, ভাবা শক্ত। ধ্রুবর বিস্ময়-মাখা দু'চোখ ভাতের থালা ছেড়ে বাপের মুখের ওপর।—তুমি কি বলে দিয়েছ...যাবো?

—না। শুধু তোকে জানাবো বলেছি।

—তাহলে কি বলো—যাবো?

—এ-ভাবে কেউ বাড়ি বয়ে এসে আদর করে ডাকলে যাওয়া তো উচিত।

মানুষটা ভিতরে ভিতরে কৌতুকপ্রিয়। তাই ছেলে কি জেনে বা বুঝে আসে দেখার লোভ। জীবন ঘোষালের আর কোন উদ্দেশ্যের ধার-কাছ দিয়েও গেলেন না।

আমন্ত্রণ রক্ষা করে ধ্রুবর ফিরে আসতে আসতে প্রায় সন্ধ্যা। ফিরেই দোতলায় উঠে হাঁক-ডাক করে তার মাকে ডেকে নিয়ে সোমেশ্বরের ঘরে ঢুকেছে। তারপর সরাসরি প্রশ্ন।—বাবা, ওই জীবন ঘোষালের আমাকে এমন আদর-আপ্যায়ন করার পিছনে কি মতলব তুমি একটুও বোঝনি?

সোমেশ্বরের আকাশ থেকে পড়া মুখ।—মতলব...!

ছেলের মেজাজ বশে থাকলে অমন বিস্ময়ের ফাঁকেও কৌতুকের আভাস চোখে পড়ত। মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল, হ্যাঁ—মতলব! তাদের মেয়েও এবারে ফার্স্ট ডিভিশনে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছে, কলকাতার কলেজে ভর্তি হয়েছে—তুমি জানতে?

তেমনি নিরীহ মুখে সোমেশ্বর জবাব দিয়েছেন, শুনেছিলাম বোধহয়...তাতে কি?

—তাতেই যা-কিছু। শোনো, বাড়ি যেতে প্রথমে আমাকে তাঁরা এক-প্রস্থ চা-টা খাইয়েছেন—তারপর ভদ্রলোক আমাকে কোলিয়ারি দেখাতে নিয়ে গেছেন—তাঁদের মেয়ের এখন পর্যন্ত ভালো করে কোলিয়ারি দেখা হয়নি বলে সে-ও সঙ্গে ছিল—দেখে আসার পরে আবার আমাকে বাড়ি নিয়ে এসে জীবন ঘোষাল আর তাঁর স্ত্রী আদর করে আমাকে এমন খাওয়া খাইয়েছেন যে কাল দুপুর পর্যন্ত বোধহয় খাওয়ার দরকার হবে

না—সতের পদের কোন্-কোন্টা তাঁদের মেয়ের রান্না তা-ও বলেছেন।

গড়গড় করে এতগুলো কথা বলতে বলতে ছেলের মুখ লাল। বাসন্তী অবাক, আর সোমেশ্বরের কোনো-কিছুর হদিস না-পাওয়া মুখ।

—তার পরেও আছে। তেমনি তড়বড় করে ধ্রুব বলে গেল, খাওয়া-দাওয়ার পরে স্ত্রীর সামনে জীবন ঘোষাল এখন আমি কি করব না করব খোঁজ নিলেন। অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্কিং পরীক্ষায় বসতে যাচ্ছি শুনে নাক সিঁটকোলেন। বললেন, অত ভালো পাস করে ব্যাঙ্কের হাড়ভাঙা খাটুনির মধ্যে গিয়ে ঢোকার কি দরকার—তার থেকে তাঁদের কোলিয়ারিতে একেবারে অফিসার হয়ে বসার অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা তিনিই করে দিতে পারেন।

ছেলের মুখের দিকে চেয়ে তেমনি নিরীহ বিস্ময়ে সোমেশ্বর বলেছিলেন, সবই তো ভালো কথা...এর মধ্যে মতলবের কি দেখলি?

বাপকে ছেলে চেনে না এমন নয়। এবারে তার চাউনি ঘোরালো হয়ে উঠতে লাগল। —ভদ্রলোকের মতলব তাহলে তুমি এখনো বোঝনি বলতে চাও?

সাদামাটা সুরে সোমেশ্বর জবাব দিয়েছেন, একেবারে বুঝিনি তা নয়...ভদ্রলোক হয়তো তাঁর মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবার কথা ভাবছেন—তা মেয়ে থাকলে ভালো জামাই আনার চেষ্টা তো করতেই পারেন, তাতে দোষের কি হল?

সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুবর তপ্ত মুখ।—তার মানে ভদ্রলোকের মতলব তুমি খুব ভালো করে জেনেও আমাকে সেখানে ঠেলে পাঠিয়েছ?

—আমার মনে হয়েছিল, তবে মতলবের কথা তো তিনি আব আমাকে বলেননি, তোব ভালো পাসের আনন্দটাই শুধু দেখিয়েছেন। তা এতসব জানা বোঝার পর তুই কি ঠিক করলি?

ছেলের সহিষ্ণুতা বরাবরই কম। ফলে পাল্টা ঝাঁঝালো প্রশ্ন।—তুমি কি বলো—রাজি হয়ে যাব?

—বিয়েতে না চাকরিতে?

—দু'য়েতেই, একটা হলেই আর একটা জানো না?

সোমেশ্বর যেন চিন্তাচ্ছন্ন একটু।—তোর পছন্দের ওপর আমার কোনো কথা নেই —কিন্তু বিয়ে হলে সেখানে চাকরি করা চলবে না।...তা তুই ওঁদের কি বলে এলি?

...বুদ্ধিমান ছেলের যেটুকু বোঝার বোঝা হয়ে গেছল। রাগ করে জবাব পর্যন্ত দেয়নি, মুখ ফিরিয়ে ছিল। বাসন্তী বিস্ময়-ভাঙা গলায় বলে উঠেছিলেন, তুমি কি সত্যি সব জেনেশুনেই ধ্রুবকে সেখানে পাঠিয়েছিলে নাকি?

সোমেশ্বর মুচকি হেসে জবাব দিয়েছেন, আমার কর্তা সেজে কাজ কি, যার ব্যাপার তার ফয়সালা করাটাই ভালো নয়?

কিন্তু পরের তিন বছরেও জীবন ঘোষাল একেবারে আশা ছাড়েননি। ভাবতে পারেননি। আজ তো ভিক্ষে চাওয়ার কথা মুখ ফুটে বলেই ফেলেলন। এখনো এই লোকের সংস্রব সোমেশ্বরের বাঞ্ছিত নয়।

সোজা দামোদরের দিকে চললেন। স্নানাহ্নিক সেরে ঘরে ফিরবেন। গণেশ দলুইদের

বস্তিতে রওনা হবার সময়েই তাঁর মনে ডাক দিয়েছিল গিয়ে কি দেখবেন। তাই তাঁর জামা কাপড় নিয়ে বিহারীর নদীর ধারে অপেক্ষা করার কথা। করছে। কিন্তু বিহারীর সামনে আর এক মূর্তি দাঁড়িয়ে। শংকর হালদার। হালদার বলতে বামুন বা কায়েত নয়। নমশূদ্র। কিন্তু ওই সম্প্রদায়ের মধ্যেই মানের বিচারে ওরা উঁচু বর্ণের মানুষ। তাদের থেকে নীচু ঘরের মেয়ে আনবে না বা নীচু ঘরে মেয়ে দেবে না। গ্রামসুদ্ধ স্বজাতির কাছে এই একটি দোষে বিষম দোষী শংকর। শুধু নীচু ঘরের মেয়ের সঙ্গে অনেকগুলো বছর ঘর করেনি, এমন মেয়ে ঘরে রেখেছিল যার মুখ দেখাও পাপ ভাবে ওরা। ওর জ্ঞাতিবর্গের বিবেচনায় জাতের মুখে কালি লেপে দিয়েছে শংকর।

বছর ছত্তিরিশ বয়েস এখন। দেখলে ছেচল্লিশও মনে হতে পারে। ঢ্যাঙা, রোগা। এক মাথা ঝাঁকড়া চুলের কিছু কিছু পাক ধরেছে। চোয়ালের দু'দিকের হাড় উঁচিয়ে আছে, ফলে চোখ দুটো গর্তে। শুকনো মুখ। দু'হাত জোড় করে অনেকটা নীচু হয়ে প্রণাম জানালো।

সোমেশ্বর আড়চোখে বিহারীর দিকে তাকালেন একবার। বিহারীর গম্ভীর মুখ। দেখেই বুঝলেন মনিবের চানের সময় এই উৎপাত পছন্দ নয়। শংকরকে হয়তো শাসিয়ে রেখেছে এ-সময়ে যেন বিরক্ত করা না হয়। শংকরের আরজি সোমেশ্বর জানেন। অভাবের তাড়নায় প্রেমিক পুরুষের শোকতাপও উবে গেছে। সোমেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, কি রে, কি খবর?

আমতা আমতা করে শংকর তার এখানে হাজিরার কৈফিয়ত দিল।—গণেশ দোলুইয়ের ওখান থেকে বেরিয়ে আপনি শিউলিদির সঙ্গে কথা কইছেন দেখলাম...তারপর কোলিয়ারির ম্যানেজার সায়েবের সঙ্গে...তারপর তো চানেই যাবেন ভাবলাম, তাই দামোদরে এলাম।

সোমেশ্বরের মনে হল কিছু একটা আশায় লোকটার দু'চোখ চিক-চিক করছে। তিনি কিছু বলার আগেই ওর চকিত দৃষ্টি একবার বিহারীর মুখের ওপর থেকে ঘুরে এলো। একটু ব্যস্ত হয়ে বলল, আপনি আগে চান সেরে নেন দা-ঠাকুর, এরপর বেলা তেতে উঠবে, আর দেরি হলে বিহারী দাদাও রাগ করবে।

সোমেশ্বর হাসি চেপে নদীতে স্নান সারতে নামলেন। একসময় আহ্নিকও শেষ হল। বাবার উদ্দেশ্যে আজ একটু বেশি সময় নিয়েই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন। কোনো মৃত্যু দেখলেই বাবার কথা মনে পড়ে। মনে হয় মৃত্যুর আছাড়িবিছাড়ি শোক অনেক দেখলেন, অমন মহিমা আর দেখলেন না।

উঠলেন যখন মন তৃপ্তিতে ভরপুর। বিহারীর কাছ থেকে শুকনো কাপড় নিয়ে ভিজে কাপড় বদলালেন। বিহারী সেগুলো তুলে নিয়ে আগে আগে প্রস্থান করল। এ-সময় মনিবকে বিরক্ত করাটা আদৌ পছন্দ নয় বুঝিয়ে দিয়ে গেল।

সোমেশ্বর খানিকটা পথ ভেঙে একটা গাছের ছায়ায় এসে ঘুরে দাঁড়ালেন। একটু বাদে শংকর শুকনোমুখে সামনে এসে দাঁড়ালো।

—কি বলবি বল্।

বিষণ্ণ গলায় শংকর জবাব দিল, আজ্ঞে দা-ঠাকুর নতুন করে কি বলব—পুষ্যিগুলোর উপোস আর দেখতে পারি না—ওদের দিকে তাকালেই মনে আসে গৌরীর আত্মা আমায়

গাল-মন্দ করছে। তারপরেই কোটরের দু'চোখে আশার চেকনাই।—খানিক আগে তো দূরে দাঁড়িয়ে নিজ চোখে দেখলাম দা-ঠাকুর কোলিয়ারির ও ম্যানেজার সায়েব আপনাকে কত খাতির করে—আপনাকে দেখেই ছুটটে বাংলো থেকে নেমে এলেন পর্যন্ত...তিনি তো ঘাড় নাড়লেই আমার সঙ্গে বড় ছেলেটারও হিল্লে...হয়ে যায়...আপনি তেনাকে একবারটি বলে দেন দা-ঠাকুর।

অর্থাৎ বাপ ছেলের দু'জনেরই কোলিয়ারিতে কাজ পাওয়ার আশা। প্রস্তাব শুনে সোমেশ্বর ভিতরে ভিতরে বিরক্ত একটু। বললেন, তাঁকে আমি কিছু বলতে-টলতে পারব না—ভালোমন্দ আগে বুঝিস না? এখন এত মুখ শুকোচ্ছিস কেন, আবার একটা ভালোবাসার লোক ধরগে যা।

দাদাঠাকুর এমন বলবেন লোকটা আশা করেনি। আর একদিনও অভাবের কথা জানাতে ওই ভালবাসার লোকের খোঁটা দিয়েছিলেন। কিন্তু দয়া করে তারপর একজনের কাছে যেতে পরামর্শও দিয়েছিলেন। আশাহত অভিমানে বলে উঠল, ঠিক আছে দা-ঠাকুর, প্রাশ্চিত্তি করছি, বড়টাকে না পারি বাকি তিনটাকে নিয়ে গায়ে কেরোসিন ঢেলে মরতে পারব—

এই শুনেও সোমেশ্বর ধমকে উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু লোকটার শুকনো মুখ আর চোখে জল দেখে থমকালেন। ভুরু কুঁচকে ভাবলেন একটু।—তোকে যে তোর ওই নেউলটার কাছে যেতে বলেছিলাম তার কি হল?

নেউল বলতে শংকরেরই সব থেকে নিকট জ্ঞাতিভাই বংশী হালদার। ওর থেকে বছর দুই বড় হবে। শংকরের সাপের বিষ নেই, বরং কারো সাতে-পাঁচে থাকে না এমন সাদামাটা মানুষ। কিন্তু জ্ঞাতিভাই বংশীর সঙ্গে সাপে-নেউলের সম্পর্ক। মাথা গোঁজ করে জবাব দিল, যেছিলাম, খেঁকিয়ে মারতে এলো।

—আমার কথা বলেছিলি?

—তাইতে তো আরও রেগে গেল। গজরে গজরে বলল, ফের ওই মুখে দা-ঠাকুরের নাম নিবি বা তাঁকে বিরক্ত করবি তো ঘরে আগ লাগিয়ে সবসুদ্ধ পুড়িয়ে মারব।

সোমেশ্বর ভুরু কুঁচকে চিন্তা করলেন একটু।—আচ্ছা, ঘণ্টা দুই বাদে বাড়িতে আমার সঙ্গে দেখা করিস।

লোকটা অকূলপাথারে ডাঙা পেল। সাষ্টাঙ্গে প্রণামের উদ্যোগ করতেই সোমেশ্বর তাড়াতাড়ি সামনে এগোলেন। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ঝুলছে। ওপরওলার খেলার তলকূল মেলা ভার। নইলে এমন দু'দুটো লোকের সঙ্গে, অর্থাৎ বংশী আর শংকরের সঙ্গে তিনিই বা এমন বিচিত্রভাবে জড়িয়ে পড়লেন কেন?

...শিউলির বিয়েটা ঘটিয়ে ফেলার আগে পর্যন্ত যে পণ্ডিতেরা প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিলেন আর বলেছিলেন শাস্ত্র নিয়ে অনাচারের খেলা সোমেশ্বর চাটুজ্জে অনেক করেছেন, একঘরে অস্পৃশ্য অন্ত্যজের বিয়ে দিয়েছেন আবার শবও বহন করেছেন। সেই অস্পৃশ্য অন্ত্যজটি হল গ্রামের শেষে কয়েক সারি কুঁড়েঘরে বাস করে যে মেয়েপুরুষেরা তাদের ঘরের একটি মেয়ে। বাহারীর মানুষ ও এলাকার ছায়াও মাড়ায় না। দিনমানে লোকচক্ষুর সামনে দিয়ে অন্তত নয়। রাত নামলে ও-এলাকার অনেক ঘরে পাপের পসরা বসে এমন বিশ্বাসের কতটা রটনা আর কতটা ঘটনা কে জানে। সেখানকার

এক মেয়ের সঙ্গে শংকরের এক তাজ্জব বিয়ে দিয়েছিলেন সোমেশ্বর তা যেমন সত্যি আর তার কিছুদিন বাদে কোনো সংস্কারের পরোয়া না করে সেই মেয়ের শব বহন করেছিলেন—তা-ও তেমনি সত্যি।

অন্যদিকে শংকরের দু'বছরের বড় সাক্ষাৎ জ্ঞাতিভাই বংশীকে নিয়ে যে ঘটনা সে-ও কম বিচিত্র নয়। সোমেশ্বরের পাশের চাষের জমির মালিক হরিহর ঘোষ তেতে উঠলেই যে টিপ্পনী ছোঁড়েন আর বলেন, ডাকাত পুষে ঘর সামলাও তুমি—কুম্ভকর্ণের ঘুমে কাল কাটালেও তোমার জমি নির্বিবাদে সোনা ফলিয়ে যাবে না কেন—তোমার বংশীরত্ন থাকতে রা কাড়বে এমন কার কাঁধে কটা মাথা? এমন টিপ্পনীরও সবটাই ফুঁ দিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দেবার মতো নয়।

এ দুই যোগাযোগেরই পিছনে আর একটু পর্ব আছে। বংশীর বাপ গোকুল হালদার সোমেশ্বরের বাবার আমলের সব থেকে বিশ্বস্ত চাষী। সোমেশ্বরও তাকে অনেক দেখেছেন। ওর মতো লোক ছিল বলেই জমি নিয়ে বাবার কোনো চিন্তা ভাবনা ছিল না। ওর অধীনের ভাগচাষীরাও তেমনি বিশ্বস্তই ছিল।

এই গোকুলের বুকের তলায় খুব একটা দুঃখের স্মৃতি ছিল। বাহারীতে বাবার কাছে আসার আগে গোখলা গ্রামে বাস ছিল ওদের। সেখানে তিন পুরুষের ভিটে। সেখানে এক প্রবলপ্রতাপ অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের জমি সে ভাগে চাষ করত। গোকুলের ভিতরে একটু তেজ ছিল যা মালিক স্বভাবতই পছন্দ করত না। ভাগের পাওনা সরাসরি দাবী করত। এই রকমই কি ব্যাপারে মালিক এমন অপমান বোধ করল, যার ফলে পরের এক-দেড় বছরে একেবারে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে ছাড়ল তাকে। ঠিক সেই সময়েই গোকুলের বউ আবার কালজ্বরে পড়ে গেছল। দারুণ অশান্তি নিয়েই বউটা চোখ বুজেছে। নিজের ছেলে বংশী আর ভাইয়ের ছেলে শংকরকে নিয়ে গোকুল ভিটেমাটি ছেড়ে বাহারীতে চলে এসেছিল।

...সেই গোকুল একটা কথা প্রায়ই বলত। বলত, গোখলার সেই মালিকের ওপর প্রতিশোধের বাসনা তার এ জীবনে যাবে না। ওই নির্দয় মালিকের সব কিছু মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া গেল না সেই খেদ নাকি তার থেকেই গেল।

গোকুলের ছেলে বংশী দিনে দিনে ষণ্ডা আর বেপরোয়া হয়ে উঠছিল। চাষের কাজে মন নেই. কোথায় কোথায় চলে যায়, যার-তার সঙ্গে মেশে। উঠতি বয়সেও সেই ছেলেকে বাপের হাতে বেদম প্রহার খেতে দেখেছেন সোমেশ্বর। তাঁর ধারণা, বাপের সেই প্রতিশোধ না নিতে পারার খেদের কথা ছেলে অনেক শুনে থাকবে। সোমেশ্বরের বাবার দেহত্যাগের মাস দুই-তিনের মধ্যে গোকুলও চোখ বোজে। বংশী তখন সোমত্ত বয়সের জোয়ান ছেলে। বাপ মরার কিছু দিনের মধ্যে সেই ছেলে নিপাত্তা।

...মাস ছয়েকের মধ্যে গোখলায় গোকুলের সেই নির্দয় বড়লোকের বাড়িতে ভয়াবহ ডাকাতির খবর বাহারীর মানুষেরাও শুনেছে। ডাকাতরা প্রাণে কাউকে মারেনি বটে, বহু টাকা আর গয়না নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, যাবার আগে তাদের বিশাল ধানের গোলাতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে গেছে।

সোমেশ্বর অনুমান করেছেন সেই ডাকাত দলে কার থাকা সম্ভব। কিন্তু মুখ ফুটে সন্দেহের কথা কাউকে বলেননি। বংশীর বাহারীর বাড়িতে তখন শুধু শংকর থাকে।

সে-ই শুধু চুপি চুপি সোমেশ্বরকে বলেছিল, গোখলার ওই বাড়িতে অমন ডাকাতি একদিন হব সে ঠিক জানত।

সোমেশ্বর শুনেও শোনেননি। মনে মনে ভেবেছিলেন, বংশী নাম যার তার এই পরিণাম। অন্যদিকে বাঁশের বাঁশী বাজায় শংকর। গ্রাম্য গানের বেশ মিঠে সুর তুলতে পারে। চাষে মন নেই। উদাস উদাস ভাব।

বছর দুই বাদে বাহারীতে আবার একটা ত্রাসের খবর শোনা গেল। আবার এক মস্ত ডাকাতি হয়ে গেছে কালিকাপুরে। না, ডাকাতি হতে পারেনি, আগে থাকতে কিছু উড়ো খবর পেয়ে বাড়ির লোক প্রস্তুতি নিল। ফলে তাদের সঙ্গে ডাকাতদের খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে। দু-তিনজন ডাকাত ধরা পড়েছে, জনা দুই জখম হয়েছে, আর বাকিরা পালিয়ে গেছে। এই ডাকাত দলের পাণ্ডাগোছের একজনের চালু নাম নাকি শত্রুখেকো হালদার, জাতে নমশূদ্র, বাহারীতে নিবাস।

বুড়ো চাষীদের কারো কারো সন্দেহ হয়েছিল লোকটা কে হতে পারে। আর শংকরের তো হয়েই ছিল। বুড়োরা তাকে পরামর্শ দিয়েছিল, কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকবি কিনা ভেবে দেখ—পুলিশ শত্তুরখেকোকে না পাক তোকে পাবে— পেলে ধরে নিয়ে গিয়ে হাড় গুঁড়িয়ে আর জিভ টেনে ছিঁড়ে কথা বার কববে—আর তোকে দলের লোক ভাবাও বিচিত্র নয়— হালদার আর আমাদের মধ্যে কে আছে।

ওদের বুদ্ধি অনুযায়ী ওরা পরামর্শ দিয়েছে। আর তাই শুনেই শংকরের কাঁপুনি। গ্রামের ব্যাপারটাও ঘটে গেল সেই গভীর রাতেই। দুর্ভাবনায় চোখে ঘুম আসছিল না শংকরের। শেষ রাতে সবে তন্দ্রা এসেছে। কিছু শব্দ শুনে বা হয়তো অজ্ঞাত কারণেই তন্দ্রা ছুটে গেল। উঠে এসে বাইরে দেখে আবছা অন্ধকাবে লাঠি—অনেকগুলো লোক নিঃশব্দে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ছে। শংকর সেই মুহূর্তে বুঝল কারা। দিশেহারার মতো খিড়কি দিয়ে বাইরে চলে এলো সে। তারপর গাছগাছড়ার আড়ালে আড়ালে পুকুরের ওপারে এসেই ছুট। অমন ছোটা আর জীবনে ছোটেনি বোধহয়।

গোকুল বা বংশীর বাড়ি তছনছ করে পুলিস পবদিন একটু বেলায় খোঁজখবর নেবার জন্য সোমেশ্বরের বাড়িতেও এসেছিল। আসারই কথা। কারণ তাঁর থেকে সম্ভ্রান্ত এ তল্লাটে আর কে। অম্লানবদনে বলেছেন, শত্রুখেকো নাম কোনো ডাকাত নিতে পারে কিন্তু তার সঙ্গে বাহারীর বা বাহারীর হালদার চাষীর কোনো সংস্রব আছে সেটা তিনি বিশ্বাস করেন না। শংকরকে রাতে বাড়িতে না পাওয়ার কারণ তার স্বভাব-চরিত্রের খুব সুনাম নেই বলেও হতে পারে। চুরি ডাকাতির সঙ্গে কোনদিন তাব সম্পর্ক নেই, ছিলও না।

এ-রকম বলার কারণ, ওই বুড়োদের একজন খুব ভোরেই তাঁর কাছে ছুটে এসেছিল। তাদের পরামর্শ শুনে শংকর যে বুদ্ধিমানের মতো ঘর ছেড়ে নিপাত্তা হয়েছে তা-ও শুনেছিলেন। সোমেশ্বর তক্ষুণি বুঝেছিলেন, সব থেকে বড় বোকামিটা ওদের ওইখানেই হয়ে গেছে। ওই বুড়োকে বলে দিয়েছিলেন, পুলিশ তোমাদের জেরা করলে বলে দেবে, রাতে মাঝে মধ্যে শংকর ঘরে থাকে না। ওকে বাঁচানোর জন্য পুলিসকে সোমেশ্বর নিজেও ওই কথাই বলেছেন। কিন্তু শংকরের চরিত্র নিয়ে ওই কটাক্ষপাত যে এমন সত্যি হতে পারে সেটা কল্পনারও বাইরে।

যাক, তার আগে, এই বাহারীতে তারই বাড়ির চত্বরে আরো ঘটনা ঘটে গেছে।

রাত তখন প্রায় ন'টা। গাঁয়ে সেটা বেশ রাত। নিচেরই একটা ঘরে বসে সোমেশ্বর আয়ুর্বেদ চিকিৎসার বই পড়ছিলেন। বিহারী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল। থমথমে মুখ। খুব ঠাণ্ডা চাপা গলায় বলল, ঠাকুরদালানের পিছনে একবারটি আসতে হবে। বলেই প্রস্থান। কি ব্যাপার সোমেশ্বর ঠাওরও করতে পারলেন না। বিহারীর এই আচরণও অস্বাভাবিক। যা-ই হোক, উঠলেন। ঠাকুরদালানের পিছনটা বেশ অন্ধকার। সোমেশ্বরের অভ্যস্ত পা, অন্ধকারে অসুবিধে হয় না। সেই অন্ধকারে মিশে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে বিহারী। দুর্বোধ্য বিস্ময়ে সোমেশ্বর কাছে এলেন। তারপরেই বিষম চমক। মাটির দিকে চোখ ছিল না তাঁর। কে একজন শক্ত হাতে তাঁর দুটো পা-ই জড়িয়ে ধরল। এত জোরে যে নড়ার ক্ষমতা নেই। বিহারী সামনে না থাকলে হঠাৎ ওভাবে পা জাপটে ধরার দরুন ঘাবড়েই যেতেন।

অন্ধকারে চোখ বসতে সময় লাগল একটু।...একটা লোক তাঁর পা সবলে আঁকড়ে ধরে দু'পায়ে মাথা গুঁজে সটান উবুড় হয়ে পড়ে আছে। কে হতে পারে তখনো ভেবে পেলেন না। পায়ের ওপর মুখ গুঁজে লোকটা কাঁদছে।

অস্ফুটস্বরে বিহারীকে জিজ্ঞেস করলেন, কে?

বিহারী তেমনি চাপা জবাব দিল, বংশী।

শুনে সোমেশ্বর নিস্পন্দ কাঠ খানিকক্ষণ। তারপর অনুচ্চ কঠিন গলায় বললেন, পা ছাড়—

ছাড়ল না।

তেমনি কঠিন গলায় সোমেশ্বর আবার বললেন, পা ছাড় বলছি!

এবারে ছাড়ল। আস্তে আস্তে একটা পা হিঁচড়ে টেনে উঠে বসল। ও-ভাবে বসাটা সোমেশ্বর লক্ষ্য করলেন। কিন্তু অন্ধকারে ঠাওর করতে পারলেন না। গলা না তুলে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কেন?

বংশী অস্ফুট শব্দ করে কেঁদে উঠল। বলল, আমি বাকি জেবনটাই পাশ্চিত্তি করে কাটাবো দা-ঠাকুর, এবারের মতো আমারে বাঁচায়ে দ্যান—গুলি লাইগে আমার একটা পায়ের সামনেটা ছাতু হইন গেছে, আপনি না দয়া করলে আমার আর ফেরার পথ নাই দাদাঠাকুর!

সোমেশ্বর নির্বাক খানিক। তারপর বিহারীকে হুকুম করলেন, সামনের দাওয়ার সব আলো নিভিয়ে ঠাকুরঘরের দরজার তালা খোল্—চাবি আমার ওই পড়ার টেবিলেই পাবি।

বিহারী তখুনি অন্ধকারে মিশে গেল আর এক-দেড় মিনিটের মধ্যে ফিরে এলো।

—আয়।

দেয়াল ধরে আর বিহারীর সাহায্যে বংশীকে ঠাকুরদালানে নিয়ে আসা হল। কর্তার ইশারায় বিহারী ওকে ঠাকুরঘরেই ঢুকিয়ে দিল। মায়ের এই ঘর সকলের অবারিত সবাই জানে। নিজেও ভিতরে ঢুকে সোমেশ্বর আগে নিঃশব্দে দরজা দুটো বন্ধ করে দিলেন। তারপর হাতড়ে দেশলাই বার করে প্রদীপ জ্বাললেন।

বংশীই বটে। আগের থেকেও ঢের বেশি জোয়ান দেহ এখন। পরনে খাটো ধুতি,

গায়ে ফতুয়া। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। ডান পায়ে মোটা করে ন্যাকড়ার ব্যান্ডেজ। সেটা রক্তে জবজব করছে। সোমেশ্বর স্থির চোখে ওর দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। বংশী চোখ না নামিয়ে পারল না।

সোমেশ্বরের গলার স্বর ঠাণ্ডা, কিন্তু নরম নয় একটুও।—কত লোকের প্রাণ নিয়েছিস, এখন প্রাণের ভয়ে কাঁদতে লজ্জা করে না?

কথার চাবুকে বংশী আবারও কেঁদে ফেলল। বলল, এই মায়ের ঘরে মাকে সাক্ষী রেখে বলছি দা-ঠাকুর মিথ্যে বললে এই পায়ের ঘায়ে যেন কুষ্ঠ ধরে— কাউকে আমি প্রাণে মারি নাই—বিপাকে পড়লে জখম করেছি হক কথা।

হাতের উল্টো পিঠে চোখ মুছতে মুছতে বংশী আবার বলল, গোখলায় বাপের অপমান আর মায়ের মিত্যু আমি ভুলতে পারলাম না দা-ঠাকুর, তাই এমন মতি হল—একবার ভিড়ে যেয়ে আর ফেরাও গেল না। তবু বিশ্বাস করেন দাঠাকুর, ডাকাতির ভাগের টাকা দিয়েও আমি ফুর্তি করি নাই—লোকের আপদে-বিপদে দিছি—সত্য সত্য সত্য!

সোমেশ্বর অপলক চেয়ে ছিলেন তার দিকে। বংশী এবারে আব চোখ নামিয়ে নেয়নি। এমন করে তাকিয়ে ছিল যেন তাঁরই ওপর ওর বাঁচা-মরা নির্ভর করছে।

নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে আবার দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। ক্ষত পরিষ্কার করার সরঞ্জাম আর ওষুধপত্র নিয়ে ফিরেছেন। ন্যাকড়ার ব্যান্ডেজ সরিয়ে শিউরে উঠেছেন। ডান পায়ের সামনের দু'আঙুল বলতে গেলে উড়েই গেছে। বীভৎস দৃশ্য। ওতেই পচন ধরে মারা যেতে পারে। নিজেকে সংযত করে আগে ক্ষত পরিষ্কার করতে যেতেই বংশী আকুল হয়ে বাধা দিতে চেষ্টা করেছে। পায়ে হাত দিতে দেবে না। মুখে কিছু বলতে হল না, সোমেশ্বর যে-ভাবে তাকালেন তাতেই কাজ হল।

প্রায় একঘন্টা ধরে যতটুকু পারলেন করলেন। মলম লাগালেন। ওষুধ খাওয়ালেন। পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন।

কি করতে হবে বিহারীকে রাতেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। টাকাও। সাইকেল-রিকশ মজুত থাকলে ন'মাইল পথ ভেঙে আসানসোলে পৌঁছনো কঠিন কিছু নয়। ভোর হবার আগেই বংশীকে নিয়ে বিহারী আসানসোলে এসেছে। সেখান থেকে ট্রেনে কলকাতায় মামাবাবু অর্থাৎ বাসন্তীর দাদার বাড়ি। তাঁর নামে কর্তার লেখা চিঠিও বিহারীর পকেটে।

পরদিন বেশ বেলায় বাসন্তী বিহারীর খোঁজ করেছেন। জিজ্ঞেস করেছেন, সকাল থেকে বিহারীকে দেখছি না, কোথাও পাঠিয়েছ নাকি?

সোমেশ্বরের তখন কি একটা হিসেবে মনেযোগ।—এত কাছে থেকেও কখনো কলকাতা দেখেনি, কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে কলকাতা দেখতে গেছে।

বাসন্তী অবাক। তাঁকে না জানিয়েই চলে গেল এ আবার কেমন করে হয়। কিন্তু স্বামীকে হিসেবে অত মনোযোগ দেখে আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

বিহারী ফিরল আটদিন বাদে। সোমেশ্বর নিচে থেকেই সমাচার শুনে নিলেন। হাসপাতালের ব্যবস্থা সব মামাবাবু করেছেন। বংশীর অপারেশন হয়ে গেছে। ডান পায়ের সামনের দিক থেকে দু'আঙুলের মতো কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। ভালো আছে।

দোতলায় এসে সোমেশ্বর বাসন্তীকে সব বললেন।

বাসন্তী থ।

এই আটদিনের মধ্যে বাহারীতে শংকরকে নিয়ে ওদের সমাজে বেশ একটু উত্তেজনার ব্যাপার ঘটেছে। পুলিস গ্রামশেষের সেই অন্ত্যজ এলাকায় তার সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু ওই চরিত্রের কলঙ্কই শেষ পর্যন্ত তাকে রক্ষা করেছে। পুলিস জেনেছে সেখানে গৌরী নামে একটা মেয়ের খপ্পরে পড়েছে লোকটা। পুলিসের জেরার জবাবে সেই মেয়েটাই নাকি মুখঝামটা দিয়ে বলেছে, ঘর বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসবে না তো কি—সমাজে ফিরে গেলে ওকে জ্যান্ত পুঁতবে না?

এ-ব্যাপারে পুলিসের কান তৈরিই ছিল। তাছাড়া শংকর এত বোকা নয় যে শত্রুখেকো হালদার কে হতে পারে তার আভাস দেবে। নিজের গায়ের চামড়া বাঁচানোর তাড়নায় ওই জেরার জবাবে সে আকাশ থেকে পড়া মুখখানা করেছে।

উত্তেজনার ব্যাপারটা তার পরে। শংকরের সত্যি আর ঘরে ফেরার নাম নেই। ওদের সমাজের লোকেরা ক্রুদ্ধ। একে তো নিচু শ্রেণীর, তার ওপর ওখানকার মেয়ে খারাপ ছাড়া আর কি? কিন্তু শঙ্করের কানে তুলো পিঠে কুলো। ও তখন সত্যিই গৌরীর প্রেমে হাবুডুবু। সমাজের মুরুব্বিরা তাকে একঘরে করল। কিন্তু শংকর ঘরে বা সমাজে ফিরতে চাইলে তো সমস্যা। না ফিরলে আর সমস্যা কি।

বাহারীতে বংশীর পদার্পণ ঘটল আরো এক বছর বাদে। ডান পায়ের সামনের খানিকটা নেই। ফলে সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটে। নইলে পেটানো মজবুত স্বাস্থ্য। মাথায় এখন ঝাঁকড়া চুল। ওকে দেখে সকলে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করছে। বেফাঁস কিছু জিজ্ঞেস করবে এত সাহস কারো হয়নি। বংশী যে কৈফিয়ত দিয়েছে তাই শুনে গেছে। কলকাতায় গঙ্গার ধারের কলে কাজ করত। দুর্ঘটনায় পা কাটা যেতে চলে এসেছে। দা-ঠাকুরের দয়ায় এখন আবার ক্ষেতির কাজে লেগে যাবে।

দাদাঠাকুরের নামে মুখ আরো সেলাই সকলের। ওই মানুষের তো কোনো অন্যায়ের সঙ্গে আপোস নেই। মনে কারো কারো খটকা লাগলেও মুখে আর কেউ তা প্রকাশ করল না।

...সোমেশ্বর প্রথমেই বংশীকে আবার ঠাকুরঘরে এনে দরজা বন্ধ করেছেন।—মায়ের সামনে যা বলে গেছলি আবার বল।

মায়ের বিগ্রহের সামনে বংশী উপুড় হয়ে পড়েছে। চোখের জলে ভেসেছে। তারপর ওই ঠাকুরঘরেই সোমেশ্বরের দু'পা আঁকড়ে ধরেছে।

কিন্তু ওই বংশীকে আবার ক্ষিপ্ত হতে দেখা গেছে জ্ঞাতিভাই শংকরের ওপরে। অমন একটা খারাপ মেয়েছেলে নিয়ে আছে। জাতের মুখে চুনকালি দিয়েছে। দূরের হাটে একদিন শংকরকে সামনাসামনি পেয়েছিল। সম্ভব হলে বংশী ওর মাথাটা চিবিয়ে খায়। রাগে জ্বলতে জ্বলতে সোমেশ্বরকেই এসে বলেছিল, দা-ঠাকুরের কাছে পিতিজ্ঞে করলাম তাই বেঁচে গেল, তা না হলে একটা খুন করা থেকে ওকে কেউ রুখতে পারত না। জ্ঞাতিভাইকে নাকি সে-কথা বলেও এসেছে।

আরো বছর দুই বাদে ওই শংকরকে নিয়ে বেশ একটু মজাদার বিপাকে পড়তে হয়েছিল সোমেশ্বরকে। ছোঁড়াটার খবরও রাখতেন না। মোট তিন বছরের মধ্যে ও

দু'ছেলের বাপ হয়েছে জানতেন না বা শ্রমিক বস্তি এলাকার কাছাকাছি এক কামারশালায় কাজ করে সে-খবরও জানা ছিল না।

...সেই এক সকালে বস্তিতে গিয়ে মেজাজ খিঁচড়ে গেছল সোমেশ্বরের। মেয়েগুলো তারস্বরে নালিশ জানাচ্ছিল, মদ খেয়ে তাদের মরদগুলো কত মেরেছে ওদের। মরদেরাও রাগে গোঁ গোঁ করছিল। বিরক্ত হয়ে শ্লেষের সুরেই সোমেশ্বর বলে উঠেছিলেন, আ-হা, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়—স্বামী-স্ত্রী তো নয়, সাক্ষাৎ যেন শংকর গৌরী বাস কচ্ছিস একসঙ্গে।

শুনে ওরা বিমূঢ় খানিক। দাদাঠাকুরের এই শ্লেষ মাথায় ঢুকল না। ভেবেচিন্তে মরদগুলে অন্য একটা অর্থ করে নিল। শংকর হালদার বিয়ে-থা না করে একটা মেয়েমানুষ নিয়ে আছে যার নাম গৌরী। দাদাঠাকুর নিশ্চয় বলেছেন, তোদের বউগুলোও কি বিয়ে-করা বউ নয় যে অমন মারধর করিস!

কামারশালায় গিয়ে দাদাঠাকুরের ওই টিপ্পনী সেই দিনই শংকরের কানে তুলে দিল কেউ কেউ।

শুনে শংকর গুম একেবারে। দাঠাকুর অমন মর্মান্তিক কথা বলতে পারেন ভাবা যায় না। তাছাড়া গৌরীর গায়ে হাত তোলা দূরে থাক, কোনদিন গালমন্দ পর্যন্ত করেনি। গৌরী-অন্ত প্রাণ ওর। দ্বিতীয় ছেলেটা দু'মাস হল হয়েছে, হবার পরেই গৌরী ব্যামোয় পড়েছে। এই জন্যে দুর্ভাবনার অন্ত নেই শংকরের। একটু চিকিৎসাও হচ্ছে না' অগতির গতি যে দাদাঠাকুরের কাছে গিয়ে হত্যা দিয়ে পড়বে ভেবেছিল, তাঁরই কিনা এমন কথা!

শংকর তক্কে-তক্কে ছিল। পরের সপ্তাহে ছুটির দিনে ওই বস্তি এলাকাতেই ধরল তাঁকে। অভিমানে আর কিছুটা বা রাগে থমথমে মুখ। আগে কর্তব্য করল অর্থাৎ নত হয়ে পেন্নাম জানালো। তারপরেই কান্না-ভেজা গলায় বলে উঠল, দুটি অন্নের জন্যি সকাল-সন্ধ্যা আমি কামারশালে কাজ করি, আর গৌরীরও ঘরেব কাজের অন্ত নেই—তাই বিয়ে করি-করি করেও এখন পর্যন্ত করা হয়ে ওঠেনি—তা বলে কি আমরা পাপের জীবন যাপন করছি, না গৌরীর গায়ে আমি কখনো হাত তুলেছি যে আপনি ওদের ও কথা শুনিয়ে এলেন!

সোমেশ্বর হতভম্ব খানিক।—আমি কাদের কি কথা শুনিয়ে এলাম?

—আপনি ওই বস্তির ঘরে গিয়ে ওদের 'বিদ্যুপ' করে বলে এলেন ওরা 'স্বামী-স্ত্রী' তো নয়, সাক্ষাৎ শংকর-গৌরী বাস কচ্ছে একসঙ্গে!

শোনার পরে এবং বোঝার পরেও সোমেশ্বর হাঁ খানিক। হাসলে বিপদ, কি বলবেন ভেবে পেলেন না। ধরা গলায় শংকর আবার বলল, আপনার দায়ার শরীল দা-ঠাকুর, কিন্তু আপনি আমাদের এত ঘেন্না করেন জানতাম না। ছেলেটা হবার পর থেকেই গৌরী বিছানা নিল, এখন উঠতেও পারে না—এক কোঁটা ওষুধ পড়ল না—আমি ভাবছিলাম, দা-ঠাকুরের পায়ে গিয়ে পড়ি, যদি গৌরীর একটু ওষুধ জোটে—আপনিও এত নিষ্ঠুর দা-ঠাকুর!

সোমেশ্বর গম্ভীর।—আমি ওদের ও-কথা বলিনি।

শুনে কালো মুখে আশার ছোঁয়া।—ওরা তাহলে মিথ্যাবাদী ঠাকুর?

—তা নয়। ওরা বুঝতে ভুল করেছে। চল, গৌরীকে দেখে আসি।

শংকরের অভিমান সঙ্গে সঙ্গে জল। দাদাঠাকুরকে নিয়ে বাতাস সাঁতরে চলল।

কিন্তু রোগিণী দেখে সোমেশ্বরের চক্ষু স্থির। গায়ের আধময়লা রং সাদাটে হয়ে এসেছে। মুখখানা সুশ্রী। দেহ শয্যায় মিশে আছে। কে ঘরে এলেন শোনার সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে ফেলল। কান্না আর সহজে থামে না। যা শুনলেন আর দেখলেন, সূতিকা রোগ অনেক দূর গড়িয়েছে। কোনো কোনো রোগীকে দেখা মাত্র যা মনে হয় তেমনি মনে হল। আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। ওদিকে শংকর দুঃখ করছে, কি ভালো স্বাস্থ্য ছিল গৌরীর আর কি হয়ে গেল দা-ঠাকুর!

সোমেশ্বর ধমকে উঠলেন, কি হয়ে গেল দেখেও এতদিন কি করছিলি— আগে খবর দিসনি কেন?

শংকরের অপরাধী মুখ। দাদাঠাকুরের এত দয়া জেনেও সত্যিই তো সাহস করে কাছে আসেনি।

চিকিৎসা চলল। ওর ব্যাপার নিয়ে সোমেশ্বর বাহারীর অতিবৃদ্ধ কবরেজ মশাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। কিছু যে হবার নয় তা-ও বুঝছেন। আর বুঝছিল বোধহয় গৌরীও। মরদের মারফৎ তার বায়না শুনে সোমেশ্বর বিপাকেই পড়ে গেলেন। শুধু গৌরী কেন, ওই বায়না শংকরেরও, ওদের বিয়েটা হয়ে ওঠেনি, কিন্তু এখন সেটা দিয়ে দিতে হবে। বিয়েটা হয়ে গেলে গৌরীর নাকি মরেও শান্তি। আর শংকরের আশা, বিয়েটা হয়ে গেলে গৌরী বেঁচেও যেতে পারে।

সোমেশ্বর শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন।—ঠিক আছে, দেব তোদের বিয়ে।

দিলেন। শংকরের ছোট ছেলেটা মাত্র কয়েক মাসের। দু'বছরের বড় ছেলেটা পড়শিনীদের কারো কোলে বসে বাপ-মায়ের বিয়ে দেখল।

এই বিয়ে নিয়েই গ্রামে সোরগোল। পণ্ডিতদের উত্তেজনা। কিন্তু মানুষটা সোমেশ্বর চাটুজ্জে বলেই সামাজিক শাস্তির বিধান নিয়ে কেউ ঘোঁট পাকালো না। ওদিকে বংশীর তিরিক্ষি মেজাজ। দাদাঠাকুরকে নিয়ে কটু কথা হচ্ছে দেখে পারলে ও শংকরের মাথাটা ছিঁড়ে আনে।

কিন্তু দু'মাস না যেতে আবার হুলুস্থুলু কাণ্ড। গৌরী মারা গেল। ওর সমাজের মানুষদের শংকর দেহ স্পর্শ করতে দেবে না গোঁ ধরে বসল। কারণ, দাদাঠাকুরের মতো মানুষ নিজে বিয়ে দিয়ে ওদের জাতে তুলে দিলেন, শুচিসুদ্ধ করে দিলেন—অচ্ছুতরা এখন আর তার বউকে স্পর্শ করবে কেন? কিন্তু নিজের জাতের মানুষরাও কেউ শব তুলতে এলো না—ওই দাদাঠাকুরই তখন সমস্যার সমাধান করে দিলেন। বললেন, ঠিক আছে, আমি শব তুলছি তোদের সঙ্গে, তাহলে যে-কেউ ধরতে ছুঁতে পারবে।

এই নিয়েও বাহারীতে বড়রকমের সোরগোল উঠেছিল। অনাচারের রব তুলেছিলেন বৃদ্ধ পণ্ডিতরা। সোমেশ্বর তাঁদের কাছে গিয়ে মৃতদেহের সৎকার সম্বন্ধে সবিনয়ে শাস্ত্রের বিধি ব্যাখ্যা শুনতে চেয়েছিলেন।

এই ঘটনার মাস কয়েক বাদে সোমেশ্বর নিজের বাড়িতে শিউলির সঙ্গে বলাই কুশারির বিয়ে দিয়েছিলেন। বাড়ি থেকে তিন-তিনটে দিন পালিয়ে থাকার দরুন শিউলির ওই বিয়েও সংস্কারাভিমানীরা বরদাস্ত করতে চাননি।

...গৌরী মারা যাবার পর বছর দুই আড়াই শংকরের মন-মরা বিবাগী দশা। তার

ওপর বাচ্চা দুটোকে সামলানোর দায়। রোজগারই বা করে কখন? শোক ভুলে এরপর আবার একটা বিয়ে করে বসল সে। শোকের কালে শংকরের বাঁশী বাজানো আরো বেড়ে গেছলো। যারা শংকরকে দেখতে পারে না তাদের রটনা ওই বাঁশী শুনিয়ে মেয়েটার মন মজানো হয়েছে। শ্রমিক বস্তি এলাকার এই মেয়েটা.অত নীচু ঘরের না হলেও শংকরের সমাজের লোকেরা আর তাকে পাত্তা দিতে রাজি নয়। এদিকে মনের মতো আবার নতুন বউ পেয়ে শংকরও আবার নিজের সংসার নিয়ে মশগুল।

...বরাত মন্দই বটে লোকটার। সাত-আট বছর ঘর করার পর দু'বছর আগে এই বউটাও ধুপ করে মরে গেল। আগের দুই আর পরের দুই নিয়ে শংকর তখন চার ছেলের বাপ। কিন্তু ওদের দেখবে কি, শোকে নিজেই দিশেহারা। সকলকে নিয়ে আধপেটে খেয়েও সহজে শোক ভুলতে পারেনি। কিন্তু পেটের আগুন শেষ পর্যন্ত শোকের আগুন নিভিয়েছে। এখন রোজগারের ধান্দায় পাগল। ভরসা দাদাঠাকুর। তাঁর পিছনেই ঘুরছে। মাথা খাটিয়ে প্রথম বউয়ের নাম করেছে, বলেছে উপোসী ছেলেদের দিকে তাকালে মনে হয় গৌরীর আত্মা ওকে গাল-মন্দ করছে!

অন্য পথ না দেখে সোমেশ্বব ওকে বংশীর কাছে যেতে বলেছিলেন। তাঁর জমি-জমা চাষ আবাদ করা বা দেখাশোনার সমস্ত দায়িত্ব এখন বংশীর ওপর। অন্য চাষীরা তার আজ্ঞাবহ। বংশীকে পাপের পথ থেকে ফেরাতে পেরে সোমেশ্বরের থেকে বেশি খুশি আর কেউ নয়। লোকটার নিষ্ঠা বা সততাব তুলনা নেই।

প্রকাশ্যে সোর না তুললেও ওই বংশী লোকটা আসলে কে, স্থানীয় বয়স্ক-লোকদের অন্তত জানতে বুঝতে বাকি নেই। পাশেব জমির খিটখিটে মালিক হরিহর ঘোষ ওই বংশীর জন্যে বলতে গেলে হিংসেই করেন সোমেশ্বরকে। অনেক সময় ঠেস দিয়ে বলেন, তোমার জমিতে সোনা ফলবে না কেন।—চোর-ডাকাতের হাতে ভার দিয়েছ—তার দাপটে অনা চাষীরা মাথা গুঁজে কাজ করছে। সোমেশ্বর হাসেন। জবাব দেন না। ঘরের মজলিশে বসে আগে শুভার্থীজনেরাও বলেছেন, চোর-ডাকাত পুষছ, এটা ভাল করছ না কিন্তু। হাসি মুখে একদিন তাঁদেরও মুখ বন্ধ কবেছিলেন সোমেশ্বর। বলেছিলেন:

'ক্ষিপ্রং করোতি ধনিনং, দাতারং কৃপণং তথা।
সাম্যং প্রকুরুতে চৈব, তচ্চৌর্য্যং প্রণমাম্যহম।।'

শ্লোকের পর দু'হাত কপালে।—যা মানুষকে দ্রুত ধনী করে এবং কৃপণকে দাতা করে আবার সাম্য আনে—সেই চুরিকে প্রণাম করি!

সোমেশ্বর ভুল যে করেন নি শুভার্থীজনেরা এখন তা নিজেরাই দেখে চলেছেন। ...কিন্তু তিনি পাঠিয়েছেন শুনেও ওই বংশী যে তার জ্ঞাতিভাই শংকরকে এ-ভাবে হুমকি দিয়ে ফেরাবে ভাবেন নি। রাগের বদলে সোমেশ্বরের ঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেখা। বংশী তার জ্ঞাতিভাইকে বলেছে, ফের দা-ঠাকুরের নাম নিলে বা দা-ঠাকুরকে বিরক্ত করলে ঘরে আগুন লাগিয়ে সবসুদ্ধ পুড়িয়ে মারবে।

বংশীর অত রাগেব কারণ নিজের স্বার্থে নয় সোমেশ্বর সেটা ভালই জানেন। ওর বিচার বিবেচনায় ওই জ্ঞাতিভাই শংকর দুশ্চরিত্র পাপী ছাড়া আর কিছু নয়।

তাই ওর সংস্রব থেকে দাদাঠাকুরকে আগলে রাখার তাড়নায় ওর এত রাগ।

পা চালিয়ে চলেছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে থামতেই হচ্ছে। বিপরীত দিক থেকে যারা আসছে তারা সকলেই চেনা জানা। তাদের প্রণামের জবাবে কুশল প্রশ্নের দায়ে মাঝে মাঝে থামতে হচ্ছে।

জি. টি রোডের বাঁকের মুখে খবরের কাগজের স্টল। কলকাতার প্রথম ট্রেনে কাগজ আসে। এতক্ষণে এসে থাকতে পারে। রোজ নিজের কাগজ নিজেই সংগ্রহ করে নিয়ে যান তিনি। ওদের দিয়ে যাবার আশায় থাকলে দেরি হয়।

কাগজ পেলেন। যে-খবরটা দু'দিন ধরে পাওয়া যেতে পারে ভাবছিলেন, আর প্রথম পাতাতেই সেই খবর। সোমেশ্বরের দুই ঠোঁটের ফাঁকে হাসি স্পষ্ট হল। দেখলেন। সেখানে দাঁড়িয়েই পড়ে নিলেন।

বাড়ি। বাইরে থেকে এলে পা না ধুয়ে ঘরে ঢোকেন না। জল মজুতই থাকে। পা ধুতে ধুতে বিহারীকে বললেন, বংশীকে একবার খবর দিতে, এসে যেন দেখা করে। দোতলায় উঠে অনুচ্চ হাঁক দিলেন, কই গো, কিছু খবর শোনার ইচ্ছে আছে নাকি?

বাসন্তী ঘরের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ভাবলেন গণেশ দলুইয়ের খবর। ও-দিকের ঘর থেকে বললেন, তোমার এত দেরি দেখেই বুঝেছি হয়ে গেল।

—তা গেল। এদিকে তোমার শোনার মতোও কিছু খবর আছে।

ওদিক থেকে বাসন্তী জবাব দিলেন, একটু দেরি হবে—আসছি।

বারান্দায় মোড়ায় বসে সোমেশ্বর কাগজ পড়ায় মন দিলেন। ইদানীং কাগজ খুললেই ভিতরটা তিক্তবিরক্ত হয়ে ওঠে। আজও সারি সারি দুঃসংবাদ। শত্রুতা করে আগুন লাগিয়ে একটা বড় গুদাম ভস্ম করে ফেলা হয়েছে, তিন জায়গায় সমাজবিরোধীদের হামলা—পাঁচজন নিহত। দু'দুটো বড় ডাকাতি। চারটি নারী ধর্ষণ। তার মধ্যে দুটি মেয়ের আত্মহত্যার খবর।

এ-সব খবর পড়লে যন্ত্রণায় সোমেশ্বরের ভিতরটা কুঁকড়ে যায়। বাসন্তী এসে দাঁড়ালেন।—কি বলছিলে?

এই খবরগুলো পড়তে পড়তে সোমেশ্বর তখনো ফুঁসছিলেন, কি জন্যে ডেকেছিলেন ভুলেই গেছেন। বলে উঠলেন, কি আর বলব, লোভে স্বার্থে হিংসায় চরিত্রহীনতায় এই যুগটাই বিপন্ন—বুঝলে? মানুষ কেবল তলিয়েই যাচ্ছে।

খবরের কাগজে খুন জখমের খবর পড়লেই স্বামীর মেজাজ বিগড়োয় জানেন। কিন্তু তাঁকে ডাকা কেন না বুঝে ওই কাগজটার দিকেই তাকালেন। পরমুহূর্তে সচকিত সন্ত্রস্ত।—ও কি, ও কার ছবি?

সোমেশ্বর এবারে আত্মস্থ একটু।—তোমার ছেলের। আই-এ-এস-এর ফল বেরিয়েছে, অল ইন্ডিয়ায় তৃতীয় হয়েছে —বাঙালী ওই একজনই, তাই ফলাও করে ছবি বেরিয়েছে আর খবর বেরিয়েছে।

বলে যে খবরটা পড়ছিলেন সোমেশ্বর সেদিকে চোখ ফেরালেন। বাসন্তী পিছনে একটু ঝুঁকে দাঁড়ালেন। এবারে সম্পূর্ণ আত্মস্থ সোমেশ্বর। মুচকি হেসে কাগজটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আচ্ছা, আগে তুমিই দেখে নাও আর পড়ে নাও।

একটু লজ্জা পেয়ে বাসন্তী বললেন, আ-হা, ইচ্ছে তো করেই। তুমি পড়ো না—

তেমনি হেসে সোমেশ্বর বললেন, আমি পড়লেও তুমি অনেক বার দেখবে অনেক বার পড়বে। নাও—।

কাগজটা হাতে নিয়ে বাসন্তী আগে ছেলের ছবিটাই ভাল করে দেখে নিলেন। তারপর সেটা আবার স্বামীর কোলে ফেলে দিয়ে খুশি মুখে দ্রুত প্রস্থান করলেন।

সামান্য জলযোগ সেরে সোমেশ্বর নিচে নেমে এলেন আরো ঘণ্টাখানেক বাদে। সকালের অবসর সময়টা নানা রকমের ওষুধ-পত্র ঘাঁটাঘাটি করে কাটে। আজ একটা বই নিয়ে বসলেন।

বিহারীকে দিয়ে বংশীকে এত্তালা পাঠানো হয়েছে, আজ শংকরকে নিজেই আসতে বলে দিয়েছিলেন। দু'জনেই এলো বলে। হাতের বইএ সোমেশ্বরের অখণ্ড মনোযোগ।

দাদাঠাকুর এ-সময় বড় একটা ডাকেন না। তাই খবর পেয়ে বংশী পা চালিয়ে আসছিল। ফটকের কাছাকাছি আসতে সেখানে আর এক মূর্তির দিকে চোখ গেল। শুকনো মুখে তার জ্ঞাতিভাই শংকর দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু অমন পাপীর প্রতি বংশীর মায়াদয়ার ছিটেফোঁটাও নেই। উল্টে ভেতরটা ঝলসে উঠল। ওর জন্যেই দাদাঠাকুর ডেকে থাকতে পারেন মনে হতে ভিতরটা রাগে আরও রি-রি করে উঠল। কাছে এসে গলা না চড়িয়ে ও দাঁত কড়মড় করে বলল, তুই এখেনে কেন?

মুখ চুন করে শংকর জানান দিল, দা-ঠাকুর আসতে বলে দেছলেন...

বেশ ক্ষোভ নিয়ে বংশী গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকল। দরকার হলে দাদাঠাকুরকেও পষ্ট জানিয়ে দেবে অমন জ্ঞাতির মুখ দেখতেও সে রাজি নয়। ঘরের দরজার কাছে এসে চেষ্টা করেও গলার স্বর তেমন মোলায়েম করতে পারল না।—ভিতরে আসব দা-ঠাকুর?

জবাবে শব্দ করে চেয়ার ঠেলে ব্যস্ত মুখে সোমেশ্বর উঠে এলেন। তারপর দু'হাত জোড় করে ভক্তিনম্র মুখে বললেন, আসুন আসুন বংশীবাবু, এই সকালে আপনার পায়ের ধুলো পড়ল—বড় খুশি হলাম।

—দা-দা-দা-ঠাকুর...! আপ্যায়নে এমনই হকচকিয়ে গেল বংশী যে গলা দিয়ে আর কথা বেরোয় না। নিজের অগোচরে ঘরে ঢুকেছে।

তাড়াতাড়ি ওর সামনে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে সোমেশ্বর আবার বললেন, দয়া করে এসেছেন যখন, দাঁড়িয়ে কেন, বসুন। আপনাকে ডেকে পাঠিয়ে বড় লজ্জা পাচ্ছি...বিহারী চলে যাওয়ার পর মনে হল নিজেরই যাওয়া উচিত ছিল—অপরাধ নেবেন না।

বংশীর পায়ের নিচে মাটি দুলছে। দুই চক্ষু বিস্ফারিত। কাঁদ-কাঁদ গলায় বলে উঠল, এ আপনি কি করছেন—এ আপনি কি বলছেন দাঠাকুর—আমি কি অপরাধ করলাম?

—ছিঃ, অমন কথা বলবেন না—আপনার বিচার বিবেচনা কত বড় বুঝিয়ে দিয়ে আপনি আমার অহংকার দূর করেছেন—এদিক থেকে আপনি এখন আমার শিক্ষাগুরু—

দাদাঠাকুর! বংশী আর্তনাদ করে উঠল, আর সেই সঙ্গে কেঁদেও ফেলল প্রায়। —দোহাই দা-ঠাকুর, আর বেঁধবেন না—তার থিকে ছিচরণের ওই চটি খুলে দু'ঘা দ্যান —আর বলে দ্যান কোন পাপে, আমার এই শাস্তি!

এবারে কোমরে দু'হাত তুলে সোমেশ্বর ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। ক্রুদ্ধ গম্ভীর মুখ।—আমি বলে দেব?

এই মূর্তি দেখে আর এ-কথা শুনেও বংশী দিশেহারা।

প্রায় রুক্ষ গলায় সোমেশ্বর বলে গেলেন, শংকরকে আমি তোর কাছে পাঠালাম—তার পরেও আমার বিচার-বিবেচনার থেকে তোর বিচার-বিবেচনা বড় হল? তাকে তুই গলাধাক্কা দিয়ে তাড়ালি আর শাসালি? পেটে ক্ষুধার আগুন জ্বললে পাপও জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায় কিনা এ আমাকে তোর কাছ থেকে শিখতে হবে? আমি বাইরের মানুষ ক্ষমা করলাম, আর তুই ছোট ভাইয়ের উপোস দেখেও ক্ষমা করতে পারছিস না—তোর মতে তাহলে আমি ওকে ক্ষমা করে পাপের প্রশ্রয় দিচ্ছি?

বংশীর চোখে জল এসে গেছে। চোখ মুছতে মুছতে ও এক ঝটকায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওর পিছনে সোমেশ্বরও দাওয়ায় নেমে দাঁড়ালেন।

ফটক খুলেই বংশী শংকরের ঘাড়ে হাত দিলে। মারবে ভেবে শংকরের সমস্ত মুখ বিবর্ণ।

ঘাড় ধরে ধাক্কা দিয়ে তাকে এগিয়ে নিয়ে চলল বংশী। চিৎকার করে বলতে লাগল, চল এবার—গেলাবো তোকে—গুষ্টিসুদ্ধ এমন গেলা গেলাবো তোকে যাতে নাভিশ্বাস উঠে মরিস সব—চল, হারামজাদা—কত গিলবি চল—

সোমেশ্বর পিছনে দাঁড়িয়ে দেখছেন। শংকরকে বংশী হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছে।

সোমেশ্বেরের চোখে মুখে কাঁচা পাকা খাড়া খাড়া গোঁফের ফাঁক দিয়েও হাসি উপছে পড়ছে।

## সাত

এই বংশের একটিই ধারা। পিতৃধারা।

এই ধারার দুই প্রান্তে দু'জন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এখন। একজন সোমেশ্বর চাটুজ্জে। আব একজন তাঁর ছেলে ধ্রুব চ্যাটার্জি।

সোমেশ্বর তাঁর বাবাকে দেখেছেন, ঠাকুরদাকেও দেখেছেন। কাছে থাকলেও বাবাকে দেখেছেন দূর থেকে। আর ঠাকুরদাকে কাছ থেকে। ঠাকুরদাকে নিয়ে তাঁর মনে ভক্তি-শ্রদ্ধার বান কখনো ডাকেনি। সেটা পুরোপুরি বাপের দিকে গেছে। খুব ছেলেবেলার কথাও মনে আছে সোমেশ্বরের। ঠাকুরদাকে ভারী আপনার আর ভারী কাছের মানুষ মনে হত তাঁর।

ধ্রুব চ্যাটার্জি তার ঠাকুরদাকে দেখেইনি। কিন্তু বাবা-মায়ের আর বয়স্ক প্রতিবেশীর মুখে ঠাকুরদার কথা এত শুনেছে যে তাঁকে প্রায় অলৌকিক গোছের মানুষ ভাবে। বড় হবার পরেও তাঁর সম্পর্কে ভক্তি-শ্রদ্ধার অভাব হয়নি। কিন্তু ওই দাদার কথা যখন চিন্তা করে, তখন একটা কালের ছবিও চোখে ভাসে। ভাবে, অমন দাদু আর শাস্ত্র নিয়ে তাঁর সেই সব তর্কযুদ্ধ সে-কালেই সম্ভব। এ-কালে নয়। তাঁকে নিয়ে গর্ব করা চলে। তাঁর ধার এ-কালে অচল।

কিন্তু বাবাকে সে খুব কাছের থেকে দেখেছে। দেখছে। এত কাছ থেকে যে বাবার কিছু জানতে বুঝতে বাকি আছে ভাবে না। তাই এ-কালের চোখ দিয়ে দেখা বাবার সেকালের আচার-আচরণ সম্পর্কে খোলাখুলি নিজের মনোভাব ব্যক্ত করতে দ্বিধা নেই।

সোমেশ্বরের প্রথম সন্তান মেয়ে। মায়ের সঙ্গে মিলিয়ে তিনিই নাম রেখেছেন অবন্তী। এই মেয়ের স্বভাবও অনেকটা মায়ের মতোই। তার পর ছেলে। সোমেশ্বর নাম রাখলেন, ধ্রুব। হেসে স্ত্রীকে বলেছিলেন, ঈশ্বর তো এই বংশে পর পর অনেক হল, এবারে একজন ভক্ত হোক।

বলেছিলেন বটে, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে লক্ষ্য করে আসছেন, তার মধ্যে বাধ্যতা থেকে গোঁয়ার্তুমির ভাগ বেশি, মেনে নেওয়া থেকে প্রতিবাদ বেশি, তর্ক বেশি। অবশ্য এজন্যে নিজেকেই অনেকটা দায়ী করেন তিনি, আর মনে মনে হাসেন। কখনো ভাবেন, নাম যাই বাখুন, ওর ঠাকুরদার সঙ্গেই হয়তো চরিত্রের প্রচ্ছন্ন মিল আছে।

ছেলের তিন বছব পরে আবার মেয়ে। সোমেশ্বর নাম রাখলেন হৈমন্তী। এই মেয়ে মা বা দিদির মত নয়। বাপের মতো তো নয়ই। বরং ভাইয়ের প্রভাবই একটু বেশি। যুগের হাওয়া এই দু'জনের গায়েই বেশি লেগেছে। তাও খুব স্বাভাবিকই ভাবেন সোমেশ্বর। কিন্তু দুই মেয়েই মায়ের শাসন আর শিক্ষায় সংযত। ছেলে বাপের মুখে মুখে তর্ক করলে বাসন্তী কিছু বলেন না। অবশ্যই এ-তর্ক অসম্মানের বা অবাধ্যতার তর্ক কিছু নয়। ছেলের বেলায় বাপটি তাকে নিজস্ব প্রবণতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চান জানেন। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে অনেক কথাও হয়েছে। কিন্তু মেয়েদের কারো বাপের কোনো মতামতে প্রতিবাদের আভাস পেলেও বাসন্তী সেটা বরদাস্ত করেন না। অবুর বেলায় শাসন দরকারও হয় না, সে বরাবরই বাধ্য, শান্ত মেয়ে। শাসন মাঝে-সাঝে করেন হিমুকে। কিন্তু তাঁর শাসনে মার-ধর ছেড়ে বকাঝকাও নেই। ঠাণ্ডা কঠিন গলায় হিমু বলে ডাক দিলেই হল। হিমু ছোট বেলা থেকেই জেনেছে, দাদার কথা আলাদা, ওরা বাবার কথার ওপর কোনো কথা বললে মায়ের শাসন অবধারিত। কিন্তু বোনের হয়ে দাদা অনেক সময় তর্ক করতে এগোয়। মায়েব তখন সাদাসাপটা কথা, তোর বাবা তোকে দিগগজ বানাচ্ছেন তার কাছে যা—আমার বিচার বিবেচনা নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।

বংশের যে ধারাটি সোমেশ্বর গোড়াতেই বদলে দিয়েছেন সেটা বাপ-ছেলের মধ্যে প্রায়-দুর্লঙ্ঘ্য বিচ্ছিন্নতার ধারা। বাবা তাঁর চোখে পুরুষ প্রতীক, নারায়ণ প্রতীক। একেবারে ছেলেবেলা থেকেই বাপের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার সীমা-পরিসীমা ছিল না। কিন্তু দু'জনের মাঝের ফারাক থেকেই গেছল। ভিতর বার লালায়িত হয়ে উঠলেও বাপের বুকের স্পর্শ কেমন সোমেশ্বরের জানা নেই। জ্ঞান বয়স থেকে বাবা কখনো তাঁকে তুমি ছাড়া তুই বলেন নি। আর ছেলেদের এ বংশে আপনি ছেড়ে বাবাকে তুমি বলার রীতি তো ছিলই না। সোমেশ্বর ওই ফারাকের বীজটুকু উপড়ে ফেলে দিয়েছেন। ছেলেকে বুকে পিঠে নিয়ে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করতেন। ছেলের আজেবাজে কথাও কান পেতে শোনার মনোযোগ দেখাতেন। ছেলে এতটুকু কিছু বাহাদুরির কাজ করে ফেললে মুগ্ধ হবার ভান করতেন। আবার অন্যায় করলেও ছেলের বেলায় শাসনের রীতি অন্যরকম। পুঁথিপত্র খুলে বলতেন, দৃষ্টান্ত ফেঁদে বসে বোঝাতে চেষ্টা করতেন, একটা ছোট অন্যায় থেকে বিরাট অন্যায়ের গাছ কি করে হয়।

যেতে চাইলেন। ছেলে কলকাতায় বেশ ভালো চাকরি করে। আত্মীয়ের মুখে বংশমর্যাদার কথা শুনেই তাঁদের আগ্রহ। দেখে শুনে সোমেশ্বরের পছন্দ হল।

...বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হতেই ধ্রুব দিদিকে খুব কাঁদতে দেখেছিল। তার ধারণা, বিয়ে হলে শ্বশুরবাড়ি চলে যেতে হবে এই দুঃখেই দিদি কাঁদে। দিদি আর এখানে থাকবে না ভাবলে ওর নিজেরও কম মন খারাপ হত নাকি!

কিন্তু দিদির কি কথায় মা একদিন বকে উঠতে ধ্রুবর মনে হল, ঠিক শ্বশুরবাড়ি চলে যাবার দুঃখেই দিদি অত কাঁদছে না। অন্য ব্যাপারও কিছু আছে। তা না হলে মা বলে উঠবে কেন, তোর বাবা যা ঠিক করেছেন তাঁর ওপর আবার কথা? ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা দিয়ে দুটো হাতের বদলে দুটো ডানা গজাবে? নিজের ভালো আমাদের থেকে বেশি বুঝিস? আমার ম্যাট্রিক পাসের কিছু আছে—সব ধুয়ে মুছে গেছে না!

ধ্রুবর বয়স তখন তেরো। ক্লাসের ফার্স্ট বয় বরাবর। দিদির কান্না বা আপত্তির কারণ একেবারে না বোঝার কথা নয়। দিদি মায়ের মতো ম্যাট্রিক পাস দেবার আগে বিয়ে করতে চায় না। আর বাবা-মা তার আগেই বিয়ে দিযে তাকে বিদেয় করতে চায়। ধ্রুবর যুক্তি দিদির পক্ষেই গেল। তাকে মায়ের আড়ালে পেয়ে প্রস্তাব দিল, মাকে বলে কি হবে, বাবা বিয়ে ঠিক করেছে বাবাকে গিয়ে বলো ম্যাট্রিক পাসের আগে বিয়ে হবে না।

অবন্তীর মন-মেজাজ বিগড়ে ছিল। মা মুখে যা-ই বলুক-ম্যাট্রিক পাস তো বটে। পাসের সব ধুয়ে মুছে গেছে বললেও এই বাহারীতে বিদুষী বলে মায়ের নাম কম নাকি। মা কলকাতার মেয়ে, বাহারীতে ম্যাট্রিক পাস মেয়ে আর একটিও নেই। তাই মনে খুব সাধ ছিল, সে-ই প্রথম পাস করা মেয়ে হবে। ভাইয়ের কথায় সহানুভূতির আভাস পেয়েও তাই রেগেই গেল। বলল, ভাগ এখান থেকে—মা-ই বলতে পারল না আর বাবার সামনে দাঁড়িয়ে আমি নিজের বিয়ের কথা বলতে যাব!

অতএব ধ্রুবই বাবার কাছে সরাসরি হাজির। মা-ও উপস্থিত সেখানে।—আচ্ছা বাবা, ছেলেদের পাস-টাস করে বেরুনোর পরে বিয়ে হয়, মেয়েদের বেলায় তা হয় না কেন?

বাসন্তী বলে উঠলেন, তোর এখনই এ-সব খোঁজে দরকার কি?

সোমেশ্বর চোখের ইশারায় স্ত্রীকে থামতে বললেন। ছেলের কোনো কৌতূহলেই হেলাফেলার ভাব দেখান না। জবাব দিলেন, মেয়েরা যে তখন ছোট থাকে, আর বিয়ে করলে ছেলেদের দায়িত্ব নিতে হয়, তাই পাসটাস করে রোজগারের ব্যবস্থা হলে তবে বিয়ে করে!

—মেয়েরাও বড় হলে বিয়ে হয় না কেন?

—হয়।...তবে মেয়েদের বিয়ে তো বেশির ভাগ তার বাপ-মায়েরা দেয় না মেয়েরা বড় হতে হতে বাপ-মা বুড়ো হয়ে যদি মরেই যায়? তখন মুশকিল হবে না?

যুক্তি অগ্রাহ্য করা গেল না। কিন্তু বাপ-মা মরে যাওয়ার সম্ভাবনার কথাটা ধ্রুবর আদৌ পছন্দ হল না। বাবা-মা না থাকা কি ব্যাপার ভাবতেও ভালো লাগে না। ছেলে চলে যেতে বাসন্তী হেসেই বলেছিলেন, তুমি তোমার বাবার সঙ্গে এই সব আলোচনা করছ ভাবতে কেমন লাগে?

সোমেশ্বরও হেসেই মাথা নেড়েছেন। অর্থাৎ ভাবাই যায় না।

বেশ ঘটা করেই অবন্তীর বিয়ে হয়ে গেল।

ধ্রুব আর হৈমন্তী স্কুলে পড়ছে। এখানে ধারেকাছে মেয়েদের স্কুল নেই। ছেলেদের স্কুলেই মেয়েদের পড়ার রেওয়াজ এসেছে। তারা শিক্ষকের সঙ্গে ক্লাসে আসে, আবার শিক্ষকের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। অনেকের ছোট বড় মেয়েরাই ছেলে স্কুলে পড়ছে এখন। হৈমন্তী বায়না ধরেছিল সে-ও পড়বে। সোমেশ্বর আপত্তি করেননি। কাছাকাছির মধ্যে আর একটি মেয়েও স্কুলে পড়বে ঠিক হতে সোমেশ্বর যাতায়াতের বাস-ভাড়া সাইকেল-রিকশ ঠিক করে দিলেন। ধ্রুব বাবার বহুকালের পুরনো সাইকেল সেই কবেই ঠিক করে নিয়েছে। বাড়ির ফটক খোলা থাকলে সে সাইকেল ছেড়ে উঠোনও মাড়ায় না।

অবন্তীর বিয়ের বছর তিনেক বাদে ধ্রুব হায়ার সেকেন্ডারি পাস করল। ডিভিশন্যাল স্কলারশিপ না পেলেও ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেল। সংস্কৃত, ইংরেজি, বাংলা তিনটেই বাবার কাছে পড়ত। সংস্কৃততে তো কথাই নেই, ইংরেজিতেও দস্তুর মতো ভালো নম্বর পেয়েছে। সে তুলনায় বাংলা সামান্য খারাপ হয়েছে। ভাবনা, বি. এ. পড়বে কি নিয়ে। না, সংস্কৃতে অনার্স পড়ার ইচ্ছে তার নেই। এখন তার নিজস্বতা আরো প্রখর। বাবার রাস্তায় চলতে চায় না। সংস্কৃততে হাজার ভালো করলেও লোকে বলবে, বাপের ছেলে, হবে না কেন! তাছাড়া সংস্কৃত পাসের ভবিষ্যৎ ও উজ্জ্বল ভাবে না।

ছেলের নিজের বিকাশের পথে কোথাও ভুল কিছু হয়েছে কিনা সোমেশ্বর ঠিক বুঝে ওঠেন না। বাবার থেকে ওর একটা স্বতন্ত্র পথে চলার ঝোঁক লক্ষ্য করেছেন। মতের বা ভাবনার অমিলটাও অস্পষ্ট নয়। সময়কালে পৈতে দিয়েছিলেন। এ বংশের ছেলে নিয়মিত গায়ত্রী জপ করবে না বা সন্ধ্যা আহ্নিক কববে না, ভাবা যায় না। কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেবার আগে অনায়াসে ও সে সব ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। মা রাগ করতে খুব সহজেই বলেছে, বাবার মতো পাপ পুণ্য স্বর্গ নরকে আমার বিশ্বাস-টিশ্বাস নেই মা—আমার সময় নষ্ট মনে হয়।

সোমেশ্বর রাগ না করে বলেছেন, ও-সবে বিশ্বাস না থাক, কিন্তু গায়ত্রীর মর্মও বুঝতে পারলি না?

—তুমি তো কত লোককে বুঝিয়েছ, কত জনকে কত শাস্ত্রীয় উপদেশ দিয়েছ —কারো মনে আলো ঢুকেছে? কেবল যখন ভয় পায় তখন কাঁপে আর জপ করে, আর শান্তি-স্বস্ত্যয়নের জন্য তোমার কাছে ছোটে। আবার স্বার্থে ঘা পড়লে তোমার ওপরেই এসে চড়াও হয়।

শুধু এ ব্যাপারে নয়, বাবার স্বভাবগত আরো কিছু আচরণের সঙ্গে ছেলের মানসিক আপোস হত না। যা-ই হোক, বাবার সমস্ত আচরণের একটা হদিস সে পেয়েছিল হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার কিছু আগে। রচনা লেখার ব্যাপারে 'অ্যামবিশন' প্রসঙ্গে আলোচনা উঠতেই বাবা সাগ্রহে পুরনো বইপত্র ঘেঁটে তাঁর কলেজ ম্যাগাজিনে ছাপা সেই লেখাটা বার করেছিলেন। যে রচনার প্রথমেই তিনি লিখেছিলেন, 'আই ওয়ান্ট টু বি এ সিম্পল অনারেবল ম্যান'। পড়ে মুগ্ধ হবার মতোই মনে হয়েছিল ধ্রুবর। কিন্তু তারই মধ্যে একটু বেশি আদর্শপ্রবণতা চোখে পড়েছিল। পরে কলেজে পড়তেও ধ্রুবর অনেক সময় মনে হত, সংস্কৃত কেন, ইংরেজি পড়লেও বাবা হয়তো কারো পিছনে পড়ে থাকতেন না। কিন্তু পাণ্ডিত্য আর আদর্শ এক জিনিস নয়। এক জিনিস নয় আদর্শ আর বাস্তবও। ওই

রচনা পড়ার পর থেকেই ধ্রুবর ধারণা, সক্কলের কাছে 'সিম্পল অনারেবল ম্যান' হবার জন্যই বাবার এই আচরণ, এভাবে জীবন-যাপন। কিন্তু তাতেও বাস্তবের তফাৎ তার চোখে পড়ত।

...বাবা বারি ধান নেন না, কৃষকরা ধন্য ধন্য করে। বংশী তো বলতে গেলে পূজোই করে বাবাকে। হরি কাকার থেকে বাবাকে তারা অনেক বড় ভাবে। কিন্তু এই চাষের ব্যাপারেই অন্য দিকে বাবার কড়াক্রান্তি হিসেব। কত সার, কত টাকার ওষুধ-পত্র দেওয়া হল, সব চাষীদের ভাগ থেকে সমান কেটে নেওয়া হয়। কেউ ওদের অসুবিধেয় পড়ে গেলে বাবা উদার হয়ে সাহায্য করেন বটে, কিন্তু ধ্রুব লক্ষ্য করেছে খেটে হোক বা অন্য যে-ভাবে হোক ওরা ঠিক সেটা পুষিয়ে দেয়। মাঝখান থেকে বাবার সুনাম হয়।

এ ছাড়াও টাকার টান বাবার আছেই ভাবে। অন্যরা বোকার মতো সেটা ফাঁস করে। বাবার বেলায় সেটা উল্টো হয়। গাঁয়ের মানুষ বেশির ভাগ আকাট মুখখু। যারা মুখখু নয় তারাও সংস্কারান্ধ। বাবা চিকিৎসা করেন। কাউকে হোমিওপ্যাথির ফোঁটা কাউকে আয়ুর্বেদের টোটকা-টাটকি। দু' আনা চার আনা আট আনা করে তারা যে যেমন পারে দেয়। আর বাবাকেও অম্লানবদনে তা হাত পেতে নিতে দেখে। এই দেওয়া-নেওয়াটা এমন ভাবে হয়, যেন যে দিতে পারল সে-ই কৃতার্থ হল। অবশ্য যে দিতে পারে না বা যে দিতে পারে কারো কাছ থেকেই বাবা কিছু চান না। কিন্তু এমন একটা ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেছে যে মানুষগুলো যেটুকু পারে দিয়ে কৃতার্থ হতেই চায়, আর বাবা নিয়ে তাদের কৃতার্থ করেন। কিন্তু আসল যে বিদ্যা অর্থাৎ চিকিৎসা তাতে বাবার কতখানি অধিকার আছে, তাইতেই ধ্রুবর সংশয়। বংশের নাম আছে বলে বিপাকে পড়লে লোকে বাবার কাছেই আগে ছুটে আসে। বাবা অভয় দেন, তাদের অনুরোধ মতো শান্তিস্বস্ত্যয়ন করেন। তখনো তারা যা দেয় বাবার হাত পেতে নিতে একটুও দ্বিধা নেই। তাছাড়া বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন আর বারো মাসের তের পার্বণে বাবার কাছে গ্রামের লোকে আগে ছুটে আসে। সময় সুযোগ করতে পারলে বাবা কাউকেই ফেরান না। ফেরাবার কোনো কারণই নেই। সর্বব্যাপারে টাকা আসে। কিন্তু টাকাটা যেন কিছু নয়, বাবা কাজ করে দিলেন লোকের কাছে এটাই বড় হয়ে ওঠে।

...অথচ, ধ্রুবর মনে হয়, অনায়াসে বাবা কারো কাছ থেকে একটি পয়সাও না নিলে পারেন। কলেজের এত কালের চাকরি, দস্তুরমতো ভালো মাইনে। কলেজে অঢেল ছুটি বলেই তাঁর চিকিৎসা-পর্ব বেশ চলছে। বাবার ছুটিব মানেই গাদা গাদা রোগী। বিশ বিঘে ধানী জমি তাদের, বছরে দু'প্রস্থে কম করে তিনশ' মণ ধান হয়। চাষীদের ভাগ মিটিয়ে যা থাকে তাতে বছরের খাওয়ার জন্য রেখে চড়া দামের সময় বাকিটা বেচে দেওয়া হয়। খড়-বিচালিরও অনেক দাম আজকাল, তার থেকেও ভালো টাকা ঘরে আসে। দু'বারের ধান চাষের পর ফাঁকা সময়েও সেই জমিতে ডাল আর সজ্জির চাষ হয়। তাতেও টাকা। তাছাড়া পুকুরে মাছ, গোয়ালে গরু—মাছ দুধ বেচা না হোক কিনতে হয় না। তাদের মতো এমন বড় অবস্থা ক'জনের? তবু বাবার ওসব করার দরকার কি, গরিবের কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নেবারই বা দরকার কি? আসলে টাকার টান, টাকার মোহ বাবার একটু আছেই।

কলেজে পড়তে এসব নিয়ে অনেক সময় খোলাখুলি বাবার ওপর চড়াও হয়েছে

ছেলে। বাবার মেজাজ অবশ্য কোনো সময় বিগড়োয় না। বাবা অভ্যেস করিয়েছেন বলেই সে কলেজের সুবক্তা আর ভালো ডিবেটর হয়ে উঠতে পেরেছে। তাই যুক্তি তর্কের আলোচনায় বাবার অরুচি নেই।

সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেছে, আচ্ছা বাবা, এই যে তুমি গরিবদের বস্তিতে ঘুরে ঘুরে চিকিৎসা করো, সকলের সব রোগের ওষুধ দাও—কিন্তু নিজে তুমি চিকিৎসার কতটুকু জানো?

সোমেশ্বরের সাদাসিধে জবাব, কিছুই প্রায় জানি না, বই পড়ে আর রোগী দেখে দেখে যেটুকু অভিজ্ঞতা। ফাঁক পেলে আয়ুর্বেদটা খুব ভালো করে পড়ার ইচ্ছে আছে।

ছেলের ভিতরে তর্ক জমতে থাকে। এই জবাবে সে খুশি নয়।—জানো না অথচ চিকিৎসা করো, তার মানে তো ওদের ঠকানো হয়!

—ঠকানো কি রে! সোমেশ্বর অবাক।—আমি তো যতটা পারি খাটি, বই কনসালট করি।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলের মন্তব্য এবং প্রশ্ন।

—ওটুকুতে ডাক্তার হতে পারলে আর কথা ছিল না। ওদের উপকার হয়? অসুখ ভালো হয়?

সোমেশ্বরের রাগ দূরে থাক উল্টে আত্মসমর্থনেব চেষ্টা।—

—একেবারে না হলে ওরা আসে কেন—ডাকাডাকি করে কেন? একটুও খারাপ মনে হলে আমি তো বলেই দিই সত্যিকারের ডাক্তারের কাছে যাও। কিন্তু ওরা কি সহজে ছাড়ে? বিশ্বাসেব মাহাত্ম্য তো তোর জানা নেই—আমার ওষুধে ভালো হবে এই বিশ্বাসেই ওদের কত ছোটখাটো অসুখ ভালো হয়ে যায় দেখে আমারই অবাক লাগে।

বাবাকে এবারে কোণঠাসা করার চেষ্টা ছেলের।—তাহলে তুমি ওদের কাছ থেকে পয়সা নাও কেন?

—আমি নিই কোথায়, দিতে পারলে ওদের আনন্দ হয়। অগোচরের আত্মা কখনো ঋণী থাকতে চায় না। দিতে না পারলেই বরং বেজার হয়।

—আত্মা-ফাত্মা বুঝি না—ছেলের তর্কেব ঝোঁক বেড়েই চলে, তুমি ওদের বুঝিয়ে দাও না কেন—বা ওষুধের ঠিক-ঠিক যা দাম শুধু সেটুকুই নাও না কেন? লোকের মনস্তুষ্টির জন্য শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করতে তো তোমার এক আধলাও খরচ হয় না—সেখানেই বা টাকা নাও কেন? আমি যদি কারো জন্যে প্রার্থনা করতে যাই ফী নিয়ে করব?

সোমেশ্বব মজা পান। হেসে ওঠেন।—দক্ষিণা দেওয়াটা আমাদের সংস্কারের সঙ্গে মিশে আছে—বুঝলি। না নিলে কর্মের অঙ্গহানি হল ভাববে।

হাসে ছেলেও।—সেটা যে কুসংস্কার তাও তুমি বুঝিয়ে দিতে পারো—দাও না কারণ তোমার আবার নেবার সংস্কার আছে—নাকি তোমার একটুও লোভ নেই বলতে চাও?

—তা কি বলতে পারি! ছোট গোঁপের ফাঁক দিয়ে কৌতুক আর মজা ঠিকরোতে থাকে। অব্যর্থ শ্লোক মুখে এসে পড়ে ঃ

কামাত্মতা ন প্রশস্তা, ন চৈবেহাস্ত্যকামতা।
যদ বুদ্ধি কুরুতে কর্ম, তৎতৎ কামস্য চেষ্টিতম।

—বুঝলি? এখানে কাম অর্থাৎ লোভ। বলছে, লোভ ভালো নয় ঠিকই কিন্তু জগতে

অবিমিশ্র লোভহীনতারই বা অস্তিত্ব কোথায়? মানুষ স্ববুদ্ধিতে যা কিছু কর্ম করে তার সবই তো কোনো না কোনো লোভের বশে।

বাসন্তীর গোড়ায় গোড়ায় বাপ-ছেলের এমন তর্ক ভালো লাগত না। এখন তিনিও একটু আধটু মজা পান। সেই সঙ্গে স্বামীর ধৈর্যও দেখেন।

মায়ের দিকে ফিরে ছেলেও হেসেই বলে ওঠে, ব্যস হয়ে গেল! বাবার ব্যাঙ্কের বইটইগুলো একবার আমাকে দেখিও তো মা—শাস্ত্রসঙ্গত ছিটেফোঁটা লোভের ফলাফল কোন্ অঙ্কে পৌঁছেছে দেখব।

ছেলের মুখে এ-কথা আবার বাসন্তীর একটুও ভালো লাগে না। বলেন, তুই পুরোপুরি নির্লোভ হ'—কে বারণ করেছে?

সোমেশ্বর তক্ষুনি হেসে বাধা দেন। বলেন, রাগলে কি ঠকলে—ছেলের জিত হয়ে গেল।

কলেজে ছেলের বি. এ. পড়া নিয়েও বেশ মজার প্রহসন হয়েছিল। ভালো পাস করেছে। সংস্কৃত-টংস্কৃত নয়—ইংরেজিও নয়। ধ্রুব ঠিক করেছে ইকনমিক্স মানে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পড়বে।

প্রসঙ্গ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সোমেশ্বর ব্যস্ত হঠাৎ।—দাঁড়া দাঁড়া, একটু কাজ সেরে নিই। তক্ষুনি একটা কাগজে কি লিখলেন। কাগজটা ভাঁজ করে একটা নতুন খামে পুরে মুখ আঁটলেন। তারপর সেই আঁটা মুখের ওপর নিজের নাম সই করে ছেলেকে বললেন তুই নিচে সই কর।

বাবার এই মজা করা নতুন নয়। কোনো কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করে অথবা কোনো ব্যাপারে বাজী ধরে সেটা লিখে খামে এঁটে স্ত্রীকে দিয়ে বলেন, এটা অমুক সময় খোলা হবে, তার আগে নয়। দু'জনের সই করা মানে ছল-চাতুরি করে খাম বদলানো হয়নি সেই প্রমাণ।

ছেলে সই করে দিতে সেটা বাসন্তীর হাতে দিয়ে বললেন, ও কলেজে ভর্তি হলে এটা খোলা হবে।

ধ্রুব সন্দিগ্ধ।—তার মানে আমার ইকনমিক্স পড়া হবে না—সংস্কৃতই নিতে হবে ভবিষ্যদ্বাণী করছ?

সোমেশ্বরের মুখে পলকা বিস্ময়।—সংস্কৃত নিবি না?

—কক্ষনো না! সংস্কৃত পড়ে আজকালকার দিনে হবেটা কি? বাজী যদি ধরে থাকো তো হারলে।

অনুরোধের সুরে সোমেশ্বর বললেন, পাস-এ অন্তত সংস্কৃত রাখিস, বাবাকে কি একেবারে ছেঁটে দিতে হয়!

ধ্রুবও হেসে ফেলেছিল। পাস-এ সংস্কৃত নেবার কথা ওই খামে লিখেছ?

—না, পাস নিয়ে অবশ্য মাথা ঘামাইনি। তা তুই কি বলছিলি—বল।

—আমি ঠিক করে ফেলেছি ইকনমিক্স অনার্স পড়ব।

—বেশ কথা। কোথায়?

বাসন্তী মাঝখান থেকে বললেন, কোথায় আবার, ওর বাবার কলেজেই পড়বে।

ছেলের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ।—এখানকার কলেজে হবে না মা—ভালো রেজাল্ট

করতে হলে সোজা কলকাতায় প্রেসিডেন্সিতে গিয়ে ভর্তি হতে হবে।

মায়ের আপত্তি।—ভালো হবার হলে এখান থেকেই হবে। এখানে ছেলেরা ইকনমিক্স পড়ছে না?

ছেলের তক্ষুনি বিরক্তি।—যা জানো না বোঝো না মা, তা নিয়ে কথা বোলো না। ভালো রেজাল্ট করতে হলে কলকাতাতেই যেতে হবে।

বাসন্তী তবু ছেড়ে কথা বলার মা নন।—ভালো করে পড়লে এখানেই বা ভালো রেজাল্ট হবে না কেন—তোর বাবার হয়নি—ফার্স্ট ক্লাস পায়নি?

ছেলের মুখে হালছাড়া বিস্ময়। তুমি বলো কি মা, কোথায় ইকনমিক্স আর কোথায় সংস্কৃত! সংস্কৃততে তো আমি ঘরে বসেও ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হতে পারি।

এতবড় কথার পরেও ছেলের বাপ কিছু বলছেন না বলে বাসন্তী অসহিষ্ণু একটু। কিন্তু বুদ্ধি তিনিও কম ধরেন না—বাপের প্রতি ব্যাপারে ছেলের রেষারেষি জানেন। বললেন, বেশ তো, তুই তোর বাবার ওপর দিয়ে টেক্কা দে, এখান থেকে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে দেখিয়ে দে তাঁর থেকে কত ওপরের দরের ছাত্র তুই—দেখি কেমন মুরোদ।

মায়ের এই কথার প্যাঁচে পড়ে ছেলে একটু দ্বিধাগ্রস্ত। এদিক থেকে সোমেশ্বর আলতো করে বললেন, এ-রকম চ্যালেঞ্জ কখনো নেওযা যায়, ইকনমিক্স বলে কথা—বাংলা বা ইংরেজি হলেও ভেবে দেখা যেত।

ছেলের মেজাজ চড়ল একটু।—ঠাট্টা করছ?

—পড়াশুনা নিয়ে ঠাট্টা করব কি রে! আচ্ছা, অপেক্ষা করে কাজ নেই—খামটা এখনই খোল।

থমকে গিয়ে হাত বাড়িয়ে ধ্রুব মায়ের কাছ থেকে বন্ধ খামটা নিল। কৌতূহল ছিলই। ছিঁড়ল। বাবার লেখা কাগজটা বার করল। পড়ল। তার পরেই মুখ লাল। বাসন্তী সাগ্রহে ওটা টেনে নিলেন। তাঁকেই লেখা।—তোমার ছেলে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ইকনমিক্স পড়তে চলল। এখানে পড়ে ভালো রেজাল্ট না হলে সেটা কলেজের বা আমাদের দোষ হবে। তাই বাধা দিও না।

বাসন্তী হাসছেন। ছেলেও খানিক গুম হয়ে থেকে শেষে হেসেই ফেলল। স্পোর্টসম্যানের মতো বলল, আচ্ছা মা তোমার চ্যালেঞ্জ নিলাম। ইকনমিক্স বাবার কলেজেই পড়ব, আর রেজাল্ট খারাপ হলে কাউকে দোষ দেব না। কিন্তু তাহলে বাবার ভবিষ্যদ্বাণী যে ঠিক হল না এটা স্বীকার করছ তো?

মা হাসি মুখেই মাথা নাড়লেন। স্বীকার করছেন।

বাবার কলেজে অর্থাৎ আসানসোল কলেজে পড়ে একটাই লাভ হয়েছে ভাবে ধ্রুব চ্যাটার্জী। কলেজে বাবার সংস্কৃত পড়ানোটা যে কি অনাবিল রসের ব্যাপার, এখানে না পড়লে কল্পনাও করা যেতে পারত না। এখানে এসে দেখেছে বর্ধমান বা দুর্গাপুর কলেজ থেকেও সুবিধে পেলে ছাত্র আসে বাবার ক্লাসে। ধ্রুবর পাস-এ সংস্কৃত, কিন্তু বাবার পড়ানোর টানে অনার্স ক্লাসেও ফাঁক পেলেই এসে বসে। বাবা যেন নিখুঁত এক ব্যঞ্জনা-শিল্পী। রসের চিত্র, ব্যথার চিত্র, বেদনার চিত্র, কামনার চিত্র, প্রেমের চিত্রগুলো সব যেন সংস্কৃত সম্ভার থেকে তুলে এনে মূর্ত জীবন্ত করে তোলেন। কামরসকে সাবলীল

সৌন্দর্যের দিকে অবলীলাক্রমে টেনে নিয়ে যান। শ্রীহর্ষের রত্নাবলী পড়ান যখন—ছেলেরা মন্ত্রমুগ্ধ। সাগরিকারূপিণী রত্নাবলী, বৎসরাজ উদয়ন আর পত্নী বাসবদত্তার ত্রিকোণ প্রেমের সংকটময় মুহূর্তগুলি বাবার পড়ানোর মধ্য দিয়ে রঙে-রসে-ত্রাসে মূর্ত হয়ে ওঠে—প্রধান চক্রী প্রধানমন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের প্রভুহিতার্থে প্রণয়ের জাল বিস্তার, রূপসী পরিচারিকা সুসঙ্গতার ছলাকলার সম্পদ শত শতাব্দী পরেও দুর্লভ মনে হয়। শেষে বাসবদত্তার কাছে ধরা পড়ে প্রেমজ্বরে জর্জরিত রত্নাবলী যখন আর্তগলায় বলে ওঠে, 'মরণং শরণং' ধ্রুব চাটুজ্জের মনে হয় রসাভিসারিকার মৃত্যু বুঝি বাবার গলাতেই বিলাপ হয়ে বেজে উঠল।

...কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম-এর শকুন্তলার সঙ্গে রাজা দুষ্যন্তের মালিনী নদীর তীরে বেতসকুঞ্জে প্রথম গোপন মিলনের অধ্যায়টি পড়ানোর সময়ে প্রেমবিহ্বল শেষের মুহূর্তে সখীদের আকস্মিক নেপথ্য কণ্ঠে সচকিত ক্লাসসুদ্ধ ছেলেও বুঝি চমকেই ওঠে—মুহূর্ত তাদের কানেই যেন সতর্ক-কণ্ঠ হানা দেয়। তার আগে বাবা চক্রবাক-চক্রবাকী অর্থাৎ চখা-চখীর মিলন রীতিটা ছেলেদের বুঝিয়ে দেন। চখা চখী সমস্ত দিন গায়ে গায়ে লেপটে থাকে, মুহূর্তের তিল-বিচ্ছেদ অসহ্য তাদের। কিন্তু যেই রাত হল অমনি তারা পরস্পরের কাছ থেকে পৃথক হবে, একজন হয়তো খাল-বিলের এপারে অন্যজন ওপারে চলে যাবে—কেউ কারো মুখ পর্যন্ত দেখবে না—বিপরীত দিকে ফিরে বসে থাকবে—আর সমস্ত রাত ধরে চ্যাঁচ্যা চেঁচিয়ে গলা দিয়ে রক্ত তুলে ফেলতে চাইবে। এটা বোঝাবার পর বাবার সেই বেতসকুঞ্জের অধ্যায় শুরু হবে। বেতসকুঞ্জে শকুন্তলাকে রাজা দুষ্যন্তের হাতে সঁপে দিয়ে ছল করে প্রিয় সখী অনসূয়া প্রিয়ংবদা সরে গেছে। প্রণয়পাগল রাজা প্রেম ভিক্ষা করছেন। প্রেমস্পন্দনে থরথর কাঁপছেন আশ্রমবাসিনী ভীরু কন্যকা শকুন্তলা। রাজা তাঁকে প্রেম নিবেদন করছেন, আশ্বাস দিচ্ছেন, অভয় দিচ্ছেন। সমস্ত প্রকৃতিও যেন মিলনোন্মুখ। সন্ধ্যা আসন্ন, দু'জনার কারো সেদিকে হুঁশ নেই। ওদিকে উতলা অনুচরেরা রাজাকে খুঁজতে খুঁজতে সেই বেতসকুঞ্জের দিকে এগিয়ে আসছে। সেই বিপদের মুহূর্তে বেতসকুঞ্জে আত্মবিস্মৃত প্রেমিক-প্রেমিকার কানে পৌঁছল নেপথ্য সংকেত অর্থাৎ সতর্কবাণী ঃ

'চক্রবাকবধূকে! আমন্ত্রয়স্ব সহচরম উপস্থিতা রজনী!'

—চক্রবাক-বধূ ('কচি' অর্থে 'কে' প্রয়োগ)—সহচরকে বিদায় জানাও—রজনী যে সমাগতা—উপস্থিতা রজনী।

বাবার গলার সেই আকস্মিক সতর্ক কণ্ঠে ক্লাসসুদ্ধ ছেলেও হকচকিয়ে যায়—তারপর হাসির ফোয়ারা ছোটে।

ধ্রুব বাড়িতে মাকে বলে, বাবার সংস্কৃত পড়ানোর তুলনা নেই এটা ঠিক মা।

বাসন্তী খুশি হয়েও ঠেসের সুরে বলেন, তবু বাবার একটা গুণ তোর চোখে পড়ল।

বি. এ.-তে ধ্রুব সত্যি ফার্স্ট ক্লাস পেল না। এ-জন্যে মনে মনে ক্ষুব্ধ একটু। কিন্তু বাবা-মায়ের ঘাড়ে দোষ চাপানোর রাস্তা নিজেই মেরে রেখেছে। ফার্স্ট ক্লাস দু' দুজন পেয়েছে। ও সেকেন্ড ক্লাসে সকলের ওপরে।

কলকাতায় এম. এ. পড়তে যাওয়ার আগে বাবার সঙ্গে একটু মতবিরোধ হয়ে গেল অন্য ব্যাপারে। হৈমন্তী হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেছে। মোটামুটি ভালো নম্বর পেয়ে

ফার্স্ট ডিভিশনে উৎরেছে। গোঁ ধরেছে আসানসোলে বাবার কলেজে বি. এ. পড়বে। ট্রেনে যাবে আসবে, হবে না কেন?

এতে ধ্রুবরও খুব উৎসাহ। কিন্তু বাবা যে এদিকে তলায় তলায় হিমুর বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, ভাই বোনের কেউ জানেও না। কলকাতায় দিদির শ্বশুরবাড়ি মারফৎ এই যোগাযোগের খবর পরে শুনেছে। বাবা দিদি আর জামাইবাবুকে প্রায়ই চিঠি লিখতেন, একটু খোঁজে থেকো, হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই হিমুর বিয়ে দেবার ইচ্ছে।

একদিন বাবা-মাকে দেখা গেল বেশ ব্যস্ত। মা পাঁচ-রকম রান্নাবান্না নিয়ে আছেন। ওরা শুনল দিদির খুব চেনা-জানা কারা সব গ্রাম দেখতে আসছেন। কিন্তু আসার পর দেখা গেল দু'জন বয়স্ক ভদ্রলোক আর দু'জন বয়স্কা ভদ্রমহিলা। ধ্রুব আর হৈমন্তী সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিল ব্যাপারখানা কি। রাগে মুখ লাল হৈমন্তীর। ধ্রুব তাকে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করল, এঁরা চলে গেলে বাবার সঙ্গে আমি কথা বলব—এখন একেবারে চুপ, যা বলে শুনে যা।

খাওয়া-দাওয়াব পাট চুকতে হিমুকে অল্পস্বল্প সাজিয়ে তাঁদের সামনে আনা হল। ধ্রুবও ওঁদের চোখ দিয়েই বোনকে দেখছে। অপছন্দের মেয়ে নয় তো বটেই! দেখতে শুনতে বেশ ভালো শুধু নয়, তার ওপর যাকে বলে ভারী তাজা মেয়ে। এসে বসা মাত্র যে ওঁদের ভালো লেগেছে তা-ও বোঝা গেল।

ইতিমধ্যে ধ্রুব মায়ের কাছে সমাচার শুনেছে। এই ভদ্রলোকদেরই একজনের ছেলে। ভালো ঘর, অবুদের চেনা-জানা। ছেলে এ-বছরই কলকাতার মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করে বেরিয়েছে। অবু মানে দিদি তাঁদের জানিয়েছিল বাবা সবই যথাসাধ্য করবেন কিন্তু পণ দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেবেন না। তাঁরা বলেছেন, মেয়ে পছন্দ হলেই হল, আর কিছুই চাই না।

ধ্রুবও তখনকার মতো চুপ। বাবার পণ না দেওয়াটা খরচ সাশ্রয়ের নীতি কিনা সে-সম্পর্কেও নিঃসংশয় নয়। গ্রাম দেখতে আসা অতিথিরা আর কিছু না দেখেই খুশি মুখে বিদায় নিলেন। মেয়ে পছন্দ হয়েছে এমন আভাস দিয়েই গেছেন। হিমুও যে-করেই হোক বুঝেছে পছন্দ হয়েছে। ওঁরা চলে যেতে ধ্রুব এসে দেখল, বোন মুখ গুঁজে কাঁদছে।

বিয়ের আগে দিদিকেও কাঁদতে দেখেছিল ধ্রুবর মনে আছে। অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া নিয়ে বাবার যুক্তি এখন আর অকাট্য মনে হয় না আদৌ। তাছাড়া এই ছ'সাত বছরের মধ্যে শহর ছেড়ে বাহারীর হাওয়া পর্যন্ত পাল্টেছে। দিদির বায়না ছিল একটা পাস দিয়ে বিয়ে। আর হিমুকে এ-ভাবে কাঁদতে দেখলে বাবা-মা ধরেই নেবেন আরো পড়ার বাসনাটাই দুঃখের কারণ। বাবার কলেজে বি. এ. পড়বে এমন ঘোষণা করেই রেখেছিল।

এই আশাভঙ্গ কান্নার একটা কারণ তো বটেই। কিন্তু এই সঙ্গে আরো কিছু কারণ ধ্রুব আঁচ করতে পারে যা মা বাবা কাউকে বলার নয়। বাহারীর হাওয়া বদলালেও সেটা চাটুজ্জে বাড়ির অন্দরে ঢুকবে না, বা ঢুকতে চাইলেও বাধা পড়বে সেটা ধ্রুবর ধারণা নয়—বিশ্বাস। এই কারণে হিমুকে নিয়ে তার ভিতরে ভিতরে কিছু ভাবনা চিন্তা ছিল।

মায়ের হাব-ভাব দেখে আর কথাবার্তা শুনে ভাবনাটা অস্বস্তির দিকে গড়াচ্ছিল। কিছুদিন আগেও বাসন্তী ছেলেকে স্পষ্ট বিরক্তির সুরেই বলেছিলেন, বাইরের ছেলে এলে নিচে বাইরের ঘরে বসাবি, আড্ডা দিবি—তাকে একেবারে দোতলার অন্দরে নিয়ে আসার দরকার কি—তাছাড়া তোর ওই বন্ধু এলে হিমুর যাবার দরকার পড়ে কেন, পরীক্ষা তো হয়েই গেছে।

মায়ের কথাগুলো হিমুর কানেও গেছে বোঝা গেছল। কারণ এর পরের কয়েকটা দিন হিমু বলতে গেলে ঘর ছেড়ে বেরোয়নি। আর সামনাসামনি হলে লজ্জায় আর মায়ের ওপর রাগে মুখ তুলে দাদার দিকে তাকাতে পারেনি। মায়ের ও-কথার জবাবে ধ্রুব বলেছিল তা-ও হিমুর না শোনার কথা নয়। ধ্রুব একটু বিপাকে পড়ে গলা চড়িয়ে মায়ের কথা উড়িয়েই দিতে চেয়েছিল।—তোমরা এখনো কি-যে সেকেলে হয়ে আছ মা বুঝি না, ছেলে মেয়েরা আজকাল কত সহজ আর স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করে খবরও রাখো না। তাছাড়া তোমার মেয়ের পরীক্ষার আগে যে ছেলেটা নিজে খেটেখুটে এত সাহায্য করল, পরীক্ষা হয়ে গেল বলেই হিমু আর তার সামনে যাবে না—কথা বলবে না? এ-সব চিন্তা তোমার মাথায় আসে কি করে ভেবে পাই না।

মায়ের মুখ বন্ধ করেছিল বটে, কিন্তু নিজের মনে একটু অস্বস্তি লেগেই ছিল। মায়ের বুদ্ধি বিবেচনার সহজ দিকটাকে উপেক্ষা করা খুব সহজ নয়। তা না হলে মা যা বলার হিমুকেই বলতেন। কিন্তু মায়ের যা অপছন্দ সেটা ঠেকানো হিমুর হাতে নেই। এই সহজ বিবেচনায় সোজা মূলে নাড়া দিলেন।

যাকে নিয়ে কথা তার নাম প্রশান্ত। প্রশান্ত মুখুজ্জে। ধ্রুবর সব থেকে অন্তরঙ্গ বন্ধু। একই কলেজ, একই ক্লাসের ছাত্র। ধ্রুবর ইকনমিক্সে অনার্স। প্রশান্তর ইংরেজিতে। পাসএ ইকনমিক্স ছিল। দস্তুরমতো ভালো ছাত্র। ধ্রুবর ধারণা, খেলাধূলার দিকে অত ঝোঁক না থাকলে অনায়াসে য়ুনিভার্সিটির সেরা ছাত্রদের একজন হতে পারত। হবে না এখনও বলা যায় না। কিছুদিন আগেও প্রশান্ত জোর দিয়ে বলেছিল, কলকাতায় এম. এ. পড়তে গিয়ে আর খেলা নয়—আদা জল খেয়ে একবার লড়ে দেখব ফার্স্ট ক্লাস পাই কি না।

ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া খুবই কঠিন। এমন অনেক বছর যায় যে ও-বিষয়টিতে কেউ ফার্স্ট ক্লাস পায় না। কিন্তু ধ্রুবর ধারণা, রোখ চাপলে প্রশান্ত না পাওয়ার ছেলে নয়। এমন রোখ চাপার হেতুও মনে মনে আঁচ করতে পারে। ইদানীং ওর ব্যাপারে ভবিষ্যতে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াবার উৎসাহ লক্ষ্য করেছে। ছেলেবেলা থেকেই বাপ নেই। কাকার কাছে মানুষ। কাকা ছা-পোষা উকিল। নিজেব কয়েকটা ছেলেপুলে। অভাবের সংসার। কলেজে পড়তে শনিবার বা ছুটিছাটার দিনে প্রশান্ত এই বাহারীর বাড়িতে অনেক এসেছে। ধ্রুবও ওদের বাড়ি গেছে। কিন্তু গেলেই ওর কাকার নালিশ আর দুঃখ। ভাইপো সেভাবে পড়াশুনায় মন দিলে পাঁচজনের একজন হতে পারত, সংসারের হাল ধরতে পারত। তা আর হবে না—মন মগজ সব পড়ে আছে খেলার দিকে।

খুব সত্যি নয়, আবার মিথ্যে তো নয়ই। নিছক সত্যি নয় কারণ, ইংরেজি অনার্স ক্লাসের কোনো ছাত্র এখনো ওর নাগালের মধ্যে নেই। অন্য দিকে বলতে গেলে খেলা-অন্ত প্রাণ। শুধু কলেজ টিমের সেরা ক্রিকেট আর ফুটবল প্লেয়ার নয়, ক্রিকেটে ডিস্ট্রিক্টের বাছাই এগারোজনের মধ্যেও অলরাউন্ডার হিসাবে তার জায়গা বাঁধা। পড়া আর খেলা

দুদিক বজায় রাখতে পারার দরুন ছাত্রদের চোখের মণি আবার প্রোফেসারদেরও প্রিয় পাত্র। সংস্কৃত পড়ে না, তাই সরাসরি বাবার ছাত্র নয়। কিন্তু প্রশান্তকে বাবাও খুব ভালোই চেনেন।

স্বাস্থ্য তো ভালোই, চেহারাপত্রও ভালো। চোখে মুখে দুষ্টুমি-ছোঁয়া হাসি। চলনে বলনে বে-পরোয়া একটু। গোঁ চাপলে খেলার মাঠে অনায়াসে কারো ঠ্যাং খোঁড়া করে দিতে পারে। আবার ইংরেজি সাহিত্যের কোনো ব্যাপারে মতে না মিললে সোজা উঠে দাঁড়িয়ে প্রোফেসারের মুখে মুখে তর্কও জুড়ে দিতে পারে।

প্রশান্ত বাড়ি এলেই ধ্রুব হাঁক-ডাক করে মাকে খাবার পাঠাতে বলত। আর খাবার পাঠাবার ব্যাপারে মায়ের বরাবরই দরাজ হাত। প্রশান্ত খুশি হয়ে খেত। সোজাসুজি বলত, এত ভালো ভালো খাবার আমাদের বাড়িতে বেশি জোটে না। কোনো কোনো ছুটির দিনে আসানসোল থেকে বঁড়শী কাঁধে করে বাহারীতে আসত ধ্রুবদের পুকুরে মাছ ধরতে। ধরতে পারলে ধ্রুব সে-মাছ জোর করেই বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য গছিয়ে দিত।

এ-সবের ফাঁকে কবে কখন হৈমন্তীর সঙ্গে ওর বাক্যালাপ শুরু হয়েছিল ধ্রুব খেয়ালও করেনি। প্রশান্তর মত ছেলের সঙ্গে সকলেরই সহজ হওয়া সোজা। তাছাড়া ধ্রুব বাড়িতে ওর যখন পঞ্চমুখে প্রশংসা করত তা বোনের মনেও কতটা রেখাপাত করত ভেবে দেখেনি। একদিন কথায় কথায় হিমুর সামনেই ওকে বলেছিল, তুই যেমন ইংরেজিতে পাকা, ওটা আবার ইংরেজিতেই তেমনি কাঁচা।

প্রশান্তর তক্ষুনি সাদা-সাপটা জবাব, সেটা তাহলে তোদের দোষ, গোড়ার ভিত পাকা হলে ইংরেজিতে আবার কাঁচা হয় কি করে—ওটা আমার মতে বাংলার থেকে সহজ সাবজেক্ট। তার পরেই উদার প্রস্তাব, ঠিক আছে, আমি রোববার বা ছুটির দিনে এসে যতটা পারি ঠিক করে দিয়ে যাব'খন।

যে কথা সেই কাজ। রোববারের দুপুরের দিকে প্রায়ই হাজির তারপর থেকে। —বোনকে বইপত্র নিয়ে আসতে বলো, দেখি কেমন কাঁচা।

তখনো বাবা বা ধ্রুবর তো নয়ই, মায়ের মনেও কোনো নিষেধ উঁকিঝুঁকি দেয়নি নিশ্চয়। ছেলেটা অত দূর থেকে মেয়েকে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে আসে বলে বরং তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থায় মায়ের যত্ন আগের থেকেও বেড়েছিল। প্রশান্ত সেই ছেলে যে কাছে আসতে চাইলে তফাতে সরানো শক্ত। হিমুর পরীক্ষার আগে দোতলায় সরাসরি ওর পড়ার ঘরে চলে আসত। হিমুকে ইংরেজিতে ভালো নম্বর পাওয়ানোর দায় যেন ওরই। খেটেখুটে ক'বছরের প্রশ্নপত্র ঘেঁটে সাজেশন তৈরি করেছে, জবাবও ঠিক করে দিয়েছে। সুযোগ পেয়ে হিমুর অন্য দুই-একটা সাবজেক্টেও ওর সাহায্য চাওয়া অস্বাভাবিক নয়। ধ্রুব শুধু বোনের নির্ভরতা লক্ষ্য করেনি, উদগ্রীব প্রতীক্ষাটুকুও চোখে পড়েছে। ও এলে হিমুর মুখে চাপা খুশির ছটাও দেখেছে।

ধ্রুবর ভিতরে ভিতরে তখন থেকেই একটু অস্বস্তি। হিমুর থেকে তলায় তলায় প্রশান্তর জন্যই একটু ভাবনা। এ ছেলের মনে মুখে লাগাম নেই।—তোমার বোন ঠিকমতো তালিম পেলে একখানা জুয়েল হবে, বুঝলে। বি-এ-তে ও ইংরেজি অনার্স পড়বে আমি বলে দিয়েছি। ভেকেশনে এসে এসে সেই তালিম আমিই দেব।

হিমুকে পড়ানোর সময় ধ্রুব ঘরে থাকতই। শুয়ে শুয়ে গল্পের বইটই পড়ত। অবশ্য

দরকার পড়লে ঘর ছেড়ে যেতই, আগলে রাখার ব্যাপার তো কিছু নয়। তবু এ-সব কথা হিমুর সঙ্গে কখন হল জানে না। আর একদিনও প্রশান্তকে বাবার জমি-জমা আর মৌসুমী তরকারির বাগান দেখাতে এনে ওর একটা কথায় ধ্রুব ভিতরে ভিতরে একটু সচকিত হয়েছিল। জমি আর বাগান থেকে ঘুরে আসার পরে প্রশান্ত হঠাৎ মন্তব্য করেছিল, তোমরা দেখছি বেজায় বড়লোক...।

এত বড়লোক বলে ওর যেন কিছু একটু দুশ্চিন্তা। ধ্রুব হেসেই জবাব দিয়েছিল, বেজায় কিনা আমি খবর রাখি না, আর ভবিষ্যতেও বাবার টাকায় বড়লোক হবার কোনো বাসনা নেই। আর হিমুর পরীক্ষা হয়ে যেতে ওর বাড়িতে বসে সেদিন ওই কথা। বলেছিল, আদা জল খেয়ে একবার লড়ে দেখবে এম. এ.-তে ফার্স্ট ক্লাস পায় কিনা। খেলা-পাগল ছেলের এমন সংকল্পের পিছনে কোন প্রেরণা কাজ করছে ধ্রুব তা-ও আঁচ করতে পেরেছিল। এর সঙ্গে একটা মিষ্টি সম্পর্ক কল্পনা করতে তারও খুব খারাপ লাগত না। কিন্তু নিজেদের বাড়ির বাস্তবের দেয়াল টপকাবে কল্পনার পাখা আদৌ তেমন জোরালো করে তুলতে পারেনি।

হিমুর পরীক্ষা হয়ে যাবার পরেও আসানসোল থেকে বাসে ন' মাইল পথ ভেঙে প্রশান্তর এ-বাড়িতে আসায় ছেদ পড়েনি। আসে, আর আগের মতোই ধ্রুবর নাম ধরে হাঁক দিয়ে সোজা দোতলায় উঠে যায়। দিন তিন-চার এ-রকম দেখার পরে সেদিন ধ্রুবকে ডেকে মায়ের ওই কথা—বাইরের ছেলে সোজা ওপরে উঠে আসে কেন।

মা কি বুঝেছেন বা কতটা লক্ষ্য করেছেন ধ্রুব জানে না। কিন্তু মায়ের সঙ্গে তর্ক করার সময় ভিতরে তেমন জোর পায়নি। প্রশান্তর আসা নিয়ে মা বাবাকে কিছু বলেছেন ধ্রুবর তা মনে হয় না। মাকে ভালোই চেনে। হিমুর এই বিয়ের ব্যাপারটা হয়তো বা হঠাৎ যোগাযোগই কিছু।

বোনের কান্না দেখে ধ্রুব নিঃশব্দে চলে এলো। বাবার ঘরে এসে দাঁড়ালো। মা-ও সেইখানে। জানান দিল, হিমু কাঁদছে।

সোমেশ্বর প্রথমে অবাক একটু। তারপর হেসে জবাবে বললেন, বিয়ের নামে মেয়েরা একটু কেঁদেই থাকে...তা এত তাড়াতাড়ি কান্না শুরু করার কি হল?

—তোমাদেরই বা এত তাড়াতাড়ি ওর বিয়ের জন্য ব্যস্ত হবার কি হল?

বাবার মুখে সেই চিরাচরিত কৌতুক।—আমাদের দায় আমরা ব্যস্ত হব না তো কে হবে!

—মেয়ে তোমাদের দায়? ধ্রুবর এ প্রশ্নও অসহিষ্ণু।

নির্লিপ্ত সুরে সোমেশ্বর জবাব দিলেন, এ দায় মানে সৎ পাত্রস্থ করার দায়।

ধ্রুবর এবারের প্রশ্ন শ্লেষশূন্য নয়—ছেলে ডাক্তার শুনলাম...এ ব্যাপারে তাহলে তোমার মড়া কাটাকুটি ঘাঁটাঘুঁটি নিয়ে কোনো সংস্কারে বাধছে না?

শুনে সোমেশ্বর হেসেই ফেললেন।—মড়া কাটাকুটি না হোক, ঘাঁটাঘাঁটি করতে আমাকে তুই-ই কম দেখলি নাকি—মড়া নিয়ে আবার সংস্কার কি!

ধ্রুব ঠিক এ-কথাটাই বলতে চায়নি। শুধু মড়া কেন, অচ্ছুত অন্ত্যজ একঘরে পরিবারের শব নিজে বহন করে বাবা ওদের মন জয় করেছিলেন আর সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ মহলে বড় রকমের আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন, ধ্রুব তা-ও জানে। কিন্তু পূজা-পার্বণ

শান্তিস্বস্ত্যয়ন ক্রিয়াকলাপের দরুন বাবাকে সে অন্ধ সংস্কারের উর্ধ্বে ভাবে না একটুও। বাবা একমাত্র মা ভিন্ন কারো হাতের অন্ন গ্রহণ করেন না পর্যন্ত। এ নিয়েও ধ্রুব একদিন খোঁটা দিয়েছিল, বলেছিল, মা তোমার আগে চোখ বুজলে কি করবে, ভাত খাওয়া ছেড়ে দেবে? তেমনি হেসে বাবা জবাব দিয়েছিলেন, তখন তোর বউকে দীক্ষা নেওয়াব—রোজ স্নানটান সেরে আমার রান্না করে দেবে।

যা-ই হোক, ধ্রুব সংস্কারের খোঁটাটাই দিতে গেছল। একটু গুম হয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, ছেলে ডাক্তারি পাস করেছে, বয়স কত?

—সাতাশ।

সেটাই যেন বড় আপত্তির কারণ। বলে উঠল, হিমুর তো মাত্র সতের!

রসিকতার সুরে সোমেশ্বর জবাব দিলেন, গোড়ায় কিছুদিন একটু তফাতই মনে হবে...তারপর মেয়েদের বয়েস চট করে কয়েক বছর বেড়ে যায় আর ছেলেদের বয়েস তেমনি কয়েক বছর কমে যায়—তখন দু'জনে প্রায় সমান সমান। জোরেই হেসে উঠলেন। বললেন, তোর মা আমার থেকে ন' বছরের ছোট...কচি মনে হয় মাকে?

রাগত সুরে এবারে বাসন্তী বললেন, কি যে ঠাট্টা করো ঠিক নেই। ছেলের দিকে ফিরলেন, হিমুর ভালো-মন্দের বিবেচনা তোর থেকে আমাদের কম কিছু নয়, তার দিদি যা লিখেছে এখানে বিয়ে হলে ভাগ্যি জানিস।

সোমেশ্বর বললেন, হিমুকে নিশ্চিন্ত থাকতে বল, তাঁদের সঙ্গে ওর পড়া নিয়ে আমার কথা হয়ে গেছে—তাঁরা বলেছেন, বিয়ের পরে ওকে সেখানকার কোনো মেয়ে-কলেজে ভর্তি করে দেবেন।

...হিমুর বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু ধ্রুব চ্যাটার্জী বাবার ওপর মোটেই খুশি থাকল না। বাধা দেবার শক্তি থাকলে হিমুর মুখ চেয়ে বাধা দিত। প্রশান্তর মুখ চেয়েও। হিমুর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল শুনে প্রশান্ত যে আর্ত চোখে চেয়ে ছিল, ভোলবার নয়। পরেও এ নিয়ে আর একটি কথাও বলেনি। বিয়েতেও আসেনি। বাবার ওপর ধ্রুব আরো অখুশি কারণ হিমুর বর সুশ্রীও তেমন কিছু না। তার মতে, এই ছেলে দেখে বাবার অপছন্দ হওয়া উচিত ছিল। আর মনে মনে ধারণা, কোনো রকম দাবীদাওয়া নেই বলেই বাবার অপছন্দ হয়নি। বিয়েতে যে অনেক দেওয়াথোয়া হয়েছে সেটা অবশ্য অস্বীকার করে না।

দুবছর বাদে ধ্রুব এম. এ-তে ইকনমিক্সএ ফার্স্ট ক্লাস পেয়েই বেরিয়েছে। য়ুনিভার্সিটিতে সুবক্তা হিসাবে নাম হয়েছে তার।

এম. এ. পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুতে ধ্রুব কলকাতায় ফিরে এসে ধীরেসুস্থে ব্যাঙ্কিং পরীক্ষা দিয়েছে। তাতেও সকলের ওপরে। একবারে অফিসার হয়ে বসেছে। মাইনে পেয়ে নিজের খরচের টাকা রেখে বাকিটা বাবার হাতে দিতে গেছল। তিনি অবশ্য নেননি। বলেছেন, বাজে খরচ না করে তোর নামেই ব্যাঙ্কে রেখে দে।

ব্যাঙ্কে চাকরি করতে করতে দু'বছরের মাথায় আবার তৈরি হয়ে ধ্রুব আই.এ.এস পরীক্ষা দিয়েছে। মনে মনে স্থির বিশ্বাস এতেও ভালো করবে। চাকরিই যখন করবে, এর থেকে দাপটের চাকরি আর কোথায়। তা বলে ফল বেরুনোর আগে ব্যাঙ্কের চাকরি ছাড়ার প্রশ্ন ওঠে না। ব্যাঙ্ক থেকে দিন কয়েকের জন্য বিশেষ কাজে তাকে পাটনা পাঠানো হয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে আসার পরেই আই.এ.এস-এর ফল বেরিয়েছে।

কলকাতায় ফিরে মামার বাড়িতে শুনেছে সে পাটনা রওনা হবার পরদিনই বাবা এক বেলার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন।...ওষুধপত্র কেনার দরকারে এসেছিলেন নাকি।

কলকাতায় বাবা খুব কমই আসেন। কারণ তাঁর খাওয়ার অসুবিধে। দীক্ষা না নেওয়া থাকলে বাবা এখনো কারো হাতের রান্না খান না। বাবার জন্যই নাকি দিদি অবন্তী এখন দীক্ষা নেবার কথা ভাবছে।

এ-সবের মর্ম ধ্রুব চ্যাটার্জী বোঝে না। বুঝতে চায়ও না। উল্টে বিরক্ত। ...বিরক্তির কারণও একমাত্র ও নিজে ছাড়া এখনো আর কেউ জানে না।

## আট

মাথা খাটিয়ে এই প্রথম ধ্রুব চ্যাটার্জী কিছু টাকা খরচ করল। আই-এ-এস পরীক্ষার ফল যে এত ভালো হবে আশা করেনি। দিদি আর হিমুকে দামী দুটো শাড়ি কিনে দিয়েছে। দিদির দুই ছেলে মেয়ে আর হিমুর বাচ্চাটাকে ভালো জামা দিয়েছে। মায়ের জন্য চওড়া লাল-পেড়ে একটা গরদ কিনেছে। আর খোঁজখবর নিয়ে একশ টাকার ওপর খরচ করে ঢাউস একখানা হোমিওপ্যাথির ইংরেজি বই কিনেছে। এখানকার নয়, বিদেশের ছাপা। ওর হাত থেকে এই উপহার একটু রসিকতার ব্যাপার হবে আবার বাবার কাজেও লাগবে। ইংরেজি দুই-একখানা আর বাংলা বেশ কয়েকখানা হোমিওপ্যাথি বই বাবার আছে দেখেছে। কিন্তু এত দামের এই বই নেই আশা করছে।

শাড়ি পেয়ে মা খুশি। কিন্তু বই পেয়ে বাবা ডবল খুশি। বার বার বলেছেন, দারুণ ভালো জিনিস এনেছিস, এ বইয়ের অনেক বিজ্ঞাপন দেখেছি, গেলবাবে কোলকাতায় গিয়ে খোঁজও করেছিলাম—যাদের কাছ থেকে ওষুধ নিই তাদের কাছে ছিল না—আমারও ঘোরাঘুরির সময় ছিল না। তা সজ্জন চাইলে ভগবান কেমন জুটিয়ে দেন দেখ। কিচ্ছু না জেনে এই বইটাই তুই নিয়ে এলি।

ধ্রুব হেসেই বলল, তোমার আনন্দ দেখে ভাবছি এই সঙ্গে একটা স্টেথস্কোপ কিনে আনলেও হত—গলায় ঝুলিয়ে রোগী দেখতে বেরুতে।

ঠাট্টার মধ্যে হুল ছিলই। অর্থাৎ, বাবার স্টেথোর যেমন জ্ঞান—হোমিওপ্যাথির জ্ঞানও উনিশ-বিশ একই রকমের। সোমেশ্বর বেশ হেসে ছেলের রসিকতা উপভোগ করলেন। বললেন, এ-বই কিনে টাকাগুলো তাহলে জেনে-শুনে জলে ফেললি! কিন্তু আমার প্র্যাকটিস্ এখন কত বেড়ে গেছে জানিস, সকালে রোজ চারটি ঘণ্টা করে রোগীর বাড়ি বাড়ি টহল দিতে হয়।

ধ্রুব জিজ্ঞেস করল, রোজ কি রকম...কলেজে এ সময় কিসের ছুটি?

জবাবে সোমেশ্বর মিটিমিটি হাসতে লাগলেন, ছেলের কাছে যেন কিছু মজাদার খবর গোপন আছে।

বাসন্তী বললেন, তোর বাবা তো আজ চার মাস হয়ে গেল কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন—তুই পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলি বলে তোকে কিছু জানাননি।

ধ্রুব অবাক।—ছেড়ে দিয়েছেন! বাবার দিকে চোখ।—মানে রিটায়ার করেছ নাকি?

সোমেশ্বর তেমনি হাসছেন। এবারও বাসন্তীই জবাব দিলেন, রিটায়ারমেন্ট তো

আটান্নয়, আরো তিন বছর চাকরি করতে পারতেন...ছেড়েই দিয়েছেন।

ধ্রুব হতভম্ব। পড়ানোয় এত নামডাক বাবার—হঠাৎ কি এমন হতে পারে ভেবে পেল না।

কি হতে পারে না, কি হয়েছে মায়ের মুখে শুনল। ইদানীং কলেজে বেশ রাজনীতি ঢুকে গেছে। দলাদলি শুরু হয়েছে, দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার পড়ছে। মাস্টারমশাইরা পর্যন্ত কেউ কেউ যে-যার সুবিধে বুঝে পরোক্ষে প্রশ্রয় দিচ্ছে। বাবা এই নিয়ে প্রিন্সিপালের কাছে প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু তিনিও সাহস করে কিছু করেন না। এই নিয়ে অশান্তি বেড়েই চলেছিল। এরপর দু'চারজন ছাত্র যখন এসে মুখের ওপর শাসিয়ে গেল, তাদের কোনো কাজে বাধা দেওয়া চলবে না—সেই দিনই সোজা রিজাইন করে চলে এলেন।

বাবার এই ঠাণ্ডা তেজের দিকটা ছেলের জানা ছিল না। বলল, কোথায় আর এখন এ-সব নেই। তা ছেড়েছ ভালো করেছ।...প্রভিডেন্ড ফান্ড গ্র্যাচুইটির টাকা সব পেয়েছ?

—হ্যাঁ, পাওনাগণ্ডা সব মিটিয়ে দিয়েছে। মুচকি হেসে সোমেশ্বর বললেন, চাকরি ছেড়েও রোজগারপাতি খুব কম হচ্ছে কিনা তোর মাকে জিজ্ঞেস কর।

ছেলের অবাক হবারই কথা। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে।...নাকি আরো জমি-টমি নিয়েছ?

রোজগার কেন কম হচ্ছে না শুনল। কলেজে আসলে নিরুপদ্রব ছেলেই তো বেশি। দশ-বিশজনে ঘোঁট পাকিয়ে সব গরম করে তোলে। যারা পড়াশুনা চায় তারা এসে হাতে-পায়ে ধরে পড়েছিল। কিন্তু আব ফিরে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। প্রত্যেক শনিবার বিকেলে অনার্সের পার্ট ওয়ানের আটটি ছেলে পড়তে আসে, আর পার্ট টু'র সাতটি ছেলে পড়তে আসে রোববার দুপুরে—প্রত্যেকে তিরিশ টাকা করে দেয়। আর এখানকার পাঁচ মাইলের মধ্যে দুটো স্কুলের হায়ার সেকেন্ডারির ছাত্ররাও দল বেঁধে এসেছিল...তাদের কমপালসারি আর অ্যাডিশনাল দুই-ই পড়াতে হবে। দশটা ছেলে একত্র হয়ে সপ্তাহে একদিন রাত্রিতে পড়তে আসে—তারা দেয় কুড়ি টাকা করে। সপ্তাহে মোট তিন দিন ছ'সাত ঘণ্টা পড়িয়ে সাড়ে চারশ আর দু'শ সাড়ে ছ'শ টাকা ঘরে আসে। বাসন্তী বললেন, এর পরেও লাইন বেঁধে আবো ছেলে অপেক্ষা করছে, আমি আর বাড়াতে দিইনি।

বাবার পড়ানোব সুনাম যা, এ হতেই পারে। আর এ-রকম একজনের কাছে তিরিশ বা কুড়ি টাকা দিয়ে পড়া আজকের দিনে কিছুই না। বাবা এখানে শুধু সংস্কৃত পড়ানোর একটা স্কুল খুলে বসলেও ভালো চলতে পারে- জায়গারও অভাব নেই। সামনের উইংয়ের একতলা দোতলার সবটা খালি করে নিলেই হয়—এদিকেরও একতলাটা পুরো খালি বললেই হয়। ধ্রুব উৎসাহের মাথায় বাবাকে সে প্রস্তাব দিতে গিয়েও দিল না —কলেজ ছাড়ুন আর যা-ই করুন, রোজগারের রাস্তা পেলে বাবা ছাড়ার মানুষ নন —এক্ষুনি হয়তো মাথায় চেপে বসবে। হেসে উলটে বলল, তোমার টাকার ভাগ্যটি ঠিক আছে দেখছি।

সোমেশ্বর হেসে বললেন, তুই তো সবেতে কেবল আমার টাকাই দেখিস—এবার তোর ভাগ্যের কথা বল্ শুনি।

—আমার তো ছকে বাঁধা ব্যাপার এখন। পুরো একটি বছর এখন মাউন্ট আবুতে ট্রেনিং—ট্রেনিং শেষে কোথাও এস-ডি-ও'র পোস্টিং।

বাসন্তী উৎসুক। সেটা তো আসানসোলেও হতে পারে?

ধ্রুব হেসে মাথা নাড়ল।—হোম ডিস্ট্রিক্টএ এ-সব সার্ভিসে পোস্টিং হয় না।

মায়ের পছন্দ হল না। বলে উঠলেন, কেন হোম ডিস্ট্রিক্ট কি দোষ করল, ঘরের ছেলের ঘরের কাছে কাজ হলে কার কি ক্ষতি?

বাবার সঙ্গে ছেলেও হেসে উঠল।

এবারে ধ্রুব চ্যাটার্জী দিন পাঁচেকের জন্য বাবা মায়ের কাছে থেকে যেতে এসেছে। কলকাতায় ফিরেই মাউন্ট আবুতে রওনা হয়ে যাবে। এক বছরের মধ্যে আর দেখা হবে না। তাই এক'টা দিন সোমেশ্বর আর বাইরের কাজে যাচ্ছেন না। অবশ্য ছেলে পড়ানো আর বাড়ির চিকিৎসা আছেই।

সেদিন দুপুরের পড়ানো সেরে ওপরে উঠে নিজের ঘরের দিকে আসতে আসতে দাঁড়িয়ে গেলেন। ঘরের ভিতর থেকে মা-ছেলের কথা কানে এলো হঠাৎ। ছেলের হালকা প্রশ্ন, আচ্ছা মা, বাবা চোখ-কান বুজে একধার থেকে ব্যাঙ্কে টাকা জমিয়ে যাচ্ছে খুব —না? ক'লাখ টাকা হবে?

বাসন্তীর জবাব, তা কি করে বলব, আমি কিছু খোঁজ রাখি, না জিজ্ঞেস করি।

ছেলের হাসি।—তুমি সেকেলে বলেই খবর রাখো না, এ-কালের মেয়ে হলে কড়াক্রান্তি খবর রাখত। ট্যাক্সো-ফ্যাক্সো নিয়ে আজকাল অনেক ফ্যাঁকড়া—সে-সব দিক ঠিক আছে কিনা তা-ও জানো না নিশ্চয়?

—আমার জেনে কাজ নেই—তোর মুখে লাখ টাক শুনেই ঘাবড়ে গেছি—লোকে বলতে বলে লাখো-পতি, আর তুই কিনা তোর বাবাকে তাই ভাবছিস।

ছেলের সশব্দ হাসি। তারপর জবাব।—আজকাল লাখো-পতি কোনো পতিই নয় মা। আর আমি কি বাবাকে একলাখ দু'লাখ পতি ভাবছি নাকি? তার চেয়ে বেশি—এত বছরের ধান খড় সজ্জি বেচা টাকা—কলেজের মাইনের টাকা—সব কিছুর বছর বছর ইন্টারেস্ট—তারপর প্রভিডেন্ড ফান্ড আর গ্র্যাচুইটির টাকা—খরচ বলতে তো কিছুই না, সবই তো থোকে জমা—নিজে মাছ খাওয়া পর্যন্ত ছেড়েছে—এত দিনে ছ'সাত লাখ টাকা তো হবেই, তার বেশি হওয়াই স্বাভাবিক—তবু বাবাকে তুমি এত খাটতে দাও কেন, কি হবে এত টাকা দিয়ে—আসলে টাকা জমানোটা বাবার রোগে দাঁড়িয়েছে।

সোমেশ্বর হাসিমুখেই ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, আমার রোগ তো বুঝলাম, তুই এত টাকার হিসেব নিচ্ছিস কেন—তোর চাই কিছু?

শোনা হয়ে গেছে যখন আর ঢাকতে গিয়ে লাভ কি। সমান তালে ধ্রুব জবাব দিল, আমার চাওয়ার কথা তো হচ্ছে না, কথা হচ্ছে তোমাকে নিয়ে। অনেক হয়েছে, এখন লোককে ওষুধ দিয়ে দু' আনা চার আনা আর শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে দু'টো চারটে করে টাকা ট্যাঁকে গোঁজা ছাড়ো—যেটুকু করতে ইচ্ছে করে এমনিতেই করো—অনেক হয়েছে, আর দরকার নেই।

সোমেশ্বর শুনছেন। মিটিমিটি হাসছেন—তুই আই-এ-এস অফিসার হয়েছিস আর বাবা এ-সব করছে...মানে লাগছে?

—মানে লাগতে যাবে কেন, ভালো লাগছে না। তাছাড়া সময়ে বিশ্রামও দরকার।

—আমার এ-সব করার দরকার নেই তুই জানলি কি করে?

—অমন দরকার চিরকালেও শেষ হবে না।

ছেলে তেতে উঠছে বলে সোমেশ্বর আরো মজা পাচ্ছেন। আরো তাতিয়ে দিলেন। —আচ্ছা, আমি চোখ বুজলে তুই কি-রকম পাবি আশা করিস ঠিক-ঠিক বল তো?

ধ্রুব নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল। ঝাঁঝালো জবাব দিল, আমি তোমার থেকে এক কানা-কড়িও আশা করি না—বুঝলে? তোমার যা আছে সব তুমি মাকে আর বোনেদের লিখে দিতে পারো।

—বাঁচালি। হৃষ্ট মুখে সোমেশ্বর বললেন, তোর মুখে বাবার লাখ-লাখ টাকা শুনে তোর মায়ের মতো আমিও ঘাবড়ে যাচ্ছিলাম।

—অত গলা শুকচ্ছো কেন, তোমার কিছু নেই বলতে চাও? ধ্রুবর অত রাখা-ঢাকা ভালো লাগে না।

সোমেশ্বর এবারে গম্ভীর একটু। কিন্তু চোখে হাসি চিকচিক করছে। বললেন, তা বলব কোন্ দুঃখে, আমার যা আছে খুব কম লোকের ভাগ্যে জোটে। নর-নারায়ণের কত ভালবাসা কুড়োচ্ছি ভাবতেও পারবি না।

—দেখলে মা দেখলে? ছেলে ঘুরে মাকে সালিশ মানল।—বেগতিক দেখে এখন আধ্যাত্মিক দিকে কথা ঘোরানোর চেষ্টা।

সোমেশ্বরই বললেন, আধ্যাত্মিক সম্পর্কে তোর কত জ্ঞান! যাক এবার তোর দিকেই কথা ঘোরাচ্ছি। আজ সকালে জীবন ঘোষাল এসে ধরে পড়েছিল—তার মেয়েব সঙ্গে তোব বিয়ে দিতে চায়, তুই তো দেখেছিস মেয়েটি সুশ্রীই, কলেজে পড়ছে। কি বলব?

জীবন ঘোষাল সত্যিই এসেছিলেন এবং আবেদনও জানিয়েছেন। সোমেশ্বর বলেছেন, এ ব্যাপারে তাঁর কোনো হাত নেই, সবটাই ছেলের বিবেচনা। তাকেই জিজ্ঞেস করবেন কথা দিয়েছেন। ছেলে যে কানও পাতবে না জানতেন। তবু জিজ্ঞেস করবেন কথা দিয়েছিলেন। করলেন।

ধ্রুব আঁতকেই উঠল।—জীবন ঘোষালের মেয়ে! কি বলবে আবার আমাকে জিজ্ঞেস করছ?

—বুঝলাম। তা তুই তো ট্রেনিংএ যাচ্ছিস, এদিকে মেয়েটেয়ে দুই-একটি দেখে রাখব?

ছেলে দস্তুরমতো সচকিত।—না না না—এখন এ-সব নিয়ে তোমবা একটুও মাথা ঘামাবে না!

বাসন্তী হাসিমুখে জানান দিলেন, মাথা ঘামাব না তো বলছিস—এদিকে এবারে কলকাতা থেকে ফিরে পরদিন সমস্ত দুপুর তোর ঠিকুজি নিয়ে কেটেছে—আমি জিজ্ঞেস করতে বললেন, তোমার ছেলের প্রজাপতি-নির্বন্ধ দেখছি।

মিথ্যে বলেননি। কলকাতা থেকে ফিরেই সোমেশ্বর এবারে তা-ই করেছেন। এই সামান্য কথাতেও ধ্রুব বেশ বিরক্ত।—হুঁঃ, বাবার যেমন. আমার নির্বন্ধ ওই কুষ্ঠির মধ্যে আটকে আছে?

সোমেশ্বর মুখ তুলে সোজা খানিক ছেলের দিকে চেয়ে রইলেন। এবারে শুধু চোখে নয়, ছোট-ছোট গোঁপের ফাঁক দিয়েও হাসি ঝিকমিক করছে। উঠে কাগজ কলম আর একটা নতুন খাম নিয়ে এলেন। কাগজে খসখস করে লিখে গেলেন কি। কাগজটা বেশ

করে ভাঁজ করে খামে পুরলেন। আঠা দিয়ে তেমনি যত্ন করে মুখ আটকালেন। সেই মুখে আগে নিজের নাম সই করে এই দিনের তারিখ বসালেন। তারপর খাম আর কলম ছেলের সামনে রেখে বললেন, সই করে নিচে তারিখ দে।

এ-রকমের মজার ব্যাপারে সকলেই অভ্যস্ত। বাসন্তীর কৌতূহল অদম্য। খামটা নিয়ে ধ্রুব বাবার সইয়ের নিচে বড় করে নিজের নাম সই করল। তারিখ বসিয়ে তাঁর হাতে দিল।

খামটা স্ত্রীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সোমেশ্বর বললেন, খুব যত্ন করে ট্রাঙ্কে রেখে দাও, ধ্রুবর বিয়ে ঠিক যেদিন হবে সেদিন এটা ওর হাতে দেবে। সেদিন ও খুলবে।

বাসন্তী বলে উঠলেন, বাঃ, কি হবে অতদিন আমি না জেনে বসে থাকব নাকি!

মজার ব্যাপারেও ছেলে কেন অতটা মজা পাচ্ছে না মা বুঝে উঠলেন না। প্রায় বিরক্ত মুখ করে ধ্রুব বলল, কোথায় কি ঠিক নেই, বাবা সব জেনে বসে আছে—কেবল তোমার জানতে বাকি।

ধ্রুব কোলকাতা রওনা হবার আগের দিন বিকেলে শেফালিকা এসে হাজির। শিউলি পান চিবুতে চিবুতে এসেছে। টসটসে দুই ঠোঁট। একটা কোরা লাল পেড়ে শাড়ি পরে এসেছে আজও। এই সাধারণ বেশবাসেও দিব্যি সুন্দর দেখাচ্ছিল।

দোতলার বারান্দায় দূর থেকে ওকে আসতে দেখেই সোমেশ্বর তাড়াতাড়ি ঘরে চলে এসেছেন। সেখানে ছেলে আর মা বসে। ছেলেকে বলেছেন, শিউলি আসছে, সেই কবে একদিন তুই নাকি ভালো ব্যবহার করিসনি—সে যাক, বাড়িতে সবাই অতিথি মনে রাখিস।

ধ্রুব প্রথমে অবাক একটু।—শিউলি...মানে সেই শিউলিদি? তার পরেই চোখে-মুখে বিরক্তি।—এ-বাড়ির সঙ্গে তার এখনো কি সম্পর্ক?

—কিছু না। সম্পর্ক মনের টানের। তোর মাকে দেখতে আসতে ইচ্ছে করে বলেছিল, আমি আসতে বলেছি। বিহারীকে বলেছিল আজ আসবে। বাড়ি এসে কেউ যেন অপমানিত বোধ করে দুঃখ না পায় দেখিস।

কথা শেষ হতেই বারান্দায় শেফালিকার গলা শোনা গেল।—মাসিমা কই গো—আমি শিউলি এলাম।

বাসন্তী ডাকলেন, ভিতরে আয়, এতকালের মধ্যে তোর দেখা নেই কেন? একটা মোড়া সামনে টেনে দিলেন।—বোস্।

পান খাওয়া লাল ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে শিউলি জাঁকিয়ে বসল। জবাব দিলে, তোমরা একটাবার খোঁজ নাও যে আসব—আজ সেধেই এলাম। দু'চোখ এবার খাটে বসা ধ্রুবর দিকে। ধ্রুবর দৃষ্টি জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে। শিউলি হেসে উঠল। মাসির উদ্দেশেই আবার বলল, আমার দেখা পাবে কি গো, আমাকে দেখলে সাত বছরের ছোট ভাইও কেমন মুখ ফেরায় দেখছ না?

ধ্রুবর দু'চোখ এবারে আস্তে আস্তে তার দিকে ফিরল। শিউলি এবার ওকেই বলল, কেমন? পারলি মুখ ফিরিয়ে থাকতে? আমি বলে আজ তোকেই দেখতে ছুটে এলাম —বিহারী কাল বলল, খোকাদাদা আবার একটা জব্বর পাস দিয়েছে, কাগজে ছবি

বেরিয়েছে, হাকিম না কিসের চাকরি হবে এবার—শুনে আমার তাক লেগে গেল। সেদিনের সেই ছোট্ট ধ্রুবর এত কেরামতি! আবার শুনলাম, শীগগির চলে যাবি আর না এসে পারি? মেসোমশায়, কাগজখানা আছে তো? কেমন ছবি বেরুলো আমাকে দেখান একবার।

সোমেশ্বর হাসিমুখেই দেরাজ টেনে পুরনো কাগজটা বার করলেন। এবারে ধ্রুব হেসেই বলল, আমি সামনে বসে আছি, তবু কাগজের ছবি দেখতে হবে?

—হবে না! আমি কি কখনো কোনো চেনা লোকের ছবি কাগজে দেখেছি? সাগ্রহে শিউলি কাগজটা নিল। তারপরেই সুন্দর মুখ কুঁচকে ফেলল।—এ মা, এমন মিষ্টি মুখখানা তোর এ কি ছাইয়ের ছবি! কাগজটা সোমেশ্বরকে ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল, যাক, তুই গাঁয়ের মুখ উজ্জ্বল করলি—হবে না কেন, কার ছেলে দেখতে হবে তো!

সোমেশ্বর বললেন, তোর যেমন বুদ্ধি—লোকে ওকে কার ছেলে বলবে—না আমাকে কার বাপ বলবে?

— হুঁঃ বললেই হলো! শেফালিকার সাদাসাপটা জবাব।—গাছের ফল না ফলের গাছ —ফল যত বড় গাছেরই তত কদর।

আর কিছু না, এমন অন্তরঙ্গ হাব-ভাবই ধ্রুবর ভালো লাগছিল না। হালকা শ্লেষের সুরে বলল, চাটুকলায় মাথাখানা তো বেশ সাফ দেখছি।

—কি বললি—মেসোমশাইকে চাটুকথায় ভোলাবো? বাপকে খুব চিনেছিস তাহলে।

—বাবার ভোলার কথা তো বলিনি—তোমার কথা বলছি।

—তা বেশ করব বলব, তুই যত বড় মানুষই হোস তোর থেকে কি আশা? এত নাম ডাকের একজন হয়ে গেলি, গরিব দিদিকে একখানা শাড়ি হাতে দেবার কথা ভেবেছিস?

ধ্রুবর বিরক্তই লাগছিল। কিছু বলার আগে বাবার কথা শুনে আরো বিরক্ত। বাবা তাড়াতাড়ি বলে বসলেন, ভেবেছে কি ভাবেনি নিজেই দেখবি আর জব্দ হবি। হাসিমুখে বাসন্তীর দিকে ফিরলেন।—কই গো, ওর শাড়িখানা বার করো।

শিউলি এত অবাক আর এত খুশি যে ধ্রুবর দিকে চোখ নেই, ঘুরে মাসির দেরাজ খোলা দেখছে। রাগে ধ্রুবর মুখ মুহূর্তে রক্তবর্ণ। তার ধারণা, মাকে দেওয়া গরদখানাই বাবা দিয়ে দিতে বলছে। কিন্তু তারপরই অপ্রস্তুত একটু। না, সেই শাড়ি নয়। চওড়া লাল জরি-পাড় ফরাসডাঙার দামী শাড়িই একখানা. ভাবল, তাহলেও মায়ের একখানা ভালো নতুন শাড়ি খসল।

শাড়িটা হাতে নিয়ে শিউলি আনন্দে আটখানা। বিশ্বাস করতে পারছে না এমন শাড়িখানা সত্যি তার। ধ্রুবকে বলল, ভাই রে, দিদি একটা আকাট মুখ্যু, ক্ষমা করে ফেল —তুই রাজা হ।

'রাজা হ' শুনে বাবা-মায়ের আনন্দবিগলিত মুখ দেখে ধ্রুবর ভেতরটা আরো বেশি তিক্ত হয়ে উঠল। খাট থেকে নেমে এলো। বলল, আমি রাজা হই না হই, তোমার ভাগ্যখানা আজ ভালোই দেখছি।

ঘর ছেড়ে চলে গেল। শিউলি শাড়ি পাওয়ার আনন্দে উজ্জ্বল। কি বলল তা নিয়ে মাথা ঘামালো না।

আরো ঘণ্টা দুই থেকে দিব্যি করে খেয়ে আর আরো খাবার ছাঁদা বেঁধে নিয়ে শাড়ি হাতে শিউলি চলে গেল। যাবার আগে খোঁজাখুঁজি করেও ধ্রুবর দেখা পেল না। সোমেশ্বর জানালেন, কাল চলে যাচ্ছে, হয়তো দেখাসাক্ষাৎ সারতে বেরিয়েছে।

ধ্রুব কোথাও যায়নি। ওদিকে দালানে চুপচাপ বসে ছিল। শিউলি চলে যেতে উঠে আবার বাবা মায়ের ঘরে এলো। মুখ দেখলেই বোঝা যায় রেগে আছে। বাবাকে বলল, মায়ের অমন একখানা নতুন শাড়ি দান করে ভালোই নাম কিনলে।

সোমেশ্বর অবাক।—মায়ের শাড়ি কি রকম? কাল বিহারী বলল, খোকাদাদার পাশের খবর শুনে শিউলিদিদির খুব আনন্দ—আজ আসতে পারে। তাই ওর জন্যেই তো কিনে আনলাম, কত খুশী হল দ্যাখ তো!

তা সত্ত্বেও ধ্রুব তেতে উঠল।—কিনে এনে দিলে তো নিজের নামে দিলে না কেন? আমার নামে কেন?

—তোকে খোঁটা দিল, তাই। কিন্তু তোদের মনের স্বাস্থ্য আজকাল কি হয়েছে রে...এই সামান্য ব্যাপারে রাগের কি আছে?

—রাগের আছে, কারণ আমার ভালো লাগেনি। আমি কেন ওকে শাড়ি দিতে যাব?

—না দেবার কি হল, দেবার মতো আর কে আছে ওর?

ধ্রুবর বিরক্তি বাড়ছেই।—আছে কি নেই তুমি কতটা খবর রাখো? না থাকলে এমন বহাল তবিয়তে চলছে কি করে? এক পয়সা রোজগার নেই বলাই কুশারির, তার অত নেশার টাকাই বা আসছে কোত্থেকে?

এবারে বাসন্তী বলে উঠলেন, সামান্য ব্যাপারে কি যে তর্ক তুলিস তুই বুঝি না।

সোমেশ্বরও গম্ভীর একটু।—কি করে চলে আমি কিছুটা জানি।...সেটাও ভালো রাস্তা নয় একটুও, কিন্তু তোরা যা জানিস তার থেকে ভালো। আর তা না হলেই বা কি, ভালোভাবে বেঁচে থাকার মতো আমি কিছু করতে পারছি যে নিন্দে করব...। একদিন যাকে দিদি বলে ডেকেছিস তাকে তলিয়ে যেতে দেখলেও তোর দুঃখের থেকে রাগ বেশি হবে কেন? একটা কথা জেনে রাখিস রে বাবা, লোককে ভালবাসলে তবে বিচারের অধিকার—তা না হলে বিচার হয় না, শত্রুতা হতে পারে।

কথাগুলো মনে গেঁথে থাকার মতো বটে। ধ্রুব মনে মনে অপ্রস্তুত একটু। তবু শিউলিদিদির সম্পর্কে যা শুনে আসছে সেটা খুব মিথ্যে ভাবতে পারছে না। অবশ্য বাবার কথা শুনে একটু কৌতূহল হয়েছে। সে-প্রসঙ্গ বাতিল করে মায়ের দিকে চেয়ে হাসল একটু। বলল, মা, ছেলেবেলায় মিথ্যে বলার জন্য তুমি একবার আমাকে মারতে এসেছিলে—বাবা তখন মিথ্যে কেন বলব না তাই নিয়ে আমাকে দারুণ একখানা লেকচার দিয়েছিল মনে আছে?...কিন্তু দরকার পড়লে বাবা নিজে দিব্যি মিথ্যে কথা বলে ফেলে।

সোমেশ্বর হাসিমুখেই ভ্রূকুটি করলেন।—কি রকম?

—এই শিউলিদির ব্যাপারেই ধরো। আজ নিজে শাড়ি দিয়ে স্রেফ আমি দিয়েছি বুঝিয়ে দিলে। তার থেকেও বড় মিথ্যে কথা বলেছিলে তার মাসতুতো দাদা জীবন ঘোষালকে। শিউলিদিকে তিনদিন নিজের কাছে রেখে বোঝালে সেই সন্ধ্যায় দু'জনে তোমার কাছে এসেছে।

সোমেশ্বর হাসতে লাগলেন। বললেন, সংস্কৃতর জোরে আই-এ-এস পর্যন্ত উতরে

গেলি—কিন্তু কিছুই শিখিসনি। সঙ্গে সঙ্গে শ্লোকঃ

'ন নর্মবাক্যং বচনং হিনস্তি, ন স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহকালে।
প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে, পঞ্চানৃতং স্যাদ ঋতমেব শশ্বৎ।।'

মজার কথায়, নারীদের সঙ্গে আলাপে, বিবাহের কথায়, প্রাণ সংশয়কালে বা সর্বস্ব অপহরণ হচ্ছে এমন কালে কোনো মিথ্যাই মিথ্যা নয়—এই মিথ্যা চিরসত্যের সম্মান পাবে।

ঘরের বাতাস মুহূর্তে তরল।

বিহারী বাড়ির লোকের মতোই যখন খুশি খোকাদাদার ঘরে আসে, বসে কথা বলে। খাওয়াদাওয়ার পরে সেই রাতে এসে ওর নিজের আনন্দ প্রকাশ করল। বলল, শিউলিদিদি কত খুশি খোকাদাদা, আমাকে তোমার শাড়ি দেখালো, বলল—যেমন বাবা তেমনি তার ছেলের মন, আমাকে কেমন শাড়ি দিয়েছে দেখ। খুব ভালো করেছ তুমি খোকাদাদা—আ-হা, শিউলি দিদিমণি কি ভালো।

বিহারীকে ছেলেবেলা থেকে ওরাও বিহারীদাদাই বলে। মন বোঝার জন্য ধ্রুব তক্ষুণি প্রতিবাদ করল।—লোকে তো বলে শিউলিদি এই বয়সেও হাড়বজ্জাত মেয়ে।

বিহারী রেগেই গেল।—বলবে না! এত বয়সে অমন সুন্দর ক'জন হয়? যাদের গরম লোহার ডাণ্ডার ভয়ে পালাতে হয় তারা বলবে না? শিউলিদিদি খুব ভালো মেয়ে।

লোহার ডাণ্ডার ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হল না। ধ্রুব টিপ্পনীর সুরে বলল, ওর স্বামী তো দিন-রাত নেশা করে, তোমার ভালো মেয়ের দিন চলে কি করে?

বিহারী স্বীকার করল, সেটা অবশ্য ভালো কাজ না। শিউলিদিদি ঘরে নেশার জিনিস বানায়, মহুয়ার জিনিস, দারু, তা ছাড়া আরো শুকনো কি-সব। খদ্দের এসে নিয়ে যায়। কি-চ্ছু ভালো কাজ না, কিন্তু শিউলিদিদি কি করবে—পেট তো চালাতে হবে।

...শিউলিদির ঘরে অনেক রকম লোকের যাওয়া-আসা এ তারা অনেক দিন ধরেই শুনে আসছে। সেটা যে এই জন্য, কল্পনার মধ্যেও ছিল না। কি করে চলে জানার পরেও ভেতরটা তেতেই থাকল। জীবন ঘোযাল লোক ভালো নয় জানে, কিন্তু আশ্রয় তো দিয়েছিল। সেই ঘর না ছাড়লে এই অবস্থা তো হত না। বলাই কুশারির সঙ্গে বাবার শিউলিদির ও-ভাবে বিয়ে দেওয়াটা ধ্রুব এখনো সমর্থন করে না।

## নয়

একটা বছর দেখতে দেখতে ঘুরে গেল। ধ্রুব চ্যাটার্জীর ট্রেনিং পর্ব শেষ হয়েছে। বীরভূম জেলায় পোস্টিং পেয়েছে। শিউড়ির এস-ডি-ও। কাছেই। জিপ পেয়েছে একটা। তাতে বাড়ি আসা কয়েক ঘন্টার পথ মাত্র। ও-সব জায়গায় এস-ডি-ও'র অঢেল প্রতিপত্তি। নিজের কোয়ার্টারস পেয়েছে।

অফিসের দিনে নিজের মর্জিমতো জিপ হাঁকিয়ে বাড়ি চলে আসে। কয়েক ঘন্টা থেকে আবার চলে যায়। কিন্তু ছুটির দিনের বেশির ভাগ তাকে কলকাতায় ছুটতে হয়। বাসন্তী এক-একদিন জিজ্ঞেস করেন, ছুটির দিনেই তোর কলকাতায় এত কি কাজ পড়ে—এক-আধ রাত তো থাকতেও পারিস।

গম্ভীর মুখে সোমেশ্বর বললেন, কাজ পড়ে গেলে কি করা যাবে।

এই এক বছরে ধ্রুব বাবার কিছু মতির পরিবর্তন দেখল। পাঁচ বিঘে সেই ভালো ধানী-জমি হরিহর ঘোষকে বেচে দেওয়া হয়েছে। অত লাভের জমি বাবা ছাড়তে পারে ভাবেনি। হরিহর ঘোষের সঙ্গে ধ্রুবর একদিন দেখা হয়েছিল। জমি কেনা-বেচার খবরটা তিনিই দিয়েছেন, বাবা নয়। বলেছিলেন, তোমার বাবার মতিগতি ভালো না, জমিজমা শেষ পর্যন্ত থাকবে মনে হয় না। আমার কাছে পাঁচ বিঘে বেচেছেন, আরো পাঁচ বিঘে কেনার জন্য তাঁর কাছে লোকে ঘুরঘুর করছে দেখছি। বেচেই দেন যদি আমিই আছি —কিন্তু হঠাৎ এত টাকার দরকার হয়ে পড়ল কেন?

বাবাকে এই লোক কোনোদিন সুনজরে দেখেন না জানে। পাঁচ বিঘে জমি বেচে দেওয়া হয়েছে, আরো পাঁচ বিঘে বেচে দিতে পারে শুনে ধ্রুব অবাকই হয়েছিল। জিজ্ঞেস করতে বাবা নির্বিকার।—কি হবে, আমার পরে তুই কাজ ছেড়ে এসে জমি চাষ করাবি?

এটা অবশ্য ঠিক কথা। ধ্রুব হেসে বলেছিল, তাই বলো, হরিকাকার কথা শুনে ভাবছিলাম হঠাৎ তোমার এত কি টাকার দরকার হল। যাক, টাকাকড়ি সব এক ব্যাঙ্কে রেখো না।

মুচকি হেসে সোমেশ্বর বলেছিলেন, খুব ভালো ব্যাঙ্কেই রাখছি, কিছু জানিস না —কিন্তু তোর কিছু প্রত্যাশা নেই তো?

ধ্রুব সঙ্গে সঙ্গে অভিমানাহত। বলেছিল, তোমার আশীর্বাদে ভবিষ্যতে আমার অনেক হবে—আমার কিছুই চাই নে।

এখন ছেলে বাড়ি এলেই বাসন্তী বিয়ের তাগিদ দেন। ধ্রুব পাশ কাটায়। মেয়ে দেখাব নাম করলে তেতে উঠে নিষেধ করে। একদিন হঠাৎ বলে বসল, তোমাদের ইচ্ছেমতোই আমাকে বিয়ে করতে হবে?

বাসন্তী অপ্রস্তুত।—তা তুই নিজে পছন্দ করেই না-হয় কর না।

সোমেশ্বর গম্ভীর মন্তব্য করলেন, আমার বাবাও সেই দিনে বিয়ের আগে আমার মতামত জিজ্ঞেস করেছিলেন। এখন তো দিন অনেক বদলে গেছে।

রাগ করার কথা নয়, অথচ ধ্রুব তেতে উঠল।—বদলে গেলেও হিমুর বিয়ে তুমি নিজের ইচ্ছেয় দিয়েছিলে, কারো মতামতের ধার ধারোনি।

সোমেশ্বর আলতো করে জিজ্ঞেস করলেন, ধারিনি বলে হিমু কি অসুখী হয়েছে?

জবাব না দিয়ে ধ্রুব গুম হয়ে বসে রইল।

সোমেশ্বর বললেন, যাক, তুই তো ফাঁক পেলে কলকাতায় ছোটাছুটি করেই অস্থির। তোর মা ভাবছে, বিয়ের চিন্তা করার তোর সময়ই নেই—তার দোষ কি?

বাবার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যাতে ছেলে তাঁর দিকে না তাকিয়ে পারল না।

ঈষৎ তির্যক গলায় সোমেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, বুঝলি না?

—কি বুঝব?

সোমেশ্বর গম্ভীর। স্ত্রীকে বললেন, ওকে বিয়ের প্রসঙ্গে কিছু লিখে যে খাম বন্ধ করে দু'জনেই সই করেছিলাম সেই খামটা এনে ওকে দাও।

এ ক'বছরে মা কেন ছেলেরও খামটার কথা মনে ছিল না। বাসন্তী তাড়াতাড়ি

বাক্স খুলে সেই মুখ-বন্ধ খাম বার করলেন। ছেলেও কম উৎসুক নয়। মায়ের কাছ থেকে খামটা নিয়ে তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে কাগজটা বার করল। পড়তে পড়তে মুখ লাল। সেই সঙ্গে বিস্ময়েরও সীমা-পরিসীমা নেই।

সোমেশ্বর হাসছেন মিটিমিটি। বাসন্তী ছোঁ মেরে ছেলের হাত থেকে কাগজটা নিলেন, পড়ে তিনিও তাজ্জব, বিমূঢ়।

'—কলকাতায় তোর বড়মামা আর মামীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শুনলাম বিবেকানন্দ রোড থেকে সপ্তাহে তিন-চারদিন তুই ভবানীপুরে মামা-মামীর খোঁজ নিতে আসিস। কিন্তু তোর নিজের বোনেদের কাছে তার আগে শুনেছিলাম মাসে গড়ে একদিনও তাদের সঙ্গে দেখা করার তোর সময় হয় না। ব্যাপারটা তখনই বোঝা গেছল।...তোর মামার বাড়িতে মেয়েটিকেও আমি দেখেছি, আমার অপছন্দ হয়নি। বাড়ি ফিরে তোর ঠিকুজি খুব ভালো করে দেখলাম, আর পাঁচজনের মতো সাদাসিধে বিয়ে নেই তোর। যাক, আমার দিক থেকে বলতে পাবি বিধবা-বিবাহ আমি অশাস্ত্রীয় মনে করি না।—সোমেশ্বর।'

ধ্রুব তাড়াতাড়ি উঠে এসে বাবার পায়ের ধুলো মাথায় নিল। বাসন্তী তখনো হতভম্ব। বলে উঠলেন, বৌদির বড় বোনের মেয়ে মাধুরী?

সোমেশ্বব হাসছেন।—হ্যাঁ. এক বাড়ির ওপর-তলা নিচ-তলার ভাড়াটে তারা জানোই তো।...মেয়েটি তখন এম. এ. পড়ছিল শুনেছি—পাস করেছে?

শেষের প্রশ্ন ছেলেকে। সে মাথা নেড়ে সায় দিল।

সেই মেয়ের দুর্ভাগ্যের খবব বাসন্তীরও জানা। তারও হায়ার সেকেন্ডারি পাসের পর বিয়ে হয়েছিল। ছ'মাস না যেতে ওর স্বামী ক্যানসারে মারা যায়। বউদির মুখে শুনে বাসন্তীরও কত দুঃখ হয়েছিল ঠিক নেই। কিন্তু সেই মেয়ে এখন নিজের ঘরে বউ হয়ে আসছে জেনে হঠাৎ একটু স্তব্ধ তিনি।

সোমেশ্বর হেসেই স্ত্রীকে বললেন, এখন ছুটির দিন পড়লেই ওর কলকাতায় এত কি কাজ বুঝতে পেরেছ?

বাসন্তী তবু সহজ হতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি অন্য ঘরে চলে এলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুবও।—মা, তুমি একটুও খুশি হলে না তো?

বাসন্তী জবাব দিলেন, তুই খুশি হলেই হল, সুখী হলেই হল।

আহত মুখে ছেলে বলল, আমার ভয়ানক দুশ্চিন্তা ছিল বাবাকে নিয়ে, তখন আশা করতাম সব জানার পর তুমিই আমাব হয়ে বাবাকে বোঝাবে—

—তোর বাবাকে কাউকে বোঝাতে হয় না বাবা, তাঁর মত তো পেয়েইছিস।

—কিন্তু তোমার মত তো পাচ্ছি না।

—আমি হঠাৎ শুনে একটু নাড়াচাড়া খেয়েছিলাম, নইলে তাঁর থেকে বেশি চাওয়ার আমার কিছু নেই।

যা বললেন না সেটা অন্য কথা। তিনি আশা করেছিলেন, ছেলে যত বড়ই হোক, এই বংশের মর্যাদা সব থেকে বড় করে দেখবে। তিনি একদিন যেমন বউ হয়ে এসেছিলেন, ছেলেরও তেমনি কেউ আসবে। বংশমর্যাদার কথা শুনে তারও গর্ব হবে, সেই চোখে শ্বশুরকে দেখবে, সেবা করবে। অবশ্য ছেলে বাইরে বাইরে থাকবে, তাই

যে আসবে তার তফাৎ কিছু হবেই। তবু একটা নাড়ির যোগ গড়ে উঠবে এটুকু আশা তাঁর ছিলই। যে জন্যেই হোক, এখন মনে হল তা আর হবে না—ছেলের বউ শুধু ছেলেরই বউ।

এই এক সমস্যা নিয়ে গত দুটো বছর দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না ধ্রুবর। তার সমাধান এমন অবলীলায় হয়ে যাবে কল্পনার বাইরে। বাবাকে সামনে রেখে এই এক ব্যাপার নিয়ে এযাবৎ অনেক কাল্পনিক বিবাদের মোহড়া দিয়েছে সে। কিন্তু বলি-বলি করেও মুখ ফুটে বলে উঠতে পারেনি। বাবা বরাবরই তাঁর নিজের মতে অনড় জানে। বড়দির বিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো দিয়েছেন। হিমুর বিয়ের ব্যাপারেও কারো মতামতের ধার ধারেননি। বাধা দিতে গিয়েও ধ্রুবকে পিছু হটতে হয়েছে। হিমুর থেকেও বন্ধু প্রশান্তর জন্য তার বেশি দুঃখ হয়েছিল। প্রশান্ত এম. এ. পড়লই না আর। কিছুদিন কলকাতার দুই-একটা বড় ক্লাবে খেলা নিয়ে মেতে রইল। তারপর কোথায় চলে গেল বা তার কি হল ধ্রুব কিছু জানেই না। কত বছরের মধ্যে আর দেখাও হয় না।

বাবার চরিত্রের এই অটল দিকটা ধ্রুব গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছু ভাবে না বা ভাবত না। এ-কথা সত্যি হিমু আজ অসুখী নয়। অবস্থার সঙ্গে মেয়েদের মানিয়ে নিতেই হয়। বুদ্ধিমতীর মতো হিমু মানিয়েই নিয়েছে। তাছাড়া হিমু তখন নেহাতই ছোট ছিল। প্রশান্তকে ওর ভালো লাগত ঠিকই, কিন্তু মন সঁপে দেবার মতো কিছু হয়নি। ভালো লাগার শুরুর সঙ্গে সঙ্গে শেষও এগিয়ে এসেছে। কিন্তু ধ্রুবর বেলায় তা নয়। যে অব্যর্থ আকর্ষণে দিনে দিনে এক মেয়ের দিকে সে এগিয়ে গেছে সেটা রূপের আকর্ষণ নয়, গুণেরও নয়। অবশ্য মাধুরীর রূপ কিছু আর গুণ কিছু না থাকলে মনে ধরত কিনা সেই আত্মবিশ্লেষণের মধ্যে ধ্রুব ঢোকেনি। কিন্তু রূপ আর গুণই যদি নির্বন্ধের হেতু হত, তাহলে রূপের পাল্লায় বা গুণের পাল্লায় এই মেয়েব ওজন এমন কিছু ভারী নয়। আই-এ-এস উৎরনো ছেলে মাধুরীর থেকে ঢের বেশি রূপসী আর গুণবতীর নাগাল পেত। যে আবেগ তাকে ওই মেয়ের দিকে টেনে নিয়ে গেছে সেটা ঠুনকো কিছু নয়। ওই আবেগের উৎস ধ্রুবর নিজের চরিত্র—চরিত্রবল। চরিত্রের এই অনমিত ধারাটি বংশগত। ঠাকুরদা সিদ্ধেশ্বর চাটুজ্জের একরকম, বাবা সোমেশ্বর চাটুজ্জের একরকম, ছেলে ধ্রুব চাটুজ্জের একরকম। এমনিতে কারো সঙ্গে কারো মিল নেই—মিল সঙ্কল্পে, মিল নিজের বিচার-বিবেচনার ওপর আস্থায়। এ-ভাবে জড়িয়ে পড়ার আগে বা পরেও ধ্রুব চাটুজ্জে তার বাবার কথা ভাবেনি এমন নয়। বরং সব থেকে বেশি ভেবেছে। ধরেই নিয়েছে বাবা আঘাত পাবেন, নিজের সংস্কারের সঙ্গে আপোস করবেন না। সেটাই এতদিন পর্যন্ত তার ভিতরের সব থেকে বড় অশান্তির কারণ ছিল। বাবার কাছ থেকে তফাৎ যদি হতেই হয়, সেটা কত মোলায়েম ভাবে সহজ করে নেওয়া যায়, তাঁর মুখোমুখি বসে কথা বলে তাঁর আঘাত কতটা উপশম করা যায় ধ্রুব ইদানীং এ চিন্তাই বেশি করত। কিন্তু তা বলে একবারও ভাবত না নিজে সে অন্যায় কিছু করতে যাচ্ছে। বরং পিছিয়ে এলেই অন্যায় হত, তার বিবেক তাকে কাপুরুষ বলত।

...কলকাতায় এম. এ. পড়ার সময়ও ধ্রুবর বড়মামা পিনাকী চক্রবর্তীর বাড়িতে খুব

একটা যাতায়াত ছিল না। কোনো উপলক্ষ থাকলে বড়মামী তাকে চিঠি দিতেন, তখন যেত। না ডাকলে ছেলে আসে না, বড়মামী এ রকম অনুযোগও করতেন। ওর থেকে বোনেদের বরং যাতায়াত বেশি ছিল। দুই বোনেরই শ্বশুরবাড়ি দক্ষিণ কলকাতায়, বড়মামার বাড়িও। ধ্রুবর হস্টেল উত্তর কলকাতায়। ন'মাসে ছ'মাসে এলেও মাধুরী নামে কোনো মেয়েকে চোখেও দেখেনি। বড়মামার এক ভায়রা নিচের তলার ফ্ল্যাটে থাকেন এ অবশ্য জানা ছিল। আর, একদিন হিমুর বাড়িতে গিয়ে শুনেছিল, বড়মামীর মন ভীষণ খারাপ, বিয়ের ছ'মাসের মধ্যে মাধুরী বিধবা হল—

খারাপ খবর শুনে ধ্রুব জিজ্ঞেস করেছিল, মাধুরী কে?

—ও মা, বড়মামীর দিদির মেয়ে মাধুরী, নিচের তলায় বড়মামীর দিদি থাকে না! তার মেয়ে...আমারই বয়সী হবে। বেশ মিষ্টি মেয়েটা, সেদিন দেখে এমন দুঃখ হল।

হিমুর মন খারাপ হওয়াই স্বাভাবিক। ওরও তখন সবে সাত-আট মাস বিয়ে হয়েছে। এরই মধ্যে আর এক মেয়ের এমন সর্বস্ব খোয়ানোর মন্দ কপাল—সেই কপালের কথা ভেবে হিমুর গা শিউরে উঠেছিল।

যাক, কমপিটিটিভ পরীক্ষায় পাস করে ব্যাঙ্কের চাকরিতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুব ঠিক করেছিল আই-এ-এস পরীক্ষা দেবে। কিন্তু নতুন হলেও ব্যাঙ্কের খাটুনির খবর রাখে। আই-এ-এস-এ বসার মতো প্রস্তুত হওয়ার সময় পাওয়া শক্ত। তাই ঠিক করল, তাড়াহুড়ো না করে দু'বছরের মাথায় তৈরি হয়ে আই-এ-এস পরীক্ষায় বসবে। দু'বছর বয়েস যখন আছে, আদা-জল খেয়েই লাগবে। সামনের বারে পরীক্ষা দিয়ে বিফল হতে রাজী নয়।

মন স্থির করার পরে এই বড়মামাটির কথা মনে হয়েছে তার। বড়মামা এখন তাঁর কলেজে ইংরেজির হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট। য়ুনিভার্সিটির এম. এ.-র ছাত্ররাও বাড়িতে তাঁর কাছে পড়তে আসে। মোট কথা ইংরেজিতে বড়মামার নামডাক খুব।

আর ধ্রুবর যেটুকু দুর্বলতা তা ওই ইংরেজিতেই। কাঁচা বলা যায় না, আবার নিশ্চিন্ত থাকার মতো পাকাও বলা যায় না। ব্যাঙ্কিং পরীক্ষায় ইংরেজির জন্যেই সকলের ওপর টেক্কা দিয়ে উঠতে পারেনি। লম্বা দু'বছর সময় আছে হাতে. এর মধ্যে সপ্তাহে একদিন বড়মামার সাহায্য পেলে ইংরেজির জন্যেও ভাবনা থাকবে না ধরে নিল। ফোনে প্রস্তাব পেশ করতেই বড়মামার আন্তরিক সায় মিলল। তিনি বললেন, এখন তাহলে মাঝেসাজে তোর মুখ দেখা যাবে, সামনের রোববারেই আয়—আই-এ- এস-এর ইংরেজি প্রশ্নটশ্নগুলো কি রকম হয় জেনে আসিস।

ধ্রুবর জানাই ছিল, আর গত কয়েক বছরের প্রশ্নপত্রও যোগাড় করেছিল। এলো।

সেই দিনই মাধুরীর সঙ্গে প্রথম দেখা। সেই প্রথম দেখায় ধ্রুবর ভিতরে মোচড় যেটুকু পড়েছিল তাতে প্রণয়ের ছিটেফোঁটাও সম্পর্ক ছিল না। এই বয়সে এমন একটা মেয়ের আশা আনন্দ ঘুচে গেছে থেকে থেকে এটুকুই শুধু মনে হয়েছিল। হিমু বলেছিল দেখলে দুঃখ হয়। মাধুরীকে সামনাসামনি দেখে সেটুকুই অনুভব করেছিল।

ধ্রুবকে সঙ্গে করে বড়মামী খুশিমুখে বড়মামার ঘরে ঢুকেছেন। হালকা টিপ্পনীর সুরে বলেছেন, তোমার ভাগ্নে এসেছে—এবার থেকে তাহলে ও মামার বাড়ির পথ একটু-আধটু চিনবে।

ধ্রুব হাসিমুখে মামার পায়ের ধুলো নিল। তাঁর সামনে মুখোমুখি বসে এক মেয়ে মাথা নীচু করে খাতায় লিখছিল কিছু। টেবিলে দুটো খোলা বই। মুখ তুলে ধ্রুবকে দেখল একবার। তারপর বই দুটো আর খাতা নিয়ে আস্তে ওঠার উপক্রম করল। তার আগেই পিনাকী চক্রবর্তী বললেন, উঠছিস কেন, লেখাটা শেষ করে দেখিয়ে যা—

ধ্রুব তখনো জানে না এ-ই মাধুরী। মামার কথায় মুখে দ্বিধাভাব লক্ষ্য করল। মামার কথায় মামীও বললেন, ধ্রুবকে দেখে তোর উঠে যাবার কি হল—হিমুর দাদা। পরেরটুকু ধ্রুবর উদ্দেশ্যে।—আমার দিদির মেয়ে মাধুরী, দিদি নিচের তলায় ফ্ল্যাটে থাকে জানিস তো...হিমু এলে বেশির ভাগ সময় মাধুরীর সঙ্গেই গল্প করে কাটিয়ে যায়।

এই বয়সের সৌজন্যে ধ্রুবর হাত তুলে একটা নমস্কার সেরে ফেলার কথা। কিন্তু মামা-মামীর অন্তরঙ্গতার দরুন হোক বা পরিচয় শোনামাত্র ভিতরে একটু মোচড় পড়ার দরুন হোক, ধ্রুবর দু'হাত কপালের দিকে উঠতে গিয়েও উঠল না। মাধুরীর ঠাণ্ডা দু'চোখ আবার ওর মুখের দিকে উঠে সামনের বই খাতার দিকে নেমে এলো।

প্রথমেই ধ্রুবর মনে হল, মেয়েটি সুশ্রী কিন্তু বেশ গম্ভীরও। এর সঙ্গে দুর্ভাগ্যের যোগটাই মনে পড়া স্বাভাবিক। ভালো স্বাস্থ্য, মাঝপিঠ পর্যন্ত ছড়ানো চুল। চাউনি নির্লিপ্ত গোছের ঠাণ্ডা। পরনে ছ'সাত আঙুল চওড়া খয়েরিপাড় পাতলা সাদা জমিনের শাড়ি। গায়ে সাদা ব্লাউস। সামনে বসে থাকলেও নির্লিপ্ত গোছের একটু ব্যবধানের অনুভূতিই বড় হয়ে ওঠে। অথচ এই বেশবাস খারাপ একটুও লাগে না।

বড়মামী আবার জানান দিলেন, মাধুরীও এবার বি. এ. পরীক্ষাটা দিয়ে ফেলার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, তাই ওকে না পড়িয়ে মেসোর পার নেই। মাধুরীর দিকে ফিরলেন, আমাদের ধ্রুবও দারুণ ভালো ছাত্র জানিস তো—পরীক্ষা দিয়ে একবারে ব্যাঙ্কের অফিসার হয়েছে—এখন আই-এ-এস দেবার ইচ্ছে।

দারুণ ভালো ছাত্রও তার মামার সাহায্যের আশা করে এমন একটু গর্ব মামীর থাকা অস্বাভাবিক নয়। জবাবে মাধুরী আর একবার শুধু তাকালো। ধ্রুবর মনে হল, ওঠার জন্য উসখুস করছে।

কিন্তু মামীর কথার জের ধরেই মামার মনে পড়ল কিছু। মাধুরীকেই বললেন, তুই যে পাসে পলিটিক্যাল সায়েন্সের পেপারগুলো একটু দেখিয়ে দেবার লোকের কথা বলছিলি ধ্রুবই তো পারে বোধহয়। ভাগ্নের দিকে ফিরলেন, কি রে, তুই তো ইকনমিক্সের দিগ্‌গজ, পোলিটিক্যাল সায়েন্স একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পারবি না?

প্রস্তাব শুনে ধ্রুব সাগ্রহে জবাব দিল, পাসের পোলিটিক্যাল সায়েন্স জলভাত ব্যাপার, অনায়াসে পারব।

...ঠিক তক্ষুনি না হোক, মামার বাড়ি থেকে মেসে ফেরার সময় ধ্রুবর একটা কথা মনে হয়েছিল। মাধুরীকে ওই পাসের পেপার দেখিয়ে শুনিয়ে দেবার ব্যাপারে হয়তো একটু বেশি আগ্রহ দেখিয়ে ফেলেছে। এ-রকম মনে হওয়ার কারণ তার কথা শুনে মামা-মামী দুজনেই খুশি। কিন্তু মাধুরীর মুখে খুশি-অখুশির কোনো অভিব্যক্তি চোখে পড়েনি। ধ্রুব এ-ও ধ্রুবসত্য জানে, তার পড়ানোর আগ্রহের সঙ্গে হিমুকে প্রশান্তর ইংরেজি পড়ানোর আগ্রহের কিছুমাত্র মিল নেই। ধ্রুবর আগ্রহ দরদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই বয়সের মেয়ে অতবড় দুর্ভাগ্যের সঙ্গে যুঝে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্যে তৈরি হচ্ছে

—তাকে সাহায্য করার আগ্রহ সকলেরই হওয়া স্বাভাবিক।

যাক, ধ্রুবর কথায় খুশিমুখে মামী রসিকতা করলেন, তবে তো নিশ্চিন্ত, তোর মামাকে তাহলে তোকে আর টিউশন ফী দিতে হবে না—কাটাকাটি হয়ে গেল।

অর্থাৎ মামা ভাগ্নেকে সাহায্য করবে, আর তার বদলে ভাগ্নে মামীর বোনঝিকে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে।

ধ্রুব এবারে সোজা মাধুরীকেই জিজ্ঞেস করল, আপনার কোন্ সাবজেক্টে অনার্স?

তার দিকে না তাকিয়ে মাধুরী জবাব দিল, হিস্টরি।

মামী বলে উঠলেন, তুই ওকে আপনি-আপনি করছিস কি রে—হিমুর বয়সী বললাম না! বোনঝির দিকে ফিরলেন, তুই এক কাজ কর্ তো মাধু, আমি মাথায় তেল মেখে ফেলেছি, চানটা সেরে আসি—তোর লেখা হয়ে গেলে ধ্রুবকে এক পেয়ালা চা করে দে, আর মিটসেফে মিষ্টি আছে, বের করে দিস।

মামী চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাধুরীও উঠল। মামা আর লেখা শেষ করার কথা বললেন না। ধ্রুব কি সাহায্য চায় সেই প্রসঙ্গ উঠল। ইংরেজি তার কোনো স্পেশাল পেপার নয়—জেনারেল পেপারের জন্য এসে, প্রেসি ইত্যাদিতে হাত পাকানো দরকার।

এই আলোচনার ফাঁকে মাধুরী এসে চা আর খাবারের প্লেট টেবিলে রেখে মামাকে বলল, একটু আগে দুধ খেয়েছ, তোমাকে আর দিলাম না।

কান পেতে শোনার মতো কথা কিছু নয়, তবু ভারী মিষ্টি লাগল ধ্রুবর। মামা হেসেই জবাব দিলেন, তোর মাসির ভয়ে দিলি না বল—

মাধুরী চলে গেল। এক মিনিটের মধ্যেই এক হাতে চায়ের পেয়ালা অন্য হাতে জলের গেলাস নিয়ে আবার এলো। গেলাস ধ্রুবর ডিশের পাশে রেখে পেয়ালা মামার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আধ-পেয়ালা দিলাম।

মামা খুশি হয়েই তার হাত থেকে পেয়ালাটা নিলেন। মন্তব্য করলেন, মাসিকে দেখে দেখে তুইও বেশ হিসেব শিখেছিস।

ধ্রুব এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলে ফেলল, আপনার চা কোথায়?

জবাবে মাধুরীর ঠাণ্ডা দু'চোখ তার মুখের ওপর। সেই চোখে একটু হাসির ছোঁয়া দেখা গেল কি গেল না! মামা বললেন, ওরটা না রেখে কি আর আমাকে দিয়েছে, দিনে-রাতে আট-দশ কাপ চলে ওর।

ধ্রুবর মুখে এসে গেছল, এখানে নিয়ে এলেই হয়' বলতে গিয়েও বলল না। বিষাদ ছাওয়া মুখ নয়; শান্ত সংযমে বাঁধা। এটুকু বললেও যেন ওই সংযমের ওপর হামলা করা হবে।

মেসে ফিরেও ওই মুখখানা বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। কেবলই মনে হয়েছে অমন মেয়ের এ-রকম অদৃষ্ট হওয়ার কোনো মানে হয় না। মাধুরীর বাবা নেই জানে। ওদের চলে কি করে সেই দুশ্চিন্তাও মাথায় এসেছিল। মা প্রাইমারি স্কুল-মিসট্রেস পরে জেনেছে।

পরের তিন সপ্তাহের তিন রবিবারে মাধুরীর সঙ্গে দেখা হয়নি। অর্থাৎ বড়মামার ঘরে সে পড়তে আসেনি। ধ্রুবর ধারণা, ও আসবে জানে তাই মামার কাছে পড়ার দিন বা সময় বদলে নিয়েছে। ধ্রুবর কাছে পোলিটিক্যাল সায়েন্সে সাহায্য নিতেও আসেনি।

চতুর্থ সপ্তাহে নিচেই দেখা। চাকরকে কিছু একটা ফরমাস করে বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকে যাচ্ছিল। ধ্রুবকে দেখে ঘুরে দাঁড়ালো। পরনে চওড়া পাড় শাড়ি আজও, বাদবাকি সব আগের মতোই সাদা। সব মিলিয়ে সাদাটে ব্যবধানটুকু সম্পর্কেই আরো সচেতন হতে হয়। পরিচিতের মতোই ধ্রুব বলল, আমার জন্যেই মামার কাছে পড়তে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল নাকি?

ঠোঁটে একটু সৌজন্যের হাসি দেখা গেল কি গেল না। বলল, আমি তো যখন খুশি মেসোমশাইকে পেতে পারি, এই সময়টুকুর ওপর ভাগ বসানোর দরকার হয় না।

ধ্রুব হেসে জিজ্ঞেস করল, পোলিটিক্যাল সায়েন্স পড়ার কি হল?

তেমনি সহজ সাদাসিধে জবাব।—অনার্স নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি, এখন পর্যন্ত ওদিকে তাকাতেও পারছি না।

ধ্রুব হেসেই সায় দিল। বলল, সকলেরই তাই হয়, অনার্সের চাপ পড়লে পাস নিয়ে খুব আগে থাকতে কেউ মাথা ঘামায় না।

দোতলায় উঠে গেল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আর কথা বলাটা ভালো দেখাবে মনে হল না।

আরো তিন সপ্তাহ পরের রবিবারে দোতলায় এসে দেখে মামা নেই। মামী জানালেন, এক বন্ধুর হঠাৎ বাড়াবাড়ি অসুখের খবর পেয়ে তোর মামাকে বেরুতে হল। তোর তো টেলিফোন নেই যে আগে থাকতে খবর দেবে। বোস চা-টা-খা।

চা জলখাবার খেতে খেতে মামীর সঙ্গে বাড়ির কথা হচ্ছিল। বই-খাতা নিয়ে মাধুরী ঘরে ঢুকল। মামীর দিকে চেয়ে বলল, মেসো বাড়ি নেই যখন আজ আমিই বসে যাই?

মামী জবাব দিলেন, ও-মা, আমাকে বলছিস কি—আমি পড়াব নাকি! ধ্রুবর দিকে ফিরলেন, কি রে, দেখিয়ে শুনিয়ে দিবি নাকি একটু, ওর তো পরীক্ষা এসেই গেল—

ধ্রুবর প্রথমেই মনে হল সে প্রস্তুত নয়, আর অনেকদিন চর্চা নেই। তার পরেই ভাবল পাসের তো পড়া তার আবার চর্চা। সাগ্রহেই বলল, অনেক দিন ও-সব বইটই উল্টে দেখাও হয়নি, ঠকে যাবার চান্স আছে—তবু দেখা যাক।

মাধুরী এগিয়ে এসে টেবিলের ওধারে মুখোমুখি বসল। মামী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোকে এক পেয়ালা চা করে দেব?

—দাও।

ধ্রুব বলল, আমাকেও তাহলে আর এক পেয়ালা।

মামী চলে গেলেন। মাধুরীর কথাবার্তা আচরণ বেশ সহজ হলেও তার সঙ্গে এমন একটা ঠাণ্ডা ভাব মিশে থাকে যার জন্য সব কিছু থেকে তাকে একটু বিচ্ছিন্ন মনে হয়। মনে হয়, নিজের অদৃষ্ট সম্পর্কে সর্বদাই সচেতন। এটুকুর জন্যেই ধ্রুব খুব স্বস্তি বোধ করে না। হঠাৎ তার একটু বেশি সহজ হবার চেষ্টা। হাত বাড়িয়ে মাধুরীর বইটা টেনে নিয়ে হাসিমুখে বলল, শুরুর আগে একটা ব্যাপার ঠিক হয়ে যাক—মামীর হুকুম 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' বলতে হবে।... কি করা যাবে?

মাধুরীর দু'চোখ তার চোখে এসে স্থির হল একটু।—বলা যেতে পারে।

এ-ও খুব অন্তরঙ্গ জবাব নয়। কিন্তু ধ্রুবর ভারী ভালো লাগল।

কখনো গোচরে কখনো অগোচরে এই ভালো-লাগাটুকু দিনে দিনে পুষ্ট হয়েছে।

মাধুরীর মতো এক মেয়ে চিরকাল নিঃসঙ্গ জীবনের বোঝা বয়ে চলবে এই চিন্তার সঙ্গেই আপোস করা শক্ত হত। মাধুরীর পরীক্ষা এসে যেতে সপ্তাহের অন্য একদিন ধ্রুব সন্ধ্যার দিকে আসা শুরু করেছিল। তাও মাধুরী বলেনি। তার শান্ত সংযমের দিকটাই ধ্রুবকে বেশি নাড়া দিয়েছে কিনা বলা যায় না। প্লেটো পড়াতে পড়াতে তাঁর কমিউনিটি ম্যারেজের মতবাদ নিয়ে একটু রসিকতা করেছিল। সুস্থ রসিকতার অবকাশ একটু আছেও, জোর করে রসিকতা করা নয়। কমিউনিটি ম্যারেজ বলতে এক মেয়ের ওপর অনেকের অধিকার বা অনেকের ওপর এক মেয়ের অধিকার। ধ্রুবর স্পষ্ট মনে আছে তাদের প্রোফেসারও প্লেটো পড়াতে পড়াতে এই এক প্রসঙ্গে গম্ভীর মুখে কম রসিকতা করেননি। অবশ্য রসিকতা প্লেটো বা তাঁর মতবাদ নিয়ে নয়, ওই দর্পণে আজকের তরুণদের সম্ভাব্য মানসিকতা প্রসঙ্গে।

মাধুরী দু'চোখ তুলে তার দিকে সোজাসুজি চেয়েছিল একটু। বলেছিল, এ কি পরীক্ষায় লেখা দরকার হবে? ধ্রুব লজ্জা পেয়েছিল। আবার সুস্থ রসিকতাও এড়িয়ে চলার প্রবণতা দেখে দুঃখও পেয়েছিল। সেই রাতেই ওপরে এসে মামীকে বলেছিল, মাধুরী বি. এ. পাস করে এম. এ. পড়বে?

—তাই তো ইচ্ছে ওর...কেন?

—এম. এ. পাস করার পরে?

—ভালো পাস করলে কলেজে চাকরির চেষ্টা করবে নয়তো স্কুলের চাকরি ছাড়া আর উপায় কি?

মাধুরীর সামনের এই সাদাটে জীবনের কথা ভাবলেও বুকের তলায় মোচড় পড়ে আজকাল। ধ্রুব বলেছে, তোমরা আর ওর বিয়ের চেষ্টা করবে না?

জবাবে মামী যা বললেন শুনে ধ্রুব স্তব্ধ খানিকক্ষণ।...মাধুরীর বাবা নেই, গার্জেন বলতে কাকা। ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের পদস্থ চাকুরে। আই-এ-এস-এ প্রমোশন পাওয়ার মুখে। ভাইঝিকে ভালোবাসেন। মাধুরীর আবার বিয়ে দেবার সঙ্কল্প তাঁরও। ওর মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে ভদ্রলোক চুপচাপ বক্স-নম্বরে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। বিজ্ঞাপনে বিশেষ করে বিধবা পাত্রীর গুণের কথা আর চেহারার কথা লেখা হয়েছিল। বিজ্ঞাপন পড়ে যারা সাড়া দিয়েছে তাদের মধ্যে চারটি পাত্র অপছন্দের নয়। কিন্তু প্রত্যেকটি পাত্রপক্ষ জানতে চেয়েছে, এ-রকম বিয়ে দেবার জন্য পাত্রীপক্ষ কত টাকা খরচ করতে প্রস্তুত। বলা বাহুল্য, কোনো চিঠিরই জবাব দেওয়া হয়নি। আরো হয়নি কারণ মাকে হঠাৎ অত চিঠি নিয়ে বসতে দেখে মাধুরীর সন্দেহ হয়েছিল। তারপর আর কিছু জানতে বাকি থাকেনি। পছন্দের পাত্রপক্ষদের চাহিদা আঁচ করেই নাকি মাধুরীর মেজাজ এমন বিগড়ে ছিল যে কাকা আসতেই তাকে বলেছে, ফের এমন চেষ্টা হলে ও এ বাড়ি থেকেই চলে যাবে।

ধ্রুবর মনে হয়েছিল মাধুরীর কাছে পুরুষ জাতটাই ছোট হয়ে গেছে। এমনিতেই ভিতরটা তার দরদে ভরে উঠেছিল, এ-ব্যাপার জানার পর ভাবনাটা সংকল্পের দিকে গড়াতে লাগল। কিন্তু গোড়ায় গোড়ায় ভাবতে গিয়েও অস্বস্তি। মায়ের থেকেও বাবার মুখ আগে এগিয়ে আসে। বাবা এ-রকম কোনো সম্ভাবনার সঙ্গে আপোস করবেন কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু মাধুরীকে অমন সাদাটে নিঃসঙ্গ জীবন থেকে টেনে বার করতে হলে

কোনো ছেলেকে এগিয়ে আসতে হবে। অন্য কোনো ছেলে এগিয়ে আসুক ধ্রুব এই আশায় বসে থাকবে?

ধ্রুবর ভালো লাগা বা মনের চিন্তার কোনো আভাসও মাধুরী পেত না এমন নয়। বলিষ্ঠ যে তার মধ্যে ছলাকলা কম থাকে। ধ্রুব আসলে সীরিয়াস ছেলে। বলিষ্ঠ তো বটেই। তার মধ্যেও ছলাকলা নেই। তার আগ্রহ বা তার এক একদিনের বিমনা চাউনি মাধুরীর বিড়ম্বনার কারণ হত। এরই মধ্যে একদিন টেবিলে এ-ধারে বসে মাধুরী কি একটা প্রশ্নের জবাব লিখছিল। ও-ধারে মুখোমুখি ধ্রুব বসে। লিখতে লিখতে মাধুরী একবার মুখ তুলে দেখে ওই লোক অপলক চেয়ে আছে। মাথা নামিয়ে আবার লিখতে লাগল। একটু বাদে আবার মুখ না তুলে পারল না। মনে হল ওই চাউনি তার মুখের ওপরই হারিয়ে গেছে। এমনি আরো একবার দেখে খাতার ওপরে কলম রাখল। জিজ্ঞেস করল কি হল?

ধ্রুব সচকিত একটু।—না, ভাবছিলাম...।

মাধুরীর দু'চোখও তার মুখের ওপর স্থির একটু। খুব শান্ত গলায় বলল, আমাকে নিয়ে কারো ভাবাভাবির দরকার নেই—আমি আমার ভবিষ্যৎ ঠিক করে নিয়েছি।

এই ঠাণ্ডা কটা কথায় ধ্রুবর ভাবনাটাকে আরো কত এগিয়ে দেওয়া হল মাধুরীর ধারণা নেই।

মাধুরীর বি. এ. পরীক্ষা হয়ে গেল। ফলও বেরুলো। হিস্টরিতে ফার্স্ট ক্লাস না পাক, ভালো অনার্স পেয়েছে। আবার তেমনি শান্ত সংকল্পে এম. এ. পড়া শুরু করেছে। এমনি সময়ে হঠাৎ এক উপলক্ষে ধ্রুবই একদিন নিজের ভাবনা-চিন্তার ওপর সংকল্পের যবনিকা টেনে দিল।

বড়মামীর এক আত্মীয় চিড়িয়াখানায় ভালো চাকরি করে। ছুটির দিনের শীতের দুপুরে সকলকে চিড়িয়াখানায় টেনে এনেছে। ধ্রুব তখন মামার বাড়িতে উপস্থিত। মামার টানাটানিতে সে-ও এসেছে। মাধুরী এসেছে, তার মাও। আত্মীয়টির খাতিরে চিড়িয়াখানা বেশ খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ হল। অন্য দর্শকরা এ-রকম সুবিধে পায় না। পাখির সংগ্রহে এসে একটা ভারী মজার ব্যাপার দেখালো ভদ্রলোক। আর যা বলল, তা-ও কম মজার নয়। পাশাপাশি দুটো গোল্ডেন ফেজেন্ট। লালের ওপর তবল সোনায় ঠাসা যেন দুটো জীব। তেমনি ইস্পাতের মতো ওদের ভয়াল দুটো ঠোঁট। মামীর আত্মীয়টি দুটো পাখিরই গায়ে কতগুলো আধা-শুকনো ক্ষতচিহ্ন দেখালো। তারপর ঘটনা বলল।...স্ত্রী পুরুষ ওই দুটো পাখি এক খুপরি ঘরে খাঁচার মধ্যে ছিল। দিন সাতেক আগে প্রচণ্ড খাওয়াখাওয়ি মারামারি করেছিল দুটোতে। রক্তারক্তি কাণ্ড। সময়ে তফাৎ না করে দিলে একটা বা দুটোই মরত। দুটো ছোট খাঁচায় আলাদা করার পরেও সে কি আক্রোশ। যেন খাঁচা ভেঙেই একটা আর একটাকে খতম করবে। তখনকার মতো চোখের আড়াল থেকেই সরাতে হল। তার পরদিন থেকে এক্সপেরিমেন্ট শুরু হল। প্রথম দুদিন দিনে একবার করে একটাকে আর একটার চোখের নাগালে নিয়ে আসা হয়েছে। দেখামাত্র দুটোরই রাগে সে কি চেঁচামেচি আর ফোঁসফোঁসানি। তখনো পেলে একটাকে শেষ করে দেয়। তৃতীয় দিনে ফোঁসফোঁসানি আর চেঁচামেচি নেই, কিন্তু রাগে যেন কেউ কারো মুখ দেখতেও রাজি নয়। চতুর্থ দিনে দুটো খাঁচা আর একটু কাছে আনা হল। তখন মজার দৃশ্য। রাগ

পড়েনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা আর একটাকে ঘন ঘন দেখছে। পঞ্চম দিনে ওই খাঁচা দুটো আরো কাছাকাছি আনতে দু'জনেরই দু'জনের দিকে ঘেঁষার ইচ্ছে। বার বার খাঁচার বাধা সরাতে চাইছে। ষষ্ঠদিনে খাঁচা দুটো আরো কাছাকাছি, ওদেরও তেমনি আরো কাছে আসার জন্যে ছটফটানি। আজ সপ্তম দিনে খাঁচা দুটো লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। খাঁচার ফাঁক দিয়ে ও দুটো পরস্পরের স্পর্শ পাওয়ার জন্য কেমন আকুল ধ্রুবরা দেখতেই পাচ্ছে। শুনল, আজও ওদের এক খাঁচায় ধরে নেওয়া হবে না...কাল হবে।

শুনেই ধ্রুব লাফিয়ে উঠল, কাল কখন নেওয়া হবে—আমি আসব।

ধ্রুবর সঙ্গে কথা বলে ভদ্রলোক ঠিক করল কাল ভোরেই আনা যাবে। কারণ দশটায় ব্যাঙ্কের চাকরি।

একটু বাদে ধ্রুব হঠাৎ দেখল দল ছেড়ে মাধুরী অদূরের সবুজ লনটার দিকে চলে গেল। তখন বিকেল, রোদ আর নেই। মাধুরী সেখানে গিয়ে ঘাসের ওপর বসল। মামী বললেন, ওর বোধহয় চায়ের তেষ্টা পেয়েছে, এতক্ষণে ওর দু'তিন পেয়ালা হয়ে যায়।

ধ্রুব বলল, আপনারা বেড়ান, আমি দেখছি। লনের ও-পাশেই চায়ের স্টল। ধ্রুব আগে স্টলে গিয়ে দু'পেয়ালা চা নিল। লনে এসে মাধুরীর সামনে বসে একটা পেয়ালা তার দিকে এগিয়ে দিল।

মাধুরী সোজা একবার তার দিকে তাকালো। তারপর পেয়ালাটা নিল। ধ্রুব সোৎসাহে জিজ্ঞেস করল, কাল আসছ তো, এলে আমি তোমাদের বাড়ি হয়ে আসতে পারি—

মাধুরীর দু'চোখ সোজা আবার তার মুখের ওপর। ঠাণ্ডা প্রশ্ন।—কোথায়?

—বাঃ, কাল ওই পাখি দুটোকে এক খাঁচায় নিয়ে আসা হবে, শুনলে না? আমার তো দারুণ ভালো লাগছে...আসবে?

মাধুরী রুক্ষ গলায় বলে উঠল, না! আমি কি দেখতে আসব?

ধ্রুব প্রথমে ভেবাচাকা খেয়ে গেল একটু। তারপর নির্বাক খানিকক্ষণ। সব ভাবনা-চিন্তা শেষ করে দেবার মতো এমনি একটা পরিস্থিতির দরকার ছিল বোধহয়। সংযত গম্ভীর গলায় বলল, তোমার দেখার সবটাই বাকি। আমাকে যদি অযোগ্য না ভাবো তো দু'জনে পাশাপাশি আমরা ওই রাস্তায় পা বাড়াবো।

মাধুরী ধড়ফড় করে উঠল।—না না না না! ও-রকম বলে ফেলেছি বলে আমি কারো দয়া-দাক্ষিণ্য চাই না।

ধ্রুব থমকে চেয়ে রইল খানিক।—যে তোমাকে ঠিক ঠিক দেখেছে, দয়া না হোক দাক্ষিণ্য সে চায়। আমি চাই। আমি এ কথা হঠাৎ বলছি না। এ নিয়ে শীগগিরই একদিন কথা পাকাপাকি হতই। আজ হয়ে গেল খুব ভালো হল।

মাধুরীর মুখে রক্ত উঠেছে। জোরে জোরে কয়েকবার মাথা নাড়ল। বলল, না, এ কক্ষনো হয় না—বাবা-মাকে দুঃখ দিলে কারো ভালো হয় না। মাসির কাছে আর হৈমন্তীর কাছে বাহারীর কথা আর সেখানকার সকলের কথা আমি অনেক শুনেছি...এমন চিন্তা মনেও আনা উচিত নয়।

কিন্তু সংকল্প একবার স্থির করে ফেলার পরে সেটা আর টলতে দেবে এমন ছেলে ধ্রুব নয়। বাবা-মায়ের কথা নিজেই বলেছে। তাঁরা সংস্কারে বিশ্বাসী। আনন্দে আটখানা হয়ে তাঁরা এই বিয়ে দেবেন তা নয়। কিছু আঘাত পেতে পারেন, দুঃখ পেতে পারেন।

কিন্তু কেউ ছোট মনের মানুষ নন তা বলে। ছেলের সুখ শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাতে আসবেন না। তাছাড়া ব্যাঙ্কে চাকরি করলেও তাকে বাপ-মায়ের কাছছাড়া হয়ে থাকতে হবে —আই-এ-এস পাস করলেও। তাই কেউ কারো স্বাধীনতায় মাথা গলাতে যাচ্ছে না।

কিন্তু অনেক বুঝিয়েও মাধুরীকে রাজি করানো সহজ হয়নি। শেষে ধ্রুবর শেষ কথা। —শোনো মাধুরী, বিয়ে যদি আমার কখনো হয় তোমার সঙ্গেই হবে। নয়তো কোনোদিন হবে না। আমি আই-এ-এস পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছি। বিশ্বাস আছে ভালোভাবে উৎরে যাব। কিন্তু তোমার শেষ কথা না শোনা পর্যন্ত আমার পড়াশুনায় ব্যাঘাত হচ্ছে, মন দিতে পারছি না। আমার থেকেও আমার বাবা-মায়ের ভাবনাই যদি তোমার কাছে বড় হয় তো আমারও আর বড় হওয়ার স্বপ্ন থেকে কাজ নেই। মামাকে বলে দিও আমি পরীক্ষা দিচ্ছি না, তোমাদের ওখানে আর যাচ্ছিও না।

মাধুরী কেঁদে ফেলেছিল।

এরপর দ্বিগুণ উৎসাহে ধ্রুব চ্যাটার্জী আই-এ-এস-এর জন্য তৈরি হয়েছে। ফলও পেয়েছে। মাধুরী তখন ধ্রুবর ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে একাত্ম। বিয়েতে বড় কোনো অশান্তির ব্যাপার ঘটবে কিনা এটাই তার কাছে চিন্তাব ব্যাপার। মাউন্ট আবুতে ট্রেনিংএ যাবার আগে যদিও ধ্রুব তাকে ভরসা দিয়ে গেল, কিছু ভেব না, যা হবার হবে—বিয়ে তো কেউ ঠেকাতে পারছে না।

মাধুরী বুদ্ধিমতী মেয়ে। মুখে যা-ই বলুক, এটুকু বুঝেছে বাবা-মায়ের ওই ছেলে নিজেও খুব স্বস্তির মধ্যে নেই। নইলে এতদিনে তাঁদের কিছু আভাস অন্তত দিয়ে রাখত। তার আগে ভাবী শ্বশুরকে সে এই বাড়িতেই দেখেছে। ধ্রুব তখন ব্যাঙ্কের কি কাজে পাটনা গেছল। কে এলেন আঁচ করে কোনো অছিলায় মাসির খোঁজে ঘরে না ঢুকে পারেনি। মাসি ভদ্রলোকের পরিচয় দিতে মাধুরী এগিয়ে এসে নত হয়ে পায়ের ধুলো নিয়েছে। ভাবী শ্বশুরের হাসি-হাসি মুখখানা দেখেও খুব একটা বল-ভরসা পায়নি। তার আরো সঙ্কোচ মাসি আর মেসোর কথা ভেবে। ভাবী শ্বশুর হয়তো এর পরে এঁদেরও ভুল বুঝবেন।

## দশ

হাওড়ায় পৌঁছে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ধ্রুব সোজা মামার বাড়িতে। মাধুরীকে একতলায় দেখল না। ওর মা বললেন, দোতলায়। তিন লাফে দোতলায় উঠে এলো। মাধুরী মামীর কাছেই বসে। অদূরে মামা। ধ্রুবর মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি চাপল। গম্ভীর মুখে এসে মামা-মামীকে প্রণাম করল।

তাঁরা অবাক একটু। এ ছেলে পায়ের ধুলোটুলো খুব একটা নেয় না। মামা জিজ্ঞেস করলেন, হাতে সুটকেস দেখছি, দেশ থেকে এই ফিরলি বুঝি...হঠাৎ প্রণাম কেন?

ধ্রুব তেমনি গম্ভীর। সোজা না তাকিয়েও বুঝতে পারছে মাধুরী তাকে নিরীক্ষণ করে দেখছে। জবাব দিল, একটা সমস্যায় পড়া গেছে, তোমাদের আগের মতোই মামা মামী বলব না মাসিমা মেসোমশাই বলতে হবে?

মামা মামী দু'জনেই বিমূঢ় খানিক। দু'জনেরই তারপর মাধুরীর দিকে চোখ। তার

মুখ টকটকে লাল। এঁরা এই ছেলের মাধুরীর সঙ্গে সহজ মেলামেশাটা দেখছেন বটে, কিন্তু এমন সম্ভাবনার চিন্তা মাথায়ও আসেনি। আসেনি কারণ এই ছেলের বাপের বংশগৌরবের সঙ্গে গোড়ামির দিকটাও ভালোই জানেন তাঁরা। মাধুরী উঠে ঘর ছেড়ে পালাচ্ছিল। ধ্রুব এবার হাসিমুখেই পথ আগলালো। বলল, উঁহু, পালানো চলবে না—আগে ফয়সালা হয়ে যাক।

মামী সশংকে বলে উঠলেন, কিন্তু তোর বাবা মা?

ধ্রুব জবাব দিল, নিশ্চিন্ত থাকো, সেদিকেও নির্মল আকাশ। এত নির্মল যে আমি সুদ্ধু হকচকিয়ে গেছলাম।

বাবার সেই চিঠি ধ্রুব সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। মাধুরীকে এরপর নিরিবিলিতে পেয়ে কিছু না বলে আগে সেটা দেখালো। মাধুরী পড়ে হতভম্ব। বলে উঠল, এ তো তোমাকে এক বছরেরও আগে লেখা চিঠি দেখছি।

ধ্রুব এরপর সপল্লবে ব্যাপারখানা বলল তাকে। সব শোনার পর মাধুরী খুশি যত না, অবাক তার থেকে কম নয়। ভাবী শ্বশুর যে এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরেন ভাবতে পারেনি। ঠিকুজির ওপর আস্থা মাধুরীর খুব নেই। কিন্তু কলকাতা থেকে ফিরে ছেলের ঠিকুজি তিনি যে-ভাবে বিচার করেছেন সেই বিচার যে নির্ভুল তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

সোমেশ্বর চ্যাটার্জী বেশ ঘটা করে ব্যবস্থায় এগোলেন। বড় মেয়েকে লিখলেন, তোর ভাইয়ের বিয়ে, বাপের বাড়ি আসা তো ছেড়েছিস—এই শুভ কাজে জামাই বাবাজীবন আর নাতি নাতনী নিয়ে অন্তত মাসখানেকের জন্য চলে আয়। ছোট মেয়েকে লিখলেন, তোর দাদার কার সঙ্গে বিয়ে শুনে তুই-ই নিশ্চয় সব থেকে বেশি খুশি হবি। তোর মামার বাড়ির মাধুরী তো তোর বন্ধু শুনলাম। সক্কলকে নিয়ে চটপট চলে আয়, সব দিক কি করে সামলাবে ভেবে তোদের মায়ের এখন থেকেই দুশ্চিন্তা।

বড় শালা অর্থাৎ পিনাকী চক্রবর্তীকে ওমনি হালকা চালেই চিঠি লিখলেন একখানা। লিখলেন, বিয়ের ব্যাপারে আমাদের পুরুষকুল চিরদিনই প্রিভিলেজড ক্লাস—তাদের স্ত্রী রত্ন সংগ্রহ করার অনেক সরস নজির বরাবরই আছে। দিনকালের হাওয়ায় সেই নজির আরো বিস্তৃত হওয়াই স্বাভাবিক। যাক, খুশি হয়েছি। আমার ছেলেকে আমি চিনি, তাই আপনাদের কিছুমাত্র সংকোচের কারণ নেই। আমার এই চিঠি সত্ত্বর সব ব্যবস্থার তাগিদ বলে ধরে নেবেন।

কিন্তু গাঁয়ে গোঁড়া পণ্ডিতের সংখ্যা গাঁয়ে এখনো কম নয়। তাঁরা আড়ালে ছি-ছি করতে লাগলেন। এত বড় বংশের ছেলে একি করল! এসব খবর আবার বিহারীর কানে যায়। খোকাদাদা এখন মাঝে-সাজে ছুটির দিনের রাত্রিতে এখানে থেকে যায়। সিউড়ি থেকে জিপে চলে আসে। গেঁয়ো পণ্ডিতদের মাথা ব্যথার কথা বিহারী খোকাদাদাকেই শোনায়। বলে, কর্তার ভয়ে মুখ বুজে থাকি নইলে দিতাম দু'কথা শুনিয়ে।

ধ্রুব গুম হয়ে থাকে। পরে বাবাকেই বলে, এখানকার হাওয়া যা দেখছি, কাউকে ডাকার দরকার নেই, কি-চ্ছু ঘটা করতে যেও না—মাঝখান থেকে সেধে অপমান হবে। আমি তোমার জন্যেই ভাবছি, নইলে এ-সব লোক কি আমার জানা আছে।

সোমেশ্বর হেসে ঠাট্টা করলেন প্রথম।—বউয়ের জন্য তোর এখনই এত দরদ যে

অন্যরকম কিছু দেখে মুখ খুলল বলেই গাঁয়ের লোক সব খারাপ হয়ে গেল। পরে বললেন, তোর বাবাকে অপমান করতে পারে এমন লোক এ গাঁয়ে নেই—তাদের আমারও কিছু জানা আছে, তোকে কিছু ভাবতে হবে না।

যা আশা করেনি ধ্রুব চ্যাটার্জী তেমনি একটা ধাক্কা খেল নিজের দুই বোনের কাছ থেকে। দিদি অবন্তী মাকে লিখল, ভাইয়ের এমন বিয়ে হবে সে আশা করেনি। তার শ্বশুরবাড়িতে এ নিয়ে খুব বিরূপ সমালোচনা হচ্ছে। আর বাবা কি করে এমন বিয়েতে মত দিলেন ভেবে পাচ্ছে না। যাই হোক, বিয়ে যখন হচ্ছে ওরা সুখে থাক। কিন্তু সে এ বিয়েতে উপস্থিত থাকতে পারছে না।

হৈমন্তী অবশ্য বিয়ের আগে ছেলে নিয়ে এলো। কিন্তু দাদা আর বাবাকে শুনিয়ে মাকে বেশ স্পষ্ট করেই বলেছে, দিদির দোষ কি, তার বাড়িতে কথা উঠলে আসে কি করে। আর কথা উঠবেই না কেন, দাদা বলেই অন্ধ স্নেহে বাবা অনায়াসে রাজি হয়ে গেল। দাদা তো আর মেয়ে নয় যে পর হবেই—রাজি না হলে পাছে পর হয়ে যায় তাই বাবার মতো মানুষও নরম।

দুই বোনের ওপরেই মর্মান্তিক ক্ষুব্ধ ধ্রুব চ্যাটার্জী। সোমেশ্বর সকৌতুকে তাঁর আই-এ-এস ছেলের ক্ষুব্ধ মুখখানা দেখলেন। বললেন, কি রে, বোনেদেরও তোর জানা ছিল তো?

তারপর ঈষৎ গম্ভীর মুখে ঘরে ঢুকলেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ধ্রুব বাবাব কথা আব হৈমন্তীর কথাও শুনতে পাচ্ছে।

সোমেশ্বর ছোট মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, মামার বাড়িতে ওই মাধুরীকে তুই তো দেখেছিস?...তোর বন্ধু শুনলাম।

হৈমন্তী জবাব দিল, অনেকবারই দেখেছি, তাকে খারাপ কিছু বলছি না। কিন্তু দাদা কি করে এগলো?

—যা জিজ্ঞেস করছি মাথা ঠাণ্ডা করে জবাব দে না।...মেয়েটির জন্য তোদের দুঃখ হত না?

—তা না হবার কি আছে, যে জানবে তারই দুঃখ হবে।

—সমস্ত জীবন ওইভাবে কাটিয়ে যাবে ভাবলেও কষ্ট হত তো?

মেয়ে নিরুত্তর।

—আচ্ছা ধর, যদি শুনতিস কোনো ভালো ছেলে সসম্মানে ওকে বিয়ে করে নিয়ে চলে গেছে তাহলেও ভালো লাগতই তো?

মেয়ে এবারেও চুপ।

সোমেশ্বর হেসে বললেন, তাহলে বোঝ তোদের ভাবনার গলদটা কোথায়। অন্য কোথাও না গিয়ে সেই মেয়ে তোর দাদার ঘাড়ে পড়েছে বলেই শুধু যত মুশকিল তোদের —আর কারো ঘরে গেলে সেই ছেলেকে তোরাই আবার উদার বলতিস খুব। একটা মঙ্গল কাজের সময় শুধু মঙ্গলই প্রার্থনা করতে হয়—বুঝলি?

বারান্দা ছেড়ে ধ্রুব চ্যাটার্জী নিঃশব্দে তার ঘরে চলে গেল। বাবাকে সে সত্যি ঠিক-ঠিক চিনেছে কিনা এমন সন্দেহ মাঝে মাঝে মনে আসে।

বিয়ে হয়ে গেল।

ধ্রুব চ্যাটার্জীর একটাই ভুল, বোনেদের আপত্তির কথা মাধুরীকে দুঃখ করে বলেছে। গাঁয়ের মানুষদের অবিবেচনার কথাও বলেছে। বড় ননদ বিয়েতে এলো না মাধুরী সেটা নিজের চোখেই দেখেছে। মনে আঁচড় পড়েছে ঠিকই। যদিও শ্বশুরের প্রশংসা তাঁর ছেলে পঞ্চমুখেই করেছে। সেই এক বছর আগে খামে এ-বিয়ের কথা লিখে রাখার খবর তো জানেই।

এই রক্ষণশীল বনেদী পরিবারের গল্প মাসির কাছে অনেক শোনা ছিল। এই জন্যেই মাধুরীর ভয় ছিল, সংকোচ ছিল। কিন্তু যতবার সেকথা তুলেছে, ধ্রুব চ্যাটার্জী ততোবার জোর দিয়ে বলেছে, বিয়েটা হচ্ছে তোমার সঙ্গে আমার—সংস্কার নিয়ে যারা সরে থাকবে —থাকবে। তা নিয়ে তুমি ভেবে কি করবে—ভাবতে হলেও আমি ভাবব—যা করার তা-ও আমিই করব।

যে ক'টা দিন শ্বশুরবাড়িতে ছিল মাধুরী খুব একটা স্বস্তি বোধ করেনি। হৈমন্তী বউ-ভাতের দু'দিনের মধ্যে চলে গেছে। ধ্রুব দিন কয়েকের মাত্র ছুটি নিয়েছিল। তার মধ্যে দ্বিরাগমন সেরে ফিরে এসেছে। ছুটি শেষে বউ নিয়ে কোয়ার্টারসএ চলে যাবে। মাধুরী মনে মনে দিন গুনেছে। ঠাকুরদালান পূজোআর্চা ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে আমিষ-নিরামিষের হেঁসেল—এ-বাড়ির জগৎটাই তার কাছে খুব অচেনা মনে হয়েছে। বই পড়ে কিছু সময় কাটাবে তারও উপায় নেই। বাড়িতে অনেক বই—বেশির ভাগ সংস্কৃত আর শাস্ত্রের বই। তাছাড়া হোমিওপ্যাথি আর আয়ুর্বেদ চিকিৎসার বই। এই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে না ভাবলেও স্বস্তি। ধ্রুবকে বলেছেও এ-কথা।

ধ্রুব চ্যাটার্জী হেসেছে। বলেছে, বনেদী রক্ষণশীল বংশে এসেছ—ট্রেনিংএর জন্য অন্তত মাস ছয় তোমার বাবা-মায়ের কাছে থাকা উচিত।

...পরের ছ'মাসের মধ্যে আর এক রাতের জন্যও মাধুরীকে এখানে থাকতে হয়নি। ধ্রুব আগের মতোই জিপে করে মাঝে মাঝে এসেছে। বউ নিয়েই এসেছে। বাসন্তী রাতে থেকে যাওয়ার কথাও বলেছেন। ছেলেই এটা ওটা বলে চলে গেছে। বাবাও বলেছে, আসিস আর চলে যাস, বউমাকে নিয়ে দুটো দিন থেকে যাওযার ব্যবস্থা করতে পারিস না?

ধ্রুব বলে, বাবা চান যখন, তুমি দুটো দিন থেকে গেলে তো পারো—তাছাড়া বাবা মা অন্তত তোমাকে কোনো সময় অনাদর করেন না।

মাধুরী বলে, অনাদরের কথা কে বলেছে, আমার অস্বস্তি লাগে বাপু—

—কেন, বাবা তো গপপি মানুষ তুমি গেলে তো কতবার ঘুরঘুর করে কাছে আসেন।

—কি জানি, ওঁর সামনে আমি আরো সিঁটিয়ে যাই।

অথচ কলকাতায় গিয়ে দুই ননদের বাড়ি নিজে যেচে গেছে ধ্রুবকে নিয়ে। বড় ননদকে বলেছে, দিদি, দোষ তোমার ভাইয়ের, তাকে যত খুশি গাল-মন্দ করো—আমাকে ঠেলতে পাবে না বলে দিলাম।

সময়ে অনেক সয়। অবন্তীও আদর-যত্নই করেছে। আর হৈমন্তীকে বলেছে, এতদিনে পুরনো হয়ে গেছি, তাই কোমর বেঁধে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছি। বলা বাহুল্য ঝগড়া হয়নি।

বোনেরাই এরপর বউয়ের প্রশংসা করে মাকে চিঠি দিয়েছে। বাবা-মা কত খুশি ধ্রুব বুঝতে পারে। কিন্তু তাঁদের সামনে মাধুরী তেমনই আড়ষ্ট।

ইতিমধ্যে মাধুরীর সেই কাকা বর্ধমানে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এলেন। বয়স্ক মানুষ, নমিনেটেড আই-এ-এস। কালে দিনে ধ্রুব তাঁর থেকে অনেক বড় হবে জানা কথাই। কিন্তু এখন একে মুরুব্বি, তায় খুড়শ্বশুর। এর মধ্যে বার দুই তাঁর ওখানে মাধুরীকে নিয়ে গেছে। একবার একদিন একবার দু'দিন থেকেও এসেছে। অকপটেই ধ্রুব সে-গল্প বাবা-মায়ের কাছেও করেছে। মাধুরী লক্ষ্য করেছে, শ্বশুর শাশুড়ী মুখে বেশ-বেশ করেছেন বটে, কিন্তু আর এখানে থাকা না থাকা নিয়ে একটি কথাও বলেন নি।

পরে ধ্রুবকে বলেছে, তুমি কি যে করো না, আগ বাড়িয়ে কাকার কাছে থাকার কথা বলার কি দরকার ছিল? তাঁর ভাবলেন, ওখানে থাকে এখানে থাকে না।

ধ্রুব অপ্রস্তুত একটু হয়েইছে। কিন্তু মুখে বলেছে, ছাড়ো, আমি অত হিসেব করে কথা বলতে পারি না।

মাধুরীও শুনেছে শ্বশুরের অঢেল টাকা। ব্যাঙ্কে জমছে। পচছে। এত টাকা থাকলে কোনো পরিবার এমন সাদাসিধেভাবে থাকে কি করে ভেবে পায় না। ধ্রুব হেসে হেসে বলেছে, টাকার ওপর বাবার খুব টান—কিন্তু তাঁর এক পয়সাও আশা কোরো না—আমি তাঁর এক পয়সাও আশা করি নে এ আমার মুখ দিয়ে অনেক বার বলিয়ে নিয়েছেন।

—কেন? টাকা দিয়ে কি হবে তাহলে? এমন শুনলে মাধুরীর অবাক হবারই কথা।

—জানি না। দিদি আর হৈমন্তীকে কিছু দিতে পারেন, আর শেষ বয়সে মন্দির-টন্দির কিছু করে বা ধরমশালা-টালা কিছু খুলে নাম করার ইচ্ছেও আছে হয়তো।

—তা বলে তোমাকে বঞ্চিত করবেন? দূর, বাবাকে দেখে এ আমাব বিশ্বাসই হয় না।

বঞ্চিত করার কথাটা ধ্রুবরও ভালো লাগেনি। বলেছে, বাবার ভাবনা-চিন্তা অন্য রকম। তিনি আমাকে বঞ্চিত ভাবেন না, আজ আমি যা তার অনেকটাই বাবার জন্যে। আমি নিজেও নিজেকে কোনোভাবে বঞ্চিত ভাবি না বা ভাবব না। তাঁর টাকা তিনি যে-ভাবে খুশি খরচ করুন।

না, শ্বশুরের টাকার লোভ মাধুরীরও নেই। তবু ভবিষ্যতের চিন্তা থেকে একমাত্র ছেলেকে বাতিল করার সম্ভাবনার কথা ভাবতে তার একটুও ভালো লাগেনি।

## এগারো

একে একে আরো তিন বছর কেটেছে। বাহারী সম্বৎসরের ঋতুরঙ্গশালা। এখানে নটরাজের পদক্ষেপে বা ছন্দে রকমফের নেই। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের চোখ-ঝলসানো রোদে আর দাবদাহে বাহারী বিবর্ণপাণ্ডুর। নদী খাল বিল তৃষ্ণায় দীর্ণ। বাহারীর তখন ধূসর তাপসী রূপ। আষাঢ়-শ্রাবণে বাহারী চকিত-চঞ্চলা রজস্বলা। অজয় দামোদর খাল বিল উচ্ছ্বসিত প্লাবনে থরথর কাঁপে। সমস্ত শুষ্কতার বিরুদ্ধে বাহারীর তখন প্রবল আক্রোশ। সব বিবর্ণতা ডুবিয়ে দিয়ে গাছে গাছে লতাপাতায় দূর্বাঘাসে সে সবুজের ঢেউ তুলবে। ভাদ্র-আশ্বিনে বাহারীর বুকে হালকা খুশির তরঙ্গ। সে উচ্ছল প্রসন্ন আবার কিছুটা নিরাসক্ত। বাহারীর তখন কর্তব্যরত গৃহিণীর প্রফুল্ল মূর্তি। তার সামনে অনেক কাজ। দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা,

শ্যামাপূজা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। কোনটা সুন্দরভাবে না হলে নয়? কার্তিক-অঘ্রাণে বাহারীর সর্ব অঙ্গে হেমন্তের নরম রোদ। সেই রোদে মাঠের পর মাঠ সোনার ধানে ঝলমল। বাহারী এবার নিজেকে নিঃস্ব করার দানে বসবে। ঘরে ঘরে সোনার ধান বিলোবে। পৌষ-মাঘে এই বাহারীর রুক্ষ শীর্ণ বৈরাগী সাজ। বাহারী রিক্ত, নিরাভরণা। তার তখন হিমশীতল নব-যৌবনের তপস্যা, বসন্তের প্রতীক্ষা। ফাল্গুন চৈত্রে সেই প্রতীক্ষার শেষ। তখন রূপ দেখো বাহারীর। কোকিলের ডাকে গন্ধে মাতাল দক্ষিণা বাতাসের ক্ষ্যাপামি দেখো। আর অশোক পলাশ শিমুলের লালে বাহারীর রক্তসাজ দেখো!

না, এই বাহারীর ঋতুচক্রের রকমফের নেই। সোমেশ্বর উদাত্ত গলায় শ্লোক আওড়ান আর প্রতিটি ঋতুপটকে অভ্যর্থনা জানান, প্রণাম করেন। কিন্তু যে মানুষকে নিয়ে বাহারীর প্রাণ সেখানে একের পর এক গণ্ডগোল। মানুষের ধৈর্য কমছে, অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। তার ক্ষমা কমছে, হিংসা বাড়ছে। তার যুক্তি কমছে, তর্ক বাড়ছে। তার কানে সন্দেহের বিষ ঢুকছে। বুকের তলায় অবিশ্বাসের আগুন জ্বলছে। একটা করে বছর যায়, দেশের শাসকদের গলা-ফাটানি বাড়ে—দেশ কতটা এগলো দেখো!

কোলিয়ারীর বিশাল কুলি এলাকার, অন্ত্যজ মূর্খ এলাকার আর জমির ভাগচাষীদের সোমেশ্বর শুধু বলেন, তোদের চোখ নেই? বাহারী কত পিছলো তোদের চোখে পড়ে না?

তাদের চোখে পড়ুক না পড়ুক দাদাঠাকুরের কথায় তারা উঠতে চায়, বসতে চায়। কিন্তু ওই অন্য লোকগুলো তাদের কি বলে—কি বোঝায়? মাথার মধ্যে সব-কিছুর জট পাকিয়ে যায় যে! কিন্তু ওরাও তো ভালোই চায়, ভালোই বলে! বাড়ি ঘর ছেড়ে তারা এই গাঁয়ে এসে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকে কোন স্বার্থে?

ওরা বলতে শহরের রাজনীতির মানুষেরা। তারা এক দলের নয়। এক গোষ্ঠীর নয়। বিভিন্ন দলের, বিভিন্ন গোষ্ঠীর। দলের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্যে অন্য দলের সঙ্গে তাদের রেষারেষি হানাহানি। যে-মেহনতি আধপেটে খাওয়া মানুষদের জন্যে প্রত্যেক দলের দরদের অন্ত নেই—এক দলের দিকে ভিড়লে তারাই আবার অন্য দলের শত্রু। তাদের সম্পর্কে বিচার-বিবেচনায় তারা ক্ষমাশূন্য, কঠিন।

সমস্ত গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরেও যে মানুষটি শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত হাজার হাজার মানুষের মন জয় করে বসে আছেন, তাদের বিশ্বাসের চাবিকাঠি হাতে নিয়ে বসে আছেন—দল-নির্বিশেষে রাজনীতির মানুষদের তাঁর দিকেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। সবার আগে তাঁকেই দলে পাবার জন্য তৎপর সকলে। কিন্তু সব দলকেই সোমেশ্বরের এক কথা। আমি কোনো দলের মধ্যে নেই। কোনো রাজনীতির মধ্যে নেই। মানুষকে প্রণম্য ভাবি। যেটুকু সম্ভব তার সেবা করি।

ফলে একটু একটু করে তিনি রামেরও শত্রু, রাবণেরও শত্রু। তারা এসে এসে প্রথমে নরম কথা বলে। শেষে গরম কথা বলে। শাসায়। গর্জন করে। সোমেশ্বর হাসেন। বলেন, আমি সামান্য মানুষ, আমাকে নিয়ে আপনারা ব্যস্ত কেন?

তারা ব্যস্ত। কারণ প্রত্যেক দলের বিবেচনায় এই একজন সামান্য মানুষই তাদের প্রতিবন্ধক। এই দিনে অমন কোলিয়ারিতে পর্যন্ত দেড় দু'বছরের চেষ্টায় কোনো দলের একটা শক্তপোক্ত ইউনিয়ন গড়ে তুলতে পারা গেল না। তাদের অনেক বোঝানো হয়েছে, মালিকেরা কত রকমে তাদের হাড়-মাস নিঙড়ে নিচ্ছে বুঝিয়েছে। ওরা শুনে শুনে শেষে

বিচলিত হয়। কিন্তু পরামর্শের জন্য শেষ পর্যন্ত শরণাপন্ন হয় দাদাঠাকুরের। দাদাঠাকুরের থেকে ভালো আর তাদের কে চায়? কিন্তু ঠাকুরের সেই এক কথা। যদি ইউনিয়ন করতে হয় সেটা কোলিয়ারির ইউনিয়ন হবে—কোনো দলের নয়। সেখানে কোলিয়ারির মানুষদের ভালো মন্দ ছাড়া আর কোনো কথা থাকবে না। কিন্তু তার আগে বাইরের লোকদের সব গ্রাম থেকে বিদেয় হতে বল। মায়ের থেকে যে মাসির বেশি দরদ তাকে কি বলে জানিস না?

ওরা বলে, কিন্তু আমরা যে হদ্দমুখ্যু দাদাঠাকুর—কি দিয়ে কি কত্তে হয় কিছুই যে জানা নাই গো।

সোমেশ্বর বলেন, গাঁয়ের মানুষ খুঁজে বার কর, খনির মানুষ খুঁজে বার কর,—কত লোকের মধ্যে দেবতা বসে আছেন, না জাগালে তিনি জাগেন কি করে?

ফলে গ্রামের আর মেহনতি মানুষদের ভালো না করে যারা ছাড়বেই না, তাদের আচরণ আরো ধারালো, আরো ঘোরালো। তারা ওদের বলে, তোমাদের দাদাঠাকুর কি এ-কালের যুধিষ্ঠির যে যা বলবেন তাই বেদবাক্য! নিজের অত জমিজমা, ব্যাঙ্কে অঢেল টাকা, প্রাসাদের মতো বাড়ি। তবু নিজে একটু হোমিওপ্যাথির ফোঁটা দিয়ে, দুটো শিকড়বাকড়ের গুঁড়ো দিয়ে, শান্তি-স্বস্ত্যয়নের জল পড়ে মন্ত্র পড়ে তোমাদের কাছ থেকেও পয়সা নিয়ে ট্যাঁকে গোঁজেন দ্যাখো না?

এই রকম বলতে গিয়ে এক দল মহাবিপাকে পড়েছিল। যাদের বলতে যাওয়া বোঝাতে যাওয়া তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওদের মারতেই গেছল।—খবরদার! খবরদার! ফের অমন কথাটি বললে জিভ টেনে ছিঁড়্যা নেব—দাদাঠাকুরের নামে এমন কথা—দাদাঠাকুর আমাদের জন্য কি করেন আমরা দেখি না? জানি না?

ভালো করার দল পালিয়ে বাঁচে।

কিন্তু এ-সব অশান্তির খবর এস. ডি. ও. ধ্রুব চ্যাটার্জীর কানে যায়। সে তো নিয়মিতই বাবা-মাকে দেখতে আসে। সে স্পষ্টই বিরক্ত হয়। বাবাকে, বলে, তুমি কেন এ-সবের মধ্যে মাথা গলাও, যে যা খুশি করুক, তুমি তোমার মনে শান্তিতে থাকতে পারো না?

সোমেশ্বরের মুখে সেই চিরাচরিত হাসি। নাতিকে হাঁটুর ওপর বসিয়ে দোলান আর প্রথমে তাকেই বলেন, তোর বাবার কথা শুনলি? নিরীহ মুখ করে ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন, আমার আবার শান্তির অভাব কোথায় দেখলি?

ধ্রুব চ্যাটার্জী তিক্তবিরক্ত।—ওই সব পোলিটিক্যাল গ্রুপের ছেলেরা কেন তোমার নামে নালিশ করবে, যা-তা বলবে? এখনো তোমার বাক্স হাতে রোগী দেখতে বেরুনোর কি দরকার—শান্তি-স্বস্ত্যয়নের নামে চাল কলা বাঁধা আর ট্যাঁকে পয়সা গোঁজার কি দরকার? তোমার অভাব কিছু আছে? হরিহর ঘোষের কাছে আরো পাঁচ বিঘে জমি বিক্রি করে ব্যাঙ্কে টাকা তুলেছ—শেষ দশ বিঘেও না হয় বেচে দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে বসে খাও দাও ঘুমোও আর নিজের মনে যত খুশি শাস্ত্র পড়ো, জ্ঞান অর্জন করো।

সোমেশ্বর সকৌতুকে ছেলের মুখখানা দেখেন। আরো পাঁচ বিঘে ধানী জমি ওই হরিহর ঘোষকেই তিনি বিক্রি করেছেন বটে। সব মিলিয়ে অত জমির মালিক হয়ে হরিহর ঘোষ এখন পস্তাচ্ছে। বর্গাকিলের ধকলে পড়েছে। চাষীরা কোনোদিন এই মালিকের ওপর খুশি ছিল না। এখন তারাই হুমকি দেয়, চোখ রাঙায়। গ্রামের ভালো করার দল তাদের

মদত দেয়। ফলে সামাল দিতে কানাগলি দিয়ে ভদ্রলোকের বেশ টাকা খসছে। বাবার জমিচাষের পাণ্ডা বংশী আর শংকর। সেখানে নাক গলাতে আসবে এমন বুকের পাটা কার? কিন্তু গোল পাকানোর চেষ্টা এই অন্য দিকেও চলছেই। ছেলের মনে এই ভয়টাও লেগে আছে, তাই বাকি দশ বিঘে জমি বেচে দেবার পরামর্শ আগেও দিয়েছে। তফাৎ, এবারের বলাটা রাগের মুখে বলা।

জবাব না দিয়ে সোমেশ্বর মৃদু মৃদু হেসেছেন। তারপর বলেছেন, আর একটা ব্যাপার এখন পর্যন্ত খেয়ালই করি নি।...ওই সামনেব পোরশানের একতলা দোতলা বছরের পর বছর খালিই পড়ে থাকছে। এবারে ভাড়া দিয়ে দেব ঠিক করেছি।

ছেলে প্রথমে আঁতকে উঠেছে।—তা বলে বসত বাড়িতে ভাড়াটে বসাবে?

—একটা গোটা দালান খালি পড়ে আছে—গ্রামের লোকের ভালো করার দলের তো এখন অভাব নেই—তারা যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছে এমনি দখল নিলেই বা ঠেকায় কে?

ছেলে তক্ষুনি সুর বদলেছে।—তা অবশ্য ঠিক, আমার ওখানেই দু'তিনজনের বার-বাড়ি দখল হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো দেখেশুনে ভাড়া দিয়ে দাও।

সোমেশ্বর জানালেন, একটা ব্যাঙ্কের সঙ্গে কথা পাকা হয়ে গেছে, গ্রামে গ্রামে এখন তো ওদেরই পাকা দালানের চাহিদা বেশি। মাসে সাতশ টাকা ভাড়া, দোতলায় ব্যাঙ্কেব ম্যানেজার সপরিবারে থাকবে। ওদিকে একটা ফটক করা আর তাদের দরকারে আর যা করার ওরাই করে নেবে।

কলকাতায় এমন বাড়ির ভাড়া সাতশ ছেড়ে সাত হাজার হলেও অবাক হবার ছিল না। কিন্তু বাহান্নীতে সাতশ টাকাই অভাবনীয়! ধ্রুব চ্যাটার্জী মনে মনে জানে, বাবা কোনো পোলিটিক্যাল দলের পরোয়া করে না—টাকা আসবে ঘরে এটাই আসল কথা। যাক, এতবড় একটা পোরশান খালি নিয়ে বসে থাকলে ঝামেলা হতেই পারে।

দু'মাসের মধ্যে সামনের পোরশানে ব্যাঙ্ক হয়ে গেল। আর ম্যানেজার সপরিবারে দোতলার দখল নিল। ধ্রুব বাবাকে এবারে আর এক ব্যাপার করতে দেখল। সমস্ত বাড়িটা মায়ের নামে লেখাপড়া হয়ে গেল। ব্যাঙ্কের ভাড়া তখন থেকেই মায়ের প্রাপ্য। সোমেশ্বর বললেন, তোর মায়ের কিছু সংস্থান হল, আমি নিশ্চিন্ত।

হাসি চেপে ধ্রুব বলল, তা তো বটেই। খুব ভালো হল।

এদিকে গাঁয়ের অবস্থা ঘোরালো হয়েই চলেছে' কোলিয়ারিতে দু'দুটো পোলিটিক্যাল পাটির ইউনিয়ন গজিয়েছে। ভিতর থেকেই লোক জুটেছে। এখন আবার দুই ইউনিয়নের রেষারেষি। ম্যানেজার জীবন ঘোষাল মেয়ের সঙ্গে চাটুজ্জের ছেলের বিয়ে দিতে না পারায় আগের মতোই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। আগের শত্রুতাই মনে পুষছেন। কিন্তু মাঝের দুটো বছর আবার ওই সোমেশ্বর চাটুজ্জের জন্যেই কুলি-মজুর নিয়ে ঝামেলায় পড়তে হয়নি বলে আবার তাঁর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতেও চেষ্টা করছেন। সোমেশ্বর আগেও যেমন পরেও তেমনি। দূরে ঠেললে সেধে যান না, কাছে এলে বিনীত অভ্যর্থনা জানান। এখন দু'দুটো ইউনিয়নের মাঝে পড়ে জীবন ঘোষাল উভয় পক্ষকেই তেল দেন। কিন্তু কোনো পক্ষেই নেই বলে সোমেশ্বর চাটুজ্জে তাঁর যে শত্রু সেই শত্রু।

তৃতীয় বছরের শুরু থেকে অনেক দিকেই বেশ ভালো রকমের গণ্ডগোল দানা বেঁধে উঠল। যার ফলে শুধু এস-ডি-ও ধ্রুব চ্যাটার্জী নয়, বর্ধমানের খুড়শ্বশুর ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটটিও এই একজন অর্থাৎ সোমেশ্বর চাটুজ্জের ওপর বেশ ক্ষুন্ন। মনে মনে মাধুরীও শ্বশুরের ওপর খুব খুশি নয়। সে কাকার কাছে বা ধ্রুবর কাছে যেমন শোনে তেমনি বোঝে। শ্বশুরটি এখনো তার ভালবাসার গুরুজন যতো না, তার থেকে বেশি সমীহ করার মানুষ। চেষ্টা করেও এখন পর্যন্ত মাধুরী শ্বশুর বা শাশুড়ীর কাছে খুব সহজ হতে পারে না। ধ্রুবর ভুল, আগে যেমন সে বাবার সমালোচনা করতো, মাধুরীর সামনে এখনো তাই করে।

বাহারীতে এখন ঝামেলা লেগেই আছে। ঝামেলা জমি নিয়ে। ঝামেলা কোলিয়ারি নিয়ে। দুই ইউনিয়নের একটি চতুর ইউনিয়ন মওকা বুঝে সব-দল-মতের ঊর্ধ্বে সোমেশ্বর চাটুজ্জেকে তাদের মুকুটমণি করে বসানোর জন্যে খনি-কুলিদের আর মজুরদের ফুসলাচ্ছে। ফলে তারা দল বেঁধে এসে দাদাঠাকুরের কাছে হত্যা দিয়ে পড়েছে। এটা সম্ভব হলে বিপক্ষ দলের কুলিমজুরেরাও যে সার বেঁধে অন্য দিকে চলে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্যদিকে ওদেরই ফুসলানিতে হরিহর ঘোষের অনেক চাষী ভাগে ভাগে বর্গাদার হিসেবে নাম লিখিয়েছে। তাই নিয়ে লাঠালাঠি মারামারি। ভালো-করা লোকের দল সোমেশ্বর চাটুজ্জের ওপরেই চোখ রাঙিয়ে চড়াও হয়েছে।—অপারেশন বর্গার আদর্শ ভালো কি খারাপ?

একটুও না ভেবে সোমেশ্বর জবাব দিয়েছেন, নিশ্চয় ভালো। কিন্তু আপনাদের অপারেশনে গলদ আছে। তাই এত রক্তপাত।

—আপনি তাহলে হরিহর ঘোষকে মদত দিচ্ছেন কেন—নিজের জমিই বা এ-ভাবে আঁকড়ে ধরে বসে আছেন কেন?

—আমি কাউকে মদত দিইনি, নিজের দশ বিঘে জমিও ওদের কাছে ন্যায্য দামেই বেচে দিয়েছি।

তারা শুনে অবাক। চোখেমুখে অবিশ্বাস। ছ'মাস আগেও সোমেশ্বর চাটুজ্জের চাষীদের ফুসলাতে চেষ্টা করে তারা বংশীর কাছে নাকাল হয়েছে। তারা শাসিয়েছে, আমরা ভালো লোক নই গো বাবারা,—অতীতে অনেক কুকর্ম করেও দাদাঠাকুরের দয়ায় ভালো জেবন পেয়েছি—তাঁর পেছনে কেউ লাগাতে এলে রক্তগঙ্গা হয়ে যাবে।

আর আজ কিনা শুনছে দশ বিঘে জমি চাষীদের ন্যায্যমূল্যে বেচে দেওয়া হয়েছে। খোঁজ নিতে গিয়ে দেখে, তাই। তাদের আক্রোশ আরো বাড়ল বই কমল না। চাষীদের দৈন্যদশা জানা আছে। নগদ টাকা দেওয়া দূরে থাক, চাষের খরচও জোটাতে পারে না। সব স্রেফ কাগজ-কলমের ব্যাপার, আর চুক্তির ব্যাপার। তাছাড়া কেউ মদত না দিলে হরিহর ঘোষের বা অত সাহস হয় কি করে? তার জমি নিয়ে মারামারি লাঠালাঠি হয় কি করে?

সোমেশ্বর চাটুজ্জের সম্পর্কে রটনা শুরু হয়ে গেল। সরকারী দপ্তরে নালিশ গেল, তাঁর ছেলে অমুক চাটুজ্জে অমুক জায়গার এস-ডি-ও। ছেলের শ্বশুর ওই বর্ধমানেরই জেলা-হাকিম। সেই জোরে সোমেশ্বর চাটুজ্জের এত প্রতাপ এত প্রতিপত্তি এত অন্যায় অত্যাচার। এমন অনেক লোককে পুষছেন তিনি যারা সময়ে ধরা পড়লে কঠিন দণ্ডে

দণ্ডিত হতে পারত ইত্যাদি—। এই নালিশের খবর কাগজেও ছাপা হল।

ধ্রুব চ্যাটার্জী বাপের ওপরেই রেগে আগুন। এসে সোজা বলল, কত বার বলেছি এ-সবের মধ্যে থেকো না, যেও না—তোমার জন্য কি এখন আমরা চাকরি-বাকরি ছেড়ে বসে থাকব?

ঠাণ্ডা ভর্ৎসনার গলায় সোমেশ্বর বললেন, বাজে বকিস না। তোরা কি ঋষি অরবিন্দ না বিপ্লবী সুভাষ বোস যে অমন রাজসিক চাকরি ছেড়ে দিবি? তারপরেই হাসি।—হ্যাঁ রে, এই রটনা আর নালিশ কত মিথ্যে জেনেও তোর রাগ হচ্ছে? ঘেন্না হচ্ছে না? তোর খুড়শ্বশুরকে বলে দিস, আমার কোথাও কোনো অপরাধ দেখলে তিনি যেন তাঁর কর্তব্য করে যান।

মুখ ভার করে পরে মাধুরী বলেছে, চেনই তো নিজের বাবাকে, ও-ভাবে বলতে গিয়ে লাভ কি?

যাবার আগে মাধুরীর আরো মুখ ভার। শ্বশুর ছেলেকে বলেছেন, এই বিপন্ন যুগটাকে কি করে বাঁচাতে পারিস সেই চিন্তা কর, দলাদলি খেয়োখেয়ি করে দেশটাকে যে চোর ডাকাত খুনী লোভী আর সমাজবিরোধীর হাতে ঠেলে দিচ্ছে সব। তোদের ঘুম হয় কি করে?

দিন কতক না যেতে আবার এমন এক গণ্ডগোলের মুখোমুখি হলেন সোমেশ্বর চাটুজ্জে যা তিনি নিজেও কখনো কল্পনা করেননি। একদিন আলুথালু চুল গনগনে মুখ দিশেহারার মতো তাঁর বাড়িতে এসে উপস্থিত শেফালিকা—শিউলি। পাগলের মতো যা বলতে লাগল, শুনে সোমেশ্বর স্তব্ধ। আচরণ দেখে মাথার ভারসাম্য খোয়াতে বসেছে মনে হল।

—আমি আর কোথাও যাব না, এখান থেকে এক পা নড়ব না—এখান থেকে নিতে হলে আমার মরা শরীরটাকে নিতে হবে—জ্যান্ত কেউ নিতে পারবে না! আমার বিরুদ্ধে কি ভীষণ ষড়যন্ত্র চলেছে বুঝতে পারছেন না মেসোমশাই? ওরা আমার পিছনে আবগারি পুলিস লেলিয়ে দিয়েছে! ওরা টাকা দিয়ে মদ দিয়ে আমার ঘরের লোককে এখন শত্রু করে তুলেছে! তাকে ছিনিয়ে নিয়েছে! এখন সে-ই আমাকে দা নিয়ে তাড়া করে, দিনের মধ্যে দশবার করে মেরে তাড়ায়। টাকা গিলে মদ গিলে আমাকে কোথায় কার কাছে পাঠাতে চায় বোঝেন না? বুঝতে পারেন না? আর আমি যাই কোথাও! নিক দেখি আমাকে এখান থেকে কে নেবে!

সোমেশ্বর বিমূঢ়। তিনি বুঝতে পারেন। এই বয়সেও রূপ ওর কাল। তাড়াতাড়ি সান্ত্বনা দেন, ঠিক আছে ঠিক আছে, তোর যতদিন ইচ্ছে মাসির কাছে থেকে যা।

শিউলি বিশ্বাস করতে চায় না। উদভ্রান্ত চাউনি।—সত্যি বলছেন? আমাকে বার করে দেবেন না? নিতে এলে তাড়িয়ে দেবেন না?

সোমেশ্বর আশ্বাস দেন। বার করে দেবেন না। তাড়াবেন না।

সত্যি নিতে এলো। তার স্বামী বলাই কুশারি সদর্পে এসে শিউলিকে দাবী করল। একলা নয়। দু'চারজন সঙ্গী নিয়ে এসেছে। সোমেশ্বর বললেন, শিউলি অসুস্থ, আমি তার চিকিৎসা করছি। সুস্থ হলে পাঠাবার কথা ভাবব।

বলাই কুশারি না-ছোড়। তার এই মূর্তি আগের সে মূর্তি নয়। হঠাৎ সে এত জোর

কোথায় পেল সোমেশ্বর তা-ও অনুমান করতে পারেন। সে চেঁচামেচি করে পাড়া মাথায় করে তুলল। বউয়ের চিকিৎসার দরকার হয় সে নিজে করবে—ডাক্তার দিয়ে করাবে —তিনি আটকে রেখেছেন কোন আক্কেলে? তিনি কি ডাক্তার? অসুখ না হাতী—শিউলির বজ্জাতির খবর গ্রামসুদ্ধ মানুষে কে না জানে—তার চরিত্রের খবরই বা কে না রাখে? এতবড় বংশের সন্তান এমন একটা মেয়েকে অন্দরে ঠাঁই দিয়েছেন এই বা কেমন কথা? এবারে বউ নিয়ে গিয়ে জীবনের মতো তাকে টিট করবে—স্বামীর অবাধ্য হবার ফল কি বুঝিয়ে ছাড়বে।

সোমেশ্বরের কিছু বলার দরকার হয়নি। বিহারী এসে দাঁড়িয়েছে। বলেছে, আমার লোক বাইরে অপেক্ষা করছে, আপনি শুধু একবার হুকুম দেন কর্তা—এদের আমি ধড় আর মাথা দু'ফাঁক করে দিই!

—তুমি কেন বিহারীদা, আমার হাত নেই? আমার গতর নেই—সরো সরো সব —আজ আমি ওর রক্ত খাব—ওর রক্তে চান করব!

আনাজ কোটার প্রকাণ্ড বঁটি হাতে শিউলি। আদুড় গা। উন্মাদিনী মূর্তি। বিহারী বঁটিসুদ্ধু তাঁর হাতটা ধরে ফেলেছে। তাকে আঁচড়ে কামড়ে দা-টা ছাড়াবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে শিউলি। দু'চোখ আগুনের গোলা। পিছন থেকে বাসন্তীও এসে জড়িয়ে ধরেছেন তাকে।

সঙ্গীদের নিয়ে বলাই কুশারি পালিয়ে বেঁচেছে। অনেক দূরে এসে তবে দম ফেলেছে। তারপর শাসিয়েছে, দেখে নেবে। জন্মের মতো দেখে নেবে।

গ্রামসুদ্ধু ছড়িয়েছে ব্যাপারটা। চাটুজ্জে বাড়ি না হয়ে আর কারো বাড়ি হলে সকলে উল্টো বুঝত, ভুল বুঝত। তা বলে, গাঁয়ের লোকের ভালো করার জন্য যারা জাঁকিয়ে বসেছে এখানে, তারা এ মওকা ছাড়বে কেন? শিউলি নামে একটা নষ্টচরিত্র মেয়েছেলে আছে সে কি তাদের জানতে বাকি? তাকে বাড়ির অন্দরমহলে এনে তোলার অর্থটা কি? এই সুযোগে তারা কুৎসা রটাতে টিপ্পনী কাটতে ছাড়বে কেন? এর পরেও যদি গাঁয়ের লোকের চোখ না খোলে তবে খুলবে আর কবে?

কিন্তু ফল দাঁড়ালো বিপরীত। এমন কথা বংশী বরদাস্ত করবে না খনির মজুরেরা বরদাস্ত করবে। রটনায় যারা নেমেছিল তাদেরই জনাকয়েকের হাত ভাঙল, মাথা ফাটল। নিজেদের দলাদলি ভুলে একসঙ্গে তারা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছুটল। তেমন আশ্রয় একটাই। জীবন ঘোষালের বাড়ি। বাহারীর মানুষ যে এত মুখ্যু এত নির্বোধ আবাব এমন ভীষণ গোঁয়ার এ কি তারা জানত?

এর তিনদিন বাদে ধ্রুব চ্যাটার্জী এলো। আসার পথে গাঁয়ের লোকেরাই সব জানালো। বাবার শুভার্থীরা কেউ কেউ পরামর্শ দিল, বাবাকে এবারে একটু মাথা ঠাণ্ডা করে চলতে বলো, দিন-কাল ভালো নয়। তার ওপর এবারে জীবন ঘোষাল ক্ষেপেছে, দু'তিন দলের লোকই তার বাড়ি যাচ্ছে, জটলা করছে। পরের পাগল বউ ঘরে রেখে ঝুঁকি নেওয়ার কি দরকার?

সোমেশ্বর কি কাজে বেরুচ্ছিলেন, ফটকের সামনে ছেলের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। একগাল হেসে নাতি কোলে নিলেন। আদর করলেন। লোফালুফি খেললেন। নাতি খিল-খিল করে হাসে। দাদুও।

তারপর ছেলের দিকে চেয়ে অবাক একটু।—কি রে, মুখ এত হাঁড়ি কেন?

হাঁড়ি নয়, ছেলের মুখ থমথমে। মাধুরী নিঃশব্দে শ্বশুরকে প্রণাম করল। এটা নিজে থেকেই না করে পারে না।

—তোমার সঙ্গে কথা আছে। ধ্রুবর থমথমে গলা।

সোমেশ্বর সকৌতুকে চেয়ে রইলেন একটু। বললেন, আমি একটু কাজ সেরে আসি...তোরা বেশিক্ষণ থাকবি না?

—না। তোমার কাজটা খুব দরকারী?

—খুব না।

ছেলের ইশারায় মাধুরী দাদুর কাছ থেকে বাচ্চাটাকে নিয়ে ওপরে চলে গেল।

একটুও ভণিতা না করে ধ্রুব চ্যাটার্জী জিজ্ঞাসা করল, যা শুনছি সব সত্যি?

—কি শুনেছিস? কোথায় কখন শুনেছিস?

—তুমি ঠিকই বুঝেছ।

—কি ব্যাপার রে? কি বুঝেছি?...ও শিউলির ব্যাপারটা?

—হ্যাঁ। সে এখানে আছে?

—আছে।

—বলাই কুশারি তাকে নিয়ে যেতে এসেছিল. তুমি দাওনি?

—ও মতলব নিয়ে এসেছিল, ফিরিয়ে নিতে আসেনি।

ধ্রুব অসহিষ্ণু।—যে মতলবই থাক, সে তার স্ত্রীকে নিতে এসেছিল। আর এই নিয়ে কথা উঠেছিল বলে পরে মারামারি পর্যন্ত হয়ে গেছে?

নির্লিপ্ত মুখ করে সোমেশ্বর জবাব দিলেন, সেই রকমই তো শুনলাম, যত সব পাগলের কাণ্ড।

কঠিন গলায় ধ্রুব চ্যাটার্জী বলল, পাগলের কাণ্ডব মধ্যে তুমি নিজেকে জড়াচ্ছ কেন? কেন তাকে আটকে রাখলে?

সোমেশ্বর এবারে গম্ভীর একটু।—আমি আটকে রাখিনি। শিউলি নিজে দিশেহারা হয়ে এসেছে। ও সত্যি অসুস্থ. মাথার গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। আমি তার চিকিৎসা করছি। চিকিৎসার থেকেও ওর নিরাপদ ভাবে এমন আশ্রয় বেশি দরকার।

খুব স্থির কঠিন গলায় ধ্রুব চ্যাটার্জী বলল, সকলের সব দরকার তুমি কতটা মেটাতে পারো? যাক, যে অসুস্থ, কালকের মধ্যেই তাকে আমি শহরের হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি—আশ্রয়ও পাবে, চিকিৎসাও হবে।

সোমেশ্বরের ঠোঁটের ফাঁকে মজাদার হাসি একটু। ব্যঙ্গদৃষ্টি ছেলের মুখের ওপর চক্কর খেয়ে স্থির হল। বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ এস-ডি-ও সাহেব, দরকার হলে সবার আগে আমি আপনার শরণাপন্ন হব।

হাসতে হাসতে চলে গেলেন। ধ্রুব চ্যাটার্জীর মনে হল তার মুখের ওপর বাবা শপাং করে চাবুক বসিয়ে চলে গেল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল একটু। তার পর দোতলায় উঠল। মায়ের কোলে তার ছেলে। সামনে মাধুরী বসে। ছেলের মুখের দিকে চেয়ে মা অবাক একটু।—কি হল?

—কিছু না। মাধুরীকে বলল, চলো এক্ষুনি যেতে হবে।

বাসন্তী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন।—সে কি রে, এই এলি এই যাবি, মুখ হাত ধুয়ে যা-হোক একটু খেয়ে নে।

ধ্রুব চ্যাটার্জী রাগে ফেটেই পড়ল।—কিচ্ছু দরকার নেই—আমি এক্ষুণি যাব—বুঝলে? আমাদের থেকে গাঁয়ের সকলেই বাবার বেশি আপনার। যাক, বাবা ফিরলে তাকে স্পষ্ট বলে দিও যত দিন শিউলি এ বাড়িতে থাকবে ত ত দিন যেন আর আমাদের আশা না করে!

একটা অব্যক্ত আঘাতে বাসন্তীর সমস্ত মুখ মুহূর্তে বিবর্ণ।—এ তুই কাকে কি বলছিস ধ্রুব?

—তোমাকে বলিনি মা। তুমি দুঃখ পেও না। যাঁকে বলেছি তিনি অনেক দিন ধরে এ-রকম শোনার রাস্তা করে চলেছেন। মাধুরী, চলো—

সে আগেই বেরিয়ে এলো। পিছনে ছেলে-কোলে নিঃশব্দে মাধুরী। হঠাৎ সন্ত্রস্ত, সচকিত তারা। সিঁড়ির একপাশে শিউলি দাঁড়িয়ে। আদুড় গায়ে শাড়ি জড়ানো। দু'চোখ ধক ধক জ্বলছে। গলা দিয়েও হিসহিস আগুন ঝরল।—কি বললি? মাসিমাকে কি বলে এলি তুই? শিউলি থাকলে তুই আর এ-বাড়ি আসবি না? বাপের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবি না? অমন বাপের এই কুলাঙ্গার ছেলে তুই? তুই জ্বলবি জ্বলবি জ্বলবি! কোনোদিন আর এ জ্বলুনির শেষ হবে না। দেখবি দেখবি দেখবি!

বাসন্তী ছুটে এসে শিউলিকে জড়িয়ে ধরে টানতে টানতে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। ধ্রুব আর মাধুরী স্তব্ধ। মাধুরীর বুকের তলায় কাঁপুনি। তারই মধ্যে কোলের ছেলের হঠাৎ খিলখিল হাসি।

রাত হল। সোমেশ্বরকে বাসন্তী একটি কথাও বললেন না। ভোর হল।

আবার সন্ত্রস্ত সচকিত সকলে। শিউলি নেই। ঘরে নেই। ঠাকুরদালানে নেই। পুকুরঘাটে নেই। কোথাও নেই। লোক পাঠানো হল। চারদিক তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। বলাই কুশারির ওখানেও যায়নি। শিউলি হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

একদিন গেল, দু'দিন গেল, তিনদিন গেল। শিউলি হাওয়ায় মিলিয়েই গেছে।

সোমেশ্বর স্ত্রীর কাছে সেদিনের ঘটনা শুনেছেন। ছেলে কি বলে গেছে শুনেছেন। আর শিউলি ছেলেকে কি বলে গেছে তাও শুনেছেন। কোনো মন্তব্য করেননি। ছেলেকে নিজের হাতে একটা চিঠি শুধু লিখেছেন।—শিউলিকে তাড়াতে হয়নি। নিজেই চলে গেছে। কোথায়, কেউ জানে না। এটাই তার অদৃষ্ট ছিল। দাদুভাইকে নিয়ে তোমরা আসতে পারো।

চিঠি পাওয়ার তিন চার দিনের মধ্যে ছেলে বউ নিয়ে ধ্রুব চ্যাটার্জী এসেছে। কিন্তু বাবার মুখের দিকে খুব সহজ ভাবে তাকাতে পারেনি।

প্রায় তিন সপ্তাহ বাদে বাহারীতে একটা খবর ছড়াতে লাগল। দূরে অজয়ের ধারে রাতে এক পাগলিনীর হাসি শোনা যায় মাঝে মাঝে। নিষুতি রাতে কখনো বা দামোদরের ধারেও। কেউ কেউ স্পষ্ট করে না হোক তাকে দেখেছে। তার হাড়কাঁপানো হাসি শুনেছে। আবার আঁধার রাতে শালবনের দিক থেকেও তার হাসি শোনা যায় কখনো কখনো। যতদূর মনে হয় সেই উন্মাদিনী বাহারীর শিউলি ছাড়া আর কেউ নয়। আর কেউ হতে পারে না। কারণ এরপর কাছে যেতে সাহস না করলেও অনেকটা কাছ থেকে কেউ

কেউ তাকে দেখেছে। হাসি শুনেছে। কথা শুনেছে। কথা বলে কথা—একেবারে হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগার মতো কথা। সে আকাশের দিকে চেয়ে হি-হি করে হাসে আর বলে, বলে আর হাসে। বলে, বাহারী হেজে পচে গলে খসে খসে পড়ল বলে! কেবল একজনের জন্য পারছে না। কিন্তু সেই একজন আর কতকাল আগলে রাখবে বাহারীকে? বাহারীর সর্ব অঙ্গে যে পোকায় ধরেছে, পোকা কিলবিল করছে—মরবে মরবে, বাহারীর মরণ কেউ ঠেকাতে পারবে না—সেই একজন সরে গেলেই বাহারী মরবে—পচবে—খসবে—জ্বলবে—জ্বলবে জ্বলবে জ্বলবে।

এই থেকেই বোঝা যায়, উন্মাদিনী শিউলি ছাড়া আর কেউ নয়। আর কেউ হতে পারে না।

খবর সোমেশ্বরেরও কানে এসেছে। তিনি নির্লিপ্ত। আর বিহারী রাত-বিরেতে বেরোয় খবরটা সত্যি কিনা যাচাই করতে—শুনে সোমেশ্বর তাকে নিষেধ করেছেন।

## বারো

বাহারীর দিনগুলো থিতিয়ে থিতিয়ে পার হচ্ছে। ঘটনা নেই, রটনা নেই, বা জটলা নেই এমন দিন কমই যায়। চাষের জমি নিয়ে হাঙ্গামা বাড়ছেই। হরিহর ঘোষ হিমসিম খাচ্ছেন। দিনের মধ্যে ক'বার করে সোমেশ্বরের কাছে পরামর্শ নিতে আসেন। রাজনীতির দলগুলির সেই কারণেও আক্রোশ। তাদের নিজেদের মধ্যে রেষারেষির বিরাম নেই, কিন্তু সোমেশ্বর চাটুজ্জের প্রতি বিমুখ সকলেই। শিউলির ব্যাপারটা তারাই জুড়োতে দিচ্ছে না। সামনাসামনি পড়লে তাদের আচরণ উদ্ধত। পিছন থেকে কে তাদের ইন্ধন যোগাচ্ছেন সোমেশ্বরের তাও অজানা নেই। কোলিয়ারির ম্যানেজার জীবন ঘোষালের বাড়িতে এক এক দলের এক একদিন মিটিং হয়। সপ্তাহে দু'তিন দিন সোমেশ্বরের ও এলাকায় টহল দেওয়া বরাদ্দ। খবর কানে আসবে না কেন। কোলিয়ারির দুই ইউনিয়নেরই মাথা ঠাণ্ডা আপাতত। টাকা খেলাতে জানলে কি না হয়। জীবন ঘোষাল খেলাতে জানেন।

কিন্তু বলা নেই কওয়া নেই ওই কোলিয়ারিতেই হঠাৎ আবার গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠল। একই দিনে দুই ইউনিয়ন মিটিং ডেকে বসার ফলে ছোটখাটো গোছের মারামারি হাতাহাতিও হয়ে গেল। কুলিবস্তি এলাকার লোকের মুখে সোমেশ্বর তখনই শুনলেন মাসখানেক হল ম্যানেজার জীবন ঘোষাল বাহারীতেই নেই। তিনি কলকাতায়। সোমেশ্বরের অনুমান, দু-কূল সামাল দেবার লোক নেই বলেই এই অশান্তির সূত্রপাত। কিন্তু জীবন ঘোষাল টানা এক মাস ধরে কলকাতায় বসে কেন তিনি ভেবে পেলেন না।

এমনি ঘটনা রটনা আর জটলার মধ্য দিয়ে আরো একটা মাস পার হতে চলল। আশ্বিন পেরুলো। পূজো এলো। গেল। এ সময়টা সোমেশ্বরের খুবই ব্যস্ততার মধ্যে কাটে। এবারও ব্যস্তই ছিলেন। অনেকদিনের মধ্যে খনির কুলি এলাকার দিকেও যাওয়া হয়নি। এ সময়টা এই চাটুজ্জে বাড়িতেই অবিরাম লোক আনাগোনার স্রোত দেখা যায়। বিজয়ার পর ভদ্রলোকের তো কথাই নেই, কাছের দূরের সমস্ত শ্রেণীর মেয়ে পুরুষদের এ-বাড়িতে আসা আর প্রণামের ধুম পড়ে যায়। তাই দেখে রাজনীতির পাণ্ডারাও একটু হকচকিয়ে গেছল।

যাক, লক্ষ্মীপুজো কেটে গেছে। লোকের আসা-যাওয়াও বন্ধ হয়েছে। সেদিন রাতে সবে আহ্নিক সেরে নিজের ঘরে এসেছেন সোমেশ্বর, বিহারী দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল। —কোলিয়ারির মানিজার এসেছেন—কি করব?

এমন মুখ করে বলল, যেন জানতে চায়, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়াবে না মাথাটা ছিঁড়ে নেবে। সোমেশ্বরও অবাক বটেই।—ঘোষাল সাহেব?

—জি।

মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে বললেন, বসতে বল্।

নিচে নেমে এলেন। জীবন ঘোষাল দাঁড়িয়েই ছিলেন। তাঁকে দেখামাত্র সোমেশ্বর প্রায় চমকেই উঠলেন। দু'মাসের ওপর দেখেননি। মানুষটার এই মূর্তি কল্পনা করতে পারেন না। শুকনো ফ্যাকাশে মুখ। সেই চেকনাইয়ের ছিটে ফোঁটাও নেই। চোখ দুটো গর্তে ঢুকে গেছে, নাকের দু'পাশের হাড় দুটো উঁচিয়ে উঠেছে। শরীরের ওপর দিয়ে কত বড় ঝড় বয়ে গেলে এমন হয় সোমেশ্বর ভেবে পেলেন না।

কিছু বলার আগে জীবন ঘোষাল এগিয়ে এলেন। ঝুঁকে পায়ের ধুলো নিতে গেলেন। সোমেশ্বর চকিতে সরে এলেন।—ওকি! বসুন আপনি, বসুন। কি হয়েছে? অনেকদিন কোলকাতায় ছিলেন শুনেছিলাম...চিকিৎসার জন্য নাকি?

জীবন ঘোষাল আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন। দু'চোখ মাটির দিকে। অল্প অল্প কাঁপছেন মনে হল।

—ইস্! শরীর তো সাংঘাতিক খারাপ হয়েছে দেখছি আপনার। বসুন এখন একটু সুস্থ আছেন তো?

দ্বিতীয়বার বলার পরেও জীবন ঘোষাল বসলেন না। এবারও মুখের দিকে না চেয়ে মাথা নাড়লেন শুধু। অর্থাৎ এখনো সুস্থ নেই।

সোমেশ্বর তৃতীয়বার বললেন, আপনি বসুন—দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

এইবার চোখে চোখ তুললেন জীবন ঘোষাল। এবং তৃতীয়বার মাথা নাড়লেন। বসবেন না।

সোমেশ্বর থমকালেন। চাউনি স্থির হল একটু—কি হয়েছে আপনার?

—পাপের শাস্তি পাচ্ছি।

সোমেশ্বর এবারে তাঁর আপাদমস্তক দেখলেন একবার। নির্বাক কয়েক মুহূর্ত। —আপনি আমার কাছে এসেছেন কেন?

জীবন ঘোষাল আকুল গলায় বলে উঠলেন, আমার পাপের শেষ নেই, কিন্তু আপনি মহৎ—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন—আপনি আমাকে বাঁচান—তারপর যে শাস্তি বলবেন আমি মাথা পেতে নেব—যে প্রায়শ্চিত্ত বলুন—করব। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি আমাকে বাঁচান।

সোমেশ্বর চুপচাপ চেয়ে আছেন। দেখছেন। স্থির, শান্ত। বললেন, মানুষের বিচারের অধিকার ভগবান আমাকে দেননি, সেবার অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু আপনার রোগের চিকিৎসা আমি খুব কমই করেছি। আপনি যোগ্য লোক সন্ধান করুন।

একবার ভালো করে মুখ খুলতে পেরেই জীবন ঘোষাল যেন কিছুটা জীবনের আশ্বাস পেয়েছেন।—আমি অনেক দেখিয়েছি, অনেক করেছি। আপনি আমাকে ভালো করতে

পারবেন কিনা আমি জানি না—কিন্তু আপনি আমাকে বাঁচাতে পারবেন। এই পাপীকে ভগবানই সেই রাস্তা দেখিয়েছেন।...রাতে ঘুম হয় না মাসের পর মাস, আজ ভোর রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম...ঘুমের মধ্যে দেখলাম আমি এক ভয়ংকর অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যাচ্ছি, তলিয়ে যাচ্ছি—আর আর্তনাদ করছি। শেষ মুহূর্তে দেখলাম একজন আমার হাত ধরেছেন, টেনে তুলছেন।...দেখলাম, সেই একজন আপনি। আপনি আমাকে দয়া করুন—দয়া করুন।

সোমেশ্বর চাটুজ্জে স্তব্ধ খানিকক্ষণ। মনে হল এ-ও ভগবানের এক বিচিত্র পরীক্ষা। চোখ বুজলেন। মনে মনে বললেন, তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হোক। তাকালেন। বললেন, দয়া নয়। আমি চেষ্টা করব।...প্রস্তুত হতে সময় লাগবে কিছু। কিন্তু এবার আমি বলছি, আপনি নিঃসংকোচে বসুন।

জীবন ঘোষাল বসলেন।

সপ্তাহে একদিন করে জীবন ঘোষাল রাতের অন্ধকারে খুব সংগোপনে আসেন। তেমনি সংগোপনে চলে যান। শুধু বিহারী জানে। আর বাসন্তী জানেন। তিনি স্বামীকে একবারই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এখানে উনি যে?

শান্ত মুখে সোমেশ্বর বলেছেন, ওপরঅলার ইচ্ছেয়! কিছু জিজ্ঞেস কোরো না।

আর একজন টের পেল। ছেলে ধ্রুব চ্যাটার্জী। একদিন সে যখন এখানে, জীবন ঘোষালও এই বাড়িতেই। মাকে জিজ্ঞেস করতে তিনি শুধু বলেছেন, এ-বাড়িতে উনি কেন জানেন না। কিন্তু যে জানে অর্থাৎ বিহারীই রাগে গজ-গজ করতে করতে ফাঁস করে দিল।—উনি দেড় মাস ধরেই সপ্তাহে একদিন করে এখানে আসছেন খোকাদাদা —কর্তাবাবু তাঁর খারাপ ব্যামোর চিকিচ্ছে করছেন! আমি সমস্ত গাঁয়ে আর গাঁয়ের বাইরে টহল দিয়ে বেড়াই—ওঁর চরিত্তি জানতে আমার বাকি! উঃ খোকাদাদা, কর্তাবাবু কি মানুষ গো—এই লোকের চিকিচ্ছে করছেন!

তেমনি ধাক্কা খেয়েছে ধ্রুব চ্যাটার্জীও। শিউলির এ হাল কেন পরে এই বিহারীর মুখেই সে-বৃত্তান্ত শুনেছিল। ওই জীবন ঘোষালই টাকা দিয়ে আর মদ গিলিয়ে বলাই কুশারিকে বস করেছিল।...কিন্তু টাকার এত জোর জীবন ঘোষালের যে সেই টাকা ঢেলে বাবাকে দিয়েও কুৎসিত রোগের চিকিৎসা চালাচ্ছে দেড় মাস ধরে? এই দেড় মাসে বাবা কত টাকা পেয়েছে যে এমন মতি! কত কত কত টাকা?

রাগে বিতৃষ্ণায় ও নিয়ে বাবার সঙ্গে একটি কথাও বলল না। আর সপ্তাহ তিনেক, বড় জোর এক মাসের মধ্যে তার বদলির অর্ডার এসে যাবে। প্রমোশন পেয়ে এবারে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হবে। কোথায় পোস্টিং হবে জানে না। কিন্তু এখান থেকে যতো দূরে হয় ততো ভালো। পাঁচ-সাত দিনে একবার করে দেখা করার বা কর্তব্য পালনের প্রশ্ন উঠবে না।

এবারে ছেলে চলে যাবার পর একদিন দু'দিন করে আরো পনেরটা দিন কাটল। এক নাগাড়ে পনেরদিন আসেনি, এ-রকম বড় হয়নি। কিন্তু সোমেশ্বর নিরুদ্বিগ্ন। তিনি জানেন, ছেলের প্রমোশন আসছে, বদলি আসছে। সেই কারণে ব্যস্ত থাকা স্বাভাবিক।

পৌষের মাঝামাঝি এটা। শীত এবারে চেপে এসেছে। সঙ্গে কনকনে বাতাস। দিনের

বেলাও হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি। কিন্তু সোমেশ্বরের দেহের সঙ্গে ছয় ঋতুর কোনোটিরই ছোঁয়াছুঁয়ি নেই। সকালের সূর্য-প্রণাম থেকে রাতের শয়ন-প্রণাম পর্যন্ত একই ভাবে দিন চলে। সেদিনও ভোররাতে হেঁটে দামোদরে গেছেন। স্নান সেরেছেন। নৈমিত্তিক স্তব পাঠ করেছেন। হেঁটে ফিরেছেন। ঠাকুরদালানে মায়ের পূজো সেরে একটু জল-টল খেয়ে ওষুধের বাক্স নিয়ে আবার যখন বেরিয়েছেন তখন সকাল সবে আটটা। আজ আদিবাসী সাঁওতালদের এলাকায় যাবার কথা। চারমাইল হাঁটা পথ।

জি টি রোডে পড়তেই হঠাৎ মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল কেমন। এত ঠাণ্ডাতেও শরীরের ভিতরে আচমকা একটা গরম তাপ। সোমেশ্বর থমকে দাঁড়ালেন। বুকের বাঁ দিকে একটু খোঁচা খোঁচা ব্যথার মতো। অত শীতের সকালে চান করার ফল হয়তো। কিন্তু এ-রকম তো বড় হয় না।

কি ভেবে সাইকেল-রিকশয় উঠলেন। চললেন। খানিক বাদেই আবার সেই ব্যথা। এবারে বেশি। আর ভিতরে একটা আগুনের তাপ। চামড়া ফুটে বেরুচ্ছে। মাথাটা সোজা রাখতে পারছেন না।

সাইকেল রিকশ থামালেন। বললেন, যাব না। বাড়ি চল।

বাড়ি। নামলেন। ফটক দিয়ে বেরিয়ে আসছে হরিহর ঘোষ। তাকে দেখে কি বলতে গেলেন। সোমেশ্বর হেসেই একটা হাত তুলে থামালেন তাঁকে। রিকশর পয়সা দিয়ে বললেন, পরে শুনছি। এ-বস্তুটার হঠাৎ কিছু একটা গড়বড় হয়ে গেল মনে হচ্ছে— একটু অপেক্ষা করুন, ডাক্তার ডাকতে হবে কিনা দেখি।

দাওয়া পেরিয়ে দোতলায় উঠতে লাগলেন। হরিহর ঘোষ অবাক। হাসছেন। অথচ এ আবার কি বলছেন?

অসময়ে ফিরতে দেখে বাসন্তীও অবাক।—এরই মধ্যে ফিরলে যে?

সোমেশ্বব আবার হাসলেন।—ফিরলাম কোথায় আমাকে ঘাড় ধরে ফেরালে। বাক্সটা বাড়িয়ে দিলেন, ধরো। শোব একটু।

বাসন্তী চমকে উঠলেন।—এ কি! দরদর করে ঘামছ যে! কি হল? শরীর খারাপ লাগছে নাকি?

ঠোঁটে হাসি। সোমেশ্বর বিড়বিড় করে বললেন, বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নবোঽপরাণি।

এর অর্থ বাসন্তী জানেন। তাঁর দুই চক্ষু স্থির। বুকের তলায় কাঁপুনি।

গায়ের চাদরটা ফেলে সোমেশ্বর শুয়ে পড়লেন। গায়ে ফতুয়া। বাসন্তী তাড়াতাড়ি কম্বল চাপা দিতে গেলেন। কিন্তু ঘামে ফতুয়া ভিজে গেছে দেখে কম্বল ফেলে তাড়াতাড়ি গামছা নিয়ে এলেন।

ব্যথা বাড়ছেই। ঘাম বাড়ছেই। যন্ত্রণা সহ্য করার চেষ্টায় মুখ বিকৃত না করে সোমেশ্বর হাসি দিয়ে চাপা দিতে চেষ্টা করছেন। ঘাম মুছতে মুছতে বাসন্তী সেই যন্ত্রণা ঠিক টের পেলেন।—আমি এখন কি করব—বিহারী ছুটে যাক, একজন ডাক্তার ডেকে আনুক!

ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন। বারান্দা থেকে চিৎকার করে ডাকলেন, বিহারী! বিহারী!

বিহারীর সঙ্গে হরিহর ঘোষও ছুটে এলেন। অবস্থা দেখে তারাও দিশেহারা। বাসন্তীর তখন লাজলজ্জা নেই। বাইরের লোক দেখে অভ্যাসে মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে বললেন, হঠাৎ কি হল—এক্ষুনি একজন ডাক্তার আনা দরকার!

সোমেশ্বর যন্ত্রণা সামলে স্বাভাবিক ভাবেই বললেন, ব্যস্ত হয়ো না—আদেশ এসে গেলে ছটফট করে কি হবে।...হরিহর ঘোষকে বললেন, ঠিক আছে—ডাক্তারের ব্যবস্থা করুন। আপনি ছোটাছুটি না করে রিকশ নিয়ে জীবন ঘোষালের ওখানে চলে যান। তাঁর ফোন আছে—তিনি কোলিয়ারির ডাক্তারকে খবর দেবেন। আর তাঁর ওখান থেকে ছেলেকে একটা ফোন করে আসতে বলে দেবেন। পারলে কলকাতায় ছোট মেয়েকেও একটা ফোন করবেন—ওদের ফোন আছে...বড় মেয়েকে ও-ই যেন খবর দেয়। সাংঘাতিক কিছু বলবেন না, শরীরটা হঠাৎ একটু খারাপ হয়েছে বলবেন। ঘর্মাক্ত মুখে স্ত্রীর দিকে ফিরলেন, ওদের ফোন নম্বরগুলো দিয়ে দাও।

নম্বর নিয়ে হরিহর ঘোষ ত্রস্তে বেরিয়ে গেলেন। এত ঘাবড়ে গেছেন যে তাঁকে কোলিয়ারির ম্যানেজার জীবন ঘোষালের কাছে যেতে বলা হল এই বিস্ময়ও বড় হয়ে উঠতে পারেনি।

যন্ত্রণায় সোমেশ্বর বিছানায় এক-একবার উঠে বসছেন। আবার শুচ্ছেন। যন্ত্রণা সামলাবার চেষ্টায় তাঁর মুখের ওই হাসি দেখে বাসন্তীর কাঁপুনি আরো বাড়ছে। চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করছে।

প্রায় আধঘন্টা বাদে একটু স্থির হলেন। চোখ বুজে অবসন্নের মতো পড়ে থাকলেন। বাসন্তীর মনে হল, ঘুম আসছে। এক একটা মিনিট এক-একটা ঘন্টা মনে হচ্ছে বাসন্তীর।

খানিক বাদে সোমেশ্বর চোখ মেলে তাকালেন। বাসন্তী সামনে ঝুঁকলেন।— একটু কম লাগছে?

—হ্যাঁ। শরীরটাকে নিজের ভাবলেই যন্ত্রণা। না ভাবলে শান্তি। এখন ক'টা বাজল?

—ন'টা।

—আজ কত তারিখ?

এই সাধারণ প্রশ্ন শুনেও বুক কাঁপছে বাসন্তীর। —পৌষের চোদ্দ।—কেন?

—এমনি...কাল সকাল আটটা থেকে উত্তরায়ণ। চোখ বুজলেন। ঠোঁটে হাসি। একটু বাদে আবার তাকালেন।—দেরাজটা খোলো তো...আমার ব্যাঙ্কের পাসবইটা বার করো।

—পাসবই দিয়ে এখন কি হবে? আমার কাছে টাকা আছে।

শ্রান্ত চোখের তারায় একটু কৌতুক চিকিয়ে উঠল—বার করে আমায় দাও না।

বাসন্তী পাসবইটা এনে হাতে দিলেন। সোমেশ্বর শেষ পাতাটা খুলে দেখলেন। তারপর বন্ধ করে ওটা বালিশের নীচে রেখে স্ত্রীর দিকে চেয়ে হাসলেন। বললেন, ছেলে এলে প্রথমেই ওটা তার হাতে দেব, বলব, দ্যাখ—এবারে বাপের সম্পত্তি দেখে নে।

স্পষ্ট কথা। মুখে চেনা হাসি। তবু বুকের ভেতরটা কাঁপছেই বাসন্তীর।

না, ওটা আর তিনি ছেলের হাতে দিতে পারেননি। বলতে পারেননি। দিয়েছে হৈমন্তী। বলেছে হৈমন্তী। ধ্রুব চ্যাটার্জী তার কাজের জায়গায় ছিল না। অফিসেরই দরকারী কাজে অন্যত্র চলে গেছল। সময়ে খবর পায়নি। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে শুনেছে। মাধুরী

আর ছেলেকে নিয়ে তক্ষুনি রওনা হয়েছে। পৌঁছুতে রাত হয়েছে একটু। জিপ ফটকের কাছাকাছি হতে বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠেছে ধ্রুব চ্যাটার্জীর। এই রাতেও ফটকের সামনে পনের বিশ জন লোক কেন? কাছে এসে চিনল। বাবার সমবয়সীরা। তারণ ভট্টাচার্যও আছেন তাঁদের মধ্যে। মেয়ের বিয়ে পণ্ড হয়ে যায় শুনেও যাকে বাবা তিন হাজার টাকা দেয়নি—যার ফলে তিনি অভিশাপ দিয়েছিলেন—নীচ বলেছিলেন—টাকার পিশাচ বলেছিলেন। তার পরেও বাবা তাঁর মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছিলেন। ...আর কোলিয়ারির ডাক্তার আছে।...আর আছেন ম্যানেজার জীবন ঘোষাল। আরো আশ্চর্য, জীবন ঘোষালের চোখে জল টলটল করছে।

কে একজন বললেন, যাও...আছেন।

কি হয়েছে আর কখন হয়েছে ডাক্তার তাকে বলল। ধ্রুব চ্যাটার্জীর কানে ভালো করে কিছু ঢুকছে না। মাধুরী ছেলে নিয়ে আগেই ভিতরে চলে গেছল। আত্মস্থ হয়ে সেও ছুটল।

দোতলা। বাবার ঘর। বাবা খাটে শয়ান। দু'চোখ বোজা। হাত দুটো বুকের ওপর জোড় করা। নাকে অক্সিজেনের নল। মা স্থাণুর মতো শিয়রের কাছে বসে। পায়ের দু'দিকে দিদি অবন্তী আর ছোট বোন হৈমন্তী। তাকে দেখেই দু'বোন মুখে আঁচল চাপা দিল। মা সোজা একবার করে তাকালেন তাদের দিকে। সেই তাকানোর মধ্যে স্পষ্ট নিষেধ। অদূরে ঘুমন্ত ছেলে কোলে পাংশু মুখে মাধুরী দাঁড়িয়ে।

ধ্রুব চ্যাটার্জী খাটের পাশে অনেকক্ষণ নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তারপর খুব সন্তর্পণেই বাবার পাশে বসল। রাত বাড়তে থাকল। সামনে যে শুয়ে সে যেন সমাধিস্থ। একটু শব্দ হলে বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা।

কিন্তু বিঘ্ন একসময়ে ঘটল। বাবার বালিশের পাশে লাল জিনিসটা দেখে হৈমন্তী আবারও শব্দ না করে কেঁদে উঠল। উঠে ওটা নিয়ে দাদার দিকে বাড়িয়ে দিল। রুদ্ধ গলায় বললে, বাবার ব্যাঙ্কের পাসবই—তোমাকে সম্পত্তি দেখাবার জন্য আজই সকালে হেসে হেসে মায়ের কাছ থেকে ওটা চেয়ে রেখেছিল। মাকে বলেছিল, আজ তুমি এলেই তোমাকে দেখাবে—তুমি একবার দেখো দাদা, নইলে বাবার সাধ পূর্ণ হবে না! দেখো —দেখো—!

ধ্রুব চ্যাটার্জী নিজের অগোচরে ওটা খুলেছে। পাতার পর পাতা যেমন জমার ফিরিস্তি, তেমনি তোলার ফিরিস্তি। শেষের পাতায় শেষ ব্যালান্স। সাতষট্টি টাকা তেষট্টি পয়সা!

ধ্রুব চ্যাটার্জী হতভম্ব, বিমূঢ়। মায়ের দিকে তাকালো। মায়ের অপলক দু'-চোখ বাবার দিকে। হঠাৎ মায়ের কথা শুনে ঘরের সকলে বিষম চমকে উঠল। না ওদের কাউকেই নয়, বাবাকে বলছে।—তুমি কাল সকাল আটটা থেকে উত্তরায়ণ বলছিলে কেন? উত্তরায়ণে যাবে?

দুই বোন আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সচকিত মা আবার তাকাল তাদের দিকে। চাউনিতে আবার সেই নিষেধ।

এই মা সামনে বসে দাদুর মৃত্যু দেখেছিল, আর কেমন দেখেছিল সেই মুহূর্তে ধ্রুব চ্যাটার্জীর মনে পড়ছে।

পরদিন।

এখন বেলা দুটো। নতুন খাটে বাবার সাজানো দেহ একতলার ঠাকুরদালানের সামনের প্রশস্ত চত্বরে। সকাল আটটা দশে তিনি দেহ ছেড়েছেন। কখন তাঁকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে কেউ জানে না। কারা দু'জন শুধু ফুল আর মালা সরাচ্ছে। দেখতে দেখতে ওই দেহের ওপর আবার ফুল মালা স্তূপীকৃত হয়ে উঠছে। ধ্রুব চেয়ে আছে।

...বাবা যেন চোখ বুজে শুয়ে মজা দেখছে। শান্ত, প্রসন্ন—ঠোঁটে সেই মজা দেখা হাসি।

...দু'চোখ টান করে করে ধ্রুব চ্যাটার্জী দেখছে। দেখে যাচ্ছে। কাতারে কাতারে হাজারে হাজারে লোক আসছে। খনির কুলি এলাকার মেয়ে পুরুষরা। অস্পৃশ্য এলাকার ছোট ঘরের মেয়ে পুরুষরা। জমির চাষীরা। আদিবাসী মেয়ে পুরুষরা। আসছে, ফুঁপিয়ে কাঁদছে, বুক চাপড়ে কাঁদছে, মাটিতে গড়াগড়ি করে কাঁদছে। বংশী আর শংকর বুক চাপড়ে কাঁদছে। চেনা অচেনা কত ভদ্রলোক আসছে। দেখছে। কাঁদছে। এই আসার মধ্যে কাঁদার মধ্যে তফাৎ কিছু চোখে পড়ছে না ধ্রুব চ্যাটার্জীর। ছোট বড় নেই, উঁচু-নীচু নেই, শিক্ষিত অশিক্ষিত নেই, পাপী অপাপী নেই। সকলেই এক মৃত্যু-তীর্থ দেখতে আসছে, কেঁদে কেঁদে চলে যাচ্ছে। এই শোকের খবর কোনো কাগজে ছাপা হবে না, এই শোক নিয়ে কোনো সভা হবে না—এ শুধুই অগুনতি মানুষর বুকের তলার শোক।

নিঃশব্দে কাঁদছে, কেঁদে চলেছে মাধুরীও।

এত মানুষের মধ্যে চোখে এক ফোঁটা জল নেই শুধু ধ্রুব চ্যাটার্জীর। তার ভেতরটা শুধু জ্বলছে, পুড়ছে। দু'চোখ শুকনো খরখরে। সে শুধু দেখছে। এই মানুষের সংহত অফুরন্ত শক্তির আধার দেখছে।

...ওই কোলিয়ারির ম্যানেজার জীবন ঘোষাল চলে গেলেন—দু' গাল বেয়ে ধারা নেমেছে।...ধ্রুব হাত ধরে কাঁদছেন অনেক জমির মালিক হরিহর ঘোষ—হরিকাকা। কিন্তু কেঁদে কেঁদে এ কি বলছেন তিনি?—সস্তায় এক-একবার তোমার বাবার জমি কিনেছি আর ভেবেছি খুব পেলাম। ভেবেছি বোকা লোকটাকে দানের ভূতে পেয়েছে। কার বস্তি অস্বাস্থ্যকর সেখানে টাকা ঢালছেন, কার মেয়ের বিয়ে হল না, কার ছেলের পৈতে হল না, কার বাপের শ্রাদ্ধ হল না সেখানে টাকা ঢালছেন—আজ তিনি কি পেলেন দেখছ না? তোমার বাবার মুখের হাসি দেখছ না?

...আঃ, বিহারীদাটা এখনো এত দাপাদাপি করে কাঁদছে কেন? ওকে ধমকে থামাবে?

...ওই তারণ ভটচায্যি বা অত কাঁদছেন কেন? উনি না বাবাকে টাকার পিশাচ বলেছিলেন? অভিশাপ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন যাঁদের সঙ্গে করে টাকা চাইতে এসেছিলেন কেঁদে কেঁদে তাঁদের এ কি বলছেন তিনি?...সোমেশ্বর চাটুজ্জে সেই রাতেই একলা তাঁর কাছে গেছলেন...বলেছিলেন, তাঁর নিজস্ব বলতে কিছু নেই তাই ধার দেবার ক্ষমতাও নেই...যা আছে সব বাবার, বাবার গচ্ছিত। এ অবস্থায় আপনার জন জ্ঞানে বাবা যা করতেন তিনিও তাই করবেন ...তখন সঙ্গে অন্য লোক ছিল বলে তিনি কিছু বলতে পারেননি।...তিন হাজারের জায়গায় সোমেশ্বর চাটুজ্জে ছ'হাজার টাকা গুনে দিয়ে এসেছিলেন তাঁর হাতে, বলেছিলেন, শেষ মেয়ের বিয়ে এর কমে হয় কি করে—ধার নয়, এ শুধু বাবার আশীর্বাদ বলেই নেন যেন তিনি...কেবল অনুরোধ, কাউকে যেন কিচ্ছু না বলা হয়।

বাবার দিকে চেয়ে তারণ ভটচায্ চিৎকার করে উঠলেন।—আজ বলব না কেন? কেন তুমি এ-ভাবে আমাদের ছেড়ে গেলে? আজ বুক চাপড়ে বলব! গলা ফাটিয়ে বলব!

আবার একদফা কান্নার রোল উঠল। সকাল থেকে এ-রকম অনেকবার হয়ে গেল। কারা কবে নিঃশব্দে কত পেয়েছে এসে এসে বলে, তারপর কান্নার রোল ওঠে।

হঠাৎ স্তব্ধ সকলে। মেয়েগলায় বিকট হাসি। একে ঠেলে ওকে ধাক্কা দিয়ে একজন আঙিনার দিকে এগিয়ে আসছে। সকলে ত্রস্তে সরে সরে যাচ্ছে। পরনে ছেঁড়াখোঁড়া বিবর্ণ শাড়ি, গায়ের জামাও তেমনি ছিন্নভিন্ন, আলুথালু চুল, ধকধকে চোখ বীভৎস মূর্তি এক পাগলিনী। হাসছে আর চিৎকার করে বলছে, হল—হল? আক্কেল হল সব? বলেছিলাম না, বাহারী হেজে পচে গলে খসে খসে পড়ল বলে—কেবল একজনের জন্য পারছে না? এবার? এবার কি হবে?

ধ্রুব চ্যাটার্জীর গলা দিয়ে নয়, দু চোখ দিয়ে একটা অব্যক্ত নিঃশব্দ আর্তনাদ বেরিয়ে এলো, শিউলিদিদি!

আঙিনায় ঢুকেই পাগলিনী স্তব্ধ। মুখের হাসি গেল। কথা বন্ধ হল। বাবাকে দেখছে। স্তব্ধ। দেখছেই। পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো। পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসল। পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল। অনেক—অনেকক্ষণ।

উঠল। কাঁদছে। মুখে এতটুকু শব্দ নেই। আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে। আবার ধ্রুব চ্যাটার্জীর দু চোখের একটা নিঃশব্দ আর্তনাদ ঠেলে বেরুলো, শিউলিদিদি! যেও না! আমার সব জ্বলে গেল—জ্বলে গেল!

কেউ শুনল না। শিউলিদি চলে গেল।

ধ্রুব চ্যাটার্জী আস্তে আস্তে বাবার পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল। দেখছে। দেখছে দেখছে দেখছে।

—আই ওয়ান্ট্ টু বি এ সিম্পল অনারেবল ম্যান!

ধ্রুব চ্যাটার্জি ভীষণ চমকে উঠল। দিশেহারার মতো চারদিকে তাকালো। কেউ বলেনি। কেউ শোনেনি। সমগ্র একাগ্রতা জড়ো করে আবার বাবার মুখের দিকে তাকালো। সেই পুরনো কথা ক'টা হাসি-মাখা ওই দুই ঠোঁটে লেগে আছে।

ধ্রুব চ্যাটার্জী এই প্রথম বাবার দু'পা জড়িয়ে ধরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

**ত্রয়োদশ খণ্ড সমাপ্ত**

# গ্রন্থ-পরিচিতি

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলীর ত্রয়োদশ খণ্ডে তিনখানি গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সোনার হরিণ নেই (প্রথম ভাগ খণ্ড,) একাল ওকাল এবং তিনপুরুষ—এই তিনটি উপন্যাস।

'সোনার হরিণ নেই' উপন্যাসটি অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক "অমৃত" পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকাকারে এই সুদীর্ঘ উপন্যাসটি দুইখণ্ডে মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশকাল কার্তিক ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ। অনেক সমালোচকের মতে পঞ্চাশ শতকের পর এমন সুখপাঠ্য উপন্যাস বাংলাসাহিত্যে খুব কমই পাওয়া যায়।

'একাল ওকাল' উপন্যাসটি ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংখ্যা নবকল্লোলে প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় প্রকাশের সময়ে উপন্যাসটির নাম ছিল—'একাল ওকাল : মাঝখানে রতনে কালী'। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় উপন্যাসটির নাম সংক্ষিপ্ত করে করা হয় 'একাল-ওকাল'। ১৩৯৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে রথযাত্রার দিন উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স।

'তিনপুরুষ' উপন্যাসটি একটি শারদীয়া সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে লেখক কর্তৃক পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশ ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের ডিসেম্বর মাসে, প্রকাশক অমর সাহিত্য প্রকাশন, ৭ টেমার লেন, কলিকাতা ৯। রচনাবলীর বক্ষ্যমান খণ্ডে উপন্যাসের পাঠগ্রহণ করা হয়েছে গ্রন্থটির বর্তমান সংস্করণ থেকে। এই সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে।

# আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গল্প সমগ্র

## (আশুতোষ রচনাবলীর তৃতীয়, চতুর্থ, সপ্তম ও অষ্টম খণ্ড)

### গল্পগ্রন্থের তালিকা

তৃতীয় খণ্ড ঃ নবনায়িকা, মহুয়াকথা, অলকাতিলকা, সাঁঝের মল্লিকা, বিদেশিনী

চতুর্থ খণ্ড ঃ রাত্রির ডাক, জানালার ধারে, প্রতিহারিণী, কুমারীমাতা

সপ্তম খণ্ড ঃ মনমধুচন্দ্রিকা, প্রতিবিম্বিতা, রোশনাই, পিকপয়েন্ট, উত্তর বসন্তে

অষ্টম খণ্ড ঃ মুখোমুখি, দুজনার ঘর, ফেরারী অতীত, চলো জঙ্গলে যাই, মডেল, রূপসী বাংলার মুখ, ত্রিবর্ণা, সোনালি রেখা, একজন মিসেস নন্দী, কথামালা, সাধিকা